আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রচনাবলী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

—দু'শো ত্রিশ টাকা—

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন — অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ — ন্যাশনাল হাফটোন

ASHUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL XIV

An anthology of collection of complete works Vol XIV by Ashutosh Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta 700 073

Price Rs. 230/-

ISBN : 81-7293-592-7

শব্দগ্রন্থন ; লেজার ইম্প্রেশন

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এসসি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন কলিকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চ্যাটার্জী কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

।। ভূমিকা ।।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে গেছেন একদশক আগে। রেখে গেছেন তাঁর অজস্র জীবনবীক্ষণের ফসল। বাংলা সাহিত্যে প্রেমের গল্প বলার মুন্সিয়ানায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। সেই সঙ্গে অজস্র বিচিত্র জীবন জীবিকা আর মানুষ তাঁর উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। ছোট গল্পে জীবনের একটা ভগ্নাংশের মধ্যে সমগ্রকে খোঁজার আকৃতি থাকে। আর উপন্যাসে ছড়ানো থাকে জীবনের ব্যাপ্ত জটিলতা —মানব অস্তিত্বের বিচিত্রমুখী বিন্যাস। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস আমাদের সেই জটিলতা আর সেই বিন্যাসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বিচিত্র জীবিকা আর মানুষের জীবনযাপনেরও অজস্র বৈচিত্র্যের ফাঁকে-ফোকরে এই ঔপন্যাসিক জীবনের সদর্থকতাকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁর উপন্যাসে।

'সোনার হরিণ নেই' তাঁর দু'খণ্ডের বৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসের মূল চরিত্র বাপী তরফদার দোষে গুণে মেশা এক আপাত সাধারণ যুবক। তার বাল্যপ্রেমের পাত্রী মিষ্টি ওরফে মালবিকাই তার জীবনের ধ্রুবতারা। এই বাপীরই পর্যবেক্ষণে এই উপন্যাসে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল।

উপন্যাসে প্রথম খণ্ডে বাপীর কৈশোরের পটভূমিতে আছে বানারজুলির জঙ্গল। সেখানে আছে জঙ্গলের হেড বীটম্যানের ছেলে আবু রব্বানি। জঙ্গলের সব জন্তু-জানোয়ারকেই সে চেনে, আর বাপীকেও চেনায়। এই বানারজুলিতেই নিতান্ত কৈশোরে তার আকর্ষণ তৈরী হয়েছে বাবার ঊর্দ্ধতন সাহেবের মেয়ে মিষ্টির প্রতি। এই আকর্ষণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেই বাপীর জীবনে তৈরী হয়েছে অজস্র ঘটনার প্রবাহ।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ফাল্গুন ১৩৮৬ তে। দশম মুদ্রণ হয়েছে চৈত্র ১৪০৩-এ। এই সময়-সীমার মধ্যে দশটি মুদ্রণ উপন্যাসের উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার নিদর্শন : এই জনপ্রিয়তায় ঔপন্যাসিকের সব সৃষ্টিই ধন্য। তাঁর এই অসামান্য লোকপ্রিয়তাও শিল্পীরই সামর্থ্যের অভিজ্ঞান।

উপন্যাসের প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিল জঙ্গলের পোষা হাতি বনমায়ার শোচনীয় মৃত্যুতে। দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে তার দাতাল সঙ্গীর সঙ্গিণীকে হারিয়ে ফেলার আর্তি দিয়ে। উপন্যাসের নায়ক বাপীরও সেই একই যন্ত্রণা—তার কৈশোরের প্রেমকে সে রক্তের গভীরে বয়ে নিয়ে গেছে। অপমান আর বারবার প্রতিহত হওয়ার লাঞ্ছনার মধ্যেও তার প্রেমের একনিষ্ঠতাই জীবনের পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা।

ঔপন্যাসিক যে বাপী তরফদারকে গড়ে তুলেছেন—সে দোষে গুণে গড়া এক সাধারণ মানুষ। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বেশীরভাগ উপন্যাসের প্রেমিক নায়ক প্রেমিকার শরীরী আবেদন আর সৌন্দর্যের মুগ্ধ পূজারী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মধ্যে তারও অতিরিক্ত কিছু সে খুঁজে পায় বলেই তার নিখাদ একনিষ্ঠতা মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে একধরণের স্থির আশ্বাস দেয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কথা ভেবে হতাশ করে তোলে না। বাপী তরফদারের মিষ্টির জন্য ভালবাসাও সেই একই গোত্রের।

বাপীর জীবনে একাধিক নারীর উপস্থিতি এই প্রেমসম্পর্কের গভীরতা আর অনন্যতাকে স্পষ্ট করে। মালবিকার দেওয়া অপমান আর তাকে হারানোর তীব্র বেদনায়

সে কখনো বয়সে বড় গৌরীবৌদির দিকে পুরুষের জান্তব ক্ষুধা নিয়ে তাকায়, কিন্তু সেই স্বৈরিণীর নির্লজ্জ নিমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করে আশ্রয়হীনতাকে—অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে পারে। পুরুষের প্রবৃত্তির এই তীব্র স্ফূরণ আর তাকে প্রতিহত করতে পারার শক্তিতেই বাপী তরফদার আধুনিক উপন্যাসের জটিল নায়ক। মালবিকার জন্য অপেক্ষা করে থাকা বাপী বিবাহিতা মালবিকাকে দেখার পর আবারও তার আক্রোশকে ছড়িয়ে দিতে চায় গায়ত্রী রাই-এর মেয়ে উর্মিলার শরীরেও। কিন্তু উর্মিলা তার ভেতরের নিখাদ মনুষ্যত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে বলেই সাময়িক স্খলনের কারণ খুঁজে পেতে চায়।

বাপী আর উর্মিলার সম্পর্কও এই উপন্যাসে আধুনিক নরনারীর সম্পর্কের একটি বিচিত্র দিক। এ যেন কাদম্বরীর রুদ্রাপীড় আর পত্রলেখা। তাঁদের বন্ধুত্বে শরীরী সান্নিধ্যের নিবিড় উত্তাপ আছে—যৌনতা নেই।

বাপীর সঙ্গে গায়ত্রী রাই-এর সম্পর্কের মধ্যেও নিখাদ বাৎসল্যের অতিরিক্ত যেন আর এক ধরণের বন্ধুত্বের উষ্ণতা আছে। অসমবয়সের নরনারীর এই সম্পর্কের বিন্যাসের সূক্ষ্ম বক্রতা ধরা পড়ে গায়ত্রীর মৃত স্বামীর প্রিয় পোশাক বাপীকে দিয়ে দেওয়ার ঘটনায়। কন্যা উর্মিলার চোখেও তার মায়ের এই ব্যতিক্রমী আচরণ ধরা পড়ে। তাই সে পরিহাস করে বলতে পারে একজনের বয়স দশ বছর কম আর অন্য একজনের বয়স একটু বেশী হলে সম্পর্কটা অন্যরকম দাঁড়াতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই জটিলতাকে শৈশবে মাতৃহারা বাপীর বাৎসল্যপিপাসার স্নিগ্ধতাতেই শেষ করা হয়েছে। আর রণজিৎ চালিহার বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে গায়ত্রী রাই নির্ভরযোগ্য এক সহকারীকে পেয়েছেন।

শঙ্খচূড়ের বিষে রেশমার আত্মহত্যা, বাপীর প্রতি তার আকর্ষণ—এই উপন্যাসের বিচিত্র জটিল কাহিনীর আবর্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাপুড়ে মেয়ে রেশমার বাপীর জন্য ভালবাসা এই উপন্যাসের কাহিনীকে অন্যতর জটিলতা আর আস্বাদন মাধুর্য এনে দিয়েছে। রেশমার মর্মান্তিক আত্মহত্যার যে ভয়াবহ ছবি এই উপন্যাসে আঁকা হয়েছে—তা আমাদের গতানুগতিক দৈনন্দিনতার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে যেন কোন এক আদিম মহাকাব্যিক যুগের তীব্র হননের স্মৃতি বয়ে আনে। রেশমার সাপের ঘরের বন্ধ দরজার একটা পাট আবু বাঁশের লাঠি দিয়ে ঠেলে খুলে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোমর সমান ফণা উঁচিয়ে ঘরের মধ্যে বিশাল শঙ্খচূড় সাপ ফোঁস করে ওঠে। সেই বিশাল সাপই রেশমার সর্বাঙ্গ পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। তার বিষে নীল হয়ে গেছে রেশমার শরীর। ঘটনার এই তীব্র আবেদন তাঁর উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাপীর জীবনের নতুন পর্ব শুরু হয়েছে গায়ত্রী রাই-এর মৃত্যুর পর। গায়ত্রী রাই-এর বিপুল সম্পত্তি আর ব্যবসার অর্ধাংশের চুলচেরা ভাগ হয়েছে বাপী আর উর্মিলার মধ্যে। নিজেদের সম্পত্তির ভাগ বাপীর হাতে দিয়ে উর্মিলা আর বিজয় মেহরা আমেরিকায় চলে গেলে বাপী এবার ব্যবসা বিস্তার করতে নেমেছে কলকাতায়। তার এই কর্মোদ্যোগের পেছনেও আছে তার জীবনের ধ্রুবতারা—তার প্রেম। মিষ্টিকে বিবাহিতা দেখেও সে আশা ছাড়ে নি। বন্ধু উর্মিলা এই সহজ সত্যকেও বাপীর সামনে অনাবৃত করে দিয়েছে।

প্রেমে আর যুদ্ধে নীতিবোধ রক্ষার দায় নেই—এই প্রচলিত প্রবাদকে মেনে নিয়ে নিপুণ ষড়যন্ত্রীর মতো বাপী এবার মিষ্টি আর তার স্বামীর সম্পর্কের ফাটলটুকুকে বড় করে তোলার কাজে এগিয়েছে। তাকে সাহায্য করেছে সহকারী জিত মালহোত্রা, মাস্টার-

মশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম। এই কুমকুমকেও জীবনের অন্ধকার বৃত্ত থেকে টেনে এনে আলোর মুখ দেখিয়েছে বাপী তরফদার। মাস্টারমশাই-এর জন্য বাপীর উদ্বেগ, তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাও বাপীর নিখাদ মনুষ্যত্বে একটি নতুন পালকের সংযোজন।

মিষ্টি তার স্বামীর মদ খাওয়া, জুয়া খেলার মতো স্খলন সত্ত্বেও ভালবাসার জোরের কথা বলেছে। কিন্তু প্রেমিক বাপী তার অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা দিয়ে এর ভেতরের ফাঁক খুঁজে পেয়েছে। তার সেই সময়ের নীরব পর্যালোচনায় ধরা পড়েছে মিষ্টির স্বামীর ভালবাসার খাদ।

শেষ পর্যন্ত ঈপ্সিতাকে তার সেই পুরোনো জঙ্গলের পটভূমিতেই ফিরে পেয়েছে বাপী। মিষ্টির সন্তানধারণের অক্ষমতা তাকে বিচলিত করে নি। সে শুধু তার জীবনের প্রেমকেই ফিরে পেতে চেয়েছে। জীবনের সমস্ত স্খলন পতন ত্রুটিকে—শেষতম চূড়ান্ত স্খলনটিকেও মিষ্টির কাছে অকপটে জানানোর পর বাপীর স্বল্পায়তন অথচ বিপুল ঘটনার বৈচিত্র্যে ভরা জীবনের যাত্রা শেষ হয়েছে। সুদূর কৈশোর থেকে মধ্যযৌবন পর্যন্ত যে পরমাকে পাওয়ার জন্য তার তপস্যা—তাকে পরিপূর্ণভাবে সমস্তটুকু পাওয়ার পর ছুটি মিলেছে তার। সন্ন্যাসীর নির্দেশে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে যাওয়া বাপী বিপুল ঐশ্বর্য সঞ্চয়ের পর সোনার হরিণকে পেয়েছে নিজের মধ্যেই।

এই উপন্যাসে ট্রামভাড়া বাড়ার আন্দোলন আর খাদ্য-আন্দোলনের প্রসঙ্গ সময়টাকে চিনিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার কোনো অভিঘাত এখানে দেখা যায় নি। তবে এই বিশেষ সময়ের উল্লেখে সেই সময়ের বিপরীত প্রবণতাকেও ঔপন্যাসিক অভ্রান্তভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন।

বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাসে নায়ক শঙ্করের পরিচয়েব বৃত্ত ঘিরে যেমন অজস্র চরিত্রের আনাগোনা—এই উপন্যাসেও তাই। উত্তরবঙ্গের অরণ্য আর কলকাতার জন-অরণ্য—এই দুই-এরই পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনী আর চরিত্রের বিস্তার। অরণ্যপ্রসঙ্গও এই উপন্যাসে বৈচিত্র্যময়। এখানে জঙ্গলের চোরা শিকারীদের অবাধ বাজত্বের প্রসঙ্গ আছে, সেই সঙ্গে জঙ্গলের গাছপালা বাড়ানোর সক্রিয় চেষ্টার কথাও আছে। ব্যবসার জন্য মাদক বস্তুর উৎস উদ্ভিদের চায়ের প্রসঙ্গও আছে। এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়েই 'সোনার হরিণ নেই' বাংলা সাহিত্যের একটি ভিন্নস্বাদী জনপ্রিয়তায় সফল প্রেমকেন্দ্রিক উপন্যাস।

'খনির নতুন মণি' উপন্যাসটি দে'জ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ, ১৩৩৯ (আগস্ট ১৯৩২) তে। নায়িকা প্রধান এই উপন্যাসে পরীরাণী নামের সাদামাঠা মেয়েটির বাস মহানগরীর এক 'দুদিকে গায়ে গায়ে লাগা সারি সারি বাড়ি'-র গলিতে। আত্মকথনের রীতি ব্যবহার করা না হলেও পরীরাণীর চোখ দিয়েই গোটা উপন্যাসের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

উপন্যাসের একেবারে প্রথমেই আছে অতি প্রত্যূষে জেগে ওঠা এই মেয়েটিরই চোখে দেখা ভোরের বর্ণনা—বাংলা সাহিত্যের আর একটি অসামান্য সূর্যোদয়ের বর্ণনা। সোনার চাকতি সূর্য গলগল করে কাঁচা সোনা ছড়িয়ে কাছে দূরের অন্ধকার ঝেঁটিয়ে দিচ্ছে—যেমন করে স্থূল আবর্জনা সরায় রাস্তায় কাজকরা মেথর লখিয়া। সূর্যের সমস্ত মিথ ভেঙে—ঋগ্বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ—ভারতীয় সাহিত্যের সব আরোপিত গৌরবকে নস্যাৎ করে পরীরাণীর চোখে সূর্য অন্ধকার সাফ করা মেথর লখিয়ার সমগোত্রীয়। সূর্যের

কাছ থেকে পরীরাণীও তেজ ধার চায়। তার ওপর এসে পড়া অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিকে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য—কিন্তু পায় না।

সৎ মা, বাবা, দাদা আর সৎ মায়ের ভাই বীরুমামু—এই কজনের সংসারে তার বাস। পরীরাণীর বাবা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দেওয়া খাবারে বিষ থাকার সন্দেহে সংশয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। পরীরাণী বাবার এই অহেতুক মৃত্যুভয়কে মনে মনে বিদ্রূপ করে। নিজের জীবনের অসহায়তা বোধ থেকে সেও আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার জীবনের এক সঙ্গোপন মাধুর্যতাকে সেই চেষ্টা থেকে সরিয়ে রেখেছে। নিজের মায়ের আত্মহত্যার ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্যও পরীর মনে গেঁথে আছে। বাবার জন্য তার মায়া আর দরদ থাকলেও এই বাবাই যে মায়ের মৃত্যুর কারণ—এই সত্যটাও সে ভুলে যায় না। সৎমা তাকে প্রশ্রয় দিলেও বাবা বা সৎ মা কাউকেই সে বিশ্বাস করে না। সৎমায়ের ভাই বীরুমামা তাদেরই বাড়ীতে আশ্রিত। সম্পর্ককে অস্বীকার করে সে পরীর প্রতি লুব্ধ। কিন্তু পরী ভালবাসে তাদের একতলার ভাড়াটে মাস্টারমশাই-এর ছেলে শেখর ভাদুড়ীকে। সে আদর্শবাদী। প্রথম গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করে গ্রামবাংলার ছেলেকে তৈরী করার ব্রত নিয়েছিল। তারপর শহরে সমস্ত শিক্ষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। সে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষককে নিয়ে সে দাবীদাওয়া আদায় করতে চায়। শেখরের অসুস্থ জলবসন্ত রোগী মায়ের একমাস সেবা করা আর তাদের বাড়ীর রান্না করে দেওয়ার সময় শেখরের সঙ্গে তার সহজ আলাপ। শেখর তার সেবাযত্নের প্রশংসাও করেছে। সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে তাকে পরবর্তী লেখাপড়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছে—প্রেরণা দিয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর, শেখরের মা এই মেলামেশা পছন্দ করছে না জেনেও সে অপছন্দকে অগ্রাহ্য করার সাহস দিয়েছে।

এই উপন্যাসেও আছে বিচিত্র চরিত্রের ভিড়। এদের মধ্যে একজন পরীরাণীদের ওপরের ছাদের ভাড়াটে পণ্টু ঘোষাল। তার লুব্ধ অনুচিত বাসনার আক্রমণ পরীর জীবনে নেমে এসেছিল চোদ্দ বছর বয়সে। তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার পর সে আর ছাদে যায় নি। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই অনাদৃতা অরক্ষিতা মেয়েকে মুখোমুখি হতে হয়েছে নানা পুরুষের লোভের আক্রমণের। তাদের মধ্যে একজন বসন্ত সরখেল। বসন্ত তার অভাবী বৌদি শ্যামলীকে মধ্যস্থ করেও লোভের হাত বাড়িয়েছে এই মেয়েটির দিকে। কলেজে পড়ার শেষ দিনেও তাকে চরমভাবে উত্যক্ত করেছে এই লোকটিই। পরীরাণীর তীব্র ঘৃণার উত্তরে বসন্ত পরীর সৎমা, দাদা আর বীরুমামার ঘৃণ্য স্বরূপ পরীর সামনে তুলে ধরেছে। সৎমা হাসিদেবী মদ্যপ বয়স্ক লোকের হাতে গছিয়ে দিতে চেয়েছে। তার নেশাগ্রস্ত দাদাই সেই বিপদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছে।

উপন্যাসের পরবর্তী নাটকীয় ঘটনা হ'ল বসন্ত সরখেলের মিথ্যা প্রতারণায় পরীকে ধরে নিয়ে যাওয়া। সেই ঘটনা যেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো। সেই দুঃস্বপ্নের জাল নিজেরই প্রবল মানসিক শক্তিতে কেটে বেরিয়ে এসেছে পরীরাণী। কিন্তু এই ঘটনা তার 'হিঁচড়ে টেনে আনা' একুশ বছরের জীবনের সমস্ত চেষ্টা-আগ্রহকে শেষ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে শেখরের আপাত ঔদাসীন্যও তাকে ব্যথিত করেছে।

মাখন নামের আর এক মস্তানের ভয়ে বসন্ত সরখেল চুপ করে থাকলেও এক মাস পর সে মারা গেলে আবারও বসন্তের আক্রমণ শুরু হয়েছে। শেখর ভাদুড়ীর নাম

করে সে পরীরাণীর সেলাই-এর স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে—তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। বলেছে—পরী চাইলে সে অন্যভাবে জীবন কাটানোর কথা ভাববে।

অন্যদিকে মাখন মজুমদারের মৃত্যুর পর তার দাদা পরিতোষ তারই বিধবা স্ত্রীর প্রেমে পড়েছে। সেই প্রেম নিয়েই ক্ষমতাশালী সুধীর সান্যালের সঙ্গে তার বিরোধ। পরিতোষ সুধীর সান্যালের বিরাগভাজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে আবার পরীরাণীর সৎমা তাকে নিয়ে গেছে অসীম ঘোষের কাছে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই চাকরির স্বরূপ আর পথ সম্পর্কে তাকে অবহিত করে অসীম ঘোষ এখনও সৎ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাওয়া পরীকে ফিরিয়ে দিয়েছে বলা যায়। শেষ পর্যন্ত শেখর ভাদুড়ীর শিক্ষক সঙ্ঘে পরী একশো পঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে।

এই উপন্যাসে শেখর আর পরীরাণীর ঘনিষ্ঠতার যে প্রত্যাশিত সমাপ্তি আশা করা গিয়েছিল—সেই প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যের প্রতিষ্ঠায়—ঘটনার উল্টো প্রবাহেই ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যেও তারই ইঙ্গিত।

শেখর তার শিক্ষক সঙ্ঘের অর্থসংগ্রহের কাজে পরীরাণীকেই সঙ্গী করে। উত্তরবঙ্গে এই কাজে গিয়েই ভদ্রলোকের মুখোশ পরা শেখরের আসল রূপ পরীর কাছে ধরা পড়েছে। পরীর শরীর ভোগ করার পরও তাকে বৃদ্ধ নয়ন চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়ে শেখরের বিপুল টাকা জোগাড় করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা, আর দাদা পরিতোষের মৃত্যু পরীকে আবারও আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়। যে বসন্ত সরখেলকে সে এতদিন ঘৃণা করে এসেছিল—সেই বসন্তই তার যথার্থ প্রেমিক। দ্বিতীয়বার নিশ্চিত আত্মহত্যা থেকে সে পরীকে বাঁচিয়েছে—অক্লান্ত সেবায় সুস্থ করেছে—তারপর সৎপথে ফিরে এসে নিজের পৈতৃক বাড়ী ভাগে পাওয়া টাকার মূলধনে পরীর সেলাই শেখাকে কাজে লাগিয়ে জীবিকার সহজ পথ খুঁজে দিয়েছে।

শিক্ষক সমাজ, তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আদর্শবাদের ভাঁওতাবাজির নির্মম কঠোর সমালোচক ঔপন্যাসিক এক সমাজবিরোধীর প্রেমকে কেন্দ্র করে সহজ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসেও তিনি মানব-মানবীর হৃদয় রহস্যের—প্রেম সম্পর্কের জটিল বৈচিত্র্যের নিপুণ রূপকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এও এক 'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী'—তরুণীর জীবনকাহিনী।

এই খণ্ডের আর একটি স্বল্পায়তন প্রেমের উপন্যাস 'অন্য নাম জীবন'। এটি করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ভাদ্র, ১৩৩৭-এ।

প্রেম এই উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকলেও একেবারে সরলরৈখিক একটি প্রেমের উপন্যাস একে বলা যাবে না। আবার প্রেমকেন্দ্রিক জটিল মনস্তত্ত্বের বিস্তারও এখানে নেই। এক স্বল্পবিত্ত পরিবারের মেয়ের নানা বিচিত্র জটিল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে—শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছেও স্থির প্রেমের বিন্দুতে উত্তীর্ণ হওয়ার উপাখ্যান এই উপন্যাসটি।

উপন্যাস শুরু হয়েছে বন্যার স্বপ্ন দিয়ে আর শেষ হয়েছে বন্যার ঘটনা দিয়ে। লোপা চক্রবর্তী এই উপন্যাসের নায়িকা। তার স্বপ্নে দেখা বন্যায় তাকে টেনে তুলেছিল সে যার বাগ্‌দত্তা—সেই রাজা ঘোষাল। স্বপ্ন এখানেই শেষ, তবে উপন্যাসের মাঝখানে

জানা গেছে লোপার দিদি এই বন্যার জলেই হারিয়ে গিয়েছিল। সেই হারিয়ে যাওয়ার আবছা প্রসঙ্গটা স্পষ্ট হয়েছে উপন্যাসের একেবারে শেষ প্রান্তে লোভী কামুক বটুক তালুকদারের সংলাপে। লোপার জন্য তার স্নেহের আপাতস্নিগ্ধ আবরণটুকু সরে গিয়ে ধরা পড়েছে তার হিংস্র লোভের মূর্তি।

এই উপন্যাসও 'এক রমণীর যুদ্ধে'র মতোই নায়িকাকেন্দ্রিক উপন্যাস। লোপারই পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে নানা চরিত্র নানা ঘটনার বিন্যাস। উপন্যাসের পটভূমি উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের রঙ্গিলা নদীর ভয়ঙ্কর বন্যাই এই উপন্যাসের পরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। উপন্যাসের প্রথমে লোপার স্বপ্নে দেখা বন্যার প্রসঙ্গ ছাড়াও সে বন্যার প্রসঙ্গ বারবার নানা চরিত্রের স্মৃতিময় সংলাপে ফিরে ফিরে এসেছে। কপিল চক্রবর্তীর প্রথমা কন্যাকে গ্রাস করেছে সেই বন্যাই, লোপার মা-ও এই বন্যাতেই চলে গেছে।

এক জনকল্যাণকামী দূরদর্শী সৎ রাজনীতিক কপিল চক্রবর্তীর যে পরিণতি এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে—তাতে সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়।

উপন্যাসের পরিসর অল্প হলেও চরিত্র অনেক। প্রতিটি চরিত্রই নায়িকা লোপারই চারপাশে নানাভাবে এসে দাঁড়িয়েছে। স্কুল শিক্ষিকা চারুবালা রায়, সরোজিনী পিসী, বটুক তরফদার, গোপাল গণাই, রাধা গণাই, তাদের ছেলে বিলে গণাই, কন্ট্রাক্টার ভুবন হালদার, বিশ্বেশ্বর ডাক্তার—সব চরিত্রই লোপার দৃষ্টিতে দেখা না হলেও লোপার জীবনকে ঘিরেই তৈরী হয়েছে।

উপন্যাসে দুই প্রেমিক বটুক তরফদার আর রাজা ঘোষালকে পাশাপাশি রেখে ঔপন্যাসিক পুরুষের প্রেমের বিকৃত আর মহনীয় দুটি রূপকে যেন দেখাতে চেয়েছেন। বটুক আর রাজা ঘোষাল—দুজনেই অপেক্ষা করেছে কিশোরী লোপার বড় হয়ে ওঠা পর্যন্ত। কিন্তু দুই অপেক্ষার মধ্যে যে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য—উপন্যাসের পরিণতিই তা বলে দিয়েছে। বটুকের হিতৈষণা আর শুভাকাঙ্ক্ষার আড়ালে নারী শরীরের জন্য পাশব লোভের নগ্নতা আর রাজা ঘোষালের নীরব প্রেম পারিবারিক বিরূপতা সত্ত্বেও লোপাকে গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব। কিন্তু রাজা ঘোষাল চরিত্র হিসেবে লোপার পাশাপাশি কিছুটা অনুজ্জ্বল—একথা বলতেই হয়।

শেষ পর্যন্ত রঙ্গিলার বন্যাই রাজা ঘোষাল আর লোপার প্রেমকে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিল। ক্ষণপ্রভা ঘোষালের বিরূপতা কাটলো বন্যা আর বটুক তরফদারের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া মুমূর্ষু লোপাকে দেখে। ছেলেবেলার পাঠ্য বই থেকে দুলে দুলে মুখস্ত করা কথা 'জলের অন্য নাম জীবন' উপন্যাসের শেষাংশেও জীবন থেকে পাঠ নেওয়া মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা লোপার গলায় আবার শোনা যায়।

'এক রমণীর যুদ্ধ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ উপন্যাস। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারীর বইমেলায়। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে উত্তম পুরুষে। নিজের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন —"আমি পাপ-পুণ্যের বিচারক নই। জীবন সন্ধান আর সেই সঙ্গে হৃদয়সন্ধান আমার কাজ"।

কাহিনীর আরম্ভ কলকাতা থেকে বেনারসগামী একটি ট্রেনের বাতানুকূল কামরায়।

সেখানে জড়ো হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত-অল্পখ্যাত শিল্পী ও সমালোচক। তাঁরা যোগ দিতে চলেছেন বেনারসের প্রাচীনতম বাঙালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের লাইব্রেরীর সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে। সেখানকার একটি কলেজের বাংলার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বন্ধু বীরেশ্বর ঘোষাল তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছেন অবন্তীদেবীর বাড়ীতে। লেখকের বর্ণনায় মহিলার বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ। গায়ের রং কালো, কিন্তু খুব সুশ্রী আর সুঠাম স্বাস্থ্য। তাঁর সমস্ত বেশবাস সাদা আর নাকে বিশালাকৃতি হীরার ফুল। তাতেই তাঁকে আরও সুশ্রী দেখাচ্ছে। লেখককে নিয়ে যাওয়ার জন্য যাঁরা দুজন সঙ্গে এসেছেন —সেই নকুল আর সহদেব তাঁর ছেলে। কিন্তু বয়স দেখে লেখকের মনে হয়েছে এঁরা মহিলার নিজের ছেলে নয়। ছেলেদের কাছ থেকেই জানা গেল তাঁদের মতো মায়েরও বেনারসী শাড়ীর ব্যবসা।

বেনারস থেকে চলে আসার আগে লেখক শুনে এসেছেন এই মহিলা অবন্তী দেবী বা অবন্তী মালহোত্রার জীবনকাহিনী।

সেই জীবনকাহিনীই উপন্যাসের কথাবস্তু। এ-ও এক নারীর নির্ভরতাময় প্রেম, সেই প্রেমকে ঘিরে বাঁচতে চাওয়া—তারপর শুধুই প্রতিহত হওয়ার শেষে আবার উঠে দাঁড়ানোর—নারীলোভী আধুনিক সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতার ঘাতপ্রতিঘাতময় কাহিনী।

অবন্তী ভালবেসেছিল বরুণ মেহ্‌রাকে। বরুণ মেহ্‌রাও তাকে ভালবেসেছিল। সে চলে গেল জার্মানিতে প্রতি মাসে একটা করে চিঠি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু একটা চিঠি দেওয়ার পর অবন্তীর দেওয়া দুটো চিঠির কোনোটিরই আর উত্তর এলো না। শুধু বহুদিন পর তার মায়ের কাছে পাঠানো চিঠিতে থাকলো অবন্তীর বিয়ে হয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন।

ইতিমধ্যে তার জীবনে এলো নতুন মানুষ সমরসিংহ। তারই ইউনিভার্সিটি রবীন্দ্রভারতীর পুরোনো ছাত্র। সে অবন্তীর কাছে প্রস্তাব রাখলো তার ছোটো স্কুলে নাচ শেখানোর। রাজী হল অবন্তী। কিন্তু স্কুলের অন্য শিক্ষয়িত্রীরা তাকে সুনজরে দেখলো না। সেই মাসেই সে চিঠি পেলো তপতী মজুমদার নামে এক মহিলার। তাকেই বরখাস্ত করে নেওয়া হয়েছে অবন্তীকে। সে আরও ভালো চাকরি পেয়েছে। কিন্তু শিল্পী মালিকের করা অপমান তার বরদাস্ত হয় নি। সমর সিংহ জানিয়েছে নাচের ক্লাস ঠিকমতো নিত না বলেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

এরপর অবন্তী বিয়ে করেছে সমরসিংহকে। মদ্যপ, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত, আংশিকভাবে অক্ষম এই পুরুষের সঙ্গে তার দাম্পত্যজীবন শেষ হয়েছে বিয়ের আটমাসের মাথায়।

এরপর বন্ধু জয়ার যোগাযোগে তার স্কুলে চাকরি জুটেছে। সে মোটা টাকার গানের টিউশানি জোগাড় করেছে, থেকেছে হোস্টেলে।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধানে আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে বরুণ মেহ্‌রা। বরুণ মেহ্‌রারই একান্ত আকৃতিতে সে হয়েছে অবন্তী মেহ্‌রা। তারপর বরুণের সঙ্গেই গেছে বিদেশে। মাদকের অবৈধ ব্যবসায় বিপদে পড়া বরুণ তাকে প্যারিসে ফেলে পালিয়েছে। আর সেখানে রজার নামের বরুণের এক দৈত্যাকৃতি দুষ্কৃতির সাগরেদের পরিচিত রেস্তোরাঁয় নাচের চাকরি হয়েছে তার। নাচের ফাঁকে রজারের

শয্যাসঙ্গিনীও হতে হয়েছে তাকে। এর দুমাস পরেই শত্রুপক্ষের ড্রাগ রিঙের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে রজার। তার সঞ্চিত অর্থের অল্প কিছু নিয়ে অবন্তী ফিরে এসেছে দিল্লীতে। দিল্লী থেকে কলকাতা যাওয়ার পথেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সে নেমে পড়েছে বাঈজীদের পীঠস্থান বেনারসে। সেখানে যোশী মহারাজের কাছে অবন্তী ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শিখতে শুরু করেছে। আর নামকরা বাঈজি উষাবাঈ-এর কাছে থেকে নাচগানের আসরে নেমে অর্থ উপার্জনও শুরু করেছে।

এই ধরণের এক নাচগানের আসরেই তার সঙ্গে বেনারসীর বড় ব্যবসাদার সূর্য পাণ্ডের দেখা হয়েছে। সূর্য পাণ্ডে দেড় হাজার টাকা মাইনেয় তাকে নিজের সেক্রেটারী করে নিয়েছে। এরপর এই লোলুপ ব্যবসায়ী আরও বেশী টাকা দিয়ে নাচগানের আসর ছাড়িয়ে তাকে নিজের রক্ষিতা করে রেখেছে। গুরুদেব ব্রহ্মগুরুর নির্দেশে অবন্তীকে বিয়ে করার পরও চূড়ান্তভাবে অপমান করেছে, তার কর্মচারী বীরেন্দ্রর সাহায্যে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের নির্দেশ দিয়েছে, আপত্তি করলে চাবুকের ঘায়ে পিঠ ফালা ফালা করেছে।

চূড়ান্ত কষ্টের মুহূর্তে অবন্তীর সেবা নেওয়ার সময়ও সূর্য পাণ্ডে শাসিয়েছে তাকে, অজস্র লোভী পুরুষের হাতে তুলে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে। আর তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবন্তী, অক্সিজেনের নল মুখ থেকে সরিয়ে পাখা বন্ধ করে দিয়ে সে সূর্য পাণ্ডের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে চূড়ান্ত মনোবলের পরিচয় দিয়ে অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তার পরের জীবন সম্মানের—সম্ভ্রমের—মর্যাদার আর সাফল্যের। সে সূর্য পাণ্ডের দুই পুত্র নকুল আর সহদেবের শ্রদ্ধা সম্মান পেয়েছে—অন্যদিকে সূর্য পাণ্ডের ব্যবসার মালিক হিসেবেও নিজের বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। জীবনের এই পর্বেই বেনারসের সাহিত্য সম্মেলনে তার সঙ্গে লেখকের পরিচয়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে জীবনসন্ধান তাঁর কাজ—একথা সভার বক্তৃতায় বলেছেন লেখক। অবন্তীর মধ্যে সেই অপরাজেয় জীবনেরই সন্ধান পেয়েছেন তিনি। সতীত্ব, দৈহিক শুচিতা—সব কিছুর ওপরে রমণীর এই যুদ্ধ জয় তার নিছক 'রমণীত্ব' থেকেও নিষ্ক্রমণের ইতিহাস। ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন মানুষ হচ্ছে—'an abstract or model of the world', অবন্তীকে শুধু নারী নয়—সেই 'abstract' হিসেবেও আমাদের দেখতে ইচ্ছে করে।

আশুতোষের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মতো এই চারটি উপন্যাসেও গল্পের নিপুণ কথক তিনি। তাঁর উপন্যাসের গল্পরস সব শ্রেণীর পাঠককেই তৃপ্ত করে। আর সেই সঙ্গে তিনি বিচিত্র জটিল জীবনেরও রূপকার বটে। এই জীবন বড় বিশ্বাসঘাতক অথচ মোহময়, জটিল হয়েও রেখায়িত। ভঙ্গুর, সীমাবদ্ধ অথচ অনন্ত, পৃথিবীর সমস্ত 'রণ রক্ত সফলতা'-র পরেও জীবনজাহ্নবী শ্মশানের কূলে নিরবধি বহমান। চল্লিশের দশকে লেখক-জীবন শুরু-করা আশুতোষ দেশকালের বিচিত্র জটিল অভিঘাতে বিধ্বস্ত এই অবিনশ্বর জীবনকে দেখেছেন নানাভাবে।

এই চল্লিশের দশকের গোড়াতেই চলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন। সেই আগুনের তাপে ঝলসে গেল বাঙালীর নিশ্চিত জীবন—বিপর্যস্ত হল মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ। দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, দাঙ্গা আর স্বাধীনতা—এইসব ঘটনার প্রভাব

অন্যদের মতো আশুতোষের উপন্যাসেও পড়েছে। সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ঔপন্যাসিকের মতো আশুতোষের উপন্যাসেও ঘটেছে ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার। এই খণ্ডের উপন্যাসেও উত্তরবঙ্গের বানারজুলির জঙ্গল আর রঙ্গিলা নদী দুটি উপন্যাসের পরিণতি আর গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'খনির নতুন মণি'তে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ খুব কম। সঙ্কীর্ণ গলির নিম্নবিত্ত নাগরিক জীবনের অন্ধকার পেরিয়ে আলোয় এগিয়ে আসা একটি মেয়ের কথা বলতে গিয়ে সেই বিকৃত নাগরিকতাকেই উপন্যাসের পটভূমি করেছেন লেখক। 'এক রমণীর যুদ্ধ' উপন্যাসের পটভূমি সারা পৃথিবীকেই বলা যায়। এই উপন্যাস আজকের গ্লোব্যাল ভিলেজে নারীকে পণ্য করে তোলা আগ্রাসী ধনতান্ত্রিকতার হাত থেকে, লেলিহান লোভের শিখা থেকে কৃষ্ণাসুন্দরী অবন্তীর নিজেকে উদ্ধার করার—নতুন জন্মে নতুন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ইতিবৃত্ত। এ-ও কথাসাহিত্যিক আশুতোষের জীবনবোধের সমর্থতম পরিচয়ে ঋদ্ধ। নারীই হোক, পুরুষই হোক—তাঁর এইসব উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা জীবনের জটিল আবর্তে অবিরত পাক খেতে খেতেও তলিয়ে যায় না—সমস্ত গ্লানি আর ক্লিন্নতাকে সরিয়ে শেষ পর্যন্ত জীবনের শুদ্ধ রূপেরই জয় ঘোষণা করে। এই ইতিবাচকতাই তাঁর সৃষ্টিকে মহৎ কথাসাহিত্যের মর্যাদা দেয়।

সত্যবতী গিরি

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

সোনার হরিণ নেই

দ্বিতীয় খণ্ড

তোমাকে

এক

বনমায়ার সেই দাঁতাল সঙ্গীকে মারার জন্য সরকারী ঢ্যাঁড়া পড়েছে।

প্রথম দিকে কিছুদিন ওই বুনো হাতিটা চা-বাগানের কাছাকাছি জঙ্গল থেকে তারস্বরে ডাকাডাকি করেছে। সন্ধ্যায় বা রাতে ওদিকে ঘেঁষার মতো বুকের পাটা কারো নেই। তারপর লছমন এক চাঁদনি রাতে স্বচক্ষে পাহাড়ের মতো ওই দাঁতাল হাতিটাকে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। একবারও ডাকেনি বা এতটুকু শব্দ করেনি। বাপীকে বলেছে, ভয়ে ওর হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গেছল। ওটা নেমে এলে ছনের ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ওকে পিষে মারতে কতক্ষণ।

কিছুই করেনি। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেছে। তার সঙ্গিনী আর এ-জগতে নেই তা ও ভালো করেই বুঝে গেছে। কিন্তু কিছুদিন না যেতে ওটার উপদ্রব শুরু হল। এক-এক রাতে গাছপালা মুড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে, জঙ্গলের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে। ঢাক-ঢোল টিন কানেস্তারা নিয়ে দল বেঁধে রাতে পাহারা দিতে হয়। পাঁচ-ছমাসের মধ্যে নানা জায়গায় সাত-সাতটা জঙ্গলের কুলি মজুরকে মেরে দলা পাকিয়ে রেখে গেছে। ওটা গুণ্ডা হয়ে গেছে। মারার পরোয়ানা বার করা ছাড়া আর উপায় নেই। বনবিভাগের তরফ থেকে পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে। বিষমাখানো ফলার কারবারী নেপালী তীরন্দাজরা ওটার খোঁজে দল বেঁধে জঙ্গল ঢুড়েছে। কিন্তু এই গুণ্ডা হাতিও এখন তেমনি চতুর। উল্টে ওই তীরন্দাজদের দুজন আচমকা ওর হাতে পড়ে তালগোল পাকিয়ে গেছে।

শেষে বাইরের দুজন রাইফেলধারী পাকা শিকারী আসরে নামতে ওটা কিছুটা নাকাল হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে মনে হয়। মনে হয় কারণ, রাইফেলের গুলি ওটার কান বা ঘাড়ের কোথাও লেগে থাকবে বলে শিকারীদের বিশ্বাস। নইলে মুখ থুবড়ে পড়ে ওখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু জঙ্গল কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে ওটা পালিয়েছে। পরের ছ'মাসের মধ্যে জঙ্গলের এই এলাকায় আব তাকে দেখা যায়নি। অমন পাহাড়ের মতো দেহ নিয়ে কোথাও মরে পড়ে থাকলেও টের পাওয়া যেত। জঙ্গলের লোকেরাই নিঃশব্দে খোঁজাখুঁজি করেছে। ওটার দাঁতের প্রতি অনেকেরই লোভ। কোথাও মরে পড়ে থাকলে আর সকলের অগোচরে দাঁত দুটোর মালিক হয়ে বসতে পারলে এক ধাক্কায় বড়লোক। বাপী শুনেছে, ওই বুনো গুণ্ডার বিশাল দাঁত দুটো ধনুকের মতো বেঁকে শূন্যে ঠেলে ওপরের দিকে উঠেছে।

পাগল হয়ে গেছে যখন একদিন ওটা কারো হাতে মরবে জানা কথা। গুলিব ক্ষত বিষিয়ে আপনিও মরতে পারে। বন্দুক ছুঁড়তে জানলে আর ওটা সামনে পড়লে বাপী নিজেও মারার চেষ্টাই করত। কিন্তু ভিতর থেকে হিংস্র হয়ে উঠতে পারত কি? উল্টে ছেলেমানুষের মতোই কাল্পনিক শত্রুনিকাশের আক্রোশ তার। বনমায়ার হাল যদি কোনো এক মেয়ের হত, ও নিজে কি করত? এমন কি কিছু না হলেও শুধু যদি সভ্য দুনিয়ার বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব না থাকত? তাহলেও কি কলকাতার এক সোনালি-চশমা-রাঙা মুখ এত দিনে যমের দরজা দেখত না?

আরো একটা বছর ঘুরে গেল। বাপী তরফদার সুখে নেই এ তার কোনো শত্রুও

বলবে না। মর্যাদা বেড়েছে, প্রতিপত্তি বেড়েছে। মাইনে বা বাড়ি ভাড়ার টাকা এক পয়সাও খরচ হয় না। সব সোজা ব্যাঙ্কে চলে যায়। অলিখিত কমিশন হিসেবে গড়ে তার দ্বিগুণের বেশি কাঁচা টাকা হাতে আসে। তাই সামাল দিতে ভাবতে হয়। খাওয়া খরচ নেই, জলখাবারের খরচ পর্যন্ত না। শুধু লাঞ্চ ডিনার নয়, সকালে-বিকেলের জলখাবারের সময়ও এখন পাশের বাংলোয় ডাক পড়ে। আপিস তো ওখানেই, তাই সাতসকালে নাকে-মুখে গুঁজে ছোটার দরকার হয় না। দু-বেলাই গায়ত্রী রাই আর তার মেয়ের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসতে হয়। তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মহিলার নজর আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, যে-মুখ করে খাও, কি পছন্দ আর কি অপছন্দ কিছুই বোঝা যায় না।

বাইরে কোনো উচ্ছ্বাস নেই। বিরক্ত হলে আগের মতোই কথা শোনায় বা ধমকে ওঠে মহিলা। তবু বাপী স্নেহের স্বাদ পায়। ওর প্রতি মনোযোগ বাড়ছে, নির্ভরতা বাড়ছে। পরোক্ষ প্রশ্রয়ও। বাপীর সঙ্গে ঊর্মিলার কথায় কথায় ঝগড়া। ঝগড়া অবশ্য এক-তরফা ঊর্মিলাই করে থাকে। দোষ বলতে গেলে বাপীরই। ফাঁক পেলেই সাদা মুখ করে এমন কিছু মন্তব্য করবে বা ফোড়ন কাটবে যে ও-মেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেই। যা মুখে আসে তাই বলে তখন। গায়ত্রী রাই দেখে। শোনে। বিরক্ত হয়ে কখনো বা মেয়েকেই শাসন করে।—সর্বদা তুই ওর সঙ্গে এমন লাগবি কেন—আর যা-তা বলবি কেন?

বেশি রাগিয়ে দিতে পারলে মেয়ে মায়ের ওপর চড়াও হয়।—আমি ওর সঙ্গে লাগি—আমি যা-তা বলি? ও কত বড় বজ্জাত জানো?

বাপীর এমন মুখ যে মালিক না বাঁচালে এই মেয়ের অত্যাচারে তার বাঁচা দায়।

গায়ত্রী রাই কখনো ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কখনো বা ঠোঁটের ফাঁকে চুলচেরা হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। ঊর্মিলা জানে না, কিন্তু বাপী তাইতেই আরো বিপন্ন বোধ করে। মহিলা বলতে গেলে গোড়া থেকেই সদয় তার ওপর। অনেক ভাবে ওকে যাচাই করেছে, কিন্তু উত্তীর্ণ হোক সেটা নিজেও মনেপ্রাণে চেয়েছে। এই চাওয়াটা ভিন্ন স্বার্থের কারণে। তখন শুধু চালিহা লক্ষ্য। তেমন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কাউকে পেলে তাকে দূরে সরানোর সংকল্প। সেই লক্ষ্য আর সংকল্পের দিকে বাপীই তাকে এগিয়ে দিয়েছে। তার পুরস্কারও পাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু পাচ্ছে যার ফলে আনন্দের থেকে ভয় বেশি। ভিতরে সেই অনাগত আশঙ্কার ছায়াটা ইদানীং আরো বেশি দুলছে। মহিলার স্নেহ শুধু কাম্য নয়, দুর্লভ ভাবে বাপী। এর সঙ্গে ওর ভিতরের একটা উপোসী আবেগের যোগ। কিন্তু এত স্নেহ আর প্রশ্রয়ের আড়ালে মহিলার প্রত্যাশাটুকু বাপীর কাছে দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয় আর দুশ্চিন্তা সেই কারণে।

...মেয়ে ওর সঙ্গে যেখানে বা যত দূরে খুশি বেড়াতে গেলে গায়ত্রী রাইয়ের আপত্তি নেই। দুপুরে ব্যবসার কাজকর্মে একটু-আধটু বোঝার জন্য মেয়েকে বাংলোর আপিস ঘরে গিয়ে বসতে বলে। কিন্তু বাপীর বিশ্বাস মেয়ে এলে স্রেফ আড্ডা দেয় আর কাজকর্ম পণ্ড হয় জেনেও এই তাগিদ দেয়। বিশেষ কাজে কিছুদিন আগে একবেলার জন্য পাহাড়ে আসার দরকার হয়েছিল। গায়ত্রী রাই মেয়েকে হুকুম করেছে, তুইও যা, ঘরে বসে থেকে কি হবে, যেটুকু পারিস শিখেটিকে নে।

ঊর্মিলা তক্ষুনি রাজি। শিখতে দায় পড়েছে তার। বাপীর সঙ্গে বেড়ানোটুকুই লাভ।

বাপীই বরং প্রস্তাব নাকচ করেছে। বলেছে, শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে, আপনাকে একলা রেখে দুজনের বেরুনো চলবে না।

মা সরে যেতে ঊর্মিলা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, না গেলাম তো বয়েই গেল, কিন্তু শেখার সময় ঢের পাওয়া যাবে বলার মানে কি ? কাজ শেখার জন্য এখানে তোমার কাছে বসে থাকব?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গায়ত্রী রাই তার সময়মতো শুতে চলে যায়। মেয়ের আবার সেটাই ভালো আড্ডার সময়। প্রায়ই বাপীকে ধরে রাখে। যে-দিন বিলেতের চিঠি আসে সেদিন তো ওকে সমস্ত সমাচার জানানোর জন্য এই নিরিবিলির প্রতীক্ষায় ছটফট করে। কিন্তু এরকম আড্ডা দেওয়াটাও গায়ত্রী রাইয়ের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকে না।

সম্প্রতি বাপীর একটা মোটর গাড়ি হয়েছে। গাড়ির তখন কি-বা দাম। চা-বাগানের সায়েবসুবোরা চলে যাবার সময় ভালো গাড়িও জলের দামে বেচে দিয়ে যায়। বাপী ডাটাবাবুকে বলে রাখতে সে-ই একটা ভালো গাড়ির সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু গায়ত্রী রাই বাপীকে এখানকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সাদা টাকা দিয়ে কিনতে দেয়নি। আর হিসেবের বাইরের উত্তর বাংলার দূর-দূরের ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা আছে—তার থেকে তুলে গাড়ি কিনলে ইনকাম ট্যাক্স ছাড়াও আরো সতের রকমের জবাবদিহির ফ্যাসাদে পড়তে হবে। গায়ত্রী রাইয়ের হুকুমে সেই গাড়ি ফার্মের নামে কেনা হয়েছে। ফলে খরচ সব কোম্পানীর ট্যাক্সের খাতায় উঠছে। গাড়ি বাপীর খাস দখলে।

মায়ের বদান্যতায় ঊর্মিলা অখুশি নয়। তবু বাপীকে ঠেস দিতে ছাড়েনি।—মা যে দেখি তোমার বেলায় মিসেস দাতাকর্ণ হয়ে বসল একেবারে, যা চাও তাই মঞ্জুর। চাইলে শেষে আমাকে সুদ্ধু না দিয়ে দেয়—

বলতে বলতে খিলখিল হাসি।

বাপী সন্তর্পণে প্রসঙ্গ এড়িয়েছে। বিজয় মেহেরা বিলেত থেকে ফেরার আগে মহিলা না চাইতেই দেবার জন্য ঝুঁকবে কিনা সেই আশঙ্কা বুকে চেপে বসেছে বাপীর। ঊর্মিলা মেয়েটা বোকা নয়। নিজেকে নিয়ে বিভোর, তাই কোনরকম সন্দেহের আঁচড় পড়ছে না। উল্টে বাপী দলে আছে বলেই নিজের ব্যাপারে বাড়তি জোর পাচ্ছে। ও ধরে নিয়েছে, সততার সবগুলো সিঁড়ি টপকানো শুধু নয়, মায়ের সব থেকে ব্যথার জায়গাটি ছুঁয়ে যেতে পেরেছে বলেই এই ছেলের এখন এত খাতির কদর, তার প্রতি এত স্নেহ। তাছাড়া মায়ের অসুখটার জন্য বাপী যা করল তাও এই মেয়ে আর কোনদিন কাউকে করতে দেখেনি। একথা ঊর্মিলা নিজেই বাপীকে বলেছিল। ওর নিজের তো আগে ধারণা হয়েছিল মায়ের অসুখ-টসুখ সব বাজে। পরে এই জন্যেও মনে মনে লজ্জা পেয়েছে।

বাপীর এত সুখের তলায় কোন্ দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আছে ঊর্মিলাকে তার আভাস দেওয়াও সম্ভব নয়। জানালে এই মেয়ে অবুঝের মতো ক্ষেপে যাবে। মা মেয়ের মধ্যে আবার একটা বড় রকমের অশান্তি ঘনাবে। শুধু মানসিক নয়, মহিলার তাতে স্বাস্থ্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া ঊর্মিলাকে বলবেই বা কি, ওর মা তো এখন পর্যন্ত সরাসরি প্রস্তাব কিছু দেয়নি। যেটুকু বোঝার বাপী আভাসে বুঝেছে, আচরণে বুঝেছে।

বাঁচোয়া শুধু এই, মেয়ে শেষ পর্যন্ত যদি তার সংকল্প আঁকড়ে ধরে থাকে। যেরকম অবস্থা আর মতিগতি দেখছে, মনে হয় থাকবে। এক বছরেরও ওপরে দেরি, এখন

থেকেই বিজয় মেহেরার ফেরার দিন গুনছে। প্রাণের দায়ে ইদানীং বাপী ঊর্মিলার কাছে ওই ছেলের গুণকীর্তন শুরু করেছে। ছেলেটার ব্যক্তিত্ব আছে, পুরুষের গোঁ আছে, বড় হবার মতো ইচ্ছের জোর তো আছেই, গুণও আছে।

ঊর্মিলার কানে মধু। এক-এক সময় তাগিদ দেয়, মায়ের কাছে ওর সম্পর্কে তুমি একটু একটু বলতে শুরু করো না।

বাপীর তখন পিছু হটার পালা।—এখন বললে মাঝখান থেকে উত্তেজনা বাড়বে, শরীর খারাপ হবে। সময়ে তোমার জোরটাই আসল, এখন বলে কিছু লাভ হবে না।

সেদিন ঊর্মিলা এসে একটা জবর খবর দিল। বিকেলে চা-বাগান কোয়ার্টার্স-এর দিকে বেড়াতে গেছল। আংকল চালিহার সঙ্গে দেখা। ডাটাবাবুর ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জোরজার করে অনেক কিছু খাওয়ালো। সেই ফাঁকে বিজয় মেহেরার দারুণ প্রশংসা। আংকল নিজের একটা মস্ত ভুল শুধরোবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে বলল। মিরিকের চা-বাগানের ওপরওলার সঙ্গে দেখা করে বিজয় মেহেরার সম্পর্কে খোঁজখবরও নিয়েছে। কারণ ডলি নিজের মেয়ে বললেই হয়, তার তো একটা দায়িত্ব আছে। তা সেই ওপরওয়ালা মেহেরার খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, যেমন সৎ তেমনি পরিশ্রমী। আর ভালো স্কলার তো বটেই। ছেলেটা যে খুব উন্নতি করবে তাতে তার কোনো সন্দেহ নেই। বিজয় লন্ডনে এখন কোথায় আছে, কি রকম আছে, কবে পর্যন্ত ফেরার সম্ভাবনা, চিঠিপত্র লেখে কিনা, সহৃদয় আপনার জনের মতো আংকল এসব খোঁজও নিয়েছে। চিঠির প্রসঙ্গে ঊর্মিলা চুপ করে ছিল। অন্য সব কথার জবাব ঠিক ঠিক দিয়েছে। তারও ধারণা, বিজয়কে মায়ের কাছে অমন ছোট করে ফেলে আংকল এখন পস্তাচ্ছে।

কিন্তু পস্তাবার কারণটা বাপীর থেকে ভালো বোধ হয় আর কেউ আঁচ করতে পারবে না। বাপীর সঙ্গেও রণজিৎ চালিহার ব্যবহার এখন আরোও আপনার জনের মতো। মাঝে মাঝে ওকে ডিনারেও ডাকে। গেলাসে চুমুক দিয়ে অন্তরঙ্গ খোশমেজাজে জিজ্ঞাসা করে, কতকাল আর ব্যাচিলার থাকবে হে, দেখেশুনে ঝুলে পড়ো কোথাও। নয় তো বলো আমিই ঘটকালিতে লেগে যাই। তারপর গলা খাটো করে জিগ্যেস করেছিল, কাউকে মনে-টনে ধরেনি তো?

নিরীহ মুখে শুধু হেসেই বাপী এসব কথার জবাব এড়াতে পারে। ঊর্মিলার সঙ্গে সহজ মেলামেশাটাই খুব সম্ভব ভদ্রলোকের বেশি দুশ্চিন্তার কারণ। আর গায়ত্রী রাই যেভাবে এখন ওকে আগলে রাখে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখে, টাকা-পয়সা দেয়—তাই দেখেও এই অতি-চতুর লোকের সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। মেয়ের বিয়ের পাত্রর জন্য দু-দুটো বড় কাগজে অত ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েও মহিলা একটা বছরের মধ্যে সে-সম্পর্কে একেবারে চুপ মেরে গেল দেখেও এই লোকের সন্দিগ্ধ হবার কথা।

অনুমান মিথ্যে নয় দিন কতকের মধ্যেই বোঝা গেল। রণজিৎ চালিহা মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলতে দেখুক। কিন্তু মুশকিল হল, সেই একই খাঁড়া যে বাপীর দিকে উঁচিয়ে আছে! মেয়েকে নিয়ে আজকাল বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে ভ্যানে চেপে হাওয়া খেতে বেরোয় গায়ত্রী রাই। ব্যবস্থা বাপীরই। তাকে না পেয়ে রণজিৎ চালিহা সেদিন বাপীর বাংলোয় হাজির।

ব্যবসার আলোচনার ফাঁকেই তার মনের সংকট আঁচ করা গেল। মধ্যপ্রদেশের

অনেক জায়গায় ঘুরে এসেছে এর মধ্যে। ভালো ব্যবসাই হবে আশা করা যায়। কিন্তু চালিহা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছে পশ্চিম বাংলার কলকাতার মতো এমন বাজার আর হয় না। শুধু শুকনো হার্বের চাহিদাই সেখানে বছরে পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ টাকার মতো। আর নেশার জিনিসও ওখানেই সব থেকে বেশি চলতে পারে। চালিহার মতে এত বড় মার্কেট আর হাতছাড়া করে রাখার কোনো মানে হয় না। ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিয়নের জন্যেই বাপীকে প্রথমে নেওয়া হয়েছিল, এখন তার সেখানেই চলে যাওয়া উচিত। সেখানে একটা গোডাউন ঠিক করে এখান থেকে মাল চালানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তারপর দেখেশুনে ঘাঁটি ঠিক করে অন্য পাঁচ রকমের মাল পাঠানো যেতে পারে।

প্রস্তাবের শুরুতেই বাপী তার মনের কথা বুঝে নিয়েছে। সাদাসিধে জবাব দিল। মিসেস রাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করুন, আমার আর অসুবিধে কি।

—বলেছিলাম। চালিহার মুখে চাপা বিরক্তি।—এই অসুখটার জন্যেই ভদ্রমহিলা মনের দিক থেকে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন মনে হয়। অতবড় একটা মার্কেট হাতছাড়া হওয়া উচিত নয় বলে যদি মনে করো তাহলে তুমিই জোর দিয়ে তাঁকে বলো। এদিকের জন্যে তো কিছু আটকে থাকবে না, মধ্যপ্রদেশের ফিল্ড হাতে নিয়েও এদিকটা আমি দেখাশুনা করতে পারব।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বাপী জিজ্ঞাসা করল, মিসেস রাই কি বলেন?

—কি বলেন তাই তো আমার মাথায় ভালো করে ঢুকছে না। তোমাকে নাকি এখন তাঁর খুব কাছে রাখা দরকার। ব্যবসায় ইন্টারেস্ট ছেড়েও তোমাকে খুব কাছে রাখা দরকার তাঁর...ব্যাপার কি বলো তো?

ব্যাপার কি তা যে এই লোক গায়ত্রী রাইয়ের ও-কথার পরে খুব ভালো করে টের পেয়ে গেছে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। মনে হল, অন্তরঙ্গ খোলসের আড়ালে একটা হিংস্র জানোয়ার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎ পেতে আছে। চোখের গভীরেও একটা ধারালো ছুরি লুকনো আছে।

বাপী ভাবনায় তলিয়ে যাবার মতো করে জবাব দিল, অসুখটার জন্যেই হয়তো মন দুর্বল হয়ে আছে।

একটু আগে নিজেই এই কথা বলেছিল চালিহা। মুখে হঠাৎ আবার হাসির খোলস ছড়ালো। বলল, তোমারও তো মন খুব সবল দেখছি না। যাক, আমার যা বলার ব্যবসার স্বার্থেই বললাম, যদি ভালো বোঝো তো মিসেস রাইয়ের সঙ্গে আলোচনা কোরো— আর কাছে থাকাটাই যদি বেশি দরকার ভাবো তা হলে আর কথা কি!

সে চলে যাবার পরেও বাপী স্থাণুর মতো বসে অনেকক্ষণ। সকলকে ছেড়ে গায়ত্রী রাই আগে এই লোকের কাছেই মনের ইচ্ছেটা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করে ফেলল কেন মাথায় আসছে না। অসুখের জন্য বাপীর যেটুকু উদ্বেগ, মহিলার নিজের তার ছিটেফোঁটাও নেই। তার চরিত্রের এই ধাত বাপীর থেকে রণজিৎ চালিহা কম জানে না। অতএব ওকে কাছে রাখার একটাই অর্থ চালিহা বুঝেছে। আর, গায়ত্রী রাইও তাকে তা-ই বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু কেন? দূরে যাকে সরাতে চায় চালিহা, ভবিষ্যতে সে কত কাছের কোন জায়গা জুড়ে বসতে পারে সেটা বলে তাকে একটু সতর্ক করে দেবার জন্যে? বুঝিয়ে দেবার জন্যে যে আর তোমার ওই ছেলের পিছনে লেগে লাভ নেই—বরং নিজে তুমি

সমঝে চলো?

কিন্তু বাপী কি করবে এরপর? মহিলার সংকল্প যে ভাবে দানা বেঁধে উঠছে, ও কোন্ পথ ধরে আত্মরক্ষা করবে?

জঙ্গলের কাজ যেমন বাড়ছে, আবুর দায়িত্ব বাড়ছে তেমনি। কোথায় কোন্ চাষের বেড় হচ্ছে বা হবে বাপীর কাছে তার প্ল্যান ছকা। দায়-দায়িত্ব আবুর। তার হুকুমমতো তিরিশজন লোক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছে। এই গতর-খাটা লোকদের হিসেব মেটাবার জন্য আর পরামর্শ নেবার জন্য একদিন অন্তর আবুকে বাপীর কাছে আসতে হয়। হিসেব বুঝে পরচা লিখে সই করে দিলে অ্যাকাউনটেন্ট টাকা দিয়ে দেয়। মেমসায়েবের বাংলোর আপিসের দিকে ঘেঁষে না আবু। সন্ধ্যার দিকে বাপীর বাংলোয় আসে।

পর পর চার দিনের মধ্যে আবুর দেখা নেই। লোক মারফৎ অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে হিসেব পাঠিয়েছে—সে এসে বাপীর কাছ থেকে সই করিয়ে নিয়ে গেছে। অ্যাকাউন্টেন্ট জানিয়েছে, রব্বানীর শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকে বাপী সেদিন ওকে দেখার জন্যেই বেরিয়ে পড়ল। এদিক ওদিক পক্স-টক্স লেগেছে খবর পেয়েছে। শুধু-মুদু ঘরে বসে থাকার লোক নয় আবু রব্বানী।

দাওয়ার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। মুখখানা বাংলার পাঁচের মতো হাঁড়ি করে হারমা বেরিয়ে আসছে। বাপীকে দেখল। অভ্যাসবশত একটা হাত কপালে উঠল বটে, কিন্তু মুখ তেমনি অপ্রসন্ন। গম্ভীর তো বরাবরই। একটি কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে গেল।

ওর অসন্তোষের কারণ আঁচ করতে পারে বাপী। সাপ ধরার মৌসুম এটা। এর মধ্যে তিন দিন আগে রেশমাকে আবার পাহাড়ের বাংলোয় পাঠানো হয়েছে। এবারে গায়ত্রী রাইকে বলেই তাকে পাঠিয়েছে রণজিৎ চালিহা। বানারজুলি বা আশপাশের এলাকার মদ চালানোর ব্যাপারটা এখন বাপীর হাতে বটে। কিন্তু অন্যত্র চালিহার পার্টিও কম নয়। একটা বড় চালানের ব্যবস্থা করে মাল সংগ্রহের জন্য রেশমাকে আগে থাকতে সেখানে পাঠানো হয়েছে। বাপীর ধারণা দু-চার দিনের মধ্যে রণজিৎ চালিহাও পাহাড়ে যাবে। অবশ্য যাওয়াই স্বাভাবিক। হাজার টাকার মাল আসবে হয়তো, সে টাকা তো আর রেশমার হাতে দিয়ে দেওয়া যায় না। আগে গিয়ে সে শুধু সংগ্রহের ব্যবস্থা পাকা করে রাখবে।

চেষ্টা করেও ব্যাপারটা খুব সাদা চোখে দেখেনি বাপী। কিন্তু কর্ত্রীর সায় থাকলে সে আর বাধা দেয় কি করে। রেশমাকে আসামে চালান করতে চাওয়ার পিছনে চালিহার নিজস্ব মতলব কিছু আছে একথা তো গায়ত্রী রাইকে খোলাখুলিই বলে দিয়েছিল বাপী। হয়তো বা ভেবেছে, ঝগড়ু আছে সেখানে, মেয়েটা ঠিক থাকলে তার ওপর হামলার কোনো ভয় নেই। আবার এমনও হতে পারে ওই তুখোড় বুদ্ধিমতী মহিলার কাছে এও একটা টোপের মতো। আর সেই কারণেই প্রস্তাব আসামাত্র সায় দিয়েছে। হামলা যদি কিছু হয়ই, আর মেয়েটা যদি রুখে দাঁড়ায় বা ফুঁসে ওঠে, রণজিৎ চাহিলার তাহলে মুখ পুড়বে। জঙ্গলের এইসব মেয়ে, বিশেষ করে রেশমা যে সহজ মেয়ে নয় গায়ত্রী রাই সেটা ভালই জানে। বড়দরের গণ্ডগোল কিছু পাকিয়ে উঠলে চালিহার সঙ্গে মহিলার

কিছু ফয়সলার সুযোগ হয়তো আপনি এগিয়ে আসবে।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাপীর চাপা অস্বস্তি রেশমাকে নিয়েই। তার হাবভাব চাল-চলনের বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। জঙ্গলের কাজ তদারকে বেরুলে ওর সঙ্গে দেখা হয়। আবার বাংলোর দিকের রাস্তায় যখন ঊর্মিলার সঙ্গে বেড়ায়, তখনো দেখা হয়। রেশমা চোখের কোণে তাকায়, ঠোঁটে হাসি টিপ টিপ করে। সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে দু-হাত কোমরে তুলে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বাপী এগোলে বা থামলে দুটো কথা কইবার সাধ। কিন্তু বাপী এগোয়ও না দাঁড়ায়ও না। সোজা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তাতেও মেয়েটার চোখেমুখে কৌতুক ঝরে লক্ষ্য করছে।

বাপী তরফদার এখন ওর শুধু খোদ ওপরওলা নয়, এক কথায় দণ্ডমুণ্ডের মালিক। রেশমাও সেটা খুব ভালো জানে। দেখা হলে এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে তাঁকে সেলাম ঠুকতে বা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াত—তাও অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু এর থেকে ওর সর্ব অঙ্গে ওপরওলার দাক্ষিণ্য যেটুকু আছে তার ওপরেই যেন নির্ভর বেশি। নিজের এই জোরের দিকটা সম্পর্কে সজাগ বলেই বেশি বেপরোয়া। এই মেয়ে যদি সসম্ভ্রমে সেলাম ঠোকে বা পথ ছেড়ে দাঁড়ায় সে-ও যেন কৌতুকের মতোই হবে। যাই হোক, বাপীর ধারণা মেয়েটার চাপা কৌতুক দিনকে দিন বাড়ছে।

...ক'দিন আগের এক বিকেলে ঊর্মিলা বাপীর বাংলোয় এসে হেসে অস্থির।—জঙ্গলে রেশমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

বাপী জবাব দেয়নি। নির্লিপ্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়েই শুধু।

—তোমাকে ক'বার করে ডেকেছিল আর তুমি সাড়া না দিয়ে আর একদিকে চলে গেছ?

...জঙ্গলের সেই সাপ ধরার পোশাকে রেশমাকে দেখেছিল ঠিকই। আঁট জামা পরা এই মেয়েকে দেখলে দুটো চোখ আপনা থেকে অবাধ্য হয় বলেই ডাক শুনেও বাপী সোজা প্রস্থান করেছিল। জিগ্যেস করতে আরো বেশি বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছিল, রেশমাকে বলে দিও আমি ওর ইয়ার্কির পাত্র নই।

ছদ্ম বিস্ময়ে ঊর্মিলার দু চোখ বড় বড়।—রেশমা তো তাহলে ঠিক বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি।

—কি বলেছে?

—ও একটা মস্ত শঙ্খচূড় ধরেছে আজ, সেই আনন্দে ওটা তোমাকে দেখাবার জন্যে ডেকেছিল। ও দুঃখ করছিল, এত বড় ওপরওলা হয়েও জ্যান্ত সাপের মতোই তুমি ওকে ভয় করো—এদিকে তোমার জন্যেই এখন ওর এত আয়-পয় যে ম্যানেজার চালিহা পর্যন্ত এখন ওকে খাতির করে, হেসে কথা কয়। তারপরেই চোখ পাকিয়েছে ঊর্মিলা, নিজের মনে পাপ না থাকলে ওর মতো এতদিনের একটা চেনা-জানা মেয়েকে তোমার এত ভয় কেন মশাই? ও-মেয়ে তো পারলে তোমাকে পুজো করে!

বিরক্ত হয়ে বাপী চায়ের তেষ্টার কথা বলে ওদের বাংলোয় চলে এসেছিল। মেয়েলী রাস্তা ধরে রেশমা যে শয়তানি করেই চালিহার খাতির করা বা হেসে কথা কওয়া ব্যাপারটা বাপীর কানে তুলতে চেয়েছে তাতেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

আবু রব্বানী দাওয়ায় একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে। অদূরে দুলারি দাঁড়িয়ে।

দুজনেই গম্ভীর। মুখ দেখে মনে হয় দুজনের কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। এইমাত্র হারমাকে চলে যেতে দেখেছে বাপী। কাছে আসতেই দুলারি জিগ্যেস করল, হারমাকে দেখলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—কেন আবার কি, তোমার একটু মায়াদয়া নেই? রেশমা পাহাড়ে গেলে ওকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না? সেখানকার জঙ্গলে সাপখোপ নেই?

এমন মুখ আর এই অভিযোগ যে আবুকে আরো উত্তপ্ত করার জন্য বাপীর বুঝতে সময় লাগল না। ওর দিকে ফিরে হেসেই জিগ্যেস করল, জ্বরটর বাধিয়ে বসে আছ নাকি?

এবারে গম্ভীর চালে ঠেস দিয়ে দুলারিই আগভাগে জবাব দিল, বসন্তের বাতাসে রাতদুপুরে ইঁদারায় ঠাণ্ডা জলে চান না করলে গা জুড়ায়? এখন গা গরম, তার থেকে মেজাজ আরো বেশি গরম। হারমার জন্য এত দরদ যে আমাকেই পাঁচ কথা শোনাচ্ছে।

বাপী দাওয়ায় বসল।—কি ব্যাপার?

গোমড়ামুখ করে আবুই ব্যাপার বোঝালো তাকে। জান কয়লা করে ফেললেও রেশমার মতো মেয়ে হারমাকে পাত্তা দেবে না, দোষের মধ্যে ঠেস দিয়ে দুলারিকে এই কথা আবু বলেছিল। তাইতেই দুলারির রাগ, রেশমার নামে কেউ কিছু বললে ও আর বরদাস্ত করতে পারে না। কিন্তু হারমা যে নালিশ করে গেল, উল্টে ওই মেয়ের ওপর দুলারির রাগ হবার কথা।...ম্যানেজার চালিহার সঙ্গে রেশমার এখনকার একটু ভাবসাব আবুও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু দুলারি তা বিশ্বাসই করে না। রেশমার কানে লাগাতে ওই পাজী মেয়ে ফিরে তড়পেছে, নতুন বড় কর্তা তো সাত খুনের আসামীর মতো দেখে তাকে, পুরনো বড় কর্তা যদি হেসে-ডেকে দুটো কথা কয় তো দোষের কি, আনন্দই বা হবে না কেন? পাহাড়ে যাবার মওকা পেয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে চলে গেল, এদিকে হারমা বলল, এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় ওই চালিহা লোক পাঠিয়ে রেশমাকে তার বাংলোয় ডেকে নিয়ে গেছল। পাহাড়ে যেতে হবে বলার জন্যে সন্ধ্যার পর বাংলোয় ডেকে পাঠাবার দরকার কি, আপিসে ডেকে এনে বললেই হয়। অবশ্য হারমা তখন ওর সঙ্গে ছিল, আর আধ ঘণ্টাটাক বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিল। তারপর রেশমার পাহাড়ে যাবার আগের দিন বিকেলে ম্যানেজার চালিহা নিজে ওর জঙ্গলের ডেরায় এসেছে, রেশমা নাকি তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। কম করে ঘণ্টাখানেক পরে কাজের কথা বলে তারপর চলে গেছে। হারমা ততক্ষণ সামনের উঠোনে বসে। নালিশ শুনে দুলারি নাকি উল্টে হারমাকে ধমকেছে, দু'দিনই তুই কাছে ছিলি আর ঘরের দরজাও বন্ধ ছিল না—তোর এভাবে এসে লাগান-ভাঙান দেবার কি হল, কাজের কথা থাকতে পারে না?

কাজ যা-ই থাক, ওই ধূর্ত লোকের সঙ্গে মাখামাখি আবুর একটুও ভালো লাগেনি। হারমার পক্ষ নিয়ে সে কথা বলতে দুলারি শুনিয়েছে, নিজের চরিত্রখানা কি ছিল তাই আগে ভালো করে দেখো, রেশমার মতো মেয়েকে বুঝতে তোমার ঢের দেরি। ফাঁদ যদি পাতেও, বুকে ছুরি বসানোর জন্যে পাতবে জেনে রেখো।

সবটা শোনার পর নিরীহ মুখে বাপী জানান দিল, চালিহা সাহেবও দু'চার দিনের মধ্যে পাহাড়ে যাচ্ছেন...।

—যাচ্ছেন! রাগ আর উত্তেজনায় আবু সামনে ঝুঁকল।

—যেতে তো হবেই। রেশমা যে কাজের ভার নিয়ে গেছে তার টাকা পৌঁছে দিতে হবে না?

—শুনলে? শুনলে দোস্তএর কথা?

মুখ মচকে দুলারি জবাব দিল, দোস্তকেও তোমার মতো রোগে ধরাতে চাও তো এ-সব কথা বেশি করে শোনাও।

রেশমার বিরুদ্ধে কোনো কথাই দুলারির বরদাস্ত হবার নয়।

কিন্তু দুদিন না যেতে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যাপারখানা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। হাজার আড়াই টাকা নিয়ে কর্ত্রীর হুকুমে চালিহার বদলে বাপীকে ছুটতে হল পাহাড়ের বাংলোয়। জরুরী তার পেয়ে রণজিৎ চালিহা বিহারে চলে গেছে। ছ'সাত দিনের আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই।

এ-রকম হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু হাসিই পেয়েছে বাপীর। বেচারার বরাত বড় মন্দ চলেছে দেখা যাচ্ছে।

রেশমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। বাংলোর ফটক দিয়ে বাপীর গাড়ি ঢুকতে দেখল। চালকের আসনে শুধু ওকেই দেখল। নিজের অগোচরে হাত দুটো কোমরে উঠল তার। একজনের বদলে অন্যজনকে দেখে অবাক কতটা ঠাওর করা গেল না। মুখে চাপা খুশির ছটা।

বাগানে মৌসুমী ফুল ছেয়ে আছে। আবার সেই বসন্তকাল। একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রঙ-চঙা ঘাগরা আর জামা-পড়া ওই মেয়ে দাঁড়িয়ে। কোমরে দু-হাত তোলার ভঙ্গিটাও চোখ টানবেই। ভিতরে ভিতরে বাপীর আবার সেই পুরনো অস্বস্তি। ফলে ওপরওলার মুখ ভার। ঠাণ্ডা, গম্ভীর।

গাড়ি থেকে নামার ফাঁকে ঝগড়ু এসে দাঁড়ালো। ওকে দেখে একগাল হাসি। তড়বড় করে বলল, তুমি আসবে বাপীভাই, ভাবিনি—খুব ভালো হল।

বারান্দায় উঠে বাপী একটা চেয়ার টেনে বসল। রেশমা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে শুধু। ঝগড়ুর দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখেই বাপী জানান দিল, মিস্টার চালিহা জরুরী তার পেয়ে বিহার চলে গেলেন, তাই আমি এলাম।

কালো মুখে আর এক প্রস্থ হাসি ছড়িয়ে ঘাড় মাথা নাড়তে নাড়তে ঝগড়ু চায়ের ব্যবস্থায় চলে গেল। ওই একজনের বদলে বাপীভাইকে দেখে সে-যে কত খুশি, মুখে আর সে-কথা বলল না।

সামান্য মাথা নেড়ে বাপী রেশমাকে কাছে ডাকল। কোমর থেকে হাত নামলো রেশমার। ঢিমেতালে এসে দাঁড়াল। বাপী তাকে বসতে বলল না। জিগ্যেস করল, কাজ-কর্মের কদ্দুর?

—হচ্ছে। কয়েকজন মাল মজুত করেছে, টাকা পেলেই দিয়ে দেবে। আর বাকিরা এখনো যোগাড় করছে, আরো পাঁচ-ছ'দিন লাগবে।

—এত সময় লাগবে কেন, তুমি তাড়া দাওনি?

—বেশি তাড়া দেবার কথা আমাকে বলা হয়নি। তোমার ফেরার তাড়া থাকলে

তাড়া দিয়ে দেখতে পারি।

রেশমা সোজা চেয়ে আছে বলেই বাপীর দু-চোখ সামনের বাগানের দিকে। এবারে ওর দিকে না তাকিয়ে পারা গেল না। খুব সহজ কথাটার মধ্যেও যেন অহেতুক মজার ছোঁয়া লেগে আছে। চোখাচোখি হতেই বাপী ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। এই হাসিমাখা চাউনি বাপীর অচেনা নয় খুব। কোথায় দেখেছিল...কোথায় ? যে-চাউনি দেখলেই মনে হয় তার আড়ালে সর্বনাশ লুকিয়ে আছে কিছু। কমলা বনিক নয় মণিদার বউ গৌরী বউদির চোখে এই রকম দেখেছিল কিছু। গৌরী বউদি সাত বছরের বড় ওর থেকে। রেশমা বছর দুইয়ের। কিন্তু দেখলে রেশমাকে বড় কেউ বলবে না। আরো তফাৎ কিছু আছে। গৌরী বউদি খুব অপ্রত্যাশিত পুরুষ দেখেছিল। রেশমার চাউনি আদৌ অপ্রত্যাশিত কাউকে দেখার মতো নয়। ও-যেন কাউকে নাগালের মধ্যে পেয়েই বসে আছে।

বাইরে বাপী আরো ঠাণ্ডা। আরো গম্ভীর। উঠল। ঘরে চলে গেল। নিজেই জানে কপাল ঘেমে উঠেছে। ওপরওলার ষড়যন্ত্রটা যে রণজিৎ চালিহাকে নিয়ে নয়—ওকে নিয়ে।

এবারে আর রেশমার সঙ্গে কোথাও বেরুলো না। ওর কাছ থেকে পার্টিদের ঠিকানা নিয়ে নিজেই বেরুলো। ওকে শুধু হুকুম করল, যোগাড়যন্ত্র তাড়াতাড়ি হয় কিনা দেখো—

একে একে চারদিন কেটে গেল। আজ পাঁচদিন। বাপী আশা করছে আজকের মধ্যে কাজ চুকিয়ে কাল সকালে বেরিয়ে পড়তে পারবে। একলাই যাবে। পরে ভ্যান এসে মালসহ রেশমাকে নিয়ে যাবে। ওর আচরণের ফলেই রেশমাও এবারে অনেকটা সমঝে চলতে বাধ্য হয়েছে বলে বিশ্বাস। সমস্ত দিন বা রাতের মধ্যে একবারও দেখা হয়নি এমন দিনও গেছে। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি একলা বসে খেয়েছে। ঝগড়ুকে বলেছে খাবার ঘরে দিয়ে যেতে। বাপীভাইয়ের মেজাজ দেখে এবার ঝগড়ুও হয়তো অবাক একটু। দুদিন মাত্র রেশমাকে ডেকে কাজের কথা বলেছে বা নির্দেশ দিয়েছে। রেশমাও অনুগত বাধ্য মেয়ের মতো কথার জবাব দিয়েছে বা শুনেছে। কোনো অছিলায় কাছে ঘেঁষতে চেষ্টা করেনি। তবু বাপীর ভেতরটা অস্বস্তিতে বোঝাই একেবারে।

সেদিন আর দুপুরের পর বাপীর হাতে কাজ নেই কিছু। রেশমা সকাল সকাল খেয়েদেয়ে তার কাজে বেরিয়েছে। বেলা থাকতে বাপী পায়ে হেঁটেই বাংলো ছেড়ে বেরুলো। আগের তুলনায় অনেক আত্মস্থ। পাহাড় থেকেই নেমে জঙ্গলে ঢুকল। তারপর পাহাড়ের ধার ধরে আপন মনে এগিয়ে চলল। পাহাড়-ঘেঁষা জঙ্গলের একান্ত নির্জন পথ ধরে মাইল দুই হাঁটার পর ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরে বসল।

বিকেল চারটে তখন। এত নিরিবিলি বলেই ভালো লাগছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। এই নির্জনতার এক ধরনের ভাষা আছে যা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। আগের বছর যেমন দেখে গেছল তেমনি। বনের সর্বত্র সেই রূপের ঢেউ। সেই রসের ঢেউ। অশোক পলাশের সেই রঙের বাহার। শিমূল কৃষ্ণচূড়ার মাথা তেমনি লালে লাল। বাপী তন্ময় হয়ে দেখছে।

হঠাৎ বিষম চমক। কেউ ডাকেনি, কিন্তু নিজে থেকে কি করে টের পেল জানে না। ওর বাঁ পাথরটার ঠিক পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে।

রেশমা। পরনে ঘাগরা। গায়ে রঙচঙা জামা। দু-হাত কোমরে। বাপীকে যেন

দেখেইনি। তার মাথার ওপর দিয়ে সামনের প্রকৃতি দেখছে সেও।

—তুমি এখানে কেন? হঠাৎ কঠিন কর্কশ গলার স্বর বাপীর।

রেশমার দু'চোখ যেন দূরের থেকে কাছে এলো। তার মুখের ওপর স্থির হল। রাগত মুখ রাগত চাউনি তারও।—আমার সঙ্গে আজকাল তুমি এরকম ব্যবহার করছ কেন?

—তুমি যাবে এখান থেকে?

—কেন যাব? জঙ্গল তোমার?

হঠাৎ বাপী অত্যন্ত শান্ত। সংযত। গলার স্বর তেমনি কঠিন।—দেখো রেশমা, তুমি যার কাজ করছ আমিও তার কাজ করছি। এর মধ্যে তুমি যদি আমাকে ওই চালিহার মতো একজন কেউ ভেবে থাকো তো খুব ভুল হবে।

কৌতুক চাপার তাড়নায় রেশমা আরো গম্ভীর। সাদাসাপটা জবাব দিল, চালিহার মতো ভাবলে তোমার ধারে-কাছে কে ঘেঁষত?

এবারে বেশ জোরেই ধমকে উঠল বাপী।—তুমি যাবে এখান থেকে?

কোমর থেকে দু-হাত খসল। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে সামনের দিকে তাকালো একবার। সঙ্গে সঙ্গে গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ। কিছু বোঝার আগেই দু-হাত বাড়িয়ে আচমকা প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে বাপীকে একেবারে নিজের গায়ের ওপর টেনে আনল। তারপরেই বলে উঠল, বনমায়ার সেই গুণ্ডা হাতি!

পলকে সামনের দিকে চোখ পড়তে বাপী বিমূঢ় হঠাৎ। রেশমা এক হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে আছে, হুঁশ নেই। দেড়শ গজ দূরে একটা বিরাট হাতি। দুটো বিশাল দাঁত ধনুকের মতো বেঁকে শূন্যে উঠে গেছে। ডান দিকের গলার কাছে প্রকাণ্ড লালচে ক্ষতর মতো। হাতিটাও বোধ হয় সেই মুহূর্তেই দেখেছে ওদের। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের মতো শরীরটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দ্রুত ধাওয়া করল এদিকে।

দুই

শক্ত মুঠোয় বাপীর জামাটা ধরে আবার একটা হ্যাঁচকা টান দিল রেশমা—ছোটো শিগ্‌গীর।

কিন্তু বুনো হাতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা যে সম্ভব নয় সেই মুহূর্তে অন্তত বাপীর মাথায় এলো না। দিশেহারার মতো সামনের দিকে ছুটতেই জামায় আবার জোরে টান পড়ল। জামাটা ফ্যাঁস করে ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রেশমা জামা ছেড়ে তার হাত ধরল। ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, আঃ, পাহাড়ের দিকে ছোটো।

পঁচিশ-তিরিশ গজের মধ্যে পাহাড়। রেশমা বাপীর হাত ছাড়েনি। ওরা পাহাড়ের নাগাল পাবার ফাঁকে ওই যম পঞ্চাশ-ষাঠ গজের মধ্যে এসে গেছে।

—ওঠো! শিগগীর ওঠো! ও-দিক দিয়ে নয়, এই ছোট পাহাড়গুলো টপকে ওঠো। রেশমা ওকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেও দু'হাতে আর দু'পায়ে তর তর করে উঠে যেতে লাগল। কিন্তু বাপী তাও পিছিয়ে পড়ছে দেখেই আবার দাঁড়িয়ে গিয়ে ওকে হাত ধরে টেনে পাথর টপকাতে সাহায্য করল। বুনো মরদ হাতি পাহাড়ের গায়ে এসে গেছে ততক্ষণে। ওদের পাহাড়ে উঠতে দেখেছে। বিশাল মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে ওটা পাহাড়ে ওঠার জায়গা খুঁজছে। একটা পাথরের আড়ালে বাপীকে এক হাতে জাপটে ধরে

বসে ওটার মতি-গতি লক্ষ্য করল রেশমা। দেখছে বাপীও। কি বলতে যেতে রেশমা মুখে হাত চাপা দিল। তারপর এক-হাতে তেমনি ধরে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে আবার অন্য উঁচু পাথরের দিকে এগিয়ে গেল। এইভাবে আরো খানিক এগিয়ে যেতে পারলে পর পর কতগুলো পাহাড়ী ঝোপের আড়াল পাবে।

আবার একটা পাথরের পিছনে এসে থামল ওরা। কানে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে রেশমা বলল, খানিকটা ওঠার মতো প্লেন পাথর পেলে ও ঠিক শুঁড় দিয়ে ছোট পাথর ঠেলে ঠেলে এ দিকে উঠে আসবে। বোসো, দেখে নিই কি করছে—

সভয়ে দেখছে বাপীও। শুঁড় তুলে শিকার ঠিক কোন্ দিকে হদিস পেতে চেষ্টা করছে। দুটো অতিকায় দাঁত ধনুকের মতো বেঁকে আছে। হাঁ করে শুঁড় উঁচনোর দরুন লালা-ঝরা লাল মুখ-গহ্বর দেখেও গা শিরশির করছে। ঘাড় আর কাঁধ ঘেঁষা পেল্লায় দগদগে ক্ষতটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন।...বনমায়ার সেই বুনো মরদ হাতিটাই যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু'পেয়ে মানুষ বনমায়ার জীবন কেড়েছে। তাই আজ মানুষই চরম শত্রু ওর।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে হাতিটা শরীর ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে এগোতে রেশমা আবার একটা হ্যাঁচকা টান দিল।—ওই ওপরের ঝোপের দিকে, শিগগীর।

ছোট বড খণ্ড খণ্ড পাথর টপকে আরো ওপরের ঝোপের আড়ালে চলে এলো তারা। একটু বাদে বাপী সত্রাশে দেখলে, দূরে বারো চৌদ্দ গজের মতো পাহাড় বেয়ে উঠে শুঁড় দিয়ে পাথর ঠেলে ঠেলে হাতিটা এ-দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা যেখানে আছে শুঁড় দিয়েও নাগাল পাবে না হয়তো, কিন্তু অতটা যখন উঠেছে আরো উঠতে পারবে কিনা কে জানে। ওটাকে আসতে দেখেই বাপীর গায়ের রক্ত হিম।

বড় পাথরের দিকে ঘেঁষল না রেশমা, আবার ওকে টেনে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খণ্ড খণ্ড পাথরের আড়ালে আড়ালে আরো উঁচু উঁচু ঝোপের পিছনে চলে আসতে লাগল। এক হাতে পিঠ বেড়িয়ে বাপীকে জাপটে ধরে আছে। মহামূল্যবান একটি প্রাণ যেন ওরই হাতের মুঠোয়। ঝোপের আড়ালে বসে আবার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, উল্টো দিকের হাওয়ায় ও আমাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে...ওর পিছনে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওটা নড়বে না, হয়তো বিকেল ছেড়ে সমস্ত রাত আমাদের আগলে রাখবে।

হাতিটা এখন বেশ নিচে অবশ্য। ওটার দিকে চোখ রেখে ঝোপ আর পাথরের আড়ালে আড়ালে ফাঁক বুঝে বুঝে তারা ওটার পিছনের দিকে এগোতে লাগল। এই করে অনেকটা পিছনে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওটা সরে না গেলে তো আর পাহাড় থেকে নামা যাবে না।

হাতিটা যে রাস্তা ধরে ওপরে উঠেছিল সেদিকে ফিরে চলল এক সময়। ফলে ওদেরও সন্তর্পণে এগোতে হচ্ছে নইলে গায়ের গন্ধ পাবে।

নামার আগে ওই বুনো হাতি হঠাৎ থেমে গিয়ে শরীরের সমস্ত রাগ গলা দিয়ে বার করতে লাগল। তার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে পাহাড়টা সুদ্ধু কাঁপছে। উঁচু ঝোপের আড়ালে রেশমা বাপীকে এক হাতে বুকের আর নিজের পাঁজরের সঙ্গে জাপটে ধরে বসে আছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাপীর আর কোনো দিকে হুঁশ নেই। সব ক'টা স্নায়ু টান টান, লক্ষ্য

নিচের ওই দানবটার দিকে।

হুঙ্কার থামিয়ে বুনো হাতিটা সমতল পাহাড় ধরে নামতে লাগল। নামার পর আরো খানিক দাপাদাপি করে জঙ্গলের যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলল।

একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটতে লাগল বাপীর। মুখ ফেরাতেই রেশমার গালের সঙ্গে গাল ঠেকল। রেশমা তেমনি এক হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছে তাকে। নিঃশব্দে হাসছে। ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সারি চিক চিক করছে। চোখের পলকে সর্বাঙ্গে যেন আগুনের ছেঁকা লাগল বাপীর। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। কোন রকম বাধা না দিয়ে রেশমাও এবারে ছেড়ে দিল। কিন্তু চাপা হাসির তরঙ্গ নিঃসব্দে ওর দেহ-তট ভেঙে উপচে উঠছে। বাপী আর তাকাতেও পারছে না। শুধু নিজের জামা নয়, রেশমারও জামার জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার।

মাথাটা প্রচণ্ড ঝিম ঝিম করছে বাপীর। তবু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে চাপা ধমকের সুরে রেশমা বলল, এখুনি নামতে যাচ্ছ নাকি ? পাগলা হাতির থেকে এখন আমাকে বেশি ভয় তোমার ?

বাপী দাঁড়িয়ে রইল স্থানুর মতো। শরীরের রক্তকণাগুলো জ্বলছে। চারদিক তাকিয়ে দেখল। বিচার-বিবেচনা যতো বাড়ছে এখন, ভিতরে ততো অস্বস্তি। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার বেশ খানিকটা নিচে পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড ছোট পাথর। তুখোড় বুদ্ধিমতীর মতোই এই ছোট পাথরগুলোর এ-ধারে ওকে নিয়ে এসেছে রেশমা। কোনো হাতির পক্ষে এই ছোট পাথরের জঙ্গল ঠেলে উঠে আসা সম্ভবই নয়, বাপীর এতক্ষণ সেটা মনে হয়নি। কিন্তু তার পরেও রেশমা ওকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনি জাপটে ধরে বসেছিল। সবটাই মনে পড়ছে বাপীর। নিজের প্রাণ তুচ্ছ, গোড়া থেকে ওকে বাঁচানোর আকুতিটুকুই সব রেশমার।

বাঁচাতে পেরেছে। পাথুরে মাটি ছেড়ে রেশমাও উঠে দাঁড়াল। চোখেমুখে হাসি চিকচিক করছে তখনো। কিন্তু বাপী কি এত দুর্বল, এত অসহায়। ওর দিকে চোখ পড়তে এ কি সর্বনাশের ছায়া দেখছে। স্নায়ুগুলো এত কাঁপছে কেন ঠক ঠক করে ?

রেশমা বলল, কিছুটা নেমে পাহাড় ধরেই যতটা সম্ভব এগনো যাক, একেবারে নিচে নামা ঠিক হবে না।

অর্ধেকটা নেমে পাহাড়ের পাথর ভেঙে ভেঙে পাশাপাশি চলল তারা। কিন্তু এভাবে চলা কষ্টকর। রেশমা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়।—হাত ধরব ?

—দরকার নেই। রেশমার এই দুটো কথাও কানে গরম তাপ ছড়াচ্ছে।

—প্রাণে বাঁচালাম, এখন তো আমাকে দূরে ঠেলবেই। না তাকিয়েও বাপী বুঝতে পারছে ওর চোখেমুখে সেই সর্বনাশা হাসি ঠিকরে পড়ছে।

...অথচ রেশমা না থাকলে প্রাণে বাঁচা যে সম্ভব ছিল না এ এক নির্মম সত্য। বুনো পাগল হাতিটা এত নিঃশব্দে আসছিল যে বাপীর চোখেই পড়ে নি। আর এক মিনিট দেরি হলেও রক্ষা পেত না। তাছাড়া ওটাকে দেখার পরেও দিশেহারার মতো জঙ্গল ধরেই ছুটতে যাচ্ছিল। রেশমা ওকে পাহাড়ে টেনে না তুললে এই জীবনের খেলা শেষ হয়ে যেত। জঙ্গলের মধ্যে ছুটে হাতির সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা যে হাস্যকর এ বাপীও

জানে। অথচ সংকটের সময় এটুকুও মাথায় আসেনি।

দিনের আলোয় টান ধরেছে। দেখতে দেখতে এখন অন্ধকার ধেয়ে আসবে। নিচে নেমেও তারা পাহাড় ঘেঁষেই দ্রুত চলতে লাগল। আরো মিনিট বিশ-পঁচিশ বাদে সব অন্ধকার। দু'জনে পাশাপাশি চলেছে। এখন রেশমার মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। তাইতেই স্বস্তি একটু।

এতটা পথ দুজনেরই মুখ সেলাই। পাহাড়ের বাংলোয় উঠে আসতে রাত। বাইরের বারান্দায় বড় হ্যাস্যাক জ্বলছে। বাপীর মনে হল ওটা না থাকলে ভালো হত। দূর থেকে দেখল ঝগড়ু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রাত হতে দেখে ওদের অপেক্ষাতেই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হয়তো।

বারান্দায় উঠে আসতে দুজনের মূর্তি দেখে ঝগড়ুর চোখ কপালে। এত আলোয় রেশমার সমস্ত মুখ লালচে দেখাচ্ছে। চাপা হাসি ঠিকরোচ্ছে। কিন্তু ঝগড়ুর কিছু তলিয়ে ভাবার ফুরসৎ নেই!—কি হয়েছে বাপীভাই? কোনো বিপদ-টিপদ নাকি?

—ওর কাছে শোনো। আমি খুব ক্লান্ত। এক পেয়ালা স্ট্রং কফি নিয়ে এসো চট করে।

দ্রুত নিজের ঘরে চলে এলো। বুকের তলায় একটা ঠক ঠক শব্দ হয়েই চলেছে। মুখ হাত ধোবার ধৈর্যও নেই। গায়ের ছেঁড়া জামাটা খুলে গেঞ্জি গায়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। একটা চেনা যন্ত্রণার আগুন ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে।

একটু বাদে ঝগড়ু কফি রেখে গেল। ভয়ার্ত বিহ্বল মুখ তারও। বিপদের কথা শুনতে শুনতেই কফি নিয়ে চলে এসেছে বোধ হয়। পেয়ালা রেখেই আবার ছুটল।

রাত নটা নাগাদ চুপচাপ একলাই খেয়ে নিল বাপী। ভিতরে ঝগড়ুর ঘরে রেশমার খুশি-ঝরা গলা শোনা যাচ্ছে। তার ঘরের সামনেটা অন্ধকার। বাপী একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে না দেখে পারল না। ঝগড়ু একটা নতুন দামী বোতল নিয়ে বসেছে। বাপী দেয়নি যখন ওটা নিশ্চয় রেশমাই দিয়েছে তাকে। পরনে তার একটা চকচকে ঘাগরা। গায়ে অন্য জামা। চান সেরে পিঠে ভিজে চুল ছড়িয়ে ঝগড়ুর মুখোমুখি মেঝেতে বসে আছে। হাঁটুর একটু ওপর থেকে ধপধপে পা দুটো দেখা যাচ্ছে। ঝগড়ুকে বিপদের গল্প বিস্তার করে শোনাচ্ছে।

বাপী সরে এলো বটে, কিন্তু স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা অবাধ্য অবুঝ দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। সেই এক রাতের কথা মনে পড়তে বুকের ওপর আসা মুগুরের ঘা পড়েছে। ...যে রাতে কমলা বনিক নিজের শোবার ঘরে বসে আধা-বুড়ো রতন বনিককে তার খুশিমত মদ খেতে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল বাপী সেই সন্ধ্যায় সেটা তক্ষুনি আঁচ করছিল।

আজ সামনে বসে ঝগড়ুকে দামী মদ খাওয়াচ্ছে রেশমা।

নিজের ঘরে এসে বাপী দরজা দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর ছিটকিনিও লাগিয়ে দিল। শরীরটা কাঁপছে। আলো নিভিয়ে সটান বিছানায়। কিন্তু তার পরেও একটা অমোঘ সর্বনাশ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল...কলকাতায় যেমন হয়েছিল। সমস্ত দিন নিদারুণ আক্রোশে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করার পরেও রাতে একটা তিমির তৃষ্ণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছে আর তারপর একটু একটু করে ওর ওপর দখল নিয়েছে—এই

রাতের অনুভূতিটাও সেই রকম। অবাধ্য তাড়নায় এখনই কেউ যেন বাপীকে ওই বদ্ধ দরজার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দরজা খুলে লোলুপ প্রতীক্ষায় বসে থাকতে বলছে। ও নড়ছে না বলেই ওই চেনা যন্ত্রণাটা ওর হাড় পাঁজর দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে।

রাত বাড়ছে। যন্ত্রণাটাও।

বাপী বিছানা ছেড়ে নামল। ওই দরজা খুললে কেউ আসুক না-আসুক ওকেই যে সামনের অন্ধকার হলঘরের ভিতর দিয়ে একজনের দরজার দিকে এগোতে হবে এটা তার থেকে ভালো কেউ জানে না। কলকাতার টালি এলাকার সেই এক খুপরি ঘরে বাপী তরফদার দেউলে হয়েছিল, সর্বস্বান্ত হয়েছিল। কিন্তু তখন বাপীর কোনো হাত ছিল না।

কিন্তু আজ? এখন?

বাপী মেঝেতে বসে পড়ল। কাঠের মেঝেতে খসখসে গালচে পাতা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সে দেউলে হবে না। জীবনে শুধু একটি মেয়েই তার লক্ষ্য। আর কেউ না—কেউ না! আবার দেউলে হলে আর কোনদিন তার মুখোমুখি হওয়া যাবে না। তাই এই যন্ত্রণার শেষ না করলেই না। এই লোভের টুঁটি টিপে না ধরলেই না।

খসখসে গালচেয় নাক মুখ কপাল ঘষে ঘষে ছাল তুলে ফেলার উপক্রম করল। চামড়া যত জ্বলছে, যন্ত্রণা তত কমছে। মুঠো করা দুটো হাতই একে একে দাঁতে তুলে চামড়া কেটে ফেলল।

...হ্যাঁ, এইবার যন্ত্রণা আরো কমছে।

গালচের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল খানিক। তার পরেই স্নায়ুগুলো সব ধনুকের ছিলে ছেঁড়ার মতো একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। বন্ধ দরজার ও-ধারে মৃদু ঘা পড়ল। কেউ দরজা ঠেলছে। খুলতে না পেরে ওই শব্দ করছে।

অন্ধকারে বাপী নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। নিঃশ্বাসেও। উঠল। দরজার দিকে এগলো। ছিটকিনি নামালো। দরজা খুলল।

বারান্দার হ্যাসাক অনেক আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। আড় হয়ে একপশলা জ্যোৎস্না রেশমার মুখের ওপর পড়েছে। কোমরে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা খুলতেই ঘরে এলো। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাত দুটো পিছনে নিয়ে নিজেই দরজা দুটো বন্ধ করল। ঘর অন্ধকার আবার।

বাপী নিঃশব্দে সুইচের দিকে এগিয়েছে। তারপরেই জোরালো আলোর ধাক্কা।

রেশমার ঠোঁটে হাসি। মুখে হাসি। চোখে হাসি। কিন্তু তার পরেই সত্যিকারের বিস্ময়। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, এ কি। নাক মুখ কপালের এ-রকম হাল হল কখন? পাহাড়ে? আগে তো লক্ষ্য করিনি...ওষুধ-টষুধ লাগিয়েছ কিছু?

বাপী চেয়ে আছে। এই রাতটা যেন এই মেয়ের দখলে। মৃত্যুর থাবা থেকে যে পুরুষকে ছিনিয়ে এনেছে, এই রাতে তার ওপর দখল বরবাদ করার হিম্মতও যেন কারো নেই।...নাক মুখ কপালের এই হাল কেন রেশমা কি তা বুঝতে পেরেছে? ঠোঁটে মুখে চোখে আবার সেই হাসি। দেখছে সে-ও।

—ও কি! অত চোখ লাল করছ কেন?

—এত রাতে তুমি এই ঘরে কেন?

জবাবে রেশমা কাছে এগিয়ে এলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। তারপর চোখের আর ঠোঁটের নিঃশব্দ হাসির জালে ওর মুখটা ভালো করে আটকে নিল।—অত ধকলের পর এত রাত পর্যন্ত তুমিই বা জেগে বসে আছ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে আরো এগিয়ে এলো। একেবারে আধ-হাতের মধ্যে। বাপীর চোখে মুখে একঝলক তপ্ত নিঃশ্বাস এসে লাগল। হাত দুটো আবার কোমরে উঠে এলো রেশমার। গলার স্বরেও হাসি ঠিকরলো এবার।—এলাম তো এলাম, তোমার অত ঘাবড়ানোর কি আছে? তুমি কি ভেবেছ মওকা বুঝে এরপর আমি তোমার ঘর করতে চাইব?

—তুমি যাবে এখন এখান থেকে?

—যাব বলে এসেছি?

রেশমা বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে এবার। কোমরের দু'হাত ওর কাঁধের ওপর দিয়ে গলার দিকে এগোচ্ছে। বাপী জানে আর এক মুহূর্ত দেরি হলে ওই দুটো হাত এবার অব্যর্থ রসাতলের গহ্বরে টেনে নিয়ে যাবে তাকে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে চার হাত দূরে কাঠের গালচের ওপর ছিটকে পড়ল রেশমা। পুরু গালচের ওপর দিয়েই মাথার পিছনটা জোরে ঠোক্কর খেল। প্রচণ্ড ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে যে-ভাবে পড়ল তার আঘাতও কম নয়। কিন্তু বাপীর মাথায় খুন চেপেছে। ওর পাশ কাটিয়ে চোখের পলকে ভেজানো দরজা দুটো খুলে ফেলল। তারপর সেই অবস্থাতেই দু'হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে নারীদেহ দরজার বাইরে এনে ফেলল। আবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা দুটো বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিল।

হাঁপাচ্ছে। বুকের তলায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। কাঁচের জাগ থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেল। আলো নিভিয়ে বিছানায় এসে বসল।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটার পর ঝগড়ু কড়া নাড়তে বাপী দরজা খুলল।

ঝগড়ু বলল, তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছ দেখে এতক্ষণ ডাকিনি। কিন্তু কি ব্যাপার বলো তো বাপীভাই, রেশমাকে কি তুমি খুব সক্কালে উঠে হেঁটেই বানারজুলিতে চলে যেতে বলেছ নাকি?

বাপী থমকালো।—কেন?

—আমি তো বেশ ভোরে উঠেছি, কিন্তু ওকে কোথাও দেখছি না। তারপর ওর ঘরে গিয়ে দেখি জামা-টামা বা তোরঙ্গটাও নেই। সকালে যাবে কাল রাতেও তো আমাকে বলেনি!

বিড় বিড় করে বাপী বলল, না, আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।

স্নেহ-মেশানো বিরক্তি ঝগড়ুর।—দেখো তো, বলা নেই কওয়া নেই এ-ভাবে কেউ চলে যায়! যেমন বুদ্ধি তেমন সাহস মেয়েটার, কাল তুমি ওর জন্যেই বড় বাঁচা বেঁচে গেছ বাপীভাই—ভাঙা পাথর বেয়ে পাহাড়ে উঠে না গেলে আর রক্ষা ছিল না—কিন্তু এ-দিকে মর্জি দেখো মেয়ের, সকালে উঠেই হাওয়া!

...না, বাপী কিচ্ছু ভাববে না। কিচ্ছু চিন্তা করবে না। যা হবার তাই হয়েছে। এর ওপর বাপীর কোনো হাত ছিল না।

সকালে উঠে নিজেই বানারজুলি চলে যাবে ঠিক করেছিল। কিন্তু রেশমা চলে গেছে শুনে তার আর যাবার তাড়া নেই। ভালোই হয়েছে। একটু সময় দরকার। সহজ হবার মতো একটু অবকাশ দরকার। সকাল দুপুর বিকেল এক-রকম শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিল। আয়নায় মুখ দেখে মাঝে মাঝে। নাক মুখ কপালে এখনো ছাল ওঠা লালচে দাগ। ঊর্মিলার প্রসাধনসামগ্রী এখানেও তার ঘরে মজুত। ঝগড়ুর অলক্ষ্যে ক্রিমের কৌটোটা এনে সকাল থেকে অনেকবার ঘষেছে।

...অমোঘ রসাতলের গহ্বর থেকে বাপী নিজেকে টেনে তুলেছে। সর্বক্ষণ তবু নিরানন্দে ভেতর ছেয়ে আছে। লোভের জাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিজেকে উদ্ধার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৌরুষের অস্তিত্ব নেই কোথাও।...এরপরেও ওই মেয়ের কোন রকম ক্ষতি করবে না বাপী। ক্ষতি করার শক্তিও নেই। কিন্তু রেশমা এরপর কি করবে? না, বাপী ভাববে না। তার ভাবনা ধরে দুনিয়ায় কিছুই ঘটছে না।

গাড়িতে সব মাল তুলে পরদিন সকালে আটটার মধ্যে বানারজুলি ফিরল। এই চালানের সবটাই রণজিৎ চালিহার অর্ডারের মাল। এগুলো কোথায় যাবে বাপী জানে না। চালিহা বাইরে থেকে ফিরেছে কিনা তাও জানা নেই। গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা তার বাংলোতেই এলো।

গাড়ি থেকে নামার আগেই বাপীর চিন্তার জগৎ ওলট-পালট আবার।

চালিহার বাংলোর বারান্দার একটা চেয়ারে বসে আছে রেশমা। একা। উস্কোখুস্কো লালচে চুল। ঢিলেঢালা বেশবাস।

বাপীকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হাত দুটো আপনা থেকেই কোমরে উঠে এলো। বাপী থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। রেশমা চেয়ে আছে। সাপ ধরা মেয়ের দুটো চোখ সাপের মতোই জ্বলছে ধক-ধক করে।

একটু বাদে ঘুরে শ্লথ পায়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে রণজিৎ চালিহা বেরিয়ে এলো। চকচকে লুঙ্গির ওপর গায়ে সিল্কের হাওয়াই সার্ট। ফোলা ফোলা লালচে মুখে জলের দাগ। এইমাত্র চোখেমুখে জল দিয়ে মুছে এসেছে বোঝা যায়। রাতে মদের মাত্রা ঠিক ছিল না বলে হয়তো বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিল।

কিন্তু ঠেলে তুলল কে? অনায়াসে অন্দরে ঢুকে রেশমা চাকরটাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে? বাপী জানে না। কিন্তু বুকের ভিতরে অস্বস্তি জমা হচ্ছে আবার।

—হ্যালো—হ্যালো! গুড মর্নিং। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, উঠে এসো।

বাপী পায়ে পায়ে বাংলোয় উঠল। অন্তরঙ্গ সম্ভাষণের কোনো জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করল, গাড়ির মাল আপনার এখানেই তোলা হবে তো?

—হ্যাঁ, বোসো। অর্জুন!

ভিতর থেকে তার অসমীয়া কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড বেরিয়ে আসতে তাকে গাড়ির মালের বাক্স কটা ভিতরে তুলতে হুকুম করল। তারপর হৃষ্টবদনে বাপীর দিকে ফিরল।...চা খাবে?

না, থ্যাংকস; আমি এক্ষুনি ফিরব।

বাপীর অবাক লাগছে, রেশমা ওর সামনে বাইরে আসতে পারছে না বলে এই

লোকের অন্দরমহলে সেঁধিয়ে আছে?

চালিহার মুখে হাসি চুঁয়ে পড়ছে, চাউনিও ছুরির ফলার মতো হাসিমাখা। বলল, তোমার জিম্মায় মাল ফেলে চলে এলো দেখে রেশমাকে বকছিলাম—তা ব্যাপারখানা কি হে, সব ফেলে-টেলে এত পথ হেঁটেই চলে এলো—আর ওর হাবভাবও অন্যরকম দেখছি—কি হল হঠাৎ?

বাপী ঠাণ্ডা জবাব দিল, কি হয়েছে জানি না, তবে ওকে বলে দেবেন দায়িত্ব ফেলে এভাবে চলে এলে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হবে।

রণজিৎ চালিহা হাসছে। মাথা নেড়ে সায় দিল।—ও ভিতরেই আছে, ডাকব?

পাল্টা প্রশ্ন ঠোঁটের ডগায় প্রায় এসে গেছল বাপীর। বলতে যাচ্ছিল, রেশমা এই বাংলোর ভিতরে কেন? বলল না। জবাব দিল, দরকার নেই।

মালের বাক্স কটা নামানো হয়েছে। বাপী উঠে দাঁড়াল, চলি—

গাড়িতে স্টার্ট দেবার ফাঁকে চলিহার চোখে চোখ পড়ল একবার। অন্তরঙ্গ হাসিমুখে চালিহা হাত নেড়ে বিদায় নিল। কিন্তু এই চাউনি আর ওই হাসি দেখে বাপীর কেবল মনে হল, লোকটার যেন কোনো ক্রূর অভিলাষ সফল হয়েছে বা হতে চলেছে।

গাড়ি নিয়ে বেরুনোর পনের সেকেণ্ডের মধ্যে বাপীর দু চোখ আবার হোঁচট খেল। রাস্তার ধারে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রেশমার সাপ ধরার সঙ্গী হারমা। ওই বাংলোর দিকে চোখ। বাপীকেও দেখল। কলের মতো একটা হাত কপালে উঠল, বাপীর গাড়ি বেরিয়ে গেল। মুখ দেখে মনে হল, রেশমা ওই বাংলোয় সেটা ও জানে।

যার কথা ভাবছিল বাড়ির কাছাকাছি আসতে তার সঙ্গেই দেখা। আবু রব্বানী। ভেতর-জোড়া অস্বস্তি বাপীর। তাই থেকে থেকে আবুর কথা মনে হয়েছে, রেশমা ফিরে এসে ওদের কিছু বলেছে কিনা বা কতটা বলেছে জানার তাগিদ। রেশমাকে চালিহার বাংলোয় দেখার পর তাগিদটা আরো বেশি বলেই জোর করে ঘরমুখো হয়েছিল। রেশমা যদি ওদের কিছু না বলে থাকে তো বাপী কি বলবে?

উল্টো দিক থেকে আবু হনহন করে হেঁটে আসছিল। আর এত বিমনা ছিল যে বাপী মুখোমুখি ব্রেক কষতে তবে হুঁশ হল। হাসতে চেষ্টা করে বাপী বলল, ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়বে যে।...কোথায়?

—তোমার ওখানেই গেছলাম, না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম।...তুমি এই ফিরলে?

শুকনো গম্ভীর মুখ দেখে বাপীর খটকা লাগল একটু। সাত দিন বাদে দেখা, কিন্তু এই মুখে হাসি নেই, উচ্ছ্বাস নেই। বাপী জবাব দিল, একটু আগে ফিরেছি, কিছু মাল ছিল, চালিহার বাংলোয় নামিয়ে দিয়ে এলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আবু উদগ্রীব।—সেখানে রেশমাকে দেখলে?

গাড়িটা রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে বাপী স্টার্ট বন্ধ করে নেমে এলো। কিছু ঘটেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কি ঘটেছে না জানা পর্যন্ত স্বস্তিও নেই। আবু কাছে এসে দাঁড়াতে বলল, দেখলাম। রেশমা ওখানে কেন?

আরো [illegible] করে আবু জবাব দিল, ও কাল সন্ধ্যা থেকেই ওখানে—রাতেও ওখানেই ছিল।

শোনামাত্র বাপীর স্নায়ুগুলো সজাগ, তীক্ষ্ণ। মুখে কথা নেই।

—হঠাৎ কি হল বলো দেখি বাপীভাই, কিছু ভেবে না পেয়ে আমি তোমার কাছে ছুটেছিলাম।

—তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—না। এতদিন বাদে পাহাড় থেকে ফিরে দুলারির কাছে এলো না। এমন তো কখনো হয় না। আজ সকালে হারমা এসে খবর দিল, রেশমা কাল সকালে হেঁটে পাহাড় থেকে ফিরেছে। সে নাকি ভয়ঙ্কর মূর্তি। খানিক বাদে ম্যানেজারের বাংলোয় চলে গেছে। অনেক দূর থেকে হারমা নিজের চোখে ওকে ওখানে যেতে দেখেছে। আবার সন্ধ্যার পর সেজে-গুজে হারমা ওকে সেই বাংলোতেই যেতে দেখেছে। রাতে আর ঘরে ফেরেইনি।

নির্লিপ্ত মুখে বাপী জানান দিল, হারমা এখনো বাংলোর কাছাকাছি একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

শুনে আরো দুর্ভাবনা আবুর। বাপী শুনল, ধামন ওঝার ছেলে ও, জাতব্যবসা ছেড়ে জোয়ান ছেলে এই একটা মেয়েতে মজে আছে বলে বাপ ওকে ভিটে থেকে তাড়িয়েছে। ভাবগতিক যেমন দেখছে, এরপর ওই হারমাই না মেরে দেয় মেয়েটাকে। রাগের থেকে আবার দুর্ভাবনা বেশি।—রেশমা হঠাৎ এরকম করছে কেন বাপীভাই ?

—জানি না। দেখা হলে জিগ্যেস কোরো।...আর বোলো আমার কোনো রাগ নেই ওর ওপর। এই জীবনটার জন্য বরাবর আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

আবু আরো হতভম্ব।—কেন বাপীভাই ? কি হয়েছে ?

বাপী ঠাণ্ডামুখে জানালো কি হয়েছে। বনমায়ার সেই বুনো হাতির খপ্পর থেকে রেশমা ওকে বাঁচিয়েছে।

শুনতে শুনতে আবু বার বার শিউরে উঠেছে। তারপর সোৎসাহে বলে উঠেছে, রেশমা এইরকমই বাপীভাই—ঠিক এইরকম। ঠিক অমনি করে ও দুলারির জন্যেও প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ও এ-রকম হয়ে গেল কেন ? সব জানলে মেমসায়েব তো উল্টে ওকে আরো অনেক ইনাম দেবে।

জবাব না দিয়ে বাপী গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। বলল, পারো তো কাল সকালের দিকে একবার এসো।

আবু বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইল তার দিকে। দেখতে দেখতে বাপীর গাড়ি অনেক দূরে।

বাংলোয় আসতে ঊর্মিলা জানালো, মায়ের শরীর আবার একটু খারাপ হয়েছে। ডাক্তার আবার দিন-কতক তাকে বিশ্রামে থাকতে বলেছে। গায়ত্রী রাই বলেছে, ও কিছুই না, ডাক্তাররা অমন বাড়িয়ে বলে। মাল চালিহার বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আর রেশমাও ফিরে এসেছে শুনে মহিলা নিশ্চিন্ত। মাল বা রেশমাকে আনার জন্য আর ভ্যান পাঠানোর দরকাব নেই। গায়ত্রী রাইয়ের অসুস্থতার ফলে বাপী যেন একটু আড়াল পেল। দুজনেই জানে তার শরীর খারাপ শুনলে বাপী একটু বেশি উতলা আর গম্ভীর হয়ে যায়।

পরদিন সকাল সাতটার আগেই আবু এলো। ত্রস্ত-চকিত চাউনি দেখেই বাপীর মনে হল রেশমার এমন অদ্ভুত আচরণের কিছু হেতু ও আঁচ করতে পেরেছে। খবর জিগ্যেস করতে আবু বলল, গতকালও সমস্ত রাত রেশমা চালিহার বাংলোয় ছিল। সমস্ত দিনও

ওই বাংলোতেই ছিল। চালিহা আপিসে চলে যেতে হারমা ওকে ডেকে দেখা করেছিল। বলেছিল, দুলারি ডেকেছে। ঝাঁঝ দেখিয়ে রেশমা তাকে বলে দিয়েছে. তার এখন কারো সঙ্গে দেখা করার সময় নেই।

বাপী চুপ। তার ওপর আক্রোশেই এই কাণ্ড করছে জানা কথা। আবুর পাথরের মতো মুখ। একটু থেমে মনের কথা ব্যক্ত করল।—দুলারি বলছিল রেশমা মনে মনে তোমাকে পূজো করে...বুনো হাতির কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে পেরে ওর বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছিল।...সত্যি ?

বাপী ঈষৎ তপ্ত জবাব দিল, ওর মাথার খবর ও-ই জানে। দুলারিকে বলে দিও আমার মাথা ঠিক ছিল। আমি ওর কোনো ক্ষতি করিনি বা কোনদিন করব না।

আবু চলে যাবার পরেও সারাক্ষণ ভেতরটা কেমন অস্থির হয়ে থাকল বাপীর। লাঞ্চের পর আপিস ঘরে আবার কাজে বসল এসে। কিন্তু মন নেই। কিছু ভালো লাগে না। বেলা তিনটে নাগাদ সেজেগুজে ঊর্মিলা ঘরে ঢুকে ঝাঁঝলো অনুযোগ করল, কাল ফিরে এসে-তক হাঁড়ি মুখ করে কেবল কাজই দেখাচ্ছো—চলো না ঘুরে আসি একটু।

—কোথায় ?

—প্রথমে রেশমার ওখানে। হতচ্ছাড়ি এসে অবধি আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত করল না। ফিক করে একটু হাসল ঊর্মিলা, তারপর ক্লাবে ডাটাবাবু কেমন আছে একটু খবর নেব।

বাপী বলতে যাচ্ছিল, রেশমাকে পেতে হলে তোমার আংকল চালিহার বাংলোয় যাও—দু দিন দু রাত সে তার ওখানেই আছে। কিন্তু বলল না, সামলে নিল। শুনলে মেয়েটা অবাক হবে, তারপর কৌতূহলে ওরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গম্ভীর মুখে বাপী ফাইলে চোখ নামাল। যাবে কি যাবে না, ওটাই জবাব। ঊর্মিলা রাগ করে বেরিয়ে গেল।

বিকেল সাড়ে চারটে তখন। বিরক্ত হয়ে ফাইলগুলো টেনে সরাল। দশ মিনিটের জন্যেও কাজে মন বসেনি। উঠে পড়বে ভাবছে।

—বাপীভাই! বাপীভাই! উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা মুখে ঘরে ঢুকল আবু রব্বানী।—বাপীভাই! শিগ্‌গির ওঠো—কি সর্বনাশ করল রেশমা দেখে যাও। কি প্রায়শ্চিত্তি করল নিজের চোখে এসে দেখো বাপীভাই।

বাপী চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু আবু ততক্ষণে বাইরে আবার। চেঁচামেচি শুনে গায়ত্রী রাই বারান্দায় এসেছে। সে-ও গেটের ওধারে আবুর উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখেছে। বাপীকে জিগ্যেস করল, কি হয়েছে ?

—রেশমার কি হয়েছে বলছে, দেখছি।

দাঁড়াবার সময় নেই. সে-ও বেরিয়ে এলো। বুকের তলায় কাঁপুনি শুরু হয়েছে। কি হতে পারে ? রেশমা কি করে বসল?

বাংলোর পিছনের পথে ধরে আবু আগে আগে হনহন করে চলছে। ওর নাগাল পেতে হলে বাপীকে ছুটতে হবে। পিছন থেকে বার দুই ডেকেও ওকে থামানো গেল না।

জঙ্গলের পথ ধরল। পিছনে বাপী। ...কিন্তু আবু এ-রকম করছে কেন ? দাঁড়াচ্ছে না কেন ? ও কি কাঁদছে ? নইলে থেকে থেকে চোখে হাত উঠছে কেন ?

দুলারির সেই আগের ঘরের কাছাকাছি আসতেই বাপীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। পর পর দুটো ঘরেই এখন সাপ মজুত করা হয়।...কিন্তু এখানে এত লোক জড় হয়েছে কেন? কি করছে ওরা? সামনের ঘরের ওই বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে কি দেখছে? বাঁশের বেড়ার ওধারে দুলারি দাঁড়িয়ে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। কিন্তু দু চোখে আগুনের হল্কা ঠিকরোচ্ছে। তার পিছনে হারমা। ওই মুখেই কোন ভাববিকার নেই। আর সব কারা বাপী জানে না। জঙ্গলের সাপ ধরার লোক বা মজুর-টজুর হবে, সকলেই বিমূঢ়, হতভম্ব।

বেড়া ঠেলে ভিতরে ঢুকতে আবু ওর একটা হাত ধরল। তার আগে মাটি থেকে একটা পাকা বাঁশের লাঠি কুড়িয়ে নিয়েছে। ওর দু চোখ টকটকে লাল। জলে ঝাপসা। আবু কাঁদছে।

মুখে একটিও কথা না বলে বাপীকে বন্ধ দরজার সামনে টেনে নিয়ে গেল। যারা সেখানে ছিল তারা সরে সরে গেল। কেউ বা পিছু হটল। কাছাকাছি এসে বাঁশের লাঠি দিয়ে আবু বন্ধ দরজার এক পাট ঠেলে খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে কোমর সমান ফনা উঁচিয়ে ফোঁস করে উঠল একটা বিশাল শঙ্খচূড় সাপ। বাপী সভয়ে দু পা পিছিয়ে গেল। আর তার পরেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তার গায়ের রক্ত জল। রেশমা মেঝের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। সর্বাঙ্গ নীল। ওই বিশাল সাপ তার সর্ব অঙ্গ পাকে পাকে জড়িয়ে বুকের কাছে কুলোর মত ফনা উঁচিয়ে আছে।

দরজা দুটো বন্ধ করে আবু একজনকে ঘরের পিছনে গিয়ে ঘুলঘুলিটা টেনে খুলে দিতে বলল। বন্ধ দরজার এদিকে লাঠি-সোঁটার ঘা পড়লে সাপটা ঘুলঘুলি দিয়ে পালাবার পথ পাবে। হারমা হঠাৎ আবার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিতে গেল। সাপটাকে পালাতে দেব না। ঘুলঘুলির দিকে গিয়ে ওটাকে মারবে। আবু বাধা দিয়েছে।—মারবি কেন, ওটার কি দোষ, রেশমা যা চেয়েছে তাই হয়েছে। তাছাড়া কি হয়েছে মেয়েটার দেখতে হবে তো, তোর বাপ যদি কিছু করতে পারে।

যে-সাপ কাটে তাকে চট করে মারতে নেই এ-রকম একটা সংস্কার আছে। সে-রকম ওঝা নাকি ঝাড়ফুঁক করে বিষ তোলার জন্য সেই সাপকে আবার টেনে আনতে পারে। কিন্তু এ আশ্বাস যে শুধু হারমাকে আটকানোর জন্য তাও বোধ হয় সকলেই জানে।

ঘোলাটে চোখে বাপীর দিকে ফিরল আবু। বলল, ওপর-অলার খেলা দেখ বাপী ভাই, পাহাড়ে যাবার দিন-কয়েক আগে এই বিরাট শঙ্খচূড়টাকে রেশমাই ধরেছিল, তারপর খুশিমুখে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, এটার ডবল টাকা দিতে হবে তোমার বাপীভাইকে বলে দিও

বাপী ভোলেনি। সেদিন সে-ও জঙ্গলে ছিল। ওই সাপ দেখার জন্য রেশমা তাকে ডাকাডাকি করেছিল। বাপী শুনেও শোনেনি। চলে গেছল। রেশমা তারপর ঊর্মিলাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, এত বড় ওপরঅলা হয়েও বাপীভাই ওকে জ্যান্ত সাপের মতই ভয় করে।

দুটো নরম হাত একটা বাহু আঁকড়ে ধরতে বাপী ঘুরে তাকালো। ঊর্মিলা। ভয়ার্ত লালচে মুখ। খবর শুনে ছুটেই এসেছে। হাঁপাচ্ছে। সাহস করে কিছু জিগ্যেস করতে

পারছে না, শুধু জানতে চায় সত্যি সব শেষ কি না। কি হল! কেন হল।

ওর হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে বাপী টের পাচ্ছে। কিন্তু বাপী কি বলবে? কি সান্ত্বনা দেবে? পাহাড়ের সেই পাগলা বুনো হাতি নাগালের মধ্যে পেলে এই দেহ ওটার পায়ের তলায় পড়ে ভেঙে-দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে যেত। কিন্তু সে যন্ত্রণা কি এর থেকে বেশি?

বন্ধ দরজার এদিকে বিশ-পঁচিশ মিনিট লাঠি ঠোকাঠুকির পর আবার দরজা ফাঁক করে দেখা হল। সাপটা পালিয়ে গেছে।

রেশমা মাটিতে শুয়ে।

চারদিক দেখে প্রথমে ঘরে ঢুকল আবু রব্বানী। তার পিছনে ঊর্মিলার সঙ্গে বাপী। ঊর্মিলা তার বাহু দু হাতে আরও শক্ত করে চেপে ধরে আছে। ওদের পিছনে আরও অনেকেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রেশমার বিবর্ণ দেহ নিষ্প্রাণ। নিস্পন্দ।

তার বুকে মুখে কপালে মাথায় কতকগুলো ছোবল মেরেছে কে গুনবে? এর যেকোনো একটাতে মৃত্যু অবধারিত। তবু ওই কাল-সাপ বোধ হয় এই নারীদেহে তার সমস্ত বিষ ঢেলে আক্রোশ মিটিয়েছে।

ঊর্মিলা দুহাতে চোখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বাপীর পায়ের নিচে মাটি ভয়ানক দুলছে। সে-ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ঊর্মিলাকে ধরে নিয়ে বাইরে এলো। বাইরে এখনও বেশ আলো। মাথার ওপর বসন্তের নীল আকাশ। কিন্তু বাপী চোখে সব-কিছু ঝাপসা দেখছে। মানুষগুলোর মুখও।

কেন এমন হল? কেন কেন কেন? বাপীর জন্য? বাপীর দোষে? তাই যদি হয় তো ওই নীল আকাশ বজ্র হয়ে ওর মাথায় নেমে আসতে পারে না?

বাঁশের বেড়ার সামনে দুলারি তেমনি তামাটে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। হারমা নেই। সে বোধ হয় তার বাপ ধামন ওঝাকে ধরে আনার জন্য ছুটেছে। সব যে শেষ এ বোধ হয় এখনও শুধু ও-ই বিশ্বাস করছে না। আবু রব্বানী তাকে আশার কথা শুনিয়েছে।

ঊর্মিলাকে ধরে বাপী বেরিয়ে আসছিল। এই মুহূর্তে কোনো নিঃসীম অন্ধকার গহ্বরে সে হারিয়ে যেতে চায়। মুছে যেতে চায়। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। দুলারির ধকধকে দুই চোখ ওর মুখের ওপর।

বলল, যেও না। কথা আছে।

তিন

রাত দশটা। বানারজুলির অনেক রাত। অন্ধকার ঘরে শুয়ে বাপী এ-পাশ ও-পাশ করছে। রাজ্যের ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। ঊর্মিলাকে বলে দিয়েছিল তাকে যেন রাতে খাওয়ার জন্য ডাকা না হয়। ঘরে গিয়েই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তাই ইচ্ছে ছিল। ঘুমের ট্যাবলেট একটা খেয়েছে। একঘুমে সকাল হলে হয়তো দেখবে এই দুঃস্বপ্নের রাতটাই মিথ্যে। ঊর্মিলা বাধা দেয়নি বা জোর করেনি। সে-শক্তিও ছিল না।

তার চোখেও আতঙ্ক। ঘরে গিয়ে হয়তো মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদবে। ওরা কেঁদে হাল্কা হতে পারে। বাপী পারে না।

কিন্তু ঘুম চোখের ত্রিসীমানায় নেই। চোখ বুজলেই সামনে বিভীষিকা। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো এক মেয়ের বুকের ওপরে শঙ্খচূড়ের ফণা। ওটা সরে যাবার পরে যা দেখেছে সে আরো ভয়ঙ্কর। বিষে বিষে ফর্সা অঙ্গ গাঢ় নীল কালিতে ছোপানো। চোখ বুজলেই সামনে সেই ত্রাশ। অন্ধকার অসহ্য। উঠে আলো জ্বেলে দিয়েছে।

আলো দেখেই একটু আগে গায়ত্রী রাই এসেছিল। ঘরের দরজা দুটো খোলাই ছিল। মাথার ওপর বনবন পাখা ঘুরছে। কিন্তু জানলা দরজা বন্ধ করলে বাপী বুঝি দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। কেউ আসছে টের পেয়েই চোখ বুঁজে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও আঁচ করেছে কে এলো। বাপী চোখ মেলে তাকায়নি। কেন তাকাবে? চোখে জল নেই। বুকে মুখ গোঁজার মতোও কেউ নেই।

গায়ত্রী রাই আধ মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে ওকে দেখেছিল হয়তো। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

মেয়ের মুখে যা শোনার শুনেছে। যা বোঝার বুঝেছে। ঊর্মিলার কাছেই বরং অনেক কিছু দুর্বোধ্য এখনো। কিন্তু তার মা সব শোনা মাত্র বুঝবে। বাপীকে রেশমা ভরাডুবি থেকে একেবারে নিরাপদ ডাঙায় তুলে দিয়ে শুধু নিজের ওপর চরম শোধ নিয়ে গেল।

...দুলারিকে নাকি রেশমা এই দুপুরেই হেসে হেসে বলেছিল,ও অনেক দোষ করেছে, ওর গুনাহ্‌র শেষ নেই। তাহলেও বাপীভাই কখনো ওর দোষ ধরবে না, ওকে মাপ করে দেবেই। কারণ সব দোষ আর সব পাপের যুগ্যি প্রায়শ্চিত্ত ও করবে। তখন আর বাপীভাইয়ের কক্ষনো ওর ওপর রাগ থাকতে পারে না। বাপীভাইয়ের মতো এমন মুরুব্বী আর হয় নাকি। এই মুরুব্বী মাফ করে দিলে যত দোষ আর যত পাপই করুক নরকের বদলে সরাসরি হয়তো বেহেস্তে গিয়েই হাজির হবে।

এই পাজী মেয়েকে হাড়ে হাড়ে চেনে দুলারি। ওর থেকে ভালো আর কেউ চেনে না। সব শোনার পরে শেষ মুহূর্তে সুমতি হয়েছে বুঝেও হাড়পিত্তি জ্বলছে দুলারির! কিন্তু ওকে চিনতে যে এত বাকি সে কি তখনো বুঝেছিল!

...হারমা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তার বাপ ধামন ওঝাকে ধরে নিয়ে আসতে দুলারির সেই কঠিন দু চোখ আবার বাপীর মুখের ওপর উঠে এসেছিল।—কি হবে?

বাপী মাথা নেড়েছে। কিছু হবে না। যা হবার হয়ে গেছে।

দুলারি ডেকেছিল, এসো। তুমিও এসো মেমদিদি।

জঙ্গলের পথ ধরে দুলারি আগে আগে নিজের ঘরের দিকে এগিয়েছে। পিছনে বাপী আর ঊর্মিলা। বাপীর মনে হচ্ছিল কেউ তার গলায় একটা অদৃশ্য দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। না গিয়ে উপায় নেই, তাই চলেছে। ঊর্মিলা তার একটা হাত চেপে ধরে ছিল। ও তখনো বিমূঢ়, ভয়ার্ত।

...দুলারি ঊর্মিলাকে সুদ্ধ ডাকল কেন? ওর সামনেই চরম কিছুর ফয়সালা করে নিতে চায়? কোনো অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে ওকে কিছু বুঝিয়ে দিতে চায়? যে আগুন দুলারির চোখে দেখেছে, সেই আগুনে এবার বাপীর মুখ ঝলসে দিতে চায়?

ঘরে ঢুকে দুলারি ছেলে দুটোকে বাইরে বার করে দিয়েছে। তারপর ঊর্মিলাকে

বলেছে, বোসো।

ওরা দাঁড়িয়েই ছিল।

আঁচলে বাঁধা একটা পুঁটলির মতো কোমর থেকে টেনে বার করল দুলারি। গিঁট খুলে মোটা সুতোয় জড়ানো কাগজের পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল বাপীর দিকে।—এটা তোমার কাছে রাখো এখন।

বাপীর মুখে কথা সরলো এতক্ষণে।—কি এতে ?

—আমার জানার কথা নয়। ওর ডেরা থেকে ঘরে ফিরে খুলে দেখছিলাম। দু'হাজার টাকা।

বাপী আরো হতভম্ব।—এ কিসের টাকা ?

তোমাকে যমের মুখে ঠেলে দেবার জন্য এই টাকা চালিহা ওকে ঘুষ দিয়েছিল।

বিস্ময়ে হতবাক দু'জনেই। ঊর্মিলার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়নি। সে চৌকিতে বসে পড়েছিল।

দুলারি আবার বলেছে, এটা রেশমা তোমার হাতে দিতে বলেছিল। মেমসায়েবকে সব বলে তার আপত্তি না হলে এ-টাকা তুমি হারমাকে দিয়ে দেবে। রেশমা তাই বলে গেছে।

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল বাপীর। নিজের ঘরের অন্ধকার শয্যায় উঠে বসল। ...একটি একটি করে দুলারি এরপর যা বলে গেছে ঊর্মিলাও শুনেছে। আংকল চালিহা একটা নোংরা ষড়যন্ত্রের জালে আটকে বাপীর বিরুদ্ধে তার মা-কে বিষিয়ে দিতে চেয়েছিল—ঊর্মিলা শুধু এটুকুই বুঝেছে। এর বাইবে আর বেশি কিছু ওর কাছে স্পষ্ট নয় এখনো। কিন্তু ওর মা সব শোনামাত্র রণজিৎ চালিহার উদ্দেশ্য আরো ঢের বেশি বুঝবে বাপীর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। গায়ত্রী রাই হয়তো এর পর ওকে আরো বেশি কাছে টেনে নেবে, আর চালিহার সঙ্গেও চূড়ান্ত বোঝাপড়া কিছু করবে। কিন্তু সব শোনার পর থেকে হাড়-পাঁজরগুলো আরো বেশি দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছে বাপীর। ভেঙেই চলেছে।

...শেষ মুহূর্তে রণজিৎ চালিহার বদলে পাহাড়ে এবার বাপী তরফদার যাবে সেটা গায়ত্রী রাই বা ঊর্মিলা জানত না, আবু বা দুলারি জানত না, বাপী নিজেও জানত না। জানত শুধু চালিহা আর রেশমা। ম্যানেজারের হঠাৎ এমন দরাজ ভালো মানুষ হবার কারণটা রেশমা আগে বোঝেনি। তার নিজের লোভটাই আসল ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝেছে। নিজের লোভ ছেড়ে এখন বাপীভাইকে লোভের ফাঁদে ফেলতে চায়। ফাঁকমতো অর্জুনকে দিয়ে কদিন সকালে ওকে ডেকে পাঠিয়েছে। ক্লাবের ডাটাবাবুর কাছে বোতলের বাক্সটা চালান দেওয়ার জন্য বা কাছাকাছির মধ্যে কোনো খদ্দেরের জিম্মায় নেশার প্যাকেট পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য রেশমাকে পঁচিশ-তিরিশ টাকা করেও বখশিশ দিয়েছে। এ-ভাবে কাঁচা টাকা হাতে পেলে রেশমা ছাড়ার মেয়ে নয়, দিব্বি নিয়েছেও। কিন্তু গোড়া থেকেই তার মতলব সম্পর্কে রেশমা হুঁশিয়ার ছিল। বাপীভাইয়ের বুকে সে কোন কলঙ্কের ছুরি বসাতে চায় সেটা বোঝার পর তাজ্জব বনেছে। আবার মজাও পেয়েছে।

রেশমার সঙ্গে খাতির বাড়ার পর টোপ ফেলেছে রণজিৎ চালিহা। প্রথমে কেবল

বাপী তরফদারের প্রশংসা। সে আছে বলেই রাতারাতি রেশমার এত আয়পয়। নইলে ও যে এত গুণের মেয়ে সেটা আগে কে বুঝেছিল? মালকানও বোঝে নি, ম্যানেজার নিজেও না। তারপর বলেছে, শুধু এই একজনের যদি মন বুঝে চলিস আর তাকে খুশি রাখতে পারিস, তাহলে আর দেখতে হবে না। কালেদিনে এর দশগুণ বরাত ফিরে যাবে।

মতলব বোঝা গেছে। কাঁচা টাকা হাতে আসছে, রেশমা পরামর্শটা একেবারে বরবাদ করে দিতে পারে না। চলিহার সামনে খুশি যেমন দুর্ভাবনাও তেমনি।...খোদ ম্যানেজার সাহেব যখন বলছে তখন আর ভাবনা কি। তার সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই তরফদার সাহেবের মেজাজের হদিসও যে পায় না কখনো, মন বুঝবে কি করে? কাছে গেলে দশ হাত দূর দিয়ে চলে যায়। আর এমন করে তাকায় যে ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করে। আগে কত সহজে মেলা-মেশা করত ওদের সঙ্গে, এত বড় মুরুব্বী হয়ে বসার 'পর অন্য রকম হয়ে গেছে।

চালিহা সাহস যুগিয়েছে। হেসে হেসে বলেছে, তুই একটা আস্ত বোকা। ওটা বাইরের চাল। কোথা থেকে কোথায় টেনে তুলল দেখে মন বুঝতে অসুবিধে! যা বললাম শোন্, চেষ্টা-চরিত্র করে লেগে থাক ওর সঙ্গে, হিল্লে হয়ে যাবে।

এই লেগে থাকার তাগিদটাই দিনে দিনে বেড়েছে। বখশিশের অঙ্কও। রেশমার টাকার লোভ দেখেই মুখোস খুলে শেষে মতলব ফাঁস করেছে। ওই বাপী তরফদারের মুখ লালসার আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। একটা রাতের জন্যও যদি রেশমা তা পারে, চালিহা ওকে নগদ দু'হাজার টাকা দেবে। আর তার পরেও বরাত ফেরানোর জন্য ওই বাপী তরফদারের মুখ চেয়ে থাকতে হবে না কোনোদিন। ওর রানীর হালে থাকার ব্যবস্থা চালিহাই করে দেবে।

ওই শয়তানের মতলব এবার আবু সাহেব আর দুলারির কাছে ফাঁস করে দেবার কথা ভেবেছিল রেশমা। বাপীভাইয়ের মুখ কার কাছে পোড়াতে চায় রেশমা তাও জানে। মালকানের কাছে। কিন্তু যেমন বেপরোয়া তেমনি নিজের ওপর বিশ্বাস ওর। ও জানে বাপীভাইয়ের কক্ষনো কোনো ক্ষতি হবে না বা হতে পারে না! মজা কতটা গড়ায় দেখা যাক না। ফাঁকতালে নগদ আরো কিছু হাতে এলেই বা মন্দ কি, সানন্দে রাজি হয়ে দু' হাজার টাকার বদলে দু'শ টাকা আগাম চেয়েছে। খুব দরকার। চালিহা তক্ষুনি দিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে এটা আগাম ফাউ। বাপী তরফদার ঘায়েল হলে ফের দু'হাজারই দেবে।

খোশ মেজাজে কড়কড়ে দু'শ টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। ম্যানেজার শেষ পর্যন্ত ওর কি করবে? কোন মতলবে দু'শ টাকা ওকে দিয়েছে সে তো আর কারো কাছে ফাঁস করতে পারবে না। বোকা বনে নিজেই জ্বলবে। তার আগে আরো কিছু টাকা ট্যাঁকে গোঁজার মওকা পাবে রেশমা। চালিহা যা চায় সেটা কল্পনা করতে গিয়ে অনেক সময় যে কান-মাথা গরম হয়েছে, শেষদিন হেসে হেসে দুলারির কাছে রেশমা তাও স্বীকার করেছে। ও-চিন্তা মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়েছে।

বাপীভাইকে রসাতলে পাঠানোর প্ল্যান রেডি চালিহার। কাজ নিয়ে রেশমা পাহাড়ের বাংলোয় যাবে। দিনকতক বাদে তার বদলে বাপী তরফদার সেখানে টাকা নিয়ে যাবে। ওদের মেমসায়েবই তাকে যাতে পাঠায় সে-ব্যবস্থা চালিহাই করবে। ওকে জালে ফেলার

মতো অমন মোক্ষম জায়গা আর নেই। সেখানে ঝগড়ু আছে, তাকে মদে ঠেসে রাখতে হবে। কিন্তু পরে যদি সে-ও আঁচ করতে পারে ব্যাপারটা, খুব ভালো হয়। রেশমা যেমন চালাক মেয়ে, একটু মাথা খাটালে সে-ব্যবস্থাও ও নিশ্চয় করে আসতে পারবে।

ওই আপনা-খাকী মেয়ের মাথায় তখনো কেবল মজাই নাচছে। এক কথায় রাজি। খরচার নাম করে আরো দু'শ টাকা আগাম ফাউ নিয়েছে। পাহাড়ে যখন নিজের নাগালের মধ্যেই পাবে বাপীভাইকে, তখন আর আবু সাহেব বা দুলারিকে বলা কেন—তার কাছেই ম্যানেজারের সব মতলব ফাঁস করে দেবে। বাপীভাইকে ও কি চোখে দেখে নিজে তো জানে—তার এক ফোঁটা ক্ষতিও কক্ষনো হতেই পারে না। সব বলে চালিহার দেওয়া চারশ টাকা বাপীভাইকে দেখাবে আর মালকানের সামনে এসেও সব কবুল করতে রাজি হবে।

পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে বাপীভাইয়ের অপেক্ষায় দিন গুনছে। রেশমা হেসে হেসে দুলারির কাছে স্বীকার করেছে, পাহাড়ে যাবার পর চালিহার মত লোকের চিন্তাটা আবারও মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে, আর ভাবতে মজা লাগলেও জোর করেই সেটা ঝেঁটিয়ে দূর করেছে। কিন্তু বাপীভাই আসতেই ও যেন আর এক মজার খোরাক পেয়েছে। দোষ বাপীভাইয়েরই। আগেও টের পেয়েছে, ওকে বিশ্বাস করে না। জঙ্গলে ওকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। ডাকলেও সাড়া দেয় না। এবারে ও আরো ভালো করে বুঝেছে, বাপীভাই আসলে ওকে ভয় পায়। এবারে পাহাড়ে আসতে রেশমার মনে হয়েছে, সেই ভয় যেন বাপীভায়ের কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসেছে। কেবল কাজের কথা ছাড়া ওর সঙ্গে কথা বলে না, ওর দিকে তাকায় না, নিজের ঘরে বসে খায়। ফাঁক পেলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

ক'দিন ধরে রেশমার মাথায় কেবল মজা গিসগিস করছে। বাপীভাইকে যা বলার পরে বলবে। যাবার আগে বলবে। তার আগে পর্যন্ত এইভাবেই চলুক। রেশমা নিজের মনে ছিল, আর চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করলে বাপীভাইয়ের মুখখানা দেখতে কেমন হবে ভেবে ডবল মজা পাচ্ছিল।

ওখানকার কাজ শেষ বুঝে রেশমা সেদিন আড়াল থেকে নজর রাখছিল। পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে এসে তাকে ধরেছে। কিন্তু পথের ওপর এমন বিমনা হয়ে বসেছিল বাপীভাই যে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে পাশ থেকে তাকে দেখে কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারেনি। শয়তান যে রেশমার দিকেই গুটি গুটি এগোচ্ছে রেশমা ভাবেইনি। ভাববে কি করে। ও তো এসেছে চালিহার মতলবের কথা ফাঁস করে দেবার জন্য!

কিন্তু ওর অজান্তে শয়তান ভর করেছে বলেই হয়তো খোদাতালাও নারাজ। নইলে বনমায়ার সেই পাগলা বুনো হাতি জঙ্গল ফুঁড়ে যমের মতো এসে হাজির হবে কেন। ওটাকে তেড়ে আসতে দেখেই রক্ত জল। ভয় পেয়ে বাপীভাই জঙ্গলের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল। ও ধরে ফেলে পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে না গেলে হয়েই গেছল। তাও প্রাণে বাঁচবে না কে জানে। তক্ষুনি মনে হয়েছে বাপীভাইয়ের মতো এত আপনার জন আর নেই, তাকে যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে—হবেই। না পারলে নিজের জীবনও রাখবে না। আর বাপীভাইয়ের সেই মুখ দেখে মনে হয়েছিল, নিজের বুকটা দু'খানা করে খুলে তাকে তার মধ্যে পুরে নিয়ে পালানো সম্ভব হলে তাই করত। তাকে আগলে নিয়ে

ফাঁড়া কাটিয়েছে শেষ পর্যন্ত। ফাঁড়া সত্যি কেটেছে কিনা বাপীভাই তখনো জানে না। আর ঠিক তক্ষুনি বোধ হয় শয়তানের দখলে চলে গেছে রেশমা। ফাঁড়া কেটেছে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত বাপীভাইকে সেটা বুঝতে দেয়নি। তাকে আঁকড়ে রেখে আর এক পাথর থেকে অন্য পাথরে সরেছে।

...শয়তান রেশমাকেই ফাঁদে ফেলেছে। আসমানের চাঁদের লোভ দেখিয়েছে। সেই চাঁদ যেন হঠাৎ ওর হাতের মুঠোয়। না, চালিহার মতলব হাঁসিলের কথা আর তার মাথায়ও ছিল না। চালিহা জানবে না। দুনিয়ার কেউ কোনদিন জানবে না।

বাংলোয় ফেরার মধ্যে রেশমার সবটাই শয়তানের দখলে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাপীভাই ভয়ে ঘরে সেঁধিয়ে আছে। সেই ভয়ের খোল ছিঁড়ে-খুঁড়েই দেবে রেশমা আজ। ঝগড়ুকে মদে ডুবিয়ে দিয়ে এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ক্ষিপ্ত হয়েই সেই বন্ধ দরজায় ঘা দিয়েছিল।

দরজা খুলতে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো আসমানের চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রেশমা।

বাপীভাই সেই হাত দুমড়ে ভেঙে দিয়েছে।

রেশমার মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে তার পর থেকে। শয়তান সেই আগুন নিভতে দেয়নি। ওকে উল্টে পাগল করে তুলেছে। চরম প্রতিশোধ না নিতে পারা পর্যন্ত মাথার আগুন নিভবে না।

ভালো করে ফর্সা হবার আগে বেরিয়ে পড়েছে। ডেরায় তোরঙ্গটা রেখে সোজা চালিহার কাছে চলে গেছে। বলেছে, দু'হাজার টাকা দাও এবার।

চালিহা আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু রেশমার মুখ দেখে আবার খটকাও লেগেছে।—তোর এরকম মূর্তি কেন? বাপী তরফদার ফাঁদে পা দিয়েছে তো?

রেশমা বলেছে, না! কিন্তু না দিলেও তুমি এত বোকা কেন? এক ঝটকায় গায়ের জামা সরিয়ে পাহাড়ের সেই কাটা-ছেঁড়ার দাগ দেখিয়েছে।—এগুলো দেখেও তোমার শত্রু কিভাবে আমাকে শেষ করেছে বললে মালকান্ অবিশ্বাস করবে? তাছাড়া জিগ্যেস করলে ঝগড়ুও বলবে, ভোর হবার আগে আমি হেঁটে পালিয়ে এসেছি।

চালিহার ফর্সা মুখেও শয়তান হাসছে।—মালকানকে তুই নিজে গিয়ে বলবি?

—বলব। তার আগে তোমার কাছে নালিশ করেছি তাও বলব।

—কবে বলবি?

—ও পাহাড় থেকে ফিরুক, তারপর বলব।

রেশমার মুখে সেই আগুন দেখে চালিহা বিশ্বাস করেছে। আর সেই প্রথম নিজের দু'চোখেও গলগল করে লোভ ঠিকরেছে। ওর মাথাটা আদর করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছে, তোর থেকে বেশি আপনার আর আমার কেউ না। নগদ টাকা হাতে নেই এখন, রাতে আসিস দিয়ে দেব।

রাতে এসেছে। আসবে না কেন, শয়তানের হাতে চলে গেলে আর কার পরোয়া? রাতে ডাকার অর্থ জেনেও এসেছে। এরপর আর কিছুই যায় আসে না। চালিহা ওকে দারুণ খাতির করেছে। কড়কড়ে টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছে। রেশমা মদ ঘৃণা করে, কিন্তু চালিহা আদর করে সেই মদও ওকে খাওয়াতে পেরেছে। তারপর নরকে ডুবেছে।

নিজেকে ধ্বংস করতেই চায়। নিজেকে, সেই সঙ্গে আর একজনকে।

কিন্তু পরদিন সকালে সেই বাংলোয় বাপীভাইকে দেখে রেশমার বুকের তলায় হঠাৎ প্রচণ্ড মোচড় পড়েছে। প্রাণপণে তখন সেই শয়তানকেই আঁকড়ে ধরেছে সে। নিজেকে দ্বিগুণ হিংস্র করে তুলতে চেয়েছে।

বাপীভাই চলে যাবার পর চালিহা ওকে মালকানের কাছে ঠেলে পাঠাতে চেয়েছে। কিন্তু রেশমা আবার যেন পঙ্গু হয়ে পড়েছে। শয়তান তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করেও বাঘিনীটাকে আর বুকের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না। তবু অক্লান্ত চেষ্টা করছে। চালিহাকে বলেছে, আজ না, মালকানের কাছে কাল যাবে।

চালিহার সবুর সয় না।—কাল কেন? আজ নয় কেন?

রেশমা বলেছে, আজ রাতেও তোমার কাছে থাকব। তাড়া দিও না। আমার মন মেজাজ এখনো ভালো না।

চালিহা লোভের টোপ গিলেছে, আর তাগিদ দিতেও সাহস করেনি।

পরদিন সকাল থেকে রেশমা আরো গুম। শয়তানও ওর সঙ্গে শয়তানি করেছে। ওকে ছেড়ে চলেই গেছে। ভিতরের সেই বাঘিনীও উধাও। এদিকে চালিহারও তাগিদ বেড়েছে। ওকে মালকানের কাছে পাঠানোর জন্য ব্যস্ত।

ভেবেচিন্তে রেশমা একটা মতলব এঁটেছে। তাকেই টিট করার মতলব। চালিহাকে বলেছে, সকালে নয়, দুপুরে যাবে মালকানের কাছে। তখন তাকে নিরিবিলিতে পাবে। আর পরামর্শ দিয়েছে, তুমি সায়েব, পাহাড়ের বাংলোয় চলে যাও। আমি যা-ই বলি, ঝগড়ুকে মেমসায়েব জিজ্ঞাসাবাদ করবেই। আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার নাম করে তুমি আগেভাগে গিয়ে তার মগজে যা ঢোকাবার ঢুকিয়ে দিয়ে এসো। তারপর রাতে এসে মালকানকে যা বলার বোলো।

রেশমা জানে এই লোকের কোনো নোংরা কথা ঝগড়ু বিশ্বাস করবে না। তার নজরে বাপীভাইয়ের পাহাড়ের মতো উঁচু মাথা। রেশমার মতলব হাঁসিল হলে চালিহা উল্টে আরো বেশি নিজের কলে পড়বে।

দুপুরে রেশমা নিজের ডেরায় ফিরেছে। হারমা ঘরের সামনে বসে আছে দেখে বিরক্ত হতে গিয়েও ফিকফিক করে হেসেছে। কাছে এসে ওর ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়েছে আর আদুরে গলায় বলেছে, আমার ওপর তোরা সব্বাই খুব রেগে গেছিস জানি। কিন্তু আজ থেকেই বুঝবি আমি কতো ভালো মেয়ে।

এ-কথা হারমাই পরে বলেছে দুলারিকে। দুদিন ধরে রক্ত সত্যি টগবগ করে ফুটছিল হারমার। রেশমাকে নাগালের মধ্যে পেলে খুনই করে ফেলবে ঠিক করেছিল। কিন্তু তার কথা শুনে আর অত হাসি দেখে হারমা হকচকিয়ে গেছল। রাগও জল।

রেশমা তক্ষুনি হারমাকে ঠেলে পাঠিয়েছে দুলারিকে ডেকে আনার জন্য। এক্ষুনি আসতে হবে, খুব দরকার।

দু'রাত এই শয়তানের বাংলোয় কাটিয়েছে জানার পর দুলারি আর তার মুখ দেখবে ভাবেনি। কিন্তু ডাকছে শুনে না এসে পারেনি। ওই মুখপুড়ি যে কতখানি ওর, জানে বলেই ডেকেছে। তাছাড়া অনেক জানার আছে, অনেক বোঝার আছে। না এলে জানবে কি করে, বুঝবে কি করে?

এসেছে। দুলারিকে জড়িয়ে ধরে সে কি আদরের ঘটা ওর। আর সে কি হাসি! যেন দুনিয়া জয় করে ঘরে ফিরল। খুশি ধরে না। তেমনি হাসিমুখে ওর আদ্যোপান্ত সব বলল। শুনতে শুনতে দুলারি স্তব্ধ। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। শয়তান ওকে ছেড়ে গেছে। ভিতরের বাঘিনী পালিয়েছে। আর ওর কাকে ভয়? এবারে ওই ম্যানেজারকে জব্দ করার পালা। মোক্ষম জব্দই করবে। এমন জব্দ করবে যে দুলারি আবু সায়েব এমন কি বাপীভাইয়েরও ওর ওপর আর একটুও রাগ থাকবে না।

ও কি করবে বা কি মতলব এঁটেছে বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও বলল না। হেসেছে আর মাথা নেড়েছে। সেটি হচ্ছে না! আগে থেকে জানা-জানি হলে সর্বনাশ। সব ভেস্তে যাবে। এত কাণ্ডর পর মেয়েটার মাথাই খারাপ হয়ে গেল কিনা দুলারি ভেবে পায়নি।...ওই চালিহাকে খুন-টুন করে বসে শেষে সব কবুল করার ফন্দি আঁটছে না তো? ও না পারে কি?

মোট কথা মেয়েটার অত হাসি দুলারির ভালো লাগেনি। তার ওপর দু'হাজার টাকার পুঁটলিটা তার হাতে দিয়ে কি করতে হবে বলতে আরো খটকা লেগেছে। কিন্তু ভাবার সময় পায়নি খুব। রেশমা আবার ঠেলে তুলে দিয়েছে ওকে। বলেছে, হারমার সঙ্গে ওর দরকারি কথা আছে, পরে দেখা হবে।

দুলারির দুশ্চিন্তা বেড়েছে আরো। ওই হারমার সঙ্গে জোট বেঁধে কিছু একটা করে বসার মতলবে আছে নাকি?

দুলারি চলে যেতে রেশমা বেরিয়ে এলো। হারমাকে বলল, তুই আর বসে আছিস কেন, ঘরে যা। আমার দরকারি কাজ আছে, এক্ষুনি বেরুবো।

হারমা গোজ হয়ে বসে থেকে জবাব দিয়েছে, আমার আর ঘর কোথায়।

এ-কথা শুনে রেশমা নাকি হাসতে লাগল আর ওকে দেখতে লাগল। তার পর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা আজ থেকে আমার এই ঘরই তোর ঘর। আবার ঘরে ঢুকে দুটো টাকা এনে ওর হাতে দিল—সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে! যা খেয়ে আয়—

হারমা তাও নড়ে না।

—অবাধ্য হলে রাগ করব বলে দিচ্ছি, যা চটপট খেয়ে আয়।

হারমা চলে গেল। কিন্তু আসলে কোথাও না গিয়ে একটু ঘুরে রেশমার ডেরার পিছনে এলো আবার। নিজের এত ভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছিল না। রেশমা কোথায় বেরুবে, কি তার দরকারি কাজ না দেখে থাকে কি করে। তাছাড়া ওর সেই হাসিমুখ দেখেই ক্ষুধাতৃষ্ণা গেছে।

একটু বাদে রেশমা বেরুলো। কিন্তু হারমা ভেবে পেল না কোথায় চলল ও। রাস্তার দিকে নয়, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে-দিকে চলেছে সে-দিকে তো সাপ-ঘর! ভয়ে ভয়ে হারমা অনেকটা ফারাক রেখে গাছের আড়ালে আড়ালে চলছে। দেখে ফেললে কি মূর্তি ধরবে সেই ভয় আছে।

বেশ দূরে একটা গাছের ওধারেই দাঁড়িয়ে গেল হারমা। সামনে আর গাছ নেই, আর এগোলে দেখে ফেলবে। বাঁশের বেড়া সরিয়ে রেশমা দাওয়ার দিকে এগলো। তারপর সামনে বড় সাপ-ঘরটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

এই ঘরে হঠাৎ কি দরকার পড়তে পারে রেশমার, হারমা ভেবেই পাচ্ছে না। পাহাড়ের বাংলো থেকে সাপের বিষ বার করা শিখে এসেছে, এ অনেকদিন আগে রেশমাই ওকে বলেছিল। সেই বিষ বার করতে গেল ? বিষের নাকি অনেক দাম। কিন্তু বিষ দিয়ে রেশমা কি করবে? চুরি করে বিক্রি করবে ? না কি কাউকে সাবড়ে দেবার মতলব!

ঝুপড়ির মুখ একটু একটু ফাঁক করে খুব বিষাক্ত সাপ টেনে বার করা জল-ভাত ব্যাপার। ভয়ের কিছু নেই। হারমা নিজেও পারে। অথচ কি একটা ভয় হারমার বুকের ওপর চেপে বসেছিল। রেশমা এত দেরি করছে কেন ? তিন-পো ঘণ্টা পার হতে চলল —বেরিয়ে আসছে না কেন ?

আর পারা গেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। পা টিপে দাওয়ায় উঠল। আস্তে আস্তে দরজাও ঠেলল। তারপর মেঝেতে ওই দৃশ্য দেখে একটা আর্তনাদ করে বাইরে ছুটল।

টর্চ জ্বেলে ঘড়ি দেখল বাপী। রাত এগারোটা বেজে দশ। ঘুম এই রাতে আর আসবে মনে হয় না।...দু'হাজার টাকার সেই পুঁটলিটা ফেরার সময় বাপী উর্মিলার হাতে দিয়েছে। তার মাকে দিতে বলেছে। আর যা শুনেছে সব তাকে বলতে বলেছে। রণজিৎ চালিহাকে রেশমা মোক্ষম জব্দ করে গেল বটে। পাহাড় থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অঘটনের খবর তার কানে গেছেই। তারপর সাহস করে সে আর পাশের বাংলোয় এসে গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দেখা করেনি নিশ্চয়। কথার খেলাপ করে যে মেয়ে এ-ভাবে নিজের জীবন দিয়েছে, তার আগে হাটে হাঁড়ি কতটা ভেঙে দিয়ে গেছে কে জানে ? দু'রাত পর পর ওই মেয়ে তার বাংলোয় কাটিয়েছে এও আর গোপন থাকবে না। আত্মঘাতিনী হবার ফলে ম্যানেজারের বাংলোয় রাত কাটানো নিয়েই সকলের বিকৃত জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বাংলো থেকে নড়ার সাহস এই রাতে অন্তত চালিহার হবে না।

কিন্তু বাপী কি করবে এখন ? টর্চটা হাতে করে রেশমার ডেরায় চলে যাবে ? ওকে সেখানেই শুইয়ে রাখা হয়েছে এখন। আবু বসে পাহারা দিচ্ছে। সংস্কারবশে হারমার বাপ ধামন ওঝা সাপে-কাটা মরাকে চব্বিশ ঘণ্টার আগে মাটি চাপা দিতে নিষেধ করে গেছে। যে মুখ চোখের সামনে থেকে সরানোই যাচ্ছে না, চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে বাপী আবুর সঙ্গে তার কাছে গিয়েই বসে থাকবে?

—বাপী সাব! বাপী সাব! বাপী সাব!

আচমকা চিৎকারে অন্ধকার রাতের স্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল। সুইচটা টিপে একলাফে বিছানা থেকে নেমে বারান্দার দরজা খুলে বাপী বেরিয়ে এলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে। বারান্দার আলো জ্বালল।

রণজিৎ চালিহার কমবাইন্ড হ্যান্ড অর্জুন। ভয়ার্ত মুখ। দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বেদম হাঁপাচ্ছে।

তার কথা শুনে বাপী কাঠ কয়েক মুহূর্ত। অর্জুন ঘুমোচ্ছিল। একটু আগে তার সায়েবকে সাপে কেটেছে। চিৎকার চেঁচামেচি করে কয়েকজন লোক জুটিয়ে সে সাইকেল নিয়ে এখানে খবর দিতে ছুটে এসেছে। মেমসায়েব তাকে জলদি গাড়ি বার করে বাংলোর সামনে দাঁড়াতে বলেছেন। তিনিও যাবেন।

দু'মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে বাপী পাশের বাংলোয় এলো। বারান্দায় গায়ত্রী রাই আর বিবর্ণ মুখে ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে। গায়ত্রী রাই একাই নেমে এলো। ঊর্মিলার নড়া চড়ারও শক্তি নেই যেন। অর্জুন সাইকেল নিয়ে আগেই ছুটে বেরিয়ে গেছে।

রণজিৎ চালিহার শোবার ঘরে আট-দশজন লোক। প্রতিবেশী হবে। কিন্তু বাপী সব থেকে অবাক সেখানে হারমাকে দেখে। তার মুখে রক্ত। হাতে একটা ছোরা। সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। দু'মিনিটের মধ্যেই মুখ ধুয়ে ফিরে এলো।

চালিহা বিছানায় পড়ে আছে। অত ফর্সা মুখ কালচে বিবর্ণ। সেটা ভয়ে কি বিষে বাপী ঠাওর করতে পারল না। জ্ঞান আছে কি নেই তাও বোঝা যাচ্ছে না। সম্বিৎ ফিরতে হাত তুলে বাপী নাড়ি দেখল। পাল্‌স্‌ অস্বাভাবিক দ্রুত। হাঁটুর নিচে পায়ের পিছনে মাংসালো জায়গায় সাপে কেটেছে। হারমা কাছাকাছিই ছিল নাকি। অর্জুনের চেঁচামেচি শুনে ভিতরে ঢুকেছে। তারপর প্রাথমিক যা করার সে-ই করেছে। হাঁটুর ঠিক নিচে শক্ত বাঁধন দিয়েছে। আর হাঁটুর ছ'আঙুল ওপরে আর একটা। তার সঙ্গে ওই ছোরাটা ছিল। সেটা দিয়ে সাপে-কাটা জায়গা আরো বেশি করে কেটে দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। একবারে বিষকালা রক্ত বেরিয়েছে গল গল করে। তারপর মুখ লাগিয়ে ও অনেকটা রক্ত টেনে এনেছে—বিষ কতটা বার করতে পেরেছে জানে না।

হারমা বিড়বিড় করে বলল, সায়েব ভয়ে ভিরমি খেয়েছে—আর ভয় নেই, বেঁচে যাবে।

চা-বাগানের হাসপাতলে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাদের গাড়ি এলো, রণজিৎ চালিহাকে তুলে নিয়ে গেল।

তখন পর্যন্ত বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি বাপীর।...সাপের জায়গা, বাংলোয় সাপ ঢোকাটা আশ্চর্য কিছু না। কিন্তু ঢুকতে পারে না বড়। কারণ সব জানলাতেই পাতলা তারের জাল লাগানো থাকে। বাপী তিনটে জানলা চেয়ে চেয়ে দেখল। পায়ের দিকের জানলার জাল বেশ খানিকটা ছেঁড়া আর দুমড়নো। মাথায় রক্ত ওঠার দাখিল বাপীর। ঘরে তখন কেবল গায়ত্রী রাই আর সে। অর্জুন তার সায়েবের সঙ্গে হাসপাতালে। কাছে ডেকে বাপী গায়ত্রী রাইকে ছেঁড়া জালটা দেখালো। চাপা গলায় বলল, জাল কেটে কেউ ঢুকিয়ে না দিলে এ-ঘরে সাপ ঢুকতে পারে না।

গায়ত্রী রাই একটি কথাও বলল না। সমস্ত মুখ অদ্ভুত সাদা। তার হার্টের কথা চিন্তা করেই বাপী হাত ধরে বাংলো থেকে নামিয়ে গাড়িতে তুলল। সব কটা আলো জ্বালাই থাকল। বাপী বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

গায়ত্রী রাই গাড়িতেও নির্বাক।

হেড লাইটের আলোয় বাপী দেখল, পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে একটা লোক শ্লথ পায়ে হেঁটে চলেছে। হারমা। লাইট দেখে সেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

তার সামনে এসে বাপী গাড়ি থামালো। হেড লাইট নেভালো, গায়ত্রী রাইকে বলল, একটু বসুন, আসছি।

নেমে এসে হারমাকে গাড়ি থেকে আট-দশ হাত দূরে গিয়ে ধরল। তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল খানিক। হারমার ভাবলেশশূন্য মুখে শুধু রাজ্যের ক্লান্তি। চেয়ে আছে সে-ও।

—তুমি এত রাতে এদিকে এসেছিলে কেন?

হারমা নিরুত্তর।

—কি করছিলে?

নিরুত্তর।

বাপীর গলার স্বর কঠিন এবার।—আমাকে বিশ্বাস করে যা জিগ্যেস করছি জবাব দাও!

বিড়বিড় করে বলল, এদিকে এসেছিলাম।

—এত রাত্তিরে কেন এসেছিলে? তোমার সঙ্গে ওই ছোরা ছিল কেন?

ঘোলাটে চোখে হারমা চেয়ে রইল খানিক।—দুশমনকে খতম করব বলে এসেছিলাম। ওই ছোরা দিয়ে খোদা তাকে বাঁচিয়ে দিল।

আর দু'চার কথায় ব্যাপারটা বুঝে নিল বাপী। রাতে সুযোগ না পেলে ভোরে বাংলোয় ঢুকে সায়েবকে শেষ করার সংকল্প নিয়ে এসেছিল। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাংলোয় ঢুকে দেখে আল্লা তাকে আগেই শাস্তি দিয়েছে। তক্ষুনি আল্লার ওপর ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল ওর—আল্লা রেশমাকে নিয়েছে। তাই খোদা এবারে যাকে মারতে গেল হারমা তাকে বাঁচিয়ে দিল। হঠাৎ বিষম রাগে ওই কালো দেহের ছাতি ফুলে উঠল, বলল, আমি ভুল করলাম, আবার বদলা নেব।

বাপী দেখছে ওকে। এবারে ঠাণ্ডা গলায় বলল, খোদা ওই সায়েবকে শাস্তি দেয়নি, জানলার জাল কেটে কেউ তার ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়ল লোকটা। সে নয়। পরের মুহূর্তে কিছু মনে হতে চমকে উঠল যেন। সামলে নিয়ে আবার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

—তুমি দেখেছ কাউকে?

মাথা নাড়ল, দেখেনি।

—ভালো করে ভেবে দেখো। দেখেছ? কে এমন কাজ করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

হঠাৎ গলার স্বর গমগম করে উঠল ওর।—কিছু মনে হয় না। আমি জানি না। আমি কাউকে দেখিনি। হনহন করে হেঁটে চলল।

গাড়িতে ফিরে আসতে গায়ত্রী রাই জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে?

—হারমা। এক ওঝার ছেলে। রেশমাকে খুব ভালোবাসত।

—তাহলে ওরই কাজ?

বাপী জবাব দিল, না—মিস্টার চালিহাকে ওই বাঁচিয়ে দিল ভেবে এখন পস্তাচ্ছে।

বাকি রাতটুকু দু' চোখের পাতা আর এক করা গেল না। খুব ভোরে বাপী গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গা-জুড়নো ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। পাশে বসন্তের রং-ছোপানো বানারজুলির জঙ্গল। বনমায়া নেই। রেশমা নেই। এই বাতাস আর এই বসন্ত বিদ্রূপে ঠাসা এখন।

সাপে-কাটা রোগী হামেসাই আসে এখানকার হাসপাতালে। তাই চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভালো। রণজিৎ চালিহাকে কেবিনে রাখা হয়েছে। এত সকালে বাপী তাকে দেখতে আসেনি। খবর নিতে এসেছে। মেট্রনের কাছ থেকে খবর পেল ভালো আছে। তবে

জ্বর খুব। এমনি ছোরা দিয়ে ক্ষত জায়গা কেটে দেওয়ার দরুন অ্যান্টিটিটেনাস দিতে হয়েছে। প্রাণের ভয় নেই আর, কিন্তু প্রচণ্ড রকমের নার্ভাস শকের দরুন পেশেন্ট খুবই কাহিল। যে লোকটা ক্ষত জায়গা কেটে বিষরক্ত বার করে দিয়েছে আর জায়গামতো দু-দুটো বাঁধন দিয়েছে তার খুব প্রশংসা করেছে ডাক্তাররা।

গাড়িতে ফিরে এলো। এক জায়গায় এসে জঙ্গলের ধারের রাস্তায় গাড়ি থামালো আবার। এখান থেকে জঙ্গলের পথে আবুর ঘর দূরে নয় খুব।

দুলারি দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বাপীকে দেখল। চোখে একবারও পলক পড়ল না। নিশ্চল পাথর-মূর্তি।

বাপী ওর কাছে দাওয়ার সামনে দাঁড়ালো। এ-ও সমস্ত রাত ঘুমোয়নি বোঝা যায়। এই চোখে গতকালের মতো আগুন ঠিকরোচ্ছে না এখন। পাথর-মূর্তির মতো শুধু অপলক। অনেকটা হারমার মতো ভাবলেশশূন্য।

সাদামাটা সুরে বাপী জিগ্যেস করল, আবু রাতে ঘরে ফেরেনি তো ?

মাথা নাড়ল। ফেরেনি।

জানা কথাই। গতকাল বিকেল থেকে রেশমার ডেরায় আছে। মাটি না দেওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। বাপী দুলারির কাছেই এসেছে। কিছু বলতে নয়, শুধু দেখতে। দেখছেও। অনেক কাল আগেব সেই দুলারিকে মনে পড়ছে। যখন রেশমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুবে সাপ খেলা দেখাতো, গাল ফুলিয়ে সাপের বাঁশি বাজাতো, হাঁটু মুড়ে বসে সামনের ফণা-তোলা সাপের মতোই সামনে পিছনে কোমর বুক মাথা দোলাতো আর বার বার মাটিতে হাত পেতে দিয়ে ছোবল পড়ার আগেই পলকে সে হাত টেনে নিয়ে সাপকে উত্তেজিত করত। বাপী তখন রেশমার থেকে সেই দুলাবিকেই ঢের সাংঘাতিক মেয়ে ভাবত।

এতকাল বাদে আজ আবার সেই দুলারিকেই দেখছে বাপী। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখাটা বিসদৃশ। বলল, এ-দিকের ব্যাপার তো শুনেছ ?

দুলারি চেয়েই আছে। এখনো জিজ্ঞেস করল না কি ব্যাপার বা কি শুনবে।

—কাল রাত এগারোটা নাগাদ রণজিৎ চালিহাকে খুব বিষাক্ত সাপে কেটেছে।...ওর চাকর এসে খবর দিতে আমি আর তোমাদের মেমসায়েব তক্ষুনি গেছলাম। চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বলছে বাপী। জানলার জাল কেটে কেউ ঘরে সাপ ছেড়ে দিয়ে গেছে। খুব বরাত ভালো লোকটার...ওই হারমার জন্যেই বড় বাচা বেঁচে গেল।

যা দেখার এবারে নির্ভুল দেখল বাপী। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকর মতো ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল দুলারি। মুহূর্তের মধ্যে চোখে সেই আগুন নেমে এলো। এই শেষের খবরটাই যেন সর্বাঙ্গ ঝলসে দিয়ে গেল ওর—হারমার জন্য বেঁচে গেল! হারমার জন্য! ও কি করেছে ?

বাপী বলল কি করেছে।

—হারমা! হারমা এই কাজ করল! হারমা ওই শয়তানকে বাঁচিয়ে দিল!

বাপীর নির্লিপ্ত মুখ। গলার স্বরও ঠাণ্ডা।—তুমি তাহলে জানতে চালিহা সাহেবকে সাপে কাটবে ?

সেই ছেলেবেলা হলে এই চাউনি দেখেই বাপী হয়তো ভয়ে তিন পা সরে যেত।

—হ্যাঁ, জানতাম। তুমিও বুঝেছ বলেই এত সকালে এখানে ছুটে এসেছ, তাও তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। তোমার বন্ধুও শোনামাত্র বুঝবে। কিন্তু আমায় কে কি করবে? কে ছেড়েছে বলার জন্য ওই সাপ ফিরে আসবে, না তার গায়ে আমার হাতের দাগ থাকবে? ওই হারমাকে আমি দেখে নেব, বুঝলে? আর রেশমাকে যে শেষ করেছে, এবার প্রাণে বাঁচলেও সেই শয়তানকে আমি আর বেশিদিন এই বানারজুলির বাতাস টানতে দেব ভেবেছ?

এবারে চাপা ধমকের সুরে বাপী বলল, এখন মাথা খারাপ করবার সময় নয় —যা বলি শুনে রাখো। কটা দিন এখন মুখ শেলাই করে থাকবে। হারমাকে একটি কথাও বলবে না, আবু যা বোঝার বুঝুক, নিজে থেকে তুমি কিছু বলবে না। নিশ্চিন্ত থাকো, যাকে সরাতে চাও এবারে সে নিজেই সরবে—বানারজুলির বাতাস বেশিদিন তাকে নিতে হবে না।

পরের পাঁচ-ছ'দিনের মধ্যে বাপী আর একবারও হাসপাতালে যায়নি। গায়ত্রী রাই রোজ একবার করে গেছে। কিন্তু তিন মিনিটও থাকেনি। দেখেই চলে এসেছে। সেদিন ঊর্মিলা সঙ্গে ছিল। সে এসে বাপীকে খবর দিল, আংকেল তার কথা শোনার জন্য মাকে বার বার বলছিল। পরে মায়ের মুখে শুনেছে, রোজই বলে তার নাকি অনেক কথা বলার আছে। সেদিন মা তাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, তারও অনেক কথা শোনা হয়ে গেছে —কিন্তু আপাতত তার কারো কোনো কথা শোনার ইচ্ছে নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই আংকল যেন এখন আসাম চলে যায়। পরের কথা পরে।

শুনে আংকলের মুখ আমসি একেবারে।

বাপী হাসপাতালে তার কেবিনে এলো আরো দু-দিন বাদে। বিকেলে। পরের দিন সকালে সে নিজের বাংলোয় আসছে শুনেছে।

বেড-এর মাথার দিকে পিঠে ঠেস দিয়ে বসেছিল, ওকে দেখেই রণজিৎ চালিহা অন্যদিকে মুখ ফেরালো। অনেক দিন বাদে সেই ওপরওয়ালার গাম্ভীর্য আর বিরক্তি টেনে আনার চেষ্টা। কিন্তু মুখ দেখে বাপীর মনে হল এই কদিনে লোকটার দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বাপী পাশে বসল।—কাল বাংলোয় ফিরছেন শুনলাম?

চালিহা তার দিকে ফিরল। ক্রূর সন্দিগ্ধ চাউনি।—তোমার কি ধারণা হাসপাতালেই থেকে যাব?

—না। তারপর আপনি আসাম যাচ্ছেন কবে?

পিঁজরায় পোরা হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রণজিৎ চালিহা।—সে খোঁজে তোমার কি দরকার? আমার ঘরের জানলার জাল কেটে সাপ ঢোকানো হয়েছে...এ খবরটা জানা আছে?

—আছে।

—কে করেছে এ কাজ? এত সাহস কার?

—জানি না।

—কিন্তু আমি জানব! আমি তার টুঁটি টিপে ধরব—বুঝলে?

—চেষ্টা করে দেখুন। আমার আপত্তি নেই।

সন্দিগ্ধ দুই চোখ মুখের ওপর থমকে রইল একটু।—তুমি আপত্তি করার কে?

—আপনার সঙ্গে ফয়সালা এরপর আমার হবে ভেবেছিলাম। আপনি এ চেষ্টায় এগিয়ে এলে তার আর দরকার হবে না। রেশমা কেন নেই কারো জানতে বাকি নেই। আপনি যাদের খুঁজছেন তারা এখনো আপনার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় আছে। আমি বাধা না দিলে তাদের সুবিধে।

রাগে কাঁপছে লোকটা। কিন্তু বাপী জানে আসলে ত্রাসে কাঁপছে। জালে পড়া জানোয়ারের ত্রাসে রাগের ঝাপটাই বড় হয়ে ওঠে।—তুমি তাহলে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ, কেমন?

—শুনুন! এবারে ঠাণ্ডা কঠিন গলায় বাপী বলে গেল, মিসেস রাইয়ের অনেক ধৈর্য...মাত্রা ছাড়িয়ে ড্রিঙ্ক করে বৃষ্টির পাহাড়ী রাস্তায় তাঁর স্বামীর জিপ-অ্যাকসিডেন্ট করাটা আর তার আগে আপনার সেই জিপ থেকে নেমে যাওয়াটা তিনি খুব সাদা চোখে দেখেননি। তবু এত ধৈর্য যে আপনাকে তিনি এ পর্যন্ত বরদাস্ত করে এসেছেন। তাঁর কাছে এতদিন থেকে আমিও কিছু ধৈর্য শিখেছি। নইলে এবারে যে ষড়যন্ত্রে আপনি নেমেছিলেন, তার জবাব আমারই দেবার কথা। কিন্তু কাল আপনার ঘরে ফেরার পর থেকে আমারও ধৈর্যের মেয়াদ আর তিন দিন। হাতে গুনে তিনটি দিন। সেই তিনদিনের জন্য আপনার জীবনের দায়িত্ব আমি নিলাম। কিন্তু তারপর আপনাকে আর এই বানারজুলিতে দেখা গেলে আমার আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

চালিহার সমস্ত মুখ এখন পাংশু বিবর্ণ।

বাপী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

বাংলোর বারান্দায় মা-মেয়ে বসে। গেটের সামনে গাড়ি থামিয়ে বাপী নামল। বারান্দায় উঠে সামনের চেয়ার টেনে বসল। গায়ত্রী রাই জিগ্যেস করল, পাঁচটার আগেই আপিস ছেড়ে হুট করে কোথায় চলে গেছলে?

—হাসপাতালে। চালিহার কাছে।

আজ আর মিস্টার বা সাহেব জুড়ল না, ওই কানে তাও ধরা পড়ল মনে হল। তার দিকে চেয়ে একটু অপেক্ষা করল।—কেন? কি কথা হল?

বাপী শান্তমুখে জানালো কেন, বা কি কথা হল। কিছুই গোপন করল না।

ঊর্মিলার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা। কিন্তু গায়ত্রী রাই বিরক্ত হঠাৎ।—কেন তুমি আগ বাড়িয়ে এ সব বলতে গেলে? সে আসাম চলে গেলে পরে ব্যবস্থা আমিই করতাম। এখন গোঁ ধরে যদি না যায়?

বাপী তেমনি নির্লিপ্ত নিরুদ্বিগ্ন। ঠাণ্ডা স্পষ্ট জবাব দিল, না যদি যায়, আপনি আমার নামে কুকুর পুষবেন।

গায়ত্রী রাই চেয়ে রইল। তার মেয়েও নতুন মুখ দেখছে।

চার

বাপীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণ করে তিনরাতের মধ্যে রণজিৎ চালিহা

বেতখাওয়া কুকুরের মতো বানারজুলি থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বাপী যা বলে এসেছিল তারপর আর তার গায়ত্রী রাইয়ের সঙ্গে দেখা করারও মুখ ছিল না বা সাহস ছিল না। পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাবার খবরটা কানে আসতে গায়ত্রী রাই মুখে একটি কথাও বলেনি বা কোনো মন্তব্য করেনি। রাতে খাবার টেবিলে বসে কেবল টিপে-টিপে হেসেছে আর বাপীকে লক্ষ্য করেছে। দুষ্ট দামাল ছেলের কাণ্ড দেখা প্রসন্ন কমনীয় মিষ্টি-মিষ্টি হাসি।

তাই দেখে ঊর্মিলার হঠাৎ হি-হি হাসি। হাসির চোটে বিষম খেয়ে নাকের জলে চোখের জলে একাকার। গায়ত্রী রাই ওকে ধমকে থামাতে চেষ্টা করে শেষে নিজেই আবার হেসে ফেলল।—এত হাসির কি হল তোর?

জবাবে চোখেমুখে জল দেবার জন্য ঊর্মিলা বাথরুমের দিকে ছুটেছে। পরে একলা পেয়ে বাপীকে বলেছে, মা তোমাকে যেভাবে দেখছিল আর হাসছিল, তাইতে আমার সেই কথা মনে আসছিল।

—কি কথা?

চপল খুশিতে ঊর্মিলার রক্তবর্ণ মুখ তখনো।—তোমার বয়েস আর দশটা বছর বেশি হলে আর মায়ের দশ বছর কম হলে কি হত!

বাপী ওকে সতর্ক করার একটা বড় সুযোগ ফসকালো। বলতে পারত, বয়সের ফারাক যে-দুজনের একটুও আপত্তিকর নয়, মা যদি তাদের মধ্যে কিছু ঘটাতে চায়, তাহলে কি হবে?

বলা গেল না। ওর মায়ের কোন উদ্দেশ্য পণ্ড করার জন্য এমন একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে বসেছিল রণজিৎ চালিহা, এই মেয়ের মাথায় সেটা ঢোকেইনি। জানলে এই হাসিমুখ আমসি হয়ে যেত।

চালিহা উধাও হবার তিন-চার দিনের মধ্যে তার আসামের ঠিকানায় গায়ত্রী রাইয়ের সই-করা রেজিষ্ট্রি চিঠি গেছে। টাইপ করা সেই চিঠির কপি বাপী দেখেছে। অল্প কথায় ঠাণ্ডা বিদায়। রাই অ্যাণ্ড রাই-এর সমস্ত দায়িত্বভার থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এই সংস্থার সঙ্গে আর তার কোনরকম সংস্রব থাকল না।

মহিলার পাকা কাজ। কাগজে কলমে চিফ একজিকিউটিভ এখন বাপী তরফদার-–ভূটান সিকিম নেপাল বিহার মধ্যপ্রদেশ আর উত্তর বাংলার ছোট বড় সমস্ত ক্লায়েণ্টের কাছে মহিলার স্বাক্ষরে রেজিষ্ট্রি ডাকে সেই ঘোষণাও তড়িঘড়ি পৌঁছে গেছে। আসামের মার্কেট হাতছাড়া হল বলে একটুও খেদ নেই তার। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলের মার্কেটও যাচাই করে আসার পরামর্শ দিয়েছে বাপীকে। সব কটা প্রভিন্স-এর জন্য তার অধীনে দেখে-শুনে একজন করে রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার নেবার কথা বলেছে। ওকে সকলের ওপরে রেখে ব্যবসাটা এবার ঢেলে সাজাবার ইচ্ছে তার।

কিন্তু গায়ত্রী রাইয়ের মাথায় আরো কি আছে বাপীর কল্পনার মধ্যেও ছিল না। জানা গেল আরো আট-ন মাস বাদে। যে লোভে শুরু থেকে রণজিৎ চালিহার এত দিনের এত ছলা কলা কৌশল, না চাইতে বাপীর বরাতে ভাগ্যের সেই শিকেও ছিঁড়ল।

রাই অ্যান্ড রাইয়ের সমস্ত ব্যবসার চার আনার অংশীদার বাপী তরফদার।

ওকে নিয়েই মহিলা শিলিগুড়ির অ্যাটর্নি অফিসে হাজির একদিন। তখন পর্যন্ত বাপীর

ধারণা নেই কি হতে যাচ্ছে। তাই বাধা দিয়ে বলেছিল, এই শরীরে এতটা পথ গাড়িতে যাওয়ার দরকার কি আপনার—কি করতে হবে আমাকে বলুন না?

অবাধ্য হলে এখনো আগের মতই মেজাজ দেখাতে চেষ্টা করে গায়ত্রী রাই। জবাব না দিয়ে গটগট করে গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। অ্যাটর্নির সঙ্গে কথাবার্তার সময় ওকে ডাকা হল না দেখে ধরে নিয়েছে ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু। তার দিন-কতক বাদে গায়ত্রী রাই বাংলোর আপিস ঘরে এসে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। সহজ সাদামাটা মুখ। হাতে অ্যাটর্নির তৈরি একটা খসড়া। বাপীর দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখো তো—

সাধারণ কিছু ধরে নিয়েই বাপী চোখ বোলাতে শুরু করেছিল। তারপর চক্ষু স্থির। হকচকিয়ে গিয়ে খসড়াটা ফেলে তার দিকে তাকালো। মহিলার সাদা মুখ কমনীয় কৌতুকে ভরাট।

—এ কি কাণ্ড! এ আপনি কি করছেন!

—কেন, তোমার আপত্তি আছে? হাসি-ছোঁয়া স্নেহ ঝরছে দু'চোখে। কিন্তু খুশির বদলে শুকনো মুখ দেখে অবাক একটু।

বাপী বলল, তা না, মানে কত ভাবে কত তো দিচ্ছেন—এক্ষুনি এর দরকার কি!

মুখের দিকে চুপচাপ খানিক চেয়ে থেকে মহিলা ওর অস্বস্তিটুকু লক্ষ্য করল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার প্রাপ্য থেকে একটুও বেশি দেওয়া হয়নি বা হচ্ছে না। শরীরের যা হাল, আমার দিক থেকে কোনো কাজ ফেলে রাখার ইচ্ছে নেই।

বাপীর গলা শুকিয়ে কাঠ। চুপচাপ খসড়াটা তার দিকে ঠেলে দিল শুধু।

—ওটা অ্যাপ্রুভ করে পাঠালে দলিল হবে, আমি দেখেছি—ঠিকই আছে, তবু তুমি একবার দেখে নিতে পারো।

—আমি আর কি দেখব। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, ডলি দেখেছে?

—ওর অত সময় আছে না ধৈর্য আছে? আমার মুখে শুনেছে। সব দিক সামলে যে ভাবে এখন তুমি ব্যবসার হাল ধরে আছ, ওর মতে চার-আনার থেকে বেশিই দেওয়া উচিত। ঠোঁটের ফাঁকে আবার একটু হাসির রেখা স্পষ্ট হতে দেখা গেল।—আমি আরও ঢের বেশি দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছি, কিন্তু নেবার জন্য তৈরি হতে পারছ না কেন? চোখ-কান বুজে এভাবেই বা দিন কাটাচ্ছ কেন?

বাপীর কপাল ঘেমে উঠেছে। খসড়াটা হাতে করে মহিলা উঠে দাঁড়াতে প্রায় অনুনয়ের সুরে বলে উঠল, দলিল করার জন্য এক্ষুনি ওটা না পাঠালে ভালো হয়।

এরকম বাধা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। গায়ত্রী রাইয়ের দু-চোখ ওর মুখের ওপর স্থির খানিক।—কেন?

বাপী চুপ। কি বলবে? কি বলতে পারে?

কমনীয় মুখে কিছু সংশয়ের আঁচড় পড়তে থাকল। গলার স্বরও নীরস একটু। —মনে যা আছে খোলাখুলি বলো। দলিল করার জন্য এক্ষুনি এটা না পাঠালে ভালো হয় কেন?

দায়ে পড়ে বাপী সত্যি জবাবই দিতে চেষ্টা করল। বলল, আপনি যা ভেবে রেখেছেন শেষ পর্যন্ত তা যদি না হয়, আপনারই খারাপ লাগবে। আপনি আমাকে অনেক দিয়েছেন,

দিচ্ছেনও—পার্টনার ইচ্ছে করলে পরেও করে নিতে পারবেন।

গায়ত্রী রাই ভিতর দেখছে ওর।—আমি যা ভেবে রেখেছি তার সঙ্গে তোমাকে চার আনার পার্টনার করার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এ-কথা কেন, আমার মেয়েকে তোমার পছন্দ নয়?

বাপী আরো ফাঁপরে পড়ল। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ডলির মতো মেয়ে আমি কমই দেখেছি। কিন্তু বলার পরই মনে হল, এবারেও ভুল বুঝল মহিলা।

অনুচ্চ গলার স্বর প্রায় কঠিন।—আমার মেয়ের যদি শেষ পর্যন্ত তোমাকে বাতিল করার মতো দুর্বুদ্ধি হয়, তাহলে তোমাকে আমার চার-আনা ছেড়ে আট-আনার পার্টনার করে নেবার কথা ভাবতে হবে। ডলি আপত্তি করেছে বা তোমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে?

সত্যি অসহায় মূর্তি বাপীর। মাথা নাড়ল। ডলি আপত্তি করেনি বা কোনো কথা হয়নি।

এত চৌকস ছেলে এ ব্যাপারে সত্যি এত ভীরু কিনা দেখছে মহিলা। এবারে গলার স্বর সদয় একটু।—আমি যতদূর বুঝেছি ডলি তোমাকে পছন্দ করে। কিন্তু তুমি প্রায় দুটো বছর এভাবে কাটিয়ে দিলে কেন, আমি কি চাই বুঝতে তোমার বাকি ছিল?

দলিলের খসড়া হাতে চলে গেল। তার পরেও বাপী অনেকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে।

ঊর্মিলার ইদানীংকালের বেপরোয়া মেলামেশা তার মা লক্ষ্য করেনি এমন হতে পারে না। ঝর্ণা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে, কিন্তু নদীর দিকে গতি তার। সেই আছাড়ি-বিছাড়ির মতো বাপীর ওপর মেয়ের অমন সহজ আর নিঃসংকোচ হামলা দেখেই তার পছন্দ সম্পর্কে মায়ের এমন ধারণা। রাগ হলে বা ঝগড়া বাধলে মেয়ে তার সামনেই বাপীর কাঁধ ধরে বা দু-হাতে মাথার চুলের মুঠো ধরে ঝাঁকায়। গায়ত্রী রাই মেয়েকে বকা-ঝকা করে আর মেয়ে পাল্টা মুখঝামটা দেয়, বেশ করব, আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন!

ঊর্মিলা এখন গাড়ি চালানোটা মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছে। অনায়াসে মায়ের অনুমতি আদায় করার ফলে বাপীই শিক্ষাগুরু। তার ওপর দিয়ে তখন আরো বেশি ধকল গেছে। শেখানোর সময় ঊর্মিলার হাতে স্টিয়ারিং, ব্রেক আর ক্লাচ স্বভাবতই বাপীর দখলে। ফলে স্টিয়ারি-এর ওপর দখল আনতে হলে মেয়ের বাপীর গায়ের সঙ্গে লেপটে বসা ছাড়া উপায় কি? একটা পা, হাঁটু থেকে কোমরের একদিক, বুকের পাশের খানিকটা আর কাঁধের একদিকে বাপীর সঙ্গে এঁটে থাকবেই—কিন্তু মেয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। শেখার উত্তেজনায় সমস্ত মন স্টিয়ারিংয়ের দিকে। প্রথম দিনের মহড়ার পরেই উল্টে বাপীর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছে, আমার দ্বারা হবে না—বিয়ের পরে নিজের লোককে ধরে শিখো।

অসুবিধেটা না বোঝার কথা নয় ঊর্মিলার। ওর শেখার তাড়া, কারণ বিজয় মেহেরা লিখেছে গাড়ি চালানো শিখে সে একটা সেকেণ্ড-হ্যান্ড গাড়িও কিনে ফেলেছে। অতএব ঊর্মিলাও তাকে অবাক করে দেবেই—ছেলে ফিরে এসে দেখবে ড্রাইভিংএ ওরও পাকা হাত। বাপীর আপত্তির হেতু বুঝে হাসি চেপে চোখ পাকিয়েছে।—ধরেছি যখন না শিখে ছাড়ব না—তোমার বদলে তাহলে ওই আধবুড়ো বাদশাই মজা লুটবে।

পরদিন সকালে মায়ের সামনেই আবার হিড়হিড় করে গাড়িতে টেনে তুলেছে ওকে।

তারপর তার চোখের আড়ালে গিয়ে ধমকেছে, মায়ের যখন আপত্তি হয়নি, তোমার অত সতীপনা কিসের মশাই? যার কাছে ড্রাইভিং শিখব, তার সঙ্গে জড়াজড়ি একটু হবেই মা জানে না? সঙ্গে সঙ্গে হাসি।—তুমি আমার ফ্রেন্ড আর আমি তোমার ফ্রেন্ড—ওই তকতকে নীল আকাশখানার মতো পরিষ্কার সম্পর্ক—শেখা হয়ে গেলে গুরুদক্ষিণা হিসেবে অনায়াসে একখানা চুমুও খেয়ে ফেলতে পারি।

এরপর বাপীর আর অব্যাহতি কোথায়। কিছুদিন বাদে মেয়ের হাত কিছুটা রপ্ত হতে বাপীই একটু সরে বসতে পেয়ে বেঁচেছে। কিন্তু এক সহজ বিশ্বাসে মেয়েটার এই বেপরোয়া মেলামেশা সত্যি যে আশ্চর্যরকম পরিষ্কার, তা অনুভব না করে পারেনি।

এভাবে আর খুব বেশি দিন কাটবে না জানত। জেনেও অসহায়। অনেক দিন থেকে মা আর মেয়ের বিপরীত প্রত্যাশা আর তাগিদ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ভাবসাব মেলামেশা দেখে গায়ত্রী রাই আশা করছে মেয়ের মনের জগৎ থেকে সেই অবাঞ্ছিত পাঞ্জাবী ছেলেটা মুছে গেছে। সে জায়গায় এই ছেলে জুড়ে বসেছে। কিন্তু আশাই করছিল শুধু, নিশ্চিত হতে পারছিল না। শরীর মোটে ভালো যাচ্ছে না। মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও দিনকে দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে গেলে সব দিক নিশ্চিন্ত। কিন্তু দিন একে একে কেটেই যাচ্ছে, ওদের দুজনারই হাতে যেন অঢেল সময়। কারো তাড়া নেই দেখেই মহিলা মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল, বাপী তাও টের পেত। অন্যদিকে মাকে সামলাবার বা বোঝাবার সব দায় ফ্রেন্ড-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ঊর্মিলাও দিন গুনছে। কিন্তু মনের মানুষের ফেরার সময় এগিয়ে আসছে অথচ ফ্রেন্ড-এর তেমন মাথাব্যথা নেই। বিয়ের ব্যাপারে মায়ের দিক থেকেও স্পষ্ট কিছু তাগিদ নেই দেখেও ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি। যে ছেলে কাছে নেই, সে একেবারেই দূরে সরে গেছে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত কিনা কে জানে! তাহলে তা চিত্তির। ঘুরেফিরে তাই বাপীর ওপরেই ক্ষোভ ঊর্মিলার। এতগুলো দিন কেটে গেল, এখনো কেন মাকে বোঝাতে পারল না—মায়ের মন ফেরাতে পারল না। এত পারে আর এটুকু পারে না? এদিকে তো মায়ের চোখের মণিটি হয়ে বসে আছে একেবারে!

বাইরের দিক থেকে দেখলে প্রতিটি দিন বাপীর অনুকূলে গড়িয়ে চলেছে সেটা মিথ্যে নয়। না চাইতে গায়ত্রী রাই তার দু-হাত ভরে দিচ্ছে। সম্মান আর প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছে। চিফ একজিকিউটিভ হিসাবে মাসের মাইনে দ্বিগুণ। তবু ও-টাকা টাকাই নয়। যাতে হাত দেয় তাই সোনা, তাই টাকা। টাকাই এখন বাপীর পিছনে ধাওয়া করে চলেছে। মাইনের টাকা, কমিশনের টাকা, পার্টনারশিপের ভাগের টাকা। গায়ত্রী রাইয়ের চোখের মণি হয়ে ভাগ্যের বিপুল জোয়ারেই ভাসছে বটে বাপী তরফদার।

এরই মধ্যে যে আশঙ্কা দুঃস্বপ্নের মতো বাপীর বুকে চেপে বসে আছে ঊর্মিলা তার খবর রাখে না। পরের কটা মাসের মধ্যে গায়ত্রী রাই আর একটা কথাও বলেনি। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তার প্রতিটি দিন কিছু প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটছে। ওর ওপর নিভর করে কখনো ঠকতে হয়নি বলেই এখনো স্থির বিশ্বাসে মহিলা সেই নির্ভরতার মর্যাদা দিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রতীক্ষারও শেষ আছেই।

এক সন্ধ্যায় ঊর্মিলা তার ঘরে হাজির। গনগনে মুখে সিঁদুরে মেঘ। এক ঝাপটায় বাপীর হাতের বই পাঁচহাত দূর মাটিতে ছিটকে পড়ল।

—সব তোমার জন্য বুঝলে? তুমি যতো নষ্টের গোড়া!

এরকম হামলা বা এই গোছের সম্ভাষণ নতুন কিছু নয়। শোয়া থেকে উঠে বসল। —কি ব্যাপার ?

রাগের ফাটলে নাচার হাসির জেল্লা। —অমন চালাক মা বোকার মতো কি আশায় এতদিন ধরে এমন ভালোমানুষটি হয়ে ঠাণ্ডা মেরে আছে তুমি জানো?

বাপীর ভিতর নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ।—তুমি কি জেনেছ তাই বলো।

জবাব না দিয়ে ঊর্মিলা আবার জিগ্যেস করল, চিকিৎসার জন্য মাকে তুমি বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছ?

—হ্যাঁ, একজন স্পেশালিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম, তাঁর মতে নিয়ে যেতে পারলে ভালই হয়।...কেন?

—একটু আগে মা সেই কথা বলতে আমি তক্ষুনি সায় দিলাম। তার উত্তরে মা কি বলল জানো? বলল, আমার বিয়ের পরে যাবে। তারপরেই জিগ্যেস করল, তোদের বিয়েটা হচ্ছে কবে আগে আমাকে সোজাসুজি বল।

বাপীর বুক দুরুদুরু।—তারপর?

—আমি হাঁ। কার সঙ্গে বিয়ে? শুনে মা রেগেই গেল। পরে বুঝলাম তার ধারণা আমার প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ একেবারে। ধমকে বলল, এমন ভালো একটা ছেলে, সেই কবে থেকে তোর মুখ চেয়ে বসে আছে আর তুই কেবল ধিঙ্গিপনা করে বেড়াচ্ছিস। ছেলেটাকে তোমারও এত পছন্দ যখন মিছিমিছি দেরি করিস কেন—আমার শরীরের হাল দেখছিস না? বোঝো কাণ্ড, মা কিনা শেষে এই ভেবে বসে আছে! তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি মায়ের এ ধারণা হল কি করে?

বাপীরও ওর মতো সহজ হবার চেষ্টা। উনি যাকে এত কাছে টেনে নিয়েছেন, তাকে তুমি এমন অমানুষ ভাবো তিনি জানবেন কি করে?

—ধ্যেৎ! তুমি একটা যাচ্ছেতাই। তুমি আমার ফ্রেন্ড। সেই হিসেবে তোমাকে আমি দারুণ ভালবাসি। মা সেটাই দেখেছে কিন্তু বোঝেনি।

—তুমি আজ বুঝিয়ে দিলে না কেন?

হুঁঃ, ধরফড়ানির চোটে পালিয়ে বাঁচলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ চড়ল।—আমি বোঝাতে যাব কেন—দু' বছর ধরে তুমি কি করলে? নাকি মায়ের মন বুঝে তলায় তলায় তাতেই সায় দেবার ইচ্ছে?

এবারে বাপী নির্লিপ্ত। গম্ভীরও।—নিজেকে নিয়ে বিভোর হয়ে না থাকলে মায়ের মন আমার থেকে তুমি ঢের আগেই বুঝতে পারতে।

ঊর্মিলার চোখে-মুখে সংশয়ের ছায়া।—তার মানে মা কি ভাবছে তুমি আগেই জানতে?

—তোমার মা ভাবাভাবির মধ্যে নেই। দু' বছর ধরে তিনি নিজে যা চেয়েছেন তাই তোমাকে বলেছেন।

সোজা চেয়ে থেকে ঊর্মিলা সেই একই প্রশ্ন করল, তুমি তাহলে জানতে মা এই চায়?

—শুধু আমি কেন, অনেকে জানত। অত বড় একটা বিভ্রাটের পরেও তুমিই শুধু কিচ্ছু তলিয়ে দেখলে না বা ভাবলে না।

ঊর্মিলা এবারে বিমূঢ় খানিক। উতলাও।—কোন বিভ্রাটের পরেও আমি কিছু তলিয়ে দেখলাম না, ভাবলাম না? মা কি চায় সেটা তুমি ছাড়া আর কে জানত?

—রণজিৎ চালিহা জানত। রেশমা জানত। আবু রব্বানী জানত। তার বউ দুলারি জানত। তোমার মা এই চান জেনেই রণজিৎ চালিহার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তোমার মায়ের কাছে তাই আমার এ-মুখ বরাবরকার মতো পুড়িয়ে দেবার জন্য টাকা ঢেলে রেশমাকে সে অমন কুৎসিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে নামাতে চেয়েছিল। এখন বুঝতে পারছ?

ঊর্মিলা হতভম্ব। চোখে পলক পড়ছে না।—কিন্তু সকলে তো জানে আংকল ইজ্জত খেয়েছে বলে রেশমা অমন ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে আক্কেল দিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা মুখে বাপী জবাব দিল, অত সহজে ইজ্জত খোয়াবার মতো ঠুনকো মেয়ে নয় রেশমা। আমার ওপর আক্রোশে তার মাথার ঠিক ছিল না। সেই আক্রোশে চালিহার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমার মায়ের কাছে সেও আমার মুখ পুড়িয়েই দিতে চেয়েছিল। পরে অনুশোচনায় জ্বলেপুড়ে ঠাণ্ডা মাথায় ওই কাজ করেছে।

এক বছর পরে হলেও চোখের সামনে থেকে একটা হেঁয়ালির পর্দা সরেছে ঊর্মিলার। অস্ফুট বিস্ময়।—ওঃ! সেই জন্যেই সেই দিন নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে দুলারি তোমাকে ওই সব কথা বলেছিল।

বাপী নিরুত্তরে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

পরের মুহূর্তে ঊর্মিলা আবার অসহিষ্ণু।—কিন্তু আমাকে তুমি কিচ্ছু বুঝতে দাওনি কেন? মায়ের মতলব জেনেও এতদিন তুমি চুপ করে ছিলে কেন?

—তাতে অশান্তি বাড়ত, মায়ের শরীর খারাপ হতো।

পায়ের নিচে থেকে নতুন করে আবার যেন মাটি সরছে ঊর্মিলার। অবুঝ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, অশান্তি কমবে? মায়ের শরীর ভালো হবে? সব জেনে-বুঝেও কেন তুমি এতদিন ধরে তাকে এমন একটা অসম্ভব ইচ্ছে আঁকড়ে ধরে থাকতে দিলে?

নিরুপায় বলেই সঙ্গে সঙ্গে বাপীও তেতেই উঠল।—তোমার কি ধারণা? কেন দিলাম?

মেয়েটা থতমত খেল একপ্রস্ত। অবিশ্বাসের এক আচমকা যন্ত্রণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠেছিল ঠিকই। ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা। কিছু হাল্কাও। কিন্তু গোঁ ছাড়ার মেয়ে নয়। সমান মেজাজে জবাব দিল, আমার ধারণা তুমি একটা ভীতুর ডিম—তুমি একটা ওয়ার্থলেস। বিপদ জেনে উটের মতো বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছ, এদিকে তোমার ওপর নির্ভর করে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

নিস্পৃহ মুখে বাপী বলল, তোমার মা-ও এখন ঠিক এই কারণে আমার ওপর বিরক্ত, দু'বছর ধরে তিনিও আমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। এজন্য অনুযোগও করেছেন—

ফ্রেন্ডকে অবিশ্বাস করে না, করতে চায় না। কিন্তু ফের একথা শোনার পর চোখে সংশয়ের ছায়া দুলছেই একটু। মায়ের জন্যেই এ-ছেলের বেশি দরদ, বেশি দুর্ভাবনা।

—মা কি বলেছে?

—বলেছেন ব্যবসার চার-আনার অংশ ছেড়ে তিনি আরো ঢের বেশি দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন—আমি নেবার জন্য তৈরি হতে পারছি না কেন, সব জেনেও কেন চোখ-কান বুঝে এভাবে দিন কাটাচ্ছি।

ঊর্মিলা চেয়ে আছে। এই লোকেরও ভিতর বোঝার দায় এখন। তাই নিজেকে সংযমে বাঁধার চেষ্টা।—এতটা শোনার পরেও মাকে তুমি কিছু বললে না? কিছু আভাস দিলে না?

—দিয়েছিলাম। সেই জন্যেই পার্টনার হ'তে আপত্তি করেছিলাম। তাইতে তিনি রেগে গিয়ে বলেছিলেন, তাঁর মেয়ের যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে বাতিল করার মতো দুর্বুদ্ধি হয়, তাহলে চার-আনা ছেড়ে আট-আনার পার্টনার করে নেবার কথা ভাবতে হবে।

চেষ্টা করেও গলার স্বর খুব সংযত রাখা গেল না এবার।—আট আনা ছেড়ে ষোলো-আনাই দিক না, কে তাকে ধরে রেখেছে?

বাপীর জবাবও এবারে প্রায় নির্মমগোছের ঠাণ্ডা।—তাও দিতে পারেন। শরীরের হাল তো ভালো নয়, তবে তাঁর ষোলো-আনাটা তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।

ঊর্মিলার ঝকঝকে দু-চোখ বাপীর মুখের ওপর নড়ে-চড়ে স্থির আবার। গলার স্বরে তপ্ত ব্যঙ্গ।—তাহলে?

—তাহলে ঘরে গিয়ে এবারে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবোগে যাও। তোমার মা আমার কাছে কতখানি সেটা তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে বলেই আমার সমস্যাটা দেখছ না--লোভের কলে পা দিলাম কিনা ভাবছ। তোমার মা হয়তো বেইমান নেমকহারাম ভাববেন আমাকে, তবু বরাবরকার মতো আমি এখান থেকে চলে গেলে তোমার সুবিধে হবে? নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

ঊর্মিলা হকচকিয়ে গেল। গালে যেন ঠাস্ করে চড় পড়ল একটা। আর একই সঙ্গে ওকে যেন একটা দম-বন্ধ-করা শূন্যতার গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হল।...ও নেই, বাপী নেই—মা একা। এ-চিত্র আর ভাবাই যায় না। ফলে চিরাচরিত রাগত মুখ।—আমি তোমাকে তাই বলেছি?

—বলেছ। সব কথা মুখে বলার দরকার হয় না।—সমস্যা দুজনেরই এক—এটুকু জেনে মাথা এখনই সব থেকে ঠাণ্ডা রাখা দরকার। বুঝলে?

পরের দিন-কতকের মধ্যে ঊর্মিলা মুখে আর কিছু বলল না বটে, কিন্তু মাথা যে খুব ঠাণ্ডা নেই, তাও স্পষ্ট। এতটা জানা আর বোঝার পরে ঘাবড়েছে বেশ। নিজের মা-টি কত শক্ত মেয়ে বিলক্ষণ জানে। কিন্তু বাপীকে তার থেকেও জোরালো ছেলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এখন ভয়, মা-ই না উল্টে এই ছেলেকে ঘায়েল করে। তার মতিগতি বদলে দেয়। দিলেও ওর নাগাল কেউ পাবে না বটে, কিন্তু এমন সংকটের মধ্যে কে পড়তে চায়। এই ছেলের প্রতি মায়ের এতটুকু টান দেখলে ভিতরে ভিতরে তেতে ওঠে এখন।

ওর মনের অবস্থাটা বাপী আঁচ করতে পারে।

কিন্তু বন্ধুকে আগের মতো মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেই চায় ঊর্মিলা। ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস যে ভেঙেছে তাও নয়। তবু এরই মধ্যে সব সংশয় আর অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার

মতোই কিছু চোখে পড়ল ঊর্মিলার।

নাকের ডগায় চশমা এঁটে মা কি-সব দরকারী কাগজপত্র দেখছিল। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে বাপী তখনো খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় বাপীর দু'চোখ আটকে গেল। ঊর্মিলা তারপর সেই আর একবারের মতোই স্থান-কাল ভুলে কাগজের খবরের ওপর ঝুঁকে পড়তে দেখল তাকে। চোখ দিয়ে পড়ছে না, মন দিয়ে স্নায়ু দিয়ে সত্তা দিয়ে পড়ার মতো কিছু খবর যেন কাগজে আছে।

ঊর্মিলা লক্ষ্য করছে। সেই একবার কলকাতায় প্লেগের খবর পড়ে যে-রকম বিবর্ণ মুখ দেখেছিল সে-রকম নয়। কিন্তু আত্মহারা মনোযোগটুকু সেই গোছের। খবরের কাগজ খুলেই এই ছেলে প্রথমে কলকাতার খবর খোঁজে, ঊর্মিলা তাও খেয়াল করেছে। ওর এখনো বদ্ধ ধারণা, ছেলেবেলার সঙ্গী এক মেয়ে তার মন জুড়ে আছে যার নাম মিষ্টি। সেবারে তো বলেই বসেছিল, কলকাতার প্লেগের খবর পড়ে মূর্ছা যেতে বসেছিলে কার ভাবনায় মশাই? আজও এই মুখ আর এই একাগ্র উন্মুখ মনোযোগ দেখেই ধরে নিল, সেই এক মেয়েকে মনে পড়ার মতো কাগজে খবর আছে কিছু।

নিঃশব্দে উঠে পিছনে এসে দাঁড়াল। ঠিক কোন খবরটার ওপর চোখ আটকে আছে ঠাওর করা গেল না। কিন্তু কোন জায়গাটা পড়ছে মোটামুটি আন্দাজ করা গেল।

একটু বাদে কাগজ রেখে বাপী আপিস ঘরে চলে এলো। নিজের তখনকার চেহারা আয়নায় দেখেনি। কিন্তু ঊর্মিলা দেখেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে নবাব নন্দিনীর মতো দুহাত পিছনে করে ঊর্মিলা হাজির। গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখ থেকে মেয়ের পরদা সরে গেছে।

—কলকাতার মিষ্টি নামে কোনো মেয়ে দু'বছর আগে বি-এ পাশ করেছিল?

হকচকিয়ে গিয়ে বাপী ওর দিকে চেয়ে রইল।

ঊর্মিলা জবাব যেন পেয়েই গেছে। আবার প্রশ্ন।—এবার তাহলে তার এম-এ পাশ করার কথা?

বাপী বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে?

—তোমার মুখ দেখে। পিছনের হাত সামনে এলো। হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। ওটা সামনে ধরল। কলকাতা য়ুনিভার্সিটির এম-এ পরীক্ষার ফল বেরুনোর খবরটার চার পাশে লাল দাগ। বলল, মুখে রক্ত তুলে এমন দিশেহারা হয়ে পড়ার মতো আর কোনো খবর এ-জায়গায় দেখলাম না। তাই মনে হল, এটাই তোমার কাছে দুনিয়ার সেরা খবর।

ঊর্মিলা হাসছে। আগের মতো তাজা হাসি।

বাপী দেখছে। এই মেয়ে এখন নিজের আর ওর সমস্যাটা এক জেনে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

পাঁচ

গেজেটের পাতায় ছাপা নামগুলোর ওপর বাপী অনেকবার চোখ বুলিয়ে গেল। ব্যাপারখানা অপ্রত্যাশিত ধাক্কার মতোই। ইতিহাসে এম. এ-র সফল ছাত্রছাত্রীদের নামের মিছিল খুব লম্বা নয়। কিন্তু ফার্স্ট বা সেকেন্ড কোনো ক্লাসে কোনো গ্রুপে যে-নাম খুঁজছে

সেটা একেবারে নেই-ই! মালা আছে, মালঞ্চ আছে, মালবী আছে—নন্দী ছেড়ে কোনো মালবিকারও অস্তিত্ব নেই।

গেজেট ফেলে বাপী হাঁ খানিকক্ষণ। এমন একটা ধাক্কা খাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বানারজুলি থেকে শিলিগুড়ি ছুটে আসেনি। আসতে আসতে বরং অন্য রকমের সম্ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।...মেয়ে বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পায়নি। প্রথম তিনজনের মধ্যেও জায়গা হয়নি। এম. এ-তে না যুঝে ছাড়বে না বাপী ধরেই নিয়েছিল। গাড়ি ছুটিয়ে আসার সময় বাপীর চিন্তায় এম. এ-র ফয়সালাটা ফার্স্ট ক্লাসের দিকে ঝুঁকছিল। আর সেই কারণে কেন যেন একটু অস্বস্তিও বোধ করছিল। সেটা ঠিক ঈর্ষা বলে মানতে রাজি নয়। এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বসলে নাগালের ফারাকটা আরো বেশি লম্বা মনে হবে বাপী তা-ও স্বীকার করে না। অস্বস্তির একটা যুৎসই কারণ নিজেই হাতড়ে বার করেছে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বসলে মিষ্টির অনেকখানি হয়তো মালবিকা হয়ে যাবে।

—ফার্স্ট ক্লাস যদি পায়ই, বাপীর এবারের টেলিগ্রামের বয়ান কি হবে তা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিল। তারপর ঠিক করেছে, যে-ক্লাসই হোক, ওর কাছ থেকে এক শব্দের অভিনন্দন যাবে। ফিরেও আসবে তেমনি এক শব্দের ধন্যবাদ, জানা কথাই। কিন্তু ধন্যবাদের পর এবার সেই মেয়ে মালবিকা লিখবে না মিষ্টি লিখবে?

এত সব চিন্তা-ভাবনার পরে এই! নামই নেই! কি হল? কি হতে পারে?

হতে অনেক কিছুই পারে। পরীক্ষা দিয়েও কত ফেল করে। কিন্তু মনে মনে মাথা ঝাঁকিয়েই বাপী সেই সম্ভাবনা বাতিল করে দিল। ফেল করার মেয়ে নয়। পরীক্ষার পড়া পছন্দমতো না হলেও অনেক ভালো ছেলে-মেয়ের ড্রপ করার ভূত চাপে মাথায়। সেটা বরং হতে পারে। এছাড়া আর এক সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই ভিতরে গনগনে আগুনের ছেঁকা।

'...বি. এ, এম. এ. পাশ করা দূরে থাক, ওই মেয়েকে ম্যাট্রিকও পাশ করতে হবে না বলে দিলাম।'

এক যুগেরও আগের সবজান্তা আবু ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিল। ফকির জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বচনের জবাবে মিষ্টির সম্পর্কে আবু এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

তার যুক্তিও কম যুৎসই নয়।—এই বয়সেই চেহারাখানা দেখছিস না মেয়েটার, ষোল-সতের বছরের ডবকা বয়সে এই মেয়ের চেহারাখানা কেমন হতে পারে চোখ বুঝে ভেবে দেখ দিকি? তারপর আবু ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল।—সেই বয়সে কোনো না কোনো বড় লোকের ছেলের চোখ পড়বেই ওর ওপর। বিয়ে করে ঘরে এনে পুরবে তারপর লুটে-পুটে শেষ করবে—বি. এ, এম. এ. পাশের ফুরসৎ মিলবে কোত্থেকে?

...তবু বি. এ, পাশ করা পর্যন্ত অন্তত ফুরসৎ মিলেছিল। কিন্তু তার পরেও বাপী নিশ্চিন্ত ছিল কোন ভরসায়? একটানা আরো দুটো বছর ওই সম্ভাবনাটা ছেঁটে দিয়ে বসে ছিল কি করে? দু বছর আগে অভিনন্দনের জবাবী টেলিগ্রামে 'মালবিকা'র বদলে মিষ্টি লিখেছিল বলে?

...পীর ফকির ওর মা-কে অন্ন দেখে ঘি আর পাত্র দেখে ঝি দেবার শ্লোক বলেছিল। ওই মেয়ে কোন পাত্রের খপ্পরে পড়ে আছে সেটা নিজের চোখে দেখে আসেনি? দুবছর আগে বি.এ-র রেজাল্ট দেখে ঘটা করে টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে নিজেই কলকাতায় ছুটে

গেল না কেন ? যা-হোক কিছু হেস্তনেস্ত করে এলো না কেন ? গায়ত্রী রাইয়ের দৌলতে দু'বছর আগেই তো ভাগ্যের চাকা বেশ জোর তালে ঘুরতে শুরু করেছিল। তারপরেও দিবাস্বপ্নে দিন কাটিয়ে দিল কেন ? বাপী কি ভেবেছিল ভাগ্যের একেবারে চূড়ায় উঠে বসতে না পারা পর্যন্ত ছপ্পরফোঁড়া কোনো মন্ত্রের জোরে সেই মেয়ে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকবে ?

নিজের বয়েস এখন ছাব্বিশের প্রায় ওধারে। মিষ্টির তাহলে বাইশ তো বটেই। টানা বারো বছরের মধ্যে চার বছর আগে মাত্র দুটো দিন বাপীকে দেখেছে, চিনেছে। তা সত্ত্বেও ওই মেয়ের জগতে নিজেকে এক অমোঘ দুর্বার পুরুষ ঠাওরে বাপী একে একে দুটো বছর পার করে দিল!

এই আবেগের গালে ঠাস ঠাস করে গোটাকয়েক চড় বসালো বাপী। তাইতেই একটা সংকল্পের শর জ্যা-মুক্ত হয়ে ঠিকরে বেরুলো।

কলকাতায় যাবে।

কিন্তু যাবে ঠিক করলেই পাঁচ-সাত-দশ দিনের জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়া আগের মতো অতটা সহজ হয় না এখন। এক বছর আগেও ব্যবসা বাড়ানোটাই বোধ হয় গায়ত্রী রাইয়ের জীবনের সব থেকে বড় লক্ষ্য ছিল। সেই উৎসাহে একটু একটু করে ভাঁটা পড়ছে বাপী সেটা অনুভব করতে পারে। দেহ নিয়ে মহিলার শান্তি নেই খুব, সেটাই হয়তো বড় কারণ। কিন্তু অশান্তির কথা মুখ ফুটে বড় একটা বলে না। বরং বেশির ভাগ সময় চাপা দিতে চেষ্টা করে। জিগ্যেস করলে বলে, ভালো আছি। আবার বেশি জিগ্যেস করলে বিরক্তি। ভালো আছি, এই জোরের ওপর থাকার চেষ্টা। কেমন ভালো আছে বা কতটা ভালো আছে বাপী তা বুঝতে পারে। ওর এই বুঝতে পারার আবেগের দিকটা খুব চাপা।

গায়ত্রী রাইয়ের প্ল্যান মতোই ব্যবসার সাজ বদল হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমন কি উত্তর বাংলারও বিশেষ বিশেষ জায়গায় মোটা মাইনের অভিজ্ঞ ম্যানেজার বহাল করা হয়েছে। সকলের মাথার ওপর জেনারেল ম্যানেজার ও পার্টনার বাপী তরফদার। ফলে বাপীর লম্বা লম্বা টুর প্রোগ্রামের ছাঁটকাট বাড়ছে। পাঁচ-সাত দিনের জন্য কোথাও বেরুতে চাইলেও গায়ত্রী রাই ভুরু কোঁচকায়!—এত লোকজন থাকতে তোমাকে এতদিনের জন্য গিয়ে বসে থাকতে হবে কেন ? ফোনে খবর নেবে, ইনস্ট্রাকশন দেবে, তারপরও ইন্সপেকশনের জন্যে যেতে হয় তো একদিন-দুদিনের জন্য এয়ারে যাবে আসবে।

বাপীকে তাই করতে হয়। কর্ত্রীর হুকুম এখনও হুকুমই। কোম্পানির খরচে তেল পুড়িয়ে বাদশা ড্রাইভার তাকে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ছেড়ে দিয়ে আসে বা সেখান থেকে নিয়ে আসে। ট্রেনের চার-পাঁচ গুণ খরচা করে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে রাতারাতি বা একদিন-দুদিনের মধ্যে বাপীকে কাজ সেরে ফিরে আসতে হয়। কোনো কারণে ফিরতে দেরি হলে মহিলা খুব একটা জেরা করে না। কিন্তু মায়ের চোখের আড়ালে মেয়ে এসে ধমকাতে ছাড়ে না। দেরি হতে পারে বুঝলে বলে যেতে পারো না বা ফোনে জানাতে পারো না ? মুখ বুজে মায়ের ছটফটানি দেখলে আমার ভয় ধরে যায় বলেছি না তোমাকে ?

এই ধমক কানের ভেতর দিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছায় তার স্বাদ আলাদা। মহিলার এই নিরুত্তাপ নির্ভরতা বাপীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই বাঁধনটুকু বড় লোভনীয়। কোনো স্বার্থের দাঁড়িপাল্লায় এর ওজন হয় না।

দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রাতে খাবার টেবিলে বাপী সেদিন গম্ভীর মুখেই প্রস্তাব পেশ করল।—একবার কলকাতা যাওয়া দরকার।

খাওয়া ছেড়ে ঊর্মিলা বাপীর মুখখানা দ্রষ্টব্য ভাবছে। পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ কলকাতা যে এ-ব্যবসার স্বর্গভূমি, গায়ত্রী রাই সেটা কারো থেকে কম জানে না। এক বছর আগের প্ল্যানেও কলকাতার বাজার বড় লক্ষ্য ছিল তার। তখন যাচাইয়ের তাগিদও বাপীকে দিয়েছে। কিন্তু সেই আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই এখন। নিস্পৃহ মুখে জিগ্যেস করল, কেন ?

—দেখেশুনে আসি...।

এই কথায় প্রস্তাব নাকচ করে দিল।—যেতে হবে না। নিজে কিছু দেখতে-শুনতে পারছি না, আর বাড়িয়ে কাজ নেই। একা কত দিক সামলাবে—

ব্যবসার স্বার্থ দেখিয়েই বাপী জোর করতে পারত। বাগডোগরা থেকে আকাশে উড়লে কলকাতা পঞ্চাশ মিনিটের তো পথ মাত্র। কিছুই বলা গেল না ঊর্মিলার জন্য। ওর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝুলছে। চোখে দুষ্টুমি চিকচিক করছে।

পরে হালকা ভ্রূকুটি করে বলেছে, হঠাৎ কলকাতা যাবার তাগিদ কেন আমাকে খোলাখুলি বললে মায়ের কাছে একটু তদবির-টদবির করি—

বাপী গম্ভীর।—নিজের স্বার্থেই বলতে পারো।

অর্থাৎ, বাপীর কলকাতা যাওয়ার সঙ্গে ওরও নিষ্কৃতি লাভের যোগ। কিন্তু ওর কথা সাদা অর্থেও এমন লেগে যাবে যে সেটা কারো কল্পনার মধ্যে ছিল না। পরের তিন সপ্তাহের মাথায় ঊর্মিলার হৃদয়জগতে এমনি তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল যে বাপীকে কলকাতা পাঠানোর জন্য ও নিজেই উন্মুখ।

এক সকালের দিকে নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে বাপী দূরের ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়েছিল। পাহাড়টা খুব দূরে নয়, কিন্তু সকালের হালকা কুয়াশার দরুন দেখাচ্ছে অনেক দূরে। ওই রকমই কিছু একটা স্থির লক্ষ্য বাপীর, কিন্তু ভিতরের অস্থিরতার দরুন যেন ওটাও ঝাপসা আর নাগালের বাইরে।...জঙ্গলের নাংগা ফকির বলেছিল, আগে বাড়লে পেয়ে যাবে। বাপী থেমে থাকেনি, সামনে এগিয়েছে। অনেক পেয়েছে। অনেক পাচ্ছেও। কিন্তু এই পাওয়াই শেষ লক্ষ্য হলে ভেতরটা সুস্থির থাকত, সামনেটা এত ঝাপসা দেখত না। বিত্ত বৈভব নিশ্চয় চেয়েছিল। কিন্তু সব চাওয়ার মূলে এক মেয়ে। সব থেকে বেশি চেয়েছিল সেই মেয়েকে। এই চাওয়ার সঙ্গে এখনো কোনো আপোস নেই। কিন্তু এই ব্যাপারে বাপী কতটা সামনে এগিয়েছে ? কতটা আগে বেড়েছে ?

ভিতরের একটা অসহিষ্ণু তাপ ঠেলে মাথার দিকে উঠতে লাগল। গায়ত্রী রাইকে যা-হোক কিছু বলে বা বুঝিয়ে দুই একদিনের মধ্যেই কলকাতা যাবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর না।

নিজের ভাবনায় ছেদ পড়ল। সদর রাস্তা ছেড়ে ঊর্মিলা হনহন করে এই পিছনের মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে। হাঁপাচ্ছে বেশ। বাপীর তক্ষুনি মনে হল, নিশ্চয় ডাটাবাবুর

ক্লাবে গেছল। সেখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে বাতাস সাঁতারে ওর কাছে আসছে। পিছন দিক দিয়ে ঘুরে আসার একটাই অর্থ। মায়ের চোখে পড়তে চায় না। বাপীকে জানলায় দেখে থমকে দাঁড়াল একটু। ফিক করে হেসে ফেলল। লালচে মুখ। তারপর ছোট মেয়ের মতোই ছুট।

জানালা ছেড়ে বাপী সামনের বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শব্দ না করে গেট ঠেলে ঊর্মিলা লঘুছন্দের দ্রুততালে বারান্দায় উঠে এলো। মেয়ের মুখের এমন গোলাপী কারুকার্য দেখলে তার মায়েরও বড় রকমের সন্দেহ কিছু হতই। চোখে মুখে গালে ঠোঁটে খুশির বন্যা। উত্তেজনাও।

বাপী গম্ভীর।—বিজয় মেহেরা কবে ফিরছে?

হিসেবমতো আর মাস-খানেকের মধ্যে ফেরার কথা বিজয় মেহেরার। সেই সম্পর্কে পাকা খবর কিছু এসেছে বাপী নিঃসংশয়।

ঊর্মিলা থমকে দাঁড়াল। তারপর যা করল, এই উত্তেজনার মুহূর্তে ওর কাছে সেটা সংকোচের ব্যাপার কিছুই নয়। খুব কাছে এসে দু'হাতে বুকে একটা ধাক্কা মেরে আগে বাপীকে দরজার কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। বাপী পড়তে পড়তে সামলে নিল। ততক্ষণে ঊর্মিলাও ঘরের মধ্যে। আনন্দ আর বিস্ময়ের ধকলে দু'চোখ কপালের দিকে।—আর কবে-টবে নয়, বাবুর ফেরা সারা।

শুনে বাপীরও হঠাৎ ফাঁপরে পড়াব দাখিল।—সে কি! কবে? কোথায় আছে?

বলতে গিয়েও ঊর্মিলা থমকালো। লালচে মুখের ওপর আর এক প্রস্থ লালের ছোপ। গরম জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বার করে ওর সামনে ধরল।—পাজী ছেলের দু'চারটে দুষ্টুমির কথাটথা আছে, কিন্তু তোমার কাছে আবার লজ্জা কি—পড়ে দেখো কি কাণ্ড!

বাপী গম্ভীর আবার। দু'হাতে দুটো কাঁধে চাপ দিয়ে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। টেবিলের ছোট আয়নাটা তুলে মুখের সামনে ধরল।

ঊর্মিলা হকচকিয়ে গেল একটু।—কি?

—গাল দুটো ফেটে এবারে খুশির রক্ত বেরুবে মনে হচ্ছে। আয়না যথাস্থানে রেখে মুখোমুখি খাটে বসল।—আমার পড়ে কাজ নেই, তুমি বলো।

যা শুনল, যে-কোনো মেয়ের মায়ের কাছে সেটা লোভনীয় হবার কথা। আরো তিন মাস আগে ওখানকার হায়ার কোর্স-এ বিজয় মেহেরা ভালো ভাবে উতরে গেছে সেখবর আগেই এসেছিল। বুক ঠুকে সেখানকার এক মস্ত সংস্থায় ইন্টারভিউ দিয়েছিল। বম্বে আর কলকাতায় তাদের বিরাট শাখা। সেখান থেকে হোম-অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কলকাতায় উড়ে এসেছে সে। ও-ভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসতে পারার ফলে খাস সায়েবদের গ্রেডে মাইনে, তাদের মতোই আনুষঙ্গিক সব সুযোগ-সুবিধে। এছাড়া দু'বছরে একবার করে সপরিবারে হোমে ফেরার বা বাইরে বেড়ানোর ছুটি আর যাবতীয় খরচ-খরচা পাবে। কলকাতায় পা দিয়েই তাকে কাজে জয়েন করতে হয়েছে, আর শুরুতেই কাজের চাপ এত যে এয়ারে বাগডোগরা এসে ঊর্মিলার সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ারও ফুরসৎ মিলছে না। এবারে বিয়ের তাগিদ। আর সবুর করার ধৈর্য নেই। সব ব্যবস্থা পাকা করে তাকে জানালেই সে ছুটির ব্যবস্থা করবে আর দেশে তার বাবা-মা-

কেও চিঠি লিখে চলে আসতে বলবে।

উর্মিলা জিগ্যেস করল, এবারে?

সংকটই বটে। বাপী জবাব দিল, তাই তো ভাবছি...।

সঙ্গে সঙ্গে উর্মিলার সেই অবুঝ মেজাজ।—দু'বছরের ওপর তো বসে বসে শুধু ভাবলেই। এখন আর ভাবার সময় আছে?

বাপীর একটুও রাগ হল না। এই উদগ্রীব উৎকণ্ঠা দেখে বরং মায়া হচ্ছে। ভালও লাগছে। প্রেমের গাছে ফোটা একখানা সুন্দর ফুলের মতো মুখ উর্মিলার। সফল হবার বাসনায় অধীর, উন্মুখ। নিজের অদৃষ্টে যা-ই থাক, বাপীরও উদার হবার ইচ্ছে। চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল। জবাব দিল, একেবারেই নেই মনে হচ্ছে।

উর্মিলা আবারও মুখ-ঝাপটা দিল বটে কিন্তু অখুশি নয়।—এখনো যদি তোমার কানে জল না ঢোকে তাহলে এবারে আমি ঠিক এখান থেকে সটকান দেব বলে দিলাম।

—কোথায়...কলকাতায়?

আবার কোথায়। মুখের কথা খসার আগেই মনে পড়ল কিছু। উৎসাহের ঝোঁকে বসার চেয়ারটা আরো এক হাত কাছে টেনে আনার ফলে দুজনের হাঁটুর মাঝে চার আঙুলেরও কম ফারাক। সামনে ঝুঁকল।—এই। তুমি তো কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলে, কালই চলে যাও না।? যাবে?

—তোমার মা-কে কে রাজি করাবে, তুমি?

—আমি কেন, ব্যবসার কথা বলবে না, বলবে নিজের খুব দরকারী কাজে যাচ্ছ। তুমি চলে যাবার পর মা-কে যা বলার আমি সাফসুফ বলে দেব।

—সাফসুফ কি বলে দেবে?

—যা সত্যি তাই। মিষ্টি নামে এক মেয়ে ছেলেবেলা থেকে তোমার মন কেড়ে রেখেছে—তার সম্পর্কে কিছু খবর পেয়ে তুমি ছুটে চলে গেছ। ব্যস, এই এক চালে মা মাৎ। যাবে?

বাপী চেয়ে রইল খানিক।—ঠিক আছে। যাব।

এত সুবোধ এই ছেলে নয়।—সত্যি বলছ?

—হ্যাঁ, তবে আমি ভেবেছিলাম বিজয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতে বলছ।

উর্মিলা কলে পড়ছে বুঝতে পারছে।—বা রে, তার সঙ্গে দেখা তো করতেই হবে, তা না হলে তোমাকে যেতে বলব কেন।

বাপীর নীরস মুখ, গলার স্বরেও তপ্ত ব্যঙ্গ ঝরল।—নিজের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রেখে মাকে গরম তেলের কড়ায় ফেলে মা-কে তুমি মাৎ করতে চাও, এটুকু বুঝতে আমার খুব অসুবিধে হয়নি।

উর্মিলা অপ্রস্তুত একটু। তাই চড়া গলা।—তোমার অত ভয়টা কিসের? মায়ের ছেলে নেই, তুমি গুটিগুটি দিব্বি ছেলের জায়গাটি জুড়ে বসেছো এখন—আমাকে ছাড়া যদিও চলে, তোমাকে ছাড়া আর তার চলেই না—সাহস করে সত্যি কথাটা বলে দিলে মা তোমার কি করবে?

একটা নরম জায়গায় মোচড় পড়ল। উর্মিলার কথাগুলো সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করার মতো। এটুকুর প্রতি বাপীর কত যে লোভ শুধু সে-ই জানে। উর্মিলা জোরের

কথা বলছে, কিন্তু এটুকু হারাবার ভয়ও যে কত, ওর কোনো ধারণা নেই।

শিরে সংক্রান্তি। ভয় ছেড়ে বাপী জোরের দিকটাই আঁকড়ে ধরল। রাতে খাবার টেবিলে গম্ভীর। ঊর্মিলার মুখেও কোনো কথা নেই। এমন চুপচাপ ভাবটা খুব স্বাভাবিক ঠেকল না গায়ত্রী রাইয়ের চোখে। একজনের ঝাঁঝ দেখে আর অন্যজনের টিপ্পনী শুনে অভ্যস্ত। থেকে থেকে দুজনকেই লক্ষ্য করল। কিন্তু জিগোস করল না।

খাওয়ার পরে গায়ত্রী রাই আগে ব্যবসার কোনো ফাইল-টাইল খুলে বসত, নয়তো দরকারী চিঠিপত্র লিখত। এ-কাজ অনেকদিন ছেড়েছে। এখন ঘুম না আসা পর্যন্ত বই-টই পড়ে। বিছানায় আধশোয়া হয়ে পাশ থেকে বইটা টেনে নেবার আগেই বাপী ঘরে ঢুকল। হাতের বই রেখে গায়ত্রী রাই আবার সোজা হয়ে বসল। অপ্রিয় কিছু শোনার আশঙ্কা।

বাপীর তেমনি ঠাণ্ডা মুখ।—কাল আমি একবার কলকাতা যাচ্ছি।

বক্তব্য শুনে স্বস্তি একটু। বিস্ময়ও। খানিক চেয়ে থেকে জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার ?

জবাব দেবার আগে বাপী দরজার দিকে ঘুরে তাকালো একবার। কেউ নেই। ঘরে ঢোকার সময় ঊর্মিলা দেখেছে। কোথাও থেকে আড়ি পেতে শুনছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাপী সোজাসুজি বলল, বিজয় মেহারা লণ্ডন থেকে ফিরেছে। যতটা আশা করেছিল তার থেকেও বড় হয়ে ফিরেছে, কলকাতায় বড় চাকরি নিয়ে এসেছে। একবার গিয়ে দেখেশুনে বুঝে আসা দরকার।

আচমকা প্রচণ্ড একটা ঘা খেলে যেমন হয় প্রথমে সেই মুখ গায়ত্রী রাইয়ের। বিবর্ণ, সাদা। সেই সাদার ওপর রাগের লালচে আভা ছড়াতে লাগল। গলার স্বর অনুচ্চ তীক্ষ্ণ। —কে বিজয় মেহেরা ? সে কত বড় হয়েছে বা কত বড় চাকরি নিয়ে এসেছে তা দিয়ে আমার কি দরকার?

কোনরকম উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই বলেই বাপীর জবাবটা জোরদার শোনালো আরো। বলল, দরকার আছে। দু-তিনদিনের মধ্যে ফিরে এসে আপনাকে বলব। আপনাকে শুধু বিশ্বাস করতে হবে, আপনার বা ডলির কোনরকম ক্ষতির মধ্যে আমি যাব না—যেতে পারি না। উতলা হয়ে শরীর খারাপ করবেন না, বা আমি ফিরে আসার আগে এ নিয়ে ডলির সঙ্গে একটি কথাও বলবেন না।

গায়ত্রী রাই নির্বাক। চেয়ে আছে। এ-ছেলেকে বিশ্বাস করতে না পারলে পায়ের নিচে মাটি থাকে না। এ-কথা শোনার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত। কিছুটা আশ্বস্ত। অশান্তি যা-কিছু তার সবটাই নিজের মেয়েকে নিয়ে, এই ছেলেকে নিয়ে নয় এ-বিশ্বাসও অটুট। কলকাতায় যাতায়াতটা মেয়েকে ঠাণ্ডা করার জন্য বা অন্য কোনোরকম বোঝাপড়া করার জন্য ধরে নিয়ে আর জেরাও করল না।

বাপী বেরিয়ে এলো। সামনের বারান্দায় ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে। রাগত মুখ। বন্ধুর ঘাড়ে দায় চাপিয়ে কিছুটা নিষ্কৃতি পাবে ভেবেছিল, উল্টে সব দায় কিনা ওর নিজের ঘাড়ে চাপল। রাগ হবারই কথা।

কিন্তু বাপীর গাম্ভীর্যে ফাটল নেই এখনো। বলল, বিজয়ের আপিস আর বাড়ির ঠিকানা লিখে কোয়েলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। ভালো যদি চাও তোমার মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে একটি কথাও বলবে না. তিনি যেন ভাবেন তুমি কিছু জানোই না। আর তাঁর

শরীরের দিকে চোখ রাখবে।

বিকেল চারটের ফ্লাইট। মোটরে বানারজুলি থেকে বাগডোগরা দেড় ঘণ্টার পথ। বাদশার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে সোয়া ঘণ্টার বেশি লাগে না। কিন্তু বাপী দেড়টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত।

ঊর্মিলা ঘরের ভিতর। তার মা বারান্দায়। এই বাংলোর ফটকে বাদশা গাড়ি নিয়ে তৈরি।

গায়ত্রী রাই বলল, যাচ্ছ যখন দু'চার দিন বেশি থেকে কলকাতার বাজারটাও দেখে আসতে পারো।

এ-রকম কথা বাপী শিগগীর শোনেনি। ফিরতে দেরি হবার সম্ভাবনার কথা শুনলেই বেজার মুখ দেখেছে।

—টাকা যথেষ্ট নিয়েছ ?

—হ্যাঁ, সে-জন্যে ভাববেন না।

—তবু যদি দরকার হয় হোটেলের ঠিকানা দিয়ে টেলিগ্রাম কোরো। ঘরেই অনেক টাকা মজুত আছে...তেমন দরকার বুঝলে আবু রব্বানী এরোপ্লেনে করে গিয়ে দিয়ে আসবে।

দুয়ে দুয়ে চার যোগ হল এবার। কলকাতার বাজার দেখার জন্য দু'চার দিন বেশি দেরি হলে আপত্তি নেই, তার মানে, যে-ফয়সলার জন্য যাচ্ছে তাতে আরো বেশি সময় লাগলে লাগবে। আর নিষ্পত্তিটা শেষ পর্যন্ত যদি মোটা টাকার টোপ ফেলে করতে হয় তাতেও কোনো অসুবিধে নেই।

হন্তদন্ত হয়ে বাংলো থেকে নেমে বাপী গাড়ীতে উঠে বাঁচল। এই একজনকে কোন রকম ভাঁওতার মধ্যে রাখতে চায় না। অথচ নিরুপায়।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে বসল বাপী। প্লেন ছাড়তে ঢের দেরি এখনো। সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে রইল খানিক। স্নায়ুর ওপর দিয়ে একটানা ধকল যাচ্ছে। চার বছর বাদে আবার সেই কলকাতায় উড়ে চলল বটে, কিন্তু ভিতরটা তার ঢের আগে থেকে অনির্দিষ্টের মতো উড়ে চলেছে। কোথাও ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছে না। ঊর্মিলার সমস্যার নিষ্পত্তি কোথায় জানে না। নিজের তো জানেই না।

মাইকে একটা ঘোষণা শুরু হতে বাপী মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। না, কলকাতার ফ্লাইট সম্পর্কে কিছু নয়। ঘাড় ফেরাতে গিয়ে বাপী বড়সড় ঝাঁকুনি খেল একপ্রস্থ। ঠিক দেখছে, না ভুল দেখছে ?

পাশের দিকের পনের-বিশ হাত দূরে আর একটা সোপায় একটি মেয়ে বসে। বছর বাইশ-তেইশ হবে বয়েস। দীর্ঘাঙ্গী, ফর্সা। নাকে জেল্লা-ঠিকরনো সাদা পাথরের ফুল। সোজা হয়ে বসে ওকেই দেখছে, ওর দিকেই অপলক চেয়ে আছে।

নাকের এই ঝকঝকে ফুল দেখেই বাপী চিনেছে। ড্রইং-মাস্টার ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম। চার বছর আগে বানারজুলিতে ডাটাবাবুর ক্লাবে দেখেছিল। তারপর এই দেখল। চেহারা বদলায়নি তেমন। দোহারা কাঠামো একটু ভারির দিকে ঘেঁষেছে। আর একটু ফর্সা লাগছে। হাতে আগের মতো একগাদা কালো চুড়ি নেই। এক হাতে একটি সৌখিন ঘড়ি। অন্য হাতে সরু রুলি একগাছা। তাইতে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। পরনে

আকাশী রঙের সিল্কের শাড়ি।

সঙ্কোচ কাটিয়ে কুমকুমই উঠল। ঠোঁটের ফাঁকে বিব্রত হাসির রেখা। কাছে এসে বলল, এবারে চিনতে পেরেছ তাহলে বাপীদা।

বাপী মাথা নাড়ল, চিনেছে।

—আমি সেই থেকে তোমাকে দেখছিলাম...ভরসা করে সামনে আসতে পারছিলাম না।...বসব?

বাপী মাথা নাড়তে সামনের সোফাটাতে বসল। আজ বোধ হয় ভয় করার মতো সঙ্গে কেউ নেই। সহজ খুশি-খুশি মুখ। কিন্তু সামনে বসার পর এই খুশি ভাবটা অকৃত্রিম মনে হল না বাপীর। তবে মেয়েটার শ্রী এ ক'বছরে ফিরেছে।

বাপী উল্টে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কেন জানে না। জিগ্যেস করল, কেমন আছ?

হালকা জবাব দিল।—ভালো থাকতে তো চেষ্টা করছি খুব।...ভালো দেখছ?

—ভালোই তো। ব্রীজমোহনের খবর কি?

ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু।—এতদিন বাদেও ওই নাম মনে আছে তোমার! ভালোই আছে বোধ হয়, অনেককাল দেখিনি।

বাপীর কিছু জানতে বুঝতে বাকি নেই এটা ধরেই নিয়েছে। নইলে গোপনতার আশ্রয় নিত। একটা তিক্ত অনুভূতি ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে বাপীর। এ ক'বছরে আরো কত ব্রীজমোহন এই মেয়ের জীবনে এসেছে গেছে জানার কোনো কৌতূহল নেই।

একটু সামনে ঝুঁকে কুমকুম সাগ্রহে জিগ্যেস কবল, তুমি কলকাতা যাচ্ছ বাপীদা?

—হ্যাঁ।...তুমি কোথায়?

জবাব দেবাব আগে কুমকুম আর এক প্রস্থ দেখ নিল তাকে। ওরা প্রাচুর্যেব গন্ধ পায় বোধ হয়। কার কেমন দিন চলছে মুখ দেখেই বুঝতে পারে হয়তো। কিন্তু জবাব শুনে বাপী অবাকই একটু।

—আমি আজ দুমাস ধরে কলকাতা যেতে চেষ্টা করছি। হচ্ছে না...। বোধগম্য হল না বুঝে কুমকুম অনায়াসে বলে গেল, এখানকার অফিসারদের সপরিবারে হাওয়া-জাহাজে যাতায়াত করতে পয়সা লাগে না—একজন আমাকে কথা দিয়েছে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুতে তার সময় হচ্ছে না, আমি মাসে মাসে খবর নিতে বা তাগিদ দিতে আসি এখানে।

শোনামাত্র বাপীরই কান গরম। একজন ওকে পরিবার সাজিয়ে বিনা পয়সায় কলকাতায় নিয়ে যাবে সেই আশায় দু'মাস ধরে এখানে ধর্ণা দিচ্ছে। বিনিময়ে ওকে কি দিতে হচ্ছে বা হবে ভাবতে ভিতরটা বি-রি করে উঠল। কিন্তু সেই চার বছর আগের মতোই মেয়েটার দু'চোখ চিকচিক করছে। গলার স্বরেও অদ্ভুত অনুনয়।—আমাকে একবারটি কলকাতায় নিয়ে যাবে বাপীদা? আমার যাওয়া খুব দরকার।

বাপী কিছু ভোলে না। চার বছর আগেও ব্যগ্র মুখে এই মেয়ে জিগ্যেস করেছিল, কলকাতা কেমন জায়গা বাপীদা?

মুখে কঠিন আঁচড় পড়তে লাগল বাপীর। চাউনিটাও সদয় নয়। হাতের চকচকে ঘড়ি আর রুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার ওর দিকে তাকাতেই কুমকুম বলে উঠল, এটা খেলনা ঘড়ি বাপীদা, পাঁচ টাকাও দাম নয়, আর এই গয়নাও সোনার নয়, গিল্টি করা—সত্যি বলছি বাপীদা, নিজে যেতে পারলে আমি কারো আশায় বসে থাকতাম

না—আমার যাওয়া খুব দরকার।

নীরস স্বরে বাপী জিগ্যেস করল, কেন দরকার?

ঢোঁক গিলে কুমকুম জবাব দিল, আমার ধারণা কলকাতায় গেলে বাবার সঙ্গে দেখা হবে।

বাপীর একটুও বিশ্বাস হল না। আরো রুক্ষ স্বরে বলল, কলকাতা সোনার শহর, কোনরকমে গিয়ে একবার সেখানে পা ফেলতে পারলেই আর ভাবনা নেই—কেমন?

চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে তিরস্কারটুকু মেনেই নিল যেন। কাতর সুরে বলল, ভাবনা তো ছায়ার মতো আমার সঙ্গে ফেরে বাপীদা, তার থেকে রেহাই পাব কি করে। ...সকলেই আমাকে ঘৃণা করে, তুমি চেনো বলে তোমার ঘেন্না আরো বেশি বোধ হয়। কিন্তু বাপীদা, যা-ই হই, আমি তোমার সেই মাস্টারমশায়ের মেয়ে—এই জন্যেও কি তুমি আমাকে একটু দয়া করতে পারো না?

বুকের তলায় উল্টো মোচড় পড়ল। যে মুখখানা চোখে ভাসল, আশ্চর্য...সেই মুখ আজও তেমনি কাছের। বাপী ভাবল একটু, তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, কাজ পেলে করবে?

অবাক হবার মতোই প্রশ্ন যেন।—কি কাজ?

—যে কাজ করছ তার থেকে অনেক ভালো। নিজের জোরে নিজেকে চালাবে, কারো লোভ বা দয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে না। করবে?

এমন প্রস্তাবও কেউ দিতে পারে মেয়েটা ভাবতে পারে না। নিজের অগোচরেই সামান্য মাথা নাড়ল। করবে।

ব্যাগ থেকে একটা ছাপানো কার্ড বার করে বাপী ওর হাতে দিল।—আট-দশদিন বাদে বানারজুলিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

বসে আরো দশ-পনের মিনিট কথা বলার মতো সময় ছিল হাতে, কিন্তু বাপী উঠে পড়ল। আর ফিরেও তাকালো না। ঝোঁকের বশে কাজটা ভালো করল, কি মন্দ করল জানে না বলেই নিজের ওপর অসহিষ্ণু। আসে যদি রেশমার জায়গায় বসিয়ে দিতে পারবে।...রেশমার সঙ্গে এই মেয়ের কোনো তুলনাই হয় না। রেশমা দু'জন হয় না। ওর কথা মনে হলে একটা ব্যথা হাড়ে-পাঁজরে টনটন করে বাজে। বুকের ভিতরে বাতাসের অভাব মনে হয়। না, রেশমার মতো আর কেউ আসবে না, আসতে পারে না। চৌকস মেয়ে দুই একজন দরকার। কুমকুম আসে তো আসবে। এতটুকু বেচাল দেখলে বা সততার অভাব দেখলে ছেঁটে দিতে বাপী একটুও দ্বিধা করবে না।

ভিতরটা বিরক্তিতে ছেয়ে আছে তবু। একটা অনিশ্চয়তার পাহাড় নিজের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। কলকাতায় ছুটেছে বটে, কিন্তু ওটা শেষ পর্যন্ত কতটা নড়বে কতটা সরবে জানে না। তার মধ্যে মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের এই দেহ-পসারিনী মেয়ের সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ মোটেই শুভ লক্ষণ ভাবতে পারছে না।

কিন্তু দমদম এয়ারপোর্টে নামার দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত সত্তা দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো কত বড় বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল জানে না। ঘড়ি ধরে চারটে পঞ্চাশ ওর ডাকোটা ল্যান্ড করেছে। ঠিক পাঁচটায় বাপী বাইরের বিশাল লাউঞ্জে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বিজয় মেহেরার ঠিকানার সঙ্গে ঊর্মিলা তার আপিসের টেলিফোন

নম্বরও লিখে দিয়েছে। একটা ফোন করতে পারলে এখনও হয়তো তাকে আপিসেই পাবে। পেলে এই রাতেই হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলবে। চৌরঙ্গী এলাকায় সব থেকে নাম-করা অভিজাত হোটেলে উঠবে তাও ঠিক করে রেখেছিল।

লাউঞ্জের সামনের দিকে ছোট বড় অনেকগুলি এয়ার অফিসের কাউন্টার। সবই বে-সরকারী সংস্থা তখন। টেলিফোনের খোঁজে বাপী পায়ে পায়ে সেদিকে এগলো।

তখনি সেই অভাবিত বিস্ময়। পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। শীতের শেষের সন্ধ্যায় আলোয় আলোয় বিশাল লাউঞ্জের এ-মাথা ও-মাথা দিনের মতো সাদা। সেই আলো হঠাৎ শতগুণ হয় বাপীর চোখের সামনে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

অদূরে এক নামী এয়ার অফিসের ঝকঝকে কাউন্টারের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বাইরের কোনো যাত্রীর সঙ্গে কথা কইছে যে মেয়ে তাকে দেখেই বাপীর দুচোখের ডেলা বেরিয়ে আসার দাখিল। তাকে দেখেই এমন দিশেহারা বিস্ময়। কাউন্টারের সামনের দিকে একটা বোর্ডে লেখা 'ইনফরমেশন'।

তার ও-ধারে দাঁড়িয়ে মিষ্টি।

বাপী ভুল দেখছে না। মিষ্টি। মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি!

পরনে ধপধপে সাদা শিফন সিল্কের শাড়ি। গায়ে জেল্লা-ঠিকরনো সাদা ব্লাউজ। শাড়ির ওপর বাঁ-দিকের কাঁধে এয়ার অফিসের কালো ব্যাজ। কপালে কুমকুমের ছোট টিপ। এই বেশে আর এই আলোয় এমন ধপধপে ফর্শা দেখাচ্ছে ওকেও। সব মিলিয়ে সাদা আলোয় গড়া রমণী অঙ্গের কপালে শুধু এককোঁটা লালের কৌতুক।

যাত্রীটি তার জ্ঞাতব্য খবর জেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চলে গেল। হাসি মুখে পাল্টা সৌজন্য জানিয়ে ওই মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাথা নিচু করে তার কাজে মন দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা আনন্দের ঢেউ এসে বাপীকে যেন মাটি থেকে চার হাত ওপরে তুলে ফেলল। মাঝের সিঁথি মসৃণ সাদা। সেখানে কোনো রক্তিম আঁচড় নেই।

বাপী বুক ভরাট করে বাতাস নিল প্রথমে। তারপর খুব নিঃশব্দে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল।

—ইয়েস প্লীজ? রাঙানো ঠোঁটে অভ্যস্ত হাসি ফুটিয়ে ও-ধারের মেয়ে মুখ তুলল।

হাতে ট্রাভেল সুটকেস, কাঁধে দামী গরম কোট, বাপী সোজা দাঁড়িয়ে তার দিকে শুধু চেয়ে রইল।

প্রথমে ওই মেয়ের ভুরুর মাঝে সুচারু ভাঁজ পড়ল একটু। তারপরেই অভাবিত কাউকে দেখার ধাক্কায় সেও হকচকিয়ে গেল কেমন। তারপর একটু একটু করে বিস্ময়ের কারুকার্যে সমস্ত মুখ ভরাট হতে লাগল।

বাপী চেয়েই আছে।

মিষ্টিও।

কথা বাপীই প্রথম বলল। বলল, ঠিক দেখছি?

স্থির জলে ছোট্ট একটা ঢিল ফেললে তলিয়ে যেতে যেতে ওটা ওপরে ছোট একটা বৃত্ত-তরঙ্গ এঁকে দেয়। তারপর সেই ছোট তরঙ্গ বড় হয়ে ছড়াতে থাকে। ছোট কটা কথা সামনের চারুদর্শনার মন-সরোবরে তেমনি টুপ করে ডুবল। পাতলা দুই ঠোঁটের

ফাঁকে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তারপর সেটুকু সমস্ত মুখে ছড়াতে থাকল। বাপী হলপ করে বলতে পারে, এ কোন ইনফরমেশন কাউন্টারে দাঁড়ানো সুদর্শনার পেশাদারি সৌজন্যের হাসি নয়।

মিষ্টিও ঠিক তেমনি করে ফিরে জিগ্যেস করল, আমি ঠিক দেখছি?

কান আর এর থেকে বেশি কেমন জুড়োয় মানুষের বাপী জানে না। দুজনের বিস্ময় দু'রকমের। গেজেটের পাতায় নাম দেখতে না পাওয়ার ফলে যাকে নিয়ে এত ভাবনা-চিন্তা এত বিশ্লেষণ, আকাশ থেকে মাটিতে নেমেই তাকে এয়ার অফিসের ইনফরমেশন কাউন্টারে দেখতে পাবে এ কোনো সুদূর কল্পনার মধ্যে ছিল না বলেই বাপীর বুকের তলায় এমন তোলপাড় কাণ্ড। নইলে চার বছর আগে যে মিষ্টিকে দেখেছিল এ-ও সেই মিষ্টি। এখানে এই বেশে আর এই পরিবেশে আগের থেকেও একটু বেশি চকচকে আর ঝকঝকে দেখাচ্ছে, তফাৎ শুধু এইটুকু। কিন্তু মিষ্টির চোখে তফাৎটা যে ঢের বেশি বাপীর আঁচ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। চার বছর আগে যাকে দেখেছিল তার পরনে সাদামাটা পাজামা পাঞ্জাবি, টালির বস্তির এক খুপরি তার বাস, ব্রুকলিন আপিসের এক বড়বাবুর মেয়েকে নাকচ করার ফলে লোয়ার ডিভিশনে কেরানীর চাকুরিটুকুও তার খোয়া গেছে। চার বছর আগের সেই ভেসে বেড়ানো ছেলে বুক ঠুকে ওকে বলেছিল, লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হওয়াটা যেমন তাব অদৃষ্ট নয়, বস্তিতে থাকাটাও তেমনি আর বেশি দিনের সত্যি নয়। টনটনে আবেগে ঘোষণা করেছিল, সব বদলাবে, একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে —মিষ্টি চাইলেই হবে।

...এয়ার পোর্টে পুরুষের এই বেশে এই মূর্তিতে ওকে দেখে সেই বদলানোর ধাক্কাটাই মিষ্টির কাছে বড় বিস্ময়। দেখামাত্র আর চেনামাত্র কেমন করে বুঝেছে অনেক বড় হয়েছে, অনেক বদলেছে, অনেক অন্য রকম হয়েছে। বাপীর আরও আনন্দ, এই বিস্ময়ের সঙ্গে খুশির মিশেলও তেমনি স্পষ্ট। সকলের চোখের ওপর এভাবে চেয়ে থাকাটা যে কোন মেয়ের কাছে অস্বস্তিকর। ওর দিকে তাকিয়ে যেতে-আসতে কাছে-দূরের কত পুরুষের জোড়া-জোড়া চোখ সরস হয়ে উঠছে বাপী আর কোন দিকে না চেয়েও আঁচ করতে পারে।

মৃদু হেসে বলল, দুজনেই ঠিক দেখছি বোধ হয়।

কোন মেয়ের যদি কোন ছেলেকে দেখামাত্র সুপুরুষ মনে হয় তো সেটা সেই ছেলের চোখেই সবার আগে ধরা পড়ে। চার বছর আগে যখন কলেজে পাজামা পাঞ্জাবি পরা ছেলেবেলার দুরন্ত সঙ্গীকে প্রথম দেখেছিল বা চিনেছিল, তখনও এই মেয়ের চোখে সুপুরুষ দেখার প্রসন্ন বিস্ময় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল বাপীর মনে আছে। সেটুকুই এখন আরও স্পষ্ট।

হাসিমাখা দু'চোখ ওর মুখের ওপর রেখে মিষ্টি মুখেও বলল, আমি ঠিক দেখছি কিনা এখনো বুঝছি না। তুমি কোথাও থেকে এলে, না কোথাও যাচ্ছ?

—আমি বানারজুলি থেকে মিষ্টির কাছে এসেছি।

এতদিন বাদে দেখা হওয়ার এটুকু সময়ের মধ্যে এই লোক আবার এমন বেপরোয়া কথা বলবে ভাবেনি। বিশেষ করে লেকের ধারের সেই অপমান আর হেনস্থার পর। আজ যদি ওকে এখানে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যেত তাহলে অস্বাভাবিক কিছু হত

না। কিন্তু স্বভাবিক পথে চলা যে ধাত নয় তাও মিষ্টির থেকে বেশি আর কেউ জানে না। মুখে সুচারু বিড়ম্বনা। কথাগুলো নাকচ করার সুরে বলল, আমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে তুমি জানতে?

—এখানে দেখা হবে জানতাম না। কোথাও দেখা হবে জানতাম।...এখানে আর কতক্ষণ কাজ তোমার?

—ছটা পর্যন্ত। হেসেই সামনের কাগজগুলো দেখালো।—তার মধ্যেও সারতে পারব মনে হয় না।

বাপী হাসছে মৃদু মৃদু। ওর হাতের মুঠো আর যে ঢিলে হবার নয় সেটা এই মেয়ে কি করে জানবে। বলল, তার মানে আমাকে বিদেয় হতে বলছ?

বানারজুলির দশ বছরের ফোলা-গাল ঝাঁকড়া-চুল নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে কত সময় মুখের ওপর ঝাঝিয়ে উঠে ওকে বিদেয় করতে চেয়েছে। এই মিষ্টি চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিল, বিদেয় করতে চাইলেও বিদেয় হবে বলে মন হয় না। মুখে বলল, না তা বলছি না—

বাপী মুখের কথাটুকুই আঁকড়ে ধরল তক্ষুনি।—হাতের কাজ তাহলে আজ না সারলেও চলবে?

চার বছর আগে ঠিক এমনি অনুরোধে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে আসার কথা মনে পড়ল মিষ্টিব। চোখে চোখ, ঠোঁটে হাসি। অল্প অল্প মাথা দুলিয়ে বলল. এ কি কলেজ যে বেরিয়ে পড়লেই হল—চাকবি না?

—তাহলে কাজ সারো, দেখ কত তাড়াতাড়ি হয়। আমি বসছি।

ব্যাগ হাতে লম্বা পা ফেলে বিশ গজ দূরের লাউঞ্জে একটা সোফায় গিয়ে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মিষ্টি তার দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু এখনও ধরা আছে। পুরুষের গাম্ভীর্যে নিজের হাতঘড়িতে সময় দেখল। পাঁচটা পনেব।

মিনিট দশের মধ্যেই একটা লোক ঝকঝকে পেয়ালা প্লেটে চা এনে ওব দিকে বাড়িয়ে দিল। বাপী বুঝেও জিগোস করল, চা কে পাঠাল?

লোকটা অদূরের ইনফরমেশন কাউন্টার দেখিয়ে দিল। মিষ্টি এখন এদিকেই চেয়ে। চোখোচোখি হতে মাথা নিচু করে কাজে মন দিল।

চা খেতে খেতে বাপী ঘুরে-ফিরে ওকেই দেখছে। সোজাসুজি চেয়ে থাকার লোভ সামলাতে হচ্ছে। একটু পরে-পরেই কেউ এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াচ্ছে। ফ্লাইট বা আর কিছুর খোঁজখবর নিয়ে চলে যাচ্ছে। মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে পেশাদারী সৌজন্যের হাসিটুকু এখন অন্য রকম। বাপীর মনে হচ্ছিল এই মেয়েকে দেখেই হয়ত বেশির ভাগ লোকের কিছু না কিছুর খোঁজ নেওয়াটা দরকার হয়ে পড়ছে। নইলে সে যখন ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তো একজনও আসে নি।

যত দেখছে, বাপীর ভেতরটা লুব্ধ হয়ে হয়ে উঠছে। শিগগীর এমন হয় নি। অনেক, অনেক দিন ধরে প্রবৃত্তির এদিকটার ওপর একটা শাসনের ছড়ি উঁচিয়ে বসে ছিল। তার অস্তিত্ব কখনো ভোলে নি বলেই আষ্টে-পৃষ্ঠে তাকে শেকলে বেঁধেছিল।...ভুটানের পাহাড়ের বাংলোয় খসখসে গালচেয় নাক মুখ কপাল ঘষে ছাল তুলে লোভাতুরকে শায়েস্তা করেছিল, তারপর উদভ্রান্ত যৌবনের ডালি রেশমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে প্রায়

অমোঘ রসাতলের গহ্বর থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছিল। ঊর্মিলার উষ্ণ ঘন সান্নিধ্যে এসেও তার থেকে অনেক সহজে ওই অন্ধ অবুঝকে শাসনের লাগামে বেঁধে রাখতে পেরেছে। সব পেরেছে এই একজনের জন্য। এই একজনের প্রতীক্ষায়। অথচ চার বছর আগেও এই মেয়েকে যখন কাছে পেয়েছিল, আর ভেবেছিল খুব কাছে পেয়েছে—তখনও চোখে ঠিক এই লোভ চিকিয়ে ওঠে নি। রেস্তরাঁয় মুখোমুখি বসে তাকে লোভের দোসর ভাবতে চায় নি। তার থেকে ঢের বেশি কিছু ভাবতে ইচ্ছে করেছিল।

আজ নিজেকে বশে রাখার তাগিদ নেই। প্রবৃত্তির ওপর ছড়ি উঁচিয়ে বসার চেষ্টাও নেই। চার বছর আগে বড় বেশি বোকা হয়ে গেছল। আবেগের দাস হয়ে পড়েছিল। তার থেকে ঢের বেশি বাস্তবের রাস্তায় হাঁটত বানারজুলির চৌদ্দ বছরের বাপী। দখল বজায় রাখার জন্য সে হিংস্র হতে পারত। চৌদ্দ বছর বয়েসের সেই সত্তাই আজ ছাব্বিশের প্রান্তে এসে দ্বিগুণ পুষ্ট। দ্বিগুণ সংকল্পবদ্ধ। এই সংকল্পে লোভ আছে ক্ষুধা আছে বাসনা আছে কামনা আছে। বাপী এই সব নিয়েই বসে আছে। দেখছে।

ঘড়িতে ছটা বাজতে কুড়ি। সন্তর্পণে উঠল। মিষ্টির সামনে এখন দুজন মাঝবয়েসী মানুষ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে। প্রায় তিরিশ গজ সামনে এগনোর পর পাবলিক টেলিফোন পেল। রিসিভার তুলে চৌকো দো-আনি ফেলে অপারেটারের গলা পেল। কিন্তু বাপী নম্বর জানে না, তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। হোটেলের নাম বললে যে কোনো অপারেটার কানেকশন দিয়ে দেবে। দিল।

চৌরঙ্গী এলাকার সব থেকে অভিজাত হোটেলে একটা ভাল সুইট বুক করে ফিরে এলো। কাউন্টারের ওধারে মিষ্টি তার দিকেই চেয়ে আছে। লাউঞ্জের চেয়ারের দিকে বাপীর পা আর এগোল না। দাঁড়িয়ে গেল।

সামনের কাগজপত্র সব তুলে নিয়ে মিষ্টি ভিতরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য প্রায় আট-ন মিনিটের জন্য। বাপী সেই খোলা দরজার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টির ওভাবে লক্ষ্য করার মধ্যে গভীর অভিব্যক্তি কিছু আছে, কিন্তু দু-চার লহমায় সেটা ধরা গেল না।

—চলো।

বাপী চমকেই পাশে তাকালো। ওদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মিষ্টি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। খুশিমুখে বাপী ঘড়ি দেখল। ছটা বাজতে দু মিনিট বাকি—হয়ে গেল?

—হয়ে গেল না। একজনের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে এলাম।

বাপী হাসল।—তোমার দায় নেবার জন্য কে আর না ঘাড় পেতে দেবে।

—এসো।

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ফিরে তাকালো না। সামনে এগলো। ও-দিক থেকে একজোড়া সাদা চামড়ার মেয়ে-পুরুষ এদিকে আসছে। পুরুষের এক হাত সঙ্গিনীর কাঁধ বেষ্টন করে আছে। জোড়ালো পুরুষের মত মাঝের চারটে বছর একেবারে মুছে ফেলার তাগিদ বাপীর। তার আগের আটটা বছরও। মিষ্টি বাঁ পাশে। বাপীর হাতে সুটকেস। বাঁ কাঁধের কোটটা ডান দিকে চালান করল। তারপর দ্বিধাশূন্য বাঁ হাত মিষ্টির বাঁ কাঁধে।

চলা না থামিয়েও মিষ্টি থমকেছে একটু। মুখও ওর দিকে ঘুরেছে। বাপীর দৃষ্টি

অদূরের দরজার দিকে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিকই করেছে। বারো বছর আগের সেই দুরন্ত দস্যির হাতে পড়ার মত মুখ অনেকটা। অস্বস্তি সত্ত্বেও কিছু বলল না—অথবা বলা গেল না।

—এরোড্রোম থেকে এত পথ ভেঙে রোজ বাড়ি ফেরো কি করে?

—কোম্পানির গাড়িতে।

—নিয়ে আসে দিয়ে আসে?

—হ্যাঁ।

বাইরে এলো। সামনের আঙিনা পেরিয়ে বিশ-তিরিশ গজ দূরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। তেমনি কাঁধ বেষ্টন করেই সেদিকে চলল। অস্বস্তির কারণেই হয়ত মিষ্টি গম্ভীর। কিন্তু কিছু না বলাটা যে তারও জোরের দিকই, বাপী সেটা অস্বীকার করছে না। এই জোরের ওপর জবর দখলের স্পর্শে ভিতরটা আরও বেপরোয়া। কোন কবিতায় না কোথায় যেন পড়েছিল, রমণীর মন জোর করে জয় করে নেবার জিনিস।

মিষ্টি এবার বলল কিছু। আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি এর মধ্যে বাইরে-টাইরে থেকে ঘুরে এসেছ নাকি?

—না তো।

—বানারজুলিতেই ছিলে?

—হ্যাঁ, কেন?

—অত সহজে কাঁধে হাত উঠে আসতে ভাবলাম বিদেশ-টিদেশ গিয়ে ব্যাপারটা রপ্ত করে এসেছ।

হুল ফুটিয়ে এত সুন্দর করে এমন কথা সকলে বলতে পারে না। ফলে লোভ আরও দুর্বার হয়ে উঠল। ছিঁচকে লোভ নয়, পুরুষের লোভ। কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, আর বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিশ্বাস করে এই মেয়ে হয়তো এরপর ওর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে চাইবে না। হেসেই কাঁধ থেকে হাত নামালো। কিন্তু মুখের উক্তি কম মোক্ষম নয়। বলল, না...বারো বছর আগে রপ্তটা শুধু একজনের ওপর দিয়েই হয়ে আছে।

মিষ্টি ঘুরে তাকালো একবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। কৌতুকের স্মৃতি কিছু নয়, অবুঝপনা দেখেও সহিষ্ণু মেয়ের নিজেকে আগলে রাখতে পারার মত হাসির আভাস একটু। বলল, দু দিক থেকেই ও-সব ভোলার মতো সময় বারোটা বছর কম নয়।

বাপী এ-কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করল না। নিজে কেমন ভুলেছে সে তো জানেই। এই মেয়েও ভোলে নি, ভুলতে পারে না। নইলে চার বছর আগে চেনার পর অনার্স ক্লাস বাতিল করে সমস্ত দিন ওর সঙ্গে কাটাত না। পরদিন লেকের ধারে যা ঘটে গেছে, তার মধ্যেও নিজেরও বিপাক বোঝাবার চেষ্টাটাই আসল ছিল। আর ভোলা এত সহজ হলে আজও আচরণ অন্য রকম হত। অন্যের ওপর কাজ চাপিয়ে দিয়ে এভাবে বেরিয়ে আসত না।...কাউন্টারে দাঁড়িয়ে তখন ওর দিকে চেয়ে কি দেখছিল বাপী এখন বোধ হয় তাও আঁচ করতে পারে। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগে আগের থেকেও ঢের সবল পুরুষ দেখছিল। পুরুষ পুরুষ হলে কোন মেয়ে তাকে সহজে ভুলতে পারে?

জবাব দেবার ফুরসৎ হল না, পাঞ্জাবী ড্রাইবার ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়েছে।

মিষ্টি এবারে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে।—তুমি যাবে কোন্ দিকে?

—তোমার দিকে। ওঠো-বেঘোরে পড়বে না।

ঠোঁটের ফঁকে আবার সেইরকম হাসির ফাটল একটু। অর্থাৎ বেঘোরে পড়ার মেয়ে সে নয়।

ট্যাক্সিতে উঠে ও-ধারের কোণের দিক ঘেঁষে বসল। বাপী উঠে দরজা বন্ধ করল। ট্যাক্সিঅলার উদ্দেশে বলল, চৌরঙ্গী।

ট্যাক্সি সোজা রাস্তায় পড়ে বেগে ছুটল। এদিকের অনেকটা পথ বেশ অন্ধকার। গাড়ির ভিতরে আরো বেশি। দুজনের মাঝে এক হাতের মত ফারাক। নড়েচড়ে বসে বাপীর এই ফাঁকটুকু আর একটু কমিয়ে আনার লোভ। কিন্তু পুরুষের এ-রকম চুরির হ্যাংলামো মানায় না। ভিতরে এমনি সাড়া পড়ে আছে সেই থেকে যে এটুকু খুব বড়ও মনে হচ্ছে না। এই সান্নিধ্যেরও এক অদ্ভুত স্বাদে উপোসী স্নায়ুগুলো টইটম্বুর হয়ে উঠছে। এই নীরবতার ঘোরে বাপী আরও অনেক অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু সেটা বিসদৃশ। বলল, তোমাকে এখানে এভাবে পাব ভাবতেও পারি নি।

পাব কানে কথাটা বাজল বোধ হয়। অন্ধকারে মিষ্টি ঘাড় ফেরালো।

—এখানে চাকরি করছ কত দিন ?

—তা দেড় বছরের বেশি হয়ে গেল।

—এম. এ না পড়ে হঠাৎ চাকরির দিকে ঝোঁক ?

—এম. এ পড়ে এর থেকে আর কি এমন ভালো চাকরি পেতাম ?

অর্থাৎ পড়ার থেকে চাকরি বড়। চাকরি লক্ষ্য। অন্ধকারে এত কাছে থাকার দরুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুখের রেখা কিছু দেখা যাচ্ছে না।

—এম. এ পাশ করে কলেজে চাকরি করতে পারতে।

—বিচ্ছিরি। তার থেকে এ ঢের ভালো।

—নিজের চেষ্টাতেই জোটালে ?

—না তো কি ? গলার স্বর তরল একটু।—খবর পেয়ে দরখাস্ত করলাম, ইন্টারভিউ দিলাম, পেয়ে গেলাম। মিষ্টি-হাসির শব্দ।—এর থেকেও ভালো পোস্টে সিলেকটেড হয়েছিলাম, কেউ রাজি হল না।

—কি পোস্ট ?

—এয়ার হোস্টেস।

বাপীর গলায়ও আপত্তির আভাস।—সেটা এর থেকে ভালো ?

—টাকার দিক থেকে তো ভালো। আর পাঁচরকম সুবিধেও আছে।

মিষ্টি টাকা চিনবে এ বাপী কোনদিন ভাবে নি। এখনও কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

—কে রাজি হল না ?

—রাজি না হবার লোকের অভাব।

সহজ হাল্কা জবাবটা কানে চিনচিন করে বাজল। বলতে পারত, দাদু রাজি হল না, বা মা-বাবা রাজি হল না। রাজি না হবার ব্যাপারে আর কারও গলা মেলার সম্ভাবনা বাপী হেঁটে দিল। চার বছর আগে সেই আঠার বছরের মিষ্টির সঙ্গে এই বাইশের মিষ্টির তফাৎ বাপী ভালই অনুভব করতে পারে। মেয়েদের বিকশিত সত্তার জোরটুকুর ওপর

আস্থাভরে দু পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। চৌদ্দ-পনের-ষোল বা আঠার বছরের অনেক মেয়েই প্রেমের দু-চারটে পলকা বাতাসের ঝাপটা এড়াতে পারে না। মিষ্টির মতো মেয়ের এড়ানো আরও কঠিন। তা বলে উল্টো দিকের বাড়ির সেই সোনার চশমা মাখনের দলা ছেলে শেষ পর্যন্ত যে এই মেয়ের জীবনের দোসর হতে পারে না সেটা শুধু ওর চকচকে সাদা সিঁথি দেখেই বুঝছে না। ওর এখনকার এই সত্তার মধ্যেও সেই রকমই ঘোষণা স্পষ্ট। শুধু সেই লোকটাকে নয় চার বছর আগে লেকের ধারের সেই বিকেলটাকেই ভেতর থেকে ছেঁটে দিয়েছে। আজ অপ্রত্যাশিত নাগালের মধ্যে পেয়ে শুরু থেকেই বাপীর এই আচরণ। অনুমান মিথ্যে হলে মিষ্টিই সুচারু সৌজন্যে ওকে বাতিল করে দিত। অন্যের ওপরে কাজ চাপিয়ে দিয়ে এভাবে ওর সঙ্গে চলে আসতই না।

ট্যাক্সি নির্জনতা পেরিয়ে লোকালয়ে এসে পড়েছে। দু' দিকের রাস্তা আর দোকান-পাটের আলোয় ট্যাক্সির ভিতরটাও অনেকটা পরিষ্কার। খানিক চুপ করে থেকে বাপী ওর দিকে ফিরল।—বানারজুলি থেকে বাগডোগরা এসে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উড়ে এসেছি বিশ্বাস করতে অসুবিধে হচ্ছে ?

মিষ্টির এবারের হাসির সঙ্গে বিড়ম্বনার মাধুর্য ছুঁয়ে আছে কিনা ঠাওর করা গেল না। মাথা নাড়ল একটু। জবাবও দিল।—হচ্ছে।

—বিশ্বাস হতে পারে এমন কিছু বলব ?

চেয়ে রইল। ভরসা করে সায় দিতে পারছে না। কিন্তু শোনার কৌতূহল।

বাপীর গলার স্বরে আবেগের চিহ্ন নেই। যেন নেহাৎ সাদামাটা কিছু বলছে।—গেজেটে তোমার এম. এ পরীক্ষার ফল দেখতে বানারজুলি থেকে শিলিগুড়ি ছুটে গেছলাম। বি. এ পরীক্ষার ফল দেখতেও তাই করেছি। বি.এ'র ফল ভালো হয় নি, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পাবে কি পাবে না ভাবতে ভাবতে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলাম। কেউ তখন গাড়ি চাপা পড়লেও খুব অবাক হবার কিছু ছিল না। কিন্তু গেজেট দেখে আমি হাঁ প্রথম। নামই নেই।

নিজের অগোচরে মিষ্টি আরও একটু ঘুরে বসেছে। চেয়ে আছে।

বাপী তেমনি ঢিমেতালে বলে গেল, ফেল করতে পারো এ একবারও মনে হল না। প্রথমে ভাবলাম ভাল প্রিপারেশন হয় নি বলে ড্রপ করেছ। তারপর আর যে সম্ভাবনার চিন্তাটা মাথায় এলো তাইতেই আমার হয়ে গেল। তক্ষুনি ঠিক করলাম, কলকাতা যাব। আমার কপাল ভেঙেছে কিনা দেখব। তবু নানা কারণে আসতে আসতে দিন কয়েক দেরিই হয়ে গেল।

মিষ্টি অপলক চেয়েই আছে সে বোধ হয় তারও খেয়াল নেই। দু চোখ চকচক করছে। বাপী অনুভব করছে, শুধু কান দিয়ে শুনলে এমনটা হয় না। কপাল ভাঙার কোন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে কলকাতায় উড়ে এসেছে তা আর ভেঙে বলার দরকার হল না। বুঝছে।

বাপী ভিতরটা সেই ছেলেবেলার মতই একটু স্পর্শের লোভে লালায়িত। এক হাত ফাবাকের এই এক মেয়েকে ঘিরে তার অন্তরাত্মা বাসনাবিদ্ধ। কামনাবিদ্ধ। কিন্তু এটা বানারজুলির জঙ্গল নয়।

তবু একটু সামনে ঝুঁকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ ?

মিষ্টি নিজের ভিতর থেকে নিজেকেই উদ্ধার করে সজাগ হল। ও পাশের দরজার সঙ্গে আর একটু চেপে বসে সহজ হবার চেষ্টা। হেসেই বলল, তুমি একটা পাগল।

বাপীও হেসেই সায় দিল।—এত দিনে তাহলে বুঝছ।

হোটেলের সামনের রাস্তায় ট্যাক্সি থামতে মিষ্টি বুঝল কোথায় যাচ্ছে বা এই লোক কোথায় আস্তানা নেবে। এই বোঝাটাও বিস্ময়শূন্য নয় দেখে বাপীর মজাই লাগছে। এর থেকে নামী আর দামী হোটেল চৌরঙ্গী ছেড়ে সমস্ত কলকাতায়ও আর দুটো নেই। পয়সার হিসেবটা যাদের কাছে বড় তারা বড় একটা এমন জায়গায় আসে না। তখন পর্যন্ত সাদা চামড়া আর অবাঙালী মেয়ে-পুরুষের ভিড় বেশি এখানে।

মিষ্টি পাশে। গালচে বিছানো চওড়া করিডোর ধবে বাপী রিসেপশনে এসে দাঁড়াল। একজন আধবয়সী কেতাদুরস্ত অফিসার এগিয়ে এলো সুটকেস রেখে বাপী ব্যাগ খুলে ছাপানো কার্ড তার হাতে দিতে লোকটি শশব্যস্তে বলল, ইয়েস সার, গট ইওর মেসেজ ওভার দি ফোন।

তার ইশারায় একজন তকমা-পরা বেয়ারা ছুটে এলো। বাপীব সুটকেশ আর ঘরের চাবি নিয়ে সে প্রস্তুত। অফিসারকে বাপী জানালো সে কদিন থাকবে ঠিক বলতে পারে না। খাতাপত্র যা সই করার সুইটে পাঠিয়ে দিলে সই করে দেবে, আর আপাতত পাঁচ দিনের চার্জ অ্যাডভান্স করে দেবে।

লিফটে উঠে তিনতলায় সুইট। নরম পুরু গালচে বিছানো বিশাল ঘরের মাঝে শৌখিন হাফ পার্টিশন। একদিকে বসার ব্যবস্থা, অন্যদিকে শোবার। অ্যাটাচড বাথ। দু' দিকে দুটো টেলিফোন। বাপী চারদিকে দেখে নিল একবার। উত্তরবাংলা মধ্যপ্রদেশ বা বিহারে টুরে বেরুলে সব থেকে বড় হোটেলেই ওঠে। কিন্তু কলকাতার সঙ্গে তুলনা হয় না।

বাপী মিষ্টির দিকে তাকালো। এই লোকের এমন দিন ফেরার বিস্ময় এখনও কাটে নি। কিন্তু খুশিই মনে হল।

সুটকেস রেখে বেয়ারা চলে গেছে। বাপী বলল, বসো—

পার্টিশনেব এধার থেকে কাঁধের কোটটা গদীর বিছানাব ওপব ছুঁড়ে দিল বাপী। তারপর নিজেও বসল—কি খাবে বলো?

মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প। কিছু খাবে না বললে শুনবে না জানে, আবার কি খাবে তাই বা বলে কি করে।

বাপী ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে রুম-সার্ভিস চাইল। তারপর একগাদা খাবারের অর্ডার দিল।

ফোন রাখতে মিষ্টি আঁতকে উঠল। অত কে খাবে!

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ছড়াচ্ছে বাপীর।—আমার এখন রাজ্যের খিদে।

জবাবটা একেবারে জল-ভাত সাদা অর্থের নয়। বিড়ম্বনা এড়াবার চেষ্টায় মিষ্টি বলল, যত খুশি খাও, আমার ওপর জুলুম কোরো না।

বাপী কি আরও বেপরোয়া হবে? জুলুম না করলে সেটা না খাওয়ারই সামিল হবে বলবে? বলল না। আরও জরুরী কিছু মনে পড়ল। ফোনের রিসিভারটা তুলে

মিষ্টির দিকে বাড়িয়ে দিল।—ফিরতে দেরি হবে বাড়িতে জানিয়ে দাও।

আবারও একটু বিড়ম্বনার ধকল সামলে মিষ্টি জবাব দিল, তোমার পাল্লায় পড়েছি যখন ফিরতে দেরি হবে আগেই জানি। এয়ার অফিস থেকেই ফোন করে দিয়ে বেরিয়েছি।

বাপী রিসিভার জায়গায় রাখল আবার। দু চোখ ওর মুখের ওপর। রক্তে খুশির তাপ ছড়াচ্ছে, লোভেরও। চার বছর আগে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসার আগে দাদুকে নিজে থেকে ফোন করে ফিরতে দেরি হবে জানিয়ে এসেছিল মনে আছে।...তার পরের পরিণাম মুছেই গেছে।

এবারে মিষ্টিরই সহজ হবার তাড়না। চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে না এলে আমি কিছুই মুখে দিতে পারব না।—মাথাটা ঝিমঝিম করছে। হাসল একটু, দু তিন ঘণ্টা পর পর সমস্ত মুখে জল দেওয়াটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে আমার।

বাপী তক্ষুনি উঠে পার্টিশনের ওধারে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল। ঝকঝকে পরিপাটি ব্যবস্থা। যাবতীয় সরঞ্জাম সাজানো।

ফিরে এসে বলল, যাও—

মিষ্টি উঠে গেল। ফিরল প্রায় সাত-আট মিনিট বাদে। সমস্ত মুখে ভালো করে সাবান ঘষে এসেছে বোঝা যায়। তোয়ালে দিয়ে মুছে আসা সত্ত্বেও ভেজা-ভেজা মুখ। ঘাড়ে মাথায়ও জল চাপড়েছে মনে হল। শুকনো চুলে মুক্তোর মতো দু-চারটে ফোঁটা আটকে আছে।

বাপী তাকালো। তারপর দুচোখ ওই মুখের ওপর অনড় খানিক। মিষ্টি আবার সামনে এসে বসার পরেও। এখানেও আলোর ছড়াছড়ি। কিন্তু সাবান দিয়ে সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে মুছে আসার ফলে এখন আর অত ফর্সা লাগছে না। অকৃত্রিম তাজা বাদামী অনেকটা ঠোঁটের লাল রং ধুয়ে মুছে গিয়ে শুধু লালচে আভা আছে একটু।

হৃষ্টমুখে বাপী মন্তব্য করল, এতক্ষণে ঠিক ঠিক তোমাকে দেখছি। শাড়িটা বদলে অন্য শাড়ি পরে আসতে পারলে আরো ঠিক দেখতাম।

মিষ্টি মুখোমুখি সোফায় বসে হেসেই জিজ্ঞাসা করল, এ শাড়ি কি দোষ করল?

বাপী অম্লান বদনে জবাব দিল, বেজায় সাদা, যেন নিষেধ-নিষেধ ভাব।

দরজার বাইরে প্যাক করে শব্দ হতে মিষ্টিরই বাঁচোয়া।

—কাম ইন! বাপী সাড়া দিল।

দরজা ঠেলে দুজন বেয়ারা ট্রেতে গরম খাবার আর টুপি-আঁটা চায়ের পট ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকল। দুজনের মাঝের চেয়ারে সেগুলো সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মিষ্টি আগে থাকতে আবার জানান দিল, আমার দ্বারা অত চলবে না, এ তো একেবারে রাতের খাওয়া সারার মতো এনে হাজির করেছে।

—সারলেই না-হয়। শুরু তো করো।

খেতে খেতে প্রথমেই মিষ্টির যার কথা মনে পড়ল সে বনমায়া। উৎসুকও।—টেলিগ্রামে বনমায়া কিল্ড লিখেছিলে—কি করে মরল? কে তাকে মারল?

বাপী সবিস্তারে বলল। মানুষের লোভের কথা বলল। দোসরকে বাঁচানোর চেষ্টায় বনমায়া ওভাবে নিজের জীবন খুইয়েছে সেই বিশ্বাসের কথাও বলল।

মিষ্টির খাওয়া থেমে গেছল। সব শোনার পর বিষণ্ণ।

—ও কি, খেতে খেতে শোনো। একটু থেমে বাপী আবার বলল, সেদিনও আমি শিলিগুড়ি গিয়ে তোমার বি. এ'র রেজাল্ট দেখে ফিরছিলাম বুঝলে? এসে দেখি বানারজুলির লোক ভেঙে পড়েছে বনমায়াকে দেখতে। বনমায়ার সেটা শেষ সময়, শুয়ে আছে। আমাকে দেখে চিনল, শুঁড় উঁচিয়ে সেলাম করল...

—থামো, আর শুনতে পারি না।

—মিষ্টির মুখে বেদনার ছায়াতে কোনো ভেজাল নেই। বাপী অখুশি নয়। ওর স্মৃতির গভীর থেকে বানারজুলি হারিয়ে যায় নি। একটু থেমে বাপী আবার বলল, ওর মরদটার খবর শুনবে?

মন্দ কিছু শুনতে হবে কিনা মিষ্টির চোখে সেই আশঙ্কা।

—পাগলা গুণ্ডা হয়ে গেছে। সামনে কাউকে পেলে তাকে মেরে মানুষের লোভের শোধ নিচ্ছে। ওটাকে মারবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, এখনো মারা যায় নি, জখম হয়ে আরো শয়তান হয়ে গেছে। গেল বছর আমি ওই যমের মুখোমুখি পড়ে গেছলাম। কি করে যে বাঁচলাম সেটাই আশ্চর্য।

কে বললে মিষ্টির বয়েস বাইশ, হালফ্যাশানের ঝকঝকে এই মেয়ে এয়ার অফিসেব চাকুরে। তার চোখে মুখে সত্যিকারের ত্রাস।—ওটার মুখোমুখি পড়লে কি করে—জঙ্গলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলে বুঝি?

—বানারজুলির জঙ্গলে নয়, ভুটানের জঙ্গলে। আমি একটা পাথবে বসেছিলাম ওটা আসছে দেখিই নি। আর একজন সঙ্গে ছিল, সে দেখেছে, সে-ই বাচালো। ঘাবড়ে গিযে আমি সোজা ছুটতে যাচ্ছিলাম, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। সঙ্গের সেই একজন আমাকে নিয়ে পাশের পাহাড়ে টেনে তুলল, আর বিশ-ত্রিশ সেকেন্ড দেরি হলেও হয়ে যেত।

ঠোঁটের ডগায় আসা সত্ত্বেও রেশমার নামটা অনুক্তই থাকল। বুক নিঙড়নো একটা বড় নিশ্বাস ঠেলে বেরুলো। রেশমার নামটা করল না বলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবছে।

দৃশ্যটা ভাবতে চেষ্টা করে মিষ্টি শিউরে উঠল। তোমার বনে-বাদাড়ে টহল দিয়ে বেড়ানোর অভ্যেস এখনো যায় নি?

রেশমার চিন্তা ঠেলে সরিয়ে বাপী হাসল। জবাব দিল না।

—সেই এক ময়াল সাপের মুখে পড়াটা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। কখনো-সখনো স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে আঁতকে উঠি।

কার জন্যে যে সেদিনের সেই মিষ্টিও প্রাণে বেঁচেছিল সেটা মুখে বলল না, চোখের ভাষায় বোঝা গেল। বাপী কিছুই ভোলে নি, কিছুই ভোলে না। মেমসায়েব অর্থাৎ ওর মায়ের সেদিনের কান-মলা পুরস্কারটাও মনে আছে। কিন্তু আজকের বাপী সেই বাপী নয়। অপ্রিয় প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেল না।

খাওয়া আর চা-পর্বও শেষ এই ফাঁকে। মিষ্টি বলল, এত খেলাম, সত্যি রাতের খাওয়া হয়ে গেল।

ওর ডিশ দুটোয় এখনো খানিকটা পড়ে আছে। বাপী তাগিদ দিল না। বেল টিপতে দরজা ঠেলে বেয়ারা এসে ট্রেসুদ্ধ নিয়ে চলে গেল।

মিষ্টি বলল, তোমার দিন অনেক বদলেছে বোঝাই যাচ্ছে—কি করছ?

এ পর্যন্ত নিজের পদমর্যাদার জাহির কারো কাছে করেছে মনে পড়ে না। ঠিক জাহির না করলেও আজ লোভ সামলানো গেল না। পকেটের মোটা ব্যাগ খুলে আর একটা ছাপা কার্ড বার করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

মিষ্টি সাগ্রহেই কার্ডের ওপর চোখ বোলালো।—তুমি এখন মস্তলোক তাহলে—জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড পার্টনার।...রাই অ্যান্ড রাই কিসের ফার্ম ?

অল্প কথায় বলল। কত জায়গায় ফার্মের শাখা-প্রশাখা আছে জানিয়ে সুবিধে মতো কলকাতায়ও যে জাঁকিয়ে বসার ইচ্ছে আছে তাও বলল।

—তুমি এই ফার্মের সর্বেসর্বা এখন ?

—তা ঠিক না, মাথার ওপর কর্ত্রী আছে।

কর্ত্রী ?

ভিতরে বাপীর যে সাড়া জেগেছে, এই একজনকেই সব উজাড় করে বলা যায়। কে কর্ত্রী, কেমন কর্ত্রী বলল। কোথা থেকে কি ভাবে ওকে টেনে তুলেছে তা বাদ গেল না। আর একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ঊর্মিলার প্রসঙ্গেও এলো।

মিষ্টি বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। এবারে সহজাত কৌতূহলে জিগ্যেস করল, ঊর্মিলার বয়েস কত ?

—তোমারই বয়সী হবে, সামান্য ছোটও হতে পারে। কিন্তু মেয়ের একেবারে রাজেশ্বরী মেজাজ।

—বিয়ে হয়েছে ?

মজা করে সত্যি কথা বলতে আপত্তি কোথায় বাপীর ? মাথা নেড়ে জবাব দিল, এই নিয়েই তো ফ্যাসাদ। মেয়ে এক ইঞ্জিনিয়ার-এর কাঁধে ঝোলার জন্য তৈরি, তার মা ওদিকে মেয়েকে আমার কাঁধে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না। সঙ্কট বোঝো।

নির্লিপ্ত সুরে মিষ্টি বলল, অমন মা যখন সহায়, সঙ্কট আবার কি, ইঞ্জিনিয়ারকে হটিয়ে দাও।

কথার ফাঁকে বাপীর কার্ডটা নিজের হাত-ব্যাগ খুলে তাতে রাখল।

কিন্তু পরামর্শটা বেখাপ্পা ছন্দপতনের মতো লাগল বাপীর। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু।—ইঞ্জিনিয়ারকে হটিয়ে দেব ?

—তাছাড়া আর কি করবে! রাজত্ব-রাজকন্যা দুইই পাবে।

বাপীর একবার মনে হল মিষ্টি মেয়েলি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ভিতরের অনুভূতিটা এমন যে তাও বরদাস্ত করার নয়। চাউনি ওই মুখের ওপর চড়াও হয়ে আছে। বলল, রাজত্ব বা রাজকন্যার লোভ নেই, আমার লোভ একটাই। গলার স্বরও ভারী।—বারো বছর ধরে পৃথিবীর সব বাধা আর সঙ্কটকে হটিয়ে আমি একজনের জন্যেই বসে আছি।

হাতের ব্যাগটা নাড়াচাড়া করছিল মিষ্টি। আঙুলগুলো থেমে গেল। দু-চোখ তার মুখের ওপর উঠে এলো। স্থির হল। মুখে যেন অদৃশ্য কঠিন রেখা পড়তে লাগল। হঠাৎ চাপা ঝাঁঝে বলল, তুমি মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল মানুষ।

এটুকুতেই ভিতরে তোলপাড় কাণ্ড বাপীর।—কেন ?

গলা না চড়িয়ে মিষ্টি আরো ঝাঁঝালো জবাব দিল, একটা মেয়ের দশ বছর বয়েসের সঙ্গে বারোটা বছর জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায় আর তার জগতে কত কি ঘটে যেতে পারে

—ভেবেছিলে? শুধু নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়েই বারোটা বছর কাটিয়ে দিলে?

বাপী স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। এই মিষ্টিকে সে দেখে নি। সহজ কথা এমন কঠিন করে বলতে পারে তাও ধারণার বাইরে। তার পরেই সচকিত। বুকের তলায় কাঁটা ছেঁড়ার যন্ত্রণা। বাপী কি করবে। উঠে হ্যাঁচকা টানে ওই মেয়েকে সোফা থেকে টেনে তুলে তার হাড় পাঁজর নিজের সঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে? তারপর চিৎকার করে বলবে, ভুল-ভ্রান্তি জানি না, কোনো বাধা মানি না, অনেক ঝড়জলের সমুদ্র সাঁতরে ডাঙায় উঠতে সময় লেগেছে বলেই এত দেরি—ডাঙায় না উঠলে কেউ আমাকে বিশ্বাস করত না, তুমিও না। এই করবে? এই বলবে?

আত্মস্থ হল। মিষ্টির মুখের কঠিন লালচে আভা মিলিয়ে গেছে। নরম হয়েছে। চোখের কোণে সদয় কৌতুকের আভাস। ওটুকুতেই একটা দম-বন্ধ-করা জমাট অন্ধকার কিছু ফিকে হয়ে আসছে। তবু সামনে ঝুঁকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বারো বছরে তার জগতে কত কি ঘটে গেছে জানতে পারি?

চোখের কৌতুক ঠোঁটে ফাটল ধরালো এবার। জবাব দিল, তেমন কিছু না—তুমি সেই বারো বছর আগের মতোই আছো দেখছি, একটুও বদলাও নি।

—কেন?

টিপ-টিপ হাসি ঠোঁট থেকে চোখে আর চোখ থেকে ঠোঁটে নামা-ওঠা করছে। —ছেলে বেলায় রেগে গেলে যেমন দেখাতো, আর আমার ওপর হামলা করার জন্য যেমন ওঁত পেতে থাকতে—ঠিক তেমনি লাগছিল তোমাকে। আমার ভয়ই করছিল—

আবার লোভ লোভ—রাজ্যের লোভ বাপীর। ভয় যে ওর থোড়াই করছিল তাও স্পষ্ট। সেই কারণেই আরো লোভ। তবু একটু আগের ঝাঁঝালো মুখ ঝাঁঝালো কথার অস্বস্তি একটু লেগেই আছে। হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখেই আবার তাগিদ দিল, কিছু যদি হয়ে থাকে আমাকে খোলাখুলি বলো।

—খোলাখুলি কি আবার বলব। বিপরীত তরল ঝাঁঝ এবার।—জেনারেল ম্যানেজার হও আর পার্টনার হও, তোমার প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির দৌড় কত তাই বলছিলাম। ঘড়ি দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।—অনেক রাত হয়ে গেল চলি।

অনুনয়ের সুরে বাপী বলল, আর একটু বোসো।

—না, আর না—এমনিতেই এ চাকরি চক্ষুশূল।

অগত্যা বাপীও উঠল। কাল কখন আসছ?

—কাল? কাল তো আমি কলকাতাতেই থাকছি না!

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর চাউনি সন্দিগ্ধ আবার।—আমাকে এড়াতে চাও।

হাল ছেড়ে আবারও হাসল মিষ্টি।—তোমাকে নিয়ে মুশকিল। হাত-ব্যাগ খুলে খাম থেকে খোলা একটা টাইপ করা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।—এই দেখো, কাল বিকেলের মধ্যে আমি দিল্লিতে। পরশু রাতে ফিরব।

ইন্টারভিউর চিঠি পড়ল বাপী। এয়ারওয়েজের আরো পদস্থ কিছু চাকরি হবে নিশ্চয়। ইচ্ছে হল চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে, এর আর দরকার কি আছে?

অতটা পারা গেল না। আবার হয়তো স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার খোঁটা দেবে। শুধু বলল, না গেলে?

—পাগল নাকি। ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ওখানেও তারা জানে আমি যাচ্ছি।

—তাহলে পরশু আসছ ?

মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসছে অল্প অল্প। মাথা নাড়ল।—পরশুও না। রাত দশটার পর প্লেন ল্যান্ড করবে।

তার পরদিন ?

—তার পরদিন বিকেলে হতে পারে।

—হতে পারে ? অস্ফুট আর্তনাদের মতো শোনালো।

মিষ্টি অবুঝের পাল্লায় পড়েছে।—আচ্ছা হবে।

—কথা দিচ্ছ ?

হাসিমাখা দু চোখ তার মুখের ওপর থেমে রইল একটু। মাথা নাড়ল। কথা দিচ্ছে।

—ঠিক আছে। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মিষ্টি শশব্যস্তে বাধা দিল, না না, পৌঁছে দিতে হবে না, একা চলা ফেরা করা আমার অভ্যেস আছে।

কান না দিয়ে বাপী বাইরে এসে চাবি দিয়ে বন্ধ করল। বলল, আজ অন্তত তোমাদের বাড়ি গিয়ে হামলা করব না, ভয় নেই। দোরগোড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে আসব। এসো—

মিষ্টির নিরুপায় মুখ দেখে এখন বাপীরই মজা লাগছে।

ছয়

বেশ সকালেই ঘুম ভাঙল বাপীর। চোখ মেলে তাকানোর আগে পর্যন্ত হালকা মেঘের মতো ও একটা ভেলায় চেপে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটা অকারণ খুশিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছিল।

চোখ মেলে তাকানোর পরেই ভেতরটা আর ততো খুশি নয়। কলকাতার সব চেয়ে সেরা হোটেলের আরামের গদীতে শুয়ে আছে। এই কলকাতায় ও আছে মিষ্টি নেই। বাতাস ছাড়া আলো যেমন, আপাতত মিষ্টি ছাড়া কলকাতা তেমন। আজকের দিনটা যাবে। কালকের দিনটা যাবে। তার পরের দিন সেই বিকেলে মিষ্টি এখানে এই ঘরে আসবে। ভাবতে গেলে বিতিকিচ্ছিরি লম্বা সময়।

বিছানায় গা ছেড়ে চোখ পাকিয়ে বাপী কিছু মিষ্টি চিন্তায় ডুব দিল। বানারজুলির সাহেব বাংলোর দশ বছরের মিষ্টি, কলকাতার কলেজে-পড়া আঠের বছরের মিষ্টি, আর এয়ার অফিসের চাকুরে বাইশ বছরের মিষ্টি—এই তিন মিষ্টিই চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে গেল। লোভাতুর তন্ময়তায় বাপী দেখছে। কারো থেকে চোখ ফেরানো সহজ নয়। যখন যাকে দেখছে, বাপী নিজের সেই বয়সের চোখ দিয়েই তাকে দেখছে।

উঠল। মুখ হাত ধুয়ে টেলিফোনে দুকাপের এক পট চা আনিয়ে নিল শুধু। এখানে গায়ত্রী রাই নেই যে শুধু চা খেতে চাইলে ঠাণ্ডা চোখে বকবে।

চা খেতে খেতে সকৌতুকে নিজের বরাতের ওপর চোখ বোলাচ্ছে বাপী। চার বছর আগে এই কলকাতা শহরে সে পায়ে হেঁটে চলে বেড়াতো। বেশি খিদে পেলে ঠোঙায় মুড়ি কিনে খেতে খেতে পথ চলত। রাস্তার কল থেকে জল খেত। ঝকঝকে এই

হোটেলের দরজার সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুন্দরী মেয়েদের আনাগোনা দেখত। আজ এই হোটেলেই সে একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক। বিলাসবহুল একটা সুইট তার দখলে। টেলিফোন তুলে হুকুম করলেই যথেচ্ছ ভোগের উপকরণ নাগালের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য, এই ভোগবিলাসের সঙ্গে তবু ঠিক নাড়ির যোগ নেই বাপীর।

ঝপ করে যে মুখখানা সামনে এগিয়ে এলো, তার এক মাথা চুল, গালবোঝাই কাঁচা পাকা দাড়ি, চওড়া কপালে মেপে সিঁদুর ঘষা। টালি এলাকার বাসিন্দা ব্রুকলিন পিওন রতন বনিকের মুখ। জোর গলায় বাপীর দিন-ফেরার ভবিষ্যদ্বাণী শুধু সে-ই করেছিল। বউকেও বলেছিল, হবে যখন দেখে নিস, বিপুলবাবুর ভাগ্যিখানা কালবোশেখীর ঝড়ের মতোই সব দিক তোলপাড় করে নেমে আসবে একদিন। ওই খুপরি ঘরের আশ্রয় ছেড়ে আসার দিনও বলেছিল আপনার কপালের রং অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরতে ভুলবেন না যেন।

বাপীর মনটা সবার আগে ওই রতন বণিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলিবিকুলি করে উঠল। কিন্তু যাব কি করে। তামাম দুনিয়ায় এই একজনের কাছে নিজের বিবেক সব থেকে বেশি অপরাধী। কাল মিষ্টির দেখা পেয়েছে বলেই সেই বিবেকের চাবুক এই সকালেও অনুভব করল। কমলা বণিকের ঢলঢলে কালো মুখখানা জোর করেই স্মৃতির গভীর থেকে টেনে উপড়ে ফেলে দিতে চাইল। সম্ভব হলে রতন বণিকের সঙ্গে দেখা একবার করবে। মুখে কিছু না বলেও বুকের তলায় কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিয়ে আসতে পারবে। বলতে পারবে তোমাকে ভুলি নি কোনদিন, ভুলব না। কিন্তু ওর ঘরের ত্রিসীমানায় গিয়ে নয়। সময় পেলে ওর আপিসে গিয়ে দেখা করে আসবে।

খবরের কাগজ পড়ল। মিষ্টি এখানে নেই, কলকাতায় বসে কাগজে আর এমন কি খবর পড়ার আছে। ধীরেসুস্থে শেভ করল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে স্নান সারল। পিছনের সব কালো ধুয়ে-মুছে ফেলার মতো স্নান একখানা। ভুটান জঙ্গলের উদ্দাম ফকির তাকে সামনে এগোতে বলেছিল, পিছনে তাকাতে বলে নি।

ঘড়ির কাঁটা বেলা দশটার ওধারে সরতেই রিসিভার তুলে বিজয় মেহেরার আপিসের নম্বর চাইল। দু মিনিটের মধ্যে ওদিক থেকে মেহেরার ব্যস্ত গলা—মেহেরা হিয়ার।

এদিক থেকে কপট গাম্ভীর্যে বাপী বলল, বানারজুলির বাপী তরফদার।

—ফ্রেণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে ওধারে গলা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল।

ঊর্মিলার ফ্রেন্ড তাই তারও ফ্রেন্ড।—এই কলকাতা থেকে কথা বলছ? কবে এসেছ? কোথায় উঠেছ?

—ধীরে বন্ধু ধীরে। তোমার বুকের তলার দাপাদাপি ফোনে শোনা যাচ্ছে। কখন দেখা হবে?

ওধার থেকে দরাজ হাসির শব্দ। হোটেলের হদিস দিয়ে বাপী ওকে চলে আসতে বলল। কিন্তু সেই বিকেল ছটার আগে বিজয়ের দম ফেলার সময় নেই। একটা বড় টেন্ডারের ফয়সালা হবে আজই। ওদিক থেকে তার আরজি, কলকাতায় সে আনকোরা নতুন এখনো, বলতে গেলে এখন পর্যন্ত কিছুই চেনে না, তার থেকে ফ্রেন্ড যদি ঠিক ছ'টায় তার খিদিরপুরের ফার্মে চলে আসে তো খুব ভালো হয়—ছটার পর থেকে রাত পর্যন্ত সে তার খাতিরের গেস্ট।

বাপী রাজি হতে খুশির হাসি হেসে ফোন ছেড়ে দিল। এত ব্যস্ত বলেই হয়তো ফোনে তার প্রেমিকার সম্পর্কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করল না।

কিন্তু বিকেল ছ'টা দূরের পাল্লা। বাপী এতক্ষণ করে কি। তক্ষুনি বন্ধু নিশীথ সেনের কথা মনে হল। এখনো যুদ্ধের আপিসের চাকরি করছে, না হবু কবিরাজ পাকা কবিরাজ হয়ে বসেছে এতদিনে, জানে না। চার বছরের মধ্যে চিঠিপত্রেরও যোগাযোগ নেই। নোট বইএ ওর বাড়ির ফোন নম্বর লেখা আছে।

দুটো চোখের মতো কান দুটোও বাপীর জোরালো। ও-দিকের গলার আওয়াজ পেয়েই মনে হল নিশীথ ফোন ধরেছে। অর্থাৎ কবিরাজই হয়েছে, আপিস থাকলে এ-সময় তার বাড়ি থাকার কথা নয়।

গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করল, সিনিয়র কোবরেজ মশাই কথা বলছেন, না জুনিয়র ?

—জুনিয়র। আপনার কাকে চাই ?

—আপনাকেই। চট করে একবার না এলেই নয়।

—কোথায় ?

হোটেলের নাম আর সুইট নম্বর বলল। ওদিকের বিমূঢ় মূর্তিখানা না দেখেও বাপী আঁচ করতে পারে। অমন একখানা হোটেলের কোনো রোগী ওর শরণাপন্ন ভাববে কি করে, বিশ্বাসই বা করবে কি করে।

—আমার নাম বাপী। চেনা-চেনা লাগছে ?

—বা-আ-বাপী। কানের পর্দায় দ্বিতীয় দফা বিস্ময় আছড়ে পড়ল।—বাপী তুই ? এতকালের মধ্যে একটা খবর নেই, কোন ভাগাড়ে ডুব দিয়ে বসেছিলি ? ওই হোটেলের কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস ?

একটি কথারও জবাব না দিয়ে বাপী বলল, আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, চলে আয়। বিকেলের আগে ছাড়া পাচ্ছিস না বাড়িতে বলে আসিস।

ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যেই দরজার বাইরে প্যাক করে আওয়াজ হল। বাপী তখন হাফ পার্টিশনের এ-ধারে আরামের শয্যায় শুয়ে।—কাম ইন।

ঘরে ঢুকে নিশীথ পার্টিশনের ও-ধার থেকে সন্তর্পণে গলা বাড়ালো। এ কোন স্বপ্নপুরীতে এসে হাজির হয়েছে ভেবে পাচ্ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে বাপী ডাকল, হাঁ করে দেখছিস কি ? ভিতরে আয়।

বেঁটে-খাটো নিশীথের দু চোখ সত্যি ছানাবড়া। চোখে দেখেও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। ভিতরে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল আর এক দফা। লোয়ার ডিভিশন চাকরি যোগাড় করে যাকে জলপাইগুড়ি থেকে টেনে এনেছিল চার বছরের মধ্যে তার এমন ভাগ্য বিশ্বাস করে কি করে ?

—এ-ঘরে সত্যি তুই থাকিস নাকি ?

—পাগল! বাপীর ভূত থাকে। বোস্।

উঠে বসে গদীর বিছানাটা চাপড়ে দিল। এমন বিছানায় বসেও অস্বস্তি নিশীথের। —কি ব্যাপার রে ? চেয়ারাখানা আগের থেকেও তো ঢের খোলতাই হয়েছে—গুপ্তধনের হদিস-টদিস পেয়েছিস নাকি ?

বাপী হাসছে মিটি-মিটি। জবাব দিল, পুরুষের ভাগ্য।

—ভাগ্যের জোরে তো মশার দশা গিয়ে একেবারে হাতির দশা চলছে মনে হচ্ছে —খুলে বলবি কিছু, না কি?

ওপর-পড়া হয়ে সে-ই খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বন্ধুর ভাগ্যের জোয়ারের মোটামুটি হদিস পেল। বনজ ওষুধের কাঁচা বা শুখা মাল হোলসেল দোকান থেকে ওদেরও কিনতে হয়। ওই সব বড় বড় হোলসেলাররা আবার যাদের কাছ থেকে মাল কেনে তারা কত মুনাফা লোটে নিশীথের ধারণা নেই। বাপী এই নামজাদা হোটেলে এসে ওঠা থেকে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—বরাত বটে একখানা তোর, পেলি কি করে?

গায়ত্রী রাইয়ের প্রসঙ্গ ধামাচাপা। এখনো তার নাম উল্লেখ করল না। এমন ভাগ্য দেখে ওর আনন্দ আটখানা হওয়া সহজ নয়। একসময় বাপী ওরও করুণার পাত্র ছিল তো বটেই।

—তুই যা বললি তাই, সবই বরাত রে ভাই। তোর খবর বল শুনি, বিয়ে-থা করেছিস?

নিজের প্রসঙ্গেও নিশীথ বীতশ্রদ্ধ। সরকারী আপিসের সেই টেম্পোরারি চাকরি করেই গেছে। বাবার দাপটে আদাজল খেয়ে কোবরেজিতেই লেগে যেতে হয়েছে। বছর আড়াই আগে কিছু টাকা খরচ করে বাবা কাশীর কোথা থেকে আয়ুর্বেদের একটা চটকদার ডিপ্লোমা এনে দিয়েছে ওকে। রোগী এলে বাবা ওকেই আগে সামনে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে, আর ছেলের সম্পর্কে আয়ুর্বেদীয় জ্ঞানগম্যির গুণকীর্তন শোনায়। কিন্তু লোকে তাতে খুব একটা ভোলে না। বাবার সঙ্গে ছেলের এখন বিয়ে নিয়েই মন-কষাকষি চলছে। ছেলের জন্য বাবা এখন একটি জ্যান্ত পুঁটলি ঘরে আনতে চায়। মেয়ের গায়ের রং ময়লা আর ওর মতোই বেঁটে-খাটো। বাবার চোখে সব দিক থেকে রাজ-যোটক। মেয়ের বাপের বাজারে নিজস্ব বড় একটা মুদি দোকান। অঢেল কাঁচা পয়সা। তিনটি মাত্র মেয়ে। ছেলে নেই। মেয়ে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে এখন ঘরে বসে বিশ্রাম করছে। এমন রূপগুণের পুটলিকে বিয়ে করতে আপত্তি দেখে বাবার উঠতে বসতে হুমকি। কথায় কথায় মাকে শোনায়, কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চাঁদ দেখার সাধ!

সখেদে আবার একটা গরম নিঃশ্বাস ছাড়ল নিশীথ।—আমার অবস্থাখানা বোঝ একবার—

সহানুভূতির দায়ে বাপী তাকে একনম্বরি লাঞ্চ খাইয়ে কিছুটা তুষ্ট করল। ডাইনিং হলএ নগদ খরচায় এ-পর্ব সমাধা করেছে। বিল মেটাবার সময় বাপীর ঢাউস ব্যাগে একশ টাকাব নোটের তাড়া দেখেও নিশীথের দু-চোখ গোল!

হাতে অঢেল সময় এখনো। বেরিয়ে এসে বাপী একটা ট্যাক্সি নিল। বনজ ওষুধের পাইকিরি বাজারটা একবার ঘুরে দেখবে। চার বছরে ব্যবসার স্বার্থ ওরও রক্তে এসে গেছে।

পাইকারদের আসল ঘাঁটি বড়বাজারে। দমদম আর উল্টোডাঙার দিকে তাদের গোডাউন। নিশীথ ওকে বড়বাজারে নিয়ে এলো। মাঝারি দুজন ডিলারের সঙ্গে ওর কিছু যোগাযোগ আছে। বড় মাঝারি ডিলারদের বহু ঘাঁটিতে হানা দেবার ফলে বাপীর আগ্রহ

চারগুণ বেড়ে গেল। এমন সোনার বাজার এখানে কল্পনা করে নি। বাপীর বেশ-ভূষা চেহারাপত্র আর ছাপা কার্ড দেখে আর কথাবার্তা শুনে মালিকরা খাতিরই দেখিয়েছে। ভারতের এত জায়গায় যাদের শাখা-প্রশাখা, তার বাঙালী পার্টনার আর জেনারেল ম্যানেজারকে হেলাফেলা করবেই বা কেন।

ঘুরে ঘুরে বাপী মোটামুটি তথ্য যোগাড় করল, আগের দিন হলে গায়ত্রী রাই তক্ষুনি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় চালান করত হয়তো। দেশজোড়া নাম আছে, এখানকার এমন কটা বড় কবিরাজি কারখানাতেই কম করে তিরিশ লক্ষ টাকার বনজ উপকরণ লাগে। গ্রীষ্মকালে কবিরাজির মন্দা বাজার, শীতকালে জমজমাট। এছাড়া বড় ফার্মেসিউটিক্যাল ফার্মগুলোতেও পনের বিশ লক্ষ টাকার মাল সরবরাহ হয়ে থাকে। আর মাঝারি বা ছোট কবিরাজি বা ওষুধ তৈরির কারখানাগুলোর চাহিদা যোগ করলে তা-ও কম ব্যাপার নয়! এখানে বাসে বা ট্রেনে বেশির ভাগ মাল আসে মোকাম থেকে।

ব্যবসা সম্পর্কে বাপীর কথাবার্তা শুনে আর তৎপরতা দেখেও নিশীথ চুপ মেরে গেছে। উদ্দেশ্যও বুঝেছে। ওকে নিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই বাপী দমদম চলে গেছে গোডাউনগুলো দেখতে। তারপর বাপীই বলেছে, ব্রোকারের মারফৎ শুধু মাল চালান দেওয়া নয়, সুযোগমতো যতো শিগগির পারে গোডাউন ভাড়া করে এখানে রিজিয়ন্যাল সেন্টার খুলবে।

ব্যাপারখানা কত বড় নিশীথের এরপর আঁচ করতে অসুবিধে হয় নি। উত্তরবাংলা বিহার মধ্যপ্রদেশের অনেক জায়গায় ওদের রিজিয়ন্যাল সেন্টার আছে, আর সে-সব জায়গায় রিজিয়ন্যাল ম্যানেজার কাজ করছে কথায় কথায় তাও জেনে নিয়েছে।

ফিরতি পথে ট্যাক্সিতে বসে নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, এইসব রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারদের মাইনে কত রে?

মাইনে শুনে আর তার ওপর বরাদ্দ কমিশনের অঙ্ক শুনে নিশীথ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর আবার চুপ।

কলেজ স্ট্রীটে বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতে নিশীথ ওকেও জোর করে নামাতে চাইল। কিন্তু ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে। ছটায় খিদিরপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। শুনে অনুনয়ের সুরে নিশীথ বলল, আচ্ছা এক মিনিটের জন্য একবার নেমে আয়।

কি হল না বুঝে বাপী নেমে এলো। নিশীথের দু চোখ এমন চকচক করছে কেন হঠাৎ বাপী বুঝছে না। পরক্ষণে বোঝা গেল।

--এখানে তোদের রিজিয়ন্যাল অফিস হলে আমার ম্যানেজারের চাকরিটা পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবি?

ভিতরে ভিতরে বাপী বিরক্ত। এ ব্যাপারে সে নির্মম। তক্ষুনি বলল, আমার কি হাত বল, মালিক খুব কড়া লোক—

—তুই চেষ্টা করলেই হবে ভাই। আঙুল তুলে তিনখানা বাড়ির পরের একটু পুরনো বাড়ি দেখালো।—ওই বাড়ির দোতলায় একটি মেয়ে থাকে, বাবা মা নেই, কাকাদের কাছে থাকে। এবারে বি.এ পাশ করেছে। মেয়েটা ফর্সা নয়, কিন্তু ভারী সুশ্রী আর কি মিষ্টি গান গায়। রোজ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আমি শুনি। আজ পর্যন্ত কথা হয় নি বটে, তবু ওই মেয়েও আমাকে বেশ লক্ষ্য করেছে জানি। কিন্তু কোবরেজের ছেলে কোবরেজ হয়ে

সেদিকে হাত বাড়াতে গেলে ওরা ঝোঁটিয়ে বিদেয় করবে। একটা ভালো চাকরি পেলে আশা ছিল...।

চোখে-মুখে প্রত্যাশা উপচে পড়ছে। বাপীর মনে আছে ওই একদিন বলেছিল, কবিরাজের ছেলে হবু কোবরেজের সঙ্গে কোনো আধুনিক মেয়ে প্রেমে পড়েছে এমনটা নাটক-নভেলেও দেখা যায় না। বাপী দেখছে ওকে। এই আবেদন যে কত মোক্ষম নিশীথও জানে না।

—ঠিক আছে, লেগে থাক। আমি চেষ্টা করব।

বলতে পারত, এখানে রিজিয়ন্যাল ইউনিট হলে চাকরি তোর হয়েই গেছে ধরে নিতে পারিস। কিন্তু অতটা বলে কি করে, একটু আগেই বলেছে ওর হাত নেই আর মালিক কড়া লোক।

বিজয় মেহেরা আগেও সুপুরুষ ছিল। এখন আরো খোলতাই হয়েছে। ফর্সা মুখে লালচে আভা, মাথায় পাতলা চুল এখন বাদামী গোছের। আগের থেকেও কমনীয় জোরালো পুরুষে ছাঁদ।

সহজ আনন্দে বাপীকে জাপটে ধরল। বলল, মাত্র দশ মিনিট আগে ফ্রি হলাম। তারপরেই তুমি আসছ মনে পড়তে দশটা মিনিট যেন দশ ঘণ্টা।

বাপীর ভালো লাগছে। ছেলে কাজের সময় কাজ-পাগল আর প্রেমের সময় প্রেমপাগল। টিপ্পনী কাটল, আমি আসছি বলে, না ডলির দূত আসছে বলে?

হা-হা শব্দে হাসল। তারপর পাল্টা জবাব দিল, তুমিও আমার কাছে কম নও। লন্ডনে থাকতে ডলির যত চিঠি পেয়েছি তার সবগুলোতে ফ্রেন্ড-এর একগাদা করে প্রশংসা। মাঝে মাঝে ভয় ধরেছে, আমার কপাল না ভাঙে।

অফিস আর ফ্যাক্টরি এলাকার মধ্যেই একদিকে রেসিডেনসিয়াল কোয়াটারস। তাছাড়া মস্ত ক্লাব আছে, অঢেল খানাপিনার ব্যবস্থাও আছে সেখানে। দু'ঘরের সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে থাকে। আগে বাপীকে সেখানে নিয়ে এলো।

—ডলি কেমন আছে বলো।

—খুব ভালো। পাকা ফলটির মতো তৈরি।

এক্ষুনি ছুটে গিয়ে দেখতে পাচ্ছে না বলে গলা দিয়ে একটা হাল্কা খেদের আওয়াজ বার করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি কলকাতায় এসেছ কেন?

নির্জলা সত্যি কথাটা বলে কি করে। জবাব দিল, ডলির তাগিদে।

খুশি। হাসছে—একেবারে গ্রীন সিগন্যাল নিয়ে এসেছ তাহলে?

বাধ্য হয়ে এবারও সত্যের অপলাপ—অতটা নয়, রেড থেকে ইয়েলো হব-হব বলতে পারো।

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু রাগের ঝাপটা—এতদিন পরে ইয়েলো হব-হব। অথচ ডলি প্রত্যেক চিঠিতে আমাকে লিখেছে ফ্রেন্ড যখন ফয়সলার ভার নিয়েছে তোমার কোনো ভাবনা নেই! আমি কি ভিখিরি নাকি যে কবে তিনি দয়া করবেন সেই আশায় বসে থাকব!

এবারে বাপীও গম্ভীর একটু। প্রায় অনুযোগের সুরে বলল, আচ্ছা বিজয়, তোমার

হবু শাশুড়ী কেমন আছেন একবারও জিগ্যেস করলে না তো?

অপ্রস্তুত একটু।—ডলি লিখেছিল বটে শরীর ভালো যাচ্ছে না, কেমন আছেন?

—বেশ খারাপ।

—কি হয়েছে? এবারে উদ্বিগ্ন একটু।

—হার্টের কি-সব ভাল্ব-টাল্ব ড্যামেজ। ফরেনে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর কথা ভাবছি।...এর মধ্যে তোমার গ্রীন সিগন্যালটাই যদি বড় করে দেখো সেটা কেমন হবে?

সমস্যাটা অস্বীকার করা গেল না।—গেলে ডলিও সঙ্গে যাবে?

—একমাত্র মেয়ে কাছে থাকবে না সেটা হয় কিনা তুমিই ভাবো।

বিজয়ের বেজার মুখ। এই থেকেই বোঝা গেল ছেলেটার মায়া দয়া আছে। তবু বলল, বিয়েটা হয়ে যেতে বাধা কি, তারপর না-হয় যাক।

—সে চেষ্টাও করতে পারি। তাছাড়া বাইরে উনি যেতে চাইবেন কিনা তাও জানি না। মোট কথা, এমন একটা অবস্থার মধ্যে তাঁর মুখ না তাকিয়ে তুমি যদি তড়িঘড়ি কিছু করে ফেলার জন্য জুলুম করো তাহলে আমাদের সকলকেই মুশকিলে ফেলবে। তোমাকে ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বিজয় চুপ খানিকক্ষণ। তারপর হালছাড়া গোছের বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে।...তবে আমি আশা করেছিলাম, ডলির মায়েব মন খানিকটা তৈরি হয়ে আছে।

—ওই চাকরি ছেড়ে তুমি ব্যবসায় চলে এসো, দশ মিনিটের মধ্যে আমি তাঁর মন তৈরি করে দিচ্ছি।

—তা কখনো হয়!

—তা যখন হয় না, এমন একটা অসুখের সময় একমাত্র মেয়েকে চোখের আড়াল করা কত শক্ত সেটাও তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি শুধু ঠাণ্ডা মাথায় একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি কি করা যায়।

বিজয় ক্লাব ক্যানটিনে ডিনারে নিয়ে গেল তাকে। খাওয়ার ফাঁকে তার চাকরি-বাকরির খোঁজও নিতে ভুলল না বাপী। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে এই দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে, ওর কম করে গোটা পনের সিগারেট খাওয়া সারা।

খাওয়া শেষ করেই আবাব সিগারেট ধরাতে বাপী বলল, তোমার সিগারেটের মাত্রা বেড়েছে মনে হচ্ছে—

—তা কি করব। সমস্ত দিন খাটাখাটুনির পর এই তো সঙ্গী।

—ড্রিংক-এর মাত্রা বাড়োন তো?

নিঃসংকোচে হেসেই জবাব দিল, তাও বেড়েছে, আজ তোমার কম্প্যানি পেলাম বলে দরকার হল না—ভালো চাও তো তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করো।

বাপীও হেসেই সাবধান করল, এ দুয়ের কোনোটাই কিন্তু তোমার হবু শাশুড়ী ভালো চোখে দেখবেন না।

সিগারেটে আরামের টান দিয়ে বিজয় বলল, তাঁর সামনে প্লেন ওয়াটার ছেড়ে ডিসটিলড ওয়াটার খাবো।

আবার আসবে কথা দিয়ে বাপী হোটেলে ফেরার ট্যাক্সি ধরল।

ভোরের আলোয় চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো বাপীর মনে হল,

আর মাত্র এই দিন আর রাতটা কাটলে তারপর যা কিছু সব মিষ্টি। এই দিন আর রাতটাকে চোখের পলকে পিছনে ঠেলে দিতে পারলে দিত। কিন্তু মিষ্টির প্রতীক্ষাটুকুও খুব মিষ্টি গোছের কিছু।

নিশীথের দুপুরে আসার কথা। বাপী ওকে সকালেই আসতে বলেছিল, কিন্তু সকালে পাশে না থাকলে বাবা এই বয়সেও কটু কথা শোনায়। চায়ের পাট শেষ করে দাড়ি কামাতে কামাতে বাপী ভাবছিল ও এলে একবার ব্রুকলিনে গিয়ে আগে রতন বণিকের সঙ্গে দেখা করবে। তারপর আজ আর কোনো কাজটাজ নয়, দুপুরের শোয়ে নিশীথকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখবে। কতকালের মধ্যেও সিনেমা-টিনেমার ধারেকাছে ঘেঁষেনি।

সকাল তখন সোয়া নটা। ঘরের টেলিফোন বাজল। বিজয় আর নিশীথ দুজনেই টেলিফোন নম্বর নিয়েছিল। ওদেরই একজন হবে ধরে নিয়ে সাড়া দিল।

ওদিক থেকে অপরিচিত গলায় প্রশ্ন এলো, বাপী তরফদার?

সায় দেবার পর যা শুনল, বাপীর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে ওঠার দাখিল।—আমি সুদীপ নন্দী...মিষ্টির দাদা, তোমাদের বানারজুলির দীপুদা...চিনতে পারছ?

সহজ হবার দায়ে বাপী চুপ একটু। তাছাড়া হঠাৎ এমন একজনের টেলিফোন অপ্রীতিকর কিছু শোনার আশঙ্কাই বেশি। জবাব দিল, আমি চিনতে পেরেছি, তোমার মনে আছে সেটাই আশ্চর্য।

ওদিক থেকে মোলায়েম হাসির শব্দ।—আমার মনে থাকবে না কেন, আমি তো তখন অ্যাডাল্ট।...তুমি এত বড় হয়েছ জেনে মা আর আমি খুব খুশি হয়েছি। সেদিন বাড়ির দোরগোড়ায় এসেও না দেখা করে চলে গেছ শুনে মা মিষ্টির ওপরেই খুব রাগ করেছে।

রোসো বাপী তরফদার, রোসো। বুকের তলায় লাফঝাঁপে বে-সামাল হয়ো না। হেসে বলল, রাত হয়ে গেছল, মিষ্টি তো দিল্লি থেকে আজ রাতেই ফিরছে?

—হ্যাঁ। আমি কাল দিনে দুবার আর সন্ধ্যের পর একবার তোমাকে ফোন করেছিলাম...তুমি ঘরে ছিলে না।

—তাই নাকি? বাপীর গলায় অন্তরঙ্গ খেদ।—জানি না তো. অপারেটারকে বলে রাখলে আমিই ফোন করতাম...

—তাতে আর কি হয়েছে,...তুমি আজ বিকেলেই এসো না একবার, এখানেই চা-টা খাবে? মা-ও বার বার বলছেন তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে...অবশ্য এসো —আসবে তো?

বুকের তলায় আবারও খুশির দামাল বাতাস। মিষ্টি দিল্লি রওনা হবার আগে এদের তাহলে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। নইলে এদের কাছ থেকে এমন আমন্ত্রণের আর কোনো অর্থ হয় না। আপত্তি করার কোনা প্রশ্ন নেই। জিজ্ঞাসা করল, বিকেলে কখন?

—আমি পাঁচটার মধ্যে কোর্ট থেকে ফিরব...ধরো সাড়ে পাঁচটা ছটা?

—তুমি কোর্টে প্র্যাকটিস করছ?

—হ্যাঁ হাইকোর্টে। বিলেত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি করছি, মিষ্টি বলেনি?

বাপী তাড়াতাড়ি সামাল দিল, হ্যাঁ তাই তো, চার বছর আগেই শুনেছিলাম তুমি ব্যারিস্টারি পড়তে গেছ। ঠিক আছে বিকেলে যাব, কিন্তু একটা শর্তে।

—কি ?

—রাতে আমার এখানে তোমার ডিনারের নেমন্তন্ন। তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে ফিরব।

—ওয়াণ্ডারফুল! বানারজুলির গাঁট্টা-মারা সুদীপ নন্দীর অস্তিত্ব নেই আর।—তোমার হোটেলের ডিনার মানে তো মস্ত ব্যাপার! গলা খাটো করে জিগ্যেস করলো, বিলিতি খাওয়াবে তো ?

—নিশ্চয়, যা তোমার ইচ্ছে আর যত ইচ্ছে। ডান ?

—ডান।

—ঠিক আছে, ছটার মধ্যে যাচ্ছি।

রিসিভার নামিয়ে বাপী হাওয়ায় ভাসল খানিকক্ষণ।...মিষ্টি বেশি রাতে ফিরবে, কোনো অছিলায় আজই তার সঙ্গে দেখাটা হয় না? কি করে হবে, বাপী যে আবার আনন্দে কাঁসি হারিয়ে বোকার মতো দীপুদাকে হোটেলে ডিনারের নেমন্তন্ন করে বসল! তাহালেও ভালোই করেছে। ওই মা-ছেলেকে বশে আনতে পারাটাও কম ব্যাপার নয়।

নিশীথকে টেলিফোন করে আসতে বারণ করে দিল। জরুরী কাজ পড়ে গেছে। পরে কবে কখন দেখা হবে, টেলিফোনে জানাবে। এই দিন আর ওর সঙ্গে ভালো লাগবে না, সিনেমা-টিনেমাও না।

ফের বাতাসে সাঁতার কাটার ফাঁকে আবার মনে হল কিছু। ও অনেক বড় হয়েছে, মিষ্টির মা আর দাদার এত খাতির অনেকটা এই কারণে। তা না হলে উল্টে ওর ওপর অসন্তুষ্ট হত তারা। এই দুজনের কাছে বড় হওয়াটা আরো জাঁকিয়ে তোলার তাগিদ। রিসিভার তুলে সোজা ম্যানেজারকে চাইল। বক্তব্য, আজ বিকেল থেকে ওর জন্য ভালো একটা সার্ভিস-কার অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব কি না। শুধু আজকের জন্য নয়, পর পর কয়েকদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওই গাড়ি তার হেপাজতে থাকবে। তার জন্য যত খরচ লাগুক, আপত্তি নেই।

ঘন্টা দুই বাদে ম্যানেজার জানালো, ভালো সার্ভিস-কারই পাওয়া গেছে। গাড়ি নিচে আছে, সে ইচ্ছে করলে দেখে যেতে পারে।

বাপী তক্ষুনি নেমে এলো। তখন বিলিতি গাড়িরই ছড়াছড়ি বেশি। ঝকঝকে গাড়ি। তকমা-পরা ড্রাইভার। তাকে ঠিক পাঁচটায় আসতে বলে বাপী হৃষ্টচিত্তে ওপরে উঠে এলো।

সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ি। মাত্র চার বছর আগে এই বাড়িরই দোরগোড়ায় পাড়ার স্তাবকের দল কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে ওকে ছেঁকে ধরেছিল, ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল। আজ সেই বাড়িতেই বাপী তরফদার সমাদরের অতিথি। টাকা যার, মামলা তার। বাপী সেই মেজাজেই দূর থেকে দোতলার বারান্দার দিকে তাকালো। রেলিংএর কাছে মনোরমা নন্দী দাঁড়িয়ে। পাশে দীপুদা।

এই গাড়ি দেখেও তাদের চোখ ঠিকরেছে বাপী আঁচ করতে পারে। গাড়ি থামতে ড্রাইভার আগে নেমে শশব্যস্তে দরজা খুলে দিল। বাপী নামল।

দীপুদা ছুটে নেমে এসে ওকে সাদরে জাপটে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। মনোরমা নন্দীও নেমে এসেছেন। এখন আর ব্যঙ্গ করে বাপীর তাঁকে মেমসায়েব বলতে ইচ্ছে করছে না। হাসিমুখে এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

—বাঃ, ভারী সুন্দর চেহারা হয়েছে তো তোমার, না জানলে আমি চিনতেই পারতুম না! বোসো বোসো।

অন্তরঙ্গ হেসে দীপুদা বলল, কেন, ছেলেবেলাতেই তো বেশ চেহারা ছিল ওর।

মিসেস নন্দীর মুখের হাসি খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না বাপীর। হাসির ওধারে যাচাইয়ের চোখ। ছেলের কথার জবাবে বললেন, তা ছিল, কিন্তু কি দুষ্টু, কি দুষ্টুই না ছিল তখন!

হৃষ্টমুখে দীপুদা মন্তব্য করল, অমন দুষ্টু ছিল বলে আমি তখনই জানতাম ও কালে-দিনে বড় হবে।

বাপীর মজাই লাগছে। তার কানে এখনো মহিলার শাসনের স্পর্শ লেগে আছে। পিঠের চাবুকের দাগ আজও মেলায়নি। দীপুদার কথায় কথায় গাঁট্টা মারাও ভোলেনি। কিন্তু আজ টাকা যার, মামলা তার।

মনোরমা নন্দীর বাবা মারা গেছেন শুনল। এক মেয়ে, তাই বাড়িটা এখন তাঁর। দীপুদা বিয়ে করেছে। ছেলেও আছে। বউকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। বেশ সুশ্রী, কিন্তু রোগা। তাদের দেড় বছরের ফুটফুটে ছেলেটাকে বাপী আদর করে কোলে তুলে নিল। চারদিক তাকিয়ে বাপীর কেন যেন মনে হল বিলেত-ফেরত দীপুদার ব্যারিস্টারির পসার তেমন জমজমাট নয়।

আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি নেই তা বলে। মনোরমা নন্দী জোর করেই অনেক কিছু খাওয়ালেন। শাঁসালো ডিনারের লোভে দীপুদা সামান্য খেল। মা-ছেলে তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর খবর নিতে লাগল। অর্থাৎ ঠিক কত বড় হয়েছে আঁচ করার চেষ্টা। মহিলা শেষে জিজ্ঞেস করে ফেললে, এত বড় ফার্মের তুমিই সকলের ওপরে, না তোমার ওপরে আর কেউ আছে?

—মালিক আছেন। তবে আমাকেই সব করতে হয়।

—মাইনে তো তাহলে অনেক পাও নিশ্চয়?

সত্যি যা তার চেয়ে ঢের বেশি বাড়িয়ে বলার লোভ সামলালো বাপী—অনেক আর কি, হাজার আড়াই।...তবে আসল রোজগার পার্টনারশিপের শেয়ার আর কমিশন থেকে, সেটা মাইনের থেকে অনেক বেশি।

বাহান্ন সালে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতের আর্থিক কাঠামোর দিকে তাকালে রোজগারের এই জলুস যে কোনো মধ্যবিত্তের চোখ ঠিকরে দেবার মতো। যুদ্ধের আপিসগুলো গোটানোর ফলে যে সময় ঘরে ঘরে বেকার, সামগ্রিক ব্যবসার বাজারও মন্দা।

মা আর ছেলে দুজনের কারো মুখে কথা সরে না খানিকক্ষণ। নিজের বিত্তের ঢাক বাজানো এই প্রথম। বাপীর নিজেরই কান জুড়লো। চোখও। বানারজুলির গরিব কেরানীর ছেলে এতদিনে তার হেনস্থার জবাব দিতে পেরেছে।

বাইরেটা শুধু সহজ নয়, অন্তরঙ্গও।—আপনাদের খবর কি বলুন—মেসোমশাই এখন কোথায় পোস্টেড?

বানারজুলির সেই দাপটের বড়সাহেবকে আজ অনায়াসে মেসোমশাই বলতে পারল। মনোরমা নন্দী জবাব দিলেন, তাঁর তো সেন্টারের চাকরি এখন, উড়িষ্যায় আছেন। টানধরা তপতপে মুখ।—খবরের কথা আর কি বলব, কি যে মতি হল মেয়েটার, আমাদের

সুখ-শান্তি সবই গেছে।

বাপী হতভম্ব হঠাৎ। এই কথা কেন! মিষ্টি এয়ার অফিসে কাজ করছে বলে? জিজ্ঞাসা করল, মিষ্টি কি করেছে?

এবারে মা আর ছেলে দুজনেই অবাক একটু। মনোরমা নন্দী ফিরে জিগ্যেস করলেন, কেন সেদিন মিষ্টি তোমাকে বলেনি কিছু?

বাপী আরো বিমূঢ়। মাথা নাড়ল। কিছু বলেনি।

সুদীপ নন্দীর ব্যারিস্টারি মাথাও যেন বিভ্রান্ত একটু—হোটেল থেকে ফিরে মায়ের কাছে তোমার সম্পর্কে কত কথা বলল, মায়ের কাছে তোমার কার্ড নিয়ে বাড়িতে ডাকার কথাও বলে গেছে—আর নিজের সম্পর্কে ও তোমাকে কিছু জানায়নি!

অজ্ঞাত আশঙ্কায় বাপী দুজনকেই দেখে নিল একবার করে। আবারও মাথা নেড়ে জিগ্যেস করল, সুখ-শান্তি নষ্ট হবার মতো মিষ্টি কি করেছে?

কি জবাব দেবেন ভেবে না পেয়ে মনোরমা নন্দী ছেলের দিকে তাকালেন। দীপুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, মা আবার বেশি-বেশি ভাবছে, তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়—চলো তোমার হোটেলেই তো যাচ্ছি, শুনবে'খন।

বাপীও উঠে দাঁড়াল। দীপুদার এ কথায়ও স্বস্তি বোধ করল না। মনোরমা নন্দীর মুখখানাই আর এক দফা দেখে নিল। ওই মুখে সুখ-শান্তির অভাবের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট এখন। নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো, তারপর আবার মনোরমা নন্দীর দিকে।— মিষ্টির ফিরতে রাত হবে, তবু আমাকে একবার ফোন করতে বলবেন তো!

ফের বিপাকে পড়ার মুখ মহিলার। জবাব দিলেন না, এমন কি মাথাও নাড়লেন না।

বাপীর অপরিসীম ধৈর্য। গাড়িতে দীপুদাকে একটি কথাও জিগ্যেস করল না। হোটেলে ফিরেও আগে তার জমজমাট ডিনার ব্যবস্থা করল। আস্ত একটা খাস বিলিতি বোতল সোডা ইত্যাদি নিজের সুইটে আনিয়ে নিল। খানাপিনা শুরু করার পরেও দীপুদা খানিকক্ষণ নিজের কথাই চালিয়ে গেল। বিলেতে কতদিন ছিল, কেমন ছিল, এখানে ফিরে সব দেখেশুনে সে-তুলনায় কতটা বীতশ্রদ্ধ, সুযোগ সুবিধে হলে সপরিবারে আবার সেইখানেই চলে যাবার বাসনা, এ-দেশে কেউ মানুষের দাম দেয় না, টাকা-পয়সার অভাব নেই যখন বাপী যেন ও-দেশটা ঘুরে দেখে আসে, ইত্যাদি। বাপীর হার্ড ড্রিংক চলে না শুনেও হতাশ একটু। নিজের গেলাস বার দুই খালি হবার পরেও নিষ্ফল অনুরোধ, দেখই না একটু টেস্ট করে, খারাপ লাগবে না।

তার গেলাস আরো এক-দফা খালি হবার পর বাপী নিজের হাতে বোতলের জিনিস এবার একটু বেশিই ঢেলে দিল। সোডা মেশালো। তারপর ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞেস করল, মাসিমা কি বলছিলেন, মিষ্টি কি করেছে?

এবারে সুদীপ নন্দী গলগল করে যা বলে গেল তাতে ব্যারিস্টারি বাকচাতুরি থেকে স্থূল গোছের উষ্মাই বেশি।

বি-এ পরীক্ষার আগেই মিষ্টি উল্টোদিকের বাড়ির এক ছেলেকে বিয়ে করেছে। গোপনে রেজিষ্ট্রি বিয়ে। ছেলের নাম অসিত চ্যাটার্জি, মিষ্টির থেকে কম করে আট বছরের বড়। ছেলেটা রূপে কার্তিক, গুণে মাকাল ফল। দুবারের চেষ্টায় আর-এ পাশ করেছে।

সাড়ে তিনশ' না চারশ টাকা মাইনেয় সবে একটা ফার্মে ঢুকেছিল। এখনো পাঁচশ' টাকার বেশি মাইনে পায় কিনা সন্দেহ। মিষ্টিটা এত বোকা গাধা কে জানত, ছয় মাস না যেতে হাড় কালি। ছেলের বাপ মা আর বাড়ির সব এমন গোঁড়া যে জানাজানি হবার পর বউ ঘরে নেওয়া দূরে থাক, তারা ছেলেকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

দীপুদা আগে কিছু জানত না। মিষ্টির বিয়ের এক মাস বাদে সে বিলেত থেকে ফিরেছে। এসে দেখে বাবা ছুটি নিয়ে কলকাতায় বসে আছে, আর মায়ের মুখ কালি। গুণধর জামাইয়ের এত দেমাক যে শ্বশুর-শাশুড়ী ভুরু কোঁচকালেও তার অপমান হয়। হুমকি দিয়ে কথা বলতেও ছাড়ে না। মিষ্টির বি-এ পরীক্ষা হতেই জোর করে তাকে নিয়ে গিয়ে আলাদা ঘরভাড়া করেছে। কিন্তু চলে কি করে? ওদিকে তো গুণের ঘাট নেই। মদের নেশা জুয়ার নেশা সবই আছে। এসব অবশ্য পরে জানা গেছে।

ছ'মাস না যেতে মিষ্টি মরতেই বসেছিল। ছেলেপুলে হবে, এদিকে টাকাপয়সার জোর নেই, উঠতে বসতে অশান্তিরও শেষ নেই। অত সুন্দর মেয়েটার দিকে তাকালে তখন ভয় করে। বাছাধনের তখন টনক নড়ল, বউকে মায়ের কাছে পাঠাতে চাইল। কিন্তু মিষ্টির আবার তখন এমন গোঁ, কিছুতে আসবে না। আসবে কি করে, বাবা মা দাদা কাকে না অপমান করেছে অসিত চাটুজ্জে?

দীপুদাদেব অজান্তে এরপর মিষ্টি শেষই হতে বসেছিল। পেটের ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে। তার ফলেই প্রাণ-সঙ্কট। অসিত চ্যাটার্জি সস্তার একটা হাসপাতালে এনে ফেলেছিল ওকে। সেখানেও আজেবাজে ডাক্তার দিয়ে অপারেশন হয়েছে। পরে দীপুদা আর তার মা কলকাতার সব থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে সে আবার অপারেশন করেছে। তাইতেই রক্ষা। সেই বড় ডাক্তারও বলেছে, বাজে হাতে পড়ে মেয়েটাব অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তবে প্রাণে যে বেঁচেছে এই ঢের।

এরপর টানা ছ'মাস মিষ্টি মায়ের কাছে ছিল। মেয়েটার শরীরের বাঁধুনি ভালো বলতে হবে, তিন মাস না যেতেই আগের শ্রী-স্বাস্থ্য সবই ফিরে পেয়েছে। পরের তিন মাসের মধ্যে এয়ার অফিসের চাকরিটাও নিজের চেষ্টাতেই পেয়ে গেছে। মা ওকে আর ছাড়তেই চায় নি। কতবার করে বলেছে, ভুল যা হয়েছে—হয়েছে, কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেললেই ছেঁড়ে। দীপুদাও বোনকে অনেক বুঝিয়েছে। কিন্তু মাথায় যে কি ওটার, হ্যাঁ না কিছুই বলে না, শুধু হাসে। তাইতেই মা আর সে ভেবেছিল হয়তো রাজি হবে। কিন্তু ছ'মাস পার হতে নিজে থেকে আবার ওই অসিত চ্যাটার্জির কাছেই চলে গেল।

এখন অবশ্য লোকটা অনেকখানি ঢিট হয়েছে। তবু অমন একটা বাজে লোকের সঙ্গে বোন সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে এ দীপুদা বা তার মা বিশ্বাসই করে না। কিন্তু ও মেয়ের মাথায় কি আছে কে জানে, মা তাগিদ দিলে হাসে, আবার বেশি বললে বিরক্ত হয়। মনোহরপুকুর রোডে মোটামুটি একটা ভালো ফ্ল্যাটেই থাকে এখন। সেদিন বাপী ওকে মায়ের বাড়ি পৌছে দিতে ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে তারপর নিজের বাড়ি চলে গেছে। আজ মিষ্টি ফিরবে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হবে না বা কথা হবে না। কারণ ওর বাড়িতে টেলিফোনও নেই।

সমস্ত রাত চোখে-পাতায় এক হয়নি বাপীর। ঘুমোতে চেষ্টাও করেনি।

তার জগৎ অন্ধকার। এ অন্ধকার দূর করার মতো আলো নেই কোথাও। আগুন আছে। সেই আগুন বুকের তলায়। এ আগুন বাইরে নিয়ে এলে ওই অন্ধকারে যে ক্রুদ্ধ হিংস্র পশুটা থাবা চাটছে, সেটা পুড়বে। বাপী তরফদার আর ওকে ধ্বংস করতে চায় না।

পরদিনই বানারজুলি চলে যাবার চিন্তা বাতিল। সকালে নিশীথ টেলিফোন করে আসতে চেয়েছে। বাপী বলেছে, আজ না, খুব ব্যস্ত। সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। একটু বাদে আবার টেলিফোন। বিজয় মেহেরা। তাকেও বলেছে, আজ না।

সকাল পেরিয়ে দুপুরও গড়াতে চলল। বাপী নরম গদীতে শুয়ে। অপেক্ষা করছে। এই বিকেলে মিষ্টি আসবে কথা দিয়ে গেছে। বাপীর ধারণা আসবে। সমস্ত ঘটনা ওর কানে দেবার জন্যেই মাকে আর দাদাকে বলে গেছে ওকে বাড়িতে চা'য়ে ডাকতে। নিজে কেন বলেনি? ভয়ে? তাই যদি হয়, তাহলে বিকেলে আর আসবে না। কিন্তু অত ভীতু বাপী ওই মেয়েকে এখনো কেন ভাবছে না, জানে না।

...এলে কি হবে?

বাপী তাও জানে না।

এলো একলা নয়। সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জি। তার পরনের ট্রাউজার বা কোট তেমন দামী নয়। চোখে আগের মতোই সোনার চশমা। গায়ের রং আগের তুলনায় কিছুটা ঝলসেছে। বিব্রত হাসি-হাসি মুখ।

মিষ্টির পরনে গাঢ় খয়রি রংয়ের দামী শাড়ি। গায়ে চকচকে সাদা ব্লাউস।

সিঁথিতে সরু সিঁদুরের আঁচড়। কপালে লাল টিপ। কালকের থেকে ঢের বেশি সুন্দর। হিংস্র উল্লাসে ভোগের রসাতলে টেনে নিয়ে যাবার মতোই লোভনীয়।

নিজের এমন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের ক্ষমতা কি বাপীর জানা ছিল! দু-হাত বাড়িয়ে সরগরম অভ্যর্থনা জানালো।—এসো অসিতদা এসো—চার বছর আগে লেকে তোমার সেই গলাধাক্কা খাবার পর থেকে তুমি আমারও হীরো হয়ে বসে আছ জানো না—

এরকম অভ্যর্থনার জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না বোঝা যায়। খুব স্বেচ্ছায় হয়তো আসেনি এখানে। মিষ্টির বাড়ির রাস্তায় আর লেকে যাকে অত হেনস্থা করা হয়েছে, সে এখন এই হোটেলের এমন ঘরের বাসিন্দা, সে-কারণেও হয়তো সহজ হওয়া মুশকিল। মিনমিন করে জবাব দিল, ও-সব ছেলেবেলার ব্যাপার তুমি এখনো মনে করে বসে আছ...

হাত ধরে বাপী সাদরে তাকে গদীর বিছানাতেই বসিয়ে দিল। আধা পার্টিশনের ওধার থেকে একটা সোফা মিষ্টির সামনে টেনে আনল। তারপর নিজের খাটের একদিকে বসে ওই সোনার চশমার ওপর চড়াও হল আবার।—কাল দীপুদার মুখে সব শোনার পর থেকে কেবল তোমার কথাই ভাবছিলাম। তুমি একটা পুরুষের মতো পুরুষ, আমাকে তোমার শিষ্য করে নিলে বর্তে যাই।

চকচকে চশমার ওধারে চোখ দুটো স্বস্তি বোধ করছে না খুব। আবারও শুকনো হাসি টেনে বলল, কি যে বলো, কত বড় একজন মানুষ তুমি এখন...

—গুলি মেরে দাও, ধন-জন-যৌবন জোয়ারের জল—এলো তো এলো, গেল তো

গেল। কিন্তু তুমি যে কেরামতি দেখিয়েছ, সন অফ কুবেরও ভেড়ার মতো তোমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে।

মিষ্টি বাপীর দিকেই চেয়ে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ছুঁয়ে আছে। কিন্তু এর নাম হাসি নয়, হাসির মতো কিছু। ও মুখ দেখছে না, ভেতর দেখছে।

ও-রকম করে হাসলে আর অমন করে চেয়ে থাকলে বাপী কি করে বেশিক্ষণ এই হাসির মুখোশ ধরে রাখতে পারবে ? ওর ভিতরটা কি-রকম লোলুপ হিংস্র ব্যভিচারী হয়ে উঠেছে মিষ্টি কি তা আঁচ করতে পারছে ? পারলে অমন করে হাসত না। ও-ভাবে চেয়ে থাকতে পারত না।

টেবিলের ওপর বিলিতি মদের বোতলটা পড়ে আছে। দীপুদা ছ'আনা শেষ করে গেছে, বাকিটা আছে। অসিত চ্যাটার্জি ঘন ঘন ওই বোতলটার দিকে তাকাচ্ছে।

বাপী উঠে ছোট সেণ্টার টেবিল তার সামনে পেতে দিল। তারপর বোতলটা এনে রেখে জিগ্যেস করল, জল চাই, না সোডা ?

অসিত চ্যাটার্জির দু চোখ খুশিতে চিকচিক করছে এখন।—জলই ভালো, কিন্তু মিলু রেগে যাচ্ছে।

মিলু শুনেই কানের পর্দা দুটো ছেঁড়ার দাখিল বাপীব। মালবিকা ওর মিলু। জলের জাগ্ আর একটা গেলাস তার সামনে রেখে বাপী তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দিল, শিবঠাকুরকেও পার্বতী গাঁজাখোর বলে গাল পাড়ত,—এসব দেখে মেজাজ না চড়ালে ওদের মান থাকে না। কাল দীপুদা মাত্র অতটুকু সাবাড় করে রেখে গেছে, আজ তোমার কেরামতি দেখাও।

দীপুদার নামটা সবুজ নিশানের কাজ করল। গেলাসে বোতলেব জিনিস একটু বেশিই ঢেলে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জি মিষ্টিকে বলল, এমন জিনিস পেলে কে আর লোভ সামলাতে পারে। বাপীকে জিগ্যেস করল, তোমার গেলাস কোথায় ?

—আজ তুমিই চালাও। আমি এরপর দিনক্ষণ দেখে হাতেখড়ি দেব ভাবছি। বোসো. কিছু খাবার-দাবার আনাই—

আধঘণ্টার মধ্যে অসিত চ্যাটার্জি ভিন্ন মানুষ। বাপী যে এমন রত্ন ছেলে সে ভাবতেই পারেনি। মিলুও কখনো বলেনি। মাত্র একদিনের আলাপে বাপী আপনার জন হয়ে গেছে তার, অথচ পান থেকে চুন খসলে আপনার জনেরাই দূরে সরে যায়,—যাচ্ছেও, ইত্যাদি।

মিষ্টির তাড়া খেয়ে আরো ঘণ্টাখানেক বাদে উঠল। বোতলের নিচে দু'ইঞ্চির মতো জিনিস পড়ে আছে। মিষ্টি খাবার ছোঁয়নি, শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েছে। কিন্তু সে খাবারও প্রায় সবটাই অসিত চ্যাটার্জির উদরে গেছে। এখন ভালো মতো দাঁড়াতেও পারছে না। মিষ্টির মুখ লালচে দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু রাগ যার ওপর হবার কথা, অর্থাৎ বাপীর দিকে সাহস করে যেন তাকাতেও পারছে না।

অন্তরঙ্গ জনের মতো লোকটাকে ধরে বাপী লিফটএ নিচে নামল। দরজার কাছে এসে অস্ফুট স্বরে বলল, আমি একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসছি।

—ট্যাক্সির দরকার নেই, গাড়ি আছে। আঙুল নেড়ে বাপী তার সার্ভিস-কারের তকমাপরা ড্রাইভারকে ডাকল। গাড়ি নিয়ে লোকটা সমস্ত দিন বসেই আছে।

—সাহেবকে আর মেমসাহেবকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসো।

থমথমে দু চোখ মিষ্টির মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক। এতক্ষণ দুটো চোখ দিয়ে তার হিংস্র সত্তা দিয়ে যে আদিম পশু ওই তাজা নরম দেহটা ছিন্নভিন্ন করছিল, এখনো সে মুখোশের আড়ালে।

তাকালো মিষ্টিও। এখনো অভিযোগ নেই। শুধু কিছু যেন বোঝাতে চায়। ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই রকমই হাসির ছোঁয়া লাগল। যার নাম ঠিক হাসি নয়। হাসির মতো কিছু।

ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাপী তার ঘরে ফিরে চলল।

সাত

নিজের পৃথিবী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জীবন প্রতারণা করেছে ? বাপী তরফদার কার ওপর শোধ নেবে ? কাকে ক্ষমা করবে ? নিজের দুটো পা কপাল পর্যন্ত ওঠে না। নইলে সবার আগে ওটাকেই থেঁতলে দিত। এই কপালের ওপর বড় বেশি আশা ছিল। আস্থা ছিল। প্রেম প্রীতি ভালবাসার কোনো দুর্জয় শক্তির উপর নির্ভর করে বসেছিল। যেন যত খুশি লম্বা দুটো হাত বাড়িয়ে তারা স্থান-কালের গণ্ডী টপকে কারো জন্যে কাউকে আগলে রাখতে পারে। এই বিশ্বাসে সত্তার সব কড়ি উজার করে ঢেলে দেয় এমন বোকাও কেউ আছে !

আজ ফিরছে গায়ত্রী রাই জানে না। বাগডোগরায় তাই গাড়িও অপেক্ষা করে নেই। লাউঞ্জে পা দিতেই একদিকের সোফার দিকে চোখ গেল। যাবার সময় যে সোফায় মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম বাপীর সামনে এসে বসেছিল। হাওয়া আপিসের এক অফিসার স্ত্রী সাজিয়ে ওকে কলকাতায় নিয়ে যাবে এ আশায় দু মাস ধরে দিন গুনছিল আর এখানে হানা দিচ্ছিল। আত্মনির্ভর জীবনে ফেরানোর আশ্বাস দিয়ে বাপী তাকে আট দশ দিন বাদে বানারজুলির ঠিকানায় দেখা করতে বলেছিল। বাপীর গলা দিয়ে নিঃশব্দে একটা কটূক্তি বেরিয়ে এলো।

এলে কি হবে ? রেশমার কাজে লাগিয়ে দেবে, না দূর করে তাড়াবে ? বাসনার যে আগুন শিরায় শিরায় জ্বলছে, নাগালেব মধ্যে এলে আর কোনো মেয়ের তার থেকে অব্যাহতি আছে !

ইচ্ছে করেই বিকেল পার করে দিয়ে বানারজুলিতে পৌঁছুল। গত এক-দেড় বছরের মধ্যে সাইকেল রিকশা চালু হয়েছে এখানে। একটায় উঠে বসল। রিকশাঅলাটাকে হুকুম করল খুব আস্তে চালাতে। বানারজুলির আকাশ বাতাস জঙ্গল সব অন্ধকারে ডুবে যাক। আরো ঘন হোক, আরো গাঢ় হোক। বুকের ভেতরটা যেমন কালি হয়ে আছে তেমনি হোক।...সেই কবে আবু রব্বানী বলেছিল, তার মুখ দেখলেই ভেতর-বার সাফ মনে হয়, মেমসায়েবের পছন্দ হবে; কিন্তু আজ অন্তত বাপীর নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। এই মুখ আজ অন্ধকারেই সেঁধিয়ে থাক !

—মিস্টার তরফদার, এক মিনিট। সাইকেল রিকশার টিমটিম আলোয়ও মুখ চিনে যে লোকটা হাত তুলে ডেকে থামালো, সে চা-বাগানেব ক্লাবের ম্যানেজার ডাটাবাবু। রাস্তার উল্টো দিক থেকে হন হন করে আসছিল। ক্লাবে সন্ধ্যায় আসর বসার আগে

ফেরার তাড়া সত্ত্বেও ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়ে রিকশা থামিয়েছে।

—কি মুশকিলে পড়েছি বলুন তো, কত দিনের মধ্যে আপনাদের কোনো চালান নেই, এদিকে ভাল মাল প্রায় শেষ—আপনি এখানে নেই খবর পেয়ে আবু রব্বানীর কাছে গেছলাম, ও বলল, আপনি কলকাতা থেকে ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিছু মাল যে আমার এক্ষুনি দরকার।

বাপীর ইচ্ছা হল রিকশা থেকে নেমে ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। তার বদলে ঝাঁঝালো জবাব দিল, আপনার জন্যে আমি ঘরে মদের বোতল মজুত করে বসে আছি যে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেব?

মেজাজের ঝাপটায় ডাটাবাবু বে-সামাল।—না না, তা বলছি না, যত তাড়াতাড়ি হয়—

—চলো! ঝাঁঝালো বিরক্তির হুকুম রিকশাঅলাকে।

আগের বাঁকের মাথায় নেমে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ট্র্যাভেল সুটকেস হাতে বাপী বাংলোর দিকে এগলো। বারান্দায় আলো জ্বলছে। মা বা মেয়ে সেখানে বসে নেই। এগিয়ে এসে নিঃশব্দে নিজের বাংলোর গেট খুলে ভেতরে এলো।

ফেব্রুয়ারির শেষ এটা। কলকাতার তুলানায় এখনো এখানে ঠাণ্ডা বেশি। অন্ধকার ঘরের জানালা-টানলাগুলোও না খুললে চলে। তবু টর্চ জ্বেলে বাপী ঘরের ভেতরটা দেখে নিল একবার। সুটকেসটা একদিকে আছড়ে ফেলল। কাঁধের কোটটা দূর থেকে আলনার দিকে ছুঁড়ে দিল। তারপর বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে টর্চ নিভিয়ে দিল। পরনের ট্রাউজার বদলে পাজামা পরার ধৈর্যও নেই।

মাথাটাকে শূন্য করে দেবার চেষ্টা। কোনরকম চিন্তা মাথায় ঢুকতে দেবে না। ভালো না মন্দ না। আশা না হতাশা না। কিন্তু এমন অসম্ভব চেষ্টার সঙ্গে যুঝতে হয়। বাপী যুঝছে।...এই রাত পোহাবে। তখন আর অন্ধকারে সেঁধিয়ে থাকা যাবে না। মুখ দেখাতে হবে। দেখতে হবে। কিন্তু মাথার এই দাপাদাপি বন্ধ না হলে ভোর হবার আগেই পালাতে হবে কোথাও।

কতক্ষণ কেটেছে জানে না। আধ ঘণ্টা হতে পারে। জোরালো আলোর ঘায়ে বিষম চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

ঘরের আলো জ্বেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে আছে ঊর্মিলা। পরণে সাদা ফ্রক। তার উপর কার্ডিগান। বাপীর মুখখানা ভালো করে দেখে নিচ্ছে।

বিছানার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল—ফিরে এসে এমন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছ? তুমি ফিরেছ মা জানে?

সরল বিশ্বাসেও কেউ হিংস্র পশুর খাঁচা খুলে দিলে কি হয়? বাপী চেয়ে আছে। ওর ভিতরের কেউ চিৎকার করে বলতে চাইছে, শিগগির চলে যাও—পালাও। কারণ আর কেউ ওকে আরো কাছে টানার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করল, তুমি জানলে কি করে?

—আমি ক্লাবে ডাটাবাবুর জন্য বসেছিলাম। কটা দিনের মধ্যে তোমাদের কারো কোনো খবর নেই...যদি চিঠিপত্র এসে থাকে। ডাটাবাবু বলল, তুমি ফিরেছ আর তোমার মেজাজও খুব খারাপ। কি হয়েছে...তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?

—কি রকম দেখাচ্ছে?

উর্মিলা এতেই অসহিষ্ণু। গায়ের কার্ডিগানটা খুলে অদূরের চেয়ারে ছুঁড়ে দিয়ে আরো একটু কাছে এসে বলল, আমি জানি না, খবর কি বলো?

বাপীর চাউনিটা ওর মুখ থেকে বুকে নেমে আবার মুখে উঠে এলো। এই মেয়ের এমন মুখর যৌবনের দিক থেকে জোর করেই চোখ ফিরিয়ে ছিল এত দিন। আর তার দরকার আছে? ঠিক এই মুহূর্তে যে সংকল্পটা উকিঝুঁকি দিয়ে গেল সেটাকে প্রশ্রয় দেবে, না ঠেলে সরাবে?

জবাব দিল, খবর ভালো না।

সঙ্গে সঙ্গে উর্মিলার ফর্সা মুখ ফ্যাকাসে একটু। উদগ্রীবও।— আঃ! চেপেচুপে কথা বলছো কেন? কার খবর ভালো না, আমার না তোমার?

মগজে লোভের হাতছানি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নয় কেন? প্রেম ভালবাসার কি মানে? শুধু শব্দ ছাড়া আর কি? মোহ ছড়ায়, ভোলায়। একবাব দখলের আওতায় পাকাপাকি ভাবে টেনে নিয়ে আসতে পারলে এই মেয়েরই বা মোহ কাটতে আর ভুলতে কত সময় লাগবে? তবু আরো একবার ভিতরের আর কেউ বাপীকে এই লোভ থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল। জোর করে ও-পাশ ফিরে বলল, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে চলে যাও, আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে—কাল কথা হবে।

কিন্তু উর্মিলারও ধৈর্যের শেষ। খাটের ওপর বসে পড়ে এদিক থেকেই ঝুঁকে তার মুখ দেখতে চেষ্টা করল। তারপর চিরাচরিত অসহিষ্ণুতায় এক হাতে বাপীর চুলের মুঠি আর অন্য হাতে বুকের কাছটা ধরে জোর করেই আবার তাকে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করে বলে উঠল, তোমার মাথায় কিচ্ছু যন্ত্রণা হচ্ছেনা—কি হয়েছে আমি এক্ষুনি শুনতে চাই। তুমি বলবে কি বলবে না?

বাপীর মুখের ওপর ওর নিঃশ্বাসের হলকা, পাঁজরে মাথায় ওর হাঁটুর ওপরের আর হাতের উষ্ণ স্পর্শ। ঘন নাগালের মধ্যে তপ্ত দুরন্ত যৌবন। যা ঘটার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। তারপর ঘটে যেতে লাগল। কঠিন দুটো হাতের ঝটকা টানে ওই সুঠাম নারীদেহ বাপী তরফদারের বুকের ওপর। নরম দুটো অধর নিজের দুটো ঠোঁটে বিদীর্ণ করে করে রসাতলের গহ্বরে তলিয়ে যেতে চাইল। নিজের শক্ত বুকের ওপর ওই উষ্ণ নরম বুক গুড়িয়ে দেবার আগে হাত দুটো আর বুঝি ক্ষান্ত হবে না।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন অবিশ্বাস্য যে উর্মিলার সম্বিৎ ফিরতেই সময় লাগল খানিকক্ষণ। তারপর প্রাণপণে ওই অমোঘ গ্রাস থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিটকে নেমে দাড়াল। কপালের ওপরে বিশৃঙ্খলা চুলের গোছা এক হাতে পিছনে ঠেলে দিল। দেখছে। হাঁপাচ্ছে। দুই চোখ বিস্ফারিত। এই লোককে সে চেনে না, কখনো দেখেনি।

এবারে দুই চোখে ওই নরম দেহ ফালা-ফালা করছে। ঠোঁটের হাসি ধারালো ছোরার মতো ঝিলিক দিচ্ছে। গলার স্বরেও কোনো দ্বিধার পরোয়া নেই আর।—ঠিক আজই আমি এরকম করে বলতে চাইনি তোমার দিকের খারাপ খবরটা কি। তুমি জোর করে বলালে।

নিজের দুটো কানের ওপরেও বিশ্বাস খুইয়ে বসেছে উর্মিলা। হাঁপাচ্ছে এখনো। চেয়েই আছে।

—দেখছ কি? আর অত অবাক হবারই বা কি আছে। এই মূর্তি দেখেই ভেতর আরো নির্মম বাপীর।—এ তো আমার পাওনাই ছিল। ড্রাইভিং শেখানোর গুরুদক্ষিণা

হিসাবে অনায়াসে চুমুও খেয়ে ফেলতে পারো, বলেছিলে না? তবে এতে হবে না, এর থেকে ঢের বেশি দক্ষিণা দেবার জন্য তৈরি হওগে যাও।

শুধু চোখে নয়, গলা দিয়েও এবারে অস্ফুট আর্তস্বর বেরুলো উর্মিলার।—এ তুমি কি করলে বাপী! তুমি না ফ্রেন্ড? কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ কি হয়ে গেল তোমার? তুমি এমন কথা বলছ কেন?

বাপীর হাসিতে এতটুকু মায়ামমতার ছোঁয়া নেই। দু চোখে নরম তাজা দেহ লেহন করছে এখনো। একটু আগের উষ্ণ স্পর্শ আগুন হয়ে মাথার দিকে উঠছে। জবাব দিল, ফ্রেন্ড বলেই আমার দাবি বেশি, কলকাতায় গিয়ে এই বাস্তব বুদ্ধিটুকু নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন কথা বলছি কারণ তোমার মা যা চান তাই হবে। আর কদিনের মধ্যে ডলি মিসেস তরফদার হবে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে?

ঠোঁটে হাসি। গলার স্বর অকরুণ। চোখে আবারও ওকে দখলের মধ্যে টেনে আনার অভিলাষ। উর্মিলা সত্রাসে চেয়ে রইল একটু। তারপর ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গায়ের কার্ডিগানটা চেয়ারেই পড়ে থাকল।

মিনিট দশেক বাদে বাপী খাট থেকে নামল। ঠাস ঠাস করে ঘরের জানালাগুলো খুলে ফেলল। বাথরুমে এসে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিল। একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে। ওটা নির্মূল করার আক্রোশেই বাপী মাথাটা কলের তলায় পেতে দিল। তোয়ালে মাথায় বুলিয়ে ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল।

চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে গায়ত্রী রাই দাঁড়িয়ে। মাত্র কটা দিনের দেখা এই মুখ আরো সাদা, রক্তশূন্য। শরীর আরো খারাপ হয়েছে, না মেয়ে গিয়ে কিছু বলেছে বলে এমন বিবর্ণ মূর্তি বোঝা গেল না। কিন্তু প্রথম কথায় মনে হল না, মহিলা মেয়ের কাছ থেকে বড় রকমের কিছু ধাক্কা খেয়ে এসেছে। এক নজর দেখে নিয়ে বলল, এই ঠাণ্ডায় মাথা ভিজিয়ে এলে, মোছো ভালো করে, জল ঝরছে।

বাধ্য ছেলের মতো ঘরের আর একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবার মাথাটা মুছে নিল। একটু সময় দরকার। কিছু শোনার জন্য আর কিছু বলার জন্য প্রস্তুতি দরকার। তোয়ালেটা জায়গামতো রেখে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচাড়াতে আঁচড়াতে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বাপী বলল, বসুন। খুব ভালো দেখছি না তো, কেমন ছিলেন?

—ভালো না।

বেশি অসুস্থ না হলে এরকম বলে না। চিরুনি থেমে গেল। আয়নার ভেতর দিয়ে বাপী তার দিকে তাকালো। মহিলা এখনো দাঁড়িয়ে। ওর দিকেই চেয়ে আছে।

—সেই কষ্টটা আবার বেড়েছিল?

বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে বলেই যেন বিরক্ত।—কষ্ট লেগেই আছে, ও নিয়ে ভেবে কি করবে, তুমি কখন ফিরেছ?

—বেশিক্ষণ নয়। চিরুনি রেখে এগিয়ে এলো।—আমি নিজেই তো যেতাম, আপনার কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল।

চেয়ারটা তার সামনে টেনে দিতে গিয়ে বাপীর দু চোখ হোঁচট খেল একপ্রস্থ। উর্মিলার কার্ডিগান এখনো চেয়োরেই পড়ে আছে। গায়ত্রী রাই দেখেছে। ঠাণ্ডা মুখে বাপী ওটা তুলে আলনায় রাখল।

গায়ত্রী রাই চেয়ারে বসল। ও খাটে এসে বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর জিগ্যেস করল, ডলির কি হয়েছে?

জবাব না দিয়ে বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। ভাবলেশশূন্য এই সাদা মুখ দেখে আশা করছে কি হয়েছে বা কতটা হয়েছে মেয়ে হয়তো এখনো সেটা বলে নি। কিছু যে হয়েছে তাই শুধু বুঝে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। ফিরে জিগ্যেস করল, ডলি কিছু বলেছে আপনাকে?

—না।

—কি করছে?

—ঘরে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে কাঁদছে। ওর বাবা মারা যেতে এভাবে কাঁদতে দেখেছিলাম। তারপর আর দেখিনি। রাগ হলে তেজে ফোটে, কাঁদে না। কি হয়েছে?

মিথ্যের সঙ্গে সত্তার বিরোধ বাপীর। এই একজনের চোখে চোখ রেখে মিথ্যে বলা আরো কঠিন। তাছাড়া একলা ঘরে পশুর মতো যেভাবে দখল নেওয়া হয়েছিল আর হামলা করা হয়েছিল, কান্না থামলে মেয়ে মায়ের চোখে সেই নিষ্ঠুর লোলুপতার দিকটাই বড় করে তুলবে। শেষ মুহূর্তে সেই দখল না ছিঁড়তে পারলে ওই পশুর হাত থেকে আজ আর অব্যাহতি ছিল না মেয়ে তাও বলতে ছাড়বে না। বাপীব চিন্তায় এখনো কোনো বিবেকের দংশন নেই, কেনো আপোস নেই। এই মুহূর্তে তাই মাথা খুব ঠাণ্ডা।

ধীর গলায় জবাব দিল, আমাকেই বিয়ে করতে হবে, আর কারো চিন্তা আর আমার বরদাস্ত হবে না, আপনার মেয়েকে আজ সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি।

গায়ত্রী রাই অপলক চেয়ে আছে। আগের মতো সেই ভেতর-দেখা চোখ। শুধু এ-জন্যেই মেয়ে রাগে না ফুঁসে বা গর্জে উঠে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এ যেন বিশ্বাস করার মতো নয়। গলার স্বর নীরস একটু।—এ বোঝানোটা আরো অনেক আগে থেকে শুরু করোনি কেন?

—অসুবিধে ছিল।

অপলক চাউনিটা মুখের ওপর বিঁধেই থাকল খানিক। বোঝার চেষ্টা। জিগ্যেস করল, কলকাতায় গিয়ে সেই ছেলের সঙ্গে ফয়সালা করে এসেছ?

—না, এখানে এসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে মন স্থির করেছি।

দেখছেই। পরের প্রশ্নটাতেও তাপ উত্তাপ নেই।—এতদিন তোমার নিজেরও মন স্থির ছিল না?

ভিতরে ভিতরে বাপী সচকিত। মায়ের কাছে এরপর নালিশ যদি করে ঊর্মিলা, পশুর মতো দখল নেবার কথাই শুধু বলবে না, মিষ্টির কথাও বলবেই। শয়তান বুদ্ধি যোগাচ্ছে বাপীকে। জবাব দিল, ছিল না। কেন ছিল না আপনার জানা দরকার। ডলিকে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, সব শুনে আপনি যদি আমাকে বাতিল করেন, সে-বিচার মাথা পেতে নেব।

চাউনিতে ব্যতিক্রম দেখা দিল একটু। জিজ্ঞাসু।

ধীর নির্লিপ্ত সুরে বাপী বলে গেল, ছেলেবেলায় এখানকার এক মেয়েকে আমি খুব পছন্দ করতাম। তখনকার রেঞ্জ অফিসার, জঙ্গলের বড়সাহেব। আমার বাবা তার

আণ্ডারে সামান্য কেরাণী। অত বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে মিশতে চাইতাম বলে হামেশা তারা অপমান করত, তার ছেলে মারত, মা কান মলে দিত। সেই আক্রোশে ওই মেয়ের ওপর আমার পছন্দটা হামলার মতো হয়ে উঠেছিল। সেই পছন্দের শাস্তি কি পেয়েছিলাম এই দেখুন—

একটুও অবকাশ না দিয়ে ঘুরে বসে একটানে ট্রাউজারের তলা থেকে শার্টটা টেনে মাথার দিকে তুলে ফেলল সে।

আধ-হাত-প্রমাণ পাঁচ-ছটা এলোপাতাড়ি সাদা দাগ পিঠের চামড়ায় স্থায়ী হয়ে আছে। জামা নামিয়ে বাপী আস্তে আস্তে ঘুরে বসল আবার। গায়ত্রী রাইয়ের সাদাটে মুখ বিমূঢ় এখন।

তেমনি নিরুত্তাপ গলায় বাপী বলে গেল, বাবার তখন জ্ঞান ছিল না, চাবুকে চাবুকে বড় সাহেব আর তার মেয়ে আর তার মায়ের আর আরো অনেকের সামনে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। রক্তে জামা ভিজে গেছল। আমার বয়েস তখন চোদ্দ, সেই মেয়ের দশ। তার কিছুদিনের মধ্যে তারা এখান থেকে বদলি হয়ে চলে যায়। কিন্তু আমি তাদের কোনদিন ভুলিনি, ভুলতে চাইনি। বি-এস-সি পাশ করার পর কলকাতায় যখন চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তখন আবার সেই মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আবারও অপমানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমি বানারজুলিতে ফিরে এসে আপনাকে পেয়েছি। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যেও সেই মেয়ের সঙ্গে ফয়সালার চিন্তা আমার মাথা থেকে যায় নি। এবারে কলকাতা দিয়ে দেখলাম সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

এর পরেও হতভম্বের মতো চেয়েই আছে গায়ত্রী রাই। রাগের চিহ্নও নেই, শুধুই বিস্ময়। এরই ফাঁকে বাপী ভিতরের আশঙ্কা ব্যক্ত করে ফেলল।—ডলি হয়তো আপনাকে এই মেয়ের কথা বলেও আমাকে বাতিল করতে চাইবে।

একটু নড়েচড়ে আত্মস্থ হল মহিলা। এবারে সদয় মুখ নয় খুব।—এত সবও ডলিকে তোমার বলা হয়ে গেছে তাহলে?

—আমি একটি কথাও বলিনি। এতটা ও জানেও না। ছেলেবেলার ব্যাপারটা আবু রব্বানী জানত। রেশমা আর দুলারির কাছে আবু সে-গল্প করেছে। ডলি রেশমার মুখ থেকে শুনেছে।

গায়ত্রী রাই ছোট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। ভালবাসা-ঠাসা নয়, যে-মেয়ের কথা শুনল তাকে ভুলতে না পারার পিছনে পুরুষের আক্রোশটাই বড় করে দেখেছে? অপমান ভোলার ছেলে যে নয় তার থেকে বেশি আর কে অনুভব করতে পারে। তবু জিজ্ঞাসা করল, সেই মেয়ের যদি বিয়ে না হয়ে যেত তাহলে কি করতে?

সত্যি কি বাপীর মুখে শয়তান কথা যোগাচ্ছে? সাদামাটা এক জবাবে মহিলার সমস্ত সংশয়ের অবসান। বলল, তাহলে আমার এতদিনের রোগ ছেড়ে যেত কিনা আমি জানি না।

নীলাভ দুটো চোখের গভীর স্নেহের এমন উৎসও কি বাপী খুব বেশি দেখেছে? গায়ত্রী রাই ওকে দেখছে এখনো। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সেই স্নেহ হাসির আকার নিচ্ছে। বলল, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমার কাছে তোমার ছেলে .বলার কথা তুলে ডলির খুব সুবিধে হবে না।

এতক্ষণে বাপী হাসল একটু।—আপনি যেমন ভাবছেন তেমন সুবিধেও হবে না। আমার জ্বর ছাড়লেও ডলির ছাড়েনি। বেগতিক দেখলে ও এখান থেকে পালাবে, হয়তো চিঠি লিখে বিজয় মেহেরাকে এখানে আনাবে। মাথা ঠাণ্ডা হবার আগে এরকম কিছু না করতে পারে আপনার দেখা দরকার।

স্নেহ-উপচনো ধমকের সুরে গায়ত্রী রাই বলে উঠল, আমার কি দায়! তুমি আগলাবে, তুমি দেখবে। ওর মন ফেরানোর মতো সময় আর সুযোগ কম পেয়েছিলে তুমি?

বাপী চুপ।

—কলকাতায় সেই ছেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

—কি বুঝলে?

রণে বা প্রেমের নীতির বালাই রাখতে নেই। প্রেমে না হোক, রণে জেতার দুরন্ত জেদ এখন। ঠাণ্ডা জবাব দিল, বড় হয়েই ফিরেছে, ভালো মাইনে, ফ্যাক্টরির মধ্যেই কোয়ার্টারস। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটুনি চলছে এখন, ফুরসত নেই বলে এখানে আসতে পারছে না। এক্ষুণি বিয়েটা করে ফেলতে চায়। একটু থেমে বিরূপ প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করে যোগ করল, সিগারেট খাওয়াটা আগের থেকেও অনেক বেড়েছে দেখলাম। আর সকাল সন্ধ্যা কাজে ডুবে থাকার পর রাতে একা ভালো লাগে না বলে ড্রিংকস-এর মাত্রাও বেড়ে গেছে নিজেই বলল।

কাউকে পিছন থেকে ছুরি বসানোর মতো একটা গ্লানি বুকের ভিতরেই গুঁড়িয়ে দেবার আক্রোশ বাপীর।

কঠিন আঁচড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গায়ত্রী রাইয়ের মুখে। রাগ বেশি হলে অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হয়ই। একটু লক্ষ্য করেই বাপী তাড়াতাড়ি বলল, আপনার শরীর ভালো দেখছি না, এ-সব কথা এখন থাক—

—কলকাতায় তাকে তুমি কি বলে এসেছ?

—বলেছি আপনি খুব অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া দরকার হতে পারে। বিয়ে এক্ষুণি সম্ভব নয়।

—আমি রাজি হব না একথা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এলে না কেন?

—জানালে ছুটি নিয়ে ডলির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে সে ছুটে আসত। আপনার মেয়ে তখন আরো অবাধ্য হত। এখনো কারো কথা শুনবে মনে হয় না।

গায়ত্রী রাই আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—না শুনলে আমি কোনদিন ক্ষমা করব না, সেটা তার জানতে বুঝতে বাকি থাকবে না।

দরজার দিকে এগুলো। বাপীর উচিত তাকে ধরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসা। মন ঝুঁকলেও আজ আর এটুকু পারা গেল না। পিছনের দরজা পর্যন্ত এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সব ছেড়ে কেন যেন মহিলার স্যাণ্ডাল পরা ধপধপে ফর্সা দুই পায়ের দিকে চোখ গেল। মনে হল এমন দুখানা পা-ও বেশি দেখেনি।

বিবেকের গলা টিপে ধরে আছে। কিন্তু যতক্ষণ না একেবারে মরছে ওটা ততক্ষণ ছটফটানি আছেই। যন্ত্রণা আছেই। থাকুক। গুমরোক। আপনি টিট হবে। শয়তানের হাতে

হাত মিলিয়েছে বাপী তরফদার। তার কাছে কারো জারিজুরি খাটবে না। সে নরকে টেনে নিয়ে যাবেই। বিবেকের দাস হয়ে থাকলে স্বর্গসুখ যে কত জানতে বাকি আছে? তার থেকে নরকের রাজত্ব ঢের ভালো।

ঘণ্টাখানেক বাদে কোয়েলা এসে তাকে খেতে ডেকে নিয়ে গেল। খাবার টেবিলে শুধু সে আর গায়ত্রী রাই মুখোমুখি। ঊর্মিলা নেই। থাকবে না জানা কথাই। দু চোখ তবু তার মায়ের মুখের ওপর উঠে এলো।

—ডলি খাবে না। তুমি শুরু করো।

ঠাণ্ডা মুখে মহিলা নিজেও খাওয়া শুরু করল। ইদানীং তার রাতের খাওয়া নামমাত্র। কিন্তু তাতে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেয়ে খেল না বলে ওই মুখে কোন রকম প্রশ্রয়ের ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু বাপীর কি হল? এক মেয়ে খাবে না শুনে জঠরে খিদে সত্ত্বেও মুখে রুচি নেই। শয়তানেরও মায়ামমতা আছে?

পরদিন সকালে বারান্দার চা-পর্বেও ঊর্মিলা অনুপস্থিত। ভিতরের ঘরেও তার অস্তিত্বের আভাস মিলল না। সতর্ক করার পরেও মেয়েকে আর একলা কোথাও ছেড়ে দেবার মতো কাঁচা নয় মহিলা। তবু আশঙ্কা। জিগ্যেস করল, ডলি কোথায়?

—বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। খুব মৃদু আর নিরুত্তাপ কঠিন সুরে বলল, ওকে যতটা বোঝানো দরকার বুঝিয়ে দিয়েছি। কোয়েলা চোখ রাখবে, তুমিও একটু খেয়াল রেখো। কিছু মতলব ভাঁজছে হয়তো, নইলে ক্ষেপে উঠত।

বাপী তরফদার নয়, সংগোপনে শয়তান বড়সড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েকে কতটা বোঝানো হয়েছে এই মুখ দেখে বাপী আঁচ করতে পারে। তার পরেও মেয়ে ওর পশুর মূর্তিটা মায়ের সামনে তুলে ধরেনি। দেহ দখলের হামলার কথা বলেনি। এখানো রাগে দুঃখে অপমানে ফুঁসছে হয়তো। পরে বলতে পারে। কিন্তু বাপী আর পরোয়া করে না। বললেও এই মা-টি আরো অকরুণ সংকল্পে মেয়ের বিরুদ্ধেই পরোয়ানা জারি করবে। যতটুকু বিশ্বাস করবে তাও পুরুষের দাপট আর পুরুষের অসহিষ্ণুতা ধরে নেবে। মনে মনে মহিলা বরাবর ওকে পুরুষের সম্মান দিয়ে এসেছে বলেই আজ তার এত স্নেহ, এমন অন্ধ বিশ্বাস।

এ কদিন ছিল না, বাপী তবু আজও আপিস ঘরের দিকে মাড়ালো না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। আবুকে দরকার। এক্ষুনি গেলে ঘরেই পাবে হয়তো।

আবুর দুটো ঘরেরই ভোল পাল্টে গেছে অনেক দিন। পয়সার ব্যাপারে ভাগ ভিন্ন ভোগে বিশ্বাস নেই বাপীর। ফলে কাঁচা টাকার মুখ আবুও কম দেখছে না। মাটির ঘর বাতিল করে কাঠের ঘর তুলেছে। তাতে হলদে সবুজ রংয়ের জেল্লা তুলেছে। টকটকে লাল টালির ছাদ বসিয়েছে। শুধু দোস্ত-এর কাছে কেনা, নইলে আবু রব্বানী এখন বুক চিতিয়ে নবাবী চালে চলে।

গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দোস্ত্ হুট করে কলকাতা কেন চলে গেছল জানে না। ফেরার খবরও রাখে না। বাপীর সাড়া পেলে যত কাজই থাক দুলারিও না এসে থাকতে পারে না। কিন্তু আজ আবুকে নিরিবিলিতে দরকার বাপীর।

আবু সাদর আপ্যায়ন জানালো, তুমি বাইরে থেকে হাঁক দাও কেন বাপীভাই, সোজা

ভিতরে চলে আসবে। এসো—কলকাতা গেছ শুনলাম, এদিকে ডাটাবাবু তো তুমি নেই বলে চোখে অন্ধকার দেখছে।

—বাদশাকে আজ জিপ দিয়ে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেব'খন, সে ব্যবস্থা করবে।...এখন আর বসব না, তুমি জঙ্গলের কাজে বেরুচ্ছিলে তো?...এসো।

দিন বদলালেও দুলারির ধাত বদলায়নি, মুখে কথা কম। দেখে বেশি। আজ বাপীর তাইতেই অস্বস্তিও বেশি।

জঙ্গলের পথে পা চালিয়ে বাপী সোজা প্রস্তাব করল, তোমাকে দিনকতক ছুটি নিতে হবে।

আবু হাঁ। কারো কাজে কোনো গুরুতর গাফিলতি ঘটে গেলে এ-রকম প্রস্তাব আসে জানে। দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখের দিকে তাকালো।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বাপী আবার বলল, ছুটি নিয়ে আমার নিজের একটু কাজে লাগতে হবে তোমাকে।

আবুর বদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্তি পেয়ে বাঁচল। কিন্তু এবারে অবাক তেমনি।—কি করতে হবে?

—সকালে দুপুরে আর বিকেলে একজনের ওপর নজর রাখতে হবে। তোমাদের মেমসায়েবের মেয়ে খুব সম্ভব আবার পালাতে চেষ্টা করবে।

—এতদিনের মধ্যেও মিসিসায়েবের সেই জ্বর ছাড়েনি?

বাপী মাথা নাড়ল। ছাড়েনি।

বেশ মজাদার উত্তেজনার রসদ পেল আবু। দোস্তএর এমন গম্ভীর মুখ না দেখলে কিছু চপল রসিকতা করে বসত। সোৎসাহে বলল, কিন্তু আমি একলা কত দিক আগলাবো? আমার দু'তিনজন সাগরেদকেও লাগিয়ে দিই তাহলে?

বাপীর ঠাণ্ডা মুখে বিরক্তির আভাস। মাথাটা আর একটু সাফ করো।—বিয়ের আগে আমার বউ পালাতে পারে বা পালাবার চেষ্টা করতে পারে এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার মান থাকবে? বানারজুলি থেকে বেরুনোর একটাই পথ, তুমি সাইকেল নিয়ে ডাটাবাবুর ক্লাবের রাস্তা আগলালেই হবে—যেমন দরকার বুঝবে করবে।...এদিকে কোয়েলার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে না, আর আমিও চোখ বুজে থাকছি না।

শেষের কথাগুলো আর কানে গেল কিনা সন্দেহ। বিস্ময়ের অকূল দরিয়ায় পড়ে হাবুডুবু দশা।—তোমার বউ! তুমি বিয়ে করবে মিসিসায়েবকে?

যে মূর্তি দেখে আর যে কথা শুনে হাসির কথা, তাই দেখে বা শুনে বাপীর রাগ হচ্ছে কেন জানে না। জবাব দিল, তোমাদের মেমসায়েবের সেই রকমই হুকুম।

বিস্ময় আর উত্তেজনার ধকল সামলে আবু জিজ্ঞাসা করল, মিসিসায়েব বেঁকে বসেছে?

—হ্যাঁ।

আবুর সামনেই যেন দিশেহারা হবার মতো সমস্যা।—তাহলে কি করে হবে...ধরেবেঁধে বিয়ে করবে?

বাপী ভিতরে ভিতরে তেতেই উঠেছে। গলার স্বরে পাল্টা শ্লেষ। —মরদ বেঁচে থাকতেও ভিতরে ভিতরে দুলালির দিকে হাত বাড়াওনি তুমি? দুলারির মেজাজ দেখে

নিজে হাল ছেড়েছিলে?

এবারে একমুখ হাসি আবুর।—তার রাগের মধ্যেও একটু আশনাইয়ের ব্যাপার ছিল যে বাপীভাই। তোমারও যদি তাই হয়ে থাকে তো কুছ পরোয়া নাই—ধরে-বেঁধে ঘরে এনে ঢোকাও, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাপী চুপ। আশনাই অর্থাৎ প্রেম থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে শুনেও ভিতরটা অসহিষ্ণু। খুশি আর উত্তেজনায় আবু টইটম্বুর।—ইস! তুমি অনেক ওপরে উঠে গেছ দোস্ত, নয়তো তোমাকে কাঁধে নিয়ে ধেই ধেই করে খানিক নেচে নিতাম।

ফেরার পথে সামনের গেটের কাছে বাপীর পা থেমে গেল। ঊর্মিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। পিছনে তার মা চোখে চশমা এঁটে লিখছে কিছু।

ঊর্মিলা চেয়ে রইল।

এত দূর থেকেও ঝলকে ঝলকে তপ্ত আগুন ঠিকরে এসে বাপীর মুখ ঝলসে দিতে লাগল।

গেট ছেড়ে বাপী নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়ালো। আগুনে ঝলসালে লোহা ছাই হয়, না উল্টে দগদগে লাল হয়? বাপীর মেজাজেরও সেই অবস্থা।

পর পর চার দিন দেখা হল এরপর। চোখাচোখি হল। দুবার তিনবার করে। একদিনও ঊর্মিলা খাবার টেবিল বা চায়ের টেবিলে আসেনি। গায়ত্রী রাই তাকে ডাকেনি। কোয়েলা তার খাবার চা ঘরে দিয়ে এসেছে। যেতে আসতে তবু দেখা হয়েছে। বেশ তফাতে দাঁড়িয়ে ঊর্মিলা দেখেছে ওকে। দুই চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরেছে। বিদ্বেষ উপচে উঠেছে। কিন্তু ঘৃণার আঘাতে কাবু হবে বাপী তরফদার? বিদ্বেষ তাকে সংকল্প-ছাড়া করাবে? এই দেখে বরং ভিতরটা তার আরো ধারালো কঠিন হয়ে উঠেছে।

রাত্রি। তখনো খাবার ডাক আসেনি। এ সময়টা বাপীর বই পড়ে কাটে। কদিন হল বই পড়ার নেশাও ছেড়ে গেছে। চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে ছিল। মাথাটাকে শূন্য করে দেবার ধকল পোহাচ্ছিল।

একটা ষষ্ঠ অনুভূতির ধাক্কায় চোখ মেলে দরজার দিকে তাকালো।

ঊর্মিলা। ভিতরে এসে দু হাত কোমরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তপ্ত লাল মুখ। চোখোচোখি হতে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরোতে লাগল। প্রস্তুত ছিল না বলেই হয়তো বাপী বে-সামাল একটু।

আরো পোড়ানো আরো ঝলসানোর জন্যেই যেন আরো একটু এগিয়ে এলো ঊর্মিলা। গলায়ও হিসহিস আগুন ঝরল।—দেখছ কি? একাই এসেছি। গেটে দাঁড়িয়ে মা তোমার ঘরে ঢুকতে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেছে। কি দেখছ? দরজা বন্ধ করে দেব? তাহলে সুবিধে হবে? আজ সব সাধ মেটাবে?

আত্মস্থ হবার চেষ্টায় বাপী নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুঝছে। নিজের অগোচরে উঠে বসেছে। গলা দিয়ে অস্ফুট স্বর বেরুলো, বোসো—

—বসব? তোমার কাছে এসে আনন্দে গল্প করতে এসেছি আমি? তুমি বেইমান, তুমি বিশ্বাসঘাতক, তোমার পরামর্শে বাড়িতে মা আর কোয়েলা ছায়ার মতো আমার সঙ্গে লেগে লেগে আছে, একটা চিঠি লিখতে বসলেও সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে —বাংলো থেকে নামলে কোয়েলা পিছু নেয়—কাজকর্ম ছেড়ে আড়াল থেকে তুমি চোখে

আগলাচ্ছ—ক্লাবের সামনে আবু রব্বানীকে মোতায়েন রেখেছ—চারদিক থেকে আমাকে শিকলে আটকেছ—কিন্তু এই করে কি পাবে তুমি? কি পাবে আশা করো?

বাপী নির্বাক। এখনো নিজের বশে নেই। ঊর্মিলার হিসহিস গলার স্বর চড়ছেই। —যে রেশমা তোমাকে পূজো করত সেই রেশমার মরা মুখ তোমার মনে আছে? আছে? আর একখানা মরা মুখ দেখতে চাও? এত পাহারা দিয়েও সেটা ঠেকাতে পারবে? এই জ্যান্ত ডলি তোমার কোনো দিন ভোগে আসবে না সেটা জেনে রেখো আর মাকেও জানিয়ে দিও। বুঝলে? বুঝলে?

বোঝার ধকলে বাপীর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। চেয়েই আছে।

ঊর্মিলাও।

বাপী অপলক।

ঊর্মিলাও।

পরের মুহূর্তে ও যা করে বসল তাও অভাবিত। এত রোষ এত ঘৃণা হঠাৎ কান্না হয়ে ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উপচে-ওঠা আবেগে এগিয়ে এসে ওই বিছানায় বসে পড়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে সমস্ত যন্ত্রণা উজার করে ঢেলে দিতে চাইল।—বাপী, এ হবে না—এ হতে পারে না। তুমি আমার ফ্রেন্ড—এত বিশ্বাসঘাতকতা তুমি করতে পারো না,—এমন বেইমান তুমি হতে পারো না—কলকাতায় গিয়ে তোমার সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয় হয়েছে—তাই তুমি পাগল হয়ে গেছ। বাপী—তোমাকে আমি কত ভালবাসি তুমি জানো না—আমার ফ্রেন্ড এমন কাজ করতে পারে না—আমার এত ভুল হতে পারে না—এত বিশ্বাস না থাকলে আমি নির্ভয়ে তোমার কাছেই ছুটে আসতে পারতাম না!

কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বাপী মূর্তির মতো বসে।

আট

ঊর্মিলা আবার দুপুরে আর রাতে অন্য দুজনের সঙ্গে খাবার টেবিলে এসে বসছে। সকাল বিকালের চায়ের টেবিলেও আসছে। একটা বড় রকমের অশান্তির মোকাবিলার সংকল্পে কঠিন হাতে বাৎসল্যের রাশ টেনে ধরে বসেছিল গায়ত্রী রাই। কিন্তু হঠাৎ কোনো জাদুমন্ত্রে মেয়ের সুমতি ফিরে এলো কিনা ঠাওর করতে পারছে না। তার আচরণ কৃত্রিম হলে মায়ের চোখে ধরা পড়তই। স্নায়ুর সব টানা-পোড়েন একেবারে ঠাণ্ডা, ভোরের যুঁইফুলের মতো কাঁচা আর তাজা মুখ। মেয়ের রাগ-বিরাগের চিহ্ন নেই। আবার মুখে কথাও নেই। বড়সড় কিছু কৌতুকের ব্যাপার ঘটে গেছে যেন। সেটা চোখে ঝিকমিক করে, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় কাটে। গায়ত্রী রাই তখন ইচ্ছে করেই অন্য দিকে মুখ ফেরায়। কারণ মাকে ফাঁকি দিতে পারলে ওই ছেলের মুখখানাই যে মেয়ের পর্যবেক্ষণের বিষয়, সেটা বুঝতে পারে।

বাপী সবই লক্ষ্য করে। মেয়ের থেকেও উল্টে ওরই আচরণ মহিলার কাছে বেশি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তাও আঁচ করতে পারে। সর্বদাই গম্ভীর। সেটা কৃত্রিম নয়। একটা অসহিষ্ণুতার বাষ্প চারিদিক থেকে ওকে ছেঁকে ধরেছে। মেয়ে উঠে গেলে প্রত্যাশিত

সুখবর শোনার আশায় গায়ত্রী রাই ওর দিকে ফেরে। কাজের অছিলায় বাপী তক্ষুনি উঠে চলে যায়। কদিন ধরে কাজের ভূত মাথায় চেপেছে। কেবল কাজ আর কাজ।

চায়ের টেবিলে সেদিন জানান দিল, এখনই সে একবার পাহাড়ে যাচ্ছে।

গায়ত্রী রাই সাদা মনে জিজ্ঞেস করল, কেন?

—আপনি সবেতে মাথা দেন কেন, নিজে কি করে ভালো থাকবেন সে চেষ্টা করুন না।

ছেলের ধমক খেয়ে মা যেমন হাসি চেপে বেচারি মুখ করে চেয়ে থাকে, গায়ত্রী রাইয়ের চাউনিও অনেকটা সেই রকম।

গম্ভীর মুখেই বাপী বলল, ক্লাবে মাল টান পড়েছে তাই যাওয়া দরকার।

একটু চুপ করে থেকে গায়ত্রী হঠাৎ বলল, এ কাজ বন্ধ করে দিলে কি হয়?

—কোন কাজ, লিকার সাপ্লাই?

—হ্যাঁ।

বাপী গম্ভীর।—কি আর হবে, মোটা লোকসান হবে। আপনি মালিক, হুকুম করলেই বন্ধ হবে।

হালকা প্রতিবাদের সুরে গায়ত্রী রাই বলল, সাপ আর সাপের বিষ চালানোর কারবার বন্ধ করার সময় তুমি মালিকের হুকুমের অপেক্ষায় ছিলে? না সেই লোকসান গায়ে লেগে আছে?

রেশমার অঘটনের পরের বছর থেকেই ব্যবসার ওদিকটা বাপী জোর করে তুলে দিয়েছিল। সাপ ধরার মৌসুমে যারা আসে তারা বেজার হয়েছিল। সব থেকে বেশি বেজার হয়েছিল পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ু। সাপের গলা টিপে বিষ বার করা বন্ধ হলে তার আর কাজের আনন্দ কি? আবুর তত্ত্বাবধানে এই ব্যবসা জাঁকিয়ে উঠছিল তাই আপত্তি তারও ছিল। বাপী কারো কথায় কান দেয়নি। গায়ত্রী রাইকে বলেছিল, আপনার সব লোকসান উশুল হয়ে যাবে, যে কাজে লেগে আছি তার এখনো ঢের স্কোপ।

কথার খেলাপ হয়নি, এদিকের ব্যবসা এত বেড়েছে যে ওদিকের লোকসান চোখেও পড়েনি। কিন্তু কোন তাড়না বা যন্ত্রণার ফলে বাপী ওই মারাত্মক কারবার একেবারে তুলে দিয়েছে তা আজও ব্যক্ত করার নয়। একটু গুম হয়ে থেকে বাপী গম্ভীর শ্লেষের সুরে বলল, তাহলে শুধু মদ কেন, নেশার আর যা কিছু নিয়ে আছি আমরা সে সবও বন্ধ করে দিন। নেশা নেশাই।

ভেবেছিল জব্দ হবে। কিন্তু জবাবে যা শুনল, মেজাজ সুস্থির থাকলে বাপীর মন নরম হবার কথা। শ্লেষ গায়ে না মেখে মহিলা হাসল একটু।—এ চিন্তাও মাঝে মাঝে মনে আসে।...যত দিন নিজের রক্তের জোর ছিল, ভয়-ভাবনা কিছু ছিল না। সব দায় নিজের ভাবতাম। এখন তোমাদের এর মধ্যে জড়াতে অস্বস্তি হয়। অনেক হয়েছে, ও সবও এখন বন্ধ করে দিলে আমার আপত্তি হবে না। গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। —তোমার রাগের কি হল, এক্ষুনি তোমাকে কিছু করতে বলছি না। মনে হল তাই ভেবে দেখতে বলেছি। আজ পাহাড়ে যাচ্ছ যাও—

টেবিলের এ পাশ থেকে আলতো করে ঊর্মিলা বলল, আমিও যেতে পারি—

চাপা গর্জনের সুরে বাপী তক্ষুণি বলল, না!

এই মেজাজ দেখে গায়ত্রী রাই সত্যি হকচকিয়ে গেল। আরো অবাক, যে মেয়ে কারো হম্বি-তম্বির ধার ধারে না, সেও চুপ। কিছু একটা ব্যাপার চলেছে দুজনের মধ্যে তাও বোঝা যাচ্ছে। একটু সময় নিয়ে গায়ত্রী রাই মোলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ ফিরছ না?

—বিকেলে ফিরব।

—তাহলে ও যেতে চাচ্ছে যাক না, রাগের কি আছে।

তেমনি চাপা ঝাঁঝে বাপী জবাব দিল, রাগ হয় স্বার্থপরতা দেখলে—বুঝলেন? আপনি নিজে ছাড়া আপনাকে দেখার আর কেউ কোথাও নেই, এ এখন থেকেই খুব ভালো করে জেনে রাখুন।

গায়ত্রী রাই হাঁ করে কয়েক পলক চেয়ে রইল তার দিকে। রাগের হেতু বোঝা গেছে। তার জন্যেই বাড়িতে কারো থাকার দরকার। আর সে খেয়াল না থাকার মানেই স্বার্থ। চোখের দু কোণ শিরশির করে উঠল। মেয়ের দিকে ফিরল। আগে হলে মেয়ে তেলতেল বলে চেঁচিয়ে উঠে জব্দ করতে চেষ্টা করত। পুরুষের যে রাগ আর শাসন মেয়েরা চেষ্টা করলেও অশ্রদ্ধা করতে পারে না, নিজের মেয়েরও এখন সেই মুখ।

বাপী উঠে এলো। মহিলার নীরব প্রতিক্রিয়া অনুভব করতে পারে বলেই ভেতরটা আরো তিক্তবিরক্ত। নিজের ঘরে এসে বেশ-বাস বদলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভিতরের অসহিষ্ণুতা গাড়ির বেগের সঙ্গে মিশছে। খানিকক্ষণের মধ্যে গাড়ি ভুটানের রাস্তায় ছুটল। আর তক্ষুনি রেশমার মুখখানা চোখে ভাসল। রেশমার হাসি-কৌতুক, ছলাকলা...নিজের সত্তা-দগ্ধানো বন্যা আক্রোশ। ও কি কোথাও থেকে বাপীকে দেখছে এখন?

রেশমার সঙ্গে সঙ্গে আর এক মেয়ের কথা মনে আসে কেন জানে না। অথচ স্বভাব-চরিত্রে দিন-রাতের তফাৎ দুজনের। মাষ্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমকুম। ...এখানে এসে দেখা করার কথা ছিল। বাপী ওকে এই ভুটান এলাকায় রেখে রেশমা যা করত সেই কাজে লাগাবে ঠিক করেছিল। আট-দশদিন ছেড়ে দু সপ্তাহ গড়াতে চলল। আর আসবে মনে হয় না। এরপর এলে সোজা বিদায় করে দিতে অসুবিধে হবে না।

সন্ধ্যার একটু আগে ডাটাবাবুকে মাল বুঝিয়ে দিয়ে আবার গাড়িতে বসতেই আবু রব্বানী সামনে এসে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার বাপীভাই, মিসিসায়েব যে আজ আমাকে খুব নাকাল করে দিয়ে গেল—তোমাদের মন-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে নাকি?

নাকাল হয়েছে বলল বটে কিন্তু মুখে খুশি উপচে পড়ছে। বাপীর স্নায়ু তেতেই আছে। তবু ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

—ক্লাবের সামনে আগেও দু-তিন দিন তাকে দেখেছি তখন একটা কথা বলা দূরে থাক, চোখে আগুন ঠিকরতো—আজ খানিক আগে আমাকে দেখে হেসে কাছে এলো, বলল, তোমার ডিউটি এখনো চলছে, আমাকে ভেবাচাকা খেয়ে যেতে দেখে আরো মজা পেয়ে বলল, আর ডিউটির দরকার আছে কিনা তোমার দোস্তকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও।...তুমি তো কিছুই বলোনি আমাকে, সত্যি আর দরকার নেই?

বাপী মাথা নাড়ল, দরকার নেই। তারপর স্টার্ট দিয়ে চোখের পলকে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল।

পরের সাতটা দিন বাপী বাইরের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত যে আপিসে বসারও ফুরসৎ নেই। কাজ-কাজ করে হঠাৎ এত ক্ষেপে গেল কেন ছেলেটা গায়ত্রী রাই বুঝছে না। দুদিনের জন্য এর মধ্যে টুরে চলে গেল একবার। কোথায় কি এমন জরুরি কাজ কিছুই বলে গেল না। ফিরে আসার পরেও কিছু জিগ্যেস করার উপায় নেই। ডাক্তার সম্পূর্ণ বিশ্রামের হুকুম জারি করেছে। ফলে ব্যবসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে যাওয়াটাও এই ছেলের বিবেচনায় দোষের এখন। এছাড়া আরো দুদিন সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরেছে। অত ভোরে তাকে ডাকেনি। কোয়েলা বা মালিকে বলে গেছে ফিরতে রাত হবে, ওর জন্য যেন অপেক্ষা করা না হয়। মাথায় কিছু চাপলে তার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সুস্থির থাকতে পারে না এ বরাবরই লক্ষ্য করেছে। তবু এ-সময়ে কাজের ঝোঁক ভালো লাগছে না। তা বলে দুশ্চিন্তা কিছু নেই। মেয়েকে এত ঠাণ্ডা আর এমন নরম কখনো দেখেনি। সর্বদা কাজে কাজে থাকে, নিজের হাতে ওষুধপত্র দেয়। দুপুরে একটু ঘুমনো অভ্যেস হয়ে গেছে, তখনো ঘরেই বসে থাকে। ওকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বললে পলকা ঝাঁজে জবাব দেয়, দরকার নেই বাপু, তোমার সেবায় পান থেকে চুল খসলে মাথা কাটতে আসবে।

গায়ত্রী রাইয়ের দু কান জুড়িয়ে যায়। মনের মতো ফয়সলা যে কিছু হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। মেয়ে কিছু বোনা বা একটা বইটই নিয়ে সামনে বসে থাকে। গায়ত্রী রাই থেকে-থেকে মুখখানা দেখে তার। ভাগ্য দেখে।

সেদিনও সকালে বেরিয়ে বাপী ফিরল প্রায় রাত আটটার পর। সামনের বাংলোর গেটের কাছে অন্ধকারে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামালো। একজন নয়, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনজন। মালি, আধবুড়ো ড্রাইভার বাদশা, আর আবু রব্বানী। জোরালো আলোয় বারান্দায় কোয়েলাকেও দেখল। কার গাড়ি বোঝামাত্র সে ভিতরে ছুটল।

গাড়ি থামিয়ে বাপী নিস্পন্দের মতো বসে রইল। চট করে নামতেও পারল না। সবার আগে আবু ছুটে এলো। চাপা উত্তেজনায় তার দু চোখ কপালে—সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে বাপীভাই, সকাল আটটায় চা-টা খাওয়ার পর মিসিসায়েব কখন বাংলো ছেড়ে বেরিয়েছে কেউ দেখেনি, এখন পর্যন্ত তার পাত্তা নেই!

বাপী বসেই আছে। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা। উদ্বিগ্ন মুখে পরের সমাচার জানালো আবু। বেলা এগারোটা নাগাদ ওর কছে খবর গেছে মিসিসাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর থেকে বাদশা ড্রাইভারকে নিয়ে আবু তামাম বানারজুলি চষেছে। পাহাড়ের বাংলোয়ও গেছল। সেখানেও নেই। অ্যাকাউন্টেন্টকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে মেমসায়েব বাপীভাইয়ের খোঁজে এদিকের প্রায় সব কটা ঘাঁটিতে ফোন করিয়েছে। বিকেল থেকে মেমসায়েব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, দাঁড়ানো থেকে পড়ে যাচ্ছিল, কোয়েলা ধরে ফেলতে রক্ষা। এখনো খুব ছটপট করছে। কোয়েলা ডাক্তার ডাকার কথা বলতে এমন ধমক খেয়েছে যে ভরসা করে আর কেউ কিছু বলতেও পারছে না। মুখ বুজে তার কষ্ট দেখতে হচ্ছে। সক্কলে সেই থেকে বাপীভাইয়ের ফেরার অপেক্ষায় দম বন্ধ করে বসে আছে।

গায়ত্রী রাইয়ের বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা কানে আসতে বাপীর সম্বিৎ ফিরল। ত্রস্তে গাড়ির দরজা খুলে বাংলোর দিকে এগলো।

ঘরে সবুজ আলো জ্বলছে। গায়ত্রী রাই বিছানার পাশে ইজিচেয়ারে শুয়ে। সবুজ আলোর জন্য কিনা বলা যায় না, রক্তশূন্য মুখ নীলবর্ণ। সমস্ত দেহেও সাড়া নেই যেন। চাউনিতে অব্যক্ত যন্ত্রণা। যন্ত্রণা প্রতিটি শ্বাসেও।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাপী তার পাশে মেঝেতেই বসে পড়ল। পালস দেখার জন্য একটা হাত ধরতেই এক ঝটকায় হাতটা টেনে নিল গায়ত্রী রাই। মুহূর্তের মধ্যে ঋজু সোজা কঠিন। চোখে সাদা আগুনের হল্কা।—আর কি দেখবে? আর কি দেখার আছে ?

বাপী নিরুত্তর। থমথমে মুখ। চোখে চোখ।

সব থেকে কাছের জনকে নাগালের মধ্যে পেয়ে এতক্ষণের জমা যন্ত্রণার সমস্ত আক্রোশ তারই ওপর ভেঙে পড়ল।—সমস্ত দিন কোথায় এত কাজ দেখাচ্ছিলে ? কোথায় যাও/না যাও বলে যেতেও মানে লাগে তোমার আজ-কাল—কেমন ? ও আমার চোখে ধুলো দিতে পেরেছে তোমার জন্য,—শুধু তোমার জন্য বুঝলে ? ওকে বিশ্বাস করে এত নিশ্চিন্ত মনে তুমি কাজে ডুবে ছিলে কি করে ? তোমার অপদার্থতার জন্য আমারও ভুল হয়েছে—

রাগে দুঃখে উত্তেজনায় কাঁপছে। সমস্ত মুখ আরো বিবর্ণ। বাপী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগলো।

—স্টপ! গায়ত্রী রাই পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

বাপী ঘুরে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—ঘরে বাপীর অনুচ্চ গলার স্বরও কঠিন একটু।—আমাকে কাছে দেখলে নিজের এতটুকু ক্ষতি যদি আপনি করেন, তাহলে কোথায় যেতে পারি এরপর তাও ভাবতে হবে।

গায়ত্রী রাইয়ের দু চোখে এখনো সাদা আগুন। আবারও ফেটে পড়ার মুখে সামলে নিল। সে শক্তিও আর নেই বোধ হয়। চেয়ারের গায়ে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

বাইরে এসে বাপী চাপা গলায় আবুকে বলল, বাদশাকে ডেকে গাড়ি নিয়ে চলে যাও. যেখান থেকে পারো চা-বাগানের ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এসো।

ভিতরে শুধু কোয়েলা দাঁড়িয়ে। রাগে আর কান্নায় তার কালো মুখ ফেটে পড়ছে। বাপী আবার এসে ইজিচেয়ারের পাশে মেঝেতে বসল। এবারে হাত টেনে নিতে গায়ত্রী রাই বাধা দিল না। দু চোখ বোজা তেমনি।

পালস-এর গতি বাপীর ভালো ঠেকল না। বাপী এবার হাঁটুর ওপর বসে নিঃসঙ্কোচে নিজের একটা হাত তার বুকের ওপর রেখে একটু চাপ দিল। এবারে গায়ত্রী রাই আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো।

বুকের ধপধপ শব্দ হাতেও স্পষ্ট টের পাচ্ছে বাপী। হাত সরিয়ে নিল। মহিলা অপলক চেয়ে আছে তার দিকে। বাপীর মনে হল, হাতটা ওখানে থাকুক তাই যেন চাইছিল। একটা উদগত অনুভূতি চেপে বাপী কোয়েলার দিকে তাকালো।—দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি তো ?

কোয়েলা মাথা নাড়ল।। হয় নি।

—এক গেলাস গরম দুধ নিয়ে এসো।

সঙ্গে কয়েক চামচ ব্র্যাণ্ডি মেশালে ভালো হত বোধ হয়, কিন্তু ও জিনিসটা খাওয়ানো যাবে না জানে, তাই শুধু দুধই আনতে বলল। দুপুরের পরে একবার দুধ এনে কোয়েলা প্রচণ্ড ধমক খেয়েছে, দ্বিধান্বিত মুখে তাই কর্ত্রীর দিকে তাকালো। বাপীরও চাপা ধমক।
—ওদিকে দেখছ কি, আমি তোমাকে দুধ আনতে বলেছি!

কোয়েলা ত্রস্তে চলে গেল। এই ধমক খেয়ে রাগের বদলে স্বস্তি বরং।

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উষ্ণ দুধের গেলাস নিয়ে ফিরে এলো। হাত বাড়িয়ে বাপী ডিস থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে আবার দুই হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসল। অন্য হাতটা মহিলার ঘাড়ের তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে খানিকটা তুলে দুধের গেলাস মুখে ধরল।

একটুও আপত্তি না করে গায়ত্রী রাই খাচ্ছে, দু চোখ বাপীর মুখের ওপর।

দুধের গেলাস কোয়েলাকে ফেরত দিয়ে বাপী জলের গেলাস নিল। দু ঢোক জল খাইয়ে সেই গেলাসও কোয়েলাকে দিয়ে বাপী পকেট থেকে রুমাল বার করে আলতো করে তার মুখ মুছিয়ে দিল।

গায়ত্রী রাইয়ের অপলক দুচোখ তখনো বাপীর মুখের ওপর। তাই দেখে বুকের তলায় অদ্ভুত মোচড় পড়ছে বাপীর। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। দু চোখ ভরে দেখতে ইচ্ছে করে। এই দেখার তৃষ্ণা কোন যুগ ধরে বুকের ভেতরেই কোথাও লুকিয়েছিল। সহজ হবার তাড়নায় আবার তাকে শুইয়ে দিয়ে বাপী হাসতে চেষ্টা করল। বলল, অত ভাবছেন কেন, যা হবার তাই হয়, দেখছেন না আমি কোথা থেকে উড়ে এসে কোন জায়গাটা জুড়ে বসেছি।

গায়ত্রী রাই কি জীবনে কখনো কেঁদেছে? বাপী জানে না। এখনো যেভাবে চেয়ে রইল কাঁদতে পারলে হয়তো হাল্কা হত। বাপী আবার বলল, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, মেয়ের খবর ঠিকই পাবেন...আর ভালো খবরই পাবেন।

কানে যেতে আস্তে আস্তে নিজে থেকেই সোজা হয়ে বসল এবার। চাউনি বদলে গেল। *সবুজ আলোয় নীলাভ তীক্ষ্ণ কঠিন মুখ। খবর পাব...। ভালো খবর পাব? তুমি এই সান্ত্বনা দিচ্ছ আমাকে? ও যা চায় তাই হতে দেবে তুমি? তাই যদি হয় নিষ্ঠুর বেইমান মেয়েকে আমি কোনদিন ক্ষমা করব ভেবেছ?*

উত্তেজনা দেখে বাপী আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু করতে হল না বা বলতে হল না। আবু ডাক্তারকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকেছে। বিরক্তি চাপতে না পেরে গায়ত্রী রাই হাল ছেড়ে চেয়ারের গায়ে মাথা রাখল আবার।

আবু বুদ্ধিমান। মেয়ের সম্পর্কে ডাক্তারকে বলেই এনেছে নিশ্চয়। কারণ হঠাৎ এরকম হল কেন ডাক্তার একবারও জিজ্ঞাসা করল না। চুপচাপ পরীক্ষা শুরু করে দিল।

বাইরে এসে বাপীকে জানালো হার্টের অবস্থা আগের থেকেও বেশ খারাপ। আগামী কালের মধ্যে আ[illegible] দফা বুকের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিল। শিলিগুড়ির বড় হার্ট-স্পেশালিস্টকে আবার নিয়ে আসার পরামর্শও দিল। এই রাতটার জন্য শুধু কড়া ঘুমের ওষুধ।

[illegible] ঘুমে রাত কেটে গেল। খুব ভোরে চোখ তাকিয়ে গায়ত্রী রাই দেখে পাশের [illegible] বাপী শুয়ে। আস্তে আস্তে বসল। বাপীও সজাগ তক্ষুনি।

—সমস্ত রাত তুমি এভাবেই কাটালে নাকি?

—খুব ভালো কাটালাম। এখন কেমন লাগছে?

জবাব না দিয়ে গায়ত্রী রাই চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। ব্যথাটা নিজের মেয়ের থেকে এই ছেলের জন্য বেশি কিনা জানে না। বলল, ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।

আড়মোড়া ভেঙে বাপী উঠে দাঁড়ল।—নাঃ, আমার এখন অনেক কাজ। কোয়েলা—।

সঙ্গে সঙ্গে কোয়েলা হাজির। বাপী হুকুম করল, আমার জন্য শুধু এক পেয়ালা চা আর ওঁর জন্য দুধ—খুব তাড়াতাড়ি।

কোয়েলা চলে গেলে বাপী এদিকে ফিরল।—আমি চট করে মুখ হাত ধুয়ে আসছি, আপনিও যান। থাক, কোয়েলা আসুক।...চা খেয়ে আমি তিন-চার ঘণ্টার জন্য একবার বেরুবো, আপনাকে ততক্ষণ সব ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে হবে।

এই ছেলেকে খুব সহজ আর নিশ্চিন্তই দেখছে গায়ত্রী রাই। আশায় উদগ্রীব হঠাৎ—ওর খোঁজে যাবে? পাবে?

সকালের শিথিল স্নায়ুগুলোতে টান পড়ল আবার। গম্ভীর শাসনের সুরে বলল, খোঁজে গেলে না পাবার কোনো কারণ নেই। যাব কিনা সেটা আপনি কতটা সুস্থ থাকেন তার ওপর নির্ভর করছে। এখন আমি শিলিগুড়ি থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আপনাকে আমি আবার বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, করে একটু নিশ্চিন্ত থাকতে চেষ্টা করুন।

বেরিয়ে এলো।

শিলিগুড়ির বড় ডাক্তারকে অনেক টাকা কবুল করে বাপী একটা রাত বানারজুলিতে ধরে রাখল। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁর ছুটি। রিপোর্ট সব হাতে পেয়ে তিনিও তেমন কিছু আশ্বাস দিয়ে যেতে পারলেন না। হার্টের আরো ভাল্ব খারাপ হয়েছে। হঠাৎ কিছু ঘটেও যেতে পারে, আবার খুব সাবধানে থাকলে কিছুকাল চলেও যেতে পারে। চিকিৎসার সমস্ত ফিরিস্তি চা-বাগানের ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি।

গায়ত্রী রাইয়ের মনের জোরের খবর বাপীর থেকে আর কে ভালো রাখে। কিন্তু এখন যে জোরটা দেখছে সে যেন প্রাণের দায়ে।...ও বলেছে, মেয়ের খোঁজে যাবে কিনা সেটা তার সুস্থ থাকার ওপর নির্ভর করছে। তাই সুস্থ থাকার প্রাণপণ চেষ্টা। বলেছে বিশ্বাস করতে, বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকতে। দুর্যোগের আকাশে রামধনু দেখার মতো এই বিশ্বাসটুকুই আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা। এই ছেলে কখনো তাকে মিথ্যে ভোলাবে না।

একান্ত চেষ্টার ফলে সত্যি কাজ হল। চারদিনের মধ্যে অনেকটা সুস্থ। পালস আর ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিক। বাপী যতক্ষণ সামনে থাকে, মহিলা ভাব দেখায় যেন কিছুই হয় নি। দিন-রাতের তিন ভাগ সময় বাপী কাছেই থাকে। কত ভালো আছে বোঝানোর তাগিদে এজন্যেও আগের মতো চোখ রাঙানোর চেষ্টা।—কাজকর্ম শিকে তুলে দিন-রাত এখানে পড়ে থাকলে চলবে?

কিন্তু ধৈর্যের শেষ আছে। সেদিন কাছে ডেকে বাপীর মুখ নিজের ঠাণ্ডা দু'চোখের আওতায় বেঁধে নিয়ে বলল, বিশ্বাস করে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছিলে, আমি

চেষ্টা করেছি।...আজ ছ'দিন হয়ে গেল, আর কত যন্ত্রণার মধ্যে আমাকে রাখতে চাও?

বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক। পাপপুণ্য মানে না,—এই যন্ত্রণা দেখার নামই বোধ হয় পাপ। মুহূর্তে মন স্থির করে নিল। ভাগ্যের পাশায় একদিন যে দান পড়েছিল আজ সেটা যদি একেবার উল্টে যায় তো যাক।

কোয়েলা!

বাপীর ডাক শুনে কোয়েলা তক্ষুণি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

—ডলির ঘর থেকে তার বড় সুটকেসটা নিয়ে এসো।

গায়ত্রী রাই অবাক।—ওর সুটকেস কেন?

—বলছি।

কোয়েলা সুটকেস এনে দিতে বাপী সেটা বিছানায় গায়ত্রী রাইয়ের সামনে রাখল। পকেট থেকে একটা চাবি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, খুলুন—

—এ চাবি তুমি কোথায় পেলে?

—ডলির কাছ থেকে চেয়ে এনেছি। খুলুন ওটা।

মেয়ে কিছু লিখে রেখে গেছে ধরে নিয়ে স্তব্ধ মুখে গায়ত্রী সুটকেসটা খুলল। তারপর বাপীর দিকে তাকালো।

—ওপরের জামাকাপড়গুলো সরিয়ে কটা চিঠি পান দেখুন।

বিমূঢ় মুখে গায়ত্রী রাই মেয়ের জামাকাপড়গুলো বিছানায় নামিয়ে আরো হতভম্ব। সুটকেসের নীচে একগাদা খাম। কম করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা হবে, সবগুলোতে লন্ডনের ছাপ।

নিজের অগোচরে গায়ত্রী রাই সেগুলো সব হাতে তুলে নিয়েছে। প্রায় দুর্বোধ্য বিস্ময়ে খামগুলো দেখছে।—এ সব কি ব্যাপার?

—বিলেত থেকে লেখা বিজয়ের চিঠি। ডলিও এব থেকে কম চিঠি লেখেনি। আড়াই বছর ধরে দুজনে দু'জনকে চিঠি লিখে দিন গুনছিল...

গায়ত্রী রাইয়ের ফ্যাকাশে মুখ কঠিন হয়ে উঠছে।—তুমি এটা জানতে?

—ও-চিঠি আপনার চোখে বা হাতে না পড়ে সে-ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হয়েছিল।

রাগ নয়, একটা অবিশ্বাস যেন যন্ত্রণার মতো ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে!—তুমি তাহলে আমার মেয়েকে কখনো ভালবাসনি...কখনো চাওনি?

—ভালো যখন বেসেছি তখন কোনো লোভ ছিল না। শেষে কোন আক্রোশে আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওকে পেতেও চেয়েছিলাম জানলে আপনিও আমাকে ঘৃণা করতেন। আমার চরিত্রের সেই কদর্য দিকটা ডলি দেখেছে।...কিন্তু এই বন্ধুর ওপর তার এত বিশ্বাস যে শেষে ও-ই আমাকে রক্ষা করেছে। রক্ষা আপনাকেও করেছে। ...আত্মহত্যার জন্য ও তৈরি হয়ে বসেছিল।

গায়ত্রী রাই নির্বাক, স্তব্ধ।

খুব শান্তমুখে বাপী আবার বলল, ডলি যাকে বেছে নিয়েছে সে একটা ছেলের মতো ছেলে এও আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, ড্রিংক একটু-আধটু করে, কিন্তু নিজের আক্রোশে আপনাকে ওর ওপর আরো বিরূপ করে তোলার জন্য আমি সেই কথা তুলে-

ছিলাম, ড্রিংক করে অমানুষ হবার ছেলে সে নয়, আমি ড্রিংক না করলেও আমার থেকে অন্তত ঢের ভালো।

গায়ত্রী রাই শুনছে, সামনে যে বসে আছে তাকে দেখছে, হিসেব জানে, এখনো কিছু হিসেব মিলতে বাকি যেন। চাউনিও সন্দিগ্ধ একটু।—ডলি কোথায় এখন...কলকাতায়?

—শিলিগুড়িতে।

—শিলিগুড়িতে কোথায়?

—একটা হোটেলে।..বিজয় মেহেরার কাছে।

গলার স্বর অভিমানে অকরুণ কিনা বলা যায় না।—তাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে? না হবে বলে আগে থাকতেই একসঙ্গে আছে?

বাপী জানে নিজেরই চরম সংকটের মুহূর্ত এটা। তবু শান্ত। তবু ঠাণ্ডা।—বিয়ে হয়ে গেছে। দু'দিন টুরে থাকার নাম করে কলকাতায় গিয়ে বিজয়কে এরোপ্লেনে নিয়ে এসে শিলিগুড়িতে রেখেছিলাম, টাকা খরচ করে পিছনের তারিখ দিয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস দেওয়া হয়েছিল।...ছ'দিন আগের সেই সকালে ডলিকে আমিই নিজের গাড়িতে করে শিলিগুড়ি নিয়ে গেছি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছি।

প্রথমে নিজের দুটো কানের ওপর অবিশ্বাস গায়ত্রী রাইয়ের, কিন্তু এই মুখ দেখেই বুঝছে অবিশ্বাস করাবও কিছু নেই আর। সমস্ত সংযম ছিঁড়ে খুঁড়ে গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এলো।—তুমি! তুমি ওকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছ? এত...এত উপকার করেছ তুমি আমার?

আবেগ সামলে নিতে বাপীরও সময় লাগল একটু। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। —উপকার সত্যি করেছি। এত ভালো কাজ জীবনে আর করেছি কিনা জানি না। এরপর আপনি যেমন খুশি শাস্তি দেবেন, তাও আমি আশীর্বাদ ধবে নেব।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। সোজা নিজের বাংলোয়। নিজের ঘরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অনেক দিনের টান-ধরা স্নায়ুগুলো সব একসঙ্গে শিথিল হয়েছে। অবসাদ সম্বল।

বাপী ঘুমিয়েই পড়ল।

কারো ডাক শুনে চোখ মেলে তাকিয়েছে। কোয়েলা। ঘরে আলো জ্বলছে। বাপী তাড়াতাড়ি উঠে বসে ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা বাজে। কোয়েলা জানালো মালকান খেতে ডাকছে।

এই রাতেই আবার ওই একজনের সামনে বসে খাওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেলে বেঁচে যেত। তার রোষ যদি মাথায় বজ্র হয়ে নেমে আসত, এর থেকে মুখ বুজে তাও সহ্য করা সহজ হত।

এত্তেলা পাবার পরেও বসে থাকতে দেখে কোয়েলা আবার জানান দিল, সে দুবার এসে ফিরে গেছে, সাহেব ঘুমুচ্ছে দেখে ডাকেনি—মালকান এবার ডেকে দিতে হুকুম করেছে।

—তুমি যাও, আসছি।

চোখে মুখে জল দিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই এলো। কোয়েলা বলল, খাবার

মালিকানের ঘরে দেওয়া হয়েছে।

পায়ে পায়ে বাপী শোবার ঘরে ঢুকল। গায়ত্রী রাই পিছনে উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসে। বিষম সাদামুখ। গালের পাশে চামড়ার নিচে একটা নীল শিরা উঁচিয়ে আছে। বাপী ঘরে ঢুকতে একটুও না নড়ে তার দিকে তাকালো। বাপীও।

সামনের ছোট টেবিলে একজনেরই খাবার দেওয়া হয়েছে।

—অসময়ে ঘুমুচ্ছিলে...শরীর খারাপ?

বাপী মাথা নাড়ল। শরীর ঠিক আছে। তবু গত পাঁচ-ছ'দিন যাবৎ স্নায়ুর ওপর দিয়ে কতটা ধকল গেছে মহিলা নিঃশব্দে আঁচ করে নিল বোধ হয়।—খেয়ে নাও।

এই মুখ সদয়ও নয়, নির্দয়ও নয়। গলার স্বরও নরম নয় বা কঠিন নয়। বাপী টেবিলের খাবারের দিকে তাকালো একবার, তারপর দাঁড়িয়েই রইল। একলা খেতে বসার দ্বিধা স্পষ্ট।

গায়ত্রী রাইয়ের চাউনি আরো ঠাণ্ডা। কথাও—আমি তোমার হুকুম এখনো মেনে চলছি, ঘড়ি ধরে সময়মতো খেয়ে নিয়েছি। বোসো!

বাপীর চোখের কোণদুটো হঠাৎ শিরশির করে উঠল কেন জানে না। শাস্তির জন্য প্রস্তুত? কিন্তু সূচনা যা দেখছে সমস্ত সংযম খুইয়ে নিজেই ভেঙে না পড়ে! ছোট টেবিলের সামনে বসল। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল।

গায়ত্রী রাইয়ের দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির সেই থেকে। এবারে জিজ্ঞাসা করল, তারা কলকাতায় চলে না গিয়ে শিলিগুড়িতে বসে আছে কেন?

বাপীর জবাবেও আর রাখা-ঢাকার চেষ্টা নেই। আপনি একবার ডাকবেন সেই আশায়।...নইলে বিজয়ের ছুটি নেই, ওর ফেরার তাড়া খুব।

গলা চড়াল না। কিন্তু কঠিন।—ডলির এত আশা করার কথা নয়।...এ-রকম আশাও তাহলে তুমিই দিয়েছ?

বাপী নিরুত্তর। এই অনুযোগের সবটাই প্রাপ্য নয়। খানিকটা হয়তো তার মেয়ের ঘাড়ে চাপানো যেত। শিলিগুড়ি থেকে বড় ডাক্তার আনার সময় ঊর্মিলা খবর জেনেছে। একবারটি এসে মা-কে দেখার জন্য তখন ঝোলাঝুলি করেছিল। সেই অবস্থায় মহিলার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই বাপী রাজি হয়নি। পরে অবস্থা বুঝে দুজনকেই নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়ে এসেছিল।

জবাবের অপেক্ষায় গায়ত্রী রাই চুপচাপ আবার খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা বালিশের ওপর রাখল। দু' চোখ বোজা এখন। পাঁচ গজের মধ্যে বসেও বাপী শ্বাস-প্রশ্বাস ঠাওর করতে পারছে না। একটু বাদে তেমনি ঠাণ্ডা কটা কথা কানে এলো। —ঠিক আছে। কাল সকালের দিকে নিয়ে এসো। আর টাকা নিয়ে যেও। বিকেলের প্লেনে ওদের কলকাতার টিকিট বুক করে এসো।

বাপী তাই করেছে। বিকেলের প্লেনে দুটো কলকাতার টিকিটও কেটেছে। নির্দেশ অমান্য করার জোর আর নেই। টিকিটের কথা ঊর্মিলাকে বলেনি। আশা হাওয়া যদি হঠাৎ বদলায়। যাওয়া যদি ওদের না হয়। তাছাড়া, বিদায় করার জন্য একেবারে তৈরি হয়ে মেয়ে-জামাইকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, এ বলেই বা কি করে।

মা যেতে বলেছে শুনে ঊর্মিলা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফ্রেন্ডের মুখখানা

ভালো করে দেখার পর হাওয়া মোটে সুবিধের মনে হয়নি। যে-ঝড়টা গেছে, শুকনো হাসির তলায় বাপীর সেটা চাপা দেবার চেষ্টা। খুঁটিয়ে কিছু জিগ্যেস করারও ফুরসৎ পেল না ঊর্মিলা। এসেই আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হওয়ার তাড়া লাগিয়েছে। তাছাড়া বিজয়ের সামনে খোলাখুলি জিগ্যেস করাও মুশকিল। এ-ছেলে মায়ের কতটুকু আর জানে। এমনিতেই ঘাবড়ে আছে। মা ডেকেছে শুনেও বাপীকে বলছিল, গিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়ব না তো, শুধু ডলিকে নিয়ে যাও না।

স্বাভাবিক ভ্রূকুটিতে তার ভয় বরবাদ করতে চেয়েছে ঊর্মিলা।—আ-হা, কি বীরপুরুষ! বলল বটে, কিন্তু নিজের ভিতরেই চাপা অস্বস্তি।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বাপী ওদের নিয়ে বানারজুলির বাংলোয় পৌঁছল। গায়ত্রী রাই নিজের শয্যাতেই বসে আছে। দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় ওই বিছানায় উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে কাটে। শ্বাসকষ্টের রোগীর এ ভাবে বসতে সুবিধে। কিন্তু ইদানীং শ্বাসকষ্ট বেশি কি কম মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।

মেয়ে জামাই ঘরে পা দেবার পর থেকে বাপী নির্বাক দ্রষ্টা, নীরব শ্রোতা। সামনে কয়েকটা চেয়ার পাতা। বাইরের অতিথি আসছে জেনে বাড়ির অসুস্থ কর্তা যেমন ঘরে চেয়ার পেতে রাখতে বলে, গায়ত্রী রাইয়ের অভ্যর্থনার আয়োজনও সেই গোছের।

ঘরে পা দিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়েই নিঃশব্দে আঁতকে উঠল ঊর্মিলা। বিজয় মেহেরা না পারুক, ক'দিনের মধ্যে তফাৎটা মেয়ে বুঝতে পারছে। মোমের মতো সাদা মুখ মায়ের। মুখে না হোক, দুই চোখেও যদি একটু উষ্ণ তাপের স্পর্শ পেত ঊর্মিলা, হয়তো ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরত, কাঁদত।

কিন্তু ঐ বিষম সাদা মুখ তেমনি একটা নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে আগলে রেখেছে নিজেকে। মেয়েকে একবার দেখল শুধু। তারপর জামাইয়ের দিকে তাকালো। ঊর্মিলা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যক্তিত্বের এরকম অভিব্যক্তি হয়তো বিজয় মেহেরার কল্পনার মধ্যে ছিল না। প্রণামের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি পা ছোঁবার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু দুটো পা-ই পাতলা চাদরের তলায়।

—থাক। আঙুল তুলে গায়ত্রী রাই চেয়ার দেখালো।—বোসো।

বিজয় মেহেরা বসে বাঁচল।

কিন্তু তার পরেও ওই দু'চোখ মুখের ওপর অনড়। কথায় অনুযোগের লেশমাত্র নেই। কি আছে সেটা বাপী অনুভব করতে পারছে। ঊর্মিলাও পারছে।

ক'দিন তোমরা আমার জন্য শিলিগুড়ির হোটেলে কাটালে শুনলাম। আমি জানতাম না, বাপী কাল রাতে বলল।...ছুটি-ছাটা না থাকায় তোমার অসুবিধের কথা ভেবে ওর খুব চিন্তা, তাই না বলে পারল না।

ফাঁপরে পড়া ভাবটা কাটিয়ে উঠে বিজয় মেহেরার সহজ হবার চেষ্টা। সায় দিয়ে বলল, নতুন জয়েন করেছি, তার ওপর কাজের এত চাপ...ছুটি বলে কিছু নেই এখন।

গায়ত্রী রাইয়ের সামান্য মাথা নাড়ার অর্থ, সমস্যাটা বুঝেছে। বলল, আর দেরি কোরো না, খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের প্লেনেই চলে যাও। বাপীর দিকে তাকালো।
—ওদের প্লেনের টিকিট কাটা হয়েছে তো?

বাপী হাঁ-না কিছুই বলল না। উর্মিলার মুখ আরো ফ্যাকাশে। কিন্তু মেহেরা ছেলেটা সরলই। শাশুড়ির উদারতা দেখে তারও একটু উদার হবার ইচ্ছে। বলল, আপনার শরীর খুব খারাপ শুনলাম, ডলি না হয় এখন আপনার কাছেই থাক না—

ঠাণ্ডা দু চোখ আবার তার মুখের ওপর—তোমার নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে আছে ?

—না, না—আমি ভালো কোয়ার্টার্সই পেয়েছি...

—তাহলে নিয়ে যাও।...আমার চোখে ধুলো দিয়ে ডলি এখান থেকে চলে যাবার পর একে-একে ছটা দিন চলে গেছে। ওকে সাপে কেটেছে কি কোথাও কোন অঘটন ঘটেছে বা কি হয়েছে ছ-ছটা দিনের মধ্যে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তখন আমার শরীরের কথা কেউ ভাবেনি। যাক, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ওকে নিয়ে চলে যাও। বাপী আছে...তার কর্তব্যজ্ঞান খুব।

বাপী বারান্দায় চলে এলো। একটু বাদে উর্মিলাও এসে চুপচাপ সামনে বসল। অপরাধের একই বোঝা দুজনের বুকে চেপে আছে। নিজেদের মধ্যে ফয়সলা যখন হয়েই গেছল, সব ভয়-ভাবনা ছেঁটে দিয়ে একসঙ্গে দুজনে যদি এই একজনের কাছেই এসে ভেঙে পড়ত, কি হতে পারে না বা কি হবেই হবে খোলাখুলি সেই ঘোষণাই করত —তাহলে কি হত ? রাগ করত, আঘাত পেত, কিন্তু এই বিয়েই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে দিতে হত। আজ মনে হচ্ছে ওরা তার দাপটই দেখেছে শুধু ভেতরটা দেখেনি।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলেও একটা স্তব্ধতা থিতিয়ে থাকল। নতুন জামাইয়ের খাতিরেও বাপীর সহজ হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। গায়ত্রী রাই নিজের ঘরে। তার সময়ে খাওয়া সময়ে বিশ্রামের আজও ব্যতিক্রম ঘটল না। এদিকে তার নির্দেশেই কোয়েলার পরিপাটি ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই। বিশেষ আয়োজনের ফলে লাঞ্চে বসতে অন্য দিনের তুলনায় দেরি হয়েছে।

খাওয়ার পরে বাপী বার দুই মহিলার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। উর্মিলাও। ...শুয়ে আছে। সাড়া নেই। চোখ বোজা। এ বিশ্রামের অর্থ এত স্পষ্ট যে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতেও দ্বিধা।

মেয়ে জামাইয়ের যাবার সময় হবার খানিক আগে গায়ত্রী রাই উঁচু বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছে আবার।

ওরা ঘরে এলো। পিছনে বাপী। সকলকে ছেড়ে গায়ত্রী রাই জামাইয়ের দিকে তাকালো।—যাচ্ছ ?

বিজয় জানান দিল,—এখনো আধ ঘণ্টা মতো সময় আছে।

—এয়ার অফিস পথ কম নয়...হাতে সময় নিয়ে রওনা হওয়াই ভালো। বাপীকে জিজ্ঞাসা করল, ওদের বাগডোগরা ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে, বাদশাকে বলে রেখেছে ?

বাপী মাথা নাড়ল। বলা হয়েছে।

জামাইয়ের দিকেই ফিরল আবার।—তোমার সঙ্গে যেতে পারে এরকম একটু বড় ব্যাগট্যাগ কিছু নেই ?

হেতু না বুঝেই সে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, এয়ার ব্যাগ আছে—

—নিয়ে এসো।

—অত কিছুই না। আরো ঢের পাবে।

এবারেও কিছু না বুঝেই বিজয় হন্তদন্ত হয়ে পাশের ঘর থেকে ব্যাগটা নিয়ে এলো।

গায়ত্রী রাই বালিশের তলা থেকে শক্ত সুতোয় বাঁধা বড় একটা খামে মোড়া প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—এটা সাবধানে ওর মধ্যে রাখো, আর ব্যাগ নিজের সঙ্গে রেখো।

ঊর্মিলা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় ভেবে পেল না কি ব্যাপার।—কি আছে এতে ?

—আগে রাখো ঠিক করে।

বিমূঢ় মুখে তামিল করল। প্যাকেট ব্যাগে ঢোকালো।

গায়ত্রী রাই বলল, চল্লিশ হাজার টাকা আছে ওখানে।...যে তাড়াহুড়োর ব্যাপার করলে, কিছুই করা গেল না। তোমাদের যা পছন্দ ওই থেকে করে নিও।

বিজয় মেহেরা আঁতকেই উঠল।—অত টাকা কি হবে।

এবারে ঊর্মিলা ভেঙে পড়ল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা, তুমি আমাদেব টাকা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছ।

এই প্রথম পরিপূর্ণ দু চোখ মেয়ের মুখের ওপর এঁটে বসতে লাগল। বাপীব মনে হল শুধু দেখবেই। জবাব দেবে না।

জবাব দিল। বলল, এখানে আমার কাছে পড়ে থাকাব জন্য এমন দুড়দাড় করে বিয়েটা সেরে ফেলেছিস ?

—না-না! তুমি তাড়িয়েই দিচ্ছ! ঠিক জানি তুমি আমাকে আর কক্ষনো ডাকবে না।

চেয়ে আছে। একটু পরে খুব স্বাভাবিক অনুশাসনের সুব।—ছেলেটার সামনে কি পাগলামি করিস ? চোখ মোছ্! আমার শরীরের হাল দেখছিস না...আমি না পারলেও সময়মতো বাপী ঠিক ডাকবে। তখন দেরি না করে বিজয়কে নিয়ে চলে আসিস।

ঊর্মিলা তবু কাঁদছে। মা কি যে বলল, এই বিচ্ছেদের আবেগে তা মাথা পর্যন্ত পৌঁছুলো না বোধ হয়। বিজয় মেহেরারও না।

এক আর্ত ত্রাসে বাপীই শুধু নিস্পন্দ হঠাৎ।

সময় হয়েছে। বাপীর গাড়ি নিয়ে বাদশা প্রস্তুত। মায়ের পা ছুঁয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। গাড়িতে উঠল। বাপী পাশে দাঁড়িয়ে। ঊর্মিলা চেয়ে আছে তার দিকে। আশা করছে এই রওনা হবার মুহূর্তে ফ্রেন্ড কিছু বলবে। আর কিছু না হোক, মায়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবে। শিগগীরই আবার দেখা হবার কথা বলবে।

বাদশাও ঘাড় ফিরিয়ে হুকুমের প্রতীক্ষায় আছে। বাপী হুকুম করল,—চলো!

সামনের বাঁকের মুখে গাড়িটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ঊর্মিলা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে এদিকে চেয়ে রইল। বাপীও। কিন্তু সে ওকে দেখছে না। গাড়িটাও না। মাথার মধ্যে চিনচিন করে জ্বলছে কিছু। কতগুলো কথার কাটা-ছেঁড়া চলেছে। গায়ত্রী রাই শেষে মেয়েকে যা বলেছে সেই কটা কথা। মেয়েকে বলেনি, ওকে শুনিয়েছে, ওকেই কিছু বোঝাতে চেয়েছে। বুকের ভেতরটা আচমকা দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে যন্ত্রণাটা মগজের দিকে ধাওয়া করেছে। এখন সেটা চোখ বেয়ে নেমে আসতে চাইছে।

বাপী বাংলোয় উঠে এলো। সেখান থেকে আবার ঘরে। কোয়েলা তার মালকানের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। কিছু বলতে হল না, এই মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'চোখ আরো বেশি করকর করছে বাপীর। চেয়ে আছে।

চেয়ে আছে গায়ত্রী রাইও। ভাবলেশশূন্য নির্লিপ্ত।—বলবে কিছু?

—হ্যাঁ। আপনার মেয়ের শাস্তি দেখলাম। আমার কি শাস্তি?

জবাব দেবার তাড়া কিছু নেই যেন। একটু সময় নিয়ে ফিরে প্রশ্ন করল, মেয়ের কি শাস্তি দেখলে?

—ক্ষমার শাস্তি। আমি আপনার ক্ষমা চাই না।

মুখখানা যেন আরো একটু ভালো করে দেখে নেয়ার কারণ ঘটল। অভিব্যক্তির রকমফের নেই, গলার স্বরে নির্লিপ্ত কৌতুকের ছোঁয়া লাগল একটু।—তুমি তো আমার গার্জেন এখন...এ-সবের অনেক ওপরে উঠে গেছ। পরের কথাগুলো ধার ধার।—তাছাড়া এসব কথা ওঠে কেন, নিজের মুখেই তো বলেছ, যা করেছ জীবনে কারো এত উপকার খুব কম করেছ।

—হ্যাঁ, বলেছি। তাই করেছি। কিন্তু তার বদলে আপনি কি করেছেন?

কি বলতে চায় গায়ত্রী রাই ঠাওর করে উঠতে পারল না। দেখছে।—আমি কি করেছি?

—আপনি মেয়েকে বলেছেন, সময়মতো বাপী ঠিক ডাকবে। সময়মতো বলতে কোন সময়? কিসের সময়? আর বলেছেন, তখন দেরি না করে চলে আসতে। তখন বলতে কখন?

দু' চোখ রাগে জ্বলছে বাপীর। কিন্তু গত রাতের পর থেকে এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম গায়ত্রী রাইয়ের মুখের নির্লিপ্ত কঠিন পরদাটা সরেছে একটু একটু করে। কোমল প্রলেপ পড়ছে। পাতলা সাদা ঠোঁটের ফাঁকে রং ধরেছে। একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ঘরের হাওয়াও লঘু করে দিতে চাইল। পলকা মোলায়েম সুরে বলল, আমার ডাক আসতে আর বেশি দেরি নেই, তোমার বুঝতে খুব অসুবিধে হচ্ছে?

আগে হলে বাপী এই কমনীয় মাধুর্যটুকু দু চোখ ভরে দেখত। কিন্তু এখন, বিশেষ করে এই কথা শোনার পর দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত। বলে উঠল, ডাক আসুক না আসুক, আমাকে আক্কেল দেবার জন্য আপনি যে তৈরী হচ্ছেন সেটা বুঝতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে অনেক চিনলেও আরো একটু চিনতে বাকি আপনার। নিজে সেধে ডাক শুনতে এগোলে তার আগে আমি আপনাকে নিজের মরা মুখ দেখিয়ে ছাড়ব। বানারজুলির জঙ্গলে তার সুযোগের অভাব কিছু নেই—

—বাপী!

বাতাস-চেরা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ওদিক থেকে কোয়েলা ছুটে এলো। বাপীর ফুটন্ত মগজে হঠাৎ যেন বিপরীত হিমশীতল তরঙ্গ বয়ে গেল একটা। শয্যার দিকে একবার থমকে তাকিয়ে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

এরপর থেকে বাপীর বাইরেটা অনেক ধীর অনেক শান্ত। নিভৃতে নিঃশব্দে এক

ধরনের শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা। যে শক্তি জীবনের অমোঘ বরাদ্দও বরবাদ করে দিতে পারে। সেই অদৃশ্য শক্তিটা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পেতে চায়। পাশের বাংলোর ওই রমণীর প্রাণসত্তায় সেটা আরোপ করে দিতে চায়।

পাশের বাংলোয় নয়। এখন ওই বাংলোতেই রাত কাটে তারও। পাশের ঘরে অর্থাৎ ঊর্মিলার ঘরে নিজের শোবার জায়গা করে নিয়েছে। এজন্যে কারো অনুমতির দরকার হয়নি। মাঝের দরজা খোলা। নিজের শয্যায় বসেই দেখতে বা লক্ষ্য রাখতে সুবিধে হয়। গায়ত্রী রাইয়ের ঘরে সবুজ আলো জ্বলে।

সেই ঘটনার পর থেকে তারও আচরণ বদলেছে। কোনো কিছুতে নিজের জোর খাটায় না। এক অবুঝ গোঁয়ার ছেলের হাতে নিজের সব দায় সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত। যা বলে, শোনে। যা করতে বলে, করে। তবু শরীর সারার নাম নেই দেখে বেচারী-মুখ করে বাপীর দিকে চেয়ে থাকে।

ঊর্মিলার যাবার সাত-আট দিনের মধ্যে পৌঁছানোর সংবাদ এসেছে বাপীর কাছে। ঊর্মিলার তখনো মন খারাপ, তখনো অভিমান। ছোট চিঠিতে মায়ের খবর জানতে চেয়েছে। নিজেদের কথা বিশেষ লেখেনি।

আর দশ দিন পরের চিঠি অবশ্য বড়। লিখেছে, কলকাতা একটুও ভালো লাগছে না। আর একজনের কেবল কাজ আর কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ফুরসৎ নেই। আর লিখছে, মা-কে যে এত ভালবাসে আগে জানত না। এখন বুঝছে। সব সময় মায়ের কাছে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। মা রাগ করুক আর যাই করুক, আর বেশিদিন মাকে না দেখে ও এভাবে থাকতে পারবে না। বিজয়কে রেখে একলাই দিনকতকের জন্য চলে আসবে।

বাপী এ চিঠিও তার মাকে পড়ে শোনালো।

—না। স্বর না চড়লেও সুর কঠিন।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি না?

—লিখে দাও একলা আসতে হ[illegible] না. আমি ভালো আছি, আমার জন্য কোনো চিন্তা নেই।

এই শুনেও বাপীর রাগ।—আমি লিখে দিচ্ছি, আপনি একটুও ভালো নেই, যত তাড়াতাড়ি পাবে চলে আসুক।

আসলে বাপীর বুকের তলায় সেই এক ত্রাস থিতিয়েই আছে। সেটা কতটা অহেতুক জানে না। একটা হিম-ছবি থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে সময়ে তার মেয়েকে বাপীর ডাকতে হবে, সেই সময়ের ডাক শুনে দেরি না করে যখন মেয়েকে চলে আসতে হবে, সেই সময়ের। সম্ভাবনার এই ছবিটাই ছিঁড়েখুঁড়ে উপড়ে নির্মূল করে দিতে চায়। কিন্তু খুব ধীরে, প্রায় অগোচরের অমোঘ গতিতে এটা যেন এগিয়ে আসছে।

তাই আতঙ্কিত যেমন, আক্রোশও তেমনি।

মফঃস্বলে বেরুনো ছেড়েই দিয়েছে। সব কাজ ফোনে বা চিঠিতে এখানকার জন্য একে একে আরে দুজন বাছাই করা সহকারী বহাল করেছে। তারা অনুগত, বাপী তরফদারকেই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জানে তারা! তাছাড়া মাইনে আরো বাড়িয়ে আবু রব্বানীর ঘাড়েও অনেক বাড়তি দায় চাপিয়েছে। বাপীর কাজ বলতে বাংলোর আপিস ঘরে। খুব

দরকার পড়লে বানারজুলির গোডাউনে অথবা পাহাড়ের বাংলোয় যেতে হয়। তাও কাজ শেষ হওয়া মাত্র ঝড়ের গতিতে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে আসে।

ঘরে এসে দাঁড়াতেই গায়ত্রী রাই খুব সহজ আর স্বাভাবিক মুখ করে তাকায় তার দিকে। বোঝাতে চায় ভালো আছে। কিন্তু ভালো যে কেমন আছে এক নজর তাকিয়েই বাপী সেটা বুঝতে পারে। অন্তত বিশ্বাস করে যে বুঝতে পারে। আরো রেগে যায়। যেন লুকোচুরি খেলা হচ্ছে ওর সঙ্গে।

সেদিনও বাইরে থেকে ফিরে মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে বলল এখানকার ডাক্তারদের বিদ্যা-বুদ্ধি বোঝা গেছে। আর না, বাইরে যাবার জন্য তৈরি হোন।

মুখের দিকে চেয়ে মেজাজ আঁচ করেও গায়ত্রী রাই বলল, পাগলামি কোরো না।

—আমি পাগলামি করছি ? আর মুখ বুজে কষ্ট সহ্য করে আপনি খুব বুদ্ধির কাজ করছেন ? তাহলে আমাকে আর কি দরকার, যেদিকে দু চোখ যায় চলে যাই ?

গাযত্রী রাইয়ের সাদা-সাপটা জবাব, ভয় দেখাচ্ছ কি, পারলে যাও। চেয়ে আছে, সামাল দেবার জন্যেই আবার বলল, হার্টের এই অবস্থায় আকাশে ওড়া সম্ভব কিনা ডাক্তারকে জিগ্যেস করেছ ?

বাপী তক্ষুনি চলে এলো। ফোনে শিলিগুড়ির ডাক্তারকে ধরল। ইদানীং প্রতি সপ্তাহে তাকে বানারজুলি এসে রোগিনী দেখে যেতে হচ্ছে। তার সঙ্গে কথা বলে রিসিভার আছড়ে বাপী মুখ কালো করে ঘরে ফিরে এলো।

গায়ত্রী রাই সাদা ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার যেতে বলল ?

চোখের ধার ওই ফ্যাকাশে সাদা মুখে বিঁধিয়ে দিতে চাইল বাপী।—না। খুশী ?

শিলিগুড়ি থেকে দুজন অভিজ্ঞ নার্স নিয়ে এসেছে এরপর। পালা করে রাতদিনের ডিউটি তাদের। দরকার একেবারে ছিল না এমন নয়। বড় ডাক্তারের ব্যবস্থামতো মাঝে মাঝে অক্সিজেন চলছে এখন। অক্সিজেন দেওয়া মানেই ভয়ের কিছু নয় জানে। তবু এ জিনিসটাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না বাপী। গা শিরশির করে। সেই হিমেল ছবিটা, সামনে এগিয়ে আসতে চায়। কিন্তু অক্সিজেন দিলে রোগীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়, আরাম হয়। অসুবিধে হচ্ছে মনে হলে গায়ত্রী রাই নিজেই ওটা চেয়ে নেয়। দরকার ফুরোলে ছেড়েও দেয়। কিন্তু দরকারের মেয়াদ যে খুব একটু একটু করে বাড়ছে তাও বাপীর হিসেব এড়ায় না। তাই কারণে অকারণে অসহিষ্ণুতা। একজন ছেড়ে দুজন নার্স আসতে দেখে গায়ত্রী রাই বলল, এক কাজ করো, জঙ্গলের একটা হাতি-বাঁধা শেকল এনে আমাকে বাঁধো, তারপর নিশ্চিন্তে একটু কাজে-কর্মে মন দাও।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীর মনে হয়েছে, বনের হাতি বনমায়াকে শেকলে বেঁধে রাখা যায়নি, সে খোলস ফেলে পালিয়েছে। ফলে এই ঠাট্টাতেও রাগ।—তাহলে ছেড়ে দিই এদের ?

নার্সদের সামনে গায়ত্রী রাই না পারে হাসতে, না পারে বকতে।

দিনে রাতে ঘণ্টাকতক কাজ দেখাশুনা করতেই হয় বাপীকে। মহিলা ইদানীং সেই ফাঁকে কিছু লেখা-পড়া করে চলেছে টের পেল। তার মাথার কাছের টেবিলে কিছু সাদা কাগজ আর কলম দেখে বাপীর সন্দেহ হয়েছিল। আড়ালে নার্সদের জিজ্ঞাসা করে জানল। কোয়েলাও বলল। চার-পাঁচ দিন বাদে টেবিলে আর কাগজ কলম দেখা গেল না। বাপীর থমথমে মুখ।—আপনার উইল-টুইল করা সারা তাহলে ? সাক্ষী-সাবুদ ডাকতে হবে ?

কোয়েলা ঘরে। সামনে একজন নার্স বসে। গায়ত্রী রাইয়ের বিপাকে-পড়া মুখ।
—উইল আবার কি? ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা লিখে রাখলাম তা ছাড়া—

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে বাপী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, আপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় দুনিয়া চলছে ভাবেন? যা লিখেছেন ছিঁড়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগে?

গায়ত্রী রাই গম্ভীর। ধমকের সুরে বলল, এবার ডাক্তার এলে আগে নিজের মাথাটা দেখিয়ে নিও।

ছায়া আগে চলে। বাপীর চিন্তায় সেটা অনেক আগে চলে। মন আগে থাকতে কিছু বলে দেয়। তেমনি অনাগত কিছুর সঙ্গে সারাক্ষণ যুঝছে এখন। সেটা নাকচ করে দেওযার আক্রোশ। অথচ আর কারো উতলা মুখ দেখলে রেগে যায়। অকারণে কোয়েলা ধমক খায়, নার্সদের বেশি যত্ন-আত্তিও সব সময় পছন্দ নয়। ঘন্টাখানেকের জন্য সেদিন কি কাজে বেরিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে আবু রব্বানী আর দুলারি এসেছে। মেমসাহেবকে দেখতে।

বাপী নীরস মন্তব্য করে বসল, ঘটা করে দেখতে আসার মতো কি হয়েছে—তোমাদের মেমসায়েবের তাতে খুব কিছু হয়েছে ভাবার সুবিধে।

আবু অপ্রস্তুত। দুলারিও। সাদামাটা গাম্ভীর্যে গায়ত্রী রাই আগের বারের মতোই মন্তব্য করল, বাপী ঠিকই বলেছে, ওকে বরং ভালো করে দেখে যাও।

একে একে কটা মাস কাটল। এই অনাগত দিনের পদক্ষেপ এখন আরো স্পষ্ট। দিনে রাতে অনেকবার করে অক্সিজেন দরকার হয়। এক এক দিন ঘন্টার পর ঘন্টা চলে। শিলিগুড়ির বড় ডাক্তারের একজন সহকারীকে বানারজুলিতে নিজের ছোট বাংলোয় এনে বসিয়ে রেখেছে বাপী। তার ক্ষিপ্ততা আরো বেড়েছে, এক অদৃশ্য বিধানের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছে। সাহস করে ঊর্মিলাকে আসতে বলবে কিনা জিজ্ঞাসাও করতে পারে না। ও এসে ভেঙে পড়লে বাপী তার সমস্ত জোর খোয়াবে।

মাঘের গোড়া এটা। হাড়-কাঁপানো শীত। বানারজুলির জঙ্গলে শুকনো কঠিন রিক্ততার ছাপ। তার কঠোর বৈরাগ্যের তপস্বিনী মূর্তির সঙ্গে শয্যায় শয়ান ওই শান্ত রমণীর নিষ্প্রভ মুখের কোথায় যেন মিল। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই ক্ষোভ নেই।

রোগীর অবস্থা হঠাৎই সংকটের দিকে মোড় নিল। এমন হবে ডাক্তার পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। কিন্তু বাপী যেন স্পষ্ট জানত এই গোছের কিছু হবে।

রাত্রি। অক্সিজেন চলছে। ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে। ঘন ঘন ইনজেকশন দিচ্ছে। ঘরে দুজন নার্স, কোয়েলা...। বাপীর ঘোরালো চোখ একে একে সকলের ওপর ঘুরছে।

গায়ত্রী রাই চোখ মেলে তাকালো। আশ্চর্য পরিষ্কার চাউনি।

বাপী কাছে এসে দাঁড়াল। গায়ত্রী রাই কিছু বলল না। শুধু চেয়ে রইল।

বাপী বলল, টেলিগ্রাম করা হয়েছে। কাল সকালের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে।

গায়ত্রী রাই আবার চোখ বুজল। যেন এটুকুই শুনতে চেয়েছিল।

বাপী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আপিস ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল।

রাত বাড়ছে। দেওয়াল ঘড়ি টুং টুং শব্দে সময় জানান দিচ্ছে। ওটুকু শব্দেও বাপী বিষম চমকে উঠেছে। ঘড়িটা আছড়ে ভাঙতে চাইছে।

তিনটে বাজল।

বাপী সোজা হয়ে দরজার দিকে তাকালো। কোয়েলা ছুটে এসেছে।—সাহেব! শিগগীর—শিগগীর!

আবার ছুটে চলে গেল।

বাপী উঠল। পায়ে পায়ে এঘরে এসে দাঁড়াল। সবুজ আলোর জায়গায় জোরালো বড় আলো জ্বলছে এখন। অক্সিজেনের নল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নার্স দুজনের ছলছল চোখ। ডাক্তার নির্বাক দাঁড়িয়ে। কোয়েলা মুখে শাড়ি গুঁজে দিয়ে কাঁদছে।

বাপী শয্যা ঘেঁষে দাঁড়াল। বুকে হাত রাখল। আর কোনো সংশয় নেই। শান্ত। স্তব্ধ।

এখনো একটা চেষ্টা বাকি আছে বাপীর, যা অনেক—অনেক দিন গলা পর্যন্ত এসেও ফিরে ফিরে গেছে। এই শেষ একবার সেই চেষ্টা করবে? এই বাতাস এই স্তব্ধতা খান-খান করে দিয়ে গলা ফাটিয়ে একবার মা বলে ডেকে দেখবে? তাহলে কানে যাবে? তাহলে ফিরবে? চোখ মেলে তাকাবে?

নয়

ছ'মাস বাদে বাপী আবার কলকাতার মাটিতে পা ফেলল।

এই আসাটা হঠাৎ কিছু ব্যাপার নয়। দু-তিন মাস যাবৎ আসার প্রস্তুতি চলছিল। গায়ত্রী রাই চোখ বোজার পর থেকে বানারজুলির সঙ্গে শিকড়ের যোগটা ঢিলে হয়ে গেছে। বানারজুলি ছেড়ে গেলে হয়তো আবার একদিন বানারজুলি ভালো লাগতে পারে। প্রথম কিছু দিন এখান থেকে একেবারে পালনোর ঝোঁক মাথায় চেপে বসেছিল। তার পিছনে আক্রোশ ছিল। অভিমান ছিল। বানারজুলি তাকে বেঁচে থাকার বিত্ত যুগিয়েছে। অকৃপণ হাতে জীবনের বোঝা টানার কড়ি ঢেলেছে। নিয়েছে তার ঢের বেশি। নিয়ে নিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত বুকের ভিতর একটা মরুভূমি তৈরি করেছে।

কিন্তু কোথা থেকে কোথায় পালাবে? যেখানে যত দূরেই যাক, জীবনের এই বোঝাটাকে কোথাও ফেলে রাখা যাবে না। একই সঙ্গে আবার এক বিপরীত অনুভূতির তাড়না অবাক করেছে ওকে। মৃত্যুব ওধারে কি জানে না। কেউ জানে না। কিন্তু অলক্ষ্য থেকে কেউ কি দেখে? কে কি ভাবছে টের পায়? সব ছেড়েছুড়ে পালানোর চিন্তা যতবার মাথায় আসে, ততবার অদৃশ্য একখানা মুখ আর শান্ত ঠাণ্ডা দুটো চোখ যেন খুব কাছ থেকে ওকে দেখে, নিষেধ করে। আভিজাত্য গাম্ভীর্য ব্যক্তিত্ব ভরা এমন একখানা মুখ আর দুটো চোখের সস্নেহ শাসন কেউ কখনো তুচ্ছ করতে পেরেছে। বাপীর ভেতরটা হাঁসফাঁস করে ওঠে। চারদিকে তাকায়। মনে হয় গায়ত্রী রাই খুব কাছে আছে। খুব কাছ থেকে দেখছে। খুব কাছ থেকে নিষেধ করছে।

পালানোর সংকল্প মাথা থেকে সরেছে। এবার তাহলে কি? খুব কাছের যাকে দেখতে পাচ্ছে না, অসহিষ্ণু সরোষ প্রশ্নটা যেন তাকেই। কি তাহলে? যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বৃত্তটাকে আরো বড় করতে হবে? আরো অনেক বড় ঢের বড়? জঙ্গলের উদোম সন্ন্যাসী ওকে আগে বাড়তে বলেছিল—আগে বাড়লে পেয়ে যাবে। চোখ-কান বুজে এই পথেই সামনে এগোবে এখন? কিন্তু কি পাবে? অনেক টাকা, তারপর আরো অনেক টাকা? তারপর আরো অনেক অনেক অনেক টাকা? তারও পরে?

ঠিক তক্ষুনি সেই আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বুকের তলার কালীবর্ণ আকাশটাকে এক ঝলক বিদ্যুৎ পলকের জন্য দুখানা করে চিরে দিয়ে গেল। ওই পলকের মধ্যেই বাপীর ঘেমে ওঠার দাখিল। দুর্যোগে ভরা অন্ধকারের আড়ালে এখনো কোনো সুদূর প্রত্যাশার আগুন জ্বলছে কিনা জানে না। সেটাই একপ্রস্থ ঝলসে গেল কিনা জানে না। কিন্তু আপাতত ওটা ওই অন্ধকারের ওধারেই থাকুক। পরে ভাববে। পরে বুঝতে চেষ্টা করবে। খুব কাছে যার অস্তিত্ব অনুভব করছে অথচ দেখতে পাচ্ছে না—সেও না কিছু বুঝতে পারে।

তার ইচ্ছে মেনে বৃত্ত বড় করার ঝোঁকটাকে বড় করে তুলতে গেল। আপাত পিছু টান কিছু নেই। ব্যবসার দিক থকে ভাগ্যের পাশায় আবার নূতন যে দান পড়েছে তার দাক্ষিণ্যে বৃত্ত বিস্তারের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই কলকাতার দিকে চোখ বাপীর।

সংকল্পের কথা গোড়ায় ঊর্মিলাকে জানায় নি। ঊর্মিলা তখনো এখানে। বিজয়ও। টেলিগ্রামে মায়ের মামাবাড়ির খবর পেয়ে পরদিন সকালের প্লেনেই ওরা ছুটে এসেছিল। ঊর্মিলা মরা মায়ের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদেছে। কেঁদে কেঁদে কিছু ঠাণ্ডা হতে পেরেছে। কিছু হালকা হতে পেরেছে। বাপীর সে সম্বলও নেই কোনো দিন। খরচোখে ওর আছাড়ি বিছাড়ি কান্না দেখেছে। হিংসা করেছে।

সমস্ত ব্যবসা আর বিত্ত চুল-চেরা দু'ভাগ করে গায়ত্রী রাই এক ভাগ বাপী আর একভাগ মেয়ে-জামাইকে দিয়ে গেছে। দিয়ে গেছে বলতে এই মর্মে নির্দেশ রেখে-গেছে। ঊর্মিলা একটু ঠাণ্ডা হতে তার মায়ের শোবার ঘরের বড় সিন্দুক খেলা হয়েছিল। গায়ত্রী রাই মেয়ের সামনেও এটা বড় একটা খুলত না। ওই পেল্লায় সিন্দুকে থরে থরে সাজানো দশ আর একশ টাকার বাণ্ডিল দেখে বিজয় মেহেরার দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। কোন ঘরের মেয়ে নিয়েছে এ যেন নতুন করে অনুভব করেছে। এ ছাড়া ছোট বড় সোনার বারও পঁচিশ-তিরিশটা হবে। হীরে জহরতও আছে কিছু।

সিন্দুক থেকে একটা মস্ত বড় আর একটা ছোট খাম বার করে বাপী ঊর্মিলার হাতে দিয়েছে। দুটোরই যত্ন করে মুখ আঁটা। বলেছে, কি লিখে গেছেন আমি জানি না, খুলে দেখো।

ছোট খামে মেয়ে-জামাইয়ের প্রতি গায়ত্রী রাইয়ের সংক্ষিপ্ত নির্দেশ। পড়ে ঊর্মিলা নিঃশব্দে সেটা আবার বাপীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পড়তে পড়তে গলার কাছে বাপীর কিছু বুঝি আবার দলা পাকিয়ে উঠেছে। ব্যবসার যাবতীয় দায়দায়িত্ব যেমন বাপীর হাতে আছে তেমনি থাকবে। জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তার বরাদ্দ টাকা, চালু হারে কমিশন আর অন্যান্য সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে নিট লাভের আট আনা অংশ মেয়ে জামাই পাবে। মালিকানা সম্পর্কে অন্য যে-কোনো সিদ্ধান্ত দু'তরফের বিবেচনাসাপেক্ষ। ঘরে এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত নগদ টাকা, সোনা ইত্যাদিরও অর্ধেক বাপী তরফদার পাবে, বাকি অর্ধেক মেয়ে জামাইয়ের। কোয়েলা ঝগড়ু বা বাদশা ড্রাইভারকেও ভোলেনি। তাদের জন্যও কিছু থোক টাকা আলাদা সরানো আছে। ভূটান পাহড়ের বাংলোটা একলা মেয়ে পাবে। ব্যবসায়ের জন্য যদি সে বাড়ির দরকার হয়, তার ন্যায্য ভাড়াও মেয়ের নামে জমা হবে।

বড় খামে উত্তরবাংলার আর তার বাইরে বহু ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা-কড়ির হদিস, ব্যাঙ্কের পাশ-বই চেক-বই ইত্যাদি। এই টাকাও প্রায় অভাবিত পরিমাণ। প্রতিটি

অ্যাকাউণ্ট মেয়ে আর মায়ের নামে। তাই মেয়ের প্রতি মায়ের নির্দেশ, সে-যেন বাপীর প্রাপ্য অর্ধেক তাকে দিয়ে দেয়।

মোটামুটি হিসেব কষা হতে বিজয় মেহেরার মুখে কথা সরে না। ব্যাঙ্ক আর সিন্দুকের নগদ টাকা ভাগে চার লক্ষর ওপরে দাঁড়াচ্ছে। এর ওপর সোনা হীরে জহরতের ভাগ। কিন্তু তখনই সব কিছুর ফয়সালা করার মতো সময় নেই হাতে। নগদ টাকা আর সোনা ইত্যাদির অর্ধেক বুঝে নিয়ে সস্ত্রীক বিজয় কলকাতা চলে গেছে। বাকি সব কিছুর ব্যবস্থা পরের যাত্রায়। যাবার আগে ঊর্মিলা চুপি চুপি বাপীকে বলে গেছল, ওর কাছে সব একবারে ফাঁস করে দিয়ে ভালো কাজ করলে না বোধ হয়। কলকাতায় চাকরি ভালো লাগছে না, আবার বাইরে কাজের চেষ্টায় আছে। এত হাতে পেয়ে এখন মতিগতি কি হয় দেখো।

বলেছে বটে কিন্তু বাইরে পাড়ি দেবার ব্যাপারে ঊর্মিলারও তেমন বাধা কিছু আছে মনে হয়নি। পরের দু'তিনটে চিঠিতেও এই তোড়জোড়ের আভাস দিয়েছে ঊর্মিলা। লিখেছে তার ঘরের লোক এখন বেপরোয়া হয়ে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, আর বলছে কাজ হাতে না পেলেও চলেই যাবে। বিদেশে ওদের জন্য উল্টে কাজই নাকি হাঁ করে আছে।

'তিন মাসের মাথায় ওরা বানারজুলি এসেছে আবার। বিজয়ের খুশি ধরে না। ওর কলকাতার চাকরির মেয়াদ আর দেড়-দু মাস মাত্র। আগামী জুলাইয়ের শেষে ওরা আমেরিকা চলল, সেখান থেকে বিজয়ের বড় চাকরির প্রতিশ্রুতি মিলেছে, শুধু নিজের খরচে সেখানে গিয়ে পৌঁছুনোর দায়। এবারে বাপীকে গিয়ে সরাসরি একটা প্রস্তাব দিয়েছে। এখানকার ব্যবসায়ে অর্ধেক মালিকানার ব্যাপারে তার বা ডলির কিছুমাত্র আগ্রহ অথবা লোভ নেই। ব্যাঙ্কগুলোতে যে-টাকা মজুত আছে তার অর্ধেক বাপীর পাওনা। বাপী সে টাকাটা ছেড়ে দিলে তারাও অর্ধেক মালিকানার শর্ত ছেড়ে দেবে। কতকালের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছে জানে না, আধা-আধি বাখবার হিসেবনিকেশের মধ্যে থাকতে চায় না।

এর থেকে বাঞ্ছিত আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু বাপীর মুখ দেখে মন বোঝা ভার। সে ঊর্মিলাকে জিগ্যেস করেছে, তোমারও এই মত তাহলে?

সে জবাব দিয়েছে, আপত্তির কিছু নেই, তবে ব্যাঙ্কগুলো থেকে ফ্রেন্ডের দু'লক্ষ টাকার ওপর পাওনা—অর্ধেক মালিকানার বদলে অত দিতে হলে তার না ঠিকা হয়ে যায়।

বাপী হেসেই বলেছিল, ঠকলে আখেরে তোমরাই।

এমন সম্ভাবনার কথা ভেবেই হয়তো গায়ত্রী রাই লিখে রেখে গেছল, ব্যবসায় মালিকানা সম্পর্কে অন্য যে কোনো সিদ্ধান্ত দু'তরফের বিবেচনাসাপেক্ষ। অতএব বাপীর বিবেকও পরিষ্কার।

মালিকানা বদল হয়ে গেল। কিন্তু নামের বেলায় বাপী শুধু একটা রাই ছেঁটে দিল। নতুন নাম রাই অ্যান্ড তরফদার। ভক্ত যেমন সর্বদা তার আরাধ্য দেবদেবীর ছবি সঙ্গে রাখে, বাপীও ঠিক সেই মন নিয়ে ওই ইষ্টদেবীর নাম গোড়ায় বসিয়ে রাখল।

বাপীর লক্ষ্য এরপর কলকাতা। আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ঝোঁকটাই বড়।

কিন্তু এদিকের সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করার ফাঁকে আরো দুটো মাস কেটেছে। উত্তরাঞ্চলে সব থেকে বড় হার্ব-ডিলার এবারে জাঁকের সঙ্গে কলকাতার বাজারে নামতে চলেছে এই প্রচার আগে থাকতেই শুরু করেছে। প্রচারের চমক বাড়ানোর মতো একটি চৌকস লোকও ঠিক সময়ে জুটে গেছে।

জুটিয়েছে আবু রব্বানী। লোকটার নাম জিত মালহোত্রা। ইউ-পি'র ছেলে। বাপীর বয়সী হবে। স্মার্ট, সুশ্রী। যোগাযোগই বটে। আর কেউ হলে তার পরিচয় শুনেই হয়তো ছেঁটে দিত। কিন্তু আবুর সুপারিশের ফলে বাপীর আগ্রহ বাড়ল। চা-বাগানের সেই ছেলে, বাপীর আগে গায়ত্রী রাই যাকে কাজে বহাল করেছিল। কাজে-কর্মে চতুর ছিল। কিন্তু মেয়ের অর্থাৎ ঊর্মিলার দিকে চোখ যেতে যার আবার মূষিকদশা। আবু বলেছিল, মেয়ের দিকে ছোঁকছোঁক করতে দেখে মা ওকে তাড়িয়েছিল। পরে ঊর্মিলা বাপীকে বলেছিল, তার মতলব বুঝে সে-ই মাকে বলে ওকে তাড়িয়েছে।

বাপীকে এই বানারজুলিতে কে না চেনে। সকলের চোখের ওপর দিয়েই আজ ভাগ্যের এই জায়গাটিতে পৌঁছেছে। জিত মালহোত্রা আবুকে ধরেছে। নিজের ভাগ্য সে আর একবার যাচাই করে দেখতে চায়।

বাপী তাকে নিয়ে আসতে বলেছিল। দেখে আর দু'চার কথা বলে পছন্দ হয়েছে। তার এই দেখার চোখ আলাদা। সপ্রতিভ মুখে অভিবাদন জানাতে বাপী চুপচাপ মুখের দিকে খানিক চেয়ে ছিল। তারপর বলেছিল, নাম জিত, কিন্তু প্রথমেই তো হেরে পালিয়েছিলে—।

ও সবিনয়ে জবাব দিয়েছে, মহিলা মালিক, তাই একটু বেশি অ্যামবিশাস হয়ে পড়েছিলাম। ভুলের খেসারত দিয়েছি। আর এমন ভুল হবে না।

--আমার কাছে এলে অমন ভুলের সুযোগ কিছু নেই। আমার অন্য কিছু দরকার।

—বলুন।

—বিশ্বাস। এই প্রথম আর এই শেষ শর্ত।

বাপীর যা পছন্দ তাই করেছিল লোকটা। আর উৎরেও গেছল। বিনীত অথচ সপ্রতিভ আবেদন নিয়ে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর নিরুচ্ছ্বাস গলায় বলেছিল, আমি বিয়ে করেছি, একটা বাচ্চা আছে। ওদের ভালবাসি। বিশ্বাস হারিয়ে ওদের পথে বসানোর হিম্মত আমার নেই। তাছাড়া বিশ্বাস কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে সেটা ছ'বছর ধরে আপনাকে দেখে শিখেছি। এরপর আমারও এই একমাত্র পুঁজি জানব।

বাপী তাকে বহাল করেছে। খেতাব প্রাইভেট সেক্রেটারী। কাজ যোগাযোগ আর প্রচার। চা-বাগান থেকে সর্বসাকুল্যে মাইনে পেত পৌনে তিনশ' টাকা। বাপী সেটা পাঁচশ'য় তুলেছে। বাইরে থাকাকালে এর ওপর থাকা খাওয়ার খরচ পাবে। এ ছাড়া ভালো পোশাক-আসাকের জন্যও গোড়ায় কিছু থোক টাকা দেওয়া হবে তাকে। আর যা বোঝানোর তাও সোজাসুজি বুঝিয়ে দিয়েছে।—এ টাকা কিছু না আমি জানি। তুমি কতটা বড় হবে সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।

এক মাস আগে রাই অ্যান্ড তরফদারের মালিক জিত মালহোত্রাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। গতবারে বড়বাজারের যে-সব মার্চেন্ট-এর সঙ্গে বাপী দেখা করে

এসেছিল। তাদের প্রত্যেকের নামে শুভেচ্ছাসহ চিঠি পাঠিয়েছে। বড় বড় ওষুধের কারখানার হোমরা চোমরাদের কাছেও! সঙ্গে কোম্পানীর গাদা গাদা ঝকঝকে ক্যালেণ্ডার আর ফ্যাশানের ডায়ারি। বনজ ওষুধের কারবারে প্রচারের এই গোছের চটক তখন পর্যন্ত কলকাতায়ও নতুন। কিছুদিনের মধ্যে জিত জানিয়েছে, কেউ তাদের হেলাফেলা করেনি, অনেকেই সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

মন সব থেকে বেশি খারাপ আবু রব্বানীর। ব্যবসার মালিকানা বদলের ফলে বরাত ওরই সব থেকে বেশি খুলেছে। এখানকার সব কিছুর তদারকের ভার বাপী ওর কাঁধে চাপিয়েছে। জঙ্গলের হেড বীটম্যানের চাকরি ওকে ছাড়তেই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জঙ্গলের বড় সাহেব খুশি থাকার ফলে ওর ঘরসহ চারিদিকের খানিকটা জমি বাপী আবুর নামেই কিনে ফেলতে নিশ্চিন্ত। এরপর আর সরকারী জমিতে বসবাসের দায় থাকল না। এখানে সকলের মাথার ওপর ওকে বসিয়ে দেবার ব্যাপারে বাপীর মনে এতটুকু দ্বিধা ছিল না। লেখাপড়ার ঘাটতি পুষিয়ে দেবার লোক তিন-চারজন আছে।

আবুর তবু মন খারাপ, কারণ দোস্ত-এর মতিগতির ওপর তার খুব আস্থা নেই। কলকাতা কেমন জানে না। কিন্তু শুনেছে সে এক আজব শহর। সেখানে ব্যবসা ফেঁদে বসলে বানারজুলির সঙ্গে যোগটা শেষে ঢিলে হয়ে যাবে কিনা কে জানে। বাপী কথা দিয়েছে, দরকার হলে মাসের মধ্যে চারবার করেও এখানে এসে দেখাশুনা করে যাবে। আর দরকার না হলেও মাসে বার দুই আসবেই। হাওয়াই জাহাজে একঘণ্টা তো ব্যাপার। আর আবুরই বা যখন তখন চলে যেতে বাধা কোথায়?

আবার তবু খুঁতখুঁতুনির একটা কারণ দুলারি ফাঁস করেছে। ছ'মাস হতে চলল মেমসায়েব বেহেস্তে পাড়ি দিয়েছে, তার মেয়েও বিয়ে-থা করে সরে পড়েছে।—এত টাকা আর এত বড় ব্যবসা নিয়েও বাপীভাই একলা পড়ে আছে—এখনো বিয়ে সাদির নাম নেই। দুলারিকে নাকি বলেছে, তোমার বাপীভাইয়ের রাজার ভাগ্য রাজার মেজাজ, কিন্তু তার মধ্যে একজন ফকির মানুষও লুকিয়ে আছে। কবে না সব বিলিয়ে দিয়ে মুসাফির হয়ে চলে যায়!

শুনে বাপী হেসেছিল। কিন্তু ভিতরে কোথায় কেটে কেটে বসেছে। ওর ভিতরে লোভের মূর্তিটা ওরা দেখেনি। সেই দানবকে ওরা জানে না। জীবনে যা ঘটে গেছে তাই শেষ বলে ওই দানব আজও মেনে নিতে পারেনি। যে মনের ওপর অগাধ বিশ্বাস সেই মন আজও বলছে, আরো কিছু ঘটতে বাকি। আরো অনেক বাকি। তা না হলে সমস্ত মন এখন কলকাতার দিকে কেন? এখনো আগে বাড়ছে কেন? আরো টাকা আরো টাকা আরো টাকা? আর কিছুই না?

তাই যদি হবে, তাহলে সংগোপনের কিছু লোলুপ চিন্তা মাথায় উঁকিঝুঁকি দেয় কেন? বাপী তরফদার ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করেছে, বিবেকের ছড়ি উঁচিয়ে ছেঁটে দিতেও চেয়েছে। কিন্তু ওরা ফিরে ফিরে এসেছে। আসছে।...প্রথম দিন কলকাতার সেই নামী হোটেলে মিষ্টি বলেছিল, দু'তিন ঘণ্টা পর পর সমস্ত মুখে জল দেওয়াটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর কানে মাথায় জলের ছিটে দেখেছিল বাপী। ভেতর ঠাণ্ডা থাকলে এই বাতিক কেন?

ঊর্মিলা আর বিজয় মেহেরার প্রসঙ্গে নির্লিপ্ত সুরে মিষ্টি বলেছিল, অমন মা যখন

সহায়, সংকট আবার কি—ইনজিনিয়ারকে হটিয়ে দাও। তার জবাবে বাপী বলেছিল, রাজত্ব বা রাজকন্যায় লোভ নেই—বারো বছর ধরে পৃথিবীর সব বাধা আর সঙ্কলকে হটিয়ে একজনের জন্যেই বসে আছে।...শুনে মিষ্টির চাউনি ওর মুখের ওপর খানিক স্থির হয়েছিল, চাপা ঝাঁঝে বলেছিল, তুমি মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল মানুষ। বলেছিল, একটা মেয়ের দশ বছরের সঙ্গে বারোটা বছর জুড়লে কি দাঁড়ায়, আর কত কি ঘটে যেতে পারে—ভেবেছিল? শুধু নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়েই বারোটা বছর কাটিয়ে দিলে?

...কি ঘটে যেতে পারে বাপী পরে জেনেছে। কিন্তু মিষ্টির সেই অসহিষ্ণুতা আর ঝাঁঝের ফাঁকে কিছু চাপা যন্ত্রণাও ঠিকরে পড়ছিল নাকি?

..ছেলেপুলে হতে গিয়ে মিষ্টির প্রাণসংকট হয়েছিল। বড় ডাক্তার বলেছে, বাজে হাতে পড়ে মেয়েটার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। কিন্তু বাপী যখন দেখেছে সে-রকম ক্ষতির কোনা চিহ্ন চোখে পড়েনি উল্টে আগের থেকেও তাজা সুন্দর লোভনীয় মনে হয়েছে। তাহলে ক্ষতিটা কি? আর ছেলেপুলে হবে কি হবে না সেই সংশয়? তাই যদি সত্যি হয়, সেই বড় ডাক্তারের হাত সোনো দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে আপত্তি হবে না—এমন চিন্তাও যে করেছিল বাপী অস্বীকার করতে পারবে?

—সুদীপ নন্দী বলেছিল, বউ ঘরে নেওয়া দূরে থাক, তারা ছেলেকেই দূর দূর করে তাড়িয়েছে। অসিত চ্যাটার্জির মদের নেশা বাপী স্বচক্ষেই দেখেছে। জুয়ার নেশার কথাও শুনেছে। মিষ্টির মা মনোরমা নন্দী জামাইয়ের ওপর ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ। কতবার করে সে নাকি মেয়েকে বলেছে, কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেললেই ছেঁড়ে। এই ছেঁড়ার ব্যাপারে দীপুদাও বোনকে অনেক বুঝিয়েছে। সব কিছুর নিষ্পত্তি যদি হয়ে গিয়ে থাকে, নিভৃতের এই চিন্তার সলতেগুলো দপ করে জ্বলে জ্বলে ওঠে কেন, হাতছানি দেয় কেন? এক এক ফুঁয়ে বাপী তো কতবার করে সেগুলো নিভিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। সব থেকে বেশি চোখে ভাসে শেষের দিনে মিষ্টির সেই মুখ। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির ছোঁয়া লেগে ছিল। যার নাম ঠিক হাসি নয়, হাসির মতো কিছু। দু চোখ তুলে ওকে শুধু কিছু বোঝাতে চেয়েছিল। কোনো অভিযোগ ছিল না, দু'চোখে শুধু মিনতি ছিল।

বাপী নামে কোনো পুরুষ ওই মেয়ের জীবন থেকে একেবারে মুছে গিয়ে থাকলে এমনটা হত না। হতে পারে না।

কিন্তু বাপী তবু এইসব লোভের বুদবুদগুলো সজাগ বিশ্লেষণের আয়নায় ফেলে বড় করে দেখতে চায় না। মিষ্টি ওকে মোস্ট আনপ্র্যাকটিকাল বলেছিল। মর্মান্তিক সত্যিকথাই বলেছিল। স্বপ্নের জালে বাস্তব কিছু ছেঁকে তোলা যায় না। মনের তলায় যা আছে—থাক। তাদের কানাকানিতে কান দেবার সময় বা সুযোগ যদি আসে কখনো, আজকের বাপী তরফদারকে তখন কেউ আনপ্র্যাকটিকাল বলবে না। স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটানোর খোঁটাও আর কেউ দেবে না। আপাতত ও শুধু সামনে এগোচ্ছে, আগে বাড়ছে। কি পাবে আগে থাকতে তার হিসেব কষে কাজ নেই।

জুনের শেষদিনে বাপী ঊর্মিলার চিঠি পেল। রাগারাগি করে লিখেছে, আসি-আসি করেও আসছ না কেন-জুলাইয়ের শেষে কলকাতা ছেড়ে ওরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, এরপর দেখা আর কবে হবে? আর লিখেছে, চটপট চলে না এলে এরপর গাড়িও ফসকে যাবে—ওটা নেবার জন্য ওখানে অনেকে হাঁ করে আছে, বিজয় ওটার গতি করার জন্যও

ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

প্রথম দফায় গায়ত্রী রাইয়ের সিন্দুকের মোটা টাকা হাতে পেয়েই কলকাতায় গিয়ে কোনো বিদায়ী সাহেবের কাছ থেকে প্রায় নতুন একটা ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি কিনে ফেলার খবর উর্মিলা চিঠিতে লিখেছিল। সর্ব কিছু পাকাপাকি ফয়সলার জন্য ওরা গেলবারে আসতে সেই গাড়ির প্রসঙ্গও বাপীই তুলেছিল। উর্মিলাকে বলে দিয়েছিল, বাইরে চলে যাবার আগে গাড়ি যেন না বেচে দেয়—তারই দরকার হবে।

এদিকের ব্যবস্থা সব পাকা করে বাপী মোটামুটি প্রস্তুত ছিল। কলকাতায় মাল চালানোর জন্য শিলিগুড়ির ডিলারের মারফৎ নতুন একটা বড় ট্রাক কেনা হয়েছে। সেটা এসে পৌঁছনোর অপেক্ষা। তাও এসে গেল।

জুলাইয়ের তৃতীয় দিন বিকেলে এরোপ্লেন থেকে নামে বাপী তরফদার আবার কলকাতার মাটিতে। এবারে আসার তফাতটুকু শুধু তার মাথার মধ্যে। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। বৃষ্টিও পড়ছে, তবে জোরে নয়। এই অভ্যর্থনাও বাপীর মেজাজের সঙ্গে মিলছে।

বাপী তরফদার সামনে এগলো। আগে বাড়ল।

দশ

মনিব আজ আসছে জিত মালহোত্রা জানে। কিন্তু বাপী তাকে এয়ারপোর্টে আসতে বলেনি। সন্ধ্যার পর হোটেলে দেখা করতে লিখেছে। মনের তলায় কিছু হিসেব ছিল তাই এ-রকম নির্দেশ। তা না হলে ঘড়ির কাঁটা ধরে জিত মালহোত্রা এরোড্রোমে হাজির থাকতই।

বিশাল লাউঞ্জের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে গেল। হিসেব গরমিল হয়েছে। এয়ার অফিসের সেই ইনফরমেশান কাউন্টারে আর একটি অবাঙালী মেয়ে দাঁড়িয়ে।

—ছ'মাস আগে বিজয় মেহেরাকে নিয়ে যাবার জন্য যখন কলকাতায় এসেছিল, এই লাউঞ্জের এদিকে আসেইনি। যে সঙ্কল্প নিয়ে আসা তার বাইরে মাথায় আর কিছু ছিলও না। আর পরের ভোরে বিজয়কে বগলদাবা করে আবার যখন প্লেনে উঠেছে তখন আর কারো সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আজ কলকাতার মাটিতে পা দেবার আগে থেকে স্নায়ুগুলো সব নির্লিপ্ত সহজতার কৃত্রিম তারে বাঁধা ছিল। কিন্তু ঝকঝকে ইনফরমেশন কাউন্টারের ওধারে একজনের বদলে আর একজনকে দেখে হিসেব বরবাদ হলে যেমন হয়, মুহূর্তের মধ্যে ভেতরটা তেমনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

...দাঁড়িয়ে যে আছে তাকেই জিগ্যেস করবে ? খোঁজ নেবে ? দু'পা এগিয়েও থামল। দিল্লির সেই ইন্টারভিউর কথা মনে পড়ল। সেই চাকরি পেয়ে থাকলে তার এখনকার ঠিকানা কলকাতা না দিল্লি ? সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক রাস্তায় সেই সাতাশি নম্বর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবার তাড়না। বাপীর এক হাতে মস্ত সুটকেস, অন্য হাতে বড় সৌখিন ট্র্যাভেল এটাচি। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরল।

ছুটন্ত গাড়ীতে বসে একটু বাদেই নিঃশব্দে এক বিপরীত কাজ করল। ছেলেবেলা থেকে চেনা নিজের ভিতরের সেই অবুঝ অসহিষ্ণু বাপী নামে ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে প্রবীণ শাসনের চোখে দেখল খানিক। তারপর ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় কষালো

গোটাকতক। অমন নির্বোধ তাড়নার মধ্যে ফেলে দেওয়ার শাস্তি। ধৈর্যের হিমঘরে বাস এখন। অনন্তকাল ধরেই যদি সেখানে থাকতে হয়—অত ছুটফটানি কিসের?

—হয়তো আজই কোনো কারণে আসেনি। দেখা হয়নি ভালো হয়েছে। মন বিক্ষিপ্ত হতই। কৃত্রিম মুখোশের আড়াল নিতে হত। ব্যবসার তাগিদে আসাটা বড় করে তুলতে হত। নিজের কানেই সেটা কৈফিয়তের মতো শোনাতো। দু-দশ দিন বা দুই এক মাসে কাজে-কর্মে কিছুটা স্থিতি হবার পরে দেখা হলে সব দিক থেকে সুবিধে। কাজের আসনে আত্মস্থ পুরুষের আর এক রূপ। সেটাই সব থেকে সহজ আর নির্ভরযোগ্য মুখোশ।

—চাকরি নিয়ে দিল্লিতেই যদি চলে গিয়ে থাকে তাও অবাঞ্ছিত নয়। বাপী চাইলে দিল্লী আর কতদূর ? এক ঘণ্টার জায়গায় দু'ঘণ্টা। আসল ফারাক অসিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে। আরো বড় ফারাকের সূচনা হতে পারে এটা। মিষ্টি তার আওতার মধ্যে বসে নেই এ আরো বেশি কাম্য। সেই রকম দাঁড়িয়েছে কিনা জানার লোভ বাপীর। দক্ষিণ কলকাতার সাতাশি নম্বরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেই জানা যেতে পারে। গেলে খাতির কদর আগের থেকেও বেশি হবে হয়তো। তার বর্তমান মর্যাদার খবর সুদীপ নন্দী আর তার মা-ই খুঁচিয়ে বার করবে। তাদের টাকা যথা পিরীত তথা।

নাঃ, বাপীর তাড়া নেই। সময়ে সব হবে। সব বোঝা যাবে। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়ের সামিল। স্নায়ু নিজের বসে এখন। আপাতত সে হোটেলে যাচ্ছে। আর কোথাও না। পাশের বড় অ্যাটাচি কেসটা বোঝাই টাকা। নিজের রোজগারের টাকা ছোঁবার দরকার হয়নি। সে-সব উত্তরবাংলার নানান ব্যাঙ্কে আর লকারে যেমন ছড়ানো ছিল তেমনি আছে। এই অ্যাটাচিতে গায়ত্রী রাইয়ের সিন্দুক থেকে পাওয়া নিজের ভাগের টাকা। দু'লক্ষর ওপরে আছে। সবটাই নিয়ে এসেছে। এত টাকা এ ভাবে আনতে বুকে কাঁপুনি ধরার কথা। কিন্তু বাপীর এ ব্যাপারে এক ফোঁটা উদ্বেগ নেই। যেমন নির্বিকার তেমনি স্বাভাবিক। এমন কি গায়ত্রী রাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী সোনা আর তার থেকেও দামী যা-কিছু হাতে এসেছে সে-সবও ওই পেল্লায় সিন্দুকের তলায় ফেলে এসেছে। অবশ্য কুড়ুলের ঘায়েও অমন সিন্দুক ভাঙা সহজ নয়। আর কোয়েলা আছে। তার মালকান নেই, কিন্তু তার কাছ থেকে নগদ যা পেয়েছে তাতে বাপীরও কেনা হয়ে আছে। না পেলেও বিশ্বাস খোয়ানোটা ইজ্জত খোয়ানোর সামিল ওর কাছে। ওদের এই ধাত বাপী চেনে। আর বাদশা ড্রাইভার আছে। প্রভুভক্ত সজাগ কুকুরের মতোই ওরা বাংলো পাহারা দেবে। তাছাড়া সিন্দুকে কিছু থাকতে পারে এমন ধারণাও কারো নেই। সোনা তবু সোনাই। ছায়া-ভয় পিছনে ধাওয়া করে। বাপীর করে না।

তা হলেও এত কাঁচা টাকা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি কোনো কাজের কথা নয়। তাই ঊর্মিলার ওখানে যাওয়ার ইচ্ছেও আজকের মতো বাতিল। কাল এখানকার ব্যাঙ্কের কাজ সেরে অন্য চিন্তা।

আগের সেই নামী হোটেলে মালহোত্রাকে ঘর বুক করে রাখতে বলা হয়েছিল। সে আগে থাকতে এসে বসে আছে। সপ্রতিভ অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো।

এই লোকের একটা গুণ বাপী বানারজুলির ক'দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছে। কাজের ব্যাপারে চতুর, চটপটে। গায়ত্রী রাইয়ের কাছেও ছ'মাস ছিল। কাজ সম্পর্কে ভালোই ধারণা আছে। কিন্তু কি করল না করল প্রশংসার লোভে আগবাড়িয়ে সেটা জাহির করতে

আসে না। হাল্কা চা-পর্বের পরে মালিককে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে পার্টিশনের ও ধারে চুপচাপ বসে আছে।

বেশভূষা বদলে বাপী গদির নরম বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল খানিকক্ষণ। গতবারে এই হোটেলের প্রথম দিনটা বার বার মনে আসছে। শেষের দিনটাও। বাপীর ওটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে সরানোর চেষ্টা। প্রত্যাশার আতসবাজী রঙে রঙে ঝলসে উঠেছিল। ছাই হয়ে নেমেছে। ছাই ঝেঁটিয়ে দুটো দিনকেই বিদায় করল বাপী। নিশ্চল নিস্পন্দ পড়ে থেকে মাথাটাকে খানিকক্ষণের জন্য শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা। ভালো-মন্দ সমস্ত রকমের চিন্তা বাতিল। কোনো বইএ পড়া এই কসরত কিছুটা রপ্ত হয়েছে। পরে বেশ ঝরঝরে লাগে।

—জিত্!

—সার! জিত মালহোত্রা তক্ষুনি পার্টিশনের ও-ধার থেকে এগিয়ে এলো।

—একটা চেয়ার এনে বোসো। তারপর খবর কি বলো!

খবর মোটামুটি যেমন আশা করা গেছল তাই। নিজের পোর্টফোলিও ব্যাগ থেকে জিত্ আর্ট পেপারে ছাপা একটা প্যামফ্লেট তার হাতে দিল। বাপী শুয়ে শুয়েই উল্টে-পাল্টে দেখল সেটা। তার খসড়া মতোই এখানে ছাপা হয়েছে গ্রুপে ভাগ করা ফার্মের যাবতীয় ভেষজ মালের ক্যাট্যালগ। সমস্ত উত্তরবাংলা নেপাল ভুটান মধ্যপ্রদেশ আর বিহারের শাখা-প্রশাখার হদিস। সে-সব এলাকায় সরবরাহের বিনীত ফিরিস্তি। ট্রেনের অনিশ্চয়তার ওপর নির্ভর না করে নিজেদের যানবাহনে সময়ে সর্বত্র মাল পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কলকাতার এ-মাথা ও মাথা পর্যন্ত এই প্যামফ্লেট ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বনজ ওষুধের পুরনো ব্যবসার প্রচার এ-যাবৎ তেমনি পুরনো ধাঁচের ছোট গণ্ডীর মধ্যে আটকে ছিল। পাঁজির পাতায় বা কচিৎ কখনো খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখা যেত। এসব জায়গায়ও পাতা-জোড়া প্রচারের সংকল্প বাপীর মাথায় আছে। তার আগে এইগোছের চটকদার প্রচার এ-লাইনে কমই দেখা গেছে। ফার্মের চকচকে ক্যালেণ্ডার আর ফ্যাশানের ডায়েরি তাদের নজর কেড়েছিল। আর্ট পেপার ছাপা প্যামপ্লেট ছড়ানোর ফলে কলকাতার বাজারে রাই অ্যান্ড তরফদারের আসন্ন পদার্পণের ঘোষণা আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। জিতের খবর, মালিক আসছে জেনে অনেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগের আগ্রহ দেখিয়েছে। এখন শুধু বানারজুলি থেকে মাল চালান আর স্যাম্পল আসার অপেক্ষা।

—সে-সব তুমি সামনের সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবে। গোডাউন ঠিক করেছ?

জিত্ সায় দিয়ে জানালো, দুটো গোডাউন দেখে রাখা আর ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে কথা বলে সময় নেওয়া হয়েছে। এখন মালিকের যেটা পছন্দ। এ-ছাড়া চৌরঙ্গীর কাছাকাছি এলাকায় আর পার্ক স্ট্রীটের দিকে কিছু ফারনিশড় ফ্ল্যাটও দেখা হয়েছে। ভাড়া অনেক। পছন্দ হলে পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।

ফ্ল্যাট খোঁজার কথাও বাপী তাকে লিখেছিল। বলল, কাল-পরশুর মধ্যে সব ঠিক করে ফেলব। ভাবল একটু। কাল সকালে—না কাল শনিবার, বারোটার মধ্যে ব্যাঙ্কের কাজ সারতে হবে। দুপুরের দিকে তাকে আসতে বলে দিল। ভবানীপুরের দিকে কোনো মেসে একটা ঘরভাড়া নিয়ে আছে ও। মনে পড়তে হঠাৎ কৌতূহল একটু।—তোমার

মেস ঠিক কোন্ জায়গায় বলো তো?

জিত্ হদিস দিতে মনে হল টালি এলাকার কাছাকাছিই হবে।—ব্রুকলিন পিওন রতন বণিক কপাল যাচাই করে প্রথম থেকে অন্ধ বিশ্বাসে তার রাজার ভাগ্য ঘোষণা করেছিল। আর চলে আসার দিনও বলেছিল, কপালের রং আগের থেকে ভালো হয়েছে, আর বলেছিল আমার কথা মিলিয়ে নেবেন, দিন ফিরলে ভুলবেন না যেন।

দিন ফিরেছে। বাপী ভোলেনি। সেই কৃতজ্ঞতায় ওরও কপাল ফেরানো, দিন ফেরানোর ইচ্ছে। আগের বারে এসেও এমনি তাগিদ অনুভব করেছিল। এবারও ছেঁটেই দিতে হল।...ভুলবে তো নাই কোনদিন। প্রবৃত্তির শেকলের দাগ এখনো আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে, ভুলবে কেমন করে। পরে দেখা যাবে। পরে যা-হয় হবে।

—আচ্ছা আজ এসো।

একটু ইতস্তত করে জিত্ উঠে দাঁড়ালো। মনিবের দিকে আর একবার তাকিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

তক্ষুনি নিজের চোখ যাচাইয়ের ঝোঁক বাপীর। ডাকল, শোনো—

ফিরল।

—বোসো। কিছু বলবে? আরো কিছু যে বলতে চেয়েছিল মালিক বুঝল কি করে ভেবে পেল না। দ্বিধা কাটিয়ে জিত জানালো আবু সাহেব অন্য মালের ব্যাপারেও কিছু খোঁজখবর নিতে বলে দিয়েছিল। তাও নেওয়া হয়েছে—

বাপী তক্ষুনি বুঝে নিল অন্য মালটা কি। ভুটান সিকিম বা নেপালের মদ। ট্রাক যখন আসবেই, লাভ বুঝলে এ-দিকটাও চালু রাখতে অসুবিধে নেই। এই ব্যবসা এখন পুরোপুরি আবুর এখ্তিয়ারে। লাভের আধাআধি বখরার শর্তে বাপী শুধু পুঁজি অর্থাৎ টাকা যুগিয়ে খালাস। এ-ছাড়া আর কোনো দায়দায়িত্ব বা সংস্রব নেই।

নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, বাজার কেমন?

শুনল, বাজার খুব ভালো। বানারজুলির থেকে ঢের ভালো। যতগুলো লিকারশপের মালিকের সঙ্গে কথা হয়েছে, দামের আঁচ পেয়ে সকলেই এক কথায় রাজি। জিনিস কেবল তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে।

এ-কাজেও লোকটার এমন তৎপরতা দেখে বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো একটু। জিগ্যেস করল, তুমি ড্রিংক করো?

—না, সার।

—শিওর—নো?

এবারে একটু জোরের সঙ্গে জবাব দিল, আপনি একটু খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, মিসেস গায়ত্রী রাইয়ের কাছে আমার সম্পর্কে চালিহা সাহেবের সেটাই বড় সার্টিফিকেট ছিল।

বাপী আর জেরা করল না। এত বলার দরকার ছিল না, সত্যি না হলে মুখ দেখে বুঝতে পারত। বলল, ঠিক আছে, এ সম্পর্কে পরে ভাবব, আবুকে চিঠিপত্রে কিছু লেখার দরকার নেই।

মালহোত্রা চলে গেল। যতটা আশা করেছিল লোকটা তার থকেও ভালো উৎরোবে মনে হল বাপীর। আকাঙ্ক্ষা বড় বলেই দ্বিতীয় দফা চাকরি ছেড়ে এই ঘাটে নৌকো

বেঁধেছে। নিজের দায়েই সেটা অক্ষত রাখতে চাইবে।

আরো অনেকক্ষণ শুয়েই কাটিয়ে দিল। বাইরের অন্ধকার ঘরে সেঁধিয়েছে। উঠে আলো জ্বালল। নোটবই খুলে একটা টেলিফোন নম্বর বার করে ঘরের রিসিভার তুলে কানেকশন দিতে বলল।

একটু বাদে ও-প্রান্ত থেকে চেনা গলা ভেসে এলো।

—ছোট কোবরেজ মশাই ?

—বলছি—আপনি ?

এধারে বাপীর গলা আরো গুরু গম্ভীর।—প্রেয়সীর খবর কি—ঘরে ডেকে গান-টান শোনাচ্ছে আজকাল, না এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতে হচ্ছে?

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্তের পর ও-দিক থেকে নিশীথ সেনের গলা আছড়ে পড়ল —বাপী তুই! আচ্ছা চমকে দিয়েছিলি মাইরি। তারপরেই খাটো গলা।—ও-সব কথা আর মুখেও আনিস না-ভাই, আমি ফেঁসে গেছি, এই গলায় যে ঝোলার সে ঝুলে পড়েছে—

বাপী যেন ধাক্কাই খেল একটু।—কে ঝুলল, তোর বাবার পছন্দের সেই টাকাঅলা মুদির পুঁটলি?

—আর বলিস না ভাই। লজ্জায় তোকে একটা খবরও দিতে পারিনি।—ভদ্রলোক মানে বউয়ের বাবা হঠাৎ শক্ত অসুখে পড়ে যেতে নিজের বাবাটি একেবারে মাথায় চেপে বসল। কি আর করব, দুগগা বলে ঝাঁপিয়েই পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে তো নেই, তিনটেই মেয়ে--অসুস্থ শ্বশুরের সঙ্গে সকালের দিকে এখন দোকানে বসতে হচ্ছে। যাগগে, হুট-হুট করে কখন আসিস কখন যাস জানতেই পারি না—তোর খবর কি ?

—ভালো।

নিশীথের গলার স্বর উৎসুক একটু।—এখানে তোদের রিজিয়ন্যাল অফিস হচ্ছে এবার ?

—ঠিক নেই। ছাড়ি, খুব ব্যস্ত এখন।

—শোন, সেই হোটেলেই উঠেছিস নাকি? কবে দেখা হবে ?

—আমি তোকে ফোন করব'খন, এখন বেজায় তাড়া, ছাড়ি—

রিসিভার নামিয়ে আবার বিছানায় চিৎপাত। ফোন করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এখানকার ম্যানেজারের চেয়ারে নিশীথ সেনকে বসানো স্থির ছিল। ওদের সামনের বাড়ির সেই বি. এ. পাশ-করা মিষ্টি গান করা আধুনিকা সুশ্রী মেয়েই যদি নাকসিঁটকে কবিবাজের ছেলেকে বাতিল করে দিত বাপী এমন অকরুণ হত না। ফোনে এই শোনার পর নিশীথ সেনের অস্তিত্বসুদ্ধ বাতিল।

কলকাতার বাতাস ঠিক এই সময়ে কতটা উত্তপ্ত বাপীর ধারণা ছিল না। পরদিনই টের পেল। দিন বারো আগে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির হঠাৎ মৃত্যুর খবর কাগজে দেখেছিল। ছ' সপ্তাহ যাবৎ শ্রীনগরে আটক ছিলেন। সেখানেই অঘটন। পশ্চিম বাংলার মানুষ এই মৃত্যুকে সাদা চোখে দেখেনি। অসন্তোষের আগুন তখন থেকেই ধিকি ধিকি জ্বলছে। দিল্লিতে বসে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আটক অবস্থায় এই সংগ্রামী নেতার জীবনান্তের কারণে তাঁর বেদনাবোধের কথা বলেছেন। কিন্তু এই মৃত্যু নিয়ে হাজার হাজার বাঙালীর

তদন্দের দাবি সম্পর্কে তিনি নিরুত্তর। অসন্তোষ বাড়ছে। সাধারণ মানুষ ক্রোধে গজরাচ্ছে। ঠিক এইসময়, অর্থাৎ বাপী আসার পরদিনই সমস্ত কলকাতা দপ কর জ্বলে উঠল আর এক উপলক্ষে। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের এক পয়সা ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। এখানকার সরকারের তাতে অনুমোদন ছিল। ফলে ক'দিন যাবৎ একটা প্রতিরোধের আন্দোলন শুরু হয়েছিল। স্নায়ু এমনি তপ্ত সকলের যে অতি নিরীহ যাত্রীও এক পয়সা বেশি দিতে নারাজ।

কলকাতায় আসার তাড়ায় আগের দু'দিনের কাগজ উল্টে দেখারও সময় হয়নি বাপীর। গতরাতে রেডিওর খবরও শোনার মেজাজ ছিল না। সকালের কাগজ খুলে দেখে, কলকাতায় সেদিন ওই এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বামপন্থীদের স্বার্থের কথা বলে পাল্টা কটাক্ষ হেনেছেন। জনসাধারণের কাছেই এই হরতাল বানচাল করার আবেদন পেশ করেছেন।

কলকাতার এই বাতাস বাপী চেনে না। ক্ষ্যাপা কলকাতার এই চেহারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা ছিল না। শুধু এইদিন নয়, পর পর আরো ক'টা দিন বাপী হোটেল বন্দী হয়ে থাকল। চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে, রক্ত ঝরছে। ট্রাম পুড়ছে, সরকারী বাস পুড়ছে। নগর জীবন স্তব্ধ, অচল। হরতালের পরদিনই বিধান রায় য়ুরোপ চলে গেছেন। তাঁব সেখানে চোখের অপারেশন। এই অনুপস্থিতিতে হাল যাঁরা ধরেছেন, জন মতের দিকে না চেয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনার তাগিদে তাঁরা পুলিশের পৌরুষের ওপর নির্ভব করেছেন। এই ভুলের মাশুল বেড়েই চলল। এক পয়সার যুদ্ধের সমস্ত নেতার সঙ্গে হাজারের ওপর বিক্ষুব্ধ মানুষ জেলে। কিন্তু মানুষ ক্ষেপলে জেলই বা কত বড় ? ফলে লাঠি টিয়ারগ্যাস গুলি—খুন-জখমের তাণ্ডব।

বাপী আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে আবুকে মালের ট্রাক ছাড়তে নিষেধ করেছে। এই বিপাকে গোডাউনই ঠিক করা হয়নি, মাল এনে করবে কি। ব্যাঙ্কের কাজ অবশ্য সেরে রাখতে পেরেছে। চৌরঙ্গী এলাকায় কয়েকটা ব্যাঙ্কের নগদ টাকার কাঁড়ি জমা করে দিয়েছে। জিত মালহোত্রা হেঁটে হলেও একবার করে আসে। তার তৎপরতায় এরই মধ্যেই ভালো একটা ফ্ল্যাটও বুক করা গেছে। চৌরঙ্গীর কাছাকাছি অভিজাত এলাকা। এখন পর্যন্ত বাঙালীর বাস কম। মস্ত ম্যানশানের রাস্তামুখো তিনতলার ফ্ল্যাট। লিফট আছে। একতলায় গ্যাবাজ। সামনে প্রকাণ্ড ফারনিশড হল। ও-ধারে দুটো বড় বেডরুম। পরিপাটী ব্যবস্থার কিচেন আর ঝকঝকে বাথরুম।

মাস কয়েকের মোটা ভাড়ার আগাম দাবি মিটিয়ে বাপী চোখকান বুজে চুক্তিপত্রে সই করে দিয়েছে। গণ্ডগোলের দিন না হলে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে উঠে আসা যেত। বাপীব তাড়ায় ফ্ল্যাটের মালিক আশ্বাস দিয়েছে, মাসের মাঝামাঝি সময়ে যে করে হোক হোয়াইটওয়াশ আর ঝাড়ামোছা সেরে ফ্ল্যাট তার বাসযোগ্য করে দেবে।

ঊর্মিলার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। বিজয়ের সঙ্গে ফোনে দু'দিন কথা হয়েছে। ওর অফিসে এসে ঊর্মিলাও গতকাল ফোনে কথা বলেছে। তাদেব ওখানে চলে আসার জোর তাগিদ ওর। এই গণ্ডগোলের মধ্যে হোটেলে বসে কি করছে ? তাদের ওখানে চলে আসছে না কেন ? ফ্যাকটরি কোয়ার্টার্স এলাকার মধ্যে ঢুকে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত।

দু'খানা ঘরের একটা খালি পড়ে আছে জেনেও ফ্রেন্ড হোটেলেই উঠতে গেল কেন?

সম্ভব হলে বাপী আজ যাবে ঠিক করেছে। আর কিছু না হোক, ওদের গাড়িটা এখনি দরকার। নিজের দখলে একটা গাড়ি থাকলে এতটা পঙ্গু মনে হত না। ট্যাক্সি পাওয়াও দুর্ঘট এখন। বেলা থাকতে যাবে ঠিক করেছিল। বিকেলের দিকেই গণ্ডগোলটা বেশি হচ্ছে। সকালে গিয়ে লাভ নেই। বিজয় মেহেরাকে অফিস থেকে টেনে বার করা যাবে না। সব ঠাণ্ডা থাকলে চলেই আসবে। বাপীর রাতে কোথাও থাকার ইচ্ছে নেই।

আড়াইটে নাগাদ বেরুনোর জন্য তৈরি হয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে সামনের ময়দান আর চৌরঙ্গী এলাকার খানিকটা দেখা যায়। এই ক'টা দিনের মধ্যে অস্থির কলকাতা সম্পর্কে বাপীর কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই জানালায় দাঁড়িয়েই দিনের হাওয়া টের পায়। ট্রাম চলাচল সেই শুরু থেকেই বন্ধ। শান্তি-শৃঙ্খলায় ঘা পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বাস ট্যাক্সি এমন কি রিকশও রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যায়।

ভারী পর্দাটা ঠেলে সরানোর সঙ্গে সঙ্গে বাপীর গলা দিয়ে একটা বিরক্তির শব্দ বেরিয়ে এলো। যাওয়ার বারোটা বেজে গেল। কোথাও ঘটছে কিছু। নিচের ফুটপাতে আর সামনের ময়দান ভেঙে কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। লোকগুলো কিছু তাড়া খেয়ে নিরাপদে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত। বাস চলছে এখনো, কিন্তু তার ছাদে পর্যন্ত মানুষ।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাপী নেমেই এলো তবু। হোটেলের বাইরের সামনের গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার মিছিল দেখতে লাগল। ঘটনা কি তাও কানে এলো। ডালহৌসি স্কোয়ারে এক পয়সার বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালিয়েছে। কত লোককে শুইয়ে দিয়েছে ঠিক নেই। কারো কারো অবস্থা আশঙ্কাজনক।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে মানুষগুলোব মুখ দেখছে বাপী। কোথায় কোন মুহূর্তে আবার আগুন জ্বলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার তাড়া তাদের। কিন্তু তার মধ্যেও চোখে মুখে জমাট-বাঁধা ক্রোধ। হয়তো বা ঘৃণাও। সামিল হবার সাহস হয়তো নেই। কিন্তু ক্ষমতার মত্ত আঘাত তাদেরও বুকে বাজছে।

ভিতরে কোথায় মোচড় পড়ছে বাপীরও। এই মানুষগুলোর থেকে, আর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়ে যার শাসনের আঘাতে মাটিতে মুখথুবড়ে পড়েছে তাদের থেকে ও যেন বিচ্ছিন্ন; এই বিচ্ছেদের একটা অচেনা যন্ত্রণা ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটা পয়সা—শুধু একটা পয়সার জন্য এমন ঝড় এমন তাণ্ডব? তা কক্ষনো হতে পারে না। এই একটা পয়সা হয়তো অনেক বঞ্চনা অনেক অবিচারের প্রতীক তাই যদি হয়, যত ঐশ্বর্যই থাকুক বাপীর অন্তরাত্মা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

—কি ব্যাপার? এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

হাত ধরে একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিল ঊর্মিলা। ফুটপাতের ধারে ক্রিম রঙের চকচকে একটা মরিস মাইনর গাড়ির দরজা বন্ধ করে বিজয় মেহেরাও এদিকে আসছে।

ঊর্মিলা অত মানুষকে পথ চলতে দেখে সভয়ে আবার জিগ্যেস করল, গণ্ডগোলের ব্যাপার নাকি কিছু?

—হ্যাঁ, ডালহৌসিতে জোর লাঠি-চার্জ হচ্ছে শুনলাম। তোমাদের কাছে যাব বলে তৈরী হয়ে আজও আটকে গেছি...এর মধ্যে আবার তোমরা এসে হাজির হলে।

কথায় সময় নষ্ট না করে ঊর্মিলা তাকে গাড়িতে ঠেলে নিয়ে সামনের সীটে তুলল। পরে নিজেও তার পাশে বসে পড়ে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে বিজয়কে তারা দিল, হাঁ করে দেখছ কি—জলদি চালাও।

সামনে তিনজন সহজভাবে বসার মতো বড় নয় গাড়িটা। ওদের দু'জনকে সামনে বসতে দেখেই বিজয় হয়তো থমকে ছিল একটু। তাড়াতাড়ি ঘুরে এসে নিজের আসনে বসে গাড়ি ছোটাল। ঊর্মিলা বলে উঠল, আর ভালো লাগে না বাপু, রোজ এই এক কাণ্ড লেগে আছে—হাড়পিত্তি জ্বলে গেল।

গাড়ির স্পিড আরো বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বিজয় বলল, হাড়পিত্তি আমারও জ্বলে যাচ্ছে। তুমি দুজনের মাঝখানে বসলে আধাআধি ভাগ পেতাম।

ছদ্ম কোপে ঊর্মিলা বলল, দেব ধরে গাঁট্টা।

বাপী হাসল মনে মনে। যখন যার যেমন জগৎ। বিজয়কে বলল, বেশি হাড়পিত্তি জ্বললে গাড়ি থামাও, আমি পিছনে গিয়ে বসছি।

ঊর্মিলাও এবার হেসেই সায় দিল, তাহলে দুজনেই পিছনে যাই চলো। এই যাঃ। জিব কাটল।—ভেবেছিলাম হাসব না, কম করে ঘণ্টাখানেক তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব।

বিজয় ফোড়ন কাটল, আমার সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টাই করছ তাই অরুচি ধরে গেছে

জবাবে ঊর্মিলা বাপীর পিছন দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের চুলের গোছা টেনে দিল

পথে আর কোয়ার্টার্সে পৌঁছনোর পরেও বাপী অনেকবার ওদের ঝগড়া দেখল। কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয়। যেমন, ঊর্মিলা বাপীকে বলল, আমার খপ্পরে পড়েছ, এখন সাতদিনের মধ্যে তোমাকে ছাড়ছি না।

বাপী বাধা দেবার আগে বিজয় বলল, বাইরে যাবার মুখে আমি এখন অত ছুটি পাচ্ছি কোথায়?

—তোমাকে ছুটি নিতে কে বলেছে? সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মিলার জবাব।

—দেখলে, দেখলে? বাপীকেই সালিশ মানল বিজয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, তোমার তেমন তাড়া থাকে তো আজই চলে যেতে পারো—আমি না হয় পৌঁছে দিয়ে আসব।

ওদের গাড়িটা বাপীর সত্যি খুব পছন্দ হয়েছে। দেখতে যেমন, চলেও জলের মতো। বাপীর মুখে প্রশংসা শুনে ঊর্মিলা চা খেতে খেতে বিজয়কে বলল, এত যখন পছন্দ হয়েছে, গাড়িটা এমনি দিয়ে দাও না ওকে, তবু মনে থাকবে—

কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর ঝাঝের সুরে বিজয় বলল, যে দরে কিনেছি তার থেকে দেড় হাজার টাকা বেশি লাগবে।

এই ঝগড়ার তলায় তলায় যা সেইটুকু আস্বাদের বস্তু। বাপীর ভাবতে ভালো লাগছে, গায়ত্রী রাইও কোথাও থেকে ওদের এই খুনসুটি দেখছে আর মুখ টিপে হাসছে।

ঊর্মিলার রাগারাগিতে কান না দিয়ে পরদিন চা-পর্বের পরেই বাপী চলে এলো। বিকেলের মধ্যেই আবার ফিরবে কথা দিল। গাড়িটা তার এক্ষুনি চাই। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে কিছু বোঝার আগেই বিজয়ের পকেটে গুঁজে দিয়েছে। দু'জনের কারো আপত্তি কানে তোলেনি। বিজয়কে বলেছে তুমি কেনা বেচা সইসাবুদের ব্যাপার করো বসে বসে, আমি গাড়ি নিয়ে আজই চললাম।

ঊর্মিলা এই রাতেও ছাড়েনি ওকে। খাবার টেবিলে ঊর্মিলার মুখেই টগবগ করে বেশি কথা ফুটছিল। হঠাৎ থেমে গিয়ে আড়ে আড়ে বাপীকে দেখতে লাগল।

—কি হল?

—একটা কথা মনে পড়ল। গোটা ব্যবসাটাই এখন তোমার। যা আছে তাই নিয়ে বানারজুলিতে বসেই রাজার হালে কাটিয়ে দিতে পারতে। হঠাৎ কলকাতায় জাঁকিয়ে বসার ইচ্ছে কেন?

বাপী হাল্কা সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি ধারণা?

—আমার ধারণা, এখনো তোমার মাথায় মতলব কিছু আছে।...এবারে এসে দেখা হয়েছে?

বাপী ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হঠাৎ। গেলবারে বানারজুলিতে এসে জেরার মধ্যে ফেলে ঊর্মিলা মিষ্টির বিয়ের খবর শুনেছে। তখন বেশ দুঃখও হয়েছিল ওর।

— কি বাজে বকছ!

—বাজে বকছি? তুমি শুধু আরো বেশি রোজগারের নেশায় এখানে জাঁকিয়ে বসছ?

আলতো করে বিজয় বলল, বসলেই বা। যে মতলবই থাক, আমি তো তোমাকে নিয়ে এ-মাসের মধ্যেই হাওয়া হয়ে যাচ্ছি! তোমার নাগাল পাচ্ছে কোথায়?

রাগতে গিয়েও ঊর্মিলা থমকালো। ঠোঁটের ফাঁকে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। ওর দিকে চেয়েই জবাব দিল, প্রেমে ঘা পড়লে কেউ কেউ কোন মূর্তি ধরতে পারে জানলে তুমি হার্টফেল করতে। বাপীর দিকে ফিরে চোখ পাকালো, বলে দেব?

পরক্ষণে সামলে নিল। একটা যন্ত্রণার আঁচড় পড়েছে বুঝতে সময় লাগল না। বলল, থাক বাপু ঘাট হয়েছে, এই কানে হাত দিচ্ছি, আর বলব না।...আসলে তোমাকে আমি একটু একটু ভয়ও করি, তাই তোমার জন্যে ভাবনা—বুঝলে?

বোঝেনি কিছুই শুধু বিজয়। তবু সে-ই চেঁচিয়ে উঠল, আমি কিন্তু এবার হার্টফেল করছি!

ওরা যাবার আগে ঘন ঘন আসবে কথা দিয়ে পরদিন বিকেলে ঝকঝকে মরিস মাইনর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সকালে বিজয়ের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক মহড়া দিয়েছে। হাত অভ্যস্ত এখন। এমন একটা গাড়ি নিজস্ব হবার ফলে মেজাজ খুশি। খানিকটা পথ এগোতে সেই খুশিতে হঠাৎই কিছু সঙ্কল্পের ফল ধরল।

দক্ষিণের পথ ধরে ফিরতে লাগল। মিনিট পঁচিশের মধ্যে সেই পরিচিত রাস্তায়। সাতাশি নম্বর বাড়িটা লক্ষ্য। ঘড়ি দেখল। ছ'টা বাজে। সুদীপ নন্দী অনেক আগেই কোর্ট থেকে ফিরেছে নিশ্চয়! আশা করছে তাকে বাড়িতে পাবে। তার মা-কেও পাবে। আজই যেন তাদের সঙ্গে দেখা করার ঠিক দিন। ঠিক সময়।

খানিক দূর থেকে গাড়ির স্পিড কমালো। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তাহলেও তেমন অস্পষ্ট নয় এখন পর্যন্ত। বাপীর আশা দীপুদাকে বা তার মা-কে বা দুজনকেই দোতলার বারান্দায় দেখবে।...ও দেখবে না, তারা ওকে এই গাড়ি থেকে নামতে দেখবে।

নেই।

খানিক আগে আপনা থেকেই ব্রেকে চাপ পড়তে গাড়িটা প্রায় থেমে গেল। প্যান্ট কোর্ট পরা যে মানুষটা ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে হনহন করে

সামনে এগিয়ে চলল, ব্রেকে চাপ পড়েছে তাকে দেখে।

...ফর্সা মুখ। সোনালী চশমা। আরো অনেক দূর থেকে দেখলেও ভুল হবার নয়। অসিত চ্যাটার্জি। যার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মিষ্টি এখন মালবিকা চ্যাটার্জি। বাপী গাড়িটা থামিয়েই দিল। লোকটা যে মুখ করে ওই সাতাশি নম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, আর যে-ভাবে দু'পায়ে মাটি দাপিয়ে চলেছে তাই থেকে মেজাজ আঁচ করা যায়। জামাই-অভ্যর্থনা নিয়ে যে বেরোয়নি সেটুকু স্পষ্ট।

দু'মিনিটের মধ্যে সামনের বাঁক ধরে চোখের আড়াল হতে বাপীর গাড়িও নড়ল। কিন্তু সাতাশি নম্বর বাড়ির দোরে আর থামল না। বা সেদিকে তাকালোও না। সোজা বেরিয়ে এসে সে-ও বাঁক নিল। এই হঠাৎ-দর্শনে মগজের প্ল্যানও বাঁক ঘুরেছে।

গাড়িটা যে ভাবে একেবারে পাশ ঘেঁষে ঘ্যাচ করে থামল, লোকটা চমকে দাঁড়িয়ে গেল। রাগ উপছে ওঠার আগেই বিস্ময়ের ধাক্কা। বাপী হাসছে অল্প অল্প। পাশের দরজা খুলে দিয়ে বলল, খুব অচেনা মনে না হলে উঠে পড়ো!

চকচকে গাড়িটা এক নজরে দেখে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জী খোলা দরজায় এক হাত রেখে ঝুঁকল একটু। সোনালি ফ্রেমে আঁটা কাঁচের ওধারে চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। বাপীর মুখ হাতড়ে অপ্রীতিকর কোনো ব্যাপারে হদিস পাচ্ছে যেন। গলার স্বরেও তেমনি আঁচ-লাগা বিস্ময়।—তুমি এখানে তাহলে?

বাপী সত্যি অবাক।—তাহলে মানে?

চোখের তাপ মুখে ছড়াচ্ছে।—বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? কবে আসা হয়েছে?

বাপী মিথ্যে কথা সচরাচর বলে না। কিন্তু জবাব যা দেবে তা আরো কারো কানে ওঠার সম্ভাবনা। কলকাতায় এসেছে আজ হাতে গুণে ন'দিন। অম্লান বদনে বলে ফেলল, তা মাস দেড়েকের ওপর হবে। কিন্তু ব্যাপার কি...তোমরা সব আছ কেমন?

দেড় মাসের ওপর এসেছে শুনে হোক বা সাদা বিস্ময়ে খবর জিজ্ঞাসা করার দরুন হোক, লোকটা থমকালো একটু। কিন্তু চাউনি সন্দিগ্ধ তার পরেও।—এতদিন এসেছ, মিলুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?

মিলু শুনে কানের পর্দা আজও চিড়চিড় করে উঠল। কিন্তু মিলু ছেড়ে মিষ্টি শুনলে আরো অসহ্য মনে হত। ভেবাচাকা খাওয়া নিরীহ মুখ বাপীর। দেখা হলে তোমার না জানার কথা নাকি। আসার দিনে ইনফরমেশান কাউন্টারে তাকে না দেখে আমি তো ধরে নিয়েছি দিল্লির সেই চাকরি পেয়ে সেখানে চলে গেছে।

কি কারণে ওকে দেখামাত্র লোকটার এমন সন্দিগ্ধ আচরণ বাপী ঠাওর করতে পারছে না। এই জবাবের পর খানিকটা ঠাণ্ডা। তবু আরো কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে যেন। আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি এখানে আছ, এখানকার এরাও জানে না?

—এরা কারা?

—মিলুর দাদা আর মা?

এবারের জবাবে স্পষ্ট বিরক্তি।—কি বাজে বকছ, তাদের নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর সময় হয়নি, কাজের চাপে নাওয়া-খাওয়ারও ফুরসৎ মেলে না। রাস্তার মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তোমার অত জেরা শোনারও ধৈর্য নেই আমার, উঠবে তো ওঠো,

নয়তো সরো।

দাবড়ানি খেয়ে ধাতে ফিরল। বাপীর মনে হল, সেই সঙ্গে একটা আশঙ্কাও দূরে সরল। তাড়াতাড়ি পাশের আসনে বসে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল।

বাপী এনজিন বন্ধ করেনি। সামনের দ্বিতীয় বাঁক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়তে গাড়ির ভিতরটা এক নজর দেখে নিয়ে অসিত চ্যাটার্জী জিগ্যেস করল, বিলিতি গাড়ি নিজে চালাচ্ছ...কিনলে নাকি ?

জবাবে মাথা নেড়ে সায় দিল।

এমন ভাগ্যও ঈর্ষার বস্তু।—তুমি তাহলে কলকাতাতেই থাকছ এখন...ব্যবসার নতুন কিছু চার্জ নিয়েছ নাকি?

—চার্জ আর কার থেকে নেব...সমস্ত ব্যবসাটাই আমার এখন। এখানে নতুন সেন্টার খুলেছি। তুমি এখন আর কোথাও যাবে, না আমার ওখানে বসবে একটু ?

—তোমার ওখানে মানে সেই হোটেলে ?

—আপাতত তাই। ফ্ল্যাট পেয়েছি একটা, শিগগীরই উঠে যাব।

—কোথায় ?

বলল।

—ওসব জায়গায় ফ্ল্যাটের তো অনেক ভাড়া!

—খুব না, মাসে আটশ। সুবিধে হলে কিনে ফেলার ইচ্ছেও আছে।

বলার উদ্দেশ্য সফল। এমন পর্যায়ের মানুষকে হিংসে আর কত করবে। হৃদ্যতা বরং কাম্য। চোখে লোভ, ঠোঁটে হাসি।—সেবারের মতো ভালো জিনিস ঘরে আছে?

বাপী গাড়ি চালাচ্ছে তাই সামনে চোখ। হেসেই জবাব দিল, তুমি হলে গিয়ে আমার হীরো, চাইলে এসে যেতে কতক্ষণ।...আচ্ছা অসিতদা, আমাকে দেখেই তোমার মেজাজখানা অমন খিঁচড়ে গেল কেন ?

লজ্জা পেল।—মন-মেজাজ সত্যি একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে আছে। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, এরা দিনকে দিন মাথায় চেপে বসছে।

—এরা বলতে ?

—আর কে, মিলুর দাদা আর মা।

জেনেও অবাক হওয়ার ভান করল বাপী।—তুমি এখন ওঁদের ওখান থেকে নাকি ?

—হ্যাঁ। আজ এক হাত হয়ে গেল।

এক হাত হয়ে গেল বলে ওকে দেখে অমন তিরিক্ষি আর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল কেন, বাপী ফিরে আর তা জিগ্যেস করল না। তার তাড়া নেই। হোটেলে নিয়ে গিয়ে ফেলার পর খোলস থেকে ভিতরের মানুষটাকে টেনে বার করতে সময় লাগবে না। বলল, গুলি মেরে দাও, তোমার মাথায় চেপে বসতে চাইলে আবার জন্মাতে হবে। কাজ-কর্ম কেমন চলছে বলো।

ফর্সা মুখে খুশির ঢল নামল। যত টাকাই করুক ছেলেটা সত্যিকারের সমজদার বটে। চাকরিতেও লোককে বলার মতো মোটামুটি পদস্থ এখন। এক নামী তেল কোম্পানীর চীফ অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে বসেছে। বিলিতি কোম্পানী। মালিকানার বেশির ভাগ এখনো সাহেবদেরই হাতে। সুপারিশের জোর ছিল না, তিন-তিনটে ইন্টারভিউর বেড়া

টপকে নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরে কাজটা পেয়েছে। ফর্সা মুখ আত্মতুষ্টিতে অমায়িক আরো।—সাহেবদের ইন্টারভিউ বোর্ডে এই চেহারাও কিছু কাজ করেছে অবশ্য, তাহলেও ও-দেশের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে আমাদের রেজিস্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যে কম কিছু নয় এটা তাদের বুঝতে হয়েছে।

বাপীর চোখেমুখে প্রশংসার বন্যা। গাড়ি চালানোর ফাঁকে দুই-একবার না তাকিয়ে পারল না। বলল, তুমি ঢের বড় হবে অসিতদা, আমি খুব ভালো করেই জানতাম। এসব ব্যাপারে আমার একটা সিক্সথ সেন্স আছে।...মাইনে এখন তাহলে অনেক পাও?

খুশিতে বিগলিত হতে গিয়েও থমকালো। হাজার টাকার মত পাচ্ছে আপাতত। চাকরির বাজার যা, সাধারণ দশজনের চোখে অনেকই বটে। কিন্তু এই লোক ফ্ল্যাট ভাড়াই দেয় মাসে আটশ টাকা। তার এই গাড়ি আর এত বড় ব্যবসার মালিক। জবাব দিল, মন্দ নয়, উন্নতিও আছে...তা হলেও তোমার কাছে আর অনেক কি!

—ছাড়ো তো। ক-অক্ষর গো-মাংস অনেক আলু-পটলের কারবারীও ঢের টাকা রোজগার করে, তা বলে তারা অসিতদা হয় না। বাবার টাকায় বিলেতে গিয়ে পার্টিগুনে ব্যারিস্টার হয়ে আসা থেকে তো ঢের ভালো।

এমন জায়গায় সুড়সুড়ি পড়ল যে অসিতদাটি আধাআধি তার দিকে ঘুরে না বসে পারল না। শুধু কান আর বুক দিয়ে নয়, দুটো চোখ দিয়েও স্বাদ নেবার মতো কথা। ফর্সা মুখে হাসি চুঁয়ে পড়ছে।

হোটেলে এসে বাপী এবারও আস্ত বিলিতি বোতল আনালো একটা। সঙ্গে জিভ টসটস করার মতো বাছাই খাবার। মাখন গলা আব্দারের সুরে অসিতদা বলল, আজ কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে একটু খেতে হবে।

—খাব যখন তোমার কাছেই হাতেখড়ি দেব, আজ না—মহাগুরু নিপাত দশার এক বছর না কাটলে ওসব হাত দেবার উপায় নেই।

—থাক তাহলে, থাক। অসিতদার গলায় অন্তরঙ্গ সহানুভূতি।— মহাগুরু মানে তোমার বাবা-মায়ের কেউ?

—না, আমার ভাগ্যের ইষ্টদেবী। মনে মনে বলল, মা গায়ত্রী রাই দোষ নিও না। ওই ইষ্টদেবীটিকে স্মরণ করার সময় আগে বা পরে মা জুড়ে দিতে বাপীর বেশ লাগে।

পানহার দ্রুততালে জমে উঠতে লাগল। ঘরের সবুজ আলো জ্বেলে বাপী সাদা আলো নিভিয়ে দিল। যে সময়ের যে পরিবেশ। অসিতদা এই বিবেচনাটুকুরও তারিফ করল। দ্বিতীয় গেলাসও আধা-আধি শেষ হতে সময় লাগল না। একটু বাড়তি মর্যাদা দেবার সুরে বাপী বলল, তুমি তো তাহলে দিব্বি ভালো আছ এখন অসিতদা—

কাবাবে কামড় দিয়ে হেসেই তাকালো। চোখের তারা সবে বড় হতে শুরু করেছে। —কেন বল তো?

—নিজে এমন একখানা চাকরি করছ, মি—মা-মানে তোমার মিলুও ভালো কাজ করছে, তোমার আর ভাবনা কি!

মিষ্টি বলতে গিয়েও শুধরে মিলু বলল। ওই মুখে এই নাম হামলার মতো শোনাবে। গেলাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে তরলানন্দে অসিতদা বলল, মিলুরও একটা প্রমোশন হয়েছে জানো তো?

বাপী ভিতরে ভিতরে থমকালো একটু।—না তো...কি প্রমোশন?

—জুনিয়ার এক্সিকিউটিভ হয়েছে। এখন আর এয়ারপোর্টে নেই, সেন্ট্রাল এভিনিউর আপিসে বসছে।

—গেলবারের সেই ইন্টারভিউতে ভালো করেছিল বুঝি?

—সেটা তো দিল্লির চাকরি। এখানেও চেষ্টা চরিত্র করছিল।—হয়ে গেল। আবার এক চুমুক তল করে লালচে মুখে রসিকতার সুরে বলল, মেয়েদের চেহারাপত্রের জোর থাকলে সুবিধে যেচে আসে ভাই...তুমি স্বীকার করো কি করো না?

বাপী তৃতীয় দফা তার গেলাস ভরে দিতে দিতে অম্লানবদনে মাথা নেড়ে সায় দিল। ফলে ওই ফর্সা মুখের লাগাম আরো একটু ঢিলে।—আমি এ-কথা বললে মিলু আবার রেগে যায়, ওর ধারণা কাজ দেখাতে পারলেই উন্নতি হয়। আমার ভাই সাফসুফ কথা, কাজের আদ্ধেক তো যে অফিসারগুলো ছোঁকছোঁক করে ঘিরে থাকে তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া। কিন্তু বলতে গেলেই ফোঁস! তা হলেও মেজাজ বিগড়োলে আমি ছেড়ে কথা কই না।

শেষের ঝাঁঝালো অভিব্যক্তিটুকু থেকেই বোঝা গেল ওই কারণে অসিতদার মেজাজ বিলক্ষণ বিগড়োয়। এ-প্রসঙ্গ বাতিল করে খুশি গলায় বাপী বলল, যাক এমন যুগল উন্নতির খবর আমি কিছুই জানতাম না—কংগ্র্যাচুলেশনস!

রং-ধরা আবেগে অসিতদা অনুযোগ করল, তুমিই তো আমাদের ছেঁটে দিয়েছ, এতদিন হল কলকাতায় আছ একটা খবর পর্যন্ত দাওনি।

সময় বুঝে হালকা ঠাট্টার সুরে বাপী ঠেস দিয়ে বলল, আজ আমাকে দেখেই রাস্তায় তোমার যে মূর্তি দেখলাম, সেধে খবর দিতে গেলে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে আসতে বোধ হয়।

আরে না না। অন্তরঙ্গ দোসরের সংশয় মোচনের চেষ্টা। মিলুর ওই মা আর দাদার সামনে গিয়ে পড়লেই মাথায় আগুন জ্বলে আমার। সঙ্গে সঙ্গে অসিতদার বিরস বদন, ধরা গলা।—তারা আমার লাইফ হেল করে দেবার চেষ্টায় আছে ভাই, আর মিলুর কানে অনবরত বিষ ঢোকাচ্ছে।

বাপীর কান জুড়োচ্ছে।—খুব দুঃখের কথা। কিন্তু তা বলে রাস্তায় আমাকে দেখে তোমার অত রাগ কেন?

—তুমি আপনার জন, তোমাকে সব বলব ভাই—কিছু লুকোবো না।—ওখানে তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ওরা যা চায় তুমি হাতে আছ বলেই চায়—

মেকি দাপটে কথার মাঝেই বাপী গলা চড়ালো।—আমি কোনো দিন কারো হাতে নেই—এই বান্দাকে চিনতে তাদের ঢের দেরি।

—জানি ভাই জানি। ভুলের জন্য তুমি এখন আমার গালে একটা চড় কষালেও রাগ করব না—তোমাকে সব বলব।

চতুর্থ গেলাস জঠরস্থ হতে গলগল করে অনেক দুঃখ আর অনেক রাগের কথা বলে গেল লোকটা।—মিলুর সঙ্গে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে খিটিরমিটির লেগেই আছে আজকাল। দোষের মধ্যে সে নেশা-টেশা করে আর একটু রেস বা জুয়াটুয়া খেলে। এ অভ্যেস বিয়ের আগে থেকেই ছিল, আর মিলু তা যে একেবারে জানত না তাও নয়।

কিন্তু মা আর দাদা সর্ব্বোক্ষণ কান বিষোলে কাঁহাতক মাথা ঠিক থাকে? নইলে সব দোষ-গুণ মেনে নিয়েই ও কি তার কাছে আসেনি?—পাড়ার দামাল ছেলেরাও অসিতদার কথায় কেমন ওঠে-বসে, তার প্রতাপ কত মিলু সে-সব নিজেদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখত। সেই লোক যখন ফাঁক পেলে রাস্তায় লেকে বা কলেজে ওর ওপর চড়াও হত তখনো পছন্দ করত বলেই ছেঁটে দিত না। আর ওর আই-এ পড়ার সময় সেই লোকই যখন চিঠি লিখল তাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না, ও-মেয়ে তখন নিজে পার্কে ডেকে নিয়ে বলেছিল, আত্মহত্যা করতে হবে না, ভালো করে পড়াশুনা করো।—তারপর দু'বাড়িরই অত বাধা সত্ত্বেও মিলু কি তার জীবনে আসেনি? এখন অত বিগড়ে যাচ্ছে কেন?

সব ওই মা-টির দোষ। ছেলে হবার সময় জামাই নাকি অভাবে আর অনাদরে তার মেয়েকে মেরেই ফেলার মতলবে ছিল। আরে বাবা, নিজের বউকে মেরে ফেলে তাঁর কি লাভ? মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী অপমান করে বাড়িতে ঠাঁই দেয়নি তাও জামাইয়ের দোষ। আর একটু নেশা-টেশা করে বলে যেন মেয়ে-খুনের আসামী সে। কিন্তু তাদের মেয়ে যে আপিসের পাঁচজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেয়, মাঝেমধ্যে রাত করে বাড়ি ফেরে, তা নিয়ে কিছু বলতে গেলেই গোটা মহাভারতখানাই অশুদ্ধ হয়ে গেল একেবারে!

...মওকা বুঝে ব্যারিস্টার দাদাটিও সর্বদাই মায়ের কানে মন্ত্র জপছে। এমন অমানুষ জামাই আর হয় না। আসলে দাদুর কাছ থেকে পাওয়া মায়ের নামের অমন বাড়িখানা একলা গেলার মতলব তার। সর্বদাই মায়ের কানে ভাঙানি দিচ্ছে, বোনের নামে বাড়ির আদ্দেক লিখে দিলে সেটা শেষ পর্যন্ত জামাইয়ের খপ্পরে গিয়ে পড়বে—বাড়িটাই তখন বেচে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। এমন সেয়ানা যে ঠিক জানে ডিভোর্সের ব্যাপারে বোন কান দেবে না—তাই মাকে বোঝায় এ বিয়ে ভেঙে দিয়ে বোনের নামে আদ্ধেক লিখে দিলে তার কোনো আপত্তি নেই।

—আজকের সমস্ত দিনটাই বড় খারাপ গেছে ভাই। পঞ্চম গেলাসে অসিতদার ধরা গলা।

কেন খারাপ গেছে তাও গলগল করে বলে গেল।...গত সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে মিলুকে বাড়িতে না দেখে বড় একলা লাগছিল। আর রাগও একটু হয়েছিল। তাই আড্ডায় চলে গেছল।

হাতে টাকা-কড়ি তেমন ছিল না। একেবারে শূন্য পকেটে জুয়ার আসরে গিয়ে বসে কি করে। ওদের আলমারির দুটো চাবি, একটা তার কাছে থাকে, অন্যটা মিলুর কাছে। সেই আলমারি খুলে মিলুর টাকার খাম থেকে মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে গেছিল। আর রাতে বাড়ি ফিরতেও দেরি হয়ে গেছিল একটু।

ব্যস তাই নিয়ে সকালে যাচ্ছেতাই করল মিলু। এমন লোকের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াই উচিত এ-কথা পর্যন্ত বলল। ফলে এই শর্মারও ভয়ানক রাগ হয়ে গেল। পাল্টা ঠেস দিয়ে সে-ও চারদিকের এই গণ্ডগোলের দিনে রাত পর্যন্ত ঘরে না ফেরার কৈফিয়ৎ চাইল। ব্যস, তারপরেই কথা বন্ধ। মিলুর এটাই এখন বড় দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝগড়ার সময় ঝগড়া করলেই ফুরিয়ে যায়। না, তার বদলে কথা বন্ধ করে বসে থাকে।

স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চায় সে অনেক সুশালীন মেয়ে, ঝগড়া করতে রুচিতে বাধে। তার ফলে অসিতদা যদি আরো বেশি রেগে যায় আর বকাঝকা করে, সেটা কি খুব দোষের? সে কি কম লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক?

আজ আপিসে গিয়ে অসিত চ্যাটার্জীর মাথা ঠাণ্ডা হয়েছিল। খানিক আগে ছুটি নিয়ে মিলুর আপিসে চলে এসেছিল। আগেও এ-রকম আপোস করেছে। দুজনে একসঙ্গে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু আজ ওর আপিসে গিয়ে শুনল মিলু আসেইনি মোটে। ভাবল বাড়িতে পাবে। বাড়িতেও নেই। তাহলে আর বাপেরবাড়ি ছাড়া কোথায়? রাগ ধামাচাপা দিয়ে ওকে নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়িতে গেল। সেখানে তেলের কড়ার মাছ ছাড়ার মতো তপতপে গলায় শাশুড়ি জানালো, মেয়ে খানিক আগে অমানুষ জামাইয়ের ওখানেই চলে গেছে।

শাশুড়ি আর সম্বন্ধী এমন ব্যবহার করল যেন হাড়িকাঠে গলা দিয়ে আছে সে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আলটিমেটামই দিল তারা। বুঝেশুনে না চললে তাদের মেয়ে বা বোনও আর বেশিদিন বরদাস্ত করবে না। অসিদতাও তখন পাল্টা জবাবে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে, ছেলে সে-ও খুব সহজ নয়—বুঝেশুনে চলার দায় তাদের মেয়ে বা বোনেরও আছে। ব্যস, তাই শুনে শাশুড়ি আরও খাপ্পা...ওই খিঁচড়নো মেজাজ নিয়ে বেরিয়ে এসেই বাপীর সঙ্গে তার দেখা। তাই তক্ষুনি সন্দেহ হল নাগালের মধ্যে একজন আছে বলেই শাশুড়ি আর শ্যালকের কথায় কথায় আজকাল এমন শাসানি—আর মিষ্টিরও তুচ্ছ কারণে এত মেজাজ।

—এ রকম সন্দেহ হতে পারে কিনা তুমিই বলো ভাই। অনুশোচনায় গলা বুজে আসার দাখিল অসিত চ্যাটার্জীর।—তুমি এতদিন ধরে কলকাতায় আছ আর এদের মতো স্বার্থপর লোক তা মোটে জানেই না ভাবব কি করে? ওই মা আর দাদাটির মতো প্যাচালো লোক নই আমি, তোমাকে দেখামাত্র সন্দেহ আমার হয়েছিল খোলাখুলি স্বীকাব করছি —ভুল স্বীকার করারও হিম্মত চাই, এরপর তোমার মনে আর কোনো দাগ থাকতে পারে, না রাগ থাকতে পারে তুমিই বলো—পারে?

মুখখানা সীরিয়াস করে বেশ ঘটা করে মাথা নাড়ল বাপী। পারে না। তারপর মুখে বলল, সব শোনার পর এখন বরং তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে—যে-সে লোক তো নও যে এভাবে হেনস্থা করবে ওরা।

সহানুভূতির আঁচ পেয়ে আহত পুরুষকাব মাথা তুলল।—তুমি হলে গিয়ে একটা সমজদার দিলের মানুষ, তুমি বুঝবে না কেন। মদ-গেলা ফর্সা তেলতেলে মুখ রাগে লাল আরো।—ওদেরও বুঝতে হবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে এই শর্মাই বুঝিয়ে ছাড়বে। আমাকে হেনস্থা করে কেউ পার পাবে ভেবেছে—সেই মেজাজ দেখলে ওদের মেয়েসুদ্ধ ভয়ে কাঁপবে—আমি কারো ধার ধারি, না, কারো পরোয়া করি?

নিরীহ মুখে বাপী বিক্রমের কথা শুনল, মাথা নেড়ে সায়ও দিল। কিন্তু আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা হচ্ছে বুঝলে জঙ্গলের পশু যেমন করে, এই প্রতাপও অনেকটা সেই গোছের লাগল বাপীর।

পঞ্চম দফা গেলাস খালি হতে বাপীই বলল, আর না, আমার ড্রাইভার নেই, তোমাকে একলা যেতে হবে।

আর দরকারও নেই। আশ মিটিয়ে খাওয়া হয়েছে। দাঁড়াতে গিয়ে এখনই দু-পায়ের ওপর তেমন ভর থাকছে না। আতিথ্যে পরিতুষ্ট অসিতদা এখন যেমন অন্তরঙ্গ তেমনি দরাজ। টেনে টেনে বলল, নিজের গাড়ি আছে, কি আর এমন রাত, তুমিও চলো না আমার সঙ্গে—মিলুও খুশি হবে নিশ্চয়, হাজার হোক ছেলেবেলার বন্ধু তো তোমরা।

এবারে লোকটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিতে ইচ্ছে করল বাপীর। মাথা নেড়ে মোলায়েম সুরেই বলল, আজ না, আর একদিন হবে—বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

—না ভাই, আপিস থেকে শিগগিরই পাবার কথা আছে। আপিসে আমার টেবিলেই ফোন, সেই নম্বরটা রাখো। দুলে দুলে টেবিলের সামনে গিয়ে পকেট থেকে কলম বার করে খসখস করে ফোন নম্বর লিখে দিয়ে বলল, তোমার নম্বরটাও আমাকে দাও।

এতক্ষণ বাদে আর যেন এক মুহূর্তও বরদাস্ত করা যাচ্ছে না লোকটাকে। হাল্কা তাড়ার সুরে বলল, কাল-পরশুর মধ্যই ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছি হয়তো, এখানকার নম্বর নিয়ে কি হবে। পরে বাড়ির নম্বর নিও'খন।

লিফটে নিচে নামালো। বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

একটু আগে অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে মনে হয়। ফুটপাথ আর রাস্তা ভেজা। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। বাপী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হাওয়াটা ভালো লাগছে।

হাওয়াটা না আর কিছু ?...জীবনের এই বাঁকে একটা অনুকূল পটভূমি তার অগোচরে আপনা থেকেই প্রস্তুতির পথে কি।

এগারো

রাত দশটার কাছাকাছি। একটা লোভ টেলিফোনটার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুদীপ নন্দী বা তার মা এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি নিশ্চয়। অসময়ের ডাকে তারা সাড়াও দেবে, খুশিও হবে। অনিশ্চয়তার গহ্বরে সহজে কেউ ঝাঁপ দিতে চায় না। নাগালের মধ্যে নিশ্চিত কোনো আশ্বাস পেলে তবে জোর বাড়ে। রাতের এই টেলিফোন সেই আশ্বাসের মতো হতে পারে। আর কিছু না বলে শুধু অন্তরঙ্গ কুশল খবর নিলেও হাতের কাছে তারা নাগালের মানুষ দেখতে পাবে।

লোভের হাতছানি বাপী জোর করেই বাতিল করে দিল। মত্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে অসিত চ্যাটার্জী মুখ সেলাই করে বসে থাকবে না। এই রাতের ঘোরে অন্তত বাপীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেই। মিষ্টি কি ভাববে বা কি বুঝবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেখান থেকেই তার কলকাতায় অবস্থানের খবরটা মা আর দাদার কানে পৌঁছুবে আশা করা যায়। মিষ্টির মন তার মা বা দাদার মতো এখনো খুব অস্থির মনে হয় না। কিন্তু যত স্থিরই হোক, অসিত চ্যাটার্জী ঘরে ফিরলে তাতে ঢিল একটা পড়বেই। সেই বৃত্ত আপনা থেকে কতটা ছড়ায় দেখা যাক।

এর থেকেও বড় লোভ সম্বরণ করতে হল পরদিন। এক পয়সার যুদ্ধের ফয়সালা এখনো হয়নি। ছোটখাটো গণ্ডগোল রোজই চলছে। তবু লোকে কাজকর্ম একেবারে সিকেয় তুলে বসে নেই। নিজের দখলে গাড়ি থাকায় বাপীরও নড়াচড়ার সুবিধে হয়েছে।

বিপাকে পড়ে কোথাও আটকে যাবার ভয় নেই। সকালে জিত্ মালহোত্রাকে সঙ্গে নিয়ে উল্টোডাঙ্গার গুদাম ঠিক করতে গেছিল।

ফেরার সময় সেণ্ট্রাল এভিনিউর পথ ধরল। রাস্তার ধারে এক জায়গায় ছোট একটা চকচকে বাড়ির দোতলায় পরিচিত নামের এয়ার অফিসের সাইনবোর্ড চোখে পড়ামাত্র বাপীর ডান পা আপনা থেকেই ব্রেকের ওপর। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা রাস্তাটা পার হলে উল্টোদিকে আপিসের দরজা। ঘাড় বেঁকিয়ে বাপী দেখছে। পাশ থেকে মালহোত্রা লক্ষ্য করছে সে-খেয়ালও নেই। ওখানে একতলা বা দোতলার কোনো একটা ঘরে বসে কাজ করছে জুনিয়ার অফিসার মালবিকা চ্যাটার্জী! অসিত চ্যাটার্জীর মতে যে অফিসারগুলো ছোঁকছোঁক করে ওকে ঘিরে থাকে, তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই কাজের অর্ধেক। জানান না দিয়ে বাপী যদি সোজা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, মুখখানা দেখতে কেমন হবে? মিষ্টির সঙ্গে তখন এই মালবিকা চ্যাটার্জীর একটুও যুঝতে হবে কি হবে না ? এক নজর তাকিয়েই বাপী সেটুকু বুঝতে পারবে।

—কোন টিকিট কাটার দরকার থাকলে আমাকে বলে দিন সার, আমি কেটে রাখব।

জিত্ মালহোত্রা। একটা অদম্য লোভের তাড়না দমন করে বাপী আবার গাড়ি চালিয়ে দিল। জবাবে সামন্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

হোটেলের মুখে জিত নেমে গেল। আবার সে তিনটেয় আসবে। মনিবের সঙ্গে আজ বড়বাজারের বড় কয়েকটা পার্টির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের প্রোগ্রাম।

স্নান সেরেই বেরিয়েছিল। হুকুমমতো হোটেলের বয় ঘরে খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। খাওয়া সবে শুরু করেছিল, টেলিফোন বেজে উঠল। ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকলো বাপী। কে হতে পারে? নিশীথ?...অসিত চ্যাটার্জীও হতে পারে। পরেরজন হলে ততো অবাঞ্ছিত নয়। গতরাতের খবর বা আজকের সকালের খবর কিছু পাওয়া যেতে পারে। বোতলে যে অর্ধেক এখনো পড়ে আছে তার টানে আজও আসতে চাইবে হয়তো। ডাকবে না ছেঁটে দেবে?

...হ্যালো?

—বাপী নাকি?

ও-ধারের গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হবার চেষ্টায় একটা উদ্‌গত অনুভূতির গলা টিপতে হল। ধৈর্যের ফল ধরেছে। সবুরে মেওয়া ফলেছে।

—হ্যাঁ, দীপুদার গলা মনে হচ্ছে?

—ঠিক ধরেছে। অন্তরঙ্গ হাসি। তারপর অন্তরঙ্গ অনুযোগ।—দেড় মাসের ওপর কলকাতায় আছ শুনলাম অথচ একটা খবর পর্যন্ত নাওনি!...শুনে মা-ও দুঃখ করছিলেন।

বাপীর গলা চিনি-গলা।—কাজের চাপে নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছিলাম না দীপুদা, তার ওপর যে গণ্ডগোল তোমাদের রাজ্যে, সব গুটিয়ে আবার না ফিরেই যেতে হয়। যখন-তখন বেরুনোর জো আছে? মাসীমাকে বোলো দেখা হলেই আমি তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। তুমি কোত্থেকে?

—কোর্ট থেকে। তোমার সঙ্গে একটু দেখা হওয়ার দরকার ছিল। বিকেলে হোটেলে থাকবে?

—বিকেলে কখন ?

—এই ধরো সাড়ে চারটে পাঁচটা ?

—পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা করো, আমার ওদিকেই একটু কাজ আছে, পাঁচটা দশ-পনেরর মধ্যে কোর্ট থেকে আমি ফেরার সময় তোমাকে তুলে নেব। বিকেলের জলযোগের ব্যবস্থা ভালই হবে কথা দিচ্ছি।

ওদিক থেকে সুদীপ নন্দীর জোরালো হাসি। পরে একটু সমঝে দেবারও চেষ্টা। তোমার গতকালের দরাজ জলযোগের ব্যবস্থার জন্য মিষ্টি কিন্তু রেগে আছে।

বাপীরও হাসির কামাই নেই।—সেই ছেলেবেলায় মিষ্টির রাগও আমার খুব মিষ্টি লাগত দীপুদা। কিন্তু গতকাল আমার সত্যি কোনো দোষ ছিল না...

কথার মাঝেই বাধা পড়ল।—ঠিক আছে ঠিক আছে, এই অপদার্থটাকে আর না চেনে কে, যা বোঝার মিষ্টিও ঠিকই বুঝেছে। পাঁচটা থেকেই আমি কোর্টের ইস্ট গেটে থাকব'খন, তুমি এসো।

ফোন রেখে বাপী আবার খেতে বসল। কি খাচ্ছে, সেদিকে আর চোখ মন কিছুই নেই। হাসছে নিঃশব্দে। মিষ্টি রেগে আছে। সেটাই স্বাভাবিক। বাপীর ঘর থেকে তার ঘরের লোক মাতাল হয়ে ফিরেছে সেটা বরদাস্ত করা সহজ নয়। নেশার ঘোরে এই লোক বেফাঁস কি বলেছে না বলেছে ভেবেও তার রাগ হতে পারে। ঘরের মানুষ অমানুষ হলে মেয়েদের আসল পুঁজি ঝাঁঝরা। মিষ্টি সেটা বাপীর কাছেই সব থকে বেশি গোপন করতে চাইবে। তার রাগ হবে না তো কি ? কিন্তু তার মা আর দাদার ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন চিন্তা। গেলবারেও বাপীর লক্ষ্য বা চিন্তার আভাস পেয়েছিল। ওকে দেখামাত্র অসিত চ্যাটার্জীর সন্দেহ বা তিরিক্ষি মেজাজ অহেতুক নয়। মিষ্টিকে সে এখনো অত ভয় করে বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মা বা দাদা যে তাকে ছেঁটে দেবার মতলবে নির্ভরযোগ্য নাগালের মানুষ খুঁজছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী বাপী পার্টি বাছাই করে নিল। হাতে যেটুকু সময়, সকলের সঙ্গে আজ দেখা করা সম্ভব নয়। ঠিক পাঁচটা দশে কোর্টের পূব গেটে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। দীপুদা অপেক্ষা করছিল। ক্রিম-রঙের ঝকঝকে গাড়ি দেখে তারও দু'চোখ অসিত চ্যাটার্জীর মতোই গোল হল।

রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসছে।

বাপীর পাশের আসনে জিত মালহোত্রা। তাকে বলাই ছিল, বাপীর চোখের ইশারায় সে শশব্যস্ত দরজা খুলে নামল। মানী অতিথির উদ্দেশে বিনীত তৎপর অভিবাদন জানিয়ে তাকে নিজের আসন ছেড়ে দিল। সে মালিকের পাশে বসতে দরজা খুলে ও পিছনের সীটে বসল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাপী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ নাকি ?

—না, মিনিট পাঁচেক। গাড়ির ভেতরটাতেও চোখ বুলিয়ে নিল। জিগ্যেস করল, এ গাড়ি এখানে কিনলে, না ওখান থেকে নিয়ে এসেছ ?

—আনা নেওয়ার অনেক হাঙ্গামা। তাছাড়া বানারজুলিতে থাকলে সেখানে গাড়ি ছাড়া আরো অচল। যাতায়াত তো করতেই হবে, এখানেও কিনে নিলাম আর একটা।

গাড়ি আরো একটা আছে বুঝিয়ে দেওয়া গেল। জিপও একটা আছে ফাঁক পেলে

তাও জানিয়ে দিত। ব্যারিস্টার সাহেবের যাতায়াত এখনো ট্রামে বা বাসে। স্কুলে পড়তে জঙ্গল সাহেবের ছেলে জঙ্গল-আপিসের জিপে আসত যেত। বাপী পিসিমার তৈরি আমসত্ব, পাকা কামরাঙা, বন-মোরগ ঘুষ দিয়ে সেই জিপে তার সঙ্গে যাতায়াতের আরজি পেশ করতে মনে লেগেছিল। প্রথমে ধমকে উঠে পরে সদয় হয়ে বলেছিল, বাড়ি থেকে এক মাইল রাস্তা হেঁটে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে আর স্কুলের আধ-মাইল আগে নেমে যেতে। কেরানীর ছেলের সঙ্গে এক জিপে কেউ তাকে দেখে ফেললে মান খোয়া যাবে। আর আসার সময় হেঁটেই আসতে হবে কারণ উঁচু ক্লাসের ছেলেদের সামনে তাকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। রাগে আর অপমানে বাপী ঐই জিপের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চায়নি। বাপী ভোলেনি। কিন্তু দীপুদার কি মনে আছে?

সুদীপ নন্দী ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের স্মার্ট লোকটাকে দেখে নিল একবার।—ইনি?

—ইনি আমার সেক্রেটারি মিস্টার জিত্ মালহোত্রা।

মালহোত্রা আর একবার কপালে হাত তুলে সৌজন্য জানালো। দীপুদাও। বানারজুলির সেই কথায় কথায় গাঁট্টা-খাওয়া ছেলেটার আজ এই বরাত দেখে বুক একটুও চড়চড় না করে পারে কি? গাড়ি চালানোর ফাঁকে খোশ-মেজাজে বাপী আড়চোখে মুখখানা দেখার চেষ্টা করছে।

—কলকাতায় একটা বড় সেন্টার খুলে ফেললাম দীপুদা। জিত, তুমি কি করলে না করলে দীপুদাকে একটু দেখাও না। আমাকে খুব কাজ দেখাচ্ছ, কিন্তু এঁর চোখ সহজে ফাঁকি দিতে পারবে না—নামজাদা ব্যারিস্টার।

দীপুদার বিব্রত মুখ। পিছন থেকে জিত্ সাগ্রহে আর্ট পেপারে ছাপা চকচকে প্যামফ্লেট তার হাতে দিল। সেটা ওলটাবার আগে ফর্মের একচ্ছত্র মালিকের নাম চোখে পড়বেই। ভারতের নানা জায়গায় শাখা-প্রশাখার বিস্তারও নজর এড়াবে না। জিত্ এরপর ফর্মের ক্যালেণ্ডার আর ভেলভেট কভারে মোড়া ডায়েরিও তাকে উপহার দিয়ে ফেলল। ওতেও বর্তমান মালিকের নাম অনুপস্থিত নয়।

খুশিতে মুখখানা ভরাট করার চেষ্টা সুদীপ নন্দীর।—চমৎকার! আপাতত তুমি তাহলে কলকাতাতেই থাকছ?

ইচ্ছে তাই, তবে ফাঁকে ফাঁকে বাইরে ছোটাছুটি তো আছেই। মাসে এক-আধবার বানারজুলিও যেতে হবে। হাসল।—তুমি বিলেত-ফেরত সাহেব মানুষ এখন, বানারজুলির জঙ্গল বোধ হয় ভুলেই গেছ।

দীপুদা স্বীকার করল না। উল্টে রং চড়ালো।—বানারজুলির জঙ্গলের সেইসব দিনগুলি কি ভোলবার। তোমার সেই বনমোরগের স্বাদ এখনো জিভে লেগে আছে।

বিনিময়ে বাপী কি পেয়েছে তা মনে আছে কিনা জিগ্যেস করার লোভ সামলাতেই হল। হোটেলে পৌঁছনোর ফাঁকে ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার খবরটাও জানিয়ে দিল। শিগগীরই উঠে যাবে, মাসিমাকে এনে তখন একটু দেখেশুনে যাবার আবেদনও জানিয়ে রাখল। সুদীপ নন্দীও সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিল।

জিত্ মালহোত্রাকে বিদায় করে বাপী গাড়িটা তকমা-পরা দারোয়ানের জিম্মায় ছেড়ে দিল। লোক ডেকে পিছনের গ্যারাজে গাড়ি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা সে-ই করবে। দীপুদাকে নিয়ে নিজের সুইটে এলো। ফোনে দুজনের মতো খাবারের হুকুম দিয়ে সামনে এসে

নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।—এবারে বলো কি খবর।

—না, খবর তেমন কিছু না, তুমি কলকাতায় আছ আর এতদিনের মধ্যে দেখা হল না, মা তাই বার বার বলছিল। মিষ্টির সঙ্গেও তোমার দেখা হয়নি শুনলাম।

—না। কৈফিয়ৎ দাখিল করার মুখ বাপীর।—এয়ারপোর্টের ইনফরমেশন কাউন্টারে ওকে না দেখে ভাবলাম দিল্লির চাকরিটা হয়ে গেছে, ইন্টারভিউ দিতে গেছল জানতাম তো।

ব্যারিস্টার সুদীপ নন্দীর ক্ষোভপ্রকাশের ধরন আলাদা। মুখ মচকে বলল, সে-চাকরিও ও-ই পেয়েছিল, আর সেটা এর থেকে ঢের ভালো চাকরিই ছিল। নিতে পারল না। দ্যাট স্কাউনড্রেল ওয়ন্—আমি আর মা বার বার করে বলেছিলাম, কি করবে ও, চলে যা। গেল না, এখন পস্তাচ্ছে।

শুনে ভেতরটা চিনচিন করছে বাপীর। এখন পস্তাচ্ছে শুনেও তেমন খুশি হতে পারল না। বড় চাকরি পেয়েও নিতে না পারার একটাই অর্থ। আর একজনের জোর খেটেছে। নিছক অত্যাচারের জোর হলে মিষ্টি পরোয়া করত কি...?

একটু চুপ করে থেকে দীপুদা বলল, এত বড় ব্যবসার তুমি একলা মালিক এখন মা তাও জানে দেখলাম। ফোনে মিষ্টি হয়তো বলেছে। আচ্ছা, এর আসল মালিক তো একজন মহিলা শুনেছি, তাঁর কি হল?

—নেই। সাত-আট মাস হল মারা গেছেন।

—তাঁর ছেলেপুলে নেই?

—একটি মেয়ে।

দীপুদা নড়েচড়ে বসল।...সমস্ত ব্যবসাটাই তুমি পেয়ে গেলে, তার কি হল?

বাপী থমকালো একটু। ফোনে দীপুদা বলেছিল, তার সঙ্গে দেখা হওয়া একটু দরকার। দরকারটা কি তার আভাস একটু একটু পাচ্ছে মনে হয়। সত্যি যদি হয় বাপী নিজেই তাহলে নিজের মগজের তারিফ করবে না তো কি? হেসেই জবাব দিল, তার বিয়ে হয়ে গেল বলেই তো আমি সব পেলাম।

ব্যারিষ্টার সাহেবের অপ্রতিভ ভাবটুকু কেউ বুঝি সুইচ টিপে নিভিয়ে দিল। ঢোক গিলে জিগ্যেস করল, ও...তোমার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে তাহলে?

—আমার সঙ্গে! ভিতরে উৎফুল্ল, বাইরে আকাশ থেকে পড়া মুখ।—কি যে বলো ঠিক নেই। তার বিয়ে হয়েছে এক বিলেত-ফেরত পাঞ্জাবী এনজিনিয়ারের সঙ্গে—এখন কলকাতায় আছে ওরা, এ-মাসের শেষেই আমেরিকা চলে যাবে।

ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ সুদীপ নন্দীর।—তাহলে তুমি সবটা পেলে কি করে?

বাপী হাসছে। দীপুদা আর তার মাকে অন্তত নিশ্চিত করার তাগিদ এখন। বলল, সেই মহিলা আমাকে খুব ভালবাসতেন, নিজের ছেলেকেও কেউ এত ভালবাসে কিনা জানি না। ব্যবসা ছাড়াও তার অগাধ টাকা আর সোনা ছিল। ব্যবসার সঙ্গে সে-সবও আমাকে আর ঊর্মিলাকে সমান দু-ভাগ করে দিয়ে গেছেন। ওর বা স্বামীর আর ব্যবসায় ইনটারেস্ট নেই—তাই এদের অংশ আমিই কিনে নিয়েছি! কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করেছি তোমাদের এ ধারণা হল কি করে দীপুদা?

বিব্রত দেখালেও মানুষটার ভিতর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেছে। হেসেই

জবাব দিল, আর বলো কেন, রাগ হলে মেয়েদের আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। অসিতকে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতে দেখেই ওর মেজাজ বিগড়ে গেছিল। তোমার কাছে ছিল আর তুমি এখন কত বড় হয়েছ তাও বোধ হয় তার মুখেই শুনেছে। আর, মা যা বলল, তোমার মালিকের মেয়ের গল্প গেলবারে তুমিই হয়তো মিষ্টির কাছে করেছিলে। তাই গোটা ব্যবসাটা এখন তোমার শুনেই ও ধরে নিয়েছে মালিকের সেই মেয়েকে বিয়ে করেই সব পেয়েছ। আসলে মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরে ওই অপদার্থটা আরো কি বলেছে না বলেছে ঠিক নেই। রাগের মাথায় রাত এগারোটায় মিষ্টি পাশের ওষুধের দোকান থেকে মাকে ফোন করেছে। ওর ধারণা, মালিকের সেই মেয়েকে বিয়ে করেই এখন মস্তলোক হয়েছ তুমি আর তার হাজব্যান্ডকে দেদার মদ খাইয়ে মজা দেখেছ। বোনটার দোষ নেই বুঝলে, একেবারে তিক্তবিরক্ত হয়ে গেল।

শিরায় শিরায় বাপীরও উষ্ণ তাপ ছড়াচ্ছে। এখন পর্যন্ত কি আর হয়েছে, কতটুকু হয়েছে। তার আগে অনেক এগনোর ইচ্ছে, অনেক দেখার ইচ্ছে। ওই মেয়ে যেন সেই ইচ্ছের বিরুদ্ধে ছড়ি উঁচিয়েছে।

কিন্তু সুদীপ নন্দী নিশ্চিন্ত এখন, খুশিও। এই রাতের মধ্যে তার মা-ও নিশ্চিন্ত হবে। খুশি হবে। তাদের ভিন্ন স্বার্থ। ভিন্ন প্ল্যান। নিজের মুখ কৌতুকের মুখোশে ঢাকল বাপী। হাসতে লাগল।—তোমাদের কাছে আমিই কালপ্রিট তাহলে।

—কি যে বলো, আমরা তোমাকে চিনি না। মিষ্টিও যা বলেছে রাগের মাথায়ই বলেছে, নইলে তার চিজটিকেও সে খুব ভালোই জানে।

বয় খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। বাপী উঠে দেয়ালের দেরাজ থেকে হুইস্কির বোতল এনে টেবিলে রাখল। আধাআধি অবশিষ্ট আছে এখনো। কিন্তু ওটা দেখামাত্র খুশি হবার বদলে দীপুদা তেতেই উঠল একটু।—তুমি তো খাও না, ওই রাসকেল একলাই এতটা সাবড়ে দিয়ে গেছে নাকি?

বাপীই যেন অপরাধী—কি করব বলো, খেতে থাকলে তো আর কেড়ে রাখতে পারি না। তাও তো শেষ পর্যন্ত জোর করেই তুলে দিলাম।

—ও তোমার কাঁধে চাপল কি করে, তোমাকে পেল কোথায়?

—গাড়িতে আসছিলাম, রাস্তায় দেখা। কোন্ রাস্তা সেটা বলল না।

দীপুদার মুখ চলছে। গেলাসও। প্রথম গেলাস একটু দ্রুতই শেষ। ফলে আরো একটু অন্তরঙ্গ। বাপী আবার গেলাস ভরে দিতে বলল, কিছু না মনে করো তো একটা কথা বলি, ওই ওকে তুমি অত আসকারা দিও না।

—অসিতবাবুকে? এলে তাড়িয়ে দেব?

—তা বলছি না, অন্তত বুঝিয়ে দেবে তুমি খুব সহজ লোক নও আর ওর কাছের লোক নও।

খেতে খেতে নির্লিপ্ত মুখে বাপী বলল, কিন্তু তার তো নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা—রেজিস্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট—এখন বড় চাকরিও পেয়েছে...

—স-সবও গেয়ে গেল—না? রাগত মুখে খাওয়া থামিয়ে গেলাসে বড় চুমুক দিল একটা। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কপালজোরে বড় চাকরি তো পেয়েছে, কিন্তু তার কটা পয়সা ঘরে আনে সে-কথা বলেছে? সব রেসে ঢেলে দিয়ে আসে, নয়তো

জুয়ায়—বুঝলে? মিষ্টির টাকা চুরি করেও জুয়া খেলে এসেছে—উনি আবার বড় চাকরি করেন!

আলতো করে বাপী জানান দিল, কাল নিজেই সেকথা বলেছিল। তোমাদের সঙ্গে নাকি এ-নিয়ে এক হাত হয়ে গেছে।

—না হয়ে উপায়ে কি বলো। আমরা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, সে জুয়া মদ এসব না ছাড়লে আমাদের তাকে ছাড়তে হবে—মিষ্টিকেও।

যা জানানো হয়েছে মা আর দাদাটি তাই হবে আশা করছে বলেই যে আজ এত খাতির কদর বাপী তরফদারের তা দিনের মতোই স্পষ্ট। অপ্রিয় প্রসঙ্গ বদলে বাপী আপনার জনের মতো মাসিমার স্বাস্থ্যের খবর নিল। মেয়ের ভাবনায় তার রাতের ঘুম গেছে শুনে বাপীর মুখেও উদ্বেগের ছায়া। বউদি অর্থাৎ দীপুদার স্ত্রী আর ছেলের খবরও নিতে ভুলল না। বউদিকে আগের বারে রোগাই দেখে গেছিল, এখন এমনি আছে শুনল। স্বাস্থ্যটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, অল্প স্বল্প রোগ লেগেই আছে।

—ছেলে আর বউদিকে নিয়ে মাসখানেকের জন্য আমার বানারজুলির বাংলোয় থেকে এসো, স্বাস্থ্য চেহারা সব ফিরে যাবে। সেখানে সব ব্যবস্থা আছে, কুটোটি নাড়তে হবে না—খাবে-দাবে আর বেড়িয়ে বেড়াবে।

যাবে কি যাবে না সেটা স্বতন্ত্র কথা, এ-রকম আপ্যায়ন শুনলে সকলেই খুশি হয়। দীপুদা খুবই খুশি।

ততক্ষণে খাওয়া শেষ। দীপুদার দ্বিতীয় গেলাসও। বাপী আবার বোতল তুলে নিতে সে আধো-আধো বাধা দিল, আবার কেন...

—ওয়ান ফর দি রোড। হুইস্কি ঢেলে বাপী নিজেই সোডাও মিশিয়ে দিল।

এই গেলাসও আধাআধি শেষ হতে বাপী আলতো করে আবার মোক্ষম জায়গাটিতে ঘা বসালো। বলল, অসিতবাবুরও তোমাদের ওপর বেজায় রাগ দেখলাম কাল—

ওই জিনিসটা পেটে পড়লে আর একটু জমে উঠলে গলতেও সময় লাগে না, জ্বলতেও না। দীপুদাও দপ করে ঝলসে উঠল।—হবে না! গুণের শেষ আছে ওর? যা-তা বলে গেছে বুঝি?

—বলছিল, মাসিমাই তার মেয়ের কান বিষিয়ে দিচ্ছে, আর বাড়িটার লোভে তুমিও মাসিমাকে তাতিয়ে রাখছ।

—এসব কথাও বলেছে! বাড়িটা মানে আমাদের ওই বাড়িটা?

হ্যাঁ, তুমি নাকি বলেছ মেয়েকে ভাগ দিলে বাড়ি আর রক্ষা করা যাবে না, সে বেচে খাবে—এ-সব বলে মাসিমাকে বিগড়ে দিয়ে ওটা তুমি একলাই হাতড়াবার মতলবে আছ।

—স্কাউনড্রেল! মদ গিলেও মুখ এতক্ষণ এত লাল হয়নি দীপুদার।—একলা হাতাতে হলে মিষ্টিকে ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে দেওয়ার জন্য এত ঝোলাঝুলি করব কেন? ওই স্কাউনড্রেলের খপ্পরে গিয়ে পড়লে যা বলেছি তাই হবে না তো কি? জুয়ার নেশায় যে স্ত্রীর গহনা আর টাকা চুরি করতে পারে সে না পারে কি?

টাকা চুরির সঙ্গে এবারে গয়না চুরিটাও যোগ হল। কান পেতে শোনার মতোই। চার মাস আগে ভালো একটা হার খোয়া গেছে মিষ্টির। টাকা চুরি ধরা পড়ার পর মা

আর তার অন্তত ধারণা ওই শয়তানই সেটা খেয়েছে। দিনে দিনে আরো অনেক গুণ ধরা পড়ছে ছেলের। মিষ্টিকে ইদানীং সন্দেহ করে। দিল্লিতে অমন ভালো চাকরিটা পাওয়ার পিছনে খারাপ কোনো খাতিরের হাত আছে ধরে নিয়ে এমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার করল যে মিষ্টির যাওয়াই হল না শেষ পর্যন্ত। তার এই প্রমোশনটাও একই সন্দেহের চোখে দেখে। যখন তখন আপিসে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করতে দেখলে ঘরে এসে বিচ্ছিরি রকমের খোঁচা দিয়ে কথা বলে আর যাচ্ছেতাই রসিকতা করে।

জ্বলজ্বলে চাউনি দীপুদার।—ঘরের কেচ্ছার কথা কত আর বলব তোমাকে?

আর বেশি শোনার তাগিদ নেই বাপীর। গতকাল আর আজকের মধ্যে তুরুপের অনেকগুলো তাস হাতে পেয়ে গেছে। ধীরেসুস্থে কি ভাবে খেলবে এখন সেই বিবেচনা সেই হিসেব।

বারো

পরের দিনটা আবার হরতাল। ট্রাম ভাড়ার সেই এক পয়সার যুদ্ধ। তার পরের দিন জায়গায় জায়গায় একশ চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করার ধুম, জনতা পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ। গুলি টিয়ারগ্যাস লাঠি। সৈন্যদের টহলদারি।

এরই মধ্যে বাপী হোটেল ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাট গিয়ে উঠেছে। ফ্ল্যাটের মালিক কথার খেলাপ করেনি। অল্প কটা দিনের মধ্যে ছিমছাম সাজিয়ে দিয়েছে। হট্টগোল থেকে সরে এসে বাপী প্রায় চব্বিশটা ঘণ্টা ঠাণ্ডা নিরিবিলির মধ্যে সেঁধিয়ে থাকল।

আরও একটা দিন গড়িয়ে গেল। দুপুরের দিকে গাড়ি হাঁকিয়ে বাপী উল্টোডাঙার সেই গুদাম ঘর দেখতে গেছল। ইতিমধ্যে সেটাও কিছু সংস্কার হবার কথা। মিস্ত্রির কাজও অনেক। ভিতরে পার্টিশন দিয়ে গোটাকতক খুপরি করতে হবে। এদিকের কাজ সবই এগোচ্ছে। জিত মালহোত্রা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু হাঙ্গামার চেহারা যা দাঁড়াচ্ছে, আসল কাজ কবে থেকে যে শুরু হবে বাপী ভেবে পাচ্ছে না বলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ ধরে ফিরছিল। হাতঘড়িতে বিকেল চারটে। রাস্তাটা কেমন ফাঁকা আর থমথমে মনে হল। দূরে দূরে গলির মুখে ছোট ছোট জটলা। কিছু মিলিটারি ট্রাকেরও আনাগোনা চোখে পড়ল। গলির মুখে যারা দাঁড়িয়ে, মিলিটারি গাড়ি দেখে তারা ছুটছাট সরে যাচ্ছে। একশ চুয়াল্লিশ ধারা চলছে তখনও। হাওয়াটা তেমন সুবিধের ঠেকল না বাপীর।

সেই এয়ার অফিসের কাছাকাছি এসে গাড়ি আরও ছোটাল। কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দেবে না। তার অগোচরে আপনা থেকে যে অনুকূল পটভূমি গড়ে উঠেছে, খুব বুঝে-শুনে পা ফেলতে হবে সেখানে। সময় আসবে। আসবেই।

কিন্তু সময় আসারও রকমফের আছে, দশ মিনিট আগেও তা ভাবে নি। সামনে থেকে একদঙ্গল লোক হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। অদূরে টিয়ার গ্যাসের শব্দ। ধোঁয়া। ঘন ঘন গোটাকতক বোমার আওয়াজ। হতচকিত বাপী গাড়িটা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে

দাঁড় করিয়ে দিল। পুলিশের তাড়া-খাওয়া লোকগুলো অনেক দূরে দূরে গিয়ে থামল।

বাপী গাড়ি থেকে নেমে খবর সংগ্রহ করল। দক্ষিণ কলকাতায় সেই দুপুর থেকেই আগুন জ্বলছে। গুলি চলেছে। লোক মরেছে। দু-দুটো সরকারী বাস জ্বালানা হয়েছে। সেই উত্তাপ এদিকেও ছড়িয়েছে। খানিক আগে লাঠিচার্জ হয়ে গেছে, এখন টিয়ারগ্যাস চলছে। অন্যদিক থেকে বোমাবাজী শুরু হয়েছে।

বাপী গড়িতে এসে বসল। দু-দুটো বাস পোড়ানো হয়েছে, বাস আর চলবে না। এতটা পথ আসতে একটাও বাস চোখে পড়েছে মনে হল না। রাস্তায় এখন ট্যাক্সিও দেখছে না।

ইউ-টার্ন করে গাড়িটা ঘুরিয়ে দিল। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ার অফিসের ফুটপাথের গা ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করালো। কাচ তুলে দিয়ে দরজা লক করে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিতরে ঢুকল।

বোর্ডে নাম দেখল। মালবিকা চ্যাটার্জীর ঘর দোতলায়। উপরে উঠে গেল। একজন বেয়ারাকে জিগ্যেস করতে ঘরের হদিস মিলল। অপেক্ষা করতে হল একটু। ভিতরে দ্বিতীয় কেউ আছে। মিনিট তিন-চারের মধ্যে বছর চল্লিশের একজন ফিটফাট ভদ্রলোক বেরিয়ে এলো।

সুইং ডোর ঠেলে বাপী ভিতবে ঢুকল।

মস্ত টেবিলের ওধারে কলম হাতে মিষ্টি টাইপ করা একটা কাগজরে দিকে চোখ নামিয়েছিল। মুখ তুলল।

একটা চকিত অভিব্যক্তির ঢেউ চোখের তারায় এসে স্থির হল। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি দেখা দিল একটু। গেলবারে অসিত চ্যাটার্জীকে সঙ্গে করে হোটেলে আসার পর যে হাসি আর চাউনি দেখেছিল বাপীর মনে আছে। সেই হাসি আর চাউনিতে ওকে কিছু বোঝানোর আকৃতি ছিল। এ চাউনি বা হাসি সে-রকম নয়। অনেকখানি আত্মস্থ, ব্যক্তিত্বে বাঁধা।

—বসো। সমস্ত মানুষটাকেই দেখে নিল একবার।

বাপীর পুরুষের পদক্ষেপ। এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে বসল। বলল, এই রাস্তা ধরেই আমার যাতায়াত। আজই চলেই যাচ্ছিলাম, সামনে গণ্ডগোল দেখে ফিরে এলাম। বাস পোড়ানো হয়েছে, গুলিটুলি চলছে, ট্যাক্সিও চলছে না।

শুধু ঠোঁটে নয়, চোখেও একটু হাসির ছোঁয়া লেগে আছে। মিষ্টি বলল, জানি। খবর শুনেই অনেক তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

বাপী জিজ্ঞাসা করল, তোমার তাড়া নেই?

ঠোঁটের আর চোখের হাসি আর একটু প্রশস্ত হল। জবাব দিল, লেগেই তো আছে, কত আর আগে আগে পালানো যায়!

বাপীও চেয়ে আছে। আলগা সহজতা নেই। বাড়তি গাম্ভীর্যও না। এই মেয়েকে দেখে কেউ বলবে না ঘরের লোকের কারণে বুকের তলায় বড় রকমের যন্ত্রণা পুষছে। বাপীর ভিতরেই বরং একটা চিনচিন যন্ত্রণার অনুভূতি।...গেলবারে যা দেখেছিল তার থেকেও তরতাজা লাগছে। বয়েস যেন আরো কমেছে। সহজ ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় বেশ স্বাতন্ত্র্যের ছাঁদ এসেছে। পরনে ঘন ছাইরঙের সিল্কের ওপর সাদা বুটির শাড়ি, গায়ে

ধপধপে সাদা ব্লাউস। ঈষৎ ঝোলানো খোঁপা।...যৌবন আপন মাধুর্যে সুস্থির। যত দিন দেখেনি, বাপী একরকম ছিল। আজ এইটুকু দেখার মধ্যেই ভিতরে একটা তোলপাড় কাণ্ড হতে থাকল। কেউ তার একেবারে নিজস্ব কাউকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে যার ওপর আর কারো অধিকার নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু আজ বাপী শান্ত সংযত সতর্ক। স্নায়ুগুলো সব নিজের বশে টেনে ধরে আছে। মুখ দেখে ভিতরের চেহারার আভাসও কেউ পাবে না। মাথায় যে সংকল্প এঁটে বসেছে এই মুখের দিকে চেয়ে কেউ তা কল্পনা করতে পারবে না।...শেষ দেখবেই। রণে-প্রণয়ে নীতির ধার কে ধারে?

মিষ্টিই স্বল্প নীরবতার ছেদ টানল।—চা খাবে?

—খেতে পারি।

—আর কিছু?

—আর কি?

মিষ্টি হাসল।—হোটেলে লোক ধরে নিয়ে গিয়ে যে-রকম খাওয়াচ্ছ শুনলাম, সে-রকম আর এখানে কোথায় পাব?

বাপী শুনল। দেখল। খোঁচা বটে, কিন্তু বেঁধার মতো উগ্র নয়।—শুধু চা-ই বলো।

—ভাল প্যাটিস আর পেস্ট্রি খাওয়াতে পারি।

—তুমি খাবে?

—আমার দুটোর মধ্যেই হয়ে গেছে। চা খাব'খন। বেল টিপল।

—শুধু চা-ই হোক।

মিষ্টি তাকালো একবার। জোর করে আগ্রহ দেখাল না। বেয়ারা আসতে দু পেয়ালা চায়ের হুকুম করল।

বাপী নড়েচড়ে বসল একটু।—দীপুদার সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে বা কথা হয়েছে তাহলে?

প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা।—তাহলে কি রকম?

—দীপুদা বলেছিল, তার আগে যে লোককে হোটেলে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছি তার জন্য তুমি আমার ওপর খুব রেগে আছ আর আমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছ। ...কিন্তু এখন এতটা রেগে আছ বলে মনে হচ্ছে না।

মিষ্টি হাসিমুখেই স্বীকার করল, এখন আর অত রাগ নেই। বলল, রাত এগরোটায় অমন অবস্থায় বাড়ি ফিরে যা-তা বকতে থাকলে কার মেজাজ ঠিক থাকে?

চোখে চোখ রেখে বাপী ঠাণ্ডা গলায় বলল, মেজাজ ঠিক না থাকলেও মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে আমি মস্ত লোক হয়েছি আর তোমার হাজব্যান্ডকে মদ খাইয়ে মজা দেখছি—এমন কথা তুমি বলতে পারো ভাবিনি—এর পর এলে আমার কি করা উচিত?

একটু থমকে খুব চাপা ঝাঁঝের সুরে মিষ্টি বলল, সে তোমার কাছে অত আসবেই বা কেন?

—সেটা তাহলে তুমিই তাকে বলে দিও।

বেয়ারা চায়ের ট্রে রেখে গেল। মিষ্টি দু পেয়ালা চা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিল। প্রায় তখনই চকচকে কোট প্যান্ট টাই পরা অল্পবয়সী একজন লোক দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ঘরে দ্বিতীয় লোক দেখে সপ্রতিভ তৎপরতায় বলল, একসকিউজ মি—

ডিস্টারব্যান্স ভাল রকম শুরু হয়ে গেছে, মিসেস চ্যাটার্জী নো কনভেয়ান্স, একটা গাড়ি যোগাড় হয়েছে—অনেক খদ্দের, যেতে চান তো চটপট উঠতে হবে।

মুখ থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে বাপী মিষ্টির দিকে চেয়ে বলল, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।

ঈষৎ বিব্রত হাসিমুখে মিষ্টি লোকটার দিকে তাকালো।

—ও, কে। যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

চায়ের পেয়ালা শেষ হতেই বাপী বলল, চলো—

চোখ আর হাসি-ছোঁয়া-ঠোঁটে সামান্য বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি।—গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি আবার বাড়ি পৌঁছে দিতে যাবে...এঁদেব সঙ্গে আপিসের গাড়িতেই চলে যেতে পারতাম।

তার মুখের ওপর দু চোখ আরো একটু এঁটে বসল।—ভয় পাচ্ছ ?

সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্পষ্ট প্রতিবাদ।—ভয় পেতে যাব কেন!

—গেলবারে তোমার ভদ্রলোককে নিয়ে যেদিন হোটেলে এসেছিলে, সেদিন একটু ভয়ই পেয়েছিলে মনে হয়েছিল...।

টেবিলে দু হাত, কৌতুক ছুঁয়ে আছে। চেয়েই রইল একটু। তারপর জবাব দিল, তোমার মধ্যে সারাক্ষণ সেদিন বানারজুলির চোদ্দ বছরের এক ক্ষ্যাপা ছেলেকেও দেখছিলাম...। মুখ লাল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের কাগজপত্র একদিকে সরিয়ে রাখল।—চলো।

একরাশ হিংস্র লোভ গুঁড়িয়ে দিয়ে বাপীও উঠল। ঘর থেকে বেরিযে পাশাপাশি সিঁড়ি ধরে নামল। রাস্তায় এসে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে বাপী চাবি লাগিয়ে নিজের দিকে সামনের দরজা খুলে বসল। ও-ধারের দবজার লক খুলে তাকালো।

মিষ্টি গাড়িটা লক্ষ্য করেছে। উঠে পাশে বসল। নিজেই দরজাটা বন্ধ করল। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বাপী আবার পাশের দিকে তাকালো। ওদিকের দরজার কাঁচ তোলা। ঝুঁকে হাতবাড়িযে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কাঁচ না[illegible]য়ে দিতে পারে। সম্ভাব্য স্পর্শমুকুর লোভ থেকেও নিজেকে ছিঁড়ে এনে বলল, কাঁচটা নামিয়ে দাও, নইলে গরম হবে।

মিষ্টি কাঁচ নামালো।

গাড়ি আবার টার্ন নিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে ছুট[illegible]। দুজনের মাঝে আধ হাতটাক ফারাক। অনেক দিনের একটা ভুলে-যাওয়া স্পর্শ বাপীকে ছেঁকে ধরছে! ফাক পেলেই গায়ে হাত দিত আর হামলা করত বলে ন-দশ বছরের এই মেয়ের মুখঝামটা আর তাই নিয়ে তার অনেক ঝাঝের কথাগুলো মগজে আছড়ে পড়ছে। ফাঁকা রাস্তা। স্পিডও বাড়ছেই। পাশে যে বসে আছে তাকে নিয়ে এর সহস্রগুণ বেগে সমস্ত বাধা-বন্ধনের ওধারে উধাও হয়ে যাবার তাড়না। একই সঙ্গে নিজেকে সংয[illegible] করার চেষ্টা। সবুর! রণে-প্রণয়ে নীতি ধার কেউ ধারে না। শেষ দেখবেই।

চৌরঙ্গীর খানিক বাদে গাড়িটা বাঁয়ের রাস্তায় যেতে মিষ্টি সামান্য ঘুরে তাকালো। —এদিকে কোথায় ?

—আমার ফ্ল্যাটে।

—তুমি হোটেলে নেই ?

—ছিলাম। এখন নেই। একবার দেখে যাও, তোমার খুব তাড়া নেই তো ?

অস্বস্তি বোধ করছে কিনা বোঝা গেল না। ছোট জবাব কানে এলো, না...।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে গাড়িবারান্দার নিচে গাড়িটা দাঁড় করালো। সামনেই লিফট। দুজনে উঠল।

বাপী চাবি লাগিয়ে সামনের মস্ত দরজাটা খুলে ডাকল, এসো—

গালচে বিছানো মস্ত হল। দামী সোফা-সেটি পাতা। মিষ্টি ভিতরে ঢুকতে বাইরের দরজাটা টেনে দিল। বিকেলের আলোয় সবে টান ধরেছে। বাপী তবু সুইচ টিপে লাইট জ্বালল। এত বড় ফ্ল্যাটে এখন তৃতীয় আর কেউ নেই মিষ্টি সেটা বুঝেছে। তবু তার মুখে অস্বস্তি বা উদ্বেগের ছায়া চোখে পড়ছে না। না, বাপী শয়তানকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেবে না। ক্রুর লোভে ভিতরে কেউ আছাড়িপাছাড়ি করছে টের পাচ্ছে। তবু সবুর। এটা সময় নয়। সময় আসবে। আসতেই হবে।

—বোসো।

মিষ্টি বসল না। হলের চারদিক দেখে নিল। ফ্ল্যাটের মালিক বড় বড় দেয়ালে কিছু শৌখিন ছবি টাঙিয়েছে। শিথিল পায়ে এগিয়ে গিয়ে সেগুলিও দেখল। বাপী এগিয়ে এলো। বেড়রুম দুটো, ডাইনিং স্পেস কিচেন বাথও দেখলো। তারপর আবার হলের সোফায় এসে বসল। তিন হাত দূরের সোফায় মিষ্টি।

—মোটামুটি মন্দ নয়, কি বলো?

মিষ্টি হাসছে।—তোমার এখন অঢেল টাকা, তাই তোমার কাছে মোটামুটি।

সোফায় আরও একটু গা ছেড়ে দিয়ে বাপী জবাব দিল, অঢেল টাকা যে হবে সে তো তোমাকে অনেক বছর আগেই বলেছিলাম...সেই যে-বারে তুমি ভাবী বরকে ডেকে লেকে আমাকে অপমান করে তাড়ালে।

মিষ্টি সোজাসুজি চেয়ে রইল খানিক। স্পষ্ট করেই বলল, অপমান করতে চাইনি, তোমাকে কিছু বোঝাতে চেয়েছিলাম। তুমি কোনদিন কিছু বোঝবার লোক নও।

বাপী আবার সোজা হয়ে বসল। দু চোখ তার মুখের ওপর। সামান্য মাথা নাড়ল। —ঠিকই বলেছ—কো-নো দিন নয়।

মিষ্টি তেমনি চেয়ে রইল। গলার ঠাণ্ডা অথচ বাড়তি জোরটুকু কান এড়াবার নয়। বাপী তক্ষুনি নিজের নাক-মুখ বেড়িয়ে কল্পিত চাবুক বসাল একটা। রণে বা প্রণয়ে কাউকে আগে থাকতে সতর্ক করা রীতি নয়। চাবুকের ঘায়ে মুখে হাসি ছড়াল।—যাক, আমার বোঝাবুঝি নিয়ে তোমার আর কি মাথাব্যথা।

মিষ্টিও হাসল।—মাথাব্যথা একটু আছে। সেই যেবারে তোমাকে অপমান করে তাড়ালাম বললে, তখন থেকে।...গেলবারে তোমাকে দেখে সেটা আরও বেড়েছিল। আমি খুব আশা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তোমার সেই মালিকের মেয়েই ঘরে আসবে আর তোমার পাগলামিও ছাড়বে।

জমা বারুদের গায়ে আঁচ লাগছে। সেই আঁচ তফাতে রাখার চেষ্টায় বাপী নিঃশব্দে যুঝল খানিক। ভিতরের দৈন্যদশা বুঝতে বাকি নেই, মিষ্টি তা বেশ মিষ্টি করেই জানিয়ে দিল। ঠোঁটের ফাঁকে তির্যক হাসি ছড়িয়ে বাপী মোলায়েম সুরে জিগ্যেস করল, তা হলে না বলে হতাশ হয়েছ?

মাথা নেড়ে হাল্কা জোরের সঙ্গেই জবাব দিল, হবো না। সেই ছেলেবেলা থেকে

তুমিই আমার হাড় জ্বালিয়েছ—আমি কবে না তোমার ভাল চেয়েছি?

সুচারু ব্যক্তিত্বের আত্মস্থ হলেও এমন আপোশের দিক ধরেই সম্পর্কটা সহজ করে তোলার আগ্রহ স্পষ্ট। লুব্ধ দু চোখ পলকা কৌতুকে ঢেকে বাপী জিজ্ঞাসা করল, ভালো দেখছ না?

—কি ভালো—মস্ত ব্যবসা অনেক টাকা বাড়ি গাড়ি?

—আর কি চাই। একটা পয়সা ট্রামভাড়া বাড়ানো হয়েছে বলে কলকাতা রক্তে ভাসছে। যাক গে, তোমার মতে তাহলে আমার এখন কি করা উচিত?

মিষ্টির দু চোখে হাসি ছুঁয়ে আছে, কিন্তু তরল নয় আদৌ। যা বলতে চায় তার সাদা অর্থ, যা হবার হয়েই যখন গেছে তার জের টেনে আর লাভ কি বাপু—সুস্থির হও, ভালো থাকো—আর কি চাই তা নিজেই বেশ জানো। বলল না। হাত উল্টে ঘড়ি দেখল।—এখন ওঠা উচিত।...ফ্ল্যাটে তো এখন পর্যন্ত লোকজন দেখলাম না। তোমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি?

—যখন যেখানে যা জোটে।

মিষ্টি তক্ষুনি হেসেই আমন্ত্রণ জানালো, তাহলে আমার ওখানেই চলো এ রাতটার মতো কি জোটে দেখা যাক—

রমণী-মুখের ওই কমনীয় ব্যক্তিত্বের উপর একটা আঁচড় বসানোর সুযোগ পেল বাপী। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

—কি হল?

—লোভ হচ্ছে...সাহসে কুলোবে না!

—কেন? আর একজনের মুখে তো তোমার প্রশংসা ধরে না এখন।

কিছু বলার আগেই দুর্বল দিকটা আগলানোর চেষ্টা দেখে বাপীর মজা লাগছে। তার তাড়া নেই। টোপ আর একটু বসানো হোক। হৃষ্ট মন্তব্য করল, এখন আমার এই ভাগ্যটাও খুব ভালো, শুধু তোমার একজন কেন, দীপুদার সঙ্গে দেখা হলে তার মুখেও আমার খুব প্রশংসা শুনবে...কারণ দুজনের কাছেই আমি এখন একজন নিরীহ অথচ ধৈর্যশীল শ্রোতা।

মিষ্টির ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যেতে লাগল। নিরীহ যে কত সেটা খুব ভালো জানে। ...দাদার ছেলেবেলার আচরণের খোঁচা হলে দুজনকে টানত না। সতর্ক চাউনি তার মুখের ওপর স্থির কয়েক পলক।—দেখা হয়েছে অনেক প্রশংসাও শুনেছি...কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন, ড্রিংক করে এই একজন দাদার নামে যা-তা বলেছে বলে?

বাপী একটু শব্দ করেই হেসে উঠল।—বলাবলির কথা ছাড়ো, এ ব্যাপারে দুজনা দুজনার ওপর সমান টান—একেবারে কর্ণার্জুনের টান যাকে বলে।

ছাড়তে বললেও বলাবলিটা যে একতরফা হয়নি সেইটুকুই বুঝিয়ে দিল। মিষ্টি বুঝল। সুন্দর মুখের এই ব্যক্তিত্ব কমনীয় হলেও একটু আগের মতো সরল নয়।—আমার ওখানে যেতে তোমার সাহসে কুলোচ্ছে না কেন...দাদা কি বলেছে?

—তোমার ভদ্রলোকের কিছু রোগের কথা।...

চাপা ঝাঁঝালো গলায় মিষ্টি জানতে চাইল, কি রোগ? জুয়া খেলে, নেশা করে?

—দিল্লির অমন ভাল চাকরিটা নিতে পারলে না বলেও তোমার দাদা খুব দুঃখ করছিল।

সব থেকে দুর্বল জায়গাটি ধরে নিঙড়ে দেওয়ার কাজ সারা। ফর্সা মুখে তপ্ত লালের আভাস ছড়িয়ে পড়েছে। অপলক দু চোখ বাপীর চোখে আটকে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো হাসির রেখা স্পষ্ট হতে থাকল। বলল, সবই বুঝলাম।...আমার মা বা দাদা কখন কোন রাস্তায় চলে ছেলেবেলা থেকে জেনেও তাদের কথায় তোমার এখন এত ভক্তিশ্রদ্ধা কেন সেটুকু শুধু বুঝলাম না।...যে সহজ কথাটা তাদের বুঝতে অসুবিধে তা নিয়ে আমি খুব মাথা ঘামাই না বা তাদের কিছু বলিও না। কিন্তু তুমি এমন এক ধৈর্যশীল শ্রোতা বলেই তোমাকে বলতে পারি। তারা শুধু রোগ দেখছে, কিন্তু তার জোরের আসল পুঁজিটুকু তাদের চোখে পড়ছে না। সেটা মিথ্যে হলে আর কাউকে কিছু বলতে হত না, আমি নিজেই ছেঁটে দিতাম। জোরের এই পুঁজিটুকুতে ভেজাল নেই বলেই রোগ বরদাস্ত করতে আমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না এটুকু তুমি অন্তত জেনে রাখতে পার।

ধীরে-সুস্থে কথাগুলো শেষ করে মিষ্টি আবার ঘড়ি দেখল। মুখ তুলে সোজাই তাকালো আবার। কঠিন আঁচড়টুকু ঠোঁটের ফাঁকে লেগে আছে এখনও।—এবারে উঠতে হচ্ছে।

জবাবটা বাপীর মগজের মধ্যে কেটে কেটে বসতে লাগল। দুর্বলতার মোচড় পড়া সত্ত্বেও যা বলল বাপীর বুঝতে একটুও সময় লাগল ন। জোরের আসল পুঁজি বলতে তার ঘরের ওই একজনের ভালবাসার পুঁজি, ভালবাসার জোর। মিষ্টির ধারণা এতে কোন ভেজাল নেই। আর, এ সম্বল যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওই রোগ বরদাস্ত করতে অসুবিধে হবে না। অর্থাৎ ভালবাসা আছে বলেই অবস্থাগতিকে সেটুকু হারাবার ভয়ে এই আঁকড়ে ধরে থাকার রোগ।...এও বুঝিয়ে দিল, দাদা বা মা যা-ই বলুক, এ-জন্যে আর কারও প্রত্যাশারও কিছু নেই।

সহজ সংযমের মুখোস ধরে রাখার চেষ্টায় বাপীকে যুঝতে হচ্ছে এখনো। বুকের পাতালে ফুঁসছে কেউ। গজরাচ্ছে।...সামনের দরজা বন্ধ। ফ্ল্যাটে তৃতীয় কেউ নেই। ওটা শেকল ছেঁড়ার আগে বাপী উঠে পড়ল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। ছিটকিনি টেনে দরজা দুটো খুলে দিয়ে ডাকল, এসো—

লিফটে নিচে নামল পাশাপাশি গাড়িতে উঠে বসল। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি আবার বড় রাস্তায় পড়ে বেগে ছুটল। গণ্ডগোলের দরুণ ফুটপাথে লোক চলাচল কম। ফাঁকা রাস্তা।

মিষ্টি কোন কথা বলছে না। বাপীও চুপ। গাড়ি ছুটছে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মগজও থেমে নেই। মিষ্টির কথাগুলো হিসেব করছে। আর ওজন করছে। হিসেব করছে আর ওজন করছে আর নাকচ করছে।

...ভালবাসার পুঁজি বাপী চেনে। তার জোর কত জানে। এই পুঁজি, এই জোরের ওপর তার চিরকালের দুর্বলতা। বনমায়ার মরদ হাতির কবলে পড়ে মরতে বসেছিল, তবু ওই আহত পাগলা হাতিটার প্রতি অগাধ দরদ তার। ভালবাসার বুকে দাগ বসিয়েছিল বলে বনমায়ার এককালের মাহুত ভীম বাহাদুর চা-বাগানের লম্পট সাহেবের বুকে ছোরা বসিয়ে পালিয়েছিল—বাপী তখন মনে প্রাণে প্রার্থনা করেছে, ভীম বাহাদুর ধরা যেন না পড়ে।...ব্রুকলিন পিওন রতন বনিকের মুখে সেই ভালবাসার নির্ভরতা দেখেছিল —বাপী নিজেকে আজও ক্ষমা করতে পারে না।...নিজের বুকের তলায় এই পুঁজি পুষছিল

বলেই প্রাণ বাঁচানো সত্ত্বেও রেশমাকে অত বড় আঘাত দিয়ে সেই চরম বিপর্যয়ের মুখ থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পেরেছিল!...ভালবাসার নিঃশব্দ অথচ বিপুল স্রোত জঙ্গলের সাপধরা মানুষ হারমার মধ্যে দেখেছে। এই পুঁজি আর এই জোরের ওপর নির্ভর করে ঊর্মিলা বেঁচে গেল!...কোবরেজের ছেলে ছোট কবিরাজ নিশীথ সেনের মুখেও এই ভালবাসার ছোঁয়াটুকু দেখেছিল বলেই অনায়াসে তাকে এখানকার ম্যানেজারের চেয়ারে বসিয়ে দেবার কথা ভাবতে পেরেছিল। সেই ছোঁয়া মুছে গেছে জানামাত্র তাকে মন থেকেই ছেঁটে দিতে দ্বিধা করেনি।

অসিত চ্যাটার্জীর হাসিতে খুশিতে রাগে ক্ষোভে বা আচরণে এই পুঁজি। আর এই জোরের ছিটে-ফোঁটাও দেখতে পেলে বাপী সেটুকু অনুভব করত। বুঝতে পারত। নিজের বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেলেও জানতে বা চিনতে ভুল হত না।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু শিরায় শিরায় রক্তের তাপ বাড়ছে। মিষ্টির কথাগুলো একটা চ্যালেঞ্জের মতো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে।

অপেক্ষাকৃত ঘন বসতির কাছাকাছি এসে পড়তে বাপী গাড়িটা হঠাৎ সামনের রাস্তার ডাইনের বাঁকে ঘুরিয়ে দিল। ওই রাস্তাটা ফাঁকা পাবে!...ঘোরার মুখে স্পিড এমনিতেই কমাতে হয়েছে। হঠাৎ রাস্তার ও-ধারে ল্যাম্প-পোস্টের দিকে চোখ যেতেই ব্রেকে চাপ পড়ল। বাপী বিমূঢ় নিস্পন্দ হঠাৎ।

ল্যাম্প-পোস্টের একটু তফাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়িটা প্রায় থেমে যেতে সপ্রতিভ তৎপরতায় রাস্তায় নেমে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে এলো। তার পরেই আচমকা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে মেয়েটা ছিটকে ঘুরে আবার ফুটপাথে উঠে সামনের অন্ধকারের দিকে হনহন করে হেঁটে চলল।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল পনের সেকেন্ডের মধ্যে। গাড়িটা এভাবে থামতে মিষ্টি প্রথম মুখ ঘুরিয়ে বাপীর দিকে তাকালো। তারপর তার হতচকিত দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে। মুখ দেখা গেল না। মেয়েটির তৎক্ষণে ও-দিকে ফিরে পালানোর তাড়া। কিন্তু মিষ্টির পাশের লোক গাড়ি চালানো ভুলে সেদিকে চেয়েই আছে।

—কি ব্যাপার, মহিলাকে চেনো নাকি?

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। বাপী মাথা নাড়ল। চেনে।

—ওভাবে পালিয়ে গেল কেন...আমাকে দেখে?

—হয়ত আমাকে দেখেই। তোমাকে দেখলে এগোতই না।

যাকে চেনে তাকে দেখেই অমন ত্রস্তে পালিয়ে গেল শুনে মিষ্টি অবাকই একটু। বলল, কিছু না পেয়ে লিফটের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল হয়ত, ডেকে তুলে নিলে না কেন?

বাপীর দু চোখ সামনের দিকে। জবাব দিল, লিফটের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল না।

—তাহলে কি জন্য?

—আমার জন্য...যে কোন একটি পুরুষের জন্য...।

জবাবটা দিয়ে বাপী এবারে আড়চোখে তার মুখখানা লক্ষ্য করল। মিষ্টি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকেই দেখছে। ওদের মনোহরপুকুরের বাড়ি বাপী চেনে না। সেই রাস্তায় এসে মিষ্টি একবার বাঁয়ে যেতে বলল একবাব ডাইনে। তারপর আঙুল তুলে ছোট একটা একতলা দালান দেখিয়ে দিল।

গাড়ি থামতে মিষ্টি একাই নামল। তারপর দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আসবে না ?

—আজ না।

বেগে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বাপী আবার সেই রাস্তায় চলে এলো। যেখানে তাকে দেখে এক মেয়ে ত্রস্ত হরিণীর মতো অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেছে।। বাপী আশপাশের রাস্তাগুলোতে চক্কর খেল খানিক। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করল।

নেই।

মাস্টারমশাই ললিত ভড়ের মেয়ে কুমু। কুমকুম। কলকাতায় আসার বড় সাধ ছিল। আসতে পেরেছে।

কিন্তু কলকাতায় আসার সাধ কেমন মিটেছে নিজের চোখে দেখেও বাপী তাকে খুঁজছে কেন ? অস্ফুট একটা ইতর গালাগালে নিজেকে বিদ্ধ করে ফেরার রাস্তায় গাড়ি ছোটাল।

তেরো

মাঠের ধার ঘেঁষে ফাঁকা রাস্তা ধরে আসছিল। মাইলখানেকের মধ্যে ব্রেকে আপনা থেকে চাপ পড়ল আবার। রাস্তার পাশে মাঠের আবছা অন্ধকার ধরে একজন হনহন করে হেঁটে চলেছে।...মেয়ে।

বাপী হেড লাইট জ্বালল। সেই মেয়ে।

মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে কুমকুম।

জোরালো হেড লাইটের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে গেল। চোখে মুখে কয়েক মুহূর্তের চকিত প্রত্যাশা। তার পরেই কাঠ একেবারে।

গাড়িটা নিঃশব্দে পাশে এসে থামল। হেড লাইট নিভিয়ে বাপী নেমে এলো। মুখোমুখি দাঁড়াল। পরনে ক্যাটকেটে গোলাপী শাড়ি। গায়ে সস্তা সিল্কের সাদা ব্লাউস। পায়ে লাল স্ট্রাইপ স্যান্ডাল। ঠোঁট লাল, গাল লাল। নাকে ঝকঝকে সাদা পাথরের ফুল। বানারজুলিতে চা-বাগানের ক্লাবে জেল্লা ঠিকরনো এই সাদা ফুলটা দেখেছিল। কপালে কালো টিপ।

বাপী বেশ ধীরেসুস্থে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। রাতের কলকাতায় শিকারে বেরিয়েছিল যে মেয়ে সে নিজেই হঠাৎএক নির্মম শিকারীর জালে আটকে গেছে। সম্ভব হলে এখনো সত্রাসে ছুটে পালানোর ইচ্ছে, কিন্তু পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। অসহায় বড় বড় দু'চোখ মেলে সে চেয়ে আছে।

অকরুণ গাম্ভীর্যে বাপী দেখেছেই। ওই চোখ-তাতানো প্রসাধন ধুয়ে মুছে ফেললে মুখখানা এখনো মন্দ সুশ্রী নয়। লম্বা আর ফর্সা বলে আগে বেশ স্মার্টই দেখাতো। ডাটাবাবুর ক্লাবে ব্রিজমোহনের সঙ্গিনী হিসেবে যেমন দেখেছিল, চার বছর বাদে বাগডোগরার এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে তার থেকেও বেশি সুন্দর দেখেছিল। সেই চেকনাইয়ে টান ধরেছে। শুকনো মুখ, চোখের কোলে কালি। তবু কলকাতার রাস্তায় এই যৌবনের পসরা নিয়ে দাঁড়ালে খদ্দের না জোটার কথা নয়। আজ চারিদিকের

গণ্ডগোলের দরুন রসিক হায়নারা সব গর্তে বোধ হয়।

কিন্তু বাপী এখন কি করবে ? মিষ্টিকে ছেড়ে এসে আবার এই পথে এসেছিল কেন ? খুঁজছিল। কেন ? এখন...? ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে যে পশুটা এতক্ষণ ধরে ফুঁসছিল আর গজরাচ্ছিল তাকে ছেড়ে দেবে ?...একবার ছেড়ে দিয়েছিল। এই দিনের মতোই এক সবখোয়ানো আক্রোশের মুখে রাতের অন্ধকারে কমলা বনিক সেধে তার খুপরি ঘরে এসেছিল। ...পরপর তিন রাত এসেছিল। কিন্তু সেই অকরুণ উল্লাসের মুহূর্তে কমলা বনিকের অস্তিত্বও ছিল না। চেতনার মুগুর মাথায় এসে না পড়া পর্যন্ত আর একজন সেই জায়গায় জুড়ে ছিল। খানিক আগে তার লোলুপ গ্রাস থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে যে গাড়ি থেকে নেমে গেল—সেই মেয়ে। আজও এই একজনকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারে। তারপর কামনার অন্ধকার গহ্বরে আছড়ে ফেলে তারও অস্তিত্ব মুছে দিয়ে সে জায়গায় অনায়াসে সেই মেয়েকেই বাসনার নরকে টেনে আনতে পারে। বিস্মৃতির শেষে কদর্য বাস্তবে ফেরার পরেও এবারে কোনো বিবেকের মুগুর মাথায় এসে পড়বে না।

চাপা আগুনের হলকা বেরুলো গলা দিয়ে।—কেমন কলকাতা দেখছ ?

কুমকুম জবাব দিল না। কাতর চোখে চেয়ে রইল। মুখে ভয়ের ছায়া ঘন হয়ে উঠছে আরো। সামনে যে দাঁড়িয়ে সে বুঝি মেরেই বসবে তাকে।

গলা দিয়ে আর এক প্রস্থ আগুন ঝরল বাপীর।—অত ভয় পাচ্ছ কেন...এ-রকম খদ্দের পছন্দ হচ্ছে না ?

ভীত ত্রস্ত চাউনিটা এবারে মুখের ওপর স্থির হল একটু। বাপী অভিনয় দেখছে হয়তো। মুখে কিছু যন্ত্রণার রেখা টেনে আনার চেষ্টা দেখছে। গলার স্বরও ফুটল এবার। —বাপীদা বিশ্বাস করো, ওটা তোমার গাড়ি ভাবতে পারি নি, তাহলে এগোতাম না। ...তোমার সঙ্গে যে ছিল তার কাছে হয়তো তুমি অপ্রস্তুত হয়েছ, কিন্তু রোজগারের তাগিদে মাথা এত খারাপ হয়েছিল যে তাকেও আমি লক্ষ্য করি নি। আমাকে ধরে মার বাপীদা, তুমি আমাকে বাঁচার রাস্তায় টেনে নিতে চেয়েছিলে, বাবার জন্য পাগল হয়ে আমি তাও—

—চোপ! কথা শেষ হবার আগেই বাপীর মাথায় বিপরীত আগুন জ্বলে উঠল। দুটো হাতের থাবা তার দুই কাঁধে উঠে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গোটা কতক প্রবল ঝাঁকুনি—বাবার জন্যে ? বাবার জন্য পাগল হয়ে তুমি এই নরকে চলে এসেছ ? এখনো এই নাম মুখে ?

মেয়েটার চোখে মুখে আর্ত বিস্ময়। তারপর মুক্তি।—তুমি বিশ্বাস করো বাপীদা-—শুধু বাবার জন্য, আমি জানতাম বাবা কলকাতায় আছে, সেই এয়ারপোর্টে তোমাকে বলেছিলাম, তুমি তখনো বিশ্বাস করো নি—আমি এসে পড়তে পেরেছিলাম বলেই বাবা এখনো বেঁচে আছে—

বাপীর হাতের থাবা দুটো আপনা থেকেই শিথিল হল। নেমে এলো। কিন্তু দু'চোখের অবিশ্বাস তারপরেও ওই মুখে বিঁধে আছে।—তোমার বাবা এখন কোথায় ?

—আমার কাছে...ঘরে...

—কার ঘর ? কোথায় ঘর ?

—এন্টালির কাছাকাছি...ঘর বলতে ভাঙা টালির ঘর। ভয় গিয়ে দু'চোখে হঠাৎ

বুভুক্ষ আশার আলো জ্বলে উঠল।—বাবা আর বেশি দিন বাঁচবে না বাপীদা, তুমি একবারটি এসে তাকে দেখে যাবে? গেলে দেখবে, আমি ফিরলে কিছু খেতে পাবে এই আশায় বসে আছে আর ছটফট করছে। তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না, কাউকে চিনতে পারে না...তবু আসবে একবারটি?

আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বাপী ওই মুখ ফালা ফালা করে দেখে নিচ্ছে। প্রাণের দায়ে এমন অভিনয়ও কারো দ্বারা সম্ভব? এ-রকম গাড়ির মালিক যাবে না বা যেতে পারে না ধরে নিয়ে করুণা উদ্রেক করে কিছু পাওয়ার চেষ্টা? কিন্তু এই দুটো চোখকে এত বড় ফাঁকিও কেউ দিতে পারে ভাবা যাচ্ছে না বলেই অস্বস্তি।

—এসো।

বাঁ-দিকের সামনের দরজাটা খুলে দিতে গিয়েও থমকালো। নিজের ভিতর থেকেই বাধা পড়ল। তার পাশে এই সীটে এতক্ষণ মিষ্টি বসে ছিল। পিছনের দরজাটা খুলে দিল।

কুমকুম তক্ষুনি উঠে বসল। বাপীর অস্বস্তি আরো বাড়ল। ওই মুখে এখনো ছলনা দেখছে না। ভয় দেখছে না। ক্ষুধার্ত আশা দেখছে, আকূতি দেখছে। বাপীর অস্বস্তি বাড়ছেই।

নির্জন রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। বাপী সামনে। পিছনে কুমকুম। বাপী এখনো আশা করছে কোনো অজুহাতে কুমকুম গাড়ি থামাতে বলবে। নেমে যেতে চাইবে। ভিতরে যে কাটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছে সেটা থামবে তাহলে। গাড়ি থামিয়ে বাপী তক্ষুনি ওকে নেমে যাওয়ার সুযোগ দেবে। এমন কি পকেটে যা আছে তাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। এমন নিষ্ঠুর বাস্তব থেকে ছলনা বরদাস্ত করাও সহজ।

দু' মাইল রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি ধর্মতলায় এসে পড়ল। পিছনে কেউ আছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ঘাড় সরিয়ে রিয়ারভিউ গ্লাসে দেখতে চেষ্টা করল। তেমনি আশা ঠিকরনো অপলক দুটো চোখের ধাক্কায় বাপী মাথা সরিয়ে নিল। সামনে চোখ রেখে জিগ্যেস করল, মাস্টারমশাই কলকাতায় আছেন তুমি জানলে কি করে?

পিছনে যে বসে তার গলার স্বরে এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই। কি করে জেনেছে বাপী শুনল। শিলিগুড়িতে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে খাতির হয়েছিল। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে তাকে কলকাতা যাতায়াত করতে হত। কুমকুমকে সে চা-বাগানের এক নেশাখোর অত্যাচারী অফিসারের শিক্ষিতা বউ বলে জানত। খাতির কদর পেতে হলে এ-রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। কথায় কথায় কুমকুম একদিন তার আর্টিস্ট বাবার কিছু গল্প করেছিল। তার দু'দিন আগে সেই লোক কলকাতা থেকে ফিরেছে। বাবা আর্টিস্ট শুনে সে-ও কলকাতায় সদ্য দেখা ফুটপাথের এক তাজ্জব আর্টিস্টের কথা বলল। লোকটা বোধ হয় বদ্ধ পাগল। চুল-দাড়ির জঙ্গলের ভিতরে মুখের সামান্যই দেখা যায়, তবু দেখলে ভয় করে। ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক-আশাকও তেমনি। খোলা ফুটপাথে বসে থাকে, আর যখন খেয়াল হয়, মস্ত একটা খড়ির ডেলা নিয়ে ফুটপাথে নানা রকমের ছবি আঁকতে থাকে। ফুটপাথের দশ-পনের হাত জুড়ে বড় বড় ছবি। সে-সব এত সুন্দর আর এত পরিষ্কার যে রাস্তার লোক ভিড় করে দেখতে দাঁড়িয়ে যায়। সেই সব তকতকে খাবারের ছবি দেখে লোকটার খিদে পেয়েছে ভেবে কেউ কেউ পয়সাও ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু লোকটা যখন মুখের দিকে তাকায় তখন ভয়ে ভয়ে তাকে সরে দাঁড়াতে হয়।

শোনামাত্র কুমকুম বুঝেছিল তার বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সেই থেকে তার কলকাতায় আসার তাড়না। সেই বাঙালী ছেলেকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য ধরেছিল। সে কথাও দিয়েছিল পরের বারে যখন যাবে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই সে জেনে ফেলল ও চা-বাগানের কোনো অফিসারের শিক্ষিতা বউ-টউ কিছু নয়। যাদের ভোগের দাসী ছিল তাদেরই কেউ বলে দিয়ে থাকবে। তাই তার নেশা ছুটে গেল আর তাড়িয়েও দিল। তার পরও কলকাতায় আসার জন্য পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। ট্রেনে চেপে একলাই কলকাতায় চলে আসতে পারত, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। এ-সব জায়গার মানুষই হাঙর এক-একটা, অসহায় একলা মেয়ে দেখলে কলকাতার মানুষ ওকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে, তারপর রাস্তায় ফেলে দেবে সেই ভয়। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা দুই একটা মেয়ের মুখে কলকাতার মানুষদের যে গল্প শুনেছে, তাতে বুকের রক্ত আগেই হিম হয়ে ছিল। কিন্তু অনেকে আশা দেওয়া সত্ত্বেও লোক আর শেষ পর্যন্ত জুটলই না। মরীয়া হয়ে শেষে একলাই কলকাতায় চলে এলো। কলকাতার হায়নারা যে দিনে দুপুরে স্টেশনে রাস্তায় ওঁৎ পেতে থাকে জানত না। বাইরের গৃহস্থঘরের বউ অজানা অচেনা জায়গয় এসে পড়েছে বুঝে নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই একজন তাকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়ে তুলে নিয়ে গেল—

বাপীর এই বিবরণ শোনার ইচ্ছে আর নেই। বলল এ-সব কথা থাক, কলকাতায় এসেই তুমি মাস্টারমশায়ের দেখা পেয়ে গেলে?

—যেখানে গিয়ে পড়েছিলুম, এক মাসের মধ্যে সেখান থেকে বেরুতে পারি নি। শেষে সেখানকার সর্বেসর্বা মাসি যখন বুঝল কোথাও পালাবার মতো আশ্রয় আর নেই, তখন কড়াকড়ি গেল। সেই বাঙালী লোকটা বাবাকে কোন রাস্তার ফুটপাথে দেখেছিল জানতাম। সেই এলাকা ধরে খোঁজাখুঁজি করতে এক জায়গায় পেয়ে গেলাম। কি যে দেখলাম, আর দেখা না হলেই ভালো ছিল বাপীদা।

আশ্চর্য। এই মেয়ের এখনো চোখে জল আসে, কান্নায় গলা বুজে যায়। সেই পাওয়ার চিত্রটাও বাপী শুনল।...এক জায়গায় অনেক লোক ভিড় করে আছে। তাদের মুখ দেখেই বোঝা গেছে সেখানে অশুভ কিছু হয়েছে। কাছে গিয়ে কুমু যা দেখল, বুক শুকিয়ে কাঠ। ফুটপাতে সারি সারি আঁকা খাবারের ওপর মুখ থুবড়ে পাগলের মতো একটা লোক পড়ে আছে। প্রাণ আছে কি নেই বোঝা যায় না। মুখের ওপর মাছি ভন ভন করছে। রাস্তার লোকেরাই কর্পোরেশানের গাড়ি ডেকেছিল। একটু বাদে সেই গাড়ি ফুটপাথের আর্টিস্টকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের হাতে পায়ে ধরে কুমকুমও সঙ্গে গেল। চার-পাঁচ দিন বাদে বাবাকে তারা ছেড়ে ছিল। কুমকুমকে বলল, করার কিছুই নেই, শিগগীরই মরে যাবে—যে ক'দিন টেঁকে ভালো-মন্দ খেতে দাও।

এই বোঝা দেখে ওদের মুরুব্বী মাসি শুধু ওকে ছেড়ে দিল না, দয়া করে মাসে চার টাকা ভাড়ায় একটা ঘরও যোগাড় করে দিল। আজ দেড় মাসের ওপর হয়ে গেল, বাবা এখনো বেঁচেই আছে। ওকেও সব সময় চিনতে পারে না।—খুব যখন খিদে পায় তখন চিনতে পারে।

...বাপী এবার কি করবে। গাড়ি থামিয়ে কুমকুমকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দেবে? তারপর পকেটে যা আছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজে পালিয়ে বাঁচবে?

কুমকুমের নিশানা মতো গাড়ি বড়রাস্তা ছেড়ে দু'তিনটে আঁকা-বাঁকা গলি পেরিয়ে একেবারে একটা ঘুটঘুটি অন্ধকার সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াল। ওখানে গাড়ি ঢুকবে না। ওই গলির মধ্যে ঘর।

গাড়ি লক করে, অন্ধকারে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে খেতে কুমকুমের পিছনে একটা টালির খুপরির সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে টিমটিম হারিকেন জ্বলছে। মেঝেতে হাড় চামড়া সার একটা বুড়ী বসে। তার সামনে দড়ির খাটিয়ায় আর একটা লোক আধ-বসা। গায়ে মোটা শতেক ফুটোর কম্বল, শনের মতো চুল-দাড়ির বোঝা পিঠ আর বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঠামো দেখে এখনো বোঝা যায় এককালে বেশ লম্বা চওড়া ছিল মানুষটা। হারিকেনের অল্প আলোয় ঘুরে তাকাতে সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠল বাপীর।

কুমকুমের অনুপস্থিতিতে বুড়ীটার হয়তো তাকে আগলানোর ভার। হাতে ভর করে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালো। মাছের মতো ঘোলাটে দুই চোখ একবার বাপীর মুখের ওপর বুলিয়ে কুমকুমের দিকে চেয়ে খনখনে চাপা গলায় বলে উঠল, একটা মাত্র ঘরে আবার কাকে এনে হাজির করলি, আমি এখন আমার ঘরে একটু না শুয়ে পারব না—

বাপীর দু'কান গরম। আরো চাপা গলায় কুমকুম তাকে ধমকে উঠল, আঃ! তুমি তোমার ঘরে চলে যাও।

খাটিয়ার দিকে এগিয়ে স্বর চড়িয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, বাবা—কে এসেছে তোমাকে দেখতে, চিনতে পারছ ? তোমার সেই আদরের ছাত্র বাপীদা—জলপাইগুড়িতে আমাদের বাড়িতে আসত—পরে অনেক দিন তোমরা একসঙ্গে সেই বাড়িতে ছিলে —মনে আছে ? চিনতে পারছ ?

গর্তের ভেতর থেকে দুটো চোখ বাপীর দিকে ঘুরল। দৃষ্টি নয়, মুখের ওপর একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধার্ত ঝাপটা এসে লাগল। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে বাপীকেই মুখ ফেরাতে হত। একটু বাদেই সেই দৃষ্টি মেয়ের দিকে ঘুরল। ক্রুদ্ধ ফ্যাসফেসে গলায় ধমকে উঠলেন, কাকে চিনব—তুই কে ?

মেয়ে নির্ভয়ে আরো কাছে গিয়ে জট বোঝাই মাথায় হাত রাখল।—এই দেখো, এর মধ্যে নিজের মেয়েকেও ভুলে গেলে ? আমি কুমু! চিনেছ ?

চিনলেন হয়তো। কারণ রাগে আরো বেশি গরগর করতে করতে বললেন, খিদেয় নাড়ি জ্বলছে ও এলো এখন আমাকে লোক চেনাতে—কি খেতে দিবি?

বাবার মাথার ওপর থেকে হাতটা খসে পড়ল। বিব্রত, বিবর্ণ মুখ। এই যোগাযোগের উত্তেজনায় ঘরে ফেরার আসল সমস্যা ভুলে গেছিল। হালছাড়া অসহায় চোখ বাপীর দিকে তাকালো।

চোখের কোণ দুটো অদ্ভুত দাপাদাপি করছে বাপীর। সামান্য মাথা নেড়ে ওকে কাছে ডাকল। পকেট থেকে পার্স বার করে তিনটে দশ টাকার নোট তার হাতে দিল। বিড়বিড় করে বলল, আমি এদিকের কিছু চিনি না, তুমি নিয়ে এসো...আমি অপেক্ষা করছি।

তিরিশ টাকা হাতে পেয়ে কুমকুমের দ্বিধা। অস্ফুট স্বরে বলল, এত কি হবে...

এবারে বাপীরও ধমকে উঠতে ইচ্ছে করল তাকে। তাড়াতাড়ি খাটিয়ার দিকে ফিরে কুমকুম বলল, এক্ষুনি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করছি বাবা—তুমি ঠাণ্ডা হয়ে থাকো—

চোখের পলকে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল। ললিত ভড় গায়ের কম্বলটা ভালো করে টেনে সোজা সামনের দিকে চেয়ে আবার আধ শোয়া হলেন। হয়তো কথা বলার মেজাজ বা অভিরুচি নেই। হয়তো বা ঘরে আর কেউ আছে ভুলেই গেছেন।

ভদ্রলোক গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে আছেন, বাপী দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে। শার্টের তলায় গেঞ্জিটা সপসপে ভিজে। গুমোটে দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘরের এই বাতাস শ্বাস-যন্ত্রটা টানতে পারছে না। বুকের ভিতরেও একটা চাপা যন্ত্রণা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এই খাটিয়ার দিকে চেয়ে আছে। মানুষের বেঁচে থাকার ও কি দুর্জয় শক্তি —দেখছে। নিজেদের খাওয়া জোটে না, তবু এই লোক স্ত্রীর বাক্স থেকে দশ টাকা চুরি করে দুর্ভিক্ষের ফাণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল।...জেল থেকে ফিরে আসার পর বাপী তাঁর সঙ্গে তাঁরই ঘরে দেড় মাস কাটিয়েছিল। তখন নিজে হাতে ওকে রান্না শিখিয়েছে, যোগব্যায়াম শিখিয়েছে! তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে তবু কারো বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের কথা শোনে নি। একমাত্র অভিযোগ ছিল শাসন-যন্ত্রের বিরুদ্ধে, আর মানুষের বে-সামাল লোভের বিরুদ্ধে।

বাপীর এখানো ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে এখান থেকে। সব-কিছু দুঃস্বপ্ন ভাবার মতো অনেক দূরে কোথাও। পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে তাই পারছে না। সারি সারি সেই সব স্মৃতিব মিছিলে আগুন ধরিয়ে ছাই করে দিতেও পারছে না।

কুমু ফিরে এলো। হাতে বড় একটা শালপাতার ঠোঙা আর একটা মাঝারি সাইজের ভাঁড়। দরজার কাছে আবছা অন্ধকারে বাপীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকালো একটু। তারপর ত্রস্তে ঘরে ঢুকে গেল। ঘরের কোণে ঠোঙা আর ভাঁড় রেখে বাবার খাটিয়ার পায়ের দিক থেকে বিবর্ণ তেলচিটে একটা মোড়া এনে বাপীর সামনে পেতে দিল। এরকম ভুলের অপরাধটুকু শুধু চোখেই ব্যক্ত করল, মুখে কিছু বলল না।

বাপী আপাতত স্থানকাল ভুলেছে। ওকেই একটু খুশি করার তাগিদে মোড়াটা দরজার কাছে টেনে নিয়ে বসল। একটা কলাই-করা বাসনে কুমু বাবার খাবার সাজালো। কচুরি তরকারি ডাল। থালাটা বাবার সামনে ধরে বলল, খেয়ে নাও।

খাওয়ার নামে শোয়া থেকে তড়াক করে উঠে বসলেন মানুষটা। গায়ের কম্বল খসে পড়ল। ব্যগ্র দু'হাত বাড়িয়ে মেয়ের হাত থেকে থালাটা ছিনিয়ে নিলেন। ঝুঁকে দেখলেন কি দেওয়া হয়েছে। দাড়ির খানিকটা খাবারের ওপর এসে পড়ল।

সেই খাওয়া দেখেও মাথাটা ঝিমঝিম করছে বাপীর। আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে কুমকুম ইচ্ছে করেই ও-দিক ফিরে আছে। খেতে খেতে ললিত ভড় একবার মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বাপীর দিকে। খাওয়ার আনন্দে গর্তের দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে।

বাপী পাথরের মূর্তির মতো বসে।...শহরের হাঙ্গামার রাতেও মেয়ে এই বাপকে ফেলে চার-পাঁচ পথ হেঁটে খদ্দের ধরতে গেছিল। কারো মত্ত ভোগের মাশুল আদায় হলে তবে বাবার খাবার আসবে। সেই খদ্দের আজ জোটে নি। বাপীর সঙ্গে আজ দেখা না হলে জঠরের এই খিদে নিয়ে মানুষটার রাত ভোর হত।

থালা খালি। কুমু জিজ্ঞাসা করল, আর দেব?

ব্যগ্র দু'চোখ মেয়ের মুখের ওপর। কিন্তু একটু বাদে তাঁর গলার স্বরে হঠাৎ জলপাইগুড়ির সেই মানুষটাকেই সামনে দেখল বাপী।—তোমাদের আছে?

—অনেক আছে। কুমু আর দুটো কচুরি আর একটু তরকারী তাঁর থালায় এনে দিল। বলল, বেশি সহ্য হবে না, এর পর মিষ্টি আছে।

মিষ্টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাপীর চোখের সামনে হঠাৎ মিষ্টির মুখ। কিন্তু ও চেয়ে আছে ললিত ভড়ের দিকে। 'মিষ্টি' শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের ভাষাও অবর্ণনীয়। দুই-ই লোভ। কত তফাৎ অথচ কত অমোঘ।

খাওয়া হতে কুমু নিজের হাতে তাকে জল খাওয়ালো। দাড়িভরতি মুখ মুছিয়ে দিল। একটা গুমরনো যন্ত্রণায় বাপীর শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। দুনিয়ার লোককে চিৎকার করে ডেকে বলতে ইচ্ছে করল, একটা ঘৃণ্য অসতী মেয়ে দেখে যাও তোমরা!

জলের গেলাস হাতে ভিতরের একটা চাপা তাগিদে কুমকুম বলে উঠল, এবারে বাপীদাকে একটু ভালো করে দেখো বাবা—চিনতে চেষ্টা করো—জলপাইগুড়ি থাকতে কত' ভালবাসতে বাপীদাকে তুমি—বাপীদাই তো আজ তোমাকে খাওয়ালো!

জবাবে ঘাড় ফিরিয়ে ললিত ভড় একবার দেখলেন। কোটরগত দুচোখের একটা ঝাপটা মেরে ঘর থেকে বিদায় করতে চাইলেন ওকে। তারপর আবার মেয়ের দিকে ফিরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, দূর হ', দূর হ' এখান থেকে—আমি কাউকে চিনি না, কাউকে চিনতে চাই না—তুই আসিস কেন এখানে? কি চাস? আমাকে খাবি? খাবি? খাবি?

মোড়া ছেড়ে বাপী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গাড়িতে কুমকুম বাড়িয়ে বলেনি। পেট ভরেছে। এখন তাঁর চোখে নিজের মেয়েও অচেনা।

চোখের ইশারায় ওকে ডেকে বাপী বাইরে চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের টিমটিমে হারিকেনটা তুলে নিয়ে কুমু তক্ষুনি এগিয়ে এলো। ঘর এখন অন্ধকার কিন্তু সেজন্য ভিতরের মানুষের কোন রকম আপত্তির আভাস পেল না বাপী।

নিজের পকেটে হাত ঢোকালো। কিন্তু আশপাশের খুপরিগুলো থেকে কারো উঁকি-ঝুঁকি দেবার সম্ভাবনা মনে আসতে তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল। আগে গলির বাইরে আসার তাড়া। অস্ফুট স্বরে বলল, এসো আমার সঙ্গে—

গলির মুখে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পার্স থেকে দু'টো একশ' টাকার নোট বার করে বলল, এই টাকা এখন তোমার কাছ রাখো—

একসঙ্গে দু'শ টাকা মেয়েটার কাছে অভাবনীয় ব্যাপার কিছু। হাত বাড়ালো না। শুধু চেয়ে রইল। ঠোঁট দুটো কাঁপছে অল্প অল্প।

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বাপী ধমকের সুরে বলল, ধরো। ওর এক হাতে হারিকেন। অন্য হাত তুলে বাপী নিজেই টাকাটা ধরিয়ে দিল। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে শাসনের সুরে হুকুম করল, বাবাকে ফেলে আর তুমি ঘর ছেড়ে বেরুবে না...আমি কাল ঠিক কখন আসতে পারব বলতে পারছি না।

গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল। মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই খচখচ করছে। সে না হয় ফ্ল্যাটে গিয়েই মাথার ওপর শাওয়ার খুলে দিয়ে গা জুড়বে।

এখানে যাদের দেখে গেল তারা কি করবে।

পরদিন জিত মালহোত্রা একটু সকাল-সকাল এসে হাজির। সহরে কখন আবার হাঙ্গামা বেঁধে যায় ঠিক নেই। আগে এসে যতটা সম্ভব কাজ সারার তাগিদ। বাপীও তার প্রতীক্ষায় ছিল। দেরাজ খুলে একগোছা টাকা বার করে পকেটে পুরল। তারপর ওকে সঙ্গে করে নিচে নেমে গাড়িতে উঠল।

এন্টালি এলাকারই ভদ্র জায়গায় মোটামুটি পছন্দসই একটা ফ্ল্যাট ঠিক করতে ঘণ্টা আড়াই সময় লেগে গেল। একতলায় ছোট-বড় ছিমছাম দুটো ঘর। বাড়িঅলা দোতলায় থাকে। আলাদা ব্যবস্থা। মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া, ছ'মাসের ভাড়া আগাম। টাকা গুনে দিয়ে আর রসিদ নিয়ে বাপী বাড়িঅলাকে জানালো, আজই ঘণ্টা-কতকের মধ্যে থাকার লোক এসে যাবে, এর মধ্যে একটু ঝাড়ামোছা করিয়ে রাখতে পারলে ভালো হয়।

জিতকে সেখানে রেখে এর পর কাছাকাছির একটা ফার্নিচারের দোকানে ঢুকল। ম্যাট্রেসসুদ্ধ রেডি-মেড ছোট ছোট দুটো খাট কিনল। একটা ড্রেসিং টেবিল আর আলনাও। ঠিকানা লিখে কুলি দিয়ে সেগুলা পাঠানোর ব্যবস্থা করে সেখান থেকে সাইনবোর্ড দেখে দেখে একটা বেডিং স্টোরস-এ ঢুকল। বিছানা বালিশ তোষক চাদর ওয়াড় সব এক জায়গাতেই পেয়ে গেল। সে-সবও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়গায় পৌঁছুনোর নির্দেশ দিয়ে বড় রকমের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অভ্যস্ত না হলেও পকেটে টাকার জোর থাকলে কলকাতা শহরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র যোগাড় করে দুটো ঘর বাসযোগ্য করে তোলা খুব কঠিন কিছু নয়। বাপীও পেরেছে। কিন্তু ভিতরের তৃপ্তি টুকুর স্বাদ আলাদা। জিত মালহোত্রা মুখ বুজে তাকে সাহায্য করেছে। মালিকটির মেজাজ জানে বলেই এতক্ষণ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি। এমন কে আসছে এখানে যার জন্য মনিবের এত দরদ, সে কৌতূহল ছিলই। বেলা প্রায় একটার সময় বাপী তাকে ছুটি দিয়ে চলে যেতে বলতে জিজ্ঞাসা করল, কে আসছেন এখানে...আপনারজন কেউ ?

বাপী গম্ভীর। বুড়ো আঙুলটা নিজের বুকে ছুঁইয়ে জবাব দিল, একেবারে এখানকার। কাছাকাছির হোটেলে খাওয়া সারার ফাঁকে আর একটা সমস্যা মনে এলো। যে মূর্তি হয়েছে মাস্টারমশাইয়ের দেখে সকলেই আঁতকে উঠবে। চুল-দাড়ির ওপর আপাতত হাত নেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথমে মাঝারি সাইজের একটা সুটকেস কিনল। তারপর রেডিমেড জামা-কাপড়ের দোকান থেকে সব চেয়ে বড় সাইজের দুজোড়া টুইলের সার্ট আর দু'জোড়া পাজামা কিনে ফেলল। শরীরে কিছু নেই, কিন্তু দেহের খাঁচাটা কম নয়। জলপাইগুড়িতে টুইলের সার্টই পরতে দেখত ভদ্রলোককে।

বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ গলির সেই খুপরি থেকে মাস্টারমশাই আর কুমুকে নিজের গাড়িতে তুলে নতুন ফ্ল্যাটে নিয়ে এলো। ললিত ভড়ের বেশবাস শুধু বদলেছে। আচরণে রকম-ফের নেই। কোটরের দু'চোখ ঘর দুটোর ওপর ঘোরাফেরা করে বাপীর মুখের ওপর এসে থেমেছে. তারপর আরো উষ্ণ হয়ে মেয়ের দিকে ফিরেছে। বিড়বিড় করে বলেছেন, খেতে দে, খিদে পেয়েছে।

পরের পাঁচ-ছ'টা দিনও বাপীর এক রকম ঝোঁকের ওপর কেটে গেল। ওপরতলার বয়স্ক বাড়িঅলা লোকটি ভদ্র। তার সঙ্গে আলাপ করে বাপী একজন বড় ডাক্তারের

হদিস পেয়ে তাঁকে ধরে এনেছে। ক'দিনের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি জানিয়েছেন রোগীর বাঁচার কোনো আশা নেই। বুক ঝাঁঝরা, পেটে ঘা, মাত্রাতিরিক্ত রক্তাল্পতা—বেঁচে আছেন কি করে সেটাই আশ্চর্য। তবু যতদিন বাঁচেন...। লম্বা ওষুধপত্রের ফিরিস্তি দিয়ে যতটা সম্ভব কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি। যখন তখন রাজ্যের খিদে ছাড়া আর কি যে কষ্ট মাস্টারমশায়ের বাপী ভেবে পায় না।

ওপরতলার ভদ্রলোক তাঁর চাকরকে বলে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে দিয়েছেন। কুমকুমকে সাত কথা জিজ্ঞাসা করলে সহজে একটার জবাব দেয় না। মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। পরিষ্কার আটপৌরে জামা-কাপড়ে এখন বেশ সুশ্রীই দেখায় মেয়েটাকে। প্রসাধনের প্রলেপ না থাকতে আরো ভালো লাগে। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে না পেয়ে ওই রকম করে চেয়ে থাকে যখন, তখন মুশকিল হয়। মেয়েটার চোখের তারায় কতকালের কান্না জমে আছে ঠিক নেই। বাপীর ভয়, কখন না ভেঙে পড়ে। ও কাঁদতে জানে না, কান্নাকাটি দেখতেও পারে না। তাই ছোকরা চাকরটার সঙ্গেই পরামর্শ করে ওই ছোট্ট সংসারের যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হয়েছে তাকে। চাল ডাল তেল নুন চিনি কেরোসিন, ঝাঁটা মশালাপাতি স্টোভ বালতি মগ হাঁড়ি কড়া সসপ্যান চায়ের কেটলি পেয়ালা প্লেট খাবার ডিশ বাটি—দুজনের একটা সংসার চালাতে এমন আরো কত কি যে লাগে বাপীর ধারণা ছিল না। চাকরটা এসে দফায় দফায় ফিরিস্তি দেয়, অমুক অমুক জিনিস চাই। কুমকুম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাপী তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে ছোটে বাপকে ছেড়ে মেয়ে এক ঘণ্টার জন্যেও বাইরে যাক চায় না। কিন্তু নিজের ওদিকে হাঁপ ধরার দাখিল। তবু বাপীর ভিতরের কোথায় যেন একটা আশ্চর্য রকমের আনন্দের উৎসও খুলে গেছে। এক খাওয়া ভিন্ন আর সব-কিছুর ওপর বীতশ্রদ্ধ এবং ক্রুদ্ধ ওই বিদায়ী মানুষটার জন্য যেটুকু করতে পারছে তাই যেন ওরই পরম ভাগ্য।

বাপীর হুকুমমতো মাস্টারমশাইয়ের চুল-দাড়ির জঙ্গল পরামাণিক ডাকিয়ে কুমু কিছুটা সাফ করতে পেরেছে। সবটা পারেনি। এটুকু করতেই নাকি ক্ষেপে গেছিল। পারে তো দু-জনকেই মারে আর কুমু হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে। সব দাড়ি কামিয়ে ফেলে চামড়ার ওপর হাড় উঁচিয়ে উঠবে। একমুখ দাড়ির জঙ্গল জলপাইগুড়ি থাকতেও বাপী অনেক সময় দেখেছে। এটুকু সংস্কারের ফলে এখন সেই মানুষের কিছুটা আদল এসেছে।

ফাঁক পেলে বাপী দু'বেলাই আসছে। সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে এসে দেখে মাস্টারমশাই ঘরে একলা খাটের ওপর বসে আছেন। কুমকুম ঘরে নেই। বাড়িতেও না। সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো টান-টান বাপীর। কখন কি জন্যে দরকার হয় ভেবে আরো অনেক টাকাই ওই মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়েছে। টাকার অভাবে বাপকে ফেলে বেরুতে হয়েছে এমন হতে পারে না। ওর কড়া নিষেধ সত্ত্বেও নেই কেন? এদিক-ওদিক চেয়েও বাচ্চা চাকরটাকেও না দেখে মেজাজ আরো বিগড়ে গেল।

মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করল, কুমু কোথায়? আপনি একলা কেন?

কথা জিজ্ঞাসা করলে রোজ যা করেন ভদ্রলোক আজও তাই করলেন। গর্তে ঢোকা দুই চোখের একটা ঝাপটা মেরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

বাপী তবু অসহিষ্ণু।—আপনাকে বলে কোথাও গেছে না এমনি চলে গেছে?

মুখ না ফিরিয়ে রাগে গজগজ করে উঠলেন।—ওষুধ আনতে গেছে, খিদে পেয়েছে খেতে দেবার নাম নেই—আমাকে ওষুধ গেলাবে!

বাপী নিজের কাছেই অপ্রস্তুত একটু। যার মনে চোর সে-ই অন্যের মধ্যে চোর দেখে। দরকারে বেরুতে পারে সেটা না ভেবে প্রথমেই সন্দেহ। একটা মোড়া টেনে কাছাকাছি বসল। ভদ্রলোক এখনো তাকে চেনে না বা পছন্দ করে না। পছন্দ অবশ্য কাউকেই করে না, খিদের তাগিদ ভিন্ন নিজের মেয়েকেও চেনে না। কাছাকাছি বসার দরুন বিরক্ত মুখে ভদ্রলোক আরো একটু ঘুরে বসলেন।

মানুষটা বেশি দিন নেই আর জানা কথাই। ঘরে তাঁকে একলা পেয়ে একটা চাপা আবেগ ভেতর থেকে ঠেলে উঠলে। বলল, আচ্ছা মাস্টারমশায়—

কানে ঢুকল না। অন্য দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছেন।

—মাস্টারমশাই! আমি আপনাকে ডাকছি—এদিকে ফিরুন না, দেখুন না আমাকে চিনতে পারেন কি না?

এবারে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। কোটরের চোখে রাগের ঝাপটা।—কে তোমার মাস্টারমশাই?

—আপনি। আমি বাপী—বানারহাট স্কুলে আপনি আমাদের ড্রইং করাতেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়িতে আপনার কাছে আমি থেকেছি—কত গল্প করেছি-আপনি আমাকে রান্না শিখিয়েছেন, যোগ-ব্যায়াম শিখিয়েছেন—আপনার কিচ্ছু মনে পড়ে না?

গর্তে ঢোকা দুটো চোখ অস্বাভাবিক চিকচিক করছে। রাগে কিনা বাপী বুঝছে না। সাগ্রহে আবার বলল, আপনি কত গল্প করতেন, যুদ্ধের গল্প দুর্ভিক্ষের গল্প—আর কত সুন্দর সুন্দর শ্লোক শোনাতেন—আপনি বলতেন, দারিদ্র্যের দোষো গুনরাশিনাশী'—বলতেন, স্বদেশের ঠাকুর বিদেশের কুকুর—মনে আছে?

হঠাৎ বুকের তলায় একটা মোচড় পড়ল বাপীর। মনে হল মানুষটার কোটরগত ওই চকচকে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। তার দিকেই চেয়ে আছে। বাপী কি ঠিক দেখছে? ব্যগ্র মুখে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, মনে পড়ছে মাস্টারমশাই—আমাকে চিনতে পারছেন?

এবারে বিড়বিড় করে যে জবাব দিলেন, শুনে বাপীরই রোমে রোমে কাঁটা দিয়ে উঠল।—সব মনে আছে...চিনতেও সব সময়েই পারি...কিন্তু মনে পড়ে কি লাভ...চিনে কি লাভ...কুমুর অসুবিধে, আমারও অসুবিধে...আবার হয়তো আমাকে ফেলে সব পালাবে...কুমুকে বলিস না।

নিজের অগোচরে বাপী ছিটকে মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সামনে তাঁর খাটে এসে বসেছে। ও কত বড় হয়েছে এখন এই মুহূর্তে অন্তত মনে নেই। জোরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, না মাস্টারমশাই না—আপনার কোনো ভয় নেই। আপনি যতকাল বাঁচবেন আপনার সব ভার আমার—এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন!

বিশ্বাস যে করলেন, অনুভব করতে একটু সময় লাগল না। গর্তের দু'চোখ জলে ভরে গেছে। দাড়ি-ছাওয়া মুখে হাসি। দেখছেন। নির্নিমেষে চেয়ে আছেন। বললেন, জেল-ফেরত তোর সঙ্গে দেখা হতে ডিস্টিংশনে বি-এস-সি পাশের কথা বলে তুই

আমাকে মিষ্টির দোকানে টেনে নিয়ে গিয়ে খুব খাইয়েছিলি, আর আমি তোকে বলে ছিলাম বড় নরম মন তোর, তোর কিস্‌সু হবে না—মনে আছে ?...এখনো এই মন তোর, এত হল কি করে রে!

বাপী চেষ্টা করছে হাসতে। চেষ্টা করছে কিছু বলতে। কোনোটাই পারছে না।

ওষুধের প্যাকেট হাতে কুমকুম ফিরল। এক খাটে দু'জনকে এমন ঘন হয়ে বসে থাকতে দেখে অবাক।

বাপী খাট ছেড়ে উঠে পড়ল। কুমকুমকে বলল, মাস্টারমশাই আমাকে চিনতে পেরেছেন, সব মনে পড়েছে! আর ভুল হবে না কথা দিয়েছেন—কিন্তু আমাদেরও যেন আর এতটুকু ভুল না হয়—বুঝলে?

অপ্রত্যাশিত খুশির ধাক্কার কুমকুম তাড়াতাড়ি বাবার দিকে তাকালো। তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। গলার কাছে কি দলা পাকিয়ে আছে বাপীর। সেটা আনন্দের কি যন্ত্রণার জানে না। ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা পা ফেলে গাড়িতে এসে উঠল।

চৌদ্দ

টানা চব্বিশ দিনের ট্রাম বয়কটের ফয়সলা শেষ পর্যন্ত হল। এক পয়সার যুদ্ধ শেষ। সরকারের তরফ থেকে এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিতের নির্দেশ ঘোষণার ফলে আপাতত গণদাবির জয়। বাপীর ধারণা পুঁজিপতিরা এ জয় খুব স্বস্তির চোখে দেখছে না। কারণ এর পিছনে নিরীহ মানুষগুলোর সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবের চেহারাটা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। চোখ চালিয়ে নিজের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করেছে বাপী। সেও তো ছোটখাটো এক পুঁজিপতিই হয়ে বসেছে। তবু সাধারণের এই জয় তার ভালো লাগছে। গা-ঝাড়া দিয়ে বাপী আত্ম প্রসাদ বাতিল করল।

এবারে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। আবু রব্বানীকে একস্‌প্রেস টেলিগ্রাম করে মালের ট্রাক পাঠাতে বলেছে। ফাক পেলে নিজেরও একবার ঘুরে আসার ইচ্ছে। পুরো এক মাসও হয়নি কলকাতা এসেছে কিন্তু মনে হচ্ছে কত দিন হয়ে গেল শিকড় ছাড়া হয়ে আছে।

ঊর্মিলাদের যাওয়া কি কারণে এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়েছিল। সেই যাত্রারও সময় এগিয়ে এসেছে। ফ্ল্যাটে আসার পর একদিন মাত্র ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল। শিগগীরই যাবে কথা দিয়েছিল। হঠাৎ ললিত ভড়কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার দরুন সময় পেয়ে ওঠেনি। সে মেয়ে হয়তো রাগে ফুঁসছে। রাতে ওর নাগালের মধ্যে টেলিফোন নেই। বিজয়ের আপিস থেকে দিনে করতে পারে। এর মধ্যে ক'বার করে তাই করেছে কে জানে। দিনের বেলায় ঘরে আর কতক্ষণ থাকে বাপী, ফোন ধরে কে।

ঊর্মিলার ওখানেই যাবে ঠিক করে প্যান্ট আর শার্ট বদলাবার জন্য সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটে ফিরেছিল। একটু বাদে দরজার ওধারে কলিং বেল বেজে উঠল। বাপী অবাক একটু। ...কে হতে পারে। একটু আগে জিত মালহোত্রাকে ছেড়ে এসেছে—সে নয়। একমাত্র মিষ্টি চেনে এই ফ্ল্যাট। সে এসেছে ভাবা যায় না। তার কাছ থেকে ঠিকানা আর ফ্ল্যাটের হদিস নিয়ে দীপুদা আসতে পারে অবশ্য।

দ্বিতীয় দফা বেল বাজল। বাপী এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

অসিত চ্যাটার্জী। ফর্সা মুখে খুশি উপচে উঠল। সঙ্গে অন্তরঙ্গ অনুযোগ। কি ব্যাপার বলো তো তোমার! কদিনের মধ্যে নো-পাত্তা। আপিস থেকে রোজ একবার করে টেলিফোন করছি কেউ ধরেই না! আপিস-ফেরতা দু-দিন এসে ফিরে গেলাম—তুমি নেই, দরজায় তালা।

লোকটাকে দেখামাত্র একটা বিজাতীয় আক্রোশ ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। তার সঙ্গে যুঝতে হলে মুখে দরাজ হাসি টেনে আনতেই হয়।—এসো অসিতদা এসো। আমিও কদিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম। একদম সময় পাইনি। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে বসার জায়গায় নিয়ে এলো।—আমার ফ্ল্যাটের হদিস আর টেলিফোনের নম্বর তোমাকে কে দিল?

সোফায় আরাম করে বসে জবাব দিল, বাঃ মিলু এসেছিল না!!

সাদা কথায় কদিন আগে যার স্ত্রী এসে গেছে এখানে, তার স্বামী কেন জানবে না। কিন্তু এত সাদা বাপী ভাবতে পারছে না। ঠিকানা বা ফোন নম্বর পেলে এই লোক এখানে এসে হানা দেবে অথবা যোগাযোগ করবে জানা কথাই। তবু দিয়েছে। দিয়ে মিষ্টি বোঝাতে চেয়েছে, যে যাই ভাবুক ওদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়ার কোনো অভাব নেই। ফাঁকিও নেই।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে একবার চোখ চালিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকটাও একবার দেখে নিল। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল, নাঃ, টাকা না থাকলে সুখ নেই—চমৎকার ফ্ল্যাট তোমার। তারপরেই অন্তরঙ্গ অথচ কড়া অনুযোগ। আমি আসি আর যাই করি তোমার ওপর কিন্তু দারুণ রেগে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে বাপীরও আকাশ থেকে আছাড় খাওয়া মুখ।—কি অপরাধ করলাম?

—বাড়ির দোরে সেদিন মিলুকে নামিয়ে দিলে, একবারটি ভিতরে এলে না বা দেখা করলে না!

মগজে বক্র চিন্তার কারিকুরি চলেছে। মুখের হাসিতে খুত নেই।—

মিস...মানে মিলু গিয়েই তোমার কাছে নালিশ ঠুকল বুঝি?

খুশি থাকলে লোকটা প্যাঁচ-ট্যাচের ধার ধারে না বাপী আগেও লক্ষ্য করেছে। এখনো নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করল না, ইয়ে মেজাজটা সেদিন আমার খুব ভালো ছিল না, আর দিনটাও কেমন ছিল তোমার মনে আছে তো? হাঙ্গামা, গুলি-গোলা—অথচ রাত পর্যন্ত ওর বাড়ি ফেরার নাম নেই। তুমি বলো, চিন্তা হয় না?

বাপী ঘটা করে মাথা নাড়ল। চিন্তা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

—আমি ভাবলাম ওই মওকায় ঠিক কেউ না কেউ ওকে নিজের বাড়ি টেনে নিয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, মিলুর আপিসের খাতিরের লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না—বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাতির করার জন্য বা লিফট দেবার জন্যে সর্বদা হাঁ করে আছে। আর মিলুরও একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে, আমি রেগে যাই জেনেও মিথ্যে বলে না—জিগ্যেস করলে কোথায় ছিল বা কোথায় গেছিল সত্যি কথাই বলে দেয়। রাত সাড়ে আটটায় বাড়ির দোরে গাড়ি থামতে ভাবলাম তাদের কেউ হবে--আমার তখনকার মেজাজ বুঝতেই পারছ। সেই মেজাজের মুখে যখন শুনলাম তুমি

ওর আপিসে এসে ধরে নিয়ে গেছ আর তুমিই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলে তখন আমিই আবার উল্টে হাঁ। দোরগোড়ায় এসেও পালিয়ে যেতে দিল বলে তখন মিলুকেই বকলাম।

এমন বিশ্বাস আর এই হৃদ্যতার কথা শুনে ভিতরটা আরো হিংস্র হয়ে উঠছে বাপীর। এই ঘরে বসে বাপী সেদিন যে খোঁচাটা দিয়েছিল, এ তারই জবাব। মিষ্টিই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে লোকের রোগের খোঁচা দিয়েছিলে সে তোমাকে কত পছন্দ করে আর কত বিশ্বাস করে নিজের চোখেই দেখো।

মুখের মেকি হাসি গলায় নামল। বলল, অত রাতে তোমার খপ্পরে পড়লে সহজে ছাড়া পেতাম! হাতে সময় নিয়ে যাব'খন একদিন।...কিন্তু জানান না দিয়ে আজ প্রথম দিন এলে, ঘরে তো সেসব কিছুই মজুত নেই—

মাখন-মার্কা হৃষ্টবদনে লজ্জা-লজ্জা হাসি।—না হে, তোমার এখানে এসে আর ওসব চলবে না...কথা দিতে হয়েছে।

—কি ব্যাপার ? ভিতরে একপ্রস্থ হোঁচট খেলেও বিস্ময়টুকু নির্ভেজাল।

চোখের মিটিমিটি হাসিতে সোনালি ফ্রেমের চশমাটাও বেশি ঝিকমিক করছে এক কথায় পাঁচ কথা বলার অভ্যেস। রয়েসয়ে জবাব দিল, মিলুর মাথা ইদানীং আগের থেকে ঠাণ্ডা দেখছি, কথায় কথায় আগের মতো অত রেগে ওঠে না...নিজের দাদা আর মায়ের ওপরেই বরং এখন বেশি রাগ। তারাই আমার মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে বুঝছে বোধ হয়। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বা মাখামাখিতে আপত্তি নেই—আপত্তি শুধু ড্রিংক করার ব্যাপারে। খুব ইচ্ছে হলে বাড়িতে বসে একটু-আধটু ড্রিংক করতে পারি—কিন্তু তোমার এখানে এসে নয়।

বাপীর ঠোঁটে হাসি। মগজ তৎপর আবার। এতক্ষণের হিংস্র থাবাটার এক ঘা বসিয়ে দেবার সুযোগ আপনার থেকে উপস্থিত। মিষ্টি সে দিন কিছু জোরের বড়াই করে গেছিল। এই লোকের ভালবাসার জোর। তাতে ভেজাল নেই বলেই তার একটু-আধটু বিকৃতি বরদাস্ত করতেও অসুবিধে হবে না বলেছিল। মিষ্টির সেই সব কথা একটা যন্ত্রণার মতো দাগ কেটে আছে। বাপী বিশ্বাস করেনি, কারণ এই জোরের দিকটা সে চেনে। নিজেকে দিয়ে চিনেছে, অনেক দেখে চিনেছে।

ঊর্মিলার ওখানে যাওয়ার চিন্তা আজও বাতিল। জোরের যাচাই কিছুটা এই রাতেই হতে পারে। মিষ্টিকে কথা দিয়েছে তার এখানে এসে ড্রিংক করবে না। লোকটাকে কথা রাখার মতো সবল ভাবতেও রাজি নয় বাপী। অন্তরঙ্গ সুরে বলল, চায় না যখন একেবারে ছেড়েই দাও না, ও আর এমন কি জিনিস।...কিন্তু আমার এখানে এসে ড্রিংক ছাড়া আর কিছুতেই নিষেধ নেইতো ?

—আর কি ?

—কাজের চাপে হাঁসফাঁস দশা গেছে কটা দিন, সবে আজই একটু হাল্কা হতে পেরেছি, তাই তোমাকে পেয়ে দারুণ ভাল লাগছে...শিগগীর ছাড়া পাচ্ছ না। কিন্তু আমার বেজায় খিদে পেয়ে গেছে, আগে কোথাও গিয়ে বেশ মেজাজে ডিনার সেরে আসা যাক চলো।

অসিত চ্যাটার্জীর তক্ষুনি ঘাড় কাত। এসবে আপত্তি করার মতো বেরসিক নয়।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাপীর গাড়ি পার্ক স্ট্রীটের এক জমজমাট রেস্তরাঁর পাশে এসে

দাঁড়াল। বাইরে আলোর বহর দেখে এটাই সব থেকে অভিজাত মনে হল। এত গাড়ি দাঁড়িয়ে যে পার্ক করার জায়গা মেলা ভার। রাস্তার উল্টো দিকে জায়গা খুঁজে বার করতে হল।

ঢোকার পথে পাগড়ি আঁটা তকমা-পরা দরোয়ান সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দিল। ভিতরে পা দিয়ে বাপীরই চোখে ঘোর লাগার দাখিল। পায়ের নিচে পুরু গালচে বিছানো। অন্ধকার-ছোঁয়া খুব মৃদু আর নরম লালচে আলোয় মানুষ দেখা যায়, দশ হাত দূরের মুখ ভালো দেখা যায় না। বাইরে থেকে এলে বা অনভ্যস্ত চোখে এ আলোয় চোখ বসতে সময় লাগে। মদিরাচ্ছন্ন বাতাস, ডিশে কাঁচা বা চামচ ঠোকার টুন-টান শব্দ, সোডার ফসফস মুখ খোলা, মেয়ে-পুরুষ বহু গলার গুনগুন রব, মিহি মোটা হাসি— ভোগবতীর আমেজ ঠাসা আসর।

এখানে ক্যাবিনের বালাই নেই। রসিক-রসিকারা আড়াল কেউ চায় না। দূরে দূরে দু'জন চারজন বা ছ'জনের তকতকে টেবিল চেয়ার। টেবিলে ধপধপে সাদা ঢাকনা। নিচে সিট নেই, দোতলার ব্যালকনিতে ঠাঁই মিলল। দোতলার পরিবেশও একই রকম জমাজমাট।

বেয়ারা ফুড চার্ট আর ড্রিংক চার্ট রেখে গেল। ড্রিংক চার্টটা ঠেলে সরিয়ে বাপী ফুড চার্টটা টেনে নিয়ে বলল, এখানকার ফুড খুব ভালো, সেদিন এক পার্টিকে নিয়ে এসেছিলাম—তাঁরা অবশ্য বলে এখানকার ড্রিংকের কোনো তুলনা নেই...তা আমি তো ওসবের মর্ম বুঝি না, আমার ফুডই ভালো লাগল।

চারিত্রিক নীতির প্রশ্ন যেখানে, বাপী পারতপক্ষে মিথ্যে বলে না। কিন্তু চাণক্যনীতির মুখে বাছ-বিচার নেই। তখন অম্লানবদন। গম্ভীর। ফুড বাছাই চলছে। আড়চোখে এক-একবার সামনের মুখখানাও লক্ষ্য করছে। অসিত চ্যাটার্জীর দু চোখ ব্যালকনির সব কটা টেবিলে ঘুরছে। কি মেয়ে কি পুরুষ কারো গেলাস এখানে সুরাশূন্য নয়।

একটু বাদে নোটবই আর পেন্সিল হাতে অর্ডার নেবার জন্য স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলো। বাপী জাঁকালো ডিনারের অর্ডার দিল। লেখা শেষ করে অফিসার থমকে তাকালো। অবাকই একটু।—নো ড্রিংক?

—নো ড্রিংক।

সে চলে গেল। লালচে ঝিমুনো আলোয় অসিত চ্যাটাজীর ফর্সা মুখ নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে এখন। তবু একটু হাসি টেনে বলল, এখানে এসে ড্রিংক-এর অর্ডার না দেওয়া ওরা বোধ হয় আর দেখেনি।

—তা আর কি করা যাবে, কথা যখন দিয়েছ...।

—কথা দিয়েছি বলতে, গঙ্গাজলে গলা ডুবিয়ে তো আর প্রতিজ্ঞা কিছু করিনি। —এদের খাবার আনতে সময় লাগবে, তেষ্টাও পেয়ে গেছে!

বোকা-বোকা মুখে বাপী জলের গেলাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

—ধেৎ, জল কে খাবে, এখানে এসে নিরেমিষ গেলার কোনো অর্থ হয় না, তোমার অভ্যেস নেই তাই বুঝলে না—তুমি ভাই যা হোক একটা-দুটো দিতে বলো, গলা না ভেজালে কিছু নামবে না।

—একটা দুটো মানে...ড্রিংক?

এত তেষ্টা যে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না অসিত চ্যাটার্জীর। মাথা নাড়ল।

বাপী টেবিলে আঙুল ঠুকে বয়কে ডাকল। ছাপানো ড্রিংক চার্টটা কাছে টেনে নিয়ে কোন জিনিসটার সব থেকে বেশি দাম দেখে নিল। তারপর সেই নামের ওপর আঙুল রেখে কার্ড সামনে ঠেলে দিল।—এ জিনিস চলবে?

ঝুঁকে নাম দেখেই অসিত চ্যাটার্জীর দু চোখ চকচক করে উঠল।—অনেক দাম যে...

এক পেগের অর্ডার নিয়ে বয় চলে গেল। বাপীর কোমল-গম্ভীর দু'চোখ সামনের লোকের মুখের ওপর স্থির একটু।—আমার কাছে তুমি এর থেকে ঢের দামী মানুষ, সকলে তোমাকে বোঝে না কেন আমি ভেবে পাই না।

সোনালি চশমা আঁটা মাখন-মূর্তি গলেই যাচ্ছে।—হিংসে, স্রেফ হিংসে ভাই, কিন্তু আমিও অসিত চাটুজ্জ্যে, কারো তোয়াক্কা রাখি না।

হুইস্কির গেলাসে সোডা ঢেলে দিয়ে বয় চলে যেতে বাপী বলল, শাশুড়ি জামাইকে আর সম্বন্ধী ভগ্নীপতিকে ভালো চোখে দেখবে না বরদাস্ত করবে না—এ কেমন কথা বুঝি না।

দু'ঢোক গলা দিয়ে নামার সঙ্গে সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জীর ভিন্ন মূর্তি। ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু লোক ভাবে যে নিজেদের। বরদাস্ত করবে কি করে? তাদের মেয়ে বোনকে রেশ জুয়া আর মদের নেশায় একেবারে সর্বস্বান্ত করে ফেললাম না।

তাপ বাড়ার ফলে এবারের চুমুকে গ্লাসের অর্ধেকেব বেশি শেষ! নিরীহ বিস্ময়ে বাপী চেয়ে রইল একটু।—মদ তো তোমাকে খুব একটা বেশি খেতে দেখি না...রেস আর জুয়া সত্যি বেশি খেলো নাকি?

—ক্ষেপেছ! ওরা যাই ভাবুক অত টাকা কোথায় আমার! মৌসুমের সময় মাঠে এক আধদিন যাইনে এমন নয়, আর জুয়াও একটু-আধটু খেলি সত্যি কথাই—কিন্তু সে সব তোমার কাছে নস্যি—তবু তাই বলে ওদের অত মাথা-ব্যথা কেন! ওদের কাছে কখনো হাত পাততে গেছি!

গেলাস খালি। বাপীর হুকুমে বেয়ারা দ্বিতীয় দফা গেলাস সাজিয়ে দিয়ে গেল। ডিশ থেকে একটা দুটো চিনেবাদাম তুলে বাপী দাঁতে কাটছে, আর অনেকটা আপন মনেই হাসছে। নতুন গেলাসে নতুন চুমুক বসিয়ে মাখন-মুখ উৎসুক।—হাসছ যে?

—না, ভাবছিলাম...

—কি?

—আমাদের চিন্তাটিন্তাগুলো দিনে দিনে কেমন ছোট হয়ে গেল, মানে ন্যারো হয়ে গেল সেই কথা।...নইলে এই ঘোড়দৌড় আমাদের সেই কতকালের রাজরাজড়ার খেলা, যার যত বড় দিল তার এ-খেলায় ততো বেশি টান।...জুয়াতে হেরে যুধিষ্ঠির হেন মানুষ সভার মধ্যে নিজের স্ত্রীকে বে-ইজ্জত পর্যন্ত করালেন তাতে দোষ হল না, আর আমরা দশ-বিশ টাকায় একটু আনন্দ পেতে চাইলেই মস্ত দোষ।...আর সুরা জিনিসটাই বা কি? আসল—দেব-দেবতা থেকে শুরু করে মহাযোগী ঋষি পর্যন্ত এ জিনিস ছাড়া কার চলত?

কথা নয়, সমস্ত মন ঢেলে কথকতা শুনছে অসিত চ্যাটার্জী। তারপর গলায় সবটুকু

আকৃতি ঢেলে বলল, বাপী আমাদের বাড়িতে একবারটি এসে মিলুকে ঠিক এমনি করে বলে বোঝাও, ওই মা আর দাদাটি সত্যি মাথাটা ওর মাঝে মাঝে বিগড়ে দিচ্ছে!

রসালো ডিনার শেষ হবার ফাঁকে মোট চারদফা গেলাস শেষ। এরপর আর একবার ওয়ান ফর দি রোড-এও বাপী আপত্তি করল না। পঞ্চম গেলাস শেষ হতে ঘড়িতে সাড়ে দশটা। বিল মিটিয়ে বাপী চটপট উঠে পড়ল। আর বাড়লে লোকটাকে হয়তো সিঁড়ি দিয়ে নামানো দায় হবে।

হাত ধরে নিচে নামালো। রাস্তায় এসে ট্যাক্সির খোঁজ। রাস্তার ওধারে দু-তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই আছে। তাকে ধরে পার হতে হতে বাপী বলল, আমাকে তুমি কিন্তু মুসকিলে ফেললে অসিতদা, মিলুকে কথা দিয়েও কথা রাখলে না—ও আমাকেই এরপর যাচ্ছেতাই বলবে—

আর তিন হাতের মধ্যে ট্যাক্সি। তার আগেই লোকটা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গলায় হুমকি।—কি? তোমাকে যাচ্ছেতাই বলবে? মিলু ছেড়ে মিলুর বাপ এসে কিছু বলুক দেখি তোমাকে—মুখ একেবারে ভোঁতা করে দেব না? আমার নাম অসিত চাটুজ্জে!

...টাকা মন্দ খরচ হল না আজকে। বাপীর পরিতুষ্ট মুখ। খরচের কড়ায় গণ্ডায় সার্থক! ফ্ল্যাটে এসেও নিজের মনে হেসেছে আর অসিত চ্যাটার্জী ঘরে ফেরার পর মিষ্টির মুখখানা কেমন হতে পারে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে। তার জোরের মানুষের জোর বোঝা গেছে। মিষ্টি বুঝতে চায় না, কারণ এই জোরের কল্পনাটুকুই ওর কাছে শেষ সম্বল। জোর গলায় বলেছিল, এতে ভেজাল থাকলে ও নিজেই ছেটে দিত বা দেবে।...দেখা যাক।

পরদিনও সকাল থেকে একটা প্রচণ্ড লোভের রাশ টেনে ধরে আছে। এয়ার অফিসে গিয়ে মিষ্টির মুখখানা একবার দেখার লোভ। আজ ও গিয়ে দাঁড়ালে সেই মুখের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় দেখার বাসনা।

নিজেকে আগলাবার জন্যেই সকালের কাজের পর দুপুরের লাঞ্চ সেরেই ঊর্মিলার ওখানে চলে গেছে। আর মাত্র দুটো দিন আছে ওরা, ওই মেয়ে ক্ষেপেই আছে। বিকেলে আবার কোন ফ্যাসাদে আটকে যায় কে জানে। মাস্টারমশায়ের শরীর সকালে বেশ খারাপ দেখে এসেছে। প্রতিদিন থেকে প্রতিদিন খারাপ মনে হচ্ছে। তার সময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে বোঝা যায়। সকালে ভদ্রলোক ওকে বলেছে পারলে বিকেলে আবার আসিস বাবা, তোকে দেখলেই প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়। বাপী আসবে আশ্বাস দিয়ে এসেছে।

বিজয় আপিসের কার সঙ্গে দেখা করার জন্যে নিচে নেমেছে। এখন আর ওর আপিস নেই। বেশ লম্বা একপ্রস্থ বকা-ঝকা রাগারাগির পর ঊর্মিলা একটু ঠাণ্ডা মাথায় বাপীকে ভালো করে লক্ষ্য করল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, দিনে না হয় তুমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত...রাতে কি নিয়ে ব্যস্ত?

—রাতে ব্যস্ত তোমাকে কে বলল?

—কাল রাত সাড়ে দশটায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিজয়কে এদিকের এক সাহেবের ফ্ল্যাট থেকে তোমাকে ফোন করার জন্য পাঠিয়েছিলাম। ফোন বেজে গেছে, কেউ ধরে নি।

আগে যে প্রসঙ্গ বাপী এড়িয়ে গেছে, আজ হঠাৎ তার বিপরীত ঝোঁক কেন, জানে না। ঠোঁটের হাসিতে কৌতুক মিশল একটু। জবাব দিল, কাল রাতে হোটেলে একজনকে

এনটারটেন করতে হল।

যেভাবে বলল, ঊর্মিলার চাউনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে জানা কথাই।—কে একজন? মহিলা না ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক। তবে যা ভাবছ তার সঙ্গে তাঁর যোগ আছে।

ঊর্মিলা উৎসুক।—কি যোগ?

—মহিলার হাসব্যান্ড।

ঊর্মিলা ডবল উৎসুক।—মিষ্টির হাসব্যান্ড। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাঁকে একলা এনটারটেন করলে?

বাপী হাসছে মিটিমিটি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, আর একদিনও হোটেলে করেছিলাম—

বড় বড় চোখ করে ঊর্মিলা আগে একদফা পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর জোর দিয়ে বলল, তোমার মতিগতি একটুও ভালো দেখছি না।—ভদ্রলোককে পথে বসাবার মতলব নাকি?

—ভদ্রলোকের যা চরিত্র নিজেই অনেকখানি পথে বসে আছে।

ঊর্মিলার চাউনি এখনো বিস্ফারিত তেমনি।—মিষ্টির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

বাপী নির্লিপ্ত।—না হবার কি আছে।

ঊর্মিলা ব্যগ্রমুখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আর আমাকে একটিবার দেখালে না! আমার এত ইচ্ছে ছিল...

কথার মাঝে থমকালো। কৌতুহলের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়তে লাগল। গলার স্বরেও চাপা আবেগ মিশল একটু।—বাপী, তোমাকে আমি বোধ হয় তোমার থেকেও ভালো চিনি...তুমি কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারো না, করবেও না। মাঝখান থেকে আরো দুঃখু পাওয়ার রাস্তা করছ না তো?

শেষের কথায় বাপী কানও পাতল না। এতক্ষণের দাবিয়ে রাখা সেই লোভটাই আবার মাথায় চেপে বসল। মিষ্টির সামনে আজই একটিবার গিয়ে দাঁড়ানোর দুর্বার লোভ। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যানও ঠিক। গম্ভীর—তুমি আর দয়া করে আমার ওপর মাস্টারি করতে বোসো না—যাকে পেয়েছ তাকেই সামলে সুমলে রাখো। দুদিন বাদে আমেরিকা দেখতে তো যাচ্ছ—ভালো করে কলকাতা দেখা হয়েছে?

তক্ষুনি রেগে ওঠার সুযোগ পেল ঊর্মিলা।—খুব দেখা হয়েছে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন আপিস ঠ্যাঙাচ্ছে—আর একজনের কলকাতায় এসেও পাত্তা নেই—জিগ্যেস করতে লজ্জাও করে না!

বাপী তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল।—লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, রেডি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণে নিচে নেমে বিজয়ের বুকে একটু দাগা দিয়ে আসি—

ঊর্মিলার খুশি আর ধরে না। হড়বড় করে এটা সেটা গল্প করে চলেছে। সেই খুশির ফাঁকে গাড়ির স্পিড কত চড়ানো হয়েছে খেয়াল নেই। বাপীর ঘড়ির দিকে চোখ আছে। বেড়ানোর নামে বেরুনো, বেড়াতে একটু হবেই। আর বিকেল চারটের মধ্যে সেই এয়ার অফিসের দরজায় গাড়ি ভিড়ানোরও তাগিদ।

ঠিক সময় ধরেই পৌঁছুলো। নিজে গাড়ি থেকে নেমে ঊর্মিলাকে বলল, নামো—

এবার অফিসের সাইনবোর্ড দেখে ঊর্মিলা অবাক!—এখানে কোথায়?

—ভয় নেই, আজই টিকিট কেটে তোমাকে নিয়ে কোথাও হাওয়া হয়ে যাচ্ছি না। এসো—

ওকে নিয়ে দোতলায় উঠল। কয়েক পা এগোলেই সেই ঘর। অপেক্ষা করতে হল না, ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। দরজা ঠেলে বাপীই প্রথম ভিতরে ঢুকল, তারপর ওটা রেখে বাইরের দিকে চেয়ে ডাকল, এসো—

কলম রেখে মিষ্টি সোজা হয়ে বসেছে। এই লোককে দেখামাত্র মুখে তাপ ছড়াচ্ছিল। তারপরেই অবাক। ঊর্মিলাও ভিতবে পা দিয়ে বিমূঢ়।

বাপী গম্ভীর। এটা যে অফিস তার জন্য ভ্রূক্ষেপ নেই। ঊর্মিলাকে বলল, দেখো--

ঊর্মিলা বড় বড চোখ করে সামনে চেয়ে দেখল খানিক। মিষ্টিও।

মিষ্টি। চাপা উচ্ছ্বাসে প্রায় নিজের অগোচরে ঊর্মিলার গলা দিয়ে নামটা বেরিয়ে এলো। তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে একমুখ হেসে বলল, আমাদের ফ্রেন্ড কি দুষ্টু দেখো, আমি মিষ্টি দেখতে চেয়েছিলাম বলে আগে থেকে কিচ্ছু না জানিয়ে হুট করে এনে হাজির করল। ঘুরে বাপীর দিকে তাকালো।—আমি তো মিষ্টি দেখলাম কিন্তু আমি কে ওঁকে বললে না?

গায়ত্রী রাইয়ের মেয়ে, তার বুদ্ধি নেই কে বলবে। জায়গা বুঝে আমার না বলে আমাদের ফ্রেন্ড বলল। বাপীর একেবারে সাদামাটা মুখ। জবাব দিল,—বলার দরকার নেই, বুঝেছে। সব থেকে দূরের চেয়ারটায় বসল সে।

ঊর্মিলা আবার টেবিলেব দিকে ফিরল।—কে বলো তো?

—ঊর্মিলা। সৌজন্যবোধে মিষ্টির ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি। তার এই ব্যক্তিত্ব যতটা সজাগ ততোটা সহজ নয়।—বসুন।

ইচ্ছে করেই 'তুমি'র জবাবে 'তুমি' বলল না।

—বসুন! মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে পড়ে অকৃত্রিম খুশির সুরে ঊর্মিলা বলল, আমি ভাই আস্ত একখানা জংলি মেয়ে, আপনি-টাপনি সিকেয় তুলে রেখে দাও। আঙুল তুলে বাপীকে দেখালো।—ওই জবরদস্ত ফ্রেন্ড-এর ওপরেও প্রথম দিনই তুমি চালিয়ে কেমন ঘায়েল করেছিলাম জিগ্যেস করো।

স্বতোৎসারিত খুশির উষ্ণ স্পর্শ একটু আছেই। চেষ্টা করলেও এরকম মেয়েকে ঠাণ্ডা ব্যবধানে সরিয়ে রাখা সহজ নয়। মিষ্টি তবু ওদিকের লোকের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঈষৎ তেরছা সুরে বলল, মালিকের মেয়ের কাছে ঘায়েল হতে পারা তো ভাগ্যের ব্যাপার।

ঊর্মিলার চোখ তক্ষুনি বড় বড় আবার।—ভাগ্য আমার? তুমি তাহলে ফ্রেন্ডকে কেমন চেনো? মেয়ে ছেড়ে উল্টে খোদ মালিকই কেমন ঘায়েল হয়ে গেল জানো না তো। ভুরু কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে বাপীর দিকে তাকালো। বলে দেব?

বাপী ছোট হাই তুলল একটা—তোমার জিভ আর কে টেনে ধরে রাখতে পারছে।

আবার একটা খুশির ঝাঁকুনি দিয়ে ঊর্মিলা সামনে তাকালো।—কটা বছরের মধ্যে

মাকেই ও যেভাবে ওর হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল, হিংসের আমার গা জ্বলে যেত—আমি বলতাম মায়ের বয়েস আর দশটা বছর কম হলে আর ওর দশটা বছর বেশি হলে ঠিক একটা গড়বড় হয়ে যেত!

অফিস আর ব্যক্তিত্ব ভুলে মিষ্টিও এবারে একটু হেসেই ফেলল।—চা বলি?

ঊর্মিলা বাপীর দিকে ফিরল।—খাবে?

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে বাপী ঘরের ছাদ দেখছে।—আমার অনুমতি দরকার?

—ছাই দরকার। মিষ্টির মুখোমুখি।—বলো।

বেল টিপে হুকুম করতে বেয়ারা দু' মিনিটের মধ্যে ট্রে-তে পট আর তিনটে পেয়ালা রেখে গেল। সেই ফাঁকে ঊর্মিলা টেবিলে দু-হাত রেখে আর একটু ঝুঁকে মিষ্টিকে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে খুশির মন্তব্য।—সত্যি মিষ্টি। গম্ভীর থাকলে মিষ্টি, হাসলে মিষ্টি, কথা কইলে মিষ্টি—এত মিষ্টি আমি ভাবিনি!

পেয়ালার চা ঢালতে ঢালতে মিষ্টি একবার তার দিকে তাকিয়ে আলতো করে জিজ্ঞাসা করলো, নিজের মুখ আয়নায় দেখো-টেখো না?

—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! আমি হলাম গিয়ে একটা জংলি মাকাল ফল...লেখাপড়ায় কাঁচকলা—আর তুমি? এক-একবার কাগজে তোমার রেজাল্ট বেরোয় আর ওই বাবুর তখন—

কি হচ্ছে! সোজা হয়ে বসে একটা পেয়ালা টেনে নিতে নিতে বাপী বলল, পরস্ত্রীর কাছে এইসব গল্প করার জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে নাকি?

এই প্রথম মিষ্টি সোজা তাকালো তার দিকে। চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরের আঁচ গোপন থাকল না খুব। গলা না চড়িয়ে বলল, পরস্ত্রী যে সে-জ্ঞান ওর থেকে তোমার আর একটু বেশি থাকলে আমার সুবিধে হয়!

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বাপী দেওয়ালের ক্যালেণ্ডার দেখছে। নিস্পৃহ গোছের জবাবও দিল।—মনে রাখতে চেষ্টা করব।

গত রাতে একজন মাতাল হয়ে ঘরে ফেরার কারণে এই উষ্মা আর এই মুখই দেখবে আশা করেছিল। কিন্তু ঊর্মিলা একটু ঘাবড়ে দিয়ে বলল, আমি এলাম বলে...?

তার দিকে চেয়ে মিষ্টি তক্ষুনি হাসল—তুমি এলে বলে ও-কথা বলব কেন? তোমাকে সত্যি খুব ভালো লেগেছে।

ঊর্মিলা সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল।—বলো কি?

—হ্যাঁ। ঠোঁটের ফাঁকে তার পরেও হাসি ঝুলছে।—তোমাকে দেখার পর ভাবছি এক-একটা লোক কত বোকা হয়। খুব মন দিয়ে তারা ট্র্যাজিক হিরো হতে চেষ্টা করে।

এবারের মোলায়েম খোঁচাটা বাপীর ঠিকই লাগল। নাগালের জনকে ছেড়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের দূরের জনকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকার খোঁচা। কিন্তু সময় বুঝে ঊর্মিলাও চোখ কপালে তুলতে জানে। একটু চেয়ে থেকে তরল গলায়ই বলে উঠল, মুখ্যসুখ্যু মানুষ অত বুঝিনে ভাই...ফ্রেন্ডের ওপর তুমি খুব রেগে আছ এটুকু শুধু বুঝছি। তুমি কেন, ও আমাকে কম জ্বালিয়েছে। তবু তো তোমাকে আমার থেকে বেশি কেয়ার করে—তুমি আর তোমার বর ওর খোঁজখবর রেখো একটু, নইলে আরো অধঃপাতে যাবে।

মিষ্টি নিজেকে ব্যক্তিত্বের সংযমে বেঁধেছে আবার। সামান্য মাথা নেড়ে স্পষ্ট অথচ

মোলায়েম সুরে বলল, আমাদের অত সময় হবে না ভাই—এতকাল তোমরা খোঁজ-খবর রেখেছ, তোমরাই রেখো।

—আমরা! দুদিন বাদে আমরা তো আমেরিকায়! জানোই না বুঝি? বোকার মতো ফেঁসে গেলাম বলে, নইলে এই লোকের ভার কেউ কাউকে দেয়! তরল উচ্ছ্বাসে জিব এবারে আরো আলগা। কি অন্যায় দেখো, ছেলেদের বেলায় তিন-চারটে বউ নিয়ে ঘর করলেও দোষ নেই, আমাদের বেলায় একের বেশি হল তো মহাভারত অশুদ্ধ।

রসের কথায় ঊর্মিলা এমনিতেই ঠোঁট কাটা মেয়ে। কিন্তু এখন যেন ইচ্ছে করেই আরো বেপরেয়া। ও-পাশ থেকে বাপী আলতো করে বলল মহাভারতে তোমাদের একসঙ্গে পাঁচজনের ঘর করার নজির আছে, এত যখন টান বিজয়কে বলে দেখতে পারো...যদি রাজি হয়ে যায়।...

ঊর্মিলা ভ্রূকুটি করে তাকালো তার দিকে।—দেব ধরে থাপ্পড়। তারপরেই চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।—আজ চলি ভাই, অনেক হামলা করে গেলাম—তোমার মনে থাকবে নিশ্চয়।

সৌজন্যবোধে মিষ্টিও উঠে দাঁড়াল। মুখের ওপর চোখ রেখে হাসছে অল্প অল্প। সামান্য মাথাও নাড়ল।

—থ্যাংক ইউ। বাপীকে ডাকল, এসো—

ঊর্মিলা আগে আগে দরজার দিকে এগলো। পিছনে বাপী। ঊর্মিলা দরজা ঠেলে বেরুতেই বাপী ঘুরে দাঁড়াল।

টেবিলের ও-ধারে মিষ্টি দাঁড়িয়ে তখনো। ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। বাপী চেয়ে আছে। মিষ্টিও। এতক্ষণের উষ্ণ তাপ সেই পলকের মধ্যেই মুখের দিকে ঠেলে উঠেছে।

পলকা গাম্ভীর্যে বাপী বলল, চলি তাহলে?

মিষ্টি জবাব দিল না, চেয়েই আছে।

বাপী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো।

বাপী গাড়ি চালাচ্ছে। সামনের দিকে গম্ভীর মনোযোগ। পাশে ঊর্মিলা। আড়ে আড়ে দেখছে তাকে। একটু বাদে আধাআধি ঘুরেই বসল ভুরুতে পলকা ভ্রূকুটি। আটঘাট বেঁধে প্রস্তুত হবার মতো করে বলল, তাহলে কি দাঁড়াল?

বাপী নির্লিপ্ত জবাব দিল, কি আর, তোমার দেখার ইচ্ছে ছিল, দেখা হল।

ঊর্মিলারও গম্ভীর হবার চেষ্টা। সামান্য, মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ দারুণ দেখা হল। প্রথমে মিষ্টি দেখলাম। তারপর মিষ্টির চোখ দিয়ে তোমাকে দেখলাম। শেষে তোমার চোখ দিয়ে মিষ্টিকে দেখলাম। এত দেখার ধাক্কায় এখন আমি খাবি খাচ্ছি, আর ভাবছি, এ-সময়ে মায়ের বেঁচে থাকার খুব দরকার ছিল।

মায়ের কথায় বাপী একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিল তাকে—এ সময়ে মানে?

—মানে বুঝতে তোমার অসুবিধে হচ্ছে? মা ছাড়া কে আর তোমাকে চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে বানারজুলির মাটিতে পা দুটো পুঁতে রাখতে পারত?

বিবেকের কাঁটা ফোটাতে চায় ভেবে বাপীর ভিতরটা উষ্ণ হয়ে উঠল। তবু নিস্পৃহ সুরেই জিগ্যেস করল, তোমার খুব ভাবনা হচ্ছে?

—খুব। সম্ভব হলে বিজয়কে বলে যাওয়া ক্যানসেল করতাম।...এক্ষুনি কি ভাবছিলাম জানো?

ভিড়ের রাস্তা। বাপী মুখ ফেরালো না। কান খাড়া।

—ভাবছিলাম...এই মিষ্টি-হারা হয়ে বানারজুলিতে ফিরে সেই রাতে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে যে তুমি একেবারে শেষ করে দাও নি সেটা নেহাত মায়ের পুণ্যির জোর। মিষ্টি তোমার চোখে কত মিষ্টি সেটা আজ বোঝা গেল। কিন্তু আমার মায়ের মতো অত পুণ্যির জোর তার স্বামী বেচারার আছে?

ধরা পড়ে বাপীরও মুখোশ খুলছে। ঠোঁটের ফাঁকে ক্রূর হাসির ঝিলিক।—নেই মনে হল?

—খুব। থাকলে মিষ্টি আরো ঢের সহজে তোমাকে বরদাস্ত করতে পারত। নয়তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারত। তার বদলে শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে বেচারী কেবল জ্বলছে মনে হল।

বিশ্লেষণ শুনে কান জুড়লো। মা গায়ত্রী রাই তোমার মেয়ের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। ভিতরে পরিতুষ্ট আরো। মেয়েটা ভালবাসতে জানে বলেই ভালবাসার অনেক চেহারাও অনায়াসে মনে দাগ কাটে। তবু গায়ত্রী রাইয়ের মেয়েকে আর বাড়তে দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। তাই সামনে মনযোগ। গম্ভীর।—বাজে বোকো না।

—বাজে বকা হল? ঊর্মিলার গলা চড়ল একটু।—ওর বরকে তুমি একলা হোটেলে নিয়ে গিয়ে এনটারটেন করো কোন মতলবে—উদারতা দেখাও, না বুকে ছুরি বসাও?

সামনে ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠেছে বাপীর সেদিকে খেয়াল নেই। একটা ক্রুদ্ধ ডাক শুনে আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামালো। অদূরের পুলিশটা চেঁচিয়ে উঠেছে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির নম্বর নেবার জন্য নোটবইটাও হাতে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গাড়িটা ব্যাক করে বাপী সাদা দাগের এ-ধারে নিয়ে এলো। রুষ্ট পুলিশের দিকে চেয়ে এমন করে হাসল যেন লজ্জায় তারই মাথা কাটা যাচ্ছে। আশপাশের গাড়ি থেকেও অনেক দেখছে।

ছদ্মরাগে ঊর্মিলার দিকে ফিরে বাপী চোখ পাকালো।—তুমি মুখ বন্ধ করবে, না এর পর লোক চাপা দেব?

কিন্তু মুখের কথা শেষ হবার আগেই চোখ দুটো হঠাৎ প্রচণ্ড রকমের ধাক্কা খেল একটা। ঊর্মিলার ও-পাশ ঘেঁষে রং-চটা একটা ছোট অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার চালকের বিস্ফারিত দুই চোখ এই গাড়ির দিকে। তার পাশে যে বসে সেই মহিলারও। স্থান-কাল ভুলে দু'জনেই তারা ঝুঁকে বাপীকে দেখছে, ক্রিম রঙের ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি দেখছে, আর ঊর্মিলাকে দেখছে।

অস্টিনের চালকের আসনে বসে মণিদার পাশের বাড়ির কনট্রাকটর সন্তু চৌধুরী। তার পাশে মণিদার বউ গৌরী বউদি।

সন্তু চৌধুরীর স্টিয়ারিং-ধরা ডান হাতের পুষ্ট কব্জিতে সেই মস্ত সোনার ঘড়ি। দু'হাতের আঙুলে সেই রকম ঝকঝকে সাদা আর নীল পাথরের আংটি। পরনে ট্রাউজার গায়ে সিল্কের শার্ট। শার্টে হীরের বোতাম। ফর্সা রং বটে, মুখশ্রী আগেও সুন্দর ছিল না। ছটা বছর বয়েস বাড়ার দরুন কিনা জানে না, দেখামাত্র এই সাজসজ্জায় মানুষটাকে

বাপীর আগের থেকেও খারাপ লাগল।

আগে লাল আলো খেয়াল না করে পুলিশের ধমক খেয়েছে। এখন আবার সবুজ আলোয় থেমে আছে দেখে পুলিশ হাঁক দিল। পিছনের দাঁড়ানো গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছে। পাশের অস্টিনও ততক্ষণে বিশ গজ এগিয়ে গেছে। রাস্তাটা পেরিয়ে বাপী গাড়ির স্পিড চড়াতে গিয়েও ব্রেকে পা রাখল। সামনের অস্টিন ফুটপাথের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গৌরী বউদি নামছে।

নিজের গাড়ি বাপী হাত দশেক পিছনে দাঁড় করালো। সামনের অস্টিন ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে অসুবিধে হল না। গৌরী বউদি শুধু নয়, সন্তু চৌধুরীও নেমেছে। স্টার্ট বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ইশারায় ঊর্মিলাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে বাপীও হাসি-হাসি মুখে নেমে এলো।

গৌরী বউদির পরনের হাল্কা নীল দামী শাড়ি। গায়ের শামলা রঙের সঙ্গে মানায় না এমন কটকটে শাড়ি বা ব্লাউস আগেও পরত না। তবে প্রসাধনের পরিপাটা আগের থেকে কিছু বেড়েছে মনে হল। তা সত্ত্বেও বয়েসের দাগ স্পষ্ট। কাছে আসার ফাঁকে বাপী হিসেব করে নিয়েছে।...সেদিন আঠাশ ছিল, এখন চৌত্রিশ। আঠাশের ধারালো কথাবার্তা আর তার থেকেও বেশি ধারালো মেজাজের ফাঁকে যে রসের দাক্ষিণ্য উঁকিঝুঁকি দিত, এখন তাতেও টান ধরেছে মনে হয়।

বিস্ময়ের ধাক্কায় সন্তু চৌধুরীর বরং আগের থেকেও দিল-খোলা হাসি মুখ। কাছে আসতে এক হাত কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে বলল, আমরা তাহলে ভুল দেখি নি ব্রাদার —অ্যাঁ?

বাপীও হাসিমুখে মাথা নাড়ল। ভুল দেখে নি। তোয়াজের সুরে বলল, সন্তুদা আবার কবে ভুল দেখেছে।

এই সন্তু চৌধুরীই একদিন ওর চেহারাখানা 'ডিসেপটিভ' বলেছিল, বাপী ভোলে নি। ভদ্রলোক আবার হাসল এক দফা।—তোমার বউদি তো দেখেও বিশ্বাস করতে পারে নি, তাই গাড়ি থামিয়ে নামলাম। কথার ফাঁকে আপাদ মস্তক চোখ বুলিয়ে নিল একবার। —বিশ্বাস করা শক্তই অবশ্য...সেই তুমি পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে এই তুমি! কি ব্যাপার বলো দেখি ভায়া, চাকরিতে তো এত বরাত ফেরে না—ব্যবসা?

বাপী তেমনি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল।

সন্তু চৌধুরী ওর ঝকঝকে বিলিতি গাড়িটা আর একবার দেখে নিল। একই সঙ্গে ঊর্মিলাকেও। তারপর জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যবসা? কলকাতাতেই?

জবাবে কোটের ভিতরের পকেট থেকে মোটা ব্যাগটা বাপীর হাতে উঠে এলো। আইভরি ফিনিশড কার্ড বার করে তার হাতে দিল। ফ্ল্যাট নেবার পর এ কার্ড নতুন করা হয়েছে। ব্যবসার নাম মালিকের নাম বাড়ির ঠিকানা ফোন নম্বর সবই এতে ফলাও করে ছাপা আছে।

কার্ডটা উল্টে-পাল্টে দেখে সন্তু চৌধুরী সেটা গৌরী বউদির দিকে এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে গৌরী বউদিও চোখ বোলালো। বাপীর এখন অন্তত 'ডিসেপটিভ' মুখ তাতে নিজেরও সন্দেহ নেই। বুকের তলায় খুশির ঢেউ, বাইরে লজ্জা-লজ্জা মুখ।

তরল স্বীকৃতির সুরে সন্তু চৌধুরী বলল, তোমার সঙ্গে সেই পাঞ্জায় হারার পরেই

আমার মনে হয়েছিল তুমি কালেদিনে কিছু একটা হবে—নাও ইউ আর রিয়েলি সামবডি! এ গ্র্যাণ্ড সারপ্রাইজ ব্রাদার—

গৌরী বউদিকে একবার দেখে নিয়ে সন্তু চৌধুরী আবার বাপীর দিকে তাকালো। খুব মজাদার কিছু মনে পড়েছে যেন।—তোমার বউদির সঙ্গে একটাও কথা বলছ না কি ব্যাপার! চওড়া কপালের তুলনায় ছোট ছোট দুই চোখে কৌতুক উপচে উঠল। জবাবের অপেক্ষা না রেখে তরল উচ্ছ্বাসে নিজেই মুখর আবার।—আমি ভায়া সব-কিছু স্পোর্টিংলি নিয়ে থাকি, বুঝলে? সেদিক থেকে আমি এভার গ্রীন অ্যান্ড এভার ইয়ং। হুট করে তুমি ঘর-ছাড়া হতে আমি তোমার হয়েই এক হাত লড়েছিলাম কিনা জিগ্যেস করে দেখো!

বেশ গলা ছেড়ে হেসে উঠল সন্তু চৌধুরী। বাপীর হাসি-ছোঁয়া নিরীহ দুচোখ এখন গৌরী বউদির মুখের ওপর। চকিত ধড়ফড়ানিটুকু দৃষ্টি এড়ালো না। তার ঘরছাড়া হবার ব্যাপারটাকে এই লোকের কাছে গৌরী বউদি যে নিজের কদর বাড়ানোর মতো করেই বিস্তার করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাগ দূরে থাক বাপীর মজাই লাগছ।

সামলে নিয়ে বিরক্তির ভ্রূকুটি জোরালো করে তুলল গৌরী বউদি। ঝাঁঝালো গলায় বলল, মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি ইয়ারকি হচ্ছে। ছ'বছর আগেব সেই মেজাজেই বাপীর দিকে ফিরল।—মস্ত মানুষ হয়েছ দেখতে পাচ্ছি, গরিব দাদার বাড়ির রাস্তা আর মনে নেই নিশ্চয়ই?

বাপী অম্লানবদনে জবাব দিল, নিশ্চয় আছে। হুকুম হলেই যেতে পারি।

গৌরী বউদি অপলক চেয়ে রইল একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার হুকুম করার দিন গেছে, ইচ্ছে হলে যেও একদিন...বাচ্চু এখনো তার বাপীকাকাকে ভোলে নি।

সাদা কথাকটা প্রাঞ্জল ঠেকল। গৌরী বউদির রাগ বিরাগ বা ঠেসঠিসারার সঙ্গে গলার এই সুর মেলে না। কিন্তু বাচ্চুর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা নির্দয় হয়ে উঠতে চাইল।...বছর সাতেক বয়স ছিল তখন ছেলেটার, এখন বছর তের হবে। এই বয়সে বাপী অনেক জানত অনেক বুঝত, অনেক কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতো। আবু তখন বলত, মেয়ে-পুরুষের ভালবাসাবাসির ব্যাপারে মানুষে জানোয়ারে কোনো তফাৎ নেই। এই গৌরী বউদি আর মণিদা বানারজুলি বেড়াতে আসার ফলে বাপীর চোখের সামনে রহস্যের শেষ পর্দাটুকুও ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছিল।...আজ নিজের ছেলে মায়ের এই অভিসার কি-চোখে দেখছে? কি ভাবছে?

গৌরী বউদির দৃষ্টি আবার পিছনের গাড়ি অর্থাৎ ঊর্মিলার দিকে। সন্তু চৌধুরীও ঘনঘন ওদিকেই তাকাচ্ছিল। চাপা আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোক এবারে বাপীর দিকে ফিরল। —মেয়েটি কে...বাঙালী মনে হচ্ছে না তো?

—বাঙালী নয়।

—তোমার বউ?

বাপী চট করে গৌরী বউদির গম্ভীর মুখখানা দেখে নিল একবার। ঠোঁটের ফাঁকে সরস হাসি, সন্তু চৌধুরীর দিকে ফিরে জবাব দিল, আমার নয়, অন্য এক ভদ্রলোকের বউ।

গৌরী বউদি তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিরাপদ ব্যবধান বুঝে সন্তু চৌধুরী চাপা আনন্দে গলা খাটো করে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস! তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হল ব্রাদার...ফাঁক পেলে তোমার বাড়ি যাব'খন একদিন।

ভুল বোঝার ইন্ধন নিজেই যুগিয়েছে। ওই হাসি মুখের ভোল পাল্টে দেবার জন্য হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল এখন। ওদিক থেকে গৌরী বউদির নীরব ঝাঁঝালো তাড়া খেয়ে ব্যস্ত পায়ে সন্তু চৌধুরী তার গাড়ির দিকে এগোল।

নিজের জায়গায় ফিরে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই উর্মিলা ধমকে উঠল, মেয়েছেলে দেখলেই অমন আটকে যাও কেন—বসে আছি তো বসেই আছি।

সামনের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। বাপী ধীরে সুস্থে চালাচ্ছে।

উর্মিলা আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে দেখে ভদ্রলোক আর মহিলা দু'জনেই খুব অবাক মনে হল...কে?

সামনে চোখ রেখে বাপী এবার গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মহিলা আমার জ্যাঠতুতো দাদার বউ। ভদ্রলোক তার প্রেমিক।

উর্মিলার চাউনি উৎসুক। ঠিক বিশ্বাস হল না। তরল সুরেই আবার জিগেস করল, তোমার আর মিষ্টির মতো?

বাপী ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। গৌরী বউদির সঙ্গে সন্তু চৌধুরীর সম্পর্কটা কোন দিন নোংরামির ঊর্ধ্বে মনে হয়নি বাপীর। তাই জবাবও অকরুণ।—বিজয় আর ফুটফুটে একটা ছেলেকে ফেলে তোমার অন্য কোনো লোকের ঘর করার মতো।

উর্মিলা বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ কুঁচকে বলে উঠল, কি বিচ্ছিরি! একটু বাদেই উৎসুক আবার।—এই জন্যেই তোমার ওপর মহিলাকে একটুও খুশি মনে হল না।—কিন্তু ওঁরা আমাকে অমন ঘন ঘন দেখছিলেন কেন—আর শেষে ভদ্রলোক কি বলছিলেন তোমাকে?

বাপী শেষেরটুকুর জবাব দিল। বলল, আমিও অন্যের বউয়ের সঙ্গে আনন্দ করে বেড়াচ্ছি ধরে নিয়ে ভদ্রলোক আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করছিলেন।

উর্মিলা বাপীর কাঁধে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নিজে সোজা হয়ে বসল।

বাপী বিমনা। মিষ্টির অফিস থেকে যে মেজাজ নিয়ে বেরিয়েছিল তার সুর কেটে গেছে। ছ'টা বছর জুড়ে মণিদার ছেলে বাচ্চুর মুখখানা ভাবতে চেষ্টা করল। পারা গেল না। সাত বছরের সেই দুষ্টু কচি মুখখানা চোখে ভাসছে।

বুকের তলায় অবাঞ্ছিত মোচড় পড়ছে একটা।...মিষ্টির কোলেও আজ যদি একটা বাচ্চা থাকত বাপী কি করত? অসহিষ্ণু আক্রোশে চিন্তাটা মগজ থেকে ছিঁড়ে সরাতে চেষ্টা করল। পারল না। ভিতবের কেউ বরাবর যা করে তাই করছে। ওকে বিচারের মুখে এনে দাঁড় করাচ্ছে। জিগ্যেস করছে, সন্তু চৌধুরীর সঙ্গে তফাৎ কোথায়? তফাৎ কতটুকু?

ওই অদৃশ্য বিচারকের মুণ্ডুপাত করতে চেয়ে বাপী মনে মনেই ঝাঁঝালো জবাব দিল, তফাৎ ঢের, তফাৎ অনেক—মিলন আর ব্যভিচারে যত তফাৎ—ততো।

কিন্তু ক্ষোভে আর আক্রোশে ওই একজনকে কেন্দ্র করে নিজের ভিতরটাও সময় সময় কত ব্যভিচারী হয়ে ওঠে বাপী জানে। বিবেকের এই দ্বন্দ্ব থেকেও নিজেকে খালাস

করার তাড়না। জীবনের শুরু থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে যার ওপর দখল নিয়ে বসে আছে তারই হাতে মার খাচ্ছে মনে হলে বাসনার আগুন শিরায় শিরায় জ্বলে ওঠে সত্যি কথাই। সর্বস্ব গ্রাস করেই তখন তাকে আবার সেই দখলের অন্তপুরে টেনে এনে বসাতে চায়। ব্যভিচার শেষ কথা নয়। এক দরজায় ঘা খেলে ব্যভিচার সতের দরজায় হানা দিয়ে বেড়ায়। মিষ্টি আর অসিত চ্যাটার্জীর সম্পর্কটাকে মিলন ভাবতে রাজি নয় বাপী তরফদার। তার চোখে এও ব্যভিচার। তাই এত দাহ, এত যন্ত্রণা। যাকে পেয়েছে, চোখ কান বুজে মিষ্টি তাকেই দোসর ভাবতে চাইছে।

...যদি সত্যি হয়, বাপীর যদি ভুল হয়ে থাকে, আর কারো বিচারের দরকার হবে না। বাপীর নিজের বিবেকই তাকে বেতের ঘায়ে দূরে সরিয়ে নেবে।

বিদেশে পাড়ি দেবার খানিক আগে ঊর্মিলা আবার না বুঝে এই বিবেকের ওপরেই আঁচড় কেটে বসল। বাপী এয়ারপোর্টে এসেছে ওদের তুলে দিতে। অকারণ ব্যস্ততায় বিজয় মেহেরা এদিক-ওদিক টহল দিচ্ছে। ঊর্মিলা একটা সোফায় চুপচাপ বসে। অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। মন খারাপ! বাপীকেও সামনে বসিয়ে রেখেছে।

মন বাপীরও ভালো না। গায়ত্রী রাইয়ের এই মেয়ে কত কাছের। আজ এত দূর চলে যাচ্ছে বলে সেটা আরো বেশি অনুভব করছে। তবু নিজে হালকা হবার আর ওকে হালকা করার জন্যে টিপ্পনীর সুরে বলল, অত মন খারাপের কি হল, গিয়ে তো দুদিন বাদেই ভুলে যাবে।

ঊর্মিলা সোজা হয়ে বসল একটু। চোখে পলক পড়ছে না। বলল, বাপী, তোমাকে ফেলে আমার সত্যি যেতে ইচ্ছে করছে না।

বাপী ঘাড় ফিরিয়ে বিজয়কে খুঁজল। অদূরে দাঁড়িয়ে সে মালের ওজন দেখছে। বাপী এদিক ফিরল আবার।—ডাকব?

—ডাকো, বয়েই গেল। আমি কেন বলছি তুমি বেশ ভালোই জানো। তার থেকে এখানকার পাট তুলে নিয়ে বানারজুলি চলে যাও না বাপু, আমি নিশ্চিন্ত হই—

বাপী হাসছে মিটি-মিটি।—গেলাম। তারপর?

—তারপর আবার কি? সেখানে আবু রব্বানী আছে, সে তোমাকে পাহাড়ের মত উঁচু-মাথা প্রাণের বন্ধু ভাবে—যতদিন না দেখাশুনার অন্য লোক ঘরে আসছে, সে দেখবে। ধমকে উঠল, হাসছ কেন?

—হাসছি না। ভাবছি।...বিজয়কে বাতিল করে তোমাকেই যদি আটকে ফেলতাম, তুমি কি করতে?

—তোমার মাথা করতাম।

—যে আসবে সে-ও তাই করবে না কি করে বুঝলে?

—কেন করবে? যে আসবে তারও যে একজন বিজয় থাকবে তার কি মানে?

—কিন্তু যার কাছে আসবে তার কেউ আছে জানলে?

রাগত সুরে ঊর্মিলা বলে উঠল, কে আছে? কোথায় আছে? সব চুকেবুকে গেছে যখন, ঘটা করে জানানোর দরকারটা কি?

বাপীও গম্ভীর এবার।—সব চুকবুকে গেছে যখন তোমারই বা আমাকে নিয়ে এত

দুর্ভাবনার কারণটা কি ?...তুমি নিজেই বলো আমি কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারি না—সে-বিশ্বাস এখন আর নেই তাহলে ?

ঊর্মিলার মুখে আর কথা যোগালো না। চেয়ে আছে। চোখ দুটো বেশি চিকচিক করছে। এবারে তাকে একটু আশ্বাস দেবার মতো করে বাপী বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, চুকেবুকে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে সব ফুরিয়েই গেল। গেছে কিনা তাতে আমার যেমন সন্দেহ, তোমারও তেমনি। এর মধ্যে ছোট কাজ, বড় কাজ কিছু নেই, সুযোগ পেলে এর ফয়সালা আমি করব, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোর এই ইচ্ছেটাকে তুমি সাদা চোখে দেখতে পারছ না বলেই অশান্তি ভোগ করছ। সব গুলি মেরে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাতাস সাঁতরে চলে যাও।

বাপী আবার হাসছে বটে, কিন্তু খুব কাছের একজন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে এটুকু অনুভব না করে পারছে না। মাইকে যাত্রীদের সিকিউরিটির দিকে এগোতে বলা হল। ওদিক থেকে বিজয় মেহেরা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলো।

আরো আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ওদের এরোপ্লেন আকাশে উড়তে দেখা গেল। অন্ধকারে এরোপ্লেন ঠিক দেখা গেল না। সগর্জনে একটা একটা বড় আলো দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল, তারপর আর দেখা গেল না।

ঘড়িতে রাত পৌনে দশটা। ফাঁকা রাস্তায় বাপী তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে আসছে। গাড়ি সার্কুলার রোডে পড়তেই মাস্টারমশাইয়ের কথা মনে হল। ঊর্মিলার ওখানে ছোটাছুটিতে আর কাজের ঝক্কিতে দু'দিনের মধ্যে একটা খবরও নেওয়া হয়নি। তার আগেও ভাল কিছু দেখিনি। ভদ্রলোক এখন নিশ্চিন্তে খুব নিশ্চিত কোন দিকে পা বাড়িয়েছেন সেটুকু আরো স্পষ্ট।

এত রাতে উনি জেগে নেই হয়তো। কুমুর জেগে থাকা সম্ভব। বাড়ির কাছের একটা লাইব্রেরিতে নাম লিখিয়েছে। ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে বই আনায়। বাবার বিছানার পাশে বসে রাত জেগে বই পড়ে। বাপী যখনই যায়, লাইব্রেরির ছাপ-মারা একটা না একটা বই চোখে পড়ে। ছোকরা চাকরটা একদিন বই বদলে এনে তার সামনেই হেসে হেসে বুড়ো বাবুকে অর্থাৎ মাস্টারমশাইকে বলছিল, লাইব্রেরীর লোক নাকি ঠাট্টা করেছে, তার দিদিমণি এই রেটে পড়লে শিগগীরই লাইব্রেরি ফাঁকা হয়ে যাবে। কুমকুম লজ্জা পেয়েছে। মাস্টারমশাই মেয়ের রাত জেগে বই পড়ার কথা বলেছিলেন। বাপীর মনে হয়েছে সময়ে ঘুমে এরই মধ্যে এই মেয়ের অভ্যস্ত হওয়ার কথা নয়।

যাবে কি যাবে না, দ্বিধা। আবার তক্ষুনি তা নাকচ করার ঝোঁক। গাড়ির স্পিড আরো চড়ল।

যা আশা করেছিল, তাই। দুটো ঘরেই আলো জ্বলছে। নিঃশব্দে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো। ঘরের দরজা বন্ধ। মাস্টারমশায়ের ঘরের দরজায় কয়েকটা মৃদু টোকা দিতে কুমকুম দরজা খুলে দিল।

—বাপীদা...এত রাতে ?

বাপী তক্ষুনি লক্ষ্য করল। বিস্ময়ের আঁচড়ে মেকি কিছু ধরা পড়ল না। ভেতর কারো কত তাড়াতাড়ি বদলায় বাপীর ধারণা নেই। এই মেয়ের কাছে অন্তত এটুকু রাত

বেশি রাত হল কি করে!

—আলো জ্বলছে দেখে নামলাম।...কেমন ?

—একরকমই। ঘুমোচ্ছে। এসো...

ওর সঙ্গে নিঃশব্দে বাপী শয্যার কাছে এলো। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। দাড়ি সত্ত্বেও মাস্টারমশায়ের মুখ দুদিন আগের থেকে বেশি ফোলা মনে হল বাপীর। চাদর টেনে দেখতে গেলে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা। সে চেষ্টা না করে পাশের ঘরে এলো। ছোকরা চাকরটা মেঝেতে মাদুর পেতে শোবার তোড়জোড় করছিল। বাপীকে দেখে তাড়াতাড়ি মাদুর গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল।

কুমকুম ব্যস্ত হয়ে বলল, বোসো বাপীদা, এক পেয়ালা চা করে আনি ?

—এত রাতে আর চা না। চেয়ার টেনে বসল।—এর মধ্যে ডাক্তার দেখে গেছে ? মুখ তো আরো ফোলা মনে হল।

—আমারও মনে হয়েছে। বাপী লক্ষ্য করছে, দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়। বলল, সকালে ডাক্তারকে ফোন করেছিলাম, শুনেও তিনি তো এই ওষুধই চালিয়ে যেতে বললেন...। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মতো দেখা গেল একটু, বলল, দুদিন আসনি, বাবা নিজেকে ছেড়ে তোমার জন্যে বেশি ব্যস্ত।...এদিকে অন্য কাজে এসেছিলে বুঝি ?

—একজনকে এয়ারপোর্টে তুলে দিয়ে ফিরছিলাম, ভাবলাম দেখে যাই—

বাপী চিন্তা না করেই দু'জনের বদলে একজনকে বলেছে। তার ফলে এমন একটা প্রশ্ন শুনবে কল্পনার মধ্যে ছিল না। কুমকুমের চাউনি হঠাৎ উৎসুক একটু। বলে ফেলল বউদি কোথাও গেলেন ?

শোনামাত্র বাপীর ভিতরে নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। প্রথমেই রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের অন্তরঙ্গ ছলাকলা কিছু কিনা বোঝার চেষ্টা। সে-রকম আদৌ মনে হল না। তবু পাশ কাটিয়ে জবাব দিল, না, অন্য কেউ। সোজা চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ তোমার এ-কথা মনে হল ?

আমতা আমতা করে কুমকুম বলল, শুনলে তুমি রাগ করবে না তো বাপীদা ?

বাপীর সন্দিগ্ধ চাউনি ওর মুখের ওপরে আরো স্থির একটু।—আমি রাগ করব এমন কি কথা তুমি বলতে পারো ?

গলার স্বরে হঠাৎ উষ্ণ আমেজ কেন কুমকুম তাই বুঝে উঠল না। বিমর্ষ অথচ ঠাণ্ডা সুরে বলল, তা না...আমি কেমন মেয়ে জানি, তবু বাবা তোমার কাছে কতখানি, নিজের চোখে দেখছি বলে রোজই খুব আশা হয় বউদিও হয়তো তোমার সঙ্গে এসে বাবাকে একবারটি দেখে যাবেন। এখন বুঝছি আমার জন্যেই ঘেন্নায় আসছেন না...

এই মুখ দেখে আর এই কথা শুনে বাপীই বিমূঢ় হঠাৎ। তারপরেই চকিতে মনে পড়ল কিছু। এবারে গলার স্বরও নরম।—বউদি বলে কেউ কোথাও আছে তুমি ধরে নিলে কি করে ?

সঙ্গে সঙ্গে কুমকুমও হকচকিয়ে গেল।—সেদিন যে তোমার গাড়িতে তোমার পাশে...বউদি নয় ?

হ্যাঁ, বাপীরও সেই সন্ধ্যার কথাটাই মনে পড়েছিল। তার পাশে সেই একজনকে দেখে কুমকুম যা ভেবে বসে আছে, তা-ও ভাবতে ভালো লাগছে। এমন কি মেয়েটার

এই ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখখানাও এখন ভালো লাগছে। ঠোঁটের হাসি চোখে জমা হচ্ছে। খুব হাল্কা করে জবাব দিল, এখন পর্যন্ত নয়।

এর পরেও মেয়েটার বিমূঢ় মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছে দেখল। কেন পড়ছে তা-ও আঁচ করতে পারে।...সেই সন্ধ্যায় গাড়িতে তার পাশে বসার আগেই মিষ্টি শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছিল। বাপীকে সজাগ রাখার আর তফাতে রাখার সংকল্প বোঝানোর জন্যেই শাড়ির আঁচল মাথার ওপর দিয়ে বুকের আর একদিকে টেনে এনেছিল।...কুমকুমের এ-রকম ভুল হতেই পারে।

বাপী উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গও বাতিল।—আর রাত করব না, তুমি যাও। ...টাকা আছে তো হাতে ?

মেয়েটার কমনীয় মুখে কৃতজ্ঞতা উপচে উঠল। বলল, অনেক আছে!

—ঠিক আছে।...ডাক্তারকে কাল আমিই না হয়ে ফোন করে দেব'খন একবার, এসে দেখে যাক। পারি তো একেবারে ধরেই নিয়ে আসব—

কুমু এমন চেয়ে রইল যে, বাপী তার পরেও থমকে দাঁড়াল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আরো কিছু ভিতর থেকে ঠেলে উঠছে।—বাপীদা আর কত করবে তুমি আমাদের জন্য—আর কত করবে ?

এই ব্যাপারটাই বাপীর চোখে বা কানে সয় না।...আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে রেশমাকে মনে পড়ল। সেই সাপ-ধরা মেয়েটার কিছু ধারালো স্ফুলিঙ্গ হঠাৎ এর মধ্যেও আশা করছে কেন, জানে না। ঝাপটা-মারা গোছের গলার স্বর।—বাজে বোকো না, তোমার জন্যে কিছু করা হলে তখন ঋণ শোধের কথা ভেবো, বাপীদা কাউকে দয়া করে কিছু করে না, তখন মনে রাখতে চেষ্টা কোরো।

কুমকুম থতোমতো খেয়ে চেয়ে আছে। অবাকও।

নির্জন রাস্তায় গাড়ির স্পিডেব কাঁটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে।...সব চুকেবুকে গেছে ভাবে না বলেই ঊর্মিলার দুশ্চিন্তা। ভালবাসার চেহারা ওই মেয়ে চেনে। মিষ্টির ওখান থেকে বেরিয়ে টিপ্পনী কেটেছিল, শ্যাম আর কুল দুই নিয়ে বেচারী কেবল জ্বলছে মনে হল। বাপী তাই বিশ্বাস করেছে, করে জোর পেয়েছে। আজও প্লেনে ওঠার আগে ঊর্মিলা হার মেনে ওর গোঁ বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তারপর কুমকুমের কথা শুনেও কান দুটো লোভাতুর হয়ে উঠেছিল! শিকারে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় কুমকুম গাড়িতে বাপীর পাশে যাকে দেখেছিল, তাকে আর বউ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। বউদি নয় শুনে অবাক হয়েছে। আব বাপীর জবাব শুনেও মেয়েটা হকচকিয়ে গেছে। বাপী বলেছে, এখন পর্যন্ত নয়।

...মাথায় ঘোমটা তোলা কারো বউ এখন পর্যন্ত তার বউ নয় শুনলে অবাক হবারই কথা।

রণে আর প্রণয়ে নীতির বালাই রাখতে নেই। শয়তানকেও কছে ডাকতে বাধা নেই। ও-কথার পর কুমকুমের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই শয়তানের কিছু ইশারা মনের পাতাল ফুঁড়ে সামনে ধেয়ে আসতে চেয়েছে। তাই কুমকুমের পরের উচ্ছ্বাসটুকু বাপী বরদাস্ত করতে চায়নি। বরং সর্বনাশের দড়ির ওপর হেসে খেলে নেচে বেড়াতে পারে

এমন মেয়ে রেশমাকে মনে পড়েছে।

কেন মনে পড়েছে বাপী এখন আর সেটা তলিয়ে দেখতে রাজি নয়। ভাবতে রাজি নয়। তাহলে নিজেরই কোনো ভয়াবহ চেহারা ধরা পড়ার আশঙ্কা। ইচ্ছেটাকে বাপী চার চাকার তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটিয়েছে।

পনেরো

পরের একটা মাস বাপী কাজের মধ্যে ডুবে থাকল। মেয়েদের রূপ সাজে, পুরুষের কাজে। মনের অবস্থা যেমনই থাক, পুরুষের এই রূপটাকে বাপী কোনদিন অবহেলা করেনি। প্রাকপ্রচারের চটকে আর পার্টির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার ফলে শুরু থেকেই সোনা ফলার লক্ষণ দেখা গেছে। আবু রব্বানী এর মধ্যে তিনদফা ট্রাক বোঝাই মাল চালান দিয়েছে। চিঠিতে তার একবার কলকাতায় ঘুরে যাওয়ার ইচ্ছের কথাও লিখেছে। দোস্তকে এতদিন না দেখে ওর ভালো লাগছে না।

'কিন্তু বাপীর কাছে আগে কাজ পরে দোস্তি। আর এক প্রস্থ মালের অর্ডার দিয়ে ট্রাক ফেরত পাঠিয়েছে। তাকে এখন আসতে নিষেধ করেছে। বানারজুলিতে এখন অনেক কাজ। ওর ওপরেই সব থেকে বেশি নির্ভর। গেল মাসে সেখানকার লেনদেনের হিসেব যা পাঠিয়েছে, তা দেখে বাপী আরো নিশ্চিন্ত। তার অনুপস্থিতিতে সেখানকার লাভের অঙ্ক কোথাও মার খায়নি। ফাঁক পেলে বাপী নিজেই একবার যাবে লিখেছে। কিন্তু তেমন ফুরসৎ যে শিগগির হবে না তা-ও জানে। জিত মালহোত্রার কাজেকর্মে বাপী খুশি। লোকটা যেমন চৌকস তেমনি তৎপর। বাপী কি চায় বা কতটা চায় মুখ চেয়ে বুঝতে পারে। তবু একা সে কত দিক সামলাবে। তেমন বিশ্বস্ত কাউকে পেলে বাপী এক্ষুনি টেনে নেয়। কিন্তু অজানা অচেনা লোক ঢুকিয়ে এতটুকু ঝুঁকি নেবার মধ্যে সে নেই। সেরকম দরকার হলে আবুকেই বরং বানারজুলি থেকে বুঝে শুনে কাউকে পাঠাতে বলবে।

কাজের চাপের মধ্যেও মাস্টারমশাইকে একবার করে দেখতে আসতে চেষ্টা করে! রোজ হয় না। যেদিন পারে না, জিতকে খবর নিতে বলে দেয়। এ ব্যাপারেও লোকটার কিছু গুণ লক্ষ্য করেছে বাপী। মনিবের মাস্টার, তাই ওরও মাস্টারজি! তার মেয়েকে বলে মিস ভড়। অসুস্থ মাস্টারের প্রতি এত দরদের হেতু ওই মেয়ে কিনা মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই চালাক লোকটার মুখে কৌতূহলের আভাসও দেখেনি।

বাপীর ফ্ল্যাটে এখন দুজন কাজের লোক মোতায়েন। একজন আধাবুড়ো বাবুর্চি রোশন। ইউ-পিতে ঘর। খাসা রাঁধে। এক হোটেল থেকে জিত্ ওকে খসিয়ে এনেছে। জিতের রাতের ডিনার এখন এখানে বরাদ্দ। দুটো বেডরুমের একটাকে অফিস ঘর করা হয়েছে। সকাল দুপুরের বেশির ভাগ ঘোরাঘুরির মধ্যে কাটে। বিকেলের দিকে সে অফিস খুলে বসে। রাতে খেয়েদেয়ে মেসে ফেরে। বাইরে কাজ না থাকলে সকাল দশটা থেকে লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত বাপী অফিসে বসে।

দ্বিতীয় কাজের লোকটার নাম বলাই। মিষ্টির মা মনোরমা নন্দীর সংগ্রহ। কথায় কথায় বাপী একদিন দীপুকে বলেছিল, ঘরের কাজ জানে আবার ফোন ধরে নাম-ঠিকানা

লিখে রাখতে পারে এমন একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছে। তার দু'দিনের মধ্যে মনোরমা নন্দী একে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন। বছর উনিশ কুড়ি বয়েস। নাম ঠিকানা লিখতে পড়তে পারে কিনা জিগ্যেস করতে মুখে জবাব দিয়েছিল, ক্লাস ফাইভ ফেল, বাবা পড়ালে না বলে এই দুগ্যতি। বাপী তক্ষুনি তাকে বহাল করেছে। ঘুম থেকে উঠে প্রায়ই দেখে মেঝেতে ইংরেজি কাগজ বিছিয়ে বলাই গম্ভীর মুখে চোখ বোলাচ্ছে। আর কিছু না হোক, এই কাগজ পড়া দেখেই বাবুর্চি রোশন তাকে সমীহ করে। নাম-ধাম খবর প্রয়োজন ইত্যাদি শুনে নিয়ে একটা খাতায় লিখে রাখে। মনিব ফিরলেই গড়গড় করে তাকে জানায়।

দীপুদার সঙ্গে মনোরমা নন্দীও একদিন এসে ফ্ল্যাট দেখে গেছেন। দরদী মাসির মতোই যতটুকু সম্ভব গোছগাছ করে দিয়ে গেছেন। বলাই আর রোশনকে সদাব্যস্ত সাহেবের খাওয়া-দাওয়া যত্ন আত্তি সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। দীপুদা বাপীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানোর কথা তুলতে বাপীই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছে। ঘরের ছেলে, যখন খুশি যাব, গল্প করব, খাব—নেমন্তন্ন টেমন্তন্ন করলেই নিজেকে পর পর লাগবে মাসিমা।

মাসিমা খুশি। কিন্তু ঘরের ছেলের এ পর্যন্ত তার বাড়ি যাওয়ার ফুরসৎ হয়নি। দীপুদা এ নিয়ে টেলিফোনে অনুযোগ করেছে। বাপী বলেছে, সকাল থেকে রাত কি করে কাটছে যদি দেখতে তোমার মায়া হত দীপুদা।

অন্তরঙ্গ আপ্যায়ন অসিত চ্যাটার্জীর দিক থেকেও এসেছে। বাপীর একই জবাব। যাবে, কিন্তু আপাতত দম নেবার সময় নেই। তারপর সাদা মুখ করে জিজ্ঞাসা করেছে, নেমন্তন্নটা তোমার না মিলুর?

অসিত চ্যাটার্জী ঘুরিয়ে জবাব দিয়েছে, আমি আর মিলু কি আলাদা? জানো আমার জন্য ও বাপের বাড়ি যাওয়াও ছেড়েছে প্রায়!

—তোমার জন্যে কেন?

লালচে দু ঠোঁট পুলকে টসটস।...পতির নিন্দা সতীর কাহাতক সয়। গেলেই তো আমার ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে শুনতে হবে -

হেসেছে বাপীও। আর মনে মনে লোকটাকে জাহান্নমে পাঠিয়েছে।

ঊর্মিলা টেলিগ্রামে তাদের পৌঁছনো সংবাদ পাঠিয়েছিল। চার সপ্তাহ বাদে তার লম্বা চিঠি। বিজয় কাজে জয়েন করেছে। সকালে বেরোয়, রাতের আগে তার টিকির দেখা মেলে না। সপ্তাহে পাঁচদিন ওখানকার সব মানুষই কাজ-পাগল। বাকি দু'দিন ফুর্তি আর বেড়ানো। কিন্তু ঘরকন্নার কাজে ওরা এত ব্যস্ত যে বেড়ানোর ফুরসৎ মেলেনি। ঘরের সমস্ত কাজ মায় রান্না পর্যন্ত ঊর্মিলাকে নিজের হাতে করতে হয়। প্রথম প্রথম কান্নাই পেয়েছে। কিন্তু সকলেই তাই করছে দেখে সয়েও যাচ্ছে। লিখেছে, এত দূরে গিয়ে এখন সব থেকে বেশি মনে পড়ে বানারজুলির কথা। তাজ্জব দেশ অনেক আছে, কিন্তু বানারজুলি বোধ হয় আর কোথাও নেই। মা-কে শুধু মনে পড়ে না, মনে হয় মা যেন সেখানে তার অবাধ্য ছেলেটার আশায় একলা বসে দিন গুনছে। মায়ের সঙ্গে কোয়েলা, বাদশা ড্রাইভার, আর পাহাড়ের বাংলোর ঝগড়ুকেও খুব মনে পড়ে। মায়ের এই আশ্রিতদের ফ্রেন্ড কি ভুলে যাবে? তার পরেই খোঁচা। বানারজুলির আকাশ বাতাস পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে না পেলে ছেলেবেলার মিষ্টিকে কি আর অত মিষ্টি লাগত?

ঊর্মিলার দুষ্টুমি বাপী বুঝতে পারে। এইরকম করে মায়ের কথা আর বানারজুলির

কথা লিখে ওকে কলকাতা থেকে সরাতে চায়। কিন্তু মিথ্যে লেখেনি। কাজে ডুবে থাকলেও মাঝে মাঝে হাঁপ ধরে। বানারজুলি তখন বিষম টানে। ওই ঊর্মিলার থেকেও ঢের বেশি ঘরছাড়া মনে হয় নিজেকে। তার চিঠিটা পাওয়ার পর দু-তিন দিনের জন্য একবার বানারজুলি ঘুরে আসবে ঠিক করল। গিয়ে কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। ওখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে আগের মতোই নিজেকে ছড়িয়ে দেবে।

হল না। মাস্টারমশাই মারা গেলেন। ললিত ভড় চলে গেলেন।

আজীবন মানুষটা একটাই মুক্তি চেয়েছিলেন। ক্ষুধার মুক্তি। শুধু নিজের নয়, সক্কলের। এমন চাওয়ার খেসারত অনেক দিয়েছেন। এবারে সত্যিই মুক্তি। তাঁর বেঁচে থাকার মধ্যে তবু কিছু সোরগোল ছিল। গেলেন বড় নিঃশব্দে। গভীর রাতে বাপীর একবার খোঁজ করেছিলেন নাকি। একটু ছটফটও করেছিলেন। এমন প্রায়ই হয়। তাই শেষ ঘনিয়েছে কুমকুম ভাবেনি, কারণ অন্যদিনের মতোই খেয়েছেন। ঘুমিয়েছেন। রাত তিনটে নাগাদ মেয়েকে ডেকেছেন। ভোর হতে দেরি কত জিজ্ঞেস করেছেন। তখনো সাংঘাতিক কিছু কষ্ট হচ্ছে বলেননি। কেবল বলেছেন, ঘরে বাতাস এত কম কেন! বাবার মুখ দেখে আর শ্বাসকষ্ট দেখে কুমকুমের অবশ্য খারাপ লেগেছে। কিন্তু অত রাতে কি আর করবে সকালের অপেক্ষায় ছিল।

সকাল পাঁচটার মধ্যে শেষ।

বাপী কুমকুমের টেলিফোন পেয়েছে সকাল ছ'টায়। বাড়িঅলার ঘর থেকে ফোন করেছে, বলাই ধরেছিল। সাহেবের নিকট-কেউ অসুস্থ খুব, এ ক'দিনের মধ্যে বলাইয়ের জানা হয়ে গেছিল। কারণ, এই মেয়ে-গলার টেলিফোন সে আরো দিন দুই ধরেছে, আর একজনের শরীরের খবর সাহেবকে জানাতে হয়েছে। যেতে না পারলে সন্ধ্যার পর টেলিফোনে খবর দেবার কথা কুমকুমকে বাপীই বলে রেখেছিল।

দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি বার করে বাপী বেরিয়ে পড়ল। উল্টো দিকে দু মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে জিতকে তার মেস থেকে তুলে নিল। আজ পর্যন্ত নিজের চোখে তিন-তিনটে মৃত্যু দেখেছে। পিসি, বাবা, গায়ত্রী রাই। না, আরো দুটো দেখেছে। বনমায়ার আর রেশমার। এই এক ব্যাপারে বাপী নিজের ওপর এতটুকু আস্থা থাকে না। ভিতরে কিছু গোলমেলে ব্যাপার হতে থাকে।

...প্রসন্ন ঘুমে গা ছেড়ে শুয়ে আছে মানুষটা। চোখ দুটো আধ-বোজা। দুনিয়ার কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অভিযোগ রেখে গেছেন মনে হয় না। বাপী অপলক চোখে দেখছিল।

—শেষের ক'টা দিন বড় ভালো কাটিয়ে গেলাম রে। আর কত খেলাম।

বাপী চমকে এদিক-ওদিক তাকালো।...ক'দিন আগে মাস্টারমশাই বলেছিলেন কথাগুলো। মনে হল, এখনো তাই বলছেন।

কুমকুমের মুখে রাতের বৃত্তান্ত শুনল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টনটনে জ্ঞান ছিল।

কুমকুমের বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখ। কিন্তু কাঁদছে না। বাপী তাইতেই স্বস্তি বোধ করছে। এ-সময়ে কারো আছাড়ি-বিছাড়ি কান্না শুনলে বা দেখলে আরো দম বন্ধ হয়ে আসে। ভেবেছিল, সেই রকমই দেখবে। আশ্রয় বা অবলম্বন খোয়ানোর ত্রাসে শোক অনেক সময় বেশি সরব হয়ে ওঠে। কুমকুমের বেলায় সেরকমই হবার কথা। বাপী মেয়েটার

বিবেচনা আর সংযমের প্রশংসাই করল মনে মনে।

এক ঘন্টার মধ্যে জিত সৎকার সমিতির গাড়ি ভাড়া করে খাট আর ফুল নিয়ে হাজির। আর যা-কিছু দরকার শ্মশানে পাওয়া যাবে।

চিতা জ্বলে উঠতে জিতকে বাপী তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিল, কাজের মৌসুমে এক সঙ্গে দুজনেই আটকে থাকলে চলে না।

বিকেল তিনটের মধ্যে মর-দেহ ছাই। কুমকুমকে আগে নিজের গাড়িতে তার বাড়ি পৌঁছে দিল। ওপরতলার বাড়ি-অলা আর তার স্ত্রী সদয় হয়ে ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে ঘর দুটো ধোয়ার কাজ সেরে এসেছে। দাহ-অন্তে কুমকুম গঙ্গায় স্নান করেছে। জিতের কেনা চওড়া খয়রা-পেড়ে কোরা শাড়ি পরেছে। অত শোকের মধ্যেও মুখখানা কমনীয় লাগছিল। নিজের ফ্ল্যাটের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে বাপী তার কথাই ভাবছিল। আগে মাস্টারমশাইকে নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন তিনি নেই বলে সমস্যা।

ফ্ল্যাটে পা দিতেই বলাই জানালো, পার্টির ফোন পেয়ে জিত সাহেব বেরিয়ে গেছেন। আর, খানিক আগে জামাইবাবু টেলিফোন করেছিলেন।

বাপী অবাক।—জামাইবাবু কে ?

—আজ্ঞে...ও বাড়ির দিদিমণির বর, নন্দী সাহেবের ভগ্নীপতি...

এবারে বুঝল। বাপীর কেন যেন মনে হল মনোরমা নন্দীর পাঠানো লোককে রাখার ব্যাপারে আর একটু চিন্তা করা উচিত ছিল। জিজ্ঞাসা করল, দিদিমণি আর জামাইবাবুকে তুমি চেনো ?

খবর দিয়ে আবার কি ফ্যাসাদে পড়ে গেল বেচারা ভেবে পেল না। জামাইবাবু বা দিদিমণি বললে নিজের কদর হবে ভেবেছিল। সাহেবের চাউনি দেখে অন্যরকম লাগছে। এবারে সত্যি জবাব দিল। পিওনের চাকরির আশায় নন্দী সাহেবের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত, সেখানে ওদের দুই একদিন দেখেছে...ও চেনে, তাঁরা ওকে চেনেন না।

ফোনে কি বলল জিজ্ঞাসা করতে বলাই আর জামাইবাবু শব্দটা মুখে আনল না। জানালো, সাহেব নেই শুনে ভদ্রলোক জানতে চাইলেন কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন। বলাই বলেছে কখন ফিরবেন ঠিক নেই, সাহেবের একজন নিকটজন মারা যেতে খুব সকালে সেখানে গেছেন, পরে সেখান থেকে শ্মশানে চলে গেছেন। কে নিকটজন ভদ্রলোক তাও জিগ্যেস করেছিলেন কিন্তু ও আর কিছু জানে না বলে এর বেশি বলতে পারে নি।

শোকের খবর নিতে অসিত চ্যাটার্জী বিকেলে এসে হাজির হতে পারে ভেবেও বিরক্তি।

অবেলায় অনেকক্ষণ ধরে চান করল। তারপর কিছু খেয়ে বিছানায় গা ছেড়ে দিল। ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। মাস্টারমশায়ের অনেক স্মৃতি চোখে ভাসছে। সে-সব ঠেলে সরিয়ে মাথাটাকে খানিকক্ষণের জন্য শূন্য করে দেওয়ার চেষ্টা।

একটু বাদে তাতেও বাধা পড়ল। হলঘরে ফোন বেজে ওঠার শব্দ কানে এলো। পাঁচটার পরে পার্টির টেলিফোন আসে না বড়। জিত হতে পারে। দু-হাতে ফোনটা নিয়ে বলাই ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল। সাহেব শোবার ঘরে থাকলে তাই রীতি। হল-ঘর ছাড়া

অন্য দুটো ঘরেও ফোন রিসিভ করার প্লাগ পয়েন্ট করে নেওয়া হয়েছে এই জন্যেই। বলাইএর শঙ্কিত মুখ দেখে বাপীর মনে হল অসিত চ্যাটার্জীরই ফোন আবার। শোকের খবর নেবার আগ্রহে চলেই আসে নি সেটা মন্দের ভালো। আসতে চাইলে কোনো অজুহাতে বারণ করা যাবে। প্লাগ করে দিয়ে বলাই তক্ষুনি সরে গেল।

বাপী শুয়ে শুয়েই রিসিভার কানে লাগিয়ে ক্লান্ত-গম্ভীর সাড়া দিল, হ্যালো...

—আমি মিষ্টি।

শোয়া থেকে বাপী উঠে বসল একেবারে। ঠাণ্ডা স্পষ্ট দুটো কথা কানের ভিতর দিয়ে ভিতরের কোথাও নামতে থাকল। বাপী ফের সাড়া দিতে ভুলে গেল।

নীবরতার ফলে লাইন কেটে গেল ভেবে ওদিকের গলার স্বর সামান্য চড়ল। —হ্যালো।

—হ্যাঁ, বলো।

—তোমার কে আত্মীয় মারা গেলেন শুনলাম...কে?

জেনেও বাপী জিজ্ঞেস করল, কার কাছ থেকে শুনলে?

—অফিস থেকে টেলিফোন করেছিল। বলল, তোমার কোন আত্মীয় মারা গেছেন, তুমি শ্মশানে চলে গেছ।...তোমার তেমন নিকট-আত্মীয় কে আছেন আমি ভেবে পেলাম না।

—আত্মীয় নয়। খুব কাছের একজন।

চুপ একটু।—কে?

—তুমি চিনবে না।

—ও আচ্ছা, এই জন্যেই ফোন করছিলাম।

—কোথা থেকে?

—অফিস থেকে।

—আসবে?

—কোথায়? তোমার ওখানে?

এদিক থেকে নীরবতাটুকুই জবাব।

ওদিকেও থমকালো মনে হল একটু।—আজ না, তাছাড়া শ্মশানে গেছিলে শুনলাম। তুমি ক্লান্ত নিশ্চয় খুব।

বাপীর গলায় উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই। জবাব দিল, তুমি এলে ক্লান্তি বাড়বে না।

ওদিকে হাসির চেষ্টা। সুরও বিব্রত একটু।—আজ থাক।...তোমার আপনার কেউ মারা গেলেন খবর পেয়ে অফিস থেকে টেলিফোনে বলেছিল...বিকেলের দিকে আমাকে তুলে নিয়ে তোমার ওখানে যাবে। আমি রাজি হইনি। তাকে ফেলে একলা চলে গেছি শুনলে কি ভালো হবে?

মনে যাই থাক, বাপী তক্ষুনি ঠাণ্ডা জবাব দিল, ভালো হবে না।

ওদিকের পরের সুর আরো সহজ।—তোমারও তো আমার ওখানে আসার কথা ছিল একদিন—

—তোমার হাজব্যান্ড বলেছিলেন। সাহস হয়নি...

—কেন?

—তোমার রাগ কতটা পড়েছে বুঝতে পারিনি।

গলার স্বরে কৌতুকের আভাস।—আমি রাগ কখন করলাম যে পড়বে।

—মাসখানেক আগে যেদিন ঊর্মিলাকে নিয়ে গেছিলাম। তোমার হাবভাবে মনে হয়েছিল জীবনে আর আমার মুখ দেখতে চাও না।

হাসি।—আমি তোমার মতো অত রাগ পুষে বসে থাকি না। সেদিন কেন অত রাগ হয়েছিল তুমি ভালোই জানো।

—কথার খেলাপ করে তোমার হাজব্যান্ড যদি ড্রিংক করে বাড়ি ফেরে তার দায় আমার ঘাড়ে কেন?

চুপ একটু। তারপর কথা শোনা গেল।—যেতে দাও, আগেও তুমি কক্ষনো কিছু বুঝতে চাইতে না—এখনো না।

—আগে বলতে? বাপীর এখনো না বোঝার ভান।

আগে বলতে অনেক আগে। সেই বানারজুলি থাকতে। চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল।—ঊর্মিলা বাইরে চলে গেল?

—হ্যাঁ।

—আমার সম্পর্কে যাচ্ছেতাই ভেবেছে নিশ্চয়?

—না। আমাকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বানারজুলি চলে যেতে পরামর্শ দিয়ে গেছে।

—কেন?

—কোন দিন মার-ধর খেতে পারি ভেবেছে হয়তো।

হাসল।—তোমাকে হয়তো তার চিনতে এখনো কিছু বাকি আছে তাহলে। আচ্ছা, আজ ছাড়ি?

—হ্যাঁ।

ওদিকে টেলিফোন নামানোর শব্দ।

হাতের রিসিভারটা বাপী বার কয়েক নিজের গালে ঘষল। কানের ভেতর দিয়ে একটা স্পর্শ এতক্ষণ ধরে তাকে লোভাতুর করে তুলেছিল। ফোন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। মিষ্টি এই তার দ্বিতীয় জীবনের গোড়া থেকেই আপস চেয়ে আসছে। এখনো চায়। কেন চায়, বাপীর কাছে তা একটুও অস্পষ্ট নয়। মন থেকে ছেঁটে দিতে পারলে তাকে নিয়ে ও-মেয়ের এতটুকু মাথা ব্যথা থাকত না। পারছে না। বাপীর মন বলে দিচ্ছে পারা সম্ভব নয়।

বাপী শেকদার শেষ দেখবে। যদি আরো ছিন্ন-ভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত হতে হয়—হবে। তবু মিষ্টির আপোসের দোসর হতে রাজি নয়।

মাস্টারমশায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তির কাজ পুরোহিতকে বলে কয়ে বাপী এক মাসের জায়গায় তেরোদিনে টেনে নিয়ে এলো। আড়ম্বরের ধার দিয়েও যায়নি। তা বলে আচার-অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখেনি। কুমকুম কালীঘাটে কাজ করেছে। শেষ হতে, বেলা তিনটে গড়িয়েছে। বাপী এতক্ষণ থাকতে পারবে নিজেও ভাবে নি। সাহায্যের জন্য জিত উপস্থিত ছিল। তাকে রেখে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু কাজ শুরু হবার পর কেন যেন আর নড়তেই পারল না। জিতকে চলে যেতে বলল।

খুব ছেলেবেলায় বাপী পিসির কাজ করেছিল। একটু বড় হতে বাবার কাজ করেছে।

মনে রাখার মতো কোন ছাপই তখন পড়েনি। এখনো অভিভূত হয়েছে এমন নয়। পড়ার নেশায় আত্মার খবর বইয়ে যা একটু-আধটু পড়েছে। তা নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। আজ এই কাজ দেখতে ভালো লাগার স্বাদটুকু নতুন। গঙ্গায় স্নান করে চওড়া লালপেড়ে কোরা শাড়ি পরে কুমকুম কাজের আসনে বসেছে। একপিঠ ছড়ানো চুল। যজ্ঞের আগুনের আভা বার বার মুখে এসে পড়ছে। এই সময়টুকু অন্তত ওর সমস্ত অস্তিত্ব একাগ্র নিষ্ঠায় অবনত। ওর দিকে তাকিয়ে শুচিতা যে ঠিক কাকে বলে বাপী ভেবে পেল না। মৃতের আত্মা বলে কোথাও যদি কিছু থেকে থাকে, তার প্রসাদ থেকে এই কুমুকে অন্তত বঞ্চিত ভাবা যাচ্ছে না।

পরদিন থেকেই আবার বাস্তব চিন্তা। মেয়েটাকে কোন কাজে লাগানো যেতে পারে ভাবছে। একটা কাজ হাতে মজুত। বানারজুলি থেকে মদ চালান আনাব প্রস্তাব দিয়েছিল জিত্ মালাহোত্রা। এখনো সে-আশা একেবারে ছাড়ে নি। তার মতে ওখান থেকে এখানে এতে ঢের বেশি লাভ। আবুকে জানালেই ব্যবস্থা পাকা করতে আর সময় লাগবে না। রেশমা হলে বাপী একটুও ভাবত না। রেশমার থেকে এই মেয়ে ঢের বেশি নরকের আবর্তে ডুবেছে, বাপীর তবু দ্বিধা একটু। মাস্টারমশায়ের মেয়ে বলেই হয়তো। জীবন-যুদ্ধে এ-রকম ভাবপ্রবণতার ঠাঁই নেই ভেবেই কুমকুমের মধ্যে অনেক সময় রেশমাকে দেখতে চেয়েছে সে। তবু মন স্থির করে উঠতে পারছিল না।

পরের সন্ধ্যায় কুমকুম নিজেই তুলল কথাটা। প্রথমে বাড়ির কথা। জিজ্ঞাসা করল, মাসের বাকি কটা দিন ও এখানেই থাকতে পাবে, না তার আগেই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

বাপীর ভিতরে একটা তির্যক আঁচড় পড়ল তক্ষুনি। চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জিজ্ঞাসা করল, বাড়ি ছাড়ার কথা উঠছে কি করে, তুমি কোথায় যাবে?

কুমকুম অবাক একটু।—বিব্রতও। বলল, বাবার জন্য যা করেছ—করেছ, এখন আমার জন্যে এত ভাড়া গুনে এ বাড়ি তুমি আটকে রেখে দেবে নাকি?

ভেতরটা তেতে উঠছে বাপী নিজেই টের পাচ্ছে। জবাবও নীরস।—তোমার জন্য কিছু দান খয়রাত করার কথা আমি ভাবছি না। আমি জিগ্যেস করছি, বাড়ি ছাড়লে তুমি কি করবে?

পুরুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সামনের দরজায় একটি মাঝবয়সী রমণী মুখ বাড়ালো। পলার মা। পলা কুমকুমের ছোকরা চাকর। মাস্টারমশাই চোখ বুঁজতে কুমকুমের কাছে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। বাপীকে দেখে চট করে সরে গেল।

শুকনো গলায় কুমকুম বলল, পলার মা বলেছিল তাদের বস্তিতে একটা ঘর খালি আছে। অসহায় অথচ ঠাণ্ডা দু' চোখ বাপীর মুখের ওপর থমকালো একটু। আবার বলল, নিজের ভাবনা-চিন্তা আমি অনেক দিন ছেড়েছি বাপীদা। বাবাকে নিয়ে আমার যেটুকু সাধ ছিল তার ঢের বেশি তুমি মিটিয়ে দিয়েছ। আমার মতো একটা মেয়ের জন্য তুমি ভেবো না।

বাপী চেয়ে আছে। দেখছে...এই দু' আড়াই মাস ভালো থেকে ভালো খেয়ে ভালো পরে মেয়েটার শ্রী অনেক ফিরেছে। পুরুষের ক্ষুধার মুখে অনায়াসে নিজেকে এখন আগের থেকেও বেশি লোভনীয় করে তুলতে পারবে হয়তো। এই জোরেই বাড়ি ছাড়ার কথা বলছে কিনা বাপীর বোঝার চেষ্টা। গলা দিয়ে রাগ আর ব্যঙ্গ একসঙ্গে ঠিকরে

বেরুলো।—বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে যাবে আর আগের মতো রাস্তায় দাঁড়াবে ঠিক করেছ তাহলে?...নাকি পলার মা তোমাকে ভালো খদ্দের জোটানোর আশ্বাসও দিয়েছে?

কুমকুমের সমস্ত মুখ পলকে বিবর্ণ পাংশু। মাথা নীচু করে একটা চাবুকের যন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল তারপর।—বাপীদা, তুমি এত বড় যে বাবা চলে যাবার পর তোমার কাছে আসতেও আমার অস্বস্তি। তাই তোমার বোঝা আর না বাড়িয়ে নিজের অদৃষ্ট নিয়েই আবার ভেসে যাওয়ার কথা বলছিলাম—

তিক্ত রূঢ় গলায় বাপী বলে উঠল, আমি একটুও বড় না। অনেক কাজ আমাকে করতে হয় যা কেউ বড় বলবে না বা ভালো বলবে না! আমি কারো মতামতের ধার ধারি না। সে-রকম কোনো কাজে আমি তোমাকে টেনে নিতে পারি—তাতে আর কিছু না হোক, বাড়ি ছাড়তে হবে না বা রাস্তায়ও গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। রাজি আছ?

অবিশ্বাস্য আগ্রহে কুমকুম উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে বাঁচার আকুতি। মুখেও তাই বলল।—বাগডোগরার এয়ারপোর্টেও তুমি কাজ দেবার কথা বলেছিলে বাপীদা—এখনো যদি সে রাস্তা থাকে আমি তো বেঁচে যাই—আমি কোন মুখে আর তোমাকে সে-কথা বলব!

কৃত্রিমতা থাকলে বাপীর চোখে ধরা পড়ত। নেই। মেজাজ প্রসন্ন নয় তবু বলল, এ-ও জল-ভাত রাস্তা কিছু নয়, ঝুঁকি আছে বলেই এতেও কিছু বুদ্ধি-বিবেচনার দরকার আছে, সাহসের দরকার আছে।

আশায় উদগ্রীব মুখ কুমকুমের।—আমার বুদ্ধি-বিবেচনায় কুলোবে কিনা তুমিই ভালো জানো বাপীদা—আমার আর খোয়ানোর কিছু নেই, তাই ঝুঁকি নেবার মতো সাহসের অভাব অন্তত হবে না। তাছাড়া তুমি আছ, চোখ বোজার এক মাস আগেও বাবা কি বলে গেছে তুমি জান না বাপীদা—

কানে গরম কিছুর ছেঁকা লাগল। ওকে থামিয়ে বাপী চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো। তেমনি নীরস গম্ভীর গলায় বলল, শোনো, যিনি চলে গেছেন, এরপর তাঁকে টানলে আমার অসুবিধে, তোমারও। এখন থেকে তুমি শুধু তুমি—মনে থাকবে?

ধাক্কা সামলে নিয়ে কুমকুম মাথা নাড়ল। থাকবে।

—ঠিক আছে। আপাতত যেমন আছ—থাকো।

বাপী বেরিয়ে এলো। একটু বাদে গাড়ি দক্ষিণে ছুটল।...মেয়েটা দুঃখ পেল হয়তো, কিন্তু ও নিজে স্বস্তিবোধ করছে। মাস্টারমশাই মুছে গেছেন। যে আছে নতুন করে আর তার কিছু হারানোর নেই, খোয়ানোর নেই—এটুকুই সার কথা, সত্যি কথা। ও মেয়ে নিজেই এ-কথা বলেছে। বাপীও শুধু এই বাস্তবের ওপরেই নির্ভর করতে পারে। নইলে তার যেমন অসুবিধে, মেয়েটারও তেমন ক্ষতি।

এখন আর বিবেকের আঁচড়পাঁচড় কিছু নেই। হাল্কা লাগছে।

মাস্টারমশাই মারা যেতে কাজে একটু ঢিলে পড়েছিল। বাপী তাই আবার কটা দিন বেশ ব্যস্ত। একটু খুশি মেজাজেই সেদিন দক্ষিণদিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। এক নামী ওষুধের কারখানার কর্তাব্যক্তির সঙ্গে একটা বড় কনট্রাক্টের কথাবার্তা পাকা। তাদের পারচেজ অফিসারের মারফৎ চাহিদার লিস্টও হাতে এসে গেছে। বছরে আপাতত দেড়-

দু লাখ টাকার মাল তারা ওর কাছ থেকে নেবে আশা করা যায়।

আজ আর ঘোরাঘুরি না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার ইচ্ছে। ঊর্মিলা এর মধ্যে আরো দুটো চিঠি লিখেছে। একটারও জবাব দেওয়া হয়নি। এরপর হয়তো রাগ করে টেলিগ্রাম করে বসবে। আর কিছু না হোক, মেয়ে তার মায়ের মেজাজখানা পেয়েছে। ঘরে ফিরে প্রথম কাজ ওকে চিঠি লেখা।

গাড়ি ভবানীপুরের রাস্তায় পড়তে ভিতরটা উসখুস করে উঠল।...সামনের বাঁয়ের রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে দিলে সেই পঁচিশ-ঘর বাসিন্দার টালি এলাকা পাঁচ মিনিটের পথ। আজ নতুন নয়, এ-পথে এলেই গাড়িটা ওদিকে ঘোরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ব্রুকলিন রতন বণিক ওকে যতো টানে, নিজেরই অগোচরের নিষেধ ততো বড় হয়ে ওঠে।

পার্ক স্ট্রীটের মুখে পড়ার আগেই আজ আবার আর একজনের কথা মনে পড়ল। গৌরী বউদি।...সেদিন বাইরে একটা পরিবর্তন দেখে নি গৌরী বউদির, কিন্তু ভিতরে কিছু রকম-ফেরের আভাস পেয়েছিল। অথচ তফাতটা কি স্পষ্ট করে ধরতে পারে নি। ওকে বলেছিল, ইচ্ছে হলে যেও একদিন, বাচ্চু এখনো তার বাপীকাকাকে ভোলে নি।

গাড়িটা ঘুরিয়ে দিল। ওখানে যেতে নিষেধ নেই আর।

দোরগোড়ায় গাড়ি থামিয়ে বিকেলের টান-ধরা আলোয় পাশাপাশি দুটো বাড়িই দেখে নিল একবার। দুটোই জীর্ণ, মলিন। চুন-বালি খসা। অনেকদিন সংস্কার হয়নি বোঝা যায়। বাড়ি দেখে বিচার করলে সন্তু চৌধুরীর রোজগারে কিছু ভাঁটা পড়েছে মনে হবে। গাড়িতে বসেই কয়েকবার হর্ন বাজালো। কিন্তু দোতলার বারান্দায় কেউ এসে দাঁড়াল না। অগত্যা নেমে দোতলার কলিংবেল টিপল।

একটু বাদে যে এসে দরজা খুলল, সে বাচ্চু কোনো সন্দেহ নেই। বছর তের বয়েস। আগের থেকে অনেক লম্বা হয়েছে। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ময়লা হাফশার্ট। শুকনো রোগাটে মূর্তি।

ঝকঝকে গাড়িটা দেখে আর ফিটফাট এক সাহেব মানুষ দেখে ছেলেটা ভেবাচাকা খেয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। চেনা আদল অথচ ঠিক ধরতে পারছে না কে।

বাপী বলল, তোর বাপীকাকুকে চিনতেই পারলি না রে!

শুকনো মুখে আচমকা খুশির তরঙ্গ। বলা মাত্র চিনেছে। কিন্তু সেদিনের সেই বাপীকাকু আজ এমন গাড়ি-অলা মস্ত সাহেব হয়ে গেছে দেখে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারছে না। তাড়াতাড়ি বলল, চিনেছি, মা বলেছিল তুমি কলকাতায় আছ, একদিন আসতেও পারো—

তার হাতে ধরে বাপী হাসিমুখে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, অনেক বড় হয়ে গেছিস—কোন ক্লাস হল এখন?

—ক্লাস সেভেন।

—ফাস্ট টাস্ট হচ্ছিস তো?

দোতলায় উঠে হাত ছেড়ে দিতে ছেলেটা বিব্রত মুখে বলল, এবার ফেল করতে করতে পাশ করে গেছি—

—সে কি রে! কেন, দেখবার কেউ নেই বুঝি?

আসার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকাকুকে এমন অপ্রিয় খবরটা দিতে হল বলে ছেলেটার

বিমর্ষ মুখ। মাথা নাড়ল, নেই।

দোতলায় এখনো আগের মতো ডাইনিং টেবিল পাতা। কিন্তু যত্নের অভাবে টেবিল চেয়ার এমন কি ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত শ্রীহীন। সামনের বসার ঘরের পর্দাও বিবর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া।

বাচ্চু তাকে বসার ঘরে এনে বসালো। সোফা-সেটিগুলোরও কাল ঘনিয়েছে বোঝা যায়।

—তোর মা বাড়ি নেই?

ছেলেটা ভেবাচেকা খেয়ে গেল একটু। তারপর বলল, মা তো এ বাড়িতে থাকে না—মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, তুমি জানো না?

একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে বাপীর সহজ হবার চেষ্টা। কিন্তু ছেলেটার কথার জবাবে মাথাও নাড়তে পারল না। মা কবে থেকে এ বাড়িতে থাকে না তা-ও জিজ্ঞাসা করতে পারল না।

বাচ্চু এবারে নিজেই মাথা খাটিয়ে বলল, সন্তুকাকু অনেক দূরে বাড়ি করেছে তো-—মা সেইখানে থাকে।...তোমাকে এখন কি সুন্দর লাগছে দেখতে বাপী কাকু—আগের থেকে ঢের ভালো। ছেলেটা কি বলবে বা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।—ভিখুদা আছে বাপীকাকু, তোমাকে এক পেয়ালা চা দিতে বলি?

বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। বাপী তাড়াতাড়ি সায় দিল, বল--

ছুটে চলে গেল। ফিরেও এলো তক্ষুনি। অপ্রতিভ মুখ।—এই যাঃ! ভিখুদাও তো বাড়ি নেই বাপীকাকু...আমি করে আনি?

বাপী তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোকে করতে হবে না, বোস—আমি চা খুব কম খাই।

ঘরটা অন্ধকার লাগছিল। বাচ্চু সুইচটা টিপে দিয়ে মুখোমুখি বসল।

—তোর বাবার অফিস থেকে ফিরতে রাত হয় এখনো?

বাচ্চু আবার অবাক।—বাবার অফিস কি, কত বছর আগেই তো চাকরি চলে গেছে। বাবা এখন দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরোয় আর অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যের সময় আসে। খানিকক্ষণের মধ্যে এসে যাবে—

এবারের ধাক্কাটা ততো বড়ো না হলেও বড়ই। মণিদার চাকরি কেন চলে গেছে আঁচ করা কঠিন নয়। তার ওখানে বাপীর চাকরির প্রসঙ্গে গৌরী বউদি বাধা দিয়ে বলেছিল, তোমার ওখানে ঢুকে পরের ছেলে হাতকড়া পরুক শেষে। হাতকড়া না পরলেও মণিদা নিজের চাকরিই রাখতে পারল না। ছেলেটার এই স্বাস্থ্য বা এমন চেহারা কেন বাপী এখন বুঝতে পারছে। ..ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গৌরী বউদি .সেদিন বলেছিল, তার হুকুম করার দিন গেছে। সে-কথার অর্থও এখনও জলের মত স্পষ্ট।

সাগ্রহে বাচ্চু জিজ্ঞাসা করল, আজ তুমি এখানে থাকবে বাপীকাকা? বলে ফেলেই অপ্রস্তুত একটু। প্রস্তাবটা কত অসম্ভব নিজেই বুঝছে যেন।

ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে বাপীর শুধু মায়া হচ্ছে না। যন্ত্রণাও হচ্ছে। বাপীকাকুঅন্ত প্রাণ ছিল একদিন, একসঙ্গে খাওয়া-শোয়া পড়া হুটোপুটি করার সব স্মৃতিই হয়তো মনে আছে। বলল, থাকতে পারছি না, তবে তোর সঙ্গে এর পর থেকে মাঝে মাঝে দেখা হবে। আমি কলকাতায় আছি তোর মা বলল?

--হ্যাঁ।

—মায়ের সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল, এখানেই?

—হ্যাঁ, মা তো মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসে, আর মাসের প্রথমে আমার জন্য বাবার হাতে টাকা দিয়ে যায়...এবারে টাকা দিতে এসে বলেছিল। তার পরেই সন্ত্রস্ত। —বাবা এলে তাকে কিন্তু এসব কিছু বোলো না বাপীকাকু, শুনলেই আমাকে মারবে।

বুকের তলায় আরো একটা আঁচড়। হাত ধরে কাছে টেনে নিল।—বাবা তোকে আজকাল মারে নাকি?

—খুব। ভয়ে ভয়ে দরজার দিকটা দেখে নিল একবার। তারপর গোপন কিছু ফাঁস করার মতো করে বলল, মা যখনই আসে, বাবাকে যাচ্ছেতাই করে বকাবকি করে তো, বাবা তখন খুব রেগে থাকে—তারপর একটু কিছু হলেই আমাকে মারে। পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হয় বলেও মার খেতে হয়—তুমি আমাকে আবার আগের মতো পড়াবে বাপীকাকু?

ঘরে যেন বাতাস কম।—দেখি, কি ব্যবস্থা করা যায়। এই বাপের কাছেই শুধু ছেলেটা কিছু আদর-যত্ন আর প্রশ্রয় পেত। দুটো চারটা বছর বাদে এই ছেলে ওই বাপকে কি চোখে দেখবে বা কতটুকু ভয় পাবে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। বাচ্চু সচকিত তক্ষুনি। ভয়ে ভয়ে বলল, বাবা আসছে। বাপীকাকুকে দেখে বাবা খুশি হবে কিনা সেই আশঙ্কা।

মণিদা ঘরে ঢুকল। রাস্তার আলোয় দোরগোড়ায় ঝকঝকে গাড়ি দেখেছে, তখনো তার ঘরে কেউ এসেছে ভাবেনি হয়তো। এই বেশে বাপীকে দেখে হকচকিয়ে গেল।

—বাপী যে...কখন এলি?

—এই তো কিছুক্ষণ। তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এবার যাব।

—বোস বোস, চা-টা দিয়েছে?

বাচ্চু বলে উঠল, ভিখুও বাড়ি নেই বাবা, কে দেবে?

মণিদার শরীরের বাড়তি মেদ ঝরে গেছে। জামাকাপড়ের বিলাস সুখের দিনেও খুব ছিল না, কিন্তু এখন দুরবস্থা বোঝা যায়! গালে তিনদিনের না কামানো খোঁচা খোচা দাড়ি।

ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলল, চায়ের দরকার নেই, বোসো।

মণিদা পরিশ্রান্ত বেশ। ঘামছে। বসে একটু সহজ হবার চেষ্টা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিড়ি বার করে ধরালো। আগে সর্বদা চুরুট মুখে থাকত। বলল, তুই কলকাতায় আছিস খবর পেয়েছি, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিস শুনলাম...নিচের ওই গাড়িটা তোর নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। উৎসুক একটু।—কিসের ব্যবসা করছিস?

—অনেক রকমের। বাচ্চুকে বলল, সাতটা বাজল, তুই বই-টই নিয়ে বোসগে যা--আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি।

বাচ্চু তক্ষুনি চলে গেল। বাপী মণিদার দিকে ফিরল।—তোমার খবর তেমন ভালো নয় বোধ হয়?

—নাঃ। চাঁচাছোলা প্রশ্ন শুনে সহজ হবার চেষ্টা ছেড়ে মণিদা বলল, একটা গণ্ডগোলে পড়ে চাকরিটা চলে গেল, তোর বউদিও অবুঝের মতো বিগড়ে গেল...। হাতের বিড়িটা

বাইরে ছুঁড়ে ফেলে এবার অসহায়ের মতো বলে ফেলল, কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস?

—পারি বাপীর গলার স্বর চড়া নয়, কিন্তু কঠিন।—তোমার চাকরি গেল বউদি বিগড়ে গেল তার শাস্তি ছেলেটা পাচ্ছে কেন? ওর এই হাল কেন? এই চেহারা কেন? ওর গায়ে হাত তুলতে তোমার লজ্জা করে না?

মণিদা আবার ভেবাচাকা খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

গায়ে হাত তোলার কথাটা বলে ফেলার দরুনও ছেলেটার দুর্ভোগ হতে পারে মনে হতে বাপী আরো তেতে উঠল।—শোনো, বাচ্চুর জন্য আমি ভালো মাস্টার ঠিক করে দেব, ওর লেখা-পড়া খাওয়া-দাওয়ার সব ভার আমি নিলাম। তোমার পোষালে আলাদা রোজগারের ব্যবস্থাও আমি করে দেব। কেবল, ওই ছেলেটার ওপর তোমাদের কারো শাসন আমি বরদাস্ত করব না, এটুকু মনে রাখতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে সামনে ধরল।—যদি রাজি থাকো তো কাল-পরশুর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা কোরো—আর বাচ্চুকে নিয়ে যেও।

মণিদা কার্ড হাতে নিল। এ সেই হাবা-মুখ ভাইটাই কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

বাপী নেমে এলো।

খিচড়নো মেজাজ নিয়েই ফ্ল্যাটে ফিরল। বাইরে দরজা খোলা দেখে আরো বিরক্ত। এসেছে কেউ। শুধু জিত হলে দরজা খোলা থাকার কথা নয়।

ঘরে পা দিয়েই দু' চোখ কপালে। খোশ মেজাজে বসে গল্প করছে তিনটি মানুষ। জিত মালহোত্রা। তার পাশে অসিত চ্যাটার্জি।

ওদের দুজনের সামনের সোফায় আবু রব্বানী।

ষোল

যত দোস্তিই থাক, মালিকের সম্মান আবুর কাছে কম নয়। তার হুট করে এসে হাজির হওয়াটা পছন্দ হবে কিনা সেই সংশয়ও আছে। হাসি মুখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। জিতও।

আবুর পরনে ধবধবে সাদা চোস্ত, গায়ে জালি গেঞ্জির ওপর রঙিন ফুলকাটা সাদা পাঞ্জাবি, তার ওপর গাঢ় খয়েরি রঙের চকচকে মেরজাই। হঠাৎ মনে হবে ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো নবাবজাদা উঠে এসেছে। ওকে দেখে বাপী কত খুশি মুখ দেখে বোঝা যাবে না। বানারজুলি টানছিল। আবু রব্বানী নিজেই তার চোখে অনেকখানি বানারজুলি। তবু ওকে আরো একটু বিব্রত করার কৌতুকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘটা করে দেখে নিয়ে চোখে চোখ রাখল।

আবুর ফাঁপরে-পড়া মুখ' বলে উঠল, ঘাট হয়েছে জনাব, মালের সঙ্গে চালান হয়ে এসে গেছি, কালই আবার ট্রাকে চেপে ফেরত চলে যাব।

বাপীর হাবভাব দেখে আর আবুর কথা শুনে অসিত চ্যাটার্জি আর জিতও মজা পাচ্ছে। বাপীর ঠোঁটে হাসি একটু এসেই গেল। এগিয়ে এসে দু'হাত আবুর দুই কাঁধে তুলে দিল। তারপর সামান্য চাপ দিয়ে আবার তাকে সোফায় বসিয়ে দিল। সামনের

সোফায় নিজেও বসল।—কখন এসেছ?

—দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল। তোমার ট্রাক গুদোমে এসে দাঁড়াতেই জিত্ সাহেব সব ছেড়ে আগে আমাকে খালাস করে সোজা তোমার এখানে এনে তুলল। তুমি নেই দেখে গাঁটের পয়সা খরচা করে অনেক খাওয়ালে।

আবুকে জিতের একটু খাতির করারই কথা। একে মুরুব্বী মানুষ এখন, তার ওপর ওর সুপারিশের জোরেই সুদিনের মুখ দেখছে।

হাসিমুখে বাপী অসিত চ্যাটার্জির দিকে ফিরল।—অসিতদা কতক্ষণ?

—অনেকক্ষণ। সময়ে এসে গেছিলাম তাই আমিও চপ কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ থেকে বাদ পড়িনি—তুমি শুধু ফসকালে।

বাপী মনে মনে জিতের বুদ্ধির তারিফ করল। দু একদিন দেখে এই লোককেও খাতিরের পাত্র ধরে নিয়েছে। আবুর দিকে ফিরল। ঠোঁটের হাসি চোখে ঠিকরলো। অসিতদার সঙ্গে গল্প তো করছিলে দেখলাম—কি, বুঝতে পেরেছ?

আবু খুশিতে ডগমগ।—আমি কি এত বোকা বাপীভাই, তুমি ওঁর বিবিসাহেবার ছেলেবেলার বন্ধু শুনেই ধরে ফেলেছি। এতক্ষণ তো বহিনজির ছেলেবেলার গল্পই বলছিলাম জামাই সাহেবকে—একবার তুমি যে তাকে পেল্লায় ময়াল সাপের গেরাস থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তাও জামাইসাহেব আমার কাছ থেকে এই প্রথম শুনলেন। ওঁকে দেখে আমাদের সেই ফুটফুটে ছোট্ট বহিনজি এখন কেমনটি হয়েছেন খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আবু পদস্থ হয়েছে বটে। আগের দিনে পড়ে থাকলে মেমসায়েবের মেয়েকে বহিনজি না বলে মিসি সায়েবটায়েব কিছু বলত। বাপী সাদা মুখ করে সায় দিল, দেখে এসো—অসিতদাকে বলো।

হৃষ্টমুখে আবু জবাব দিল, বলতে হবে না, আমি অলরেডি ইনভাইট!

বাপী হেসে ফেলল, আবার ইংরেজি কেন!

অসিত চ্যাটার্জি আর জিতও হাসছে। আবু মাথা চুলকে বলল, গড়বড় হয়ে গেল বুঝি—কি করব, তোমাদের কলকাতার বাতাসের দোষ, জিভে সুড়সুড় করে ইংরেজি বেরিয়ে আসে।

চাকরিতে বহাল হবার পর জিত্ মালহোত্রা এই প্রথম বোধ হয় মালিকের হালকা মেজাজের হদিস পেল। সকলকে ছেড়ে বাপীর পলকা গম্ভীর মনোযোগটা হঠাৎ জিতের দিকে।—মিস্টার চ্যাটার্জি মানে অসিতদার সঙ্গে তোমার কত দিনের আলাপ?

যে-রকম চেয়ে আছে আর যে ভাবে বলল, যেন গলদ কিছু ধরা পড়েছে। অপ্রতিভ জিত্ জবাব দিল, আগে কয়েকবার এখানে দেখেছি...আলাপ আজই।

বাপী আরো গম্ভীর।—তুমি তো বুদ্ধির ঢেঁকি দেখি, মিস্টার চ্যাটার্জি একজন আর-এ, চাটারড অ্যাকাউন্টেন্টের সগোত্র, আর এক মস্ত তেল কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট-—এ খবর রাখো?

কি বলতে চায় কেউই বুঝছে না। আবু দোস্তকে দেখছে। অসিত চ্যাটার্জির বদনের সলজ্জ আভায় সোনালি চশমা চিকচিক করছে। ফ্যাসাদ শুধু বেচারা জিতের। খবর রাখে না যখন মাথা নাড়া ছাড়া আর উপায় কি।

বাপীর পালিশ করা মুখ।—তিন মাস ধরে খাতাপত্রের হাল কি করে রেখেছ তুমিই জানো। সব ঠিকঠাক করে দেবার ব্যাপারে সাহায্য করার মতো এমন আর একজন কলকাতার শহর চষে পাঁবে?

আবুর চোখে কৌতুক। অসিত চ্যাটার্জির ফর্সা মুখ খুশিতে টসটসে। এতক্ষণে মনিবের ইশারার হদিশ পেয়ে জিতের অমায়িক বদন। পারলে এক্ষুনি গুণী মানুষটির তোয়াজ তোষামোদ শুরু করে দেয়। হালকা মেজাজে বাপী অসিত চ্যাটার্জিকে সতর্ক করল।—জিত এরপর তোমাকে ছেঁকে ধরবে অসিতদা, ওর তোয়াজে ভুলো না, হাত দিয়ে ওর জল গলে না—সাহায্য চাইলেই পঁচিশ পারসেন্ট চড়িয়ে ফী হাঁকবে।

বাড়তি রোজগারের লোভ আছেই। চড়িয়ে ফী হাঁকলে শেষ পর্যন্ত সেটা কার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে ভেবে না পেলেও অসিত চ্যাটার্জির চোখে জিতের কদর বেড়ে গেল। ফলে অন্তরঙ্গ হাসি মুখ তার দিকে ফিরল।—ফী-এর জন্য কি আছে, দরকার হলেই বলবেন। আপিসের দশটা-পাঁচটা ছাড়া অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস।

চতুর জিতের দুকুল বজায় রাখার চেষ্টা। সপ্রতিভ মুখে সে মাথা নাড়ল, থ্যাংকস।

আবুর আসাটা বাপী একটা বড় উপলক্ষ করে তুলল। রাতের খাওয়া-দাওয়ার আগে আজও অসিত চ্যাটার্জিকে ছাড়ল না। বলাই তার রোশন বাবুর্চির তৎপরতায় আয়োজনে কার্পণ্য নেই। খাওয়ার আনন্দেব মধ্যে বাপী বলল, এক জিনিসের অভাবে তোমার সবটাই নিরামিষ লাগছে বোধ হয় অসিতদা, কিন্তু আজ তুমি কথার খেলাপ করলে না দেখে মিলু নিশ্চয় খুশি হবে।

অভাব কোন জিনিসটার বুঝতে আবু বা জিতেরও অসুবিধে হল না। লজ্জা পেয়ে অসিত চ্যাটার্জি বলল, কি যে বলো, আমি কি রোজই ওসব খাই নাকি—

সঙ্গে সঙ্গে আবুর আফসোস।—জামাই সাহেবের চলে জানলে আমি তো গোটা কয়েক বাছাই মাল নিয়ে আসতে পারতাম।

সোনালি চশমার ওধারে দু'চোখ উৎসুক।—ওদিকে ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যায় বুঝি?

বাপী জবাব দিল, নেপাল ভূটানের ও-সব জিনিস এদিকে তো দেখতেই পাও না তোমরা। আবুর দিকে ফিরল, হবে'খন, অসিতদা তো পালিয়ে যাচ্ছে না—।

খাওয়ার পর্ব শেষ হতে জিতকে বলল, দু'জনেই তো সাউথে যাবে, একটা ট্যাকসি ধরে অসিতদাকে নামিয়ে দিয়ে যাও।

তারা চলে যেতে আবু সোফায় বসে মৌজ করে একটা বিড়ি ধরাবার ফাঁকে দোস্ত-এর মুখখানা দেখে নিচ্ছে। চোখাচোখি হতে বাপীর ঠোঁটে হাসি ছড়ালো। ঊর্মিলা দূরে চলে গেছে। কাছের মানুষ বলতে এখন শুধু এই একজন।

ভণিতা ছেড়ে আবুও সোজাসুজি চড়াও হল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শুধু জামাই-আদর নয়, বেশ একটা টোপও ফেললে মনে হল?

বাপী হাসছে।—কেন, খাতা-পত্র ঠিক রাখার দরকার নেই?

আবু মাথা নাড়ল।—আগের মতো তোমার ভেতর-বার এক লাগছে না বাপীভাই। —ভদ্রলোক সত্যি অত গুণের মানুষ নাকি?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে বাপী সায় দিল, হ্যাঁ, তার অনেক গুণ।

আবু তবু অপেক্ষা করল একটু। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আগের দিন আর নেই, নইলে তোমাকে ধরে ধরে গোটাকয়েক ঝাঁকানি দিলে ভিতরে যা আছে গলগল করে বেরিয়ে আসত। যাক, তার বিবিসাহেবের খবর কি?

—ভালোই। এয়ার অফিসে ভালো চাকরি করছে।

—তোমার সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?

—ক্বচিৎ কখনো। আপাতত তার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গেই বেশি খাতির।

আবু টান হয়ে বসল।—আপাতত?

বাপীর মগজে সূক্ষ্ম কিছু বুনুনির কাজ চলেছে। আবু রব্বানী হঠাৎ এভাবে চলে আসাটাও সামনে পা ফেলে এগোনোর মতো লাগছে। নিরীহ মুখে মাথা নেড়ে সায় দিল।

আবুরও ধৈর্য বাড়ছে। জিগ্যেস করল, এদের বিয়ে হয়েছে ক'দ্দিন?

—বছর আড়াই প্রায়।

কৌতূহলে একটা চোখ আগের মতোই ছোট হয়ে এলো।—বাচ্চা-কাচ্চা?

এই সাদাসাপটা প্রশ্নের তাৎপর্য বেআবরু গোছের ঠেকল বাপীর কানে। মাথা নাড়ল। নেই। আবুর জিভ আরো বেসামাল হবার আগে প্রসঙ্গ বাতিল। তোমার খবর কি বলো, হুট করে চলে এলে, দুলারি ছাড়ল?

রসের ঝাঁপি বন্ধ হয়ে গেল আবুও বুঝল। দোস্ত-এর পেট থেকে আপাতত আব কোনো কথা টেনে বার করা যাবে না। জবাব দিল, তোমার কাছে আসছি শুনে পারলে নিজেও ছুটে আসে।...আর, ছাড়াছাড়ির কি আছে, যে বোঝা কাঁধে চাপিয়েছ মাসের মধ্যে আট-দশ দিন বাইরেই কাটাতে হয়। কিন্তু তুমি কথা রাখলে যা-হোক—

—কি কথা?

—আসার সময় কত রকম বুঝিয়ে এসেছিল—হাওয়াই জাহাজে এক-দেড় ঘণ্টার পথ, দরকার হলে ফি হপ্তায় একবার করে চলে যাবে—তিন মাসেও একবার তোমার ফুরসৎ হল না?

বাপী বলল, দরকার হলে যেতাম। বেশ তো সামলাচ্ছ।

জবাবে গড়গড় করে আবু অনেক কথা বলে গেল। এবার থেকে দরকার যাতে হয় ফিরে গিয়েই সেই ব্যবস্থা করছে। তিন মাসের মধ্যে একবারও আসার নাম নেই দেখে দুলারিও সাত-পাঁচ ভেবেছে। ও জানে কলকাতা পুরী-পরীর দেশ—কেউ গেলে তাকে ভুলিয়ে রাখে। দোস্ত কোনো জ্যান্ত পুরীর খপ্পরে পড়েছে কিনা সেই চিন্তাও করেছে। আবার আবুর আসার ব্যাপারেও খুঁত-খুঁত করেছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে বাপীভাই নারাজ হবে কিনা চিন্তা। আবু বলেছে, নারাজ হয় হবে, কিন্তু দোস্তকে না দেখে আর সে থাকতে পারছে না?

বাপীর ভালো লাগছে। ঠিক এ-সময় ওকেই সব থেকে বেশি দরকার ছিল। কিন্তু মনে যা আছে এক্ষুনি ফাঁস করার তাড়া নেই। দিন-কতক ওকে ধরে রাখতে হবে। ওখানকার ব্যবসার খবর শুনল। লেখাপড়ায় দিগগজ বলে এখন একটু আফসোস আবুর। সে কারণে রণজিৎ চালিহার মতো একটু হম্বি-তম্বির চালে চলতে হয়। অসুবিধে খুব হচ্ছে না। কেবল বাপীভাই পাশে না থাকলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, এই যা। বাপী পাহাড়ের

বাংলোর বুড়ো ঝগড়ু, বাদশা ড্রাইভার আর কোয়েলার খবরও নিয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ের বাংলো থেকে ঝগড়ু একদিন নাচতে নাচতে নেমে এসেছিল। সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে মেমসায়েবের মেয়ের চিঠি পেয়েছে। সেই চিঠি ওদের দেখাতে এসেছিল। তার ঊর্মি লিখেছে, ওদের কোনো চিন্তা নেই, নতুন মালিক সকলকে ভালো রাখবে। মালিকের পাত্তা নেই দেখে ওরা একটু ভাবনায় পড়েছিল।

—কেন ওরা টাকা-কড়ি ঠিক মতো পাচ্ছে না?

—তা পাচ্ছে, কিন্তু বিয়ে-সাদি করে মালিকের কলকাতাতেই থেকে যাওয়ার মতলব কিনা সে-চিন্তা তো হতেই পারে।

বানারজুলির কথাপ্রসঙ্গে আবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ধামন ওঝার ছেলে সেই হারমাকে মনে আছে তো তোমার?

—থাকবে না কেন, রেশমার হারমা...

—হারমার রেশমা বলো, বেঁচে থাকতে রেশমা ওকে পাত্তাই দেয়নি।

—হারমার কি হয়েছে?

—মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। তুমি থাকতেই তো দিন-রাত রেশমার ঘর আগলে পড়ে থাকত, কেউ মুখ দেখতে পেত না। এখন আবার দিন ছেড়ে রাতেও বাইরে টো-টো করে বেড়ায়। ওর এখন মাথায় ঢুকেছে, চালিহা সাহেবের জন্য রেশমা সাপের ছোবল খেয়ে মরেনি—ও জান দিয়েছে তোমার জন্যে। কেউ বিশ্বাস করে না, দুলারিও ওকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ওর ওই এক কথা—

বাপী সচকিত একটু।—সে কি? আমার ওপর খুব রাগ নাকি ওর?

—রাগ না...দুঃখু। বলে, তোমাদের উঁচু-মাথা বাপী সাহেব কেবল দিল কাড়তেই জানে, দিলের কদর জানে না।

রাতটা এরপর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটল বাপীর। আধ-ঘুমে মাথার মধ্যে একটা হিজিবিজি ব্যাপার চলতে থাকল। পাহাড়ী জঙ্গল...বুনো হাতি...রেশমা পাহাড়ের বাংলো...নেশার বুঁদ ঝগড়ু...রেশমা। বাপী...রেশমা...রণজিৎ চালিহা টাকা মদ—রেশমা। হারমা—রেশমা—হারমা রেশমা—

সকালে উঠে বাপী নিজের ওপরে বিরক্ত। কি দোষ করেছে? কোন দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়েছে? এত দিন পরেও এ-রকম টান পড়ে কেন? হারমা যা ভাবে ভাবুক। যা বলে বলুক। তাতে ওর মগজে দাগ পড়ে কেন?

সকালটা আবুর সঙ্গে গল্প-গুজবের পর কলকাতার ব্যবসার আলোচনায় কেটে গেল। সব দেখেশুনে আবু দোস্ত-এর তারিফ করল, তুমি যাতে হাত দাও তাই সোনা দেখি বাপীভাই!

প্রশস্তির জবাবে আঙুল তুলে বাপী জিত্‌কে দেখিয়ে দিল। বলল, জিত্ সঙ্গে থাকলে তার আর মার নেই, ওরও কেরামতি কম নয়। সঙ্গে সঙ্গে ছদ্ম আশঙ্কা। মাইনে বাড়ানোর চাপ দিলো বলে।

আবু অখুশি নয়। জিত্‌কে জোটানোর বাহাদুরি সবটাই তার। চিঠিতে দোস্ত এই লোকের প্রশংসা আগেও করেছে। তার ভাগ্য শিগগীরই আরো কিছু ফিরবে ধরে নিয়ে

ভারিক্কি স্বরে মন্তব্য করল, চাপ দিলে আমি চোখ বুজে স্যাংশন করে দেব। বলে ফেলে সভয়ে বাপীর দিকে তাকালো।—স্যাংশনই তো বলে—না কি?

জিত্ হাসছে আর টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছে। গায়ত্রী রাইয়ের কাছে মাসকয়েকের চাকরির কালে এই আবু রব্বানী তাকেও সেলাম ঠুকত। যার অনুগ্রহে লোকটার আজ এই কপাল, তার দাক্ষিণ্য থেকে সে-ও বঞ্চিত হবে না, তিন মাসে সেই বিশ্বাস আরো বেড়েছে।

আলতো করে বাপী বলল, জিত্ তোমার। অন্য স্যাংশনের আশায় অনেক দিন ধৈর্য ধরে বসে আছে—

মালিকের মনে কি আছে জিত্ নিজেও ধরতে পারল না। ঠাট্টার ব্যাপার কিছু কিনা না বুঝে আরো উৎসুক। দুজনারই কৌতূহল জিইয়ে রেখে বাপী জিগ্যেস করল, ডাটাবাবুর ক্লাবের সঙ্গে তোমার লাল জলের কারবার কেমন চলছে এখন?

—ফার্স্টো কেলাস। ক্লাব তো আছেই, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও আগের থেকে বেড়েছে--রইস খদ্দেররা এসে অর্ডার পেশ করে যায়। কেন বলো তো?

—জিত্‌কে তুমি কলকাতার বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলে দিয়েছিলে?

আবু মাথা চুলকে সায় দিল। বলল, আমার মনে হয়েছিল ওই জলের কারবার এখানে ভালো চলতে পারে।

—বানারজুলি থেকেও ঢের ভালো চলতে পারে। জিত খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে কলকাতার মতো বাজার আর হয় না। আমি গা করছি না বলে ওর মেজাজ খারাপ।

আবু জিতের মুখখানা দেখে নিল। এ ব্যাপারে তার আগ্রহ সত্যি কম মনে হল না। দোস্ত ঠাট্টা করছে না বা বাড়িয়ে বলছে না বুঝে তাকেই জিগ্যেস করল, তুমি তাহলে গা করছ না কেন?

বাপী প্রায় নিরাসক্ত।—এসে গেছ যখন নিজেই বুঝেশুনে নাও। ভালো বুঝলে শুরু করা যাবে।

দোস্তকে কাগজপত্রে মন দিতে দেখে আবু একটু বাদে বসার হলঘরে চলে এলো। দোস্ত দিনকতক থেকে যেতে বলেছে। সে সানন্দে রাজি। তাই ঘরে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। দুলারি লিখতে পড়তে জানে না সে-জন্য আবুর এই প্রথম আপসোস একটু। নইলে দোস্ত-এর খবরাখবর দিয়ে বেশ রসিয়ে একখানা চিঠি লেখা যেত। কিন্তু পড়াতে হবে বড় ছেলেটাকে দিয়ে। সে ব্যাটা এখনই লায়েক হয়ে উঠেছে। ছোট সাইকেলে চেপে বানারহাটের স্কুলে যায়। চিঠিতে বেচাল কথা থাকলে ফিরে গিয়ে দুলারির মুখঝামটা খেতে হবে।

মনিবের হুকুমে জিত ড্রাইভারসুদ্ধু একটা ভালো প্রাইভেট গাড়ির সন্ধানে বেরুলো। তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা ভাড়া খাটবে। আবুর জন্য দরকার। টাকা যা লাগে লাগবে। মালিককে বাদ দিলে ব্যবসায় আবু রব্বানীর মর্যাদা এখন সকলের ওপরে। সঙ্গে গাড়ি থাকলে এখানকার পার্টির কাছে সেই মর্যাদা বজায় থাকবে। কলকাতার ঠাট আলাদা। পার্টির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানোর জন্য মালিক নিজে তার জেনারেল ম্যানেজারকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কি করে। সে কাজটা জিত্ মালহোত্রা করলে বরং কোম্পানীর চটক বাড়বে। আর, এই কাজের ফাঁকে আবুর ইচ্ছেমতো কলকাতা দেখাও হবে।

মালিকের দরাজ মনের খবর জিত্ ভালোই রাখে। আজ আরো খুশি কারণ, আবু সাহেবের জন্য গাড়ি ঠিক করতে বলে মনিব তাকেও চটপট ড্রাইভিং শিখে নিতে বলেছে। বানারজুলির মোটরগাড়ি এখন আবু সাহেবের জিম্মায়। ওর ড্রাইভিং শেখা হলে জিপটা কলকাতায় নিয়ে আসবে হয়তো।

বড় হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে পছন্দসই প্রাইভেট গাড়ি জোটানো শক্ত নয়। জিত একেবারে গাড়িতে চেপেই ফিরল। গাড়ি কি জন্যে আর কার জন্যে শুনে আবু হাঁ। বলল, তোমার কাণ্ড দেখে আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি বাপী ভাই।

হাসি চেপে বাপী বলল, তুমি কম লোক? ঘাবড়াবার কি আছে—

বিকেলে ওদের ফেরার অপেক্ষায় বসেছিল। আসলে ভাবছিল কিছু। মগজে একটা ছক তৈরী হচ্ছিল। আর থেকে থেকে কুমকুমের মুখ সামনে এগিয়ে আসছিল। রেশমার মতো করে না হোক' অবস্থা-বিপাকে এই কুমকুমও সর্বনাশের দড়ির ওপর কম হেসে খেলে নেচে বেড়ায়নি।

কলিং বেল বাজতে বলাই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। আবু বা জিত নয়। মণিদা। তার কথা বাপীর এর মধ্যে মনে পড়ে নি। মণিদার শুকনো ক্লান্ত মুখ। দায়ে ঠেকে আসার অস্বস্তিও অস্পষ্ট নয়।

বোসো মণিদা। বাচ্চু এলো না?

—আমি ইয়ে বাড়ি থেকে আসছি না, পরে একদিন আনব'খন।

গদী আঁটা সোফায় বসে ফ্ল্যাটের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। এই মানুষকে দেখে বাপীর আজ আর রাগ হচ্ছে না। বরং মায়া হচ্ছে। এই একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক। অসময়ে দু'হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু খেতে ভালোবাসতো, নইলে বরাবর সাদাসিধে চাল-চলনের মানুষ ছিল। স্ত্রীর প্রতি অন্ধ আনুগত্যের ফলে আজ এই হাল।

বলাইকে হুকুম করে আগে তার ভালো জলখাবারের ব্যবস্থা করল। তারপর সোজা কাজের কথা। বাচ্চুর অ্যানুয়েল পরীক্ষা কবে?

—দু'আড়াই মাসের মধ্যেই বোধ হয়...

বাপী ভাবল একটু। তারপর বলল, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওর জন্যে একজন ভালো মাস্টার ঠিক করে পাঠাচ্ছি।...কিন্তু আমার মতে তারপর ছেলেটাকে এখানে আর রাখা ঠিক হবে না, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। ওর মা...বিশেষ করে সন্তু চৌধুরীর কাছ থেকে ওকে তফাতে সরানো দরকার।

মণিদার অসহায় পাংশু মুখ।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, বাইরের খুব ভালো কোন ইনস্টিটিউশনে রেখে ওকে পড়ানো যায়? খরচ যা-ই লাগুক তোমাকে ভাবতে হবে না—ওর গার্জেন হিসেবে আমার নাম থাকবে।

মণিদার চোখে-মুখে সংকটের দরিয়া পার হবার আশা। নরেন্দ্রপুর আর দেওঘরের বিদ্যাপীঠের কথা বলল। সামর্থ্য থাকলে ছেলেকে নিজেই ওরকম কোনো জায়গায় পাঠাতো। ছেলেটার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে নিজেই স্বীকার করল। যন্ত্রণাও চাপা থাকল না

আর। তুই যদি ছেলেটার ভার নিস আমি আর ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখব না। এত ঠকেছি...আর সহ্য হচ্ছে না।

বাপীর জিজ্ঞাসা করার লোভ, গৌরী বউদির যে নালিশ শুনে ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলা হয়েছিল সেটা এখন আর মণিদা বিশ্বাস করে কি না। লোভ সামলালো। বলল, এই দুটো মাস কাউকে আর কিছু বলার দরকার নেই—যা করার তুমি চুপচাপ করে যাও।

উঠে ভিতরের ঘরে গিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। দশখানা একশ টাকার নোট মণিদার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল—এই হাজারটা টাকা তোমার কাছে রাখো এখন। তোমাকে কিন্তু-কিন্তু করতে হবে না, এও বাচ্চুর জন্যে। মুখোমুখি বসল আবার।—এবারে তোমার কাজের কথা বলো, কাজ করবে তো?

দু'চোখ ছলছল মণিদার। ভিতর থেকে আরো কিছু যন্ত্রণা ঠেলে বেরুলো। বলল, কাস্টমসের পাকা চাকরি গেছে...কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না।

যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষটার ভেতর দেখতে পাচ্ছে বাপী। তবু এ ব্যাপারে স্পষ্ট কথাই বলল।—কোম্পানীর লোক দরকার, তুমি কোম্পানীর কাজ করবে, সেখানে বাপী বলে কেউ নেই এটুকু মনে রাখলেই আমার দিক থেকে আর কোনো অসুবিধে হবে না।

জিতের সঙ্গে আবু ঘরে ঢুকল। বাপী ওদের সঙ্গে মণিদার পরিচয় করিয়ে দিল। তার কোম্পানীতে যোগ দেবার কথাও জানালো। মণিদাকে বলল, যতদিন না এদিকে সুবিধে মতো অফিস ঘর মেলে তাকে রোজ উল্টোডাঙার গোডাউনে হাজিরা দিতে হবে। জিত চেষ্টা করছে, অফিস-ঘর পেতে দেরি হবে না। কাজ আপাতত মাল চালানের খাতাপত্র ঠিক রাখা আর পার্টির কাছে চিঠি লেখা বা তাদের চিঠির জবাব দেওয়া। জিতই সব দেখিয়ে শুনিয়ে আর বুঝিয়ে দেবে। বানারজুলি থেকে আবু রব্বানী তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবে।

একটু বাদে মণিদা আর জিত চলে গেল। বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আবু বলল, আমাকে বাঁশ দিয়ে ঠেলে আর কত ওপরে তুলবে—একটু আগে তোমার হোমরাচোমরা পার্টিদের খাতিরের চোটে হাঁপ ধরে গেছল, এসেই আবার এই—

বাপী হাসছে—দেখাশুনা হল সব?

—এখনো সব নয় শুনছি, জিত শাসিয়ে রেখেছে কাল রবিবার, পরশু মাঝারি আর ছোট পার্টির সঙ্গে মোলাকাত হবে।

—জলের ব্যবসার খোঁজ নিয়েছ?

—নিশ্চয়। জিত ঠিকই বলেছে, টুইংকিল টুইংকিল ইস্টার—ঘাবড়ে যেও না, বাইরে বেরিয়ে একটাও ইংরেজি বলিনি।

চায়ের পর্বের পরেও দোস্ত গা ছেড়ে বসে আছে দেখে আবু উসখুস করতে লাগল। শেষে বলেই ফেলল, ইয়ে—কোথাও বেরুবে-টেরুবে না?

—কোথায়?

আবুর মুখে দুষ্টু হাসি।—কোথায় আমি তার কি জানি। ভাবলাম আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ—এলেই বেরুবে।

ওর ইচ্ছে বাপী খুব ভালো করেই বুঝছে। অসিত চ্যাটার্জির আপ্যায়নে সাড়া দেবার

জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওর চোখে সেই দশ বছরের মেয়েই লেগে আছে। এখন চৌদ্দটা বছর জুড়বার তাগিদ।

বাপী উঠল। বলল, চলো—

ভাদ্র-শেষের ছোট বেলা। আলো-ঝলমল রাস্তা। দোস্ত এখন ভারী চুপচাপ গাড়ি চালাচ্ছে দেখেও আবু মজা পাচ্ছে। জামাই সাহেবের সামনে টোপ ফেলার ব্যাপারটা মনের তলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। দোস্তের মতলব এখনো আঁচ করতে পারেনি।

সামনে চোখ রেখে বাপী জিজ্ঞাসা করল, বানারহাট স্কুলের মাস্টারমশাইদের মনে আছে তোমার?

হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন আবু ভেবে পেল না।—যারা মারধর করত তাদের মনে আছে। কেন বলো তো?

—আমাদের ড্রইং করাতো ললিত ভড়—তাকে মনে আছে?

—পেটুক ভড়! তাকে খুব মনে আছে। ব্ল্যাক বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে এঁকে কত রকমের খানা খাইয়েছে!

—এখানেও ফুটপাথে খড়ি দিয়ে এঁকে রাস্তার মানুষকে অনেক খানা খাইয়েছে—সকলে পাগল ভাবত।

—আ-হা...তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে বুঝি?

—হয়েছিল। খেতে না পেয়ে আধমরা হয়ে গেছল। শেষের দু'মাস একটু শান্তি পেয়ে গেছে। কিছুদিন আগে মারা গেল।

আবু চুপ খানিকক্ষণ। তারপরে বলে উঠল, যাচ্ছি এক জায়গায় আনন্দ করতে, দিলে মনটা খারাপ করে—

বাপী শুধু হাসল একটু।

দোরগোড়ায় তার গাড়ি থামার আগেই কুমকুম ভিতর থেকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সঙ্গে অচেনা লোক দেখে থমকালো একটু।

বাপী হাসিমুখে বলল, কটা দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। ভালো আছ তো?

কুমকুম মাথা নাড়ল। বাপীদার সঙ্গে এসেছে তাই দু'হাত জুড়ে অচেনা সঙ্গের লোকটাকে নমস্কার জানিয়ে তাদের ভিতরের ঘরে বসালো। আর হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে কেমন। সামনে যাকে দেখছে সে বেশ সুশ্রী বটে, কিন্তু জঙ্গলের বড় সাহেবের দশ বছরের যে ফুটফুটে মেয়েটাকে মনে আছে, পরের চৌদ্দ বছরে তার চেহারা এই দাঁড়াতে পারে কল্পনায় আসে না।

নিরীহ মুখে দোস্ত তার দিকে তাকাতে আরো খটকা লাগল। জিগ্যেস করল, বহিনজি তো...?

—তুমি কোন বহিনজির কথা ভাবছ? একটু আগে যে মাস্টারমশায়ের কথা বললাম তার মেয়ে কুমকুম।

আবু হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু বোকা নয়, চট করে সামলে নিল। দরাজ হেসে বলল, উনিও বহিনজিই তো হলেন তাহলে। কুমুর দিকে ফিরল, মাস্টারজির হাতে আমিও বছর কতক ঠেঙানি খেয়েছি।

কুমু হাসিমুখেই নরম প্রতিবাদ করল, বাবা ভয় দেখাতেন, মারতেন না কাউকে।

বাপী সাদা মুখে কাজের কথায় চলে এলো। আবুর পরিচয় দিল। বলল, ও-ই সর্বেসর্বা এখন, তোমার যা কিছু বোঝাপড়া সব এরপর ওর সঙ্গে আর জিতের সঙ্গে —আমাকে আর বিশেষ পাচ্ছ না।...আমাকে যতটা বিশ্বাস করো একেও ততটাই বিশ্বাস করতে পারো।

কুমুর মুখে কথা নেই চুপচাপ চেয়ে রইল।

দোস্তের মাথায় কি যে আছে আবু ভেবে পাচ্ছে না। তাই আগবাড়িয়ে সেও কিছু বলছে না।

বাপী জিজ্ঞাসা করল, টাকা কেমন আছে?

—আছে...।

পার্স থেকে এক গোছা টাকা বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।—এই পাঁচশ টাকা রাখো তোমার কাছে।

কুমকুম ইতস্তত করতে আবার বলল, আবুর সামনে লজ্জা করার কিছু নেই, ও আমার থেকে কড়া মুরুব্বী, এখন থেকে যা পাবে সব তোমার পাওনা থেকে কড়াক্রান্তি কেটে নেবে। ধরো।

কুমকুম হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। সম্মান বাঁচিয়ে সাহায্য করা হল আবু এইটুকুই ধরে নিল।

দশ মিনিটের মধ্যে আবার গাড়িতে পাশাপাশি দুজনে। আবু বলল, অ্যাস মানে গাধা আবার ডংকি মানেও গাধা—আমি কোনটা?

বাপী হাসছে।—কি হল?

প্রথম দিন তুমি আমার ঘরে রেশমার বদলে দুলারিকে দেখে হাঁ হয়ে গেছলে...তার বদলা নিলে মনে হচ্ছে।...তোমার সব ইন্টারেস্ট এখন তাহলে এই বহিনজি?

সব না, কিছুটা।

আবুর খুশি ধরে না।—এও দেখতে শুনতে তো ভালোই। ঠাণ্ডা মেয়ে হলেও বেশ বুদ্ধি ধরে মনে হল—ঠিক না?

—ঠিক। কিন্তু তুমি তো চিনতেই পারলে না।

—আমি আগে দেখলাম কোথায় যে চিনব!

—দেখেছ। ভেবে দেখো...।

আবু বিমূঢ় খানিক। এরকম ভুল তার হবার কথা নয়।—কোথায় দেখেছি?

—বানারজুলিতে। আমি তখন ডাটাবাবুর ক্লাবের সেই কোণের ঘরে থাকতাম। চা-বাগানের এক অফিসারের বন্ধু মেয়েছেলে নিয়ে এসেছিল বলে আমাকে কোণের ঘরটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল—সেজন্যে তুমি ডাটাবাবুর ওপর খেপে গেছলে, আর সেই মোটা কালো লোকটাকে দেখে বলেছিলে, এই চেহারা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে রঙ্গরস করার জন্যে কোণের ঘর চাই—মনে পড়ছে?

মনে পড়ছে বটে। কিন্তু তার ফলে আবু চারগুণ অবাক।—এই বহিনজি সে নাকি! সেই লোকটার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

সামনে চোখ রেখে বাপী নির্লিপ্ত মুখে গাড়ি চালাচ্ছে। জবাব দিল, শুধু সেই লোক কেন, তারপর আরো কত লোকের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

আবু আধাআধি ঘুরে বসেছে দোস্তের দিকে। জল-ভাত কথাগুলোও ঠিক-ঠাক মাথায় ঢুকছে না। এখানে একে কোথায় পেলে?

—রাতের রাস্তায়! কারো জন্যে অপেক্ষা করছিল।

এও হেঁয়ালির মতো লাগল।—রাতের রাস্তায়...কার জন্যে অপেক্ষা করছিল?

—পকেটে পয়সা আছে এমন যে কোনো রসিক পুরুষের জন্য। হাতে কিছু পেলে তবে বস্তিঘরের রুগ্ন বাপের জন্য খাবার আসবে।

আবুর মুখে কথা নেই আর। স্তম্ভিতের মতো বসে রইল। তার দিকে না তাকিয়ে বাপী মোলায়েম করে বলল, তুমি যে ইন্টারেস্টের কথা ভাবছিলে ঠিক সে ইন্টারেস্ট যে নয় আমার এখন বুঝতে পারছ?

ধাক্কাখানা এমনি যে আবু তার পরেও নির্বাক। একটু বাদে একই সুরে বাপী আবার মন্তব্য করল, তবু মেয়েটাকে আমি খারাপ ভাবি না।

রবিবারের বিকেল পর্যন্ত বাপীর ফ্ল্যাট ছেড়ে নড়ার নাম নেই। আড্ডা দিয়ে আর গড়িমসি করে কাটিয়ে দিল। অথচ সকাল থেকেই আবু আশা করছে এই ছুটির দিনে দোস্ত ওকে প্রত্যাশার জায়গাটিতে নিয়ে যাবে। শেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বলল, বেরুবে না কি সমস্ত দিনটা ঘরেই কাটিয়ে দেবে?

বাপী সাদামাটা মুখ করে চেয়ে রইল একটু। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বলল, চলো—

কিন্তু এবারও আবুর অপ্রস্তুত হবার কপাল। অভ্যর্থনায় যারা এগিয়ে এলো তাদের একজন সুদীপ নন্দী আর একজন মনোরমা নন্দী। আবু দেখেই চিনেছে। তারা চিনতে পারল না। খাতিরের ছেলের সঙ্গে এসেছে তাই খাতির করেই বসালো। তার আগে আবুর আদাবের ঘটা দেখে মা-ছেলে দুজনেই অবাক একটু।

হাসিমুখে বাপী বলল, মাসিমার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, দীপুদা তুমিও ওকে চিনতে পারলে না?

সুদীপ বলল, চেনা-চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক...

—বানারজুলির জঙ্গলের সেই অপদেবতা আবু রব্বানী। পাথর ছুঁড়ে কত বুনো মুরগি আর খরগোশ মেরে খাইয়েছে, মনে নেই?

বলা মাত্র ছেলে ছেড়ে মায়েরও মনে পড়েছে। মনোরমা দেবী বলে উঠলেন, ওকে তো জঙ্গলের বীটম্যান করা হয়েছিল...।

বাপীর সরব হাসি। সেই লোক আর নেই মাসিমা। আবু এখন আমাদের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার, দু'গণ্ডা বি-এ, এম-এ পাশ ওর আণ্ডারে চাকরি করছে—নিজের বাড়ি নিজের গাড়ি।

লজ্জা পেয়ে আবু বলল, ছাড়ো তো, মাসিমা আর দীপুদার কাছে আমিও তোমার মতো একটা ঘরের ছেলে—

বাপীর মজা লাগছে। মওকা বুঝে সেয়ানা আবুও নিজেকে ঘরের ছেলে করে ফেলল। বানারজুলির সেই দাপটের কালে মহিলাকে মেমসায়েব আর দীপুদাকে ছোট সাহেব না বললে গর্দান যাবার ভয় ছিল।

বাইরে অন্তত মা ছেলে দুজনেরই হাসি-মুখ আর খুশি-মুখ। কিন্তু আসলে ভেবে পাচ্ছে না, একটা বুনো জংলি ছেলেরও ভাগ্য এমন ছপ্পর ফুঁড়ে ফেরে কি করে। টাকার ঘরে রূপের বাসা। সেই জংলি ছেলেরও রূপ ফিরে গেছে বটে।

আদর-আপ্যায়নে কার্পণ্য নেই । বাপী মোটে আসে না বলে মনোরমা দেবী বার কয়েক অনুযোগ করলেন। শিগগীরই আবার আসবে কথা দিয়ে ঘন্টাখানেক বাদে আবুকে নিয়ে বাপী উঠল। ছেলের পিছনে মা-ও নিচের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এক ধাপ নেমে বাপী ঘুরে দাঁড়াল।—মিষ্টির খবর কি মাসিমা, অনেক দিন দেখি না...

মহিলার অপ্রসন্ন মুখ। গলা খাটো করে জবাব দিলেন, কে জানে মাথায় কি ঢুকেছে, এখানেও বেশি আসে-টাসে না।

গাড়ি তাঁদের চোখের আড়াল হতে আবু ঝাঁঝালো চোখে দোস্তের দিকে ফিরল। বাপী বলল, আর পাঁচ-সাত মিনিট মুখ বুজে অপেক্ষা করো, নিয়ে যাচ্ছি—

আবু ধৈর্য ধরে বসে রইল বটে, কিন্তু তার ভিতরে অনেক প্রশ্ন কিলবিল করছে এখন। বড় রাস্তা ছেড়ে কয়েকটা ছোট রাস্তা ঘুরে গাড়িটা মিনিট সাতেকের মধ্যেই থামল এক জায়গায়। আঙুল তুলে বাপী বলল, ঠিক চারটে বাড়ির পরে ওই বাড়িটা—নেমে যাও।

আবু আকাশ থেকে পড়ল।—আর তুমি?

—আমি না। একটা ট্যাক্সি ধরে ফিরে এসো, তাহলে আর রাস্তা ভুল হবে না।

—তাহলে আমারও গিয়ে কাজ নেই। ফেরো!

বাপী গম্ভীর।—দেখো তোমাকে আমি বোকা ভাবি না। তোমার একা যাওয়া দরকার, একাই যাবে। নামো।

আবছা অন্ধকারে দোস্তের মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। দরজা খুলে আবু নামল। সামনের বাঁক ঘুরে বাপী তখনি গাড়িসুদ্ধু চোখের আড়ালে।

বড় রাস্তায় পড়ে নিজের মনেই হাসছে।

রাত নটার পরে আবু ফিরল। গোল গোল দু'চোখ বাপীর মুখের ওপর তুলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

হাসি চেপে বাপী জিগ্যেস করল, হল?

আবু মাথা নাড়ল। মুখেও জবাব দিল, হল।

কিন্তু রাতের খাওয়া সারা হবার আগে দোস্তের আর কোনো কিছুতে উৎসাহ দেখা গেল না। আবু সঙ্গ দেবার জন্য বসল শুধু। পর পর দু জায়গায় খাওয়া হয়েছে, খিদে নেই। সে দোস্তের খাওয়া দেখছে অর্থাৎ ভালো করে মুখখানা দেখছে।

খাওয়ার পর রাতের আড্ডা বাপীর শোবার ঘরে বসেই হয়। আবুর গুরু-গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে এবারে বাপী হেসে ফেলল।—কেমন দেখলে?

—এত ভালো ভাবিনি, তোমার জন্যে বুকের ভেতর টনটন করছিল।

বাপী হাসছে।—আর অসিত চ্যাটার্জির জন্যে?

—খুব আদর যত্ন করেছে, তবু তাকে ধরে আছাড় মারতে ইচ্ছে করেছিল।

আলতো করে বাপী মন্তব্য করল, সে সুযোগ পাবে'খন।

আবু রব্বানী নড়েচড়ে বসল। বাপী জিগ্যেস করল, মিষ্টি তোমাকে দেখে খুশি হল?

—খুব।

—কি বলল?

—বানারজুলির পুরনো কথা, বনমায়ার কথা—আমার সে-সময়ের সাহসের কথা শোনালো জামাই সাহেবকে। পরিবার আর ছেলেপুলের কথা জিগ্যেস করল, এখানে মেমসায়েবের মেয়ে উর্মিলা আর তার বরের সঙ্গে আলাপের খবরও বলল—কেবল তোমাকে মোটে চেনেই না বোঝা গেল।

বাপী হেসে ফেলল।—বোঝা গেল?

—খুব। এই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে মিষ্টি বহিনজির ভিতরেও কিছু গড়বড় ব্যাপার আছে টের পেলাম।

বাপীর বাইরে নিরীহ মুখ। ভিতরে হাসছে। উর্মিলাও এই গোছের কিছু বলে গেছল। ওই মিষ্টিকে দেখে সব চুকে-বুকে গেছে বলে তারও মনে হয়নি। বাপী প্রস্তুত হচ্ছে। রণে বা প্রণয়ে নীতির বালাই থাকতে নেই।

আবুর একটা চোখ এবারে ছোট একটু। জেরায় জেরবার করার ইচ্ছে।—মিষ্টি বহিনজির মেমসায়েব মা এখন তাহলে তোমার মাসিমা?

হাবা মুখ করে বাপী মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ওই মা আর ছেলের কাছে তোমার এখন খুব খাতির কদর?

আবারও মাথা নাড়ল।—খুব।

—আসার সময় মেমসায়েব মেয়ের সম্পর্কে অমন কথা বলল কেন—তেমন বনছে না?

—জামাইয়ের সঙ্গে বনছে না।

এটা শোবার ঘর ভুলে আবু বিড়ি ধরালো একটা।—বনছে না কেন?

—জামাই মদ খায়, রেস খেলে, জুয়ার নেশায় বউয়ের টাকা চুরি করে, ঝগড়া করে।

—সত্যি?

বাপী মাথা নাড়ল। সত্যি।

—মেমসায়েবের তাহলে কি ইচ্ছে?

বাপী নির্লিপ্ত জবাব দিল, তার আর তার ছেলের ধারণা কাগজ-কলমের বিয়ে, ছিঁড়ে ফেললেই ফুরিয়ে যায়—অমন লোকের সঙ্গে ঘর করার কোন মানে হয় না।

আবু লাফিয়ে উঠল।—বিসমিল্লা। তুমি তাহলে গুলি মেরে দিচ্ছ না কেন?

ঠেস দেবার মতো করে বাপী ফিরে বলল, দুলারিং বেলায় তুমি অন্ধ ছট্টু মিঞাকে গুলি মেরে দিতে পেরেছিলে?

আবু লজ্জা পেল।—লোকটা মরার জন্য ধুঁকছিল তাই মায়া পড়ে গেছল। তোমারও কি এই মরদের ওপর মায়া পড়েছে?

—আমার না। তোমার বহিনজির পড়েছে। তার বিশ্বাস, জামাই সাহেব যতোই নেশা করুক জুয়া খেলুক টাকা সরাক বা ঝগড়া করুক—লোকটার ভালবাসায় কোনো ভেজাল নেই—তোমার জামাই সাহেবের এটাই নাকি আসল পুঁজি—এই পুঁজির জোর মিথ্যে হলে কাউকে কিছু বলতে হত না, তোমার বহিনজি নিজেই তাকে ছেঁটে দিত।

ব্যাপারখানা তবু মাথায় ভালো ঢুকছে না আবুর। জিজ্ঞাসা করল, তাহলে?

—তাহলে ওই লোকের ভালোবাসার সবটাই যে ভেজাল আর তোমার বহিনজির বিশ্বাস সবটাই যে ভুল এটুকু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারলেই ফুরিয়ে যায়।

—কি করে? আবু স্পষ্ট করে ধরতে ছুঁতে পারছে না বলে দ্বিগুণ উন্মুখ।

সোনা মুখ করে বাপী জবাব দিল, সেটা খুব আর কঠিন কি।...তুমি জিত্‌কে একটু তালিম দিয়ে যাও, বেচারা অসিত চ্যাটার্জিকে যেন ভালো করে খাতির-যত্ন করে, রেসের নেশায় বউয়ের আলমারি থেকে টাকা সরাতে হবে এ কি কথা! আর ভদ্রলোক রংদার মানুষ, ভালো জিনিস খুব পছন্দ—মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা তো তোমরা শুরুই করে দিচ্ছ—ও জিনিসেরও অভাব হবার কথা নয়...

আবু লাফিয়ে উঠল। কুমকুমকে নিয়ে বোতলের ব্যবসা!

—সেদিন গিয়ে বলে এলাম কি? অমন বিশ্বস্ত আর ভালো মেয়ে কোথায় পাবে। ...তাছাড়া মেয়েটার অভিজ্ঞতারও শেষ নেই।

নিরীহ মুখের দুই ঠোঁটে হাসিটুকু আরো স্পষ্ট হয়ে ঝুলছে। আবুর গোলগোল চোখ তার মুখের ওপর চড়াও হয়েই আছে। আর দুর্বোধ্য কিছু নেই। অস্পষ্ট নেই।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাছে এসে আধখানা ঝুঁকে সেলাম ঠুকল একটা। বলল, ঠিক আছে, এর পরের সব ভার তুমি এই বান্দার ওপর ছেড়ে দিতে পারো।

পরের দুটো দিন আবু জিতকে নিয়ে ব্যস্ত। তার পরের দিন বানারজুলি ফেরার তাড়া। বাপীকে বলল, জিত সাহেব আর কুমকুম বহিনকে তিন-চার দিনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আমি তো খুব ঘন ঘন আসতে পারব না, ওদেরও দরকার মতো একটু ছোটাছুটি করতে হবে। নিয়ে যাই, দেখে-শুনে বুঝে আসুক। কুমকুম বহিন তোমার বাংলোয় কোয়েলার কাছে থাকবে'খন, আর জিত সাহেবের তো বউ ছেলে সেখানেই।...তোমার অসুবিধে হবে?

পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে! বাপী মাথা নাড়ল। অসুবিধে হবে না।

নিরাসক্ত মুখ আবুরও।—তুমি ঠিকই বলেছিলে বাপীভাই, কুমু বহিন ভারী ভালো মেয়ে। নতুন করে এখন কি ব্যবসায় নামছি শুনেও একটু ঘাবড়ালো না। বলল, বাপীদার ব্যবস্থার ওপর আর কোন কথা নেই।...ওর বাবা নাকি চোখ বোজার খানিক আগেও বলে গেছে আমাদের স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই...দরকার হলে ওই বাপীর জন্য যদি প্রাণ দিতে পারিস তাহলে সব স্বর্গ।

আবু হাসছে অল্প অল্প। বাপী নির্লিপ্ত! ভেতরটা খরখরে হয়ে উঠছে। কিন্তু বাপী তা হতে দেবে না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে।

সতেরো

পরের টানা প্রায় দেড় বছরের নাটকে বাপী তরফদারের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। সে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে। শান্ত, নিরাসক্ত। কাজের সময় কাজে ডুবে থাকে। অবসর সময় বই পড়ে। পড়ার অভ্যেস আগেও ছিল। এই দেড় বছরে সেটা অনেক বেড়ে গেছে। যাওয়া-আসার পথে এক-এক সময় গাড়ি থামিয়ে স্টল থেকে গাদা গাদা

ইংরেজি-বাংলা বই কিনে ফেলে। এই কেনার ব্যাপারেও বাছ-বিচার নেই খুব। গল্প-উপন্যাস আর ভালো লাগে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখার মতো যে-সব বইয়ে জীবনের হাজারো অদৃশ্য খুঁটিনাটির সন্ধান মেলে সে-সব বেশি পছন্দ। ভালো লাগলে পাতা উল্টে যায়, না লাগলে ফেলে দেয়।

কমলার প্রসাদ অঝোরেই ঝরছে। এক বছরের ওপর হয়ে গেল কাছাকাছির অভিজাত এলাকাতে বাড়ি কেনা হয়েছে। টাকা কোনো সমস্যা না হলে যেমন বাড়ি কেনা যায় সেই রকমই। এক তলায় অফিস, দোতলায় বাস। মণিদাকে বাপী এ অফিসে এনে বসায়নি। সে উল্টোডাঙার গোডাউনের অফিসেই বসছে। বাচ্চুকে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে মণিদা গোডাউনের পাশে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে। ছেলে সরানোর ব্যাপারটা মণিদার মনেই ছিল। আগে বাচ্চুর কাছেও ফাঁস করেনি। কারণ, সন্তু চৌধুরী তখন পাঁচ ছ'মাসের জন্য গৌরী বউদিকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড সফরের তোড়জোড় করছে। রওনা হবার আগের ক'দিন তারা বাচ্চুকে দেখতে ঘন ঘন পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছিল। বাচ্চুর মাসের বরাদ্দ টাকা সন্তু চৌধুরীর কোনো বিশ্বস্ত জন প্রতি মাসের গোড়ায় মণিদাকে দিয়ে যাবার কথা। মণিদা সে টাকা সই করে রাখবে। ভরসা করে তারা একেবারে সব টাকা তার হাতে তুলে দিতে পারেনি। মণিদা ব্যবস্থার কথা শুনেছে। কোনো মন্তব্য করেনি।

পাঁচ ছ'মাস বাদে ফিরে এসে থাকলেও তারা বাচ্চু বা মণিদার হদিস পায়নি। পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে অন্য অপরিচিত ভাড়াটে দেখেছে। আর সন্তু চৌধুরীর টাকাও মণিদা ছোঁয়নি দেখে হয়তো ধরে নিয়েছে, তাদের আক্কেল দেবার জন্যেই লোকটা বাড়ি ঘর ছেড়ে আর সব বেচে দিয়ে ছেলে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। বাপীর বাড়ি কেনার খবরও তাদের জানার কারণ নেই। বাচ্চুর দু-তিন মাস অন্তর ছুটিছাটায় আসে এখানে। বাপী কাকুর কাছে থাকে। সে ক'টা দিন খুব আনন্দ ছেলেটার। বাবার কাছেও গিয়ে থাকতে চায় না। ছেলেকে দেখার জন্য মণিদাকেই আসতে হয়। বাপী আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। এখানে এসে ছেলেটা মায়ের নামও মুখে আনে না। এটা বাপের নিষেধ কিনা জানে না। হস্টেলে ফিরে যাবার সময় হলে ওর মন খারাপ হয় বুঝতে পারে। কিন্তু যেতে আপত্তি করে না। আবার কবে ছুটি ক্যালেণ্ডারে দেখে রাখে। যাবার আগে জিগ্যেস করে, জিত্ কাকুকে পাঠিয়ে তখন আবার আমাকে নিয়ে আসবে তো?

ছেলেটাকে অনায়াসে নিজের কাছেই এনে রাখা যেত। কিন্তু বাপী নিজেই এখন মাসের মধ্যে টানা পনের দিন কলকাতায় থাকে না। কলকাতার ব্যবসা মোটামুটি বাঁধা ছকের দিকে গড়াতে সে আবার বাইরের ঘাঁটিগুলো তদারকে মন দিয়েছে। আবু উত্তর বাংলা নিয়ে পড়ে আছে। বিহার আর মধ্যপ্রদেশের রিজিয়ন্যাল ম্যানেজারদের কাজকর্ম এখন আবার বাপী নিজে দেখছে। মাসে দেড় মাসে একবার করে বানারজুলিতেও যেতে হচ্ছে। কিন্তু দেড় বছরের এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোন রকম উত্তেজনা বা উদ্দীপনার ব্যাপার নেই। প্রাচুর্য থেকে কোনো কৃত্রিম আনন্দ ছেঁকে তোলার আগ্রহ নেই। চারদিকে খাল বিল নদী-নালা সমুদ্র, তৃষ্ণায় ছাতি-ফাটা চাতক তবু স্বাতী নক্ষত্রের ফটিক জল ছাড়া অন্য জল স্পর্শ করে না। সামাজিক যোগাযোগও কমে আসছে বাপীর। বাড়ি কেনার পর মিষ্টিকে আর অসিত চ্যাটার্জিকে একবার মাত্র নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছিল। তাদের

ঘরের শান্তিতে আবার চিড় খেয়েছে তখনই বোঝা গেছল। সেই কারণে দীপুদার যাতায়াত আগের থেকে বেড়েছে। তার মায়ের টেলিফোন আসাও। কিন্তু আগ্রহ সত্ত্বেও বাপীকে তারা তেমন নাগালের মধ্যে পায় না। তার ঘন ঘন টুর প্রোগ্রাম। ফিরলে কাজের ডবল চাপ।

অসিত চ্যাটার্জীর সামনে কিছু বাড়তি রোজগারের টোপ ফেলার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই বাপী জিতকে বলে দিয়েছিল হিসেব-পত্রের ব্যাপারে ওই লোকের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেবার বা কোম্পানীর ভাউচারে এক পয়সা দেবার দরকার নেই। ফলে জিত গা করছে না দেখে অসিত চ্যাটার্জী নিজেই কাজের কথা তুলেছিল। বাপীর জবাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বলেছে, তার ধারণা এটা মিলু বা তার মা-দাদা কেউ পছন্দ করবে না।

অপছন্দের ব্যাপারে স্ত্রীর সঙ্গে তার মা-দাদাকে জুড়ে দেবার ফলে ফর্সা মুখ রক্ত-বর্ণ।—আমি কাজ করে বাড়তি উপার্জন করব তাতে কার কি বলার আছে? আর মিলুই বা আপত্তি করবে কেন?

—জিগ্যেস করে দেখো। তার আপত্তি না হলেও আর কথা কি...কাজ করে কত লোকই তো কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসার ফল কি হয়েছে বাপী আঁচ করতে পারে। অসিত চ্যাটার্জী মেয়ে জাতটার ওপরেই বীতশ্রদ্ধ। বলেছিল, যত লেখা-পড়াই শিখুক মেয়েরা মোস্ট আনপ্রাকটিক্যাল। সেন্টিমেণ্টাল ফুলস্ যত সব।

ব্যবসার বাইরে জিত্ মালহোত্রার সঙ্গেও বাপীর অন্য কোনো কথা হয় না। এমন কি প্রত্যক্ষ যোগ নেই বলে এখানকার মদের ব্যবসা কেমন চলছে, সে খবরও নেয় না। কিন্তু জল কোন দিকে গড়াচ্ছে চোখ বুজে অনুমান করতে পারে। এই দেড় বছরের মধ্যে আবু রব্বানী পাঁচ-ছ'বার কলকাতায় এসেছে। ওদের লাল জলের ব্যবসা চালু হবার পরেই আবুকে বাপী এখানকার জন্য একটা লিকার শপের লাইসেন্স বের করার পরামর্শ দিয়েছিল। নিজেদের দোকান থাকলে শুধু সুবিধে নয়, নিরাপদও। টাকা খসালে বোবার মুখে কথা সরে। লাইসেন্স বার করতে জিতের বেশি সময় লাগেনি। লাইসেন্স কুমকুমের নামে। আবু আর জিত্ তার অংশীদার। লাভের চার-আনা শুধু বাপীর নামে জমা হবে —কিন্তু কাগজে-কলমে সে কেউ নয়। এরপর মধ্যকলকাতায় যে দোকান গজিয়ে উঠেছে তাতে খুব একটা জাঁকজমকের চিহ্ন নেই। যে দুজন কর্মচারীকে বহাল করা হয়েছে তারাও বানারজুলির লোক এবং আবুর লোক।

জিত মালহোত্রা সময়মতো অফিসে আসে, দরকার মতো পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে, কিন্তু বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার পর সে নিপাত্তা। শনিবারও বেলা একটার পর তার টিকির দেখা মেলে না। এই ব্যস্ততা যে শুধু ওদের জলীয় ব্যবসার কারণে নয়, তাও বোঝা গেছে। বাড়তি রোজগারের আশায় ছাই পড়লেও অসিত চ্যাটার্জির সঙ্গে জিতের যে গলায় গলায় ভাব এখন তার প্রমাণ দীপুদার নালিশ। তার অবুঝ বোন আবার অশান্তির মধ্যে পড়েছে। অমানুষ ভগ্নীপতি প্রায় রাতেই বদ্ধ মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফেরে। শনিবার শনিবার রেসের মাঠে যায়। দীপুদার চেনা জানা অনেকেই তাকে দেখেছে। শনিবার অন্য দিনের থেকে নেশার মাত্রা বেশি হয়, তাই মিষ্টিরও রেসের ব্যাপারটা জানতে

বুঝতে বাকি নেই। ঝগড়ার মুখে ওই অপদার্থই বুক ঠুকে বলে, সে রেসে যায় নেশা করে—তাতে কার বাপের কি। রোজ মদ খাওয়া আর ফি হপ্তায় রেস খেলার অত টাকা কোথা থেকে পায় দীপুদারা ভেবে পায় না।

বাপী নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত। মিষ্টির মত নেই বলে ওই লোকের তার এখান থেকে কিছু বাড়তি রোজগারের প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছে, সে-খবর দীপুদা বা তার মাকে অনেক আগেই জানানো হয়ে গেছে।

কুমকুমের সঙ্গে বাপী এখন আর দেখা পর্যন্ত করে না। কিন্তু তার সমাচারও নখদর্পণে। জীবনের এই বৃত্তে সে শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়িয়েছে। এখন সে নিজের সহজ মাধুর্যে আত্মস্থ। দ্বিধাদ্বন্দ্বশূন্য। কুমকুম বহিনের প্রসঙ্গে আবু রব্বানী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বুদ্ধি ধরে, কথা শোনে, একটুও হড়বড় করে না। বৃত্ত বদলের শুরুতেই কুমুর জন্যে বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাট ঠিক করা হয়েছে। মাথার ওপর বাড়িঅলা বসে থাকলে কাজের অসুবিধে। তার দেখাশুনার জন্য একজন আয়া আর একজন বুড়ো চাকর আছে। সেই তখন আবুর সঙ্গে বাপী একবার কুমুকে দেখতে গেছল। মনে মনে বাপী নিজেও তখন ওর বিবেচনার তারিফ করেছিল। বেশবাস আর প্রসাধনে রুচির শাসনও জানে মেয়েটা। আলগা চটক কিছু নেই। বাড়তির মধ্যে আগের সেই ঝকঝকে সাদা পাথরের ফুলটা আবার নাকে উঠে এসেছে। ওটার জেল্লা চোখে ঠিকরোবার জন্যেই।

এর মাস তিনেক বাদে আবু তৃতীয় দফা যখন কলকাতায় এসেছে, তার সঙ্গে বানারজুলির বাদশা ড্রাইভার। এখন বুড়োই বলা চলে। কলকাতায় মালিকের কাছে এসেছে। ভারী খুশি।

বাপী আবুকেই জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার?

আবু মাথা চুলকে জবাব দিয়েছে, ও কিছুদিন এখন কুমকুম বহিনের কাছে থাকবে।

বাপী আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আবু কোন চটকের ওপর নির্ভর করতে চায় তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে। ওরও এখন মাথা হয়েছে বটে একখানা। দিন কয়েকের মধ্যে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড চকচকে গাড়ি কেনা হয়েছে। কিছুদিন বলতে বাদশা ড্রাইভার কুমকুমের কাছে টানা চার মাস ছিল। ও বানারজুলি ফিরে যাবার আগে মালিককে জানিয়ে গেছে, দিদিজির গাড়ি চালানোর হাত এখন খুব পাকা আর খুব সাফ। ভারী ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালায় দিদিজি—মালিকের চিন্তার কোন কারণ নেই।

পাকা হাত দেখাবার লোভে কুমকুম কোনো দিন গাড়ি চালিয়ে বাপীর কাছে আসেনি। জিত অনেক করে বলা সত্ত্বেও আসেনি। শুনেই মিস ভড়ের নাকি দারুণ লজ্জা। জিত আশা করেছিল এ-কথা শোনার পর মালিকই একদিন তাকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলবে।

বাপী বলেনি। কিন্তু কুমকুমের গাড়ি চালানো নিজের চোখেই দেখেছে একদিন। পার্ক স্ট্রিট ধরে আসার পথে বাপীর গাড়ি ট্রাফিক লাইটে আটকে গেছল। সামনের সোজা রাস্তা ধরে সারি সারি গাড়ি যাচ্ছে আসছে। সেই চলন্ত সারিতে কুমুর গাড়ি। গাড়ি চালিয়ে কুমু দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছে। ডান হাতেই কনুই পাশের খোলা জানলায় রেখে স্টিয়ারিং ধরে বসায় শিথিল ভঙ্গিটুকু চোখে পড়ার মতোই। কুমকুমের ওকে দেখার কথা নয়। দেখেওনি। বাপী এর পর নিজের মনেই হেসেছে অনেকক্ষণ ধরে। রাতের আবছা আলোর

নিচে এই মেয়েকে শিকারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত কে বলবে।

এর পর যা, বাপীর সামনে তার সবটাই ছকে বাঁধা ছবির মতো স্পষ্ট।

...ব্যস্ততার অজুহাতে অসিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে জিতের মাখামাখির ভূমিকা কমে আসছে। সে পিছনে সরছে। সামনে মিস ভড়। কুমকুম ভড়। অসিত চ্যাটার্জী তার অন্তরঙ্গ সাহচর্যের দাক্ষিণ্যে ভাসছে। রমণীর যে রূপ গুণ বুদ্ধি পুরুষের আবিষ্কারের বস্তু, অসিত চ্যাটার্জীর চোখে কুমকুমের সেই রূপ সেই গুণ আর সেই বাস্তব বুদ্ধি। পয়সা আছে, তবু আর পাঁচটা মেয়ের মতো ড্রাইভারের মুখাপেক্ষী নয়। নিজের গাড়ি নিজে ড্রাইভ করে। নিজের তত্ত্বাবধানে মদের দোকান চালায় এমন মেয়ে এই কলকাতা শহরেও আর আছে কিনা জানে না। সে জানে মিস ভড়ের বাবার দোকান ওটা। অসময়ে বাবা মরে যেতে লাইসেন্স নিজের নামে করে নিয়ে অনায়াসে সেই দোকান চালাচ্ছে। সামনে এসে বেচাকেনা করে না অবশ্য, পর্দার আড়ালে পিছনের চিলতে ঘরে বসে দু'তিন ঘণ্টা দেখাশোনা করে। কেউ টেরও পায় না এটা কোনো মেয়ের দোকান। আর যে-কোনো মেয়ে হলে বাপ চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে দোকান বেচে দিয়ে টাকার বাণ্ডিল বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকত। নিজে মদ ছোঁয় না, কিন্তু পুরুষের এই নেশাটাকে সংস্কারে অন্ধ মেয়েদের মতো অশ্রদ্ধার চোখেও দেখে না। মান্যগণ্য অতিথিদের জন্য রকমারি জিনিস ঘরে মজুত। চাইতে হয় না। একটু উসখুস করলেই তেষ্টা বোঝে। উদার হাতে বার ক'রে দেয়। আবার বেশি খেতে দেখলে আপত্তি করে। বলে, অত ভালো নয়, আনন্দের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই ভালো। কুমকুমের চিন্তা হবে না তো কি। এত রূপ আর এত বিদ্যা যে মানুষের, তার ভালো মন্দের দিকে চোখ না রেখে কোনো মেয়ে পারে?

এ-সব খুঁটিনাটি খবর বাপী বানারজুলিতে বসে শুনেছে। আবু হেসে হেসে বলেছে, আর খুব বেশি দেরি নেই দোস্ত, জামাইসাহেব ঘায়েল হল বলে।

বাপী সচকিত।—দুলারি কিছু জানে না তো?

—ক্ষেপেছো! গেল মাসেও কুমকুম বহিন এসে তিন রাত তোমার বাংলোয় থেকে গেছে—দুলারির সঙ্গে এখন খুব ভাব তার। ও বলে, মেয়েটা কত ভালো, বাপীভাই একেই বিয়ে করছে না কেন। এ-সব শুনলে আর খাতির করবে!

ফূর্তির মুখে আবু বলেছিল, কুমকুম বহিন এবারে এসে খুব মজার কথা শুনিয়ে গেছে বাপীভাই। ওই লোকটার জন্যে তার নাকি মায়া হয়। কি রকম মায়া জানো? খারাপ সময়ে একবার ও কালীঘাটের মন্দিরে গেছল—মা কালীর কাছে প্রার্থনা করতে যদি একটু দিন ফেরে। সেখানে গিয়ে দেখে এক ভদ্রমহিলার মানতের পাঁঠা বলি হচ্ছে। জীবটার জন্য মহিলার এমন মায়া যে বলির আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল। কুমকুমেরও ওমনি মায়া, কিন্তু পূজোর বলি না দিয়ে পারে কি করে।

আবুর হা হা হাসি। কিন্তু বাপী তেমন খুশি হতে পারেনি। এ-রকম শুনলে বিবেকের ওপর আঁচড় পড়ে! এই বাস্তবে নেমে বাপী সেটা চায় না।

ঘটনার ঢল এবারে পরিণতির মোহনার দিকে। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার ঠিক পরেই দীপুদা এলো। থমথমে মুখ। সাধারণত টেলিফোন করে বাপী আছে কি নেই জেনে নিয়ে আসে। কিছু একটা তাড়ায় এই দিনে খবর না নিয়ে বা না দিয়ে এসে গেছে। এই মুখ

দেখা মাত্র বাপীর মনে হয়েছে তার প্রতীক্ষার গাছে কিছু ফল ধরেছে।

—এসো। হঠাৎ যে?

—তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে...।

—বোসো। কি ব্যাপার?

হল-এর অন্য মাথায় দাঁড়িয়ে বলাই কিছু একটা করছে। সেদিকে চেয়ে দীপুদা বলল, তোমার ভিতরের ঘরে গিয়ে বসি চলো।

শোবার ঘরে এসেই চাপা রাগে বলে উঠল, রাসকেলটার এত অধঃপতন হয়েছে আমি শুনেও বিশ্বাস করিনি।

তিন হাতের মধ্যে মুখোমুখি বসে বাপী চুপচাপ চেয়ে রইল। অর্থাৎ ব্যাপার খানা কি কিছু বুঝছে না।

বোঝানোর জন্যেই দীপুদার আসা। তপ্ত গলায় দীপুদা যা শোনালো তাতে বাপীর মনে হল, প্রতীক্ষার গাছে ফল শুধু ধরেনি, অনেকটা পেকেও গেছে।

—মেয়েছেলে নিয়ে গোলমেলে ব্যাপার বেশিদিন ধামা-চাপা থাকে না। অসিত চ্যাটার্জির আপিসের এক বন্ধু আগে ওর বাড়িতে আসত, আড্ডা দিত। মিষ্টির সঙ্গেও বেশ আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছল। ওই স্কাউনড্রেলের সেটা পছন্দ নয় বুঝেই ভদ্রলোক বছরখানেকের মধ্যে বাড়িতে আর আসেটাসে না। সপ্তাহ তিনেক আগে সে এয়ার-অফিসে এসে মিষ্টির সঙ্গে দেখা করে গেছে। কর্তব্যজ্ঞান আছে বলেই না এসে পারেনি। বলেছে, একটি সুশ্রী মেয়ে নিজে ড্রাইভ করে সপ্তাহের মধ্যে কম করে চার দিন তাদের অফিসে আসে। অফিসে ঢোকে না। ছুটির আগে আসে, গাড়িতে বসেই অপেক্ষা করে। অসিত চ্যাটার্জী নেমে এলে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। প্রত্যেক শনিবার দিন একটা বাজার দু'পাঁচ মিনিট আগে তার গাড়ি আসে, হাজার কাজ থাকলেও তখন অসিত চ্যাটার্জীকে অফিসে ধরে রাখা যায় না। ঠিক নেশা না থাকলেও আগে ওই বন্ধুটি মাঝেসাঝে অসিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে রেসের মাঠে যেত। শনিবারে ঘড়ি ধরে এই অফিস পালানোর তাড়া দেখেও তার সন্দেহ হয়। কয়েকটা শনিবার তাই সে-ও রেসের মাঠে গেছে। সব কদিনই সেই মেয়ের সঙ্গে অসিত চ্যাটার্জীকে দেখেছে। তারা গ্র্যাণ্ডে বসে খেলে। ছ'সাত মাস হয়ে গেল এই এক ব্যাপার চলছে। জিগ্যেস করলে অসিত চ্যাটার্জী বলে, মেয়েটির বাবা তাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন ছিলেন। উনি মারা যেতে তাঁর এই মেয়ে এখন ফার্ম দেখাশুনা করে। বিনে পয়সায় অসিত চ্যাটার্জী ফার্মের খাতাপত্র ঠিক করে দেয় বলেই এত খাতির কদর। সত্যি যদি হয় তাহলে বলার কিছু নেই। শুধু বন্ধুটির নয়, অফিসেই অনেকেরই খটকা লেগেছে বলে শুভানুধ্যায়ী হিসেবে সে মিষ্টিকে খোলাখুলি জানাবার দরকার মনে করেছে।

মিষ্টি জানে, একটা বড় ফার্মে বিকেলে পার্ট টাইম কাজ জুটেছে বলে ফিরতে রাত হয় লোকটার। অনেক টাকা দেয় তারা। সেই টাকায় মদ গিলে ঘরে আসে। কিন্তু মতিগতি বদলাচ্ছে, তাও লক্ষ্য করছে। মদ খাওয়া বা রেস খেলা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি হলে বেপরোয়ার মতো কথা বলে। শাসায়। তা বলে এরকম ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। তাই শোনামাত্র সব যে বিশ্বাস করেছে তাও নয়। যে সেধে এসে এমন খবর দিয়ে গেল তার রাগ বা আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আজকাল বাড়িতে আসে না তার কারণ আসতে

হয়তো নিষেধই করা হয়েছে।

দীপুদা জানিয়েছে, বোকা মেয়ে তার পরেও তাকে বা মাকে একটি কথাও বলেনি। ওই পাষণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছে। সেই রাতে নেশার মুখে কিছু বলেনি। পরদিন সকালে ধরেছে। বলেছে, তুমি রোজই প্রায় অফিস থেকে একটি মেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যাও শুনলাম—সে নিজে ড্রাইভ করে, তুমি পাশে বসে থাকো। কি ব্যাপার?

অন্ধকারে জানোয়ারের মুখে হঠাৎ জোরালো আলোর ঘা পড়লে যেমন ধড়ফড় করে ওঠে, কয়েক পলকের জন্য সেই মুখ নাকি অসিত চ্যাটার্জীর। মিষ্টির যা বোঝার সেই কটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। তারপর জানোয়ারের মতোই তর্জন-গর্জন লোকটার।—কোন সোয়াইন বলেছে? আমি কখন কোন কাজে কার গাড়িতে বেরোই তা না জেনে তোমাকে এ সব বলে কোন্ সাহসে? তোমার সেই চরিত্রবানেরা কারা আমি জানতে চাই? অফিসে তোমার চারদিকে যারা ছোঁকছোঁক করে বেড়ায়—তারা? কোন মতলবে তোমাকে তারা এ-সব বলে তুমি জানো না? না কি জেনেও ন্যাকামো করছ?

দীপুদার বোন তারপরেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। সে জানতে চেয়েছে, আপিসের পর সে কোন বড় ফার্মে পার্টটাইম কাজ করে, ফার্মের নাম কি, টেলিফোন নম্বর কি।

এরপর শয়তানের মুখোশ আরো খুলেছে। চিৎকার করে বলেছে, যে স্ত্রীর এত অবিশ্বাস তার কোন কথার জবাব সে দেবে না। তাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে কারো ঘাড়ে মাথা থাকবে না বলে শাসিয়েছে।

মিষ্টি এরপর টেলিফোন করে দাদাকে শনিবারের রেসের মাঠে যেতে বলেছে। শুনে দীপুদা প্রথমে আকাশ থেকে পড়েছিল। মিষ্টি শুধু বলেছে, কিছু গণ্ডগোলের ব্যাপার চোখে পড়তে পারে, কিছু বলবে না, শুধু দেখে এসো, পরে কথা হবে।

দুর্বোধ্য হলেও কাকে নিয়ে বোনের অশান্তি, জানা কথাই। দীপুদা গত শনিবারে রেসের মাঠে গেছল, এই শনিবারেও মাঠ থেকে ফিরে সোজা আগে মিষ্টির ওখানে গেছল। মাঠে যা দেখার দেখেছে। তারপর মিষ্টির মুখে সব শুনেছে। তাদের মা এখনো কিছু জানে না। সব শোনার পর মায়ের মাথাই না খারাপ হয়ে যায় দীপুদার এই চিন্তা।

বাপীর মুখের রেখা নিজের প্রতি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না। চুপচাপ শুনছে। চেয়ে আছে। মিষ্টির ওখান থেকে দীপুদা সরাসরি এখানে কেন, বোঝার চেষ্টা।

দুর্ভাবনায় মুখ ছাওয়া দীপুদার, একটু চুপ করে থেকে বলল, মেয়েটি সুশ্রী আর অবস্থাপন্ন তো বটেই, বেশ কালচারও মনে হল। এমন এক মেয়ের সঙ্গে স্কাউনড্রেলটা কি ভাঁওতা দিয়ে ভিড়েছে তার ঠিক কি! এরকম একটা থার্ড রেট লোক ওখানে পাত্তা পেল কি করে?

এ আলোচনা যেন অবান্তর। বাপী বলল, ওই থার্ড রেট লোক তোমার বোনের কাছেও পাত্তা পেয়েছিল...এ কথা ভেবে আর কি হবে। এখন সমস্যাটাই বড়।

দীপুদা কথাটা মেনে নিয়েই বলল, মিষ্টি তখন ছেলেমানুষ, কি আর কাণ্ডজ্ঞান। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছে। উৎসুক একটু। আচ্ছা বছর সাতাশ-আটাশ বয়েস, ব্যবসা আছে, নিজে ড্রাইভ করে—এ-রকম কোনো মেয়েকে তুমি চেনো বা দেখেছ?

বাপী ভিতরে সচকিত। প্রশ্নটা ব্যারিস্টার সুদীপ নন্দীর নিছক কাঁচা কৌতূহল মনে হল না। প্রশ্নটা তার না হয়ে তার বোনের হতে পারে। মাকে কিছু না বলে বা তার সঙ্গে শলাপরামর্শ না করে হন্তদন্ত হয়ে আগে এখানে এসেছে কেন? বাপীর ঠাণ্ডা দু'চোখ দীপুদার মুখের ওপর স্থির একটু। তারপর উঠে বলাইকে টেলিফোন এ-ঘরে দিয়ে যেতে হুকুম করল।

নম্বর ডায়াল করল। জিতের নম্বর। কাছাকাছির মধ্যে এখন তারও আলাদা ফ্ল্যাট হয়েছে। বউ ছেলে নিয়ে এসেছে। জিত্ সাড়া দিতে বাপী শুধু বলল, একবার এসো—

ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকলেও জিত মালহোত্রাকে সুদীপ নন্দীও চেনে। আরো উৎসুক। —তাকে ডাকলে কেন...এ ব্যাপারে সে কিছু জানে?

জবাবে ঠাণ্ডা মুখে বাপী তার কৌতূহল আরো চড়িয়ে দিল।—অপেক্ষা করো। এক্ষুনি এসে পড়বে।

ট্যাক্সি হাঁকিয়ে জিত দশ মিনিটের মধ্যে হাজির। বলাই খবর দিতে তাকেও শোবার ঘরেই ডাকা হল। সুদীপ নন্দীকে দেখে সদাসপ্রতিভ জিত দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো। বাপী বলল, পাঁচ-ছ'মাস আগে তুমি এঁর ভগ্নীপতি অসিত চ্যাটার্জী আর তোমার চেনাজানা কোন্ ওয়াইন-শপের মেয়ে মালিকের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলে...যা জানো দীপুদাকে বলো। নিজের দোষ ঢাকার জন্য কিছু গোপন করার দরকার নেই।

বাপী উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। জিত্‌কে ওটুকু না বললে চলত। ওর নিজের বুদ্ধিই যথেষ্ট। তার ওপর আবু রব্বানী অনেক রকমের তালিম দিয়েই রেখেছে। কলেপড়া মুখ করে ও কি বলবে বাপী জানে। বলবে, চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে আগে তারই গলায় গলায় ভাব হয়ে গেছল।...চ্যাটার্জী সাহেবের মতো অত না হলেও অল্পস্বল্প নেশার অভ্যেস তারও আছে। লিকারশপের সেই মেয়ে মালিকের কাছ থেকে জিনিস কিনত। সেই মেয়ে তাকে খুব খাতির করত আর সস্তায় জিনিস দিত। কারণ, ইনকাম ট্যাক্সের অনেকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। তার গত দু'তিন বছরের ইনকাম ট্যাক্সের জট জিত্ সাফ করে দিয়েছে, অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে। চ্যাটার্জী সাহেব ড্রিংক-এর এত বড় সমজদার, তাই জিতই সেই মেয়ে মালিকের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সস্তায় ভালো জিনিস পাওয়া ছাড়া এর থেকে আর কোনো বিভ্রাট হতে পারে ভাবেনি। বেগতিক দেখে মাস পাঁচ ছয় আগে জিত ভয়ে ভয়ে ব্যাপারটা মালিককে জানাতে চেষ্টা করেছিল।...আর শেষে বলবে, মালিকের শোনার সময় বা আগ্রহ হয়নি দেখে সে-ও চুপ মেরে গেছে।

তাসের ঘর ধসে গেছে। মিষ্টি মেয়েদের কোনো হস্টেলে যাওয়ার মতলবে ছিল। তার বাবার জন্য পারেনি। বাব রিটায়ার করে কলকাতায় চলে এসেছে। সকলে মিলে একরকম জোর করেই তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন ঝড়ের পরের স্তব্ধতা থিতিয়ে আছে।

মনোরমা নন্দীর ঘন ঘন টেলিফোন আসছে। গলার চাপা স্বর শুনেই বাপী বুঝতে পারে টেলিফোনের তাগিদটা মেয়ের অগোচরে। সব থেকে বেশি এখন তাকেই দরকার,

আভাসে ইঙ্গিতে তাও বলতে কসুর করেননি। দু'চারবার বাপী এটা-সেটা বলে এড়িয়েছে। তারপর স্পষ্ট আশ্বাস দিয়ে বলেছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না মাসিমা, যখন সময় হবে আমি নিজেই যাব, আপনাকে বলতে হবে না।

সুদীপ নন্দীও কোর্ট ফেরত বাড়িতে হানা দিচ্ছে প্রায়ই। মায়ের বাড়িটা এরপর সম্পূর্ণ তার একার হবে এই আশাতেই হয়তো দ্রুত ফয়সলার দিকে এগনোর তাড়া তার। টাকার যার গাছপাথর নেই, আর মন যার অত দরাজ—সম্পর্ক পাকা হবার পর সে ওই বাড়ির ওপর থাবা বসাতে আসবে না এ বিশ্বাস আছে। তিক্তবিরক্ত সে আসলে নিজের বোনের ওপর। তার মাথায় কি-যে আছে ভেবে পাচ্ছে না। কারো সঙ্গে কথা নেই। চুপচাপ আপিসে যায় আসে। এত বড় এক ব্যাপারের পরে ডিভোর্সের কথায় হাঁ না কিছু বলে না। দীপুদার বাপীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।

বাপীর একই জবাব।—আমার পরামর্শ যদি শোনো তো ব্যস্ত হয়ো না। এত বড় ব্যাপার হয়ে গেল বলেই ধৈর্য ধরে কিছুদিন সবুর করো। মাসিমাকেও তাড়াহুড়ো করতে বারণ করো।

দেড় মাসের মধ্যে অসিত চ্যাটার্জীর ভরাডুবি ঘনিয়ে এলো আর এক দিক থেকে। এর পিছনে সবটাই কুমকুমের হাতযশ। বড় তেল কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউনটেন্ট, জমা-খরচের হাজার হাজার কাঁচা টাকা অসিত চ্যাটার্জীর হেপাজতে। আজকের জমার টাকা কাল বা পরশু পিছনের তারিখ দিয়ে খাতায় দেখালে কে আর ওটুকু কারচুপি ধরছে। ক্যাশ ব্যালান্স ঠিক রাখাও তো তারই দায়। তারিখ অনুযায়ী সেটা ঠিক থাকলেই হল। শনিবারে রেসের মাঠের জন্য পাঁচ-সাতশ বা হাজার টাকা সরিয়ে সোমবারে আবার সে টাকাটা পুরিয়ে রাখলেই হল। দু'চারবার এ-রকম করেছে। শনিবারে তাড়াতাড়ি ব্যাংক বন্ধ, কুমকুম হয়তো সময় করে টাকা তুলে রাখতে পারেনি। অসিত চ্যাটার্জীকে ফোনে জানিয়ে রেখেছে, কিছু টাকার ব্যবস্থা রেখো, সোমবার পেয়ে যাবে।

রেসে জিতলে তো কথাই নেই, ঘাটতির টাকা তক্ষুণি পকেটে এসে গেছে। না জিতলেও সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। রবিবারের সান্ধ্য বৈঠকে কুমকুম দোকান থেকেই সে-টাকা এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে। তাই আপিসের টাকায় হাত দিতে অসিত চ্যাটার্জির তখন আর ভয়-ডর নেই।

কুমুর টেলিফোন পেয়ে শেষবারে চার হাজার টাকা সরিয়েছে। হাতে খুব ভালো ভালো টিপ আছে। কি কি উৎসব উপলক্ষে বড়দরের খেলা। কপালদোষে সেদিন সবটাই হার হয়ে গেল, রবিবারের সন্ধ্যায় এসে অসিত চ্যাটার্জী আয়ার মুখে শুনল হঠাৎ কোনো জরুরী কাজে কুমকুম বাইরে গেছে, পরদিন সকালের মধ্যে ফিরবে বলে গেছে। অসিত চ্যাটার্জী তখনো নিশ্চিন্ত। পরস্পরের প্রতি এমন মুগ্ধ তারা যে বাজে ভাবনা-চিন্তার ঠাঁই নেই।

কিন্তু পরদিন অফিসে যাবার আগে টাকা নিতে এসে দেখে কুমকুম ফেরেনি। এবারে অসিত চ্যাটার্জীর চিন্তা হয়েছে একটু। কুমকুমের জরুরি কাজে হঠাৎ যাওয়া বা দিনকতকের জন্য আটকে পড়া নতুন নয়। আগেও এরকম হয়েছে। সেরকম কোনো জরুরী কাজের জন্য যদি চলে গিয়ে থাকে, চার হাজার টাকার ব্যাপারটা হয়তো ভুলেই বসে আছে।

ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে, একদিন ছেড়ে চার-পাঁচ দিনও এই ঘাটতি ধামা-চাপা দিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার। কিন্তু লোকটার বরাত নিতান্তই খারাপ এবার। ভিতরের কারো শত্রুতার ফল কিনা জানে না। সেই বিকেলের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। বড় সাহেব স্বয়ং অ্যাকাউন্টস চেক করতে বসল।

অসিত চ্যাটার্জীর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। চাকরি খতম তো বটেই। এখন জেল বাঁচে কি করে। কাকুতি মিনতি করে আর হাতে পায়ে ধরে দুটো দিনের সময় নিল। কুমকুমের প্রতীক্ষায় পাগলের মতো সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটল। আর কোনো পথ না দেখে শ্বশুড়বাড়িতে ছুটল মিষ্টির সঙ্গে দেখা করতে। অনেক করে বলে পাঠালো, ভয়ানক বিপদ—একবারটি দেখা না হলেই না। মিষ্টি নিচে নামেনি। দেখা করেনি।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ বাপীর কাছে এসে ধর্না দিল। উদভ্রান্ত মূর্তি। এক্ষুনি চার হাজার টাকা না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

বাপী খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। খুঁটিয়ে শুনল সব। টাকারজন্য তার স্ত্রীর কাছে গেছল কিনা তাও জেনে নিল। তারপর উঠে নিজের ঘরে এসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। নম্বর ডায়েল করল।

ওদিক থেকে দীপুদা সাড়া দিল। বাপী মিষ্টিকে ডেকে দিতে বলল।

কয়েক মুহূর্তের অধীর প্রতীক্ষা। ফোন ধরবে কি ধরবে না সেই সংশয়।

—বলো।

একটা বড় নিঃশ্বাস সংগোপনে মুক্তি পেয়ে বাঁচল—ও-ঘরে অসিত চ্যাটার্জী বসে আছে। তার এক্ষুনি চার হাজার টাকা চাই। না পেলে জেল হবে। অফিসের ক্যাশ ডিভালকেশন...। তার খুব পরিচিত কে একজন মহিলা হঠাৎ দু'তিন দিনের জন্য বাইরে চলে গেছে, সে ফিরে এলেই টাকাটা দিয়ে দেবে বলছে...

একটু বাদে ওদিকের ঠাণ্ডা গলা ভেসে এলো।—আমাকে ফোন কেন?

—দেব?

—যাকে দেবে আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলে চার হাজার টাকা আমিই দিতে পারতাম। তোমার টাকা বেশি হলে বা দয়া করার ইচ্ছে হলে দিতে পারো।

ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ। বাপীও রিসিভার নামিয়ে বেরিয়ে এলো। ঠাণ্ডা মুখে অসিত চ্যাটার্জীকে বলল, মিষ্টিকে ফোন করেছিলাম, টাকা দিতে পারছি না।

অসিত চ্যাটার্জী আর্তনাদ করে উঠল, চার হাজার টাকার জন্য আমার জেল হয়ে যাবে বাপী? আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মিস ভড় আজ ফিরলে আজকের মধ্যেই টাকাটা তোমাকে দিয়ে যাব!

পিছনে জিত এসে দাঁড়িয়েছে, অসিত চ্যাটার্জী লক্ষ্য করে নি। বাপী ওর দিকে তাকাতে সে-ও দেখল। জিতের মুখে ভাব-বিকার নেই। অসিত চ্যাটার্জীর কথা কানে গেছে বলেই তাকে বলল, মিস ভড় খানিক আগে ফিরেছে, একটু আগে তার ফোন পেয়েছি।

ডুবন্ত লোকটা বাঁচার হদিস পেল। এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

দু'মাসের আগেই কোর্টের রায় বেরিয়েছে। ডিভোর্স মঞ্জুর। বিচ্ছেদের মামলা রুজু

করেছিল অসিত চ্যাটার্জী। অভিযোগ, স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবৎ তার সঙ্গে ঘর করে না। অন্য তরফ থেকে কেউ প্রতিবাদ করে নি। ফয়সলা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ব্যারিস্টার সুদীপ নন্দী বরং সেই চেষ্টা করেছে। তাদের তরফ থেকে কেউ হাজিরাও দেয়নি, অসিত চ্যাটার্জীর অনুকূলে এক তরফা ডিক্রি জারি হয়েছে।

সেই দিনই বিকেলে কুমকুম এলো। বাড়ীতে এসে বাপীর সামনে দাঁড়ালো এই প্রথম। খানিক আগে দীপুদা ফোনে বাপীকে রায়ের খবর জানিয়েছে।

বাপী অনেক দিন কুমুকে দেখে নি। আগের থেকেও কমনীয় লাগছে। বিনম্র, হাসিছোঁয়া মুখ। বাপীর মনে হল, কাজ হাঁসিল করতে পারার কৃতিত্বে আজ অনায়াসে সোজা তার সামনে এসে হাজির হতে পেরেছে। ভিতরে ভিতরে বিরক্ত তক্ষুনি। প্রশংসা বা পুরস্কার কুড়নোর জন্য বানারজুলিতে আবু রব্বানীর কাছে চলে গেলে আপত্তির কিছু ছিল না।

—কি ব্যাপার? হঠাৎ যে?

একটুও ভণিতা না করে কুমকুম বলল, আমার কিছু টাকা দরকার বাপীদা...।

পুরস্কার নিতেই এসেছ তাহলে। বাপীর মুখের রেখা কঠিন। গলার স্বরও সদয় নয়।—কত টাকা?

দ্বিধা কাটিয়ে কুমকুম বলল, বেশি টাকাই দরকার...আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, জলপাইগুড়ির সেই ভাঙা ঘরদোর ঠিক করে নেব ভাবছি...কিছুদিন চলার মতো আরো নতুন করে দু'জনারই কিছু শুরু করার মতো কত হলে চলে তুমিই ভালো বুঝবে।

বাপী বিমূঢ়ের মতো চেয়ে রইল খানিক। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, চলে যাচ্ছ! আমরা মানে আর কে? অসিত চ্যাটার্জী?

লজ্জা পেলেও সপ্রতিভ মুখেই মাথা নাড়ল কুমকুম। বলল, ওই লোকের ভালো কিছু নেই সত্যি কথাই বাপীদা, কোনো ভালো মেয়ের তাকে বরদাস্ত করতে পারার কথাও নয়। তবু যেখান থেকে যেখানে টেনে এনেছি...দেখা যাক না কিছুটা ফেরাতে পারি কিনা। না পারলেও আমার তো হারাবার কিছু ভয় নেই বাপীদা।

বাপী হতভম্বের মতো চেয়েই আছে। এক ঝটকায় ঘরে চলে গেল। তক্ষুনি চেকবই আর কলম নিয়ে ফিরল। খসখস করে চেকে কুমকুমের নাম লিখল। একটু থমকে বড়সড় একটা টাকার অঙ্ক বসালো। পছন্দ হল না। পাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে যে টাকার অঙ্কটা বসালো সেটা আরো বড়।

চেক হাতে নিয়ে টাকার পরিমাণ দেখে কুমকুমের দু'চোখ বিস্ফারিত।—এত টাকা কি হবে বাপীদা। না না, এত দরকার নেই—আমরা তো ভাল ভাবে কিছু রোজগার করতে চেষ্টা করব!

অন্য দিকে চেয়ে বাপী বিড়বিড় করে বলল, কিছু বেশি না, নিয়ে যাও...।

কুমকুম চুপচাপ চেয়ে রইল। আহত গলায় বলল, এর পর আমাকে তুমি আরো বেশী ঘৃণা করবে তো বাপীদা?

বাপী আসতে আসতে ফিরল তার দিকে। চোখের কোণ দুটো শিরশির করছে। একটা উদ্‌গত অনুভূতি জোর করেই গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ওরে না না—এর পর আমাকে তুই কত ঘেন্না করবি তাই বরং বলে যা!

হতচকিত কুমকুম ত্রস্তে কাছে এগিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ধরা গলায় বলল, তার আগে আমার যেন সত্যি মরণ হয় বাপীদা। বাবা আজ আমাকে আশীর্বাদ করছেন—তুমিও করো।

রাত প্রায় আটটা। বাপী উঠল। ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলালো। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

সাতাশি নম্বরের সেই বাড়ি। বাপী নিঃশব্দে গাড়ি থামালো। নিচের বৈঠকখানায় দীপুদা আর তার মা। আজকের কোর্টের ফয়সালার প্রসঙ্গেই তাদের আলোচনা হচ্ছিল মনে হয়। বাপীকে দেখে দু'জনেই খুশি, কিন্তু গলার স্বর চড়িয়ে কেউ অভ্যর্থনা জানাল না। দীপুদা বলল, এসো, মা তোমার কথাই বলছিল।

—মিষ্টি কোথায়?

—ওপরে তার ঘরে। খবর দেব? এবারের আগ্রহ মনোরমা নন্দীর।

—আমি গেলে অসুবিধে হবে?

—না না অসুবিধে কিসের! মহিলার ব্যস্ত মুখ।—দীপু, বাপীকে নিয়ে যা।

দায়টা ছেলের ঘাড়ে চাপালেন মনোরমা নন্দী। ছেলেও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না হয়তো। কিন্তু প্রকাশ করে চলে না।—এসো, এসো।

দোতলায় উঠে ছোট ঢাকা বারান্দা ধরে দীপুদা তাকে কোণের ঘরের সামনে নিয়ে এলো। পর্দা ঝুলছে। ভিতরে আলো জ্বলছে। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে দীপুদা বলল, মিষ্টি কি কচ্ছিস রে...বাপী এসেছে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে দেয়াল-ঘেঁষা ড্রেসিং টেবিলটা চোখে পড়ল বাপীর। তার আয়নায় দেখা একটা বই হাতে মিষ্টি শোয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। আয়নায় তারও দরজার দিকে চোখ। বাপীকে দেখছে।

দীপুদা তাকে ভিতরে পৌঁছে দিয়ে সরে গেল। বাপীর দু'চোখ মিষ্টির মুখের ওপর। শাড়ির আঁচলটা আরো ভালো করে টেনে দিতে দিতে সেও সোজা চেয়ে রইল। শান্ত, গম্ভীর। শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হওয়া বরদাস্ত করতে আপত্তি, সেটা পলকে বুঝিয়ে দিল।

তক্ষুনি সেই ছেলেবেলার মতোই একটা অসহিষ্ণু তপ্ত বাসনা বাপীর শিরায় শিরায় দাপাদাপি করে গেল। তার পরেই সংযত আবার। বলল, ওরা নিচেই বসতে বলেছিলেন, আমি উঠে এলাম।

মিষ্টির চোখে পলক পড়ল না। বলল, দেখতে পাচ্ছি।

আবারও নিজের সঙ্গে যুঝতে হল একটু। বসতেও বলে নি। ড্রেসিং টেবিলের সামনের থেকে কুশনটা টেনে নিয়ে বাপী নিজেই বসল। স্নায়ুবশে রাখার চেষ্টা—আমার আসাটা এখনো তেমন পছন্দ হচ্ছে না মনে হচ্ছে।

অনড় দৃষ্টি তেমনি আটকে আছে।—কেন এসেছো? সব কিছুর ফয়সালা হয়ে গেল ভেবেছ?

বাপী একটু থেমে জবাব দিল, তোমার আমার দুজনেরই তাই ভাবার কথা।...যা হয়ে গেল তার ধাক্কাটা বড় করে দেখছ বলেই বোধ হয় তুমি এক্ষুনি সেটা ভাবতে

পারছ না।

এবারের চাউনি তীক্ষ্ণ। মিষ্টির গলার স্বর চড়ল না। কিন্তু আরো কঠিন।—যা হয়ে গেল তার পিছনে তোমার কতটা হাত ছিল?

বাপীর দু'চোখ ওই মুখের ওপরেই হোঁচট খেল একপ্রস্থ। তারপর স্থির হল, খুব ধীরে বুকের দিকে নেমে এলো একটু। আবার চোখ উঠে এলো। আশার আলো নিভলে যে জানোয়ার অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বাপী আগে তার টুঁটি টিপে ধরল। তার পরেও আকাশ থেকে পড়ল না। মিথ্যে বলল না। জবাব দিল, হ্যাঁ, সবটাই।

মিষ্টির মুখের তাপ চোখে জমা হচ্ছে।—এর পরেও তাহলে তুমি কি আশা করো?

—আশা করেছিলাম অসিত চ্যাটার্জীর জোরের পুঁজিটা তোমাকে খুব ভালো করে দেখিয়ে দিতে পেরেছি। বাপীর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝলসালো, চোখের তারায় বিদ্রূপ ঠিকরলো।—তুমি বড়াই করে বলেছিলে না এই পুঁজিতে ভেজাল নেই বলে, তার জুয়া আর নেশার রোগ বরদাস্ত করতেও তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে না...তা না হলে নিজেই তাকে ছেঁটে দিতে? এখন সবটাই মিথ্যে সবটাই ভেজাল দেখিয়ে দেবার পরেও আমি কি আশা করি তোমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে? আমাকে তোমার দয়ার পাত্র ভেবেছ?

প্রতিটি কথা নির্দয় আঘাতের মতো কানে বিঁধল। কিন্তু এমনি নির্মম সত্য যে কোনো জবাব মুখে এলো না। অসহিষ্ণু আরক্ত চোখে মিষ্টি চেয়ে রইল শুধু।

কুশন ছেড়ে বাপী উঠে দাঁড়ালো। সামনে এগিয়ে এলো একটু। পুরুষের উঁচু মাথা। —শোনো, আঠারো বছর ধরে আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি, তোমার কথা ভেবেছি। এতে কোনো ভেজাল নেই—মিথ্যে নেই। বারো থেকে আজ এই তিরিশ বছর বয়েস পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি—এর পর হাতে গুণে আর তিন দিন অপেক্ষা করব। আমার কি প্রাপ্য যদি স্বীকার করে নিতে পারো, এই তিন দিনের মধ্যে তুমি আসবে, নিজে এসে আমাকে ডেকে নেবে। তা যদি না পারো এখানকার পাট গুটিয়ে আমি চলে যাব—আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসব না।

লম্বা পা ফেলে হাতের ধাক্কায় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

আঠারো

এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপীকে ছেলেবেলাব ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসল। চোখে মুখে ঠোঁটে সেই রকম দুষ্টুমি। ছলে বলে কৌশলে সেই রকম হাত-পা গা ছোঁয়ার লোভ। মিষ্টি টের পাচ্ছে। কিন্তু সহজে তার দিকে ফিরছে না বা সোজা হয়ে বসছে না। সে জানলার দিকে। বাইরের আকাশ দেখার সুবিধে নিরাপদও।

এয়ারপোর্টে মিষ্টির মা বাবা দাদার সামনে বাপী এতক্ষণ মানানসই রকমের গম্ভীর ছিল। তার আগেও অসহ্য রকমের কতগুলো দিন গাম্ভীর্যের খোলসের মধ্যে ঢুকে থাকতে হয়েছে। মিষ্টিকে বাপী তিন দিনের সময় দিয়েছিল। সেই তিনটে দিন এই মেয়ে ওকে কম যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখেনি। মনে পড়তে বাপীর হাত দুটো সেই ছেলেবেলার মতো নিশপিশ করে উঠল।

...সেই তিন দিনের বিকেল পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। তার পরেও মিষ্টি নিজে

আসেনি। টেলিফোনে তার গলা ভেসে এসেছে।...ফোনে ডাকলে হবে?

মুহূর্তের মধ্যে কি যে ঘটে গেল বাপীই শুধু জানে। কতকালের সত্তা-দুমড়োনো একটা জগদ্দল পাথর টুপ করে খসে পড়ে গেল। শূন্যে উঠে বাপীর মাথাটা তখন ঘরের ছাদে ঠোক্কর খেলেও অসম্ভব কিছু মনে হত না। স্নায়ুগুলোর ঝাঁপাঝাঁপি বন্ধ করতে সময় লেগেছিল। তারপর জবাব দিয়েছে, হবে। কিন্তু তোমার আসতে অসুবিধে কি?

—অসুবিধে বুঝে নাও।

—বুঝলাম তুমি না এলেও আমার যাওয়া আর ঠেকাচ্ছে কে?

জবাবে মিষ্টি টুক করে ফোনটা নামিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু সেখানে মিষ্টির মা বাবার আর দাদার সমাদরের বেড়া টপকে কতটুকু আর নিরিবিলিতে পাওয়া সম্ভব। ফলে সেখানেও বিরাট মানুষ হব, জামাইয়ের মানানসই গাম্ভীর্যের মুখোস ধরে রাখতে হয়েছে। মুখখানা আরো গুরুগম্ভীর করে তুলতে হয়েছিল শাশুড়ীর প্রস্তাব শুনে। কাগজ কলমের বিয়েতে আর তাঁর আস্থা নেই। বিয়ে হবে হিন্দুমতে অগ্নিসাক্ষী করে। বাপীর তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু সেটা ফাল্গুনের তৃতীয় সপ্তাহ। সে-মাসে আর বিয়ের তারিখ নেই। তারপর টানা চৈত্র মাসে হিন্দু বিয়ের কথাই ওঠে না। বিয়ের তারিখ আছে বৈশাখের মাঝামাঝি।

বাপীর তখন মনে হয়েছিল অত দূরের বৈশাখ আর আসবে কিনা সন্দেহ। ফলে ভাবী শাশুড়িকে দাবড়ে দেবার মতো গোঁড়া মুখ করে আপত্তি জানাতে হয়েছে।...সব বিয়েই বিয়ে। ও সময়ে তাকে ভারতবর্ষের বাইরেও চলে যেতে হতে পারে।

মনোরমা নন্দী তার পরেও মেয়ের মারফৎ বৈশাখ পর্যন্ত বিয়েটা স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। মিষ্টি বলেছিল, মা যখন চাইছে ক'টা দিন সবুর করোই না।

বাপী আরো গম্ভীর।—ঠিক আছে। তুমি কাল পরশুর মধ্যে আমার সঙ্গে বানারজুলি চলো—বিয়ে না হয় পরেই হবে।

মিষ্টি প্রথমে থমকে তাকিয়েছিল। তারপর দ্রুত প্রস্থান। মা-কে কি বলেছে বাপী জানতেও চায়নি। মোট কথা সেই থেকে উদ্রেচিত গাম্ভীর্যের মুখোস সরানোর তেমন ফুরসৎ মেলেনি। টাকার জোরে রেজিস্ট্রি আপিসে পিছনের তারিখ বসিয়ে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। আজই সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বিয়ে শেষ। দুপুরে অতিথি-অভ্যাগতদের নিয়ে নামী হোটেলে লাঞ্চ পার্টির পর শ্বশুরবাড়ি থেকে সোজা দমদম এয়ারপোর্ট। এতেও শাশুড়ির খুব আপত্তি ছিল। এ জামাই অসিত চ্যাটার্জী নয় বুঝেই হাল ছেড়েছেন। রেজিস্ট্রি বিয়ের দোষ ঢাকার জন্য মেয়ের কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরিয়েছেন, মোটা করে সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ কেটে দিয়েছেন।

জীবনে মিষ্টি এসেছে। তাই সবার আগে বানারজুলি ডেকেছে। সেখানকার আকাশ বাতাস জঙ্গল পাহাড় তারা আসবে বলে উন্মুখ হয়ে আছে। জীবনে মিষ্টি এলো এটা এখন আর স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের মত বাস্তব। এমন বাস্তবের বাসর বানারজুলি ছাড়া আর কোথায় হতে পারে। আবু রব্বানীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছে বিয়ের পরেই তারা যাচ্ছে। সে বোধ হয় এতক্ষণে বাগডোগরা এসে বসে আছে।

কিছুক্ষণ ধরে নিঃশব্দে খুনসুটি করার পরেও মিষ্টি সোজা হয়ে বসল না বা জানলা থেকে মুখ ফেরালো না। বাইরের দিকেই চেয়ে আছে আর হাসি চেপে আছে। সেই

ছেলেবেলার দুষ্টুমি টের পাচ্ছে। বাপীও হার মানবে না। তার ঘুম পেল। মাথাটা বার বার মিষ্টির কাঁধে ঠোক্কর খেতে লাগল। শেষে ওই কাঁধের আশ্রয়ে ঘুমিয়েই পড়ল। কিন্তু হাত সজাগ। সেটা মিষ্টির বাহুর ওপর দিয়ে তার কোলের ওপর নেমে এসে বিশ্রামের জায়গা খুঁজছে।

এবারে মিষ্টি ধড়ফড় করে তাকে ঠেলে সরালো। এরোপ্লেনে যাত্রী খুব বেশি না হলেও একেবারে কম নয়। চাপা তর্জনের সুরে বলল, এই! হচ্ছে কি?

—কি হচ্ছে?

গলা আরো নামিয়ে মিষ্টি বলল, শ্লীলতাহানির চেষ্টা।

মিষ্টি এবারে সোজা হয়ে বসল। গম্ভীর। কিন্তু ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। সিঁথি আর কপালের জ্বলজ্বল সিঁদুরের আভা গাল আর মুখের দিকে নেমে আসছে।

দুর্বার লোভের এমন স্বাদও বাপীর আগে জানা ছিল না। একটু বাদে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল। গলা খাটো করে বলল, আমি একটা গাধা। গোটা এরোপ্লেনটা রিজার্ভ করে আসা উচিত ছিল।

মিষ্টি সামান্য ঘাড় ফিরিয়ে পলকে দেখে নিল। ঠোঁটের হাসিটুকুকেও আর প্রশ্রয় দেওয়া নিরাপদ ভাবছে না। নির্লিপ্ত চোখ আবার সামনের দিকে।

বাপীর আরো মজা লাগছে। এয়ার অফিসের জুনিয়র অফিসারের ব্যক্তিত্বের ফাক দিয়ে বানারজুলির মিষ্টি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বাগডোগরা।

আবু দুটো গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির। ওর নিজের গাড়ি একটা। অন্যটা বাপীর গাড়ি। বাদশা চালিয়ে এসেছে। সেই গাড়ি আবার ফুল আর লতাপাতা দিয়ে সাজানো। কলকাতা থেকে আরো অতিথি অভ্যাগত আসতে পারে ভেবে দুটো গাড়ি আনা। শুধু দুজনকে দেখার পরে মনে হল, এ-সময় ঝামেলা বাড়াবে দোস্ত এত বোকা নয়।

দু'হাতে বাপীকে জাপটে ধরল প্রথম। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, তুমি মরদ বটে একখানা দোস্ত।

নিরীহ মুখে বাপীও খাটো গলায় জবাব দিল, চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার সেই মারের পর তুমিই তো তাতিয়ে দিয়ে বলেছিলে মরদ হলে বদলা নিতে।

তাকে ছেড়ে আবু সভয়ে দেখে নিল বহিনজি শুনল কি না। তারপর মিষ্টিকে শুনিয়েই বলল, ভেরি ডেনজারাস আদমি ইউ! মালিক হও আর যাই হও, এখন থেকে আমি সব সময় মালকান বহিনজির দিকে।

ঘুরে মিষ্টির উদ্দেশ্যে আধখানা নুয়ে বশম্বদ কুর্নিশ করে উঠল। অপ্রস্তুত মিষ্টি বলে উঠল, ও-কি!

—সেরে রাখলাম। আবুর ডগমগ মুখ।—এরপর সব গোস্তাকি মাফ হয়। আমি কিন্তু আর তোমাকে আপনি-টাপনি বলতে পারব না বহিনজি—দোস্ত আস্কারা দিয়ে জংলি মানুষকে কাঁধে তুললে আমার কি দোষ!

মিষ্টি হেসে জবাব দিল, কিছু দোষ নেই, বলতে হবে না।

বানারজুলি পৌঁছুতে সন্ধ্যা।

আবুর কাণ্ড দেখে বাপী হাসবে না রাগ করবে। আবুকে বেশি ঘটা করতে নিষেধ

করে দিয়েছিল। পাশাপাশি দুটো বাংলোই রকমারি রঙিন আলোয় ঝলমল করছে। দুই বাংলোর মাঝের মেহেদি গাছের পার্টিশনের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য আলোর ফুল। দুই বাংলোর উঠোনে আর বারান্দায় লোক গিসগিস করছে। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত উত্তর বাংলার কেউ বাকি নেই বোধ হয়। চা-বাগানের অনেক পদস্থজনেরাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। বাপী তরফদার আবু রব্বানীও আর উপেক্ষার পাত্র নয়। ডাটাবাবুও তার রেজিমেণ্ট নিয়ে হাজির। বুফে ডিনারের সব ভার তার ওপর। বাইরের সে-সব অভ্যাগতরা স্বস্থানে ফিরতে পারবে না, রাতে তাদের ক্লাব হাউসে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আবুর আয়োজনে ত্রুটি নেই।

উপহার আর অভিনন্দন পর্বের পরে মিষ্টিকে নিয়ে বাপীর বাংলোর ঘরে উঠে আসতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এরপর সাড়ে আটটায় ডিনার। আত্মজনেরা কেউ ভিড়ে মিশে যেতে রাজি নয়, তারা বাংলোর ভিতরে অপেক্ষা করছিল। বাপী প্রথমে দুলারির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মিষ্টিকে বলল, আবুর বউ, আমার এখানকার গার্জেন।

বউ দেখে খুশিতে দুলারির চোখে পলক পড়ে না। তারপর স্বভাব-গম্ভীর গলায় বাপীর দিকে ফিরে বলল, তোমার বউ না গার্জেন দেখে ভিরমি খায় বাপীভাই—তা আমি এখন গড় করি না কি করি?

বাপী গম্ভীর একটু।—ছোট বোনকে গড় করবে কি, আশীর্বাদ করো।

এদের শিক্ষা-দীক্ষা যেমনই হোক হেলা-ফেলার যে নয় পরোক্ষে মিষ্টিকেই সেটুকু বুঝিয়ে দিল। এরপর কোয়েলা এগিয়ে এলো। সেও তার রুচিমতো সাজসজ্জা করেছে। খাটুনি নেই, খেয়ে ঘুমিয়ে বেচারী আরো খানিকটা বিপুলা হয়েছে। অতি কষ্টে উপুড় হয়ে দু'হাত মাটিতে ঠেকালো। গড়ের মধ্যে এই ওদের সেরা গড়। মিষ্টি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে সোজা হতে সাহায্য করল, এটুকুতেই কালো মুখ খুশিতে আটখানা।

খবর পেয়ে ঝগড়ুও হাজির। সকালেই পাহাড়ের বাংলো থেকে নেমে এসেছে। বয়েস এখন সাতাত্তর। মোটামুটি মজবুত এখনও। বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাপী তাকেও মর্যাদা দিতে ভুলল না। বাদশা ড্রাইভারের সঙ্গে পথেই পরিচয় করানো হয়েছে।

একটু বাদে ঘর্মাক্ত কলেবরে আবু এলো। সকলকে সরিয়ে দুলারি মিষ্টিকে একটু বিশ্রাম নিতে বলছিল। আবু বাধা দিল, বিশ্রাম সেই রাত্তিরে হবে—এখন মুখ-হাত ধুয়ে সাজ-টাজ যদি কিছু করার থাকে জলদি করে নিতে হবে। আরো লোক এসে গেছে, আবার ডিনারের সময় হচ্ছে।

বাপী সত্যিকারের গম্ভীর।—আরো লোক এসে গেছে?

—বা রে, আসবে না!

—তোমাকে নিষেধ করলাম, আর তুমি এত বড় এক ব্যাপার করে বসে আছ?

আজ অন্তত আবু কারো ভ্রূকুটির তোয়াক্কা রাখে না। জবাব দিল, ছাড়ো তো! এ কি আমার বিয়ে যে তিন দিন আগেও হবু বিবি চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া করেছে।

বিড়ম্বনা সামলে দুলারি সকোপে তাকালো তার দিকে। মিষ্টি হেসে ফেলল। বাপী বলে উঠল, আমারও তো সেই বরাত! তাহলে তুমি এত ঘটা করতে গেলে কেন?

আবু হাসছে।—বহিনজির চেলা কাঠ তো চন্দন কাঠ, কার সঙ্গে কার তুলনা। দু'হাত কোমরে তুলে সদর্পে দুলারির মুখোমুখি।—কি বলেছিলাম?

একটু কাঁচুমাচু মুখ করে দুলারি মিষ্টির দিকে তাকালো।—বলেছিল, এই সুরৎ নিয়ে আর বহিনজির কাছে গিয়ে কাজ নেই।

আবুর উদ্দেশ্যে মিষ্টির চোখে অনুযোগ করার আগেই আবু চেঁচিয়ে উঠল, নো ট্রু—নো ট্রু বহিনজি! আমি কক্ষনো একথা বলিনি।

ইংরেজির ধাক্কায় মিষ্টি হেসে ফেলল। বাপী হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কি বলেছিলে?

এবারও দুলারিই জবাব দিল, বলেছিল, দোস্ত-এর বউয়ের নাম মিষ্টি, কত মিষ্টি দেখো'খন—এক কথাই হল না?

মিষ্টি লজ্জা পাচ্ছে। ভালোও লাগছে। এই মানুষগুলো লেখা-পড়া জানে না, শহরেব আদব কায়দা জানে না এ একবারও মনে আসছে না।

সব শেষে আবু আর দুলারিকে বিদায় দিয়ে বাপী ঘরে এলো। রাত সাড়ে দশটার ও-ধারে। বাংলো নিঝুম এতক্ষণে। ঝলমলে সাজ-পোশাক বদলে মিষ্টি চওড়া লালপাড় হালকা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরেছে। সেই রঙেরই ব্লাউস। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে বসে আছে।

বাপী দু'চোখ ভরে দেখল খানিক। ঠোঁটের হাসি চেপে মিষ্টিও চেয়ে রইল। গায়ের জামাটা খুলে বাপী একদিকে ছুঁড়ে দিল। দরজা দুটো বন্ধ করে কাছে এসে দাঁড়ালো। মিষ্টির ঠোঁটে হাসি টিপটিপ করছে।

—কেমন লাগছে?

মিষ্টির চোখে মিষ্টি কৌতুক। জবাব দিল, এখনও বানারজুলির মতো লাগছে না।

বাপী থমকালো একটু। জানালার পর্দার ওপরের ফাঁকটুকু দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বলল, এক্ষুনি লাগবে, দেখো।

ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর জানালা দুটোর পর্দা সরিয়ে দিতেই দু'দিক থেকে বাইরের জ্যোৎস্না এসে ঘরে আর বিছানায় লুটোপুটি খেল।

বাপী বলল, শুয়ে পড়ো। চোখ বুজে শোনো।

মিষ্টি তাই করল। বাপী নিঃশব্দে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে দেখতে চারদিকের নীরবতা আরো নিঝুম। না, নিঝুম বলা একেবারে ভুল। রাশি রাশি ঝিঁঝি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। সামনে জঙ্গলের গাছপালার সঙ্গে চৈত্রের বসন্ত বাতাসের মিতালির সড়সড় শব্দ থেকে পুষ্ট হচ্ছে। মিষ্টি কান পেতে শুনছে।

প্রায় মিনিট দশেক বাদে সুইচ টিপে সবুজ আলোটা জ্বালল। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, বানারজুলি?

মিষ্টির চোখে হাসি দুলছে। মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, বেশ তো ছিল, আলো জ্বাললে কেন?

—হুঁ? বাপীর পলকা ভ্রূকুটি।—কেন জ্বাললাম?

তার গা ঘেঁষে বসল। চেয়ে আছে। মিষ্টিও। বাপী হাসছে অল্প অল্প। মিষ্টিও। বাপীর দু'চোখ লোভে টইটম্বুর। বাসনার দাপাদাপি টের পাচ্ছে তবু হাত বাড়াচ্ছে না। এই রাত কৃপণের মতো খরচ করার রাত।

হাসি-টুপটুপ ঠোঁটের কোণ দাঁতে কেটে মিষ্টি বলল, কি?

বাপী জিজ্ঞাসা করল, কি?

মিষ্টি বলল, এক গেলাস জল দেব?

বাপী বুঝে উঠল না। জিজ্ঞাসা করল, জল কেন?

মিষ্টি বলল, সেই কতকাল ধরে জল দিয়ে গিলে খাবার সাধ।

তার পরেই প্রমাদ গুনল। লুঠতরাজের দস্যুকে সেধে অন্তঃপুরের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরে সবুজ আলো। জানালার পর্দা সরানো। মিষ্টি চেষ্টা করল বাধা দিতে। পারা গেল না। দেড় যুগের বুভুক্ষু দস্যু সব বাধা ছিঁড়েখুঁড়ে তাকে বিপুল বিস্মৃতির মাঝদরিয়ায় টেনে নিয়ে চলল।

পৃথিবী কি থেমে ছিল কিছুক্ষণ...বা অনেকক্ষণ! কোনো নিঃসীম নীরবতার গভীরে ডুবে গেছল। নাকি বাপী ঘুমিয়ে পড়েছিল? আস্তে মুখ তুলে তাকালো। দেখছে। কোন্ অপরিসীম শান্তির জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলো।

মিষ্টিও চেয়ে আছে। তাকেই দেখছে।

কটা দিন প্রায় হাল ছেড়ে ভোগের এক অবুঝ দুরন্ত রূপ দেখল মিষ্টি। যৌবনের অতনুবাস্তবে এই লোক প্রথম নয়। কিন্তু পুরুষ যেন এই প্রথম। আগেও ভোগ দেখেছে। নিজেকে সেই ভোগের এমন একাত্ম দোসর ভাবতে পারেনি। দেহ-পথে সমস্ত সত্তার ওপর এমন দুর্বার দখল বিস্তার দেখেনি। আবার স্বার্থপরের দখলও নয়। দু'দিকেরই সমর্পণ শর্ত, সমর্পণ লক্ষ্য।

নিজের ছাব্বিশের এই মেদশূন্য সুঠাম দেহ সম্পর্কে মিষ্টি কম সচেতন নয়। সক্রিয় চেষ্টায় বয়েসটাকে বাইশের পাকাপোক্ত গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু কটা দিনের মধ্যেই অনুভব করেছে, যা আছে খুব বাড়তি কিছু নয়। এটুকু না থাকলে ওই দামাল পুরুষের দোসর হওয়া খুব সহজ হত না। মিষ্টির অবাক লাগে, এত ক্ষুধা এত তৃষ্ণা আর এমন দুর্জয় আবেগ নিয়ে এই মানুষ এতকাল বসে ছিল কি করে।

মিষ্টি সেদিন না বলে পারল না, যে কাণ্ড করছ, দুদিনে ফুরিয়ে গেলাম বলে।

বাপী নিরীহ মুখে ঘটা না করে দেখতে লাগল তাকে। এ-রকম দেখাটাই হঠাৎ জুলুমের সূচনা মিষ্টি এ ক'দিনে সেটা বুঝে নিয়েছে। চকিতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ হামলার মতলব দেখলেই সে ঘর থেকে পালাবে। অগত্যা গম্ভীর আশ্বাসের সুরে বাপী বলল, যতই করিবে দান, ততো যাবে বেড়ে।

বারান্দায় আবুর হাঁক শোনা গেল, বাপী ভাই আছ?

মিষ্টি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এলো। তাকে বসতে দিয়ে বলল, দিদি এলো না?

দিদি শুনে আবু গলে গেল।—তুমি ডাকছ শুনলে ছুটে আসবে—

বাপীও বারান্দায় এসে চেয়ার টেনে বসল। হাতে আগের দিনের খবরের কাগজ। ভাবখানা, এতক্ষণ এটা নিয়েই সময় কাটাচ্ছিল। এখনো ওতেই চোখ। এক-পলক দেখে নিয়ে আবু জিজ্ঞাসা করল, দোস্ত্-এর তবিয়ৎ ভালো তো?

—খুব ভালো। কেন?

—চার-চারটে দিন কেটে গেল, রোজই আশা করছি বহিনজিকে নিয়ে একবার গরিব ঘরে যাবে।

ছোট হাই তুলে বাপী জবাব দিল, কি করে যাই, নিজেও যাবে না, আমাকেও ছাড়বে না। সারাক্ষণ চোখে আগলে রেখেছে, দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী, বুঝতেই পারো...

মিষ্টির মুখ লাল। চারদিনের মধ্যে দুদিন জঙ্গল দেখতে বেরোনোর কথা সেই বলেছে। টেনে বার করা যায় নি। রাগ করে ভিতরের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

বাপী শাড়ির আঁচল টেনে ধরল। আ-হা, সত্যি কথা বললাম বলে আবুর সামনে অত লজ্জা কিসের। বিয়ের পর বউ ওকে একমাস পর্যন্ত ঘর ছেড়ে বেরুতে দেয়নি —তারও দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী—বেরুতে চাইলে দুলারি নাকি চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করত। তুমি তো অতটা করো না।

আবু গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বলল, তুমি খামোখা লজ্জা পাচ্ছ বহিনজী—সেই বাচ্চা বয়েসে তোমার জন্য বাপী ভাই যে পাহাড় থেকে ঝাঁপ খায়নি আমার বাপঠাকুদ্দার ভাগ্য। এবার উল্টো বলতে না পারলে ভাত হজম হবে?

আবু উঠে পড়ল। তার কাজের অন্ত নেই। একবার খবর নিতে এসেছিল। বাপীকে বলল, ঠিক আছে, দুলারিকে বলব'খন দোস্ত এখন বেজায় ব্যস্ত—ফুরসৎ মিললে বহিনজিকে নিয়ে আসবে।

সেই দিনই দুপুরের আকাশ অন্য রকম। বাতাস অন্য রকম। চৈত্রের মেঘ কালো আস্তরণ বিছিয়ে সূর্য ঢেকেছে। পাহাড়ী এলাকায় অসময়ের মেঘ নতুন কিছু নয়। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়েছে। গাছপালার সড়সড় শব্দ কানে আসতে ক'দিনের মধ্যে বাপীর মনে হল, বানারজুলির জঙ্গল আজ ওদের ডাকছে।

যেমন ছিল দুজনে তেমনি বেরিয়ে পড়ল। বাপীর পরনে পাজামা, গায়ে গেঞ্জির ওপর শার্ট। ও এ-ভাবে বেরুলো দেখে মিষ্টিরও সাজ বদলের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আটপৌরে ভাবে পরা দামী শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে নিল। গায়ে ফিকে লাল ব্লাউস। পিঠের ওপর খোলা চুল। যাচ্ছে জঙ্গলে। সেখানে যা সহজ তাই সুন্দর।

কিন্তু বাইরে এত ছোলাছুলি বাতাস আগে বুঝতে পারেনি। পাশাপাশি পাকা রাস্তা ধরে চলেছে। একটু বাদে মিষ্টি ফাঁপরে পড়ল। চুল সামলাতে গেলে শাড়ি যে বেসামাল হয়, আবার শাড়ির নিচের দিক ঠিক রাখতে গেলে আঁচল ওড়ে। বার কয়েক দেখে নিস্পৃহ গলায় বাপী বলল, যে যেদিকে চায় যেতে দাও না, অত ধকল পোহানোর কি দরকার।

ধমকের সুরে মিষ্টি বলল, খুব সখ যে, জঙ্গলে না নেমে হাঁটিয়ে মারছ কেন?

বাপী জবাব দিল না। মুচকি হেসে এগিয়েই চলল। দুপুরের রাস্তা একেবারে নির্জন বলেই মিষ্টিও খুব একটা অস্বস্তি বোধ করছে না। চলতে চলতে মাথার চুল আঁট-খোঁপা করে নিল। আর শাড়ির আঁচলটা কাঁধের ওপর দিয়ে এনে ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নিল। সামনে কেউ পড়লে আঁচলটা চট করে খুলে মাথায় টেনে দেওয়া যাবে।

বাপী মন্তব্য করল, এয়ার অফিসের জুনিয়র অফিসার মালবিকা এইবার ঠিক-ঠিক খসল—বানারজুলির মিষ্টির খোঁজ পাচ্ছি।

খুব মিথ্যে বলিনি। মিষ্টির নিজেরই ফেলে আসা এক দূরের অতীতের দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। একটু আগে যে বাংলোটার সামনে এসে দাঁড়াল, দেখা মাত্র সেই অতীত আরো কাছে এগিয়ে এলো। তাদের সেই বাংলো। সামনের কাঠের বারান্দাটা ঠিক তেমনি আছে।

পাশের লোকের দিকে চেয়ে সভয়ে বলল, কি মতলব, ভেতরে যাবে নাকি?

বাপী মাথা নাড়ল। যাবে না। বলল, ওই বারান্দাটার দিকে চেয়ে একটা দৃশ্য দেখছি। ...এমনি দুপুরে চোরের মতো এসে আমি একজনের অঙ্ক বলে দিচ্ছি। সে যখন টুকছে আমি তখন চোরের মতোই গায়ের সঙ্গে লেগে দাঁড়িয়ে তার গায়ের আর মাথার ঝাঁকড়া চুলের গন্ধ নাকে টানছি। অঙ্ক টোকায় ব্যস্ত সে আমাকে কাঁধ আর কোমর দিয়ে ঠেলে দিয়ে বলছে, আঃ, সরো না।

—অসভ্য কোথাকারের। দু'গালে লালের ছোপ পড়ল।

সেখান দিয়ে জঙ্গলে নামার মুখে কি মনে পড়তে মিষ্টি বলল, যাঃ, সেই গাছটা কেটে ফেলেছে।

বাংলোর সামনে রাস্তার ধারের সেই গাছটা হালে কাটা হয়েছে মনে হয়। মাস কয়েক আগেও বাপী ওটা ওখানে দেখেছে। সেই গাছের ডালে বসে বাপী নানা কৌশলে মিষ্টিকে বাংলো থেকে টেনে আনত।

জঙ্গলে ঢুকেই মিষ্টির একখানা হাত বাপীর দখলে। এই উপদ্রব মিষ্টির ভোলার কথা নয়। ভোলেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। ভ্রূকুটি করে বলল, ধেৎ, কেউ দেখে ফেলবে—

হাতের দখল আরো ঘন করে বাপী বলল, এই জঙ্গলে শুধু নিজের জন ছাড়া আর কেউ কাউকে দেখে না।

মিষ্টি বাধা দেয় না। তার অদ্ভুত ভালো লাগছে। অনেক পিছনে ফেলে আসা অতীত এমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে কে জানত! ছোট বড় গাছগুলো বাতাসে দুলে দুলে সেই আগের মতোই ডাকছে ওদের। সেই রঙিন প্রজাপতির দল জোড় বেঁধে এদিক ওদিক ভেসে বেড়াচ্ছে। জোড়ায় জোড়ায় কাঠবেড়ালি গাছের ডালে লুকোচুরি খেলছে। খরগোশের জুটি একটা আর একটাকে ধাওয়া করছে। পেখম-মেলা ময়ূর তার ময়ূরির মন ভোলাচ্ছে। জঙ্গলের এ যৌবনে জরা নেই।

খুশি মনে মিষ্টি তন্ময় হয়ে দেখছে। সব ছেড়ে হাত-ধরা মানুষটা যে অপলক চোখে ওকেই দেখছে খেয়াল নেই।

একটা গাছের মোটা সোটা ডালের ওপর হাত রেখে বাপী বলে উঠল, বাঃ ঠিক সেই রকম আছে—উঠে পড়া যাক, তারপর তুমি আমার পা বেয়ে উঠে পাশে বোসো।

মিষ্টি তক্ষুনি বুঝেছে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল। এইভাবে ওকে তুলে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরে পাশে বসানো হত। পড়ে যেতে পারে বলে ধমকেই এক হাতে নিজের গায়ের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে থাকত। বাঁদরের ভয় দেখিয়ে আরো কত রকমের দুষ্টুমি করত। নামানোর সময় আগে নিজের বুকের ওপর টেনে নামাতো। তারপরেও সহজে ছাড়তে চাইত না। পিপড়ে ডাঁইয়ের ভয় দেখিয়ে ওই রকম করে দশ-বিশ গজ এগিয়ে যেত।

—তুমি একটা অসভ্যের ধাড়ী—চলো।

আবার খানিক চলার পর বাপী আচমকা থমকে দাঁড়াল। গলা দিয়ে সসস করে ত্রাসের শব্দ বার করল একটা, সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাতের আঙুল একটা শিশু গাছের গুঁড়ির দিকে তুলে বলে উঠল, সাপ!

বিষম চমকে মিষ্টি একেবারে তার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।—কোথায়?

আরো ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বাপী শিশুগাছের মোটা গুঁড়িটা দেখালো।—ওই যে!...এই যাঃ, ওখানেই তো ছিল।...একটু আগে দেখলাম, ওই গাছের গুঁড়িতে জড়ানো সাদা-কালোর ছোপ মারা একটা বিশাল ময়াল লম্বা চ্যাপ্টা মুখটা সামনের দিকে টান করে এগিয়ে দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে চোখে আটকে ফেলেছে, আর তাকে ধরার জন্য গাছের গুঁড়ি থেকে শরীরের প্যাঁচ খুলছে—সেদিকের চেয়ে অবশ মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে—কোথা থেকে একটা ছেলে এসে এক ধাক্কায় মেয়েটাকে পাঁচহাত দূর ছিটকে ফেলে দিল, তারপর তাকে তুলে নিয়ে ছুটে পালালো।

জোর করেই দু'হাতে বাপী ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে, তেমনি শক্ত করে আগলে রেখে বলল, তারপর সেই মেয়ের মায়ের হাতে ওই ছেলের কানমলা পুরস্কার জুটল।

রক্তে দোলা লাগছে, মাথাটাও ঝিমঝিম করছে মিষ্টির।—ছাড়ো, কে কোন দিক থেকে এসে যাবে।

বাপী হাসছে।—বললাম না জঙ্গলের জগৎ আলাদা, এসে গেলেও কেউ কাউকে দেখে না। সেদিনের জন্য আমার কি পুরস্কার পাওনা ছিল?

জবাবে এদিক-ওদিক চেয়ে মিষ্টি নিজের ঠোঁটে তার ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে দিয়েই ধাক্কা মেরে সরালো তাকে।

বাপী হাসতে লাগল।

মিষ্টি বলল, আর বেড়িয়ে কাজ নেই, ফেরো।

বাপী বলল, আমার কি দোষ, একে একে সব মনে করিয়ে দিচ্ছি।

মিষ্টির ঠোঁটে চাপা হাসি। টিপ্পনীর সুরে বলল, জীবনে প্রথম পুরুষ চিনিয়েছ, সব মনে আছে, আর বেশি মনে করিয়ে দিতে হবে না।

বলল বটে, এক্ষুনি ফিরতে মোটেই চায় না। ছেলেবেলায় জঙ্গলে ঢুকলে রক্তে নেশা ধরত। এখনো তাই। তার থেকেও বেশি। সঙ্গের লোক হঠাৎ বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে গেল লক্ষ্য করছে। জঙ্গলের গাছ চেনালো। ব্যবসার কাজে লাগে এমন কিছু গাছ দেখালো। সাপ ধরার গল্প করল। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ঘুরতে ঘুরতে আর এক জায়গায় দাঁড়ালো।

গাছ-গাছড়ার মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা। বাপী ভাবুকের মতো চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর আলতো করে জিগেস করল, এ জায়গাটা মনে আছে?

চারদিক চেয়ে মিষ্টি ঠিক ঠাওর করতে পারল না। মাঝের আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে ঘুরে যাওয়ার ফলে সজাগও ছিল না তেমন। জিগ্যেস করল, এখানে কি?

জবাবে বাপী হঠাৎ গায়ের শার্টটা খুলে মাটিতে আছড়ে ফেলল। তারপর মিষ্টির বিমূঢ় চোখের সামনে পিছন ফিরে ঘুরে দাড়ালো। বলল, এখানে কিছু বেপরোয়া ব্যাপার ঘটেছিল বলে পিঠে এই দাগগুলো পড়েছিল। বাংলোয় দাঁড়িয়ে তুমি নিজের চোখে দেখেছিলে—

ওই হাসি-হাসি মুখ আর চোখের দিকে তাকিয়েই ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তি মিষ্টির। মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলের কোনো আদিম ইশারা আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরতে চাইছে তাকে। শরীর ঝিমঝিম করছে। ছোট ছেলেকে আশ্বস্ত করার মতো করে তাড়াতাড়ি বলল,

ঠিক আছে, ওখানেও হাত বুলিয়ে আদর করে দেব'খন, জামা পরে নাও।

বাপী বাধ্য ছেলের মতো নিচু হয়ে জামা কুড়োতে গেল। তারপর মিষ্টি কিছু বোঝার আগে চোখের পলকে ছোঁ মেরে তাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল। এক হাত ঘাড়ের নিচে, অন্য হাত দুই হাঁটুর পিছনে। একেবারে বুকের ওপর তুলে এনেছে।

মিষ্টির গলা দিয়ে একটু গোঁ গোঁ শব্দ বেরুলো শুধু। দুই ঠোঁট আর মুখও ততক্ষণে এই অকরুণ দস্যুর দখলে। বাধা দেবার সর্ব শক্তি নিঃশেষে টেনে নিচ্ছে। আর বুঝি থামবেই না।

থামল। মুখ তুলল। দু'চোখে অমোঘ অভিলাষের তরল বন্যা। চাপা ভারি গলায় বলল, পিঠের এ-দাগ ঘরের আদরে ভোলানো যাবে না।

দু'চোখ বড় করে মিষ্টি তাকালো একবার। জঙ্গলের সেই আদিম ইশারা এখন দামামা বাজিয়ে ধেয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ অবশ। অবশ অঙ্গের আধখানা মাটিতে আর আধখানা মাটির জামাটার ওপর নেমে এলো টের পেল। তারপর পৃথিবী আবার থেমে গেল। জঙ্গলের কানাকানি স্তব্ধতার গভীরে ডুবে গেল। আজ বাপী নয়, মিষ্টি তফরদার প্রায়-অচেনা এক জগৎ ঘুরে এখান থেকে এখানেই ফিরে এলে।

জঙ্গল ভেঙে মিষ্টি আগে আগে চলেছে। ছেলেবেলায় জঙ্গলের সোজা পথে ও-বাড়ি গেছে। এতকাল বাদে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। ভুল হয় হবে, তবু পিছন ফিরে তাকাবে না।

বাপী তার হাত দশেক পিছনে। রাগের মর্যাদা দিচ্ছে আর হাসছে অল্প অল্প। খানিক বাদে ভুল রাস্তায় পা বাড়াতে দেখে পিছন থেকে বলল, ওদিকে গেলে এক-আধটা-বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

মিষ্টির পা থেমে গেল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। গনগনে মুখ। কথা বলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তপ্ত জবাবটা আপনা থেকে এসে গেল।—বাঘ-ভালুকও তোমার থেকে ঢের বেশি নিরাপদ—বুঝলে?

অপরাধী মুখ করে বাপী তক্ষুনি মাথা নেড়ে স্বীকার করল। তারপর কোন দিকে যেতে হবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

মিষ্টি আবার আগে আগে চলল। এত দুঃসাহস কারো হতে পারে, তার শরীরটাকে নিয়ে কেউ এমন কাণ্ড করতে পারে ভাবা যায় না। প্রচণ্ড রাগই হচ্ছে মিষ্টির। কিন্তু রাগটা পিছনের লোকের ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি নিজের ওপর। কারণ ওই লোকের ওপর যত রাগ হবার কথা, চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক ততো রাগ হচ্ছে না।

পাছে এও টের পেয়ে যায় সেই রাগে আগে আগে চলেছে। সেই ভয়েও।

জঙ্গল ছাড়িয়ে রাস্তায় উঠলো। মিনিট তিনেকের পথ। বাংলো দেখা যাচ্ছে। আগে আগে পা বাড়িয়েও মিষ্টি থমকে দাঁড়াল। গেটের সামনে বিচ্ছিরি দেখতে একটা লোক দাঁড়িয়ে। খালি গা। মিস-কালো। একরাশ চুলদাড়ি। নিজের মনে বিড়বিড় করছিল। মিষ্টিকে দেখে ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে রইল।

মিষ্টি ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো। বাপী হাত পনের দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে আছে। এগিয়ে এসে বলল, কি হল, যাও?

—ওই লোকটা কে?

—ওর নাম হারমা। মাথার ঠিক নেই।

—আমাকে এভাবে দেখছে কেন?

—মনের মানুষের অভাবে ওর এই হাল। তুমি যে-মুখ করে ফিরছিলে সগোত্র ভেবে ওর বোধ হয় পছন্দ হয়েছে। চলো—

মিষ্টির হাত ধরে বাপী গেটের দিকে এগলো। এবারে মিষ্টি আর বাধা দিল না। লোকটার চাউনি দেখে অস্বস্তি লাগছে। দাঁড়িয়েই আছে। চেয়েই আছে।

—কি চাই?

বাপীর ঠাণ্ডা প্রশ্নে লোকটার সম্বিৎ ফিরল একটু। হাত তিন-চার দূরে সরে দাঁড়াল। পুরনো অভ্যেসে একটা হাত তুলে কপালে ঠেকালো। কিন্তু চাউনি সদয় নয় এখনো। ঘুরে হনহন করে জঙ্গলে নেমে গেল।

উনিশ

বানারজুলির বসন্ত এবারে শুধু আনন্দের পসরা সাজিয়ে বসে আছে। সেই আনন্দের ছোঁয়া বাপীর শিরায় শিরায়। অস্তিত্বের কণায় কণায়। এতকালের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা, দুঃসহ প্রতীক্ষা--সবেরই কিছু বুঝি অর্থ আছে। হাত বাড়ালে সহজে যা মেলে তার সঙ্গে এই পাওয়ার কত তফাৎ, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেটুকু অনুভব করার জন্যেই বোধ হয় অত যন্ত্রণা আর অমন প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল। নিজের সুরবিস্তারে শিল্পী অনেক সময় নিজেই ভেসে যায়, ডুবে যায়।

মিষ্টিকে নিয়ে আবু রব্বানীর বাড়িতে সেদিন সকালের দিকে এসেছিল। আগের বারে সন্ধ্যায় এসেছিল। আবু অনুযোগ করেছিল, জঙ্গলের গরিবখানা বহিনজি রাতে আর কি দেখবে, সকালে এলে ভালো লাগত।

এবারে বাপী তাই সকালে নিয়ে এসেছে। আবুর এখন দস্তুরমতো বড়সড় কাঠের বাংলো। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এরকম বাংলো বানারজুলিতে আর দুটি নেই। মিষ্টির সত্যি ভালো লেগেছে। ইলেকট্রিক নেই তাই আগের বারে রাতে এসে গা ছমছম করেছিল। আবু বা দুলারি কারোই ইলেকট্রিক পছন্দ নয়। জঙ্গলের মধ্যে বিজলীর আলো বেখাপ্পা। জঙ্গলে থাকার মজা মাটি। দিনের আলোয় চারদিকের সবুজের মধ্যে সবুজ বাংলোটা সত্যি সুন্দর।

প্রায় ঘণ্টা দুই আদর আপ্যায়ন আর আড্ডার পর মিষ্টির আপাদমস্তক একদফা ভালো করে দেখে নিয়ে দুলারি হঠাৎ বাপীকে বলল, তোমাদের বিয়েতে মরদেরা বউকে কত গয়না দেয় শাড়ি দেয়, তুমি বহিনজিকে কি দিলে বাপীভাই?

ভিতরে ভিতরে বাপী সত্যি অপ্রস্তুত। অন্যভাবে সামাল দিল। সাদামাটা মুখ করে বলল, এত দিয়েছি যে তোমার বহিনজি নিতে পারছে না।

শুধু দুলারি নয়, আবুও উৎসুক। আর কিছু বলছে না দেখে দুলারিই জিজ্ঞেস করল, কি দিলে?

মুখে জবাব না দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বাপী বার দুই তিন নিজের বুকে

ঠুকল। অর্থাৎ নিজেকেই দিয়ে ফেলেছে।

আবু রব্বানী আনন্দে হৈ-হৈ করে বলে উঠল, বহিনজি বুঝলেও এই দেওয়ার কদর ও বুঝবে না দোস্ত, ও বুঝবে না—নিজেকে ফতুর করে দিয়েও মন পেলাম না।

দুলারির কোপ আর আবুর চপলতায় দেওয়ার প্রসঙ্গ ধামা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু বাংলোয় ফেরার পথে দুলারির কথাগুলো বাপীর মাথায় ঘুর-পাক খেতে লাগল। জঙ্গলের মেয়ের পর্যন্ত যে-বাস্তব চোখদুটো আছে ওর তাও নেই। মিষ্টিকে ঘরে এনে তুলেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। না দুটো ভালো শাড়ি না কিছু গয়না। কলকাতা থেকে ওকে তুলে নিয়ে বানারজুলিতে ছুটে আসা ছাড়া মাথায় আর কিছু ছিলই না। নইলে দুটো ছেড়ে দু'ডজন শাড়ি কিনে ফেলতে পারত। আর গয়নাও...

আবার মনে পড়ল কি। ঠোঁটে স্বস্তির হাসি।

শোবার ঘরে ঢুকে মিষ্টি বাইরের শাড়িটাও বদলাবার ফুরসৎ পেল না। দু-মিনিট বিশ্রামের জন্য সবে শয্যায় এসে বসেছিল। আঁতকে উঠে দাঁড়াল।—ও কি!

বাপী ঘরে ঢুকে ভিতরের দরজা দুটে বন্ধ করছিল। বাইরের দরজা বন্ধই ছিল। ছিটকিনি দিয়ে বাপী ঘুরে দাঁড়াল।—কি?

—এই সাতসকালে দরজা বন্ধ করছ কেন?

নিরীহ মুখে বাপী ঘড়ি দেখল।—সকাল কোথায় এখন, বেলা সাড়ে দশটা।

—ভালো হবে না বলছি, দরজা খোলো শিগগীর!

বাপী ঘটা করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।—উঃ। পাপ মন সবেতে সাপ দেখে। হাসতে হাসতে দেরাজ খুলে বড় একটা চাবির গোছা বার করল। একটা চাবি বেছে নিয়ে সামনে ধরল। কোণের পেল্লায় সিন্দুকটা দেখিয়ে বলল, ওটা খোলো।

মিষ্টি থতমত খেল একটু।—ওটা কি?

আঙুল তুলে দেয়ালে টাঙানো গায়ত্রী রাইয়ের বড় ছবিটা দেখালো।—এটা ওই ঠাকরোনের, খোলোই না।

ওই মহিলার সম্পর্কে এ কদিনে অনেক শুনেছে। চাপা আবেগও লক্ষ্য করেছে। তাই দুষ্টুমির ব্যাপার কিছু ভাবল না। খুলল।

ওপরে ভাজ ভাজ করা রঙ-চঙা কার্পেট, রঙিন বেড-কভার, শৌখিন গায়ের চাদর। বাপীই এগিয়ে এসে একে একে সেগুলো তুলে ফেলল। তার পরেই মিষ্টির দু'চোখ ধাঁধিয়ে যাবার দাখিল। এত সোনা একসঙ্গে দেখেনি। শুধু সোনা নয়, একদিকে হীরে জহরত মণি মুক্তো। ঝুঁকে প্রথমে সোনার বারগুলো তুলে বাপী বেড-কভারে ঢাকা বিছানার ওপর রাখল। মিষ্টি হাঁ করে দেখছে। ছোট বড় মিলিয়ে পনেরটা বার। হাতে নিয়ে দেখল। সব থেকে ছোটটার ওজন দশ ভরির কম হবে না। তিরিশ ভরি ওজনেরও আছে। বাপী হীরে জহরত মুক্তোর কাঁধ-উঁচু ট্রেটাও এনে খাটের ওপর রাখল।

মিষ্টির হঠাৎ কেমন অস্বস্তি হতে লাগল। সোনার বাজার চড়া। একশ দশ পনের টাকা ভরি। কম করে আড়াইশ' ভরি হবে এখানে। আর ট্রেতে এতসব দামী পাথর। এসব খোলা পথে সিন্দুকে এসে উঠেছে ভাবতে পারছে না। ঘরে কারো এত সোনা থাকে কি করে! কেন থাকে!

—এই সব তোমার?

বাপীর মজাই লাগছিল। জবাব দিল—এই স-ব তোমার। এর ডবল ছিল। ওই ঠাকরোনটি তার মেয়েকে এই কাঁধে ঝোলাতে না পেরে মনের দুঃখে অর্ধেক তাকে ভাগ করে দিয়েছে, বাকি অর্ধেক তোমার জন্যে রেখে গেছে।

মিষ্টি মনে মনে মস্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা।—উনি আমার কথা জানতেন?

—ও বা-বা, না জানলে রেহাই পেলাম কি করে! পিঠের দাগ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

এই লোকের অসাধ্য কিছু আছে ভাবে না মিষ্টি। জিগ্যেস করল, তুমি কলকাতায় ছিলে আর এ-সব এখানে পড়ে ছিল?

—না তো কি, এর থেকে ঢের দামী জিনিস ছিনিয়ে আনার তালে ছিলাম বলে এসবের কথা মনেও ছিল না। আজ দুলারি বলতে মনে পড়ল।

মিষ্টি হেসে ফেলল। তারপর বলল, বুঝলাম, কিন্তু এসব ব্যাঙ্কে না রেখে ঘরে ফেলে রেখেছ কোন সাহসে?

—ব্যাঙ্কের থেকে এখানে রাখা ঢের নিরাপদ। ধরা পড়লে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হবে।

শোনামাত্র মিষ্টির আবার সেই অস্বস্তি। কিছু সংশয় প্রকাশ পেলে দেয়ালের ওই মহিলার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা ভাবতে পারে।—ঠিক আছে, এখন চটপট তুলে ফেলো।

—তুলে ফেলব মানে? দুলারি দারুণ লজ্জা দিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া সেরেই তোমাকে নিয়ে আর এসব নিয়ে শিলিগুড়ি যাব। সেখানে গয়নার অর্ডার দিয়ে পরে শাড়ি কেনা হবে।

মিষ্টির আবার মজা লাগছে। চোখেমুখে কপট খেদ...এটুকু সোনার আর হীরেমুক্তোর গয়না?

কি দিয়ে হয় বা কতটা হয় বাপীর ধারণা নেই। তবু ঠাট্টা বুঝল। হেসে জবাব দিল, করে রাখতে দোষ কি, ইটের ডেলা আর পাথরকুঁচির মতো তো পড়েই আছে।

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে মিষ্টি এবার খাট থেকে সব-কিছু তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রাখল। তার ওপর যা ছিল একে-একে সব তুলে চাপা দিতে লাগল।

—ও কি! সব চাপাচুপি দিচ্ছ, শিলিগুড়ি যাবে না?

—না।

—আলবৎ যাবে। বাপী বাধা দিতে এগিয়ে এলো।

দেখো, পাগলামো করো না! তোমার এই বুদ্ধি দেখলে দশ বছরের ছেলেও হাসবে।

—কেন হাসবে?

—কলকাতা থেকে এসে শিলিগুড়ি যাব গয়না গড়াতে আর শাড়ি কিনতে? কলকাতায় গিয়ে যা-হয় হবে।

বেজার মুখ দেখে হেসে ফেলে মিষ্টি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ এখনো। এই লোককে বিশ্বাস নেই। বলতে যাচ্ছিল, এই জঙ্গলের রাজ্যে তুমিই আমার সেরা গয়না।

আরো সাত দিন বাদে মিষ্টিকে নিয়ে বাপী ভুটান পাহাড়ে বাংলোয় চলে এলো। দিন দশেক নিরিবিলিতে কাটানোর ইচ্ছে এখানে। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে। পাহাড়

বেয়ে ওঠার সময় গায়ত্রী রাইয়ের স্বামীর অ্যাকসিডেণ্টের গল্প করেছে। ফলে এমন সুন্দর পাহাড়ী রাস্তাটাকে মিষ্টি ভয়ের চোখে দেখল। পরে ওঠা-নামার সময় গল্পের ফাঁকে ওর দিকে ঘাড় ফেরালেই ধমক লাগায়, সামনে চোখ রেখে চালাও—বর্ষায় এ-রাস্তায় তুমি মোটে আসবে না!

বাপীর দু-কান জুড়োয়। আরো বেপরোয়া হতে ইচ্ছে করে।

দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে ঝগড়ুর কালো মুখে খুশি ধরে না। মাথায় তুলে রাখা সম্ভব হলে রাখত। পাহাড়ের এই বাংলোর সে-সব জমজমাট দিনগুলো সে ভুলতে পারে না। তাই মনমরা। দিনকতকের জন্য হলেও মরা নদীতে খুশির জোয়ার এসেছে। এই মালিক মস্ত দিলের মানুষ গোড়া থেকেই জানে। কিন্তু তার পরীপনা বউও যে সেই রকমই হবে, নিজের হাতে খেতে দেবে, বসে গল্প শুনতে চাইবে, এ কি ভেবেছিল?

এখানে বসন্ত আরো উদার। আরো অকৃত্রিম। বাংলোর সামনেই ফুলের বাহার। পিছনে ব্যবসার গাছ-গাছড়ার চাষ করে পাঁচ-ছ'টা লোক। বাংলোর বাইরে যে-দিকে তাকায় জঙ্গল আর পাহাড়, পাহাড় আর জঙ্গল। পাহাড়গুলোও রিক্ত নয় এখন। মৌসুমি ফুলের মুকুট পরে বসে আছে। আর জঙ্গল তো ঋতুসাজে সেজেই আছে। তার বাতাস রক্তে দোলা দিয়ে যায়। তখন নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

যেতে হয়ও। জীবনের এই দোসরই তাকে বসন্তের বে-হিসেবী ভোগের রকমারি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে বাঁধ ভাঙে। তখন আর কৃপণ হতে ইচ্ছে করে না। হাল ছেড়ে রাগই করছিল।—তুমি এত জানো কি করে?

এ সম্পর্কেও বাপীর কিছু বইপত্র পড়া ছিল। তা ফাস না করে মাথা চুলকে জবাব দিয়েছে, দেখে-শুনে একজন মেয়ে মাস্টার রেখেছিলাম—সেই শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা করে দিয়েছে।

দু-হাতের ধাক্কায় বাপী খাট থেকে উল্টে পড়তে যাচ্ছিল। সেই ফাঁকে মিষ্টি ঘর থেকে পালিয়েছে। ভালো মুখ করে ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করতে বসেছে। আর ভয়ে ভয়ে বার বার পিছন ফিরে দেখছে।

তিন দিন বাদে বাপী ওকে নিয়ে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল, চলো আজ জঙ্গলে বেড়িয়ে আসি।

মিষ্টি উৎসুক তক্ষুনি। তার পরেই থমকালো।—কোনরকম অসভ্যতা করবে না?

বাপী হাসতে লাগল।—তা কি বলা যায়, সব এখানকার বাতাসের দোষ।

—যাব না, যাও।

বাপী আশ্বাস দিল, ঠিক আছে, চলো। এই জঙ্গলে পিঠে দাগ পড়ার মতো কোনো কারণ ঘটেনি।

পিঠে না হোক, মনে দাগ পড়ার মতো কিছু ঘটেছিল। মিষ্টির হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় পা ফেলা মাত্র সেটা মনে পড়ে গেল। আঙুল তুলে সামনের মস্ত দেবদারু গাছটা দেখিয়ে বলল, ওখানে এক অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মিষ্টির তক্ষুনি আগ্রহ।—কার সঙ্গে?

—উদোম ন্যাংটো এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তখন হাড় কাঁপানো শীত—ওই গাছটার

নিচে দিব্বি বসেছিল, সমস্ত গায়ে ভস্মমাখা, সামনে একটা ত্রিশূল। অমন দুটো চোখ আমি আর দেখিনি, ঝাঁকড়া চুল-দাড়িতেও তার আলো ঠিকরোচ্ছিল। আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, আগে বাঢ়। মিল জায়গা।

মিষ্টি অবাক।—কি মিল জায়গা?

—ওই জানে। আমার তখন সব সামনে এগোনোটা শুধু তোমাকে লক্ষ্য করে। এসবে ভক্তি বিশ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও নেই—কিন্তু গমগমে গলার স্বর আমার কানে বসে গেল, আর তারপর থেকে মনে এক আশ্চর্য জোর পেলাম। হেসে মন্তব্য করল, এর কোনো মানে নেই, সবটাই সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার জানি, কিন্তু তখন শুধু মনে হচ্ছিল, আমার দিন ফিরবেই আর তোমারও নাগাল পাবই।

মিষ্টি বাধা দিল, মানে নেই বলছ কেন, দিনও ফিরেছে, নাগালও পেয়েছ।

বাপী হেসে উঠল। জবাব দিল, সে-কি ওই সন্ন্যাসীর দয়ায় নাকি! আমার তেড়ে-ফুঁড়ে এগনোটা তো দেখোনি। তবে এগনোর জোরটা মনের সেই অবস্থায় অনেক বেড়ে গেছল সত্যি কথা।

মিষ্টি আর কথা বাড়ালো না। সাধুসন্তদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাদের প্রতি কোনোরকম অবিশ্বাস বা অবজ্ঞার কথাও শুনতে চায় না।

ফেরার পথে জঙ্গল ঘেঁষা সেই ছোট পাহাড়। বাপী নিজে উঠল খানিকটা হাত ধরে মিষ্টিকেও টেনে তুলল। তারপর টেনে যে জায়গায় বনমায়ার শোকে পাগল সেই বুনো হাতির খপ্পরে পড়েছিল, আর কোন পর্যন্ত ওটা তাদের ধাওয়া করে নিয়ে গেছল, দেখালো। এই অবধারিত মৃত্যু থেকে প্রাণে বাঁচার গল্প মিষ্টি কলকাতায় বাপীর প্রথমবারের সেই নামী হোটেলের সুইটে বসে শুনেছিল। তখনো শিউরে উঠেছিল। কত অল্পের জন্য বেঁচেছে চোখে দেখে এখন আরো গায়ে কাঁটা।

দুদিন বাদে সকালের দিকে আবু গাড়ি নিয়ে হাজির। একটা বড় কনট্রাকটের যোগাযোগ। মালিকের সামনে পাটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ইচ্ছে। বহিনজিকে আশ্বাস দিল বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।

বাপীর ফিরতে সন্ধ্যা গড়ালো। বাদশা পৌঁছে দিয়ে গেল। মুখ-হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে বাপীর মনে হল, মিষ্টি একটু চুপচাপ। জিগ্যেস করল, সমস্ত দিন কি করলে?

মিষ্টি বলল, ঝগড়ুর সঙ্গে গল্প করলাম, তোমার এখানকার বাগানে কি কি চাষ হয় না হয়, ঝগড়ু বোঝালো, সাপের বিষ তোলার ঘরও দেখালো—একটা মেয়ে মরে গেল বলে অমন লাভের ব্যবসাটাই তুমি বন্ধ করে দিলে বলে ঝগড়ুর খুব দুঃখ।

বাপী চেয়ে রইল একটু। তারপর অল্প অল্প হাসতে লাগল।—তোমার আরো কিছু বলার ইচ্ছে মনে হচ্ছে?

মিষ্টিও হাসল একটু।—তুমি রাগ না করলে বলতে পারি।

—তুমি আমার রাগের পরোয়া করো এই প্রথম জানলাম। আচ্ছা, বলেই ফেলো—

মিষ্টির তবু দ্বিধা।—আজ থাকগে, সমস্ত দিনের ধকল গেছে তোমার...।

—কিছু না। তার দিকে চেয়ে বাপী একটু মজার খোরাক পাচ্ছে। বলল, যেদিন

তোমাদের ডিভোর্সের রায় বেরুলো, আমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে তুমি জিগ্যেস করেছিলে যা হয়ে গেল তার পিছনে আমার কতটা হাত ছিল, আমি বলেছিলাম সবটাই—মনে আছে?

মিষ্টি মাথা নাড়ল, মনে আছে।

—তার মানে তোমাকে চাওয়া বা পাওয়ার ব্যাপারে আমি কোনো মিথ্যের আশ্রয় নিইনি। তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না, এটুকু ধরে নিয়ে মনে কি আছে বলে ফেলো দেখি?

এবারে মিষ্টি সোজা চেয়ে রইল একটু। মনে যাছে ব্যক্ত না করা পর্যন্ত নিজেও স্বস্তি বোধ করছে না। বলে গেল, কলকাতার এয়ারপোর্ট থেকে প্রথম যেদিন তুমি আমাকে হোটেলে নিয়ে গেছলে সেদিনও তুমি বনমায়ার সেই বুনো হাতির হাত থেকে প্রাণে বাঁচার ব্যাপারটা আমাকে বলেছিলে।...বলেছিলে, তোমার সঙ্গে একজন ছিল, সেই তোমাকে বাঁচালে। সেই একজন কোনো মেয়েছেলে তখনো বলোনি...এখানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সেই জায়গা যখন দেখালে, তখনও না।

বাপীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়েছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। কলকাতার হোটেলে রেশমার নামটা করতে পারেনি বলে নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবছিল, তাও মনে আছে।

—তোমার কাছে এ গল্প কে করল, ঝগড়ু?

সাদা মনেই করেছে। তোমাকে বাঁচানোর ব্যাপারে জঙ্গল আলো করা মেয়েটা কত সাহস আর কত বুদ্ধি ধরে তাই বলছিল।...রাত পোহাতে হঠাৎ সে এখান থেকে চলে গেল, আর কয়েকদিনের মধ্যে বানারজুলির সাপঘরে গিয়ে সাপের ছোবল খেয়ে আত্মহত্যা করল—সেই শোক আর সেই অবাক ব্যাপার ওর মনে লেগে আছে।

মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা যন্ত্রণার আভাস দেখছে মিষ্টি। একটু চুপ করে থেকে বাপী ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করল, বানারজুলির বাংলোর সামনে সেদিন যে পাগল লোকটাকে দেখেছিলে, মনে আছে?

—হারমা না কি নাম বলেছিলে।

—হ্যা। রেশমা ওকে ভালবাসত না, ও দারুণ ভালবাসত। তার শোকে এই দশা। এখন ওর ধারণা রেশমা আমার জন্যেই আত্মহত্যা করেছে। বলে বেড়ায়, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টি সত্রাসে চেয়ে আছে।

—হারমার ধারণা খুব মিথ্যে নয়।...রেশমাকে বাঁচাতে পারতাম। তাহলে বাপী মরত। সে তোমাকে পেত না। তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারত না।

মিষ্টি নির্বাক।

ভারী অথচ নিরুত্তাপ গলায় বাপী এরপরে অব্যর্থ সেই বীভৎস মৃত্যু থেকে রেশমার তাকে বাঁচানোর চিত্রটা অকপটে তুলে ধরল। বাংলোয় ফেরার পর রাতের ঘটনাও।

মিষ্টি উৎকর্ণ। তারও চোখে মুখে বেদনার ছায়া।

বাপী বলল, এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে যে আমার কত বড় শত্রুর হাতের মুঠোয় চলে গেল আর কোন অনুশোচনায় সে নিজের ওপর অমন বীভৎস শোধ নিল—সে কথা তুমি দুলারির মুখে শুনে নিতে পারো—রেশমা তাকে সব বলে গেছে।

মিষ্টি সখেদে মাথা নাড়ল। দু চোখে অনুতাপ। আর কারো কাছে কিছু শোনার দরকার নেই।

তেমনি ভারী গলায় বাপী আবার বলে গেল, কিন্তু তোমার কথার জবাব এখনো দেওয়া হয়নি।...যাই করুক, রেশমা রেশমাই। নিজের ওপর ওরকম শোধ সে-ই নিতে পারে। সেই বীভৎস দৃশ্য তুমি কল্পনা করতে পারবে না। পর পর অনেকগুলি রাত আমি ঘুমুতে পারিনি। যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেছে। কলকাতায় বা এখানে তোমার মনে এতটুকু ভুলের ছায়া পড়ুক তা আমি চাইনি। তোমাকে পাওয়ার আনন্দে স্বার্থপরের মতো অতবড় শোকের স্মৃতিও ভুলতে চেয়েছি। তাই তার নাম করিনি।

মিষ্টির বিচ্ছিরি লাগছে। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে যাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে, তার ভোগের দুর্বার তৃষ্ণাও দেখছে এখন। রেশমার সম্পর্কে এই গোপনতার ফলে একটা কুৎসিত সন্দেহ বার বার মনে আসছিল, নিজের কাছে অন্তত সেটা অস্বীকার করার নয়। চেয়ার ছেড়ে কাছে এসে দাড়াল। একটা হাত তার পিঠে রাখল।—ঘাট হয়েছে, আর কক্ষনো তোমাকে কিছু বলব না—হল?

—হাজার বার বলবে। বললে বলেই এখন হাল্কা লাগছে। তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যা থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—ব্যস!

দশ দিন বাদে আবার বানারজুলি। এসে সেই বিকেলেই গেটের কাছে আবার হারমাকে দেখেছে। বাংলোর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তাকে দেখেই ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। লোকটা নাকি বলে, রেশমাকে যে বাঁচতে দিল না তার কি ভালো হবে...।

মিষ্টির এই অস্বস্তি বাপীও লক্ষ্য করেছে। আবুকে বলেছে, হারমার এদিকে আসা আটকাও তো। তোমার বহিনজি ঘাবড়ে যায়।

তিন দিন দার্জিলিং আর দুদিন শিলিগুড়ি বেড়ানোর পর আবার বানারজুলিতে ফিরে মিষ্টি কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত। তার এক মাসের ছুটি প্রায় শেষ।

এ ব্যাপারে বাপী নির্লিপ্ত। জিগ্যেস করল, এয়ার অফিস তোমাকে কত মাইনে দেয়?

—কেন, তুমি তার থেকে বেশী দেবে?

—দেব।

মিষ্টি হেসেই জিজ্ঞাসা করল, কত বেশি দেবে?

—বেণীর সঙ্গে মাথা।

তার চাকরির ব্যাপারে এই লোক বিগড়বে এরকম আশঙ্কা মিষ্টির ছিলই। এরপর যা দেখল তাতে দু চক্ষু স্থির। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কের এক-গাদা পাশবই। তায় কোনটাতে বাপী তরফদার, কোনোটাতে বিপুল তরফদার, কোনোটাতে বিপুলনারায়ণ তরফদার, কোনটাতে বা শুধু নারায়ণ তরফদার। এক একটাতে টাকার অঙ্ক দেখেও মাথা ঘোরার দাখিল।

শুধু অবাক নয়, মিষ্টি অস্বস্তিও বোধ করেছে। সাদা সিধে রাস্তায় এত টাকা এলে নামের এত কারচুপি কেন? শুধুই ইনকাম ট্যাকস এড়ানোর জন্যে বলে মনে হল না। পাহাড়ের বাংলোয় গিয়ে সে আরো কিছু দেখেছে, জেনেছে। রেশমাকে নিয়ে অমন

এক আবেগের ব্যাপার ঘটে গেল বলেই মুখ ফুটে তখন কিছু জিগ্যেস করতে পারেনি। বানারজুলিতে ফেরার পর ভুলে গেছল।

ভাবনাটা এখনো চেপেই গেল মিষ্টি। বাপীর তক্ষুনি আবার দরকারী কাজ মনে পড়েছে। এসব পাশবই বাতিল করে দুজনের নামে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। চার পাঁচ দিন অন্তত লাগবে তাতে।

তাকে কিছু না জানিয়ে মিষ্টি টেলিগ্রামে আরো এক সপ্তাহের ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে নিল।

ওই সব ব্যাঙ্কের অ্যাকউন্ট দুজনের নামে ট্রান্সফারের সময়েও সেই নাম বদলের খেলা দেখল। এবারে একজনের নয়, দুজনেরই। কোথাও মিষ্টি তরফদার কোথাও মালবিকা তরফদার। কোথাও শুধু মিষ্টি দেবী বা মালবিকা দেবী। কোনটাতে আগে বাপীর নাম পরে ওর। কোনটাতে আগে ওর পরে বাপীর।

মিষ্টির সাদামাটা বিস্ময়।—নামের ওপর এত হামলা কেন?

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেছে। দুষ্টুমি চিকিয়ে উঠেছে।—সত্যি আমি রাম বোকা একটা, আসল লোক এত কাছে, তাকে ছেড়ে কিনা তার নামের ওপর হামলা!

নিরাপদ ব্যবধানে সরে গিয়ে মিষ্টি আবার জানতে চেয়েছে, বলো না কি ব্যাপার?

বাপীর এবারে সত্যি বলার দায়ে-পড়া মুখ।—জেল-টেল যদি হয় কখনো, একলা গিয়ে মরি কেন, দুজনে জড়াজড়ি করেই যাব।

মিষ্টিও হেসে ফেলে তাড়াতাড়ি কৌতূহল চাপা দিল। ধুরন্ধর কম নয়, উদ্বেগ টের পেয়েই এই ঠাট্টা। মিষ্টি তার পরেও শুধু লক্ষ্য করেছে। মুখের আয়নায় ভেতর দেখতে চেষ্টা করেছে। বড় রকমের গলদ বা জটিলতা কিছু থাকলে কেউ এমন নিঃশঙ্ক অকপট স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে দিন কাটাতে পারে না। এখানে এসে মিষ্টি পাহাড়ী ঝরনা কম দেখল না। পাথুরে বিঘ্ন ঠেলে, কোনো আবর্জনা গায়ে না মেখে তরতর করে নেমে আসে। হাতে নিলে স্ফটিকস্বচ্ছ। এই লোকের সঙ্গে মেলে। বিঘ্ন মানে না। আবর্জনা গায়ে মাখে না। ওসব যে দেখে, দেখুক।

মিষ্টিও আর দেখতে চেষ্টা করল না। উৎকণ্ঠা সরে গেল। সবই জানতে বুঝতে খুব সময় লাগবে মনে হয় না। পাহাড়ের বাংলোয় এই লোকের সেদিনের জোরের কথাগুলো ভোলার নয়। বলেছিল, তোমার আমার মধ্যে কোনো মিথ্যে থাকবে না, লুকোচুরি থাকবে না—ব্যস!

থাকবে না যে, তার প্রমাণ কলকাতা রওনা হবার দিনও আর এক-দফা পেল। উপলক্ষ হাতের চিঠি। এই সকালে এসেছে। আমেরিকা থেকে ঊর্মিলা একসঙ্গে ওদের দুজনকে লিখছে। রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পরেই বাপী আট-দশ লাইনের চিঠিতে বিয়ের খবর আর বানারজুলিতে লম্বা হনিমুন কাটানোর খবরটা শুধু দিয়েছিল। তার জবাব। চিঠিতে এমন কিছু প্রগলভ রসিকতার আভাস ছিল যার দরুন বউয়ের জেরার ভয়ে অনেক পুরুষ ওটা লুকিয়ে ফেলতে চাইত। চিঠিটা নিজে পড়ে বাপী নিঃসঙ্কোচে তার হাতে তুলে দিয়েছে। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিটিমিটি হেসেছে।

'ফ্রেণ্ড ডিয়ার অ্যাণ্ড ডিয়ার ডিয়ার মিষ্টি। চিঠি পেলাম। চিঠি এত ছোট কেন তাও বুঝলাম।

যুগলে শোনো! দেশের মতো এখানেও সামার এখন। ছোট বড় যে কোনো উপলক্ষে এখানে এখন মেয়ে পুরুষের নাচার ধুম। ওর আপিসের অসভ্য বন্ধুগুলোর আমাকে নিয়ে নাচার জন্য টানাটানি। আমি ছুতোনাতায় পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু সেদিন চিঠিখানা পেয়ে আর পড়েই ঘরের মধ্যে আমি এমন নাচা নাচতে লাগলাম যে তোমাদের মিস্টার মেহেরার দুই চোখ ছানাবড়া। ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে থামাতে এসে আরো বিপাকে পড়ে গেল। আমি তাকে নিয়েই ধেই ধেই নাচতে লাগলাম।

বাপী, তুমি একখানা সত্যিকারের শয়তান। যা চাও তাই পাও। তাই করো। আমি এরকম শয়তানের কত যে ভক্ত জানলে মিষ্টি না রেগে যায়। যাক এখন কি করে মিষ্টি পেলে না জানা পর্যন্ত আমার ভাত হজম হবে না। পত্রপাঠ সবিস্তারে লিখবে।

মিষ্টি, তুমি কত যে মিষ্টি একদিন স্ব-চক্ষে দেখেছি। আজ সত্যি কথা বলছি ভাই, তোমার সেদিনের অত ঠাণ্ডা হাব-ভাব দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি কোনো গৌরবের সমর্পণের অপেক্ষায় বসে আছ। নইলে সেদিন তুমি অত ঘটা করে ফ্রেণ্ডের অস্তিত্ব উপেক্ষা করতে চাইতে না। কিন্তু খুব সাবধান, ওই ডেনজারাস মানুষকে কক্ষনো যেন আর মিষ্টি ছাড়া করতে চেও না। তার মিষ্টি ছাড়া হবার আক্রোশ আমি যেমন জানি তেমন আর কেউ জানে না। এই আক্রোশে সে নিজে রসাতলে ডুবতে পারে অন্যকেও টেনে নিয়ে যেতে পারে।

বাপী, মিষ্টিকে এভাবে সাবধান করার জন্য তুমি নিশ্চয় আমার মুণ্ডুপাত করছ। মানে মানে এখন সরে পড়ি।

তোমাদের হনিমুনের হনি অফুরন্ত হোক।—উর্মিলা।

বাপীর ঠোঁটে হাসি ঝুলছে। চিঠি পড়া শেষ করে মিষ্টি মুখ তুলল। স্বাভাবিক জেরার সুরে জিগ্যেস করল, শেষের এই কথাগুলোর মানে কি?

—মানে, অত দূরে বসেও ওই মেয়ের আমাকে ডোবানোর মতলব।

—তোমার মিষ্টি ছাড়া হবার আক্রোশ ও যেমন জানে আর কেউ তেমন জানে না লিখেছে, আক্রোশে ওকেই রসাতলের দিকে টেনেছিলে নাকি?

—প্রায়।

মিষ্টির কৌতূহল বাড়লো।—শুনি না কি ব্যাপার?

বাপী বিপন্ন মুখ।—শুনতেই হবে?

মিষ্টি একটু হালকা খোঁচা দেবার লোভ ছাড়ল না।—তুমি বলেছিলে আমাদের মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না। বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না।

বাপী বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা।—এরপর আর না বলে পারা যায় কি করে। ...তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ভস্ম করার মেজাজ নিয়ে বানারজুলি ফিরেছিলাম। সেই আক্রোশে উর্মিলার প্রেম-কাণ্ডে আগুন ধরিয়ে ওকেই প্রায় গিলে বসেছিলাম—

মিষ্টি হাসতে গিয়েও হোঁচট খেল।—তোমার গেলার নমুনা তো জানি, প্রায় বলতে কতটা?

—তা অনেকটা। ওর মা তখন ষোলো আনা আমার দিকে—আমাকে ঠেকায় কে?

মিষ্টি এবারে রুদ্ধশ্বাস।—তারপর?

—তারপর ওই মেয়ের চোখের জল আমার পিঠে চাবুক হয়ে নেমে এলো। পড়িমরি করে আবার কলকাতা ছুটে গিয়ে বিজয়কে শিলিগুড়ি ধরে নিয়ে এলাম। আর এখান থেকে মায়ের অজান্তে মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে ওদের বিয়ে দিলাম।

মিষ্টি চেয়ে আছে। তার কান-মন ভরে যাচ্ছে।

কুড়ি

চাকরির মোহ মিষ্টিরও আর নেই খুব। উপার্জনের সঙ্গে প্রয়োজনের কিছুমাত্র যোগ না থাকলে সেটা সখের চাকরি। তখন দশটা পাঁচটার কড়াকড়ি খুব সুখের মনে হয় না। মিষ্টি তবু তর্ক করতে ছাড়েনি। বলেছে, ঘরে বসে থেকে করব কি, খাবদাব ঘুমুবো আর মুটিয়ে যাব?

ওর মুটিয়ে যাবার নামে বাপীর কপট আতঙ্ক।—সর্বনাশ! সেটা বরদাস্ত হবে না। যা আছ তার থেকে এক চুল মোটা হতে দেখলে খাওয়া আর ঘুম আর্ধেক করে দেব আর হরদম ওঠ-বোস করাবো। এতদিনে আমার হাতের একটা পাকা আন্দাজ হয়ে গেছে —রোজ রাতে আর ছুটির দিনের দুপুরে খুব কড়া করে মাপ নিয়ে ছাড়ব।

মিষ্টির অবাকই লাগে। এরকম বে-আবরু রসের কথা ওই মুখেই দিব্বি মানায়। হাসি চেপে বলেছে, তোমার অত কষ্ট করার দরকার কি, আমি চাকরিটা কবে গেলেই তো হয়।

বাপী গম্ভীর। তা হয় না। অসিত চ্যাটার্জি আমার কান বিষিয়ে রেখেছে। ওখানে নাকি গণ্ডায় গণ্ডায় লোক তোমার রূপে গুণে মজে আছে। সব ছেড়েছুড়ে আমাকে তাহলে তোমার অফিস পাহারা দিতে হয়।

সন্তর্পণে একটা মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে মিষ্টি। দুজনের মধ্যে দুস্তর তফাৎ কত, অনুভব করা যায়। মুখের কথা ছেড়ে আগের লোকের চাউনিতে অবিশ্বাসের ছায়া দেখলেও বরদাস্ত করতে পারত না, ঝলসে উঠত। আর এই একজনের তাই নিয়ে সাদাসাপটা ঠাট্টাও নির্ভেজাল রসের বস্তু হয়ে ওঠে।

মিষ্টির মা বাবা দাদারও এখন বাপীর সর্ব কথায় সায়। বিশেষ করে মায়ের। জামাই-গর্বে মহিলা ডগমগ। মেয়ের নিজের আলাদা নতুন গাড়ি হয়েছে, তার জন্য ড্রাইভার রাখা হয়েছে। সোনাদানার ছড়াছড়ি। ছেলের বউয়ের আর তার নিজের গায়েও এক-গাদা নতুন গয়না উঠেছে। মেয়ে কোনো আপত্তিতে কান দেয়নি। মেয়ের একলার হাতখরচের জন্য এখানকার ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা পড়েছে তা-ও চোখ ঠিকরে পড়ার মতো। জীবনভোর বড় চাকরি করেও মেয়ের বাপ অত টাকা জমাতে পারেনি। জামাইয়ের পরামর্শ মতো সেই টাকা মনোরমা নন্দী আর মালবিকা নন্দীর নামে রাখা হয়েছে—ঠিকানাও সেই বাড়ির। বাপীর সঙ্গে এই টাকার কেউ কেউ কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাবে না। ইনকাম ট্যাক্স এড়ানোর এই ফন্দি মিষ্টির খুব পছন্দ নয়। কিন্তু দাদা এমন কি বাবাও বলে, বেশি টাকা যাদের, এভাবে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে রাখতেই হয়।

মায়ের উদ্ভাসিত মুখ দেখে মিষ্টি তাকে আরো কিছু দেখানোর লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ি পাঠালেই মা চলে আসে। মেয়ের ঐশ্বর্যের আভাস পেলেও তার পরিমাণ

সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। মায়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার পর আনন্দে আত্মহারা মা-কে মিষ্টি নিজের এখানে নিয়ে এলো। খাওয়া দাওয়ার পর আরো কত সোনা আর মণিমুক্তো ঘরে পড়ে আছে মা-কে দেখালো। উত্তর বাংলার নানা ব্যাঙ্কে জমা টাকার পাশবইগুলো দেখেও মায়ের দম-বন্ধ হওয়ার দাখিল। মিষ্টি আনন্দ পেয়েছে বই কি। যে জামাইয়ের আজ এত গুণকীর্তন, এই মায়ের হাতে তার ছেলেবেলার হেনস্থা মেয়ে ভোলেনি। মানুষটার পিঠের ওই দাগগুলোর ওপর মিষ্টি যখন হাত বা ঠোঁট বুলিয়ে আদর করে, তখন সেই সব নির্যাতন অবজ্ঞা আর অবহেলা সব থেকে বেশি মনে পড়ে।

কিন্তু এত ঐশ্বর্য বলেই মিষ্টি নিজেও স্বস্তি বোধ করে না খুব। একটা উৎকণ্ঠা মনের তলায় থিতিয়েই আছে। ভুটান পাহাড়ের বাংলোয় নিজের চোখে কিছু দেখে এসেছে। কিছু বুঝেও এসেছে। তারপর ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে এই জমা টাকার স্তূপ দেখে কেবলই মনে হয়েছে এত বড় ব্যবসার তলায় তলায় কিছু বে-আইনী ব্যাপারের স্রোতও বইছে। বাপীর দিকে চেয়ে কোনরকম উদ্বেগের ছিঁটে-ফোঁটাও যে দেখে না—সেটা অবাক হবার মতো কিছু নয়। তার মতো বেপরোয়া দুঃসাহসী কজন হয়।

মুখে কিছু না বলে মিষ্টি দেখে যাচ্ছে। বুঝতে চেষ্টা করছে। নিজের চোখ আর বুদ্ধির ওপর আস্থা আছে। বাড়ির নিচের তলায় অফিস। বাপীর কথামতো খাওয়া-দাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টার জন্য এসে বসে। জিত্ থাকলে তার কাছ থেকে কাজকর্ম বোঝা সহজ হয়। আর শুধু এই লোক থাকলে খানিক বাদে ফষ্টি-নষ্টি শুরু হয়ে যায়। এক-একদিন কাজের অছিলায় বাপী গম্ভীর মুখে জিত্‌কে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মিষ্টি মনে মনে অপ্রস্তুত হয়। জিত্ চলে গেলে রাগ দেখায়।—তোমার যে যে দিনে বাইরে কাজ থাকবে সেই সব দিনে আমি এখানকার কাজ দেখতে বা বুঝতে নামব।

বাপীর ঠোঁটে জবাব মজুত।—আমার যা হবার হয়েছে, বউ ছেলে আছে, বেচারা জিতের মাথাটা আর খাবে কেন।

—জিত কি বোকা নাকি, তোমার চালাকি বুঝতে পারে না ভাবো?

—না পারার কি আছে। তোমাকে কি করে ঘরে এনেছি ও সেটা খুব ভালোই জানে।

তবু এই ক-মাসে মিষ্টি যতটুকু দেখেছে বা বুঝেছে, এখানকার ব্যবসায় বেআইনী কিছু আছে মনে হয়নি। বাপীর সঙ্গে উল্টোডাঙার বিশাল গোডাউনও দেখে এসেছে। সেখানে ভাসুর অর্থাৎ মণিদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের কথা মিষ্টির শোনা ছিল। মাসখানেক আগের ছুটিতে বাচ্চু এসেছিল। তখন শুনেছে। শোনার পর ছেলেটার জন্য ভারী মায়া হয়েছিল। ওই ছেলেও খুব আর ছোটটি নেই এখন। সবই বোঝার কথা। যাই হোক, গোডাউন দেখেও সন্দিগ্ধ হবার মতো কিছু চোখে পড়েনি।

প্রথম ধাক্কা খেয়েছে মাস চার-পাঁচ বাদে বাপীর সঙ্গে টুরে এসে। পর পর দুবার মিষ্টি যেচে সঙ্গ নিয়েছে। তার স্পষ্ট কথা, খুব আনন্দ করে চাকরি ছাড়িয়েছ, এখন একলা বসে আমার দিন কাটে কি করে?

বাপী সানন্দে নিয়ে এসেছে। ভালো হোটেল যেখানে আছে সেখানে আর অসুবিধে কি। মিষ্টি সেই প্রথম টের পেয়েছে এ-সব দিকের ব্যবসার সবটাই সাদা রাস্তায় চলছে না। ফার্মের নামে অনেক টাকা চেকে আসতে দেখেচে। সেই সঙ্গে থোকে থোকে কাঁচা টাকাও। কাঁচা টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে না। যা-ও পড়ছে তা-ও ফার্মের

নামে নয়, দুজনের নানা নামের অ্যাকউন্টে। ঘরের সিন্দুকে অত কাঁচা টাকার আমদানিও এই থেকেই বোঝা গেল। প্রথমবারের সন্দেহ দ্বিতীয়বারে সঙ্গে এসে আরো মাথায় গেঁথে গেল। এবারে মধ্যপ্রদেশের কয়েক জায়গায় টুরে আসা হয়েছিল। ফেরার সময় গা শিরশির করার মতো সঙ্গে পাঁজা পাঁজা নোট।

এবারে ফিরে এসে মিষ্টি আর চুপ করে থাকতে পারল না। উদ্বেগ বুঝতে না দিয়ে ঘুরিয়ে প্রসঙ্গটা তুলল। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের সেই ভুটান পাহাড়ের বাংলোর পিছনের অত জায়গায় সবটা জুড়ে শুধু নেশারই নানারকম গাছগাছড়ার চাষ হচ্ছে দেখেছিলাম, সব ওষুধে লাগে?

বাপী হেসে জবাব দিল, ওষুধে যতটা লাগে নেশায় তার থেকে বেশি লাগে।

—তোমার লাইসেন্স আছে?

—লাইসেন্স না থাকলে এত জায়গায় ব্যবসা চালাচ্ছি।

—না, মানে নেশার জন্য ও-সব বিক্রি করার লাইসেন্সও আছে?

বাপী হাসতে লাগল।—হঠাৎ তোমার মাথায় এসব চিন্তা কেন?

—বলোই না?

—আমি হোলসেলারদের দিয়ে খালাস। যা করার তারা করে। কোটার বাইরে তারা যা নেয় তার হিসেব মুখে মুখে—আমার রেকর্ড সাফ।

মিষ্টির পছন্দ হল না। বলল, কোটার বেশি জিনিস দেওয়াও তো অন্যায়, বিশেষ করে কেন বেশি নিচ্ছে তা যখন তুমি জানো।

এই গোছের ন্যায়-নীতির আলোচনা ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু বাপীর একটুও খারাপ লাগছে না। মিষ্টির ভেতরটা এখনো ছেলেবেলার মতোই পরিষ্কার। বলল, লোকে নেশা করবেই, তাই এ অন্যায় তুমি না করলে আর একজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে করবে। হেসে খোঁচাও দিল, আর ন্যায়-অন্যায় যা-ই বলো সব করেছি তোমার জন্য—পিছনে টাকার জোর ছিল না বলে বানারজুলির বড়সাহেবের বাংলোয় ঢুকতে পর্যন্ত পেতাম না—লোকে নেশা আর কতটুকু করে, তোমার জন্য আমার টাকা রোজগারের নেশা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মিষ্টি মুখে আর কিছু বলল না, কিন্তু ভিতরে একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়েই থাকল। বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার জন্যেই যদি হয় তো এ নেশায় আর কাজ কি! আমার নাগাল তো পেয়েছ, এখন সাদা রাস্তায় চলো। বলতে পারল না। এত বছর ধরে এত জায়গায় যা ছড়িয়ে বসেছে, হুট করে তা গুটিয়ে ফেলতে বললে কান তো দেবেই না, উল্টে হেসে উড়িয়ে দেবে। বিরক্তও হতে পারে। এর পর বাপী টুরে বেরুলে ঘরে না ফেরা পর্যন্ত মিষ্টির একটা চাপা অস্বস্তির মধ্যে কাটে। এত কাঁচা টাকা নিয়ে অনায়াসে ঘোরাফেরা করে, মিষ্টির সে-জন্যেও দুশ্চিন্তা।

ইচ্ছে থাকলেও এখন আর সঙ্গে যাওয়া হয় না। নরেন্দ্রপুর থেকে বাচ্চুকে ছাড়িয়ে এনে আবার কলকাতার স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মুখে না বললেও বাচ্চুর এখানে থাকার ইচ্ছেটা মিষ্টি টের পেত। কলকাতায় এলে কাকীমার কাছছাড়া হতে চায় না। এই থেকেই বুঝেছে। আর এই ছেলেটার ওপর তার কাকার স্নেহ মায়া মমতাও লক্ষ্য করেছে। এত বড় বাড়িতে মিষ্টিরও একা ভালো লাগে না। সে-ই তাগিদ দিয়ে বাচ্চুকে আনিয়েছে।

ছেলেটার ওপর আগেই মায়া পড়েছিল। এখন আরো বেড়েছে।

সামনের বারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। কিন্তু মিষ্টি মাস্টার রাখতে দেয়নি। বাপীকে বলেছে, এটুকু দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।

বাপী আরো নিশ্চিন্ত।

সময় সময় তবু মিষ্টির কেমন নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিমনা দু-চোখ নিজের দেহে ওঠা-নামা করে। যেমন ছিল তেমনি আছে। আগের মতই কাঁচা, তাজা। তবু খুশি হতে পারছে না তেমন। বছর ঘুরতে চলল, দেহের নিভৃতে কোনো সাড়া নেই, ঘোষণা নেই। সব থেকে বেশি কাম্য কি এখন, মুখ ফুটে বাপীকে বলতে না পারলেও নিজে জানে। কোল-জোড়া হয়ে থাকার মতো কাউকে চাই। আগের জীবনে আর ছেলেপুলে না হওয়াটা ইচ্ছাকৃত ভাবত। একবারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সেই সম্ভাবনাও ভয়ের চোখে দেখত। সেই দোসরের ওপর ভরসা আদৌ ছিল না, তাই নিরাপদ বিধি-ব্যবস্থার দায় নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু এখন কি? এই এক বছর ধরে তো কোনো বাধারই বালাই নেই। ভাবতে গেলে নিজের মুখ লাল হয় মিষ্টির। দুর্বার স্রোতে ভেসে যাওয়ার এমন পরিপূর্ণ আনন্দ আগে জানা ছিল না। নিজের শরীর স্বাস্থ্য অত ভাল না হলে ধকল পোহানোও খুব সহজ হত না। এই ভোগ-বিস্মৃতির একটাই পরিণাম। কিন্তু এত দিনেও শরীরে তার কোনো লক্ষণ বা ইশারা নেই কেন?

মিষ্টির দুশ্চিন্তার ছায়াটা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠেছে। সেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথা মনে পড়েছে। বলেছিল, অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তখনকার সেই ভাঙা স্বাস্থ্যই সব থেকে বড় ক্ষতি ধরে নিয়েছিল মিষ্টি। সেই ক্ষতি মানে কি তাহলে এই! এত পাওয়ার বিনিময়েও তার কিছু দেবার থাকবে না?

নিজের হেপাজতে গাড়ি, হাতে অঢেল টাকা, মিষ্টি দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বসে থাকল না। মা-কে শুধু বলল। তারপর সেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে মায়ের মারফৎ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তার কাছে গেল। সঙ্গে কেবল মা। আর কেউ কিছু জানে না।

মা সব বলার পর কেসটা বড় ডাক্তারের কিছু কিছু মনে পড়েছে। 'দু' সপ্তাহে বারকয়েক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সে মা-কে জানিয়েছে, এত দিনেও হয়নি যখন, আর হবে বলে মনে হয় না। হবেই না এমন কথা ভদ্রলোক খুব জোর দিয়ে না বললেও মিষ্টি যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। মা ডাক্তারের কথা মানতে রাজি নয়। কলকাতা শহরে বড় ডাক্তার ওই একজনই নয়। মায়ের তাগিদে সমস্ত কেস সহ আর দুজন বিশেষজ্ঞ দেখানো হয়েছে। তাদেরও উনিশ-বিশ একই কথা। তবে আশ্বাস দিল, বিজ্ঞান থেমে নেই, এ ধরনের কেস নিয়েও বিদেশে ঢালাও গবেষণা চলছে। কোনো আশা নেই, এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে না।

আগের জামাইয়ের ওপর জ্বলন্ত আক্রোশে মনোরমা নন্দী দুর্ভাবনার ব্যাপারটা ছেলেকে না বলে পারেনি। ছেলে আবার কথায় কথায় সেটা বাপীকেই বলে ফেলেছে। এই ভগ্নীপতি তার সব থেকে অন্তরঙ্গজন এখন। মা-কে নিজে তাগিদ দিয়ে দাদুর সাতাশি নম্বরের বাড়ি দীপেন নন্দীর একলার নামে লেখাপড়া করিয়েছে। শুধু তার জন্যেই ভগ্নীপতি ঘরে দামী বিলিতি বোতল মজুত রাখে। নিজে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে সপরিবারে তাকে বানারজুলিতে বেড়াতে পাঠিয়েছে—সেখানে নিজের বাংলোয় নি-

খরচায় রাজার হালে রয়েছে। সেখানেও বেড়ানোর জন্য একটা গাড়ি চব্বিশ ঘণ্টা তার দখলে। এমন দরাজ ভগ্নীপতির কাছে গোপন করার কি আছে। তার ওপর তরল পদার্থ পেটে পড়তে মনের খেদ আপনি প্রকাশ পেয়েছে।

বলেছে, বোনটার মন খুব খারাপ। তিন-তিনজন স্পেশালিস্ট দেখানো হয়েছে, তারা এই-এই বলছে—ওই অসিত রাসকেলটাকে হাতের নাগালে পেলে দীপুদা নিজেই তার মাথাটা ছাতু করে দেয়, ইত্যাদি।

বাপী আদৌ আকাশ থেকে পড়েনি। প্রথম বারের সেই অঘটনের পর দীপুদার মুখ থেকে বড় ডাক্তারের মন্তব্য শুনে বাপীর মনে এই সংশয় ছিল। মিষ্টিকে ঘরে আনার তিন মাসের মধ্যেও কোনো লক্ষণ না দেখে ছেলেপুলে যে আর হবে না, ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সে-জন্য তার এতটুকু মাথাব্যথা নেই বা অসিত চ্যাটার্জীর মাথাও ছাতু করার ইচ্ছে নেই। সমস্ত অন্তরাত্মা নিয়ে মিষ্টিকে চেয়েছিল। পেয়েছে। সেই অঘটন না ঘটলে বা তার পরেও একটা বা দুটো ছেলেপুলে থাকলে বাপীর চাওয়া আর পাওয়া দুই-ই বরবাদ হয়ে যেত।

বলে ফেলার পর দীপুদার অন্য সুর।—মা নিষেধ করেছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছে তোমার জেনে রাখাই ভালো। আমার মুখ থেকে শুনেছ মিষ্টিকে বোলো না যেন—দুদিন আগে হোক পরে হোক ও নিজে তো বলবেই তোমাকে।

বাপী বলেনি।

মিষ্টির থেকে থেকে বাপীর ওপরেই রাগ হয় এখন। এত বড় ব্যবসার কোনো কিছু চোখ এড়ায় না। বানারজুলি থেকে সময়ে আবু রব্বানীর চিঠি না এলে এখান থেকে টেলিগ্রাম যায়। সব কে-কেমন আছ জানাও। ঊর্মিলার চিঠি পেলে মিষ্টিকে তাগিদ দিয়ে জবাব লেখায়। জিতের আবার ছেলেপুলে হবে, তার বউ অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। কিন্তু জিতের থেকেও চিন্তাভাবনা বেশি তার মালিকের। থোক থোক টাকা দিচ্ছে, খবর নিচ্ছে। বাচ্চুর দিকেও কড়া দৃষ্টি, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা। একমাত্র মিষ্টির সঙ্গেই যেন শুধু ভোগ-দখলের সম্পর্ক ষোল আনা ছেড়ে আঠের আনা।

খুব সুবিচার করছে না ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি নিজেই বোঝে। এই সম্পর্কে ভোগদখলের থেকে সমর্পণ ঢের বেশি। আসলে রাগ হয় অন্য কারণে। নিজের দুশ্চিন্তা সম্পর্কে এই লোককে সেধে সজাগ করতেও সংকোচ। কিন্তু এত যার বুদ্ধি-বিবেচনা আর সবেতে এমন প্রখর দৃষ্টি, এতদিনে এ-ব্যাপারেও তো তার নিজে থেকেই সচেতন হওয়ার কথা। হলে মিষ্টির পক্ষেও সংকোচ ঝেড়ে সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো সহজ হত। ও এখনো একেবারে হাল ছেড়ে বসে নেই। এরকম কেস নিয়ে বিদেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে শুনছে। দরকার হলে তাদেরও বাইরে চলে যাওয়া তো জলভাত ব্যাপার। কিন্তু এ-ব্যাপারে ওই মানুষের এতটুকু হুঁশ নেই দেখেই মিষ্টির কখনো রাগ, কখনো অভিমান।

এই মানসিক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ বড় রকমের ধাক্কা খেল একটা। দিন কয়েক আগে মিষ্টির কাছে ঊর্মিলার চিঠি এসেছে। তার শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না লিখেছে। খুব অস্পষ্ট একটু ইঙ্গিতও আছে চিঠিতে যা পড়ে শুধু মেয়েরাই সন্দিগ্ধ হতে পারে। মিষ্টি সেটা ধরিয়ে দিতে খুশি মুখে বাপী পারলে তক্ষুনি তাকে পাল্টা চিঠি লিখতে বসিয়ে দেয়। তাগিদ সত্ত্বেও তিন দিনের মধ্যে লেখা হয়ে ওঠেনি। বিকেলে বাইরের ঘরে বসে

বাচ্চু কাকুর কাছে তাদের স্কুলের খেলার গল্প ফেঁদে বসেছে। মিষ্টিও শুনছিল। আর এক-ফাঁকে উঠে গিয়ে চট করে চিঠিটা লিখে ফেলবে কিনা ভাবছিল। ওদিকে মনে পড়লেই বকুনি খেতে হবে।

কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা দুটো ভেজানো ছিল। বাপী সাড়া দিল, কাম ইন!

দরজা ঠেলে ঘরে পা ফেলল সন্তু চৌধুরী। পরনে দামী ট্রাউজারের ওপর সিল্কের শার্ট, কব্জিতে সোনার ব্যাণ্ডের ঘড়ি, দু-হাতের আঙুলে জেল্লা ঠিকরনো আংটি। লম্বা ফর্সা বলিষ্ঠ অপরিচিত মানুষকে খবর না দিয়ে সরাসরি দোতলায় উঠে আসতে দেখে মিষ্টি বাপীর দিকে তাকালো। প্রসন্ন মনে হল না তাকে।

সন্তু চৌধুরীর পিছনে আরো কেউ আছে কিনা বাপী ঝুঁকে দেখে নিল। তারপর নীরস স্বরে বলল, সন্তুদা যে...

ঘুরে বাচ্চুকে বলল, ভিতরে যা।

ছেলেটার দিকে চোখ পড়তেই মিষ্টি বুঝে নিল কে হতে পারে। বাচ্চু উঠে চলে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মিষ্টিও উঠে দাঁড়াল।

বাচ্চুকে এখানে দেখেই সন্তু চৌধুরীর ফর্সামুখ রাগে লাল। ওকে ভিতরে চলে যেতে বলা হল তাও কানে গেছে। সপ্রতিভ গাম্ভীর্যে এগিয়ে এলো। মিষ্টির মুখের ওপর। কপালে সিঁথিতে সিন্দুর আরো ঘরোয়া বেশবাস দেখে কে হতে পারে আঁচ করেছে। আর বাপীর মনে হল সেদিনের হা-ঘরে ছেলের এই বরাত দেখেও লোকটার বুক চড়চড় করছে। চোখ তুলে আলতো করে একবার তাকাতে মিষ্টি বুঝে নিল, ভব্যতার দায় কিছু নেই, সে-ও ভিতরে যেতে পারে।

ঘরের দিকে পা বাড়াতে পিছন থেকে বেশ অবাক সুরের প্রশ্ন কানে এলো, সঙ্গে সঙ্গে সরস জবাবও।

—তোমার মিসেস নাকি?

—একেবারে নির্ভেজাল।

মিষ্টি আড়ালে চলে গেল বটে, কিন্তু দূরে নয়। যে এলো তার থেকে ঘরের লোকের হাবভাব দেখে ওর বেশি দুশ্চিন্তা।

বাপী বলল, বোসো, হঠাৎ কি মনে করে?...

—হঠাৎ নয়, বিলেত থেকে ফিরে তোমার অনেক খোঁজ করেছিলাম। ফ্ল্যাট ছেড়ে বাড়ি করেছ কি করে জানব। ফোন গাইডেও তোমার নিজের নাম নেই। দিন কয়েক আগে খবরের কাগজে হঠাৎ হার্ব-ডিলার রাই অ্যাণ্ড তরফদারের বিজ্ঞাপনে টেলিফোন নম্বর দেখে তোমার বউদি অনেকটা আন্দাজেই ফোন করেছিল। তোমার অফিস থেকে খবর পেল তুমি এ-বাড়ির দোতলায় থাকো।

খুব ঠাণ্ডা গলায় বাপী জিজ্ঞাসা করল, আমাকে এত খোঁজাখুঁজির কারণ কি?

চাপা ঝাঁঝে সন্তু চৌধুরী জবাব দিল, বাচ্চু তোমার ঘাড়ে পড়ে আছে সেই সন্দেহ আমাদের হয়েছিল। দু বছরের ওপর নিজের ছেলের একটা খবর পর্যন্ত না পেলে মায়ের মন কেমন হয় সেটা ওই রাসকেল বুঝতে না পারুক, তোমার বোঝার কথা।

...কার কথা বলছ, মণিদার?

সন্তু চৌধুরী জবাব দিল না। ঝাঁঝালো মুখ।

বাপী আরো শান্ত।—যা বললে, দ্বিতীয়বার উচ্চারণ কোরো না, ওই ভদ্রলোক আমার দাদা।

সন্তু চৌধুরীর ছোট চোখজোড়া খাপ্পা হয়ে উঠল।

একই সুরে বাপী আবার বলল, বাচ্চুকে কেউ আমার ঘাড়ে চাপায়নি, আমিই ওকে নিয়েছি।

রূঢ় স্বরে সন্তু চৌধুরী বলল, এখন আমরা যদি ওকে নিয়ে যেতে চাই?

—আমরা বলতে তুমি কে?

সন্তু চৌধুরী থমকালো একপ্রস্থ। মুখ আরো লাল।—ওর মা যদি নিতে চায়?

—ওব মা বলে কেউ আছে আমি ভাবি না। আর কিছু দিন গেলে বাচ্চুও ভাববে না।

দু-চোখ ধক ধক করছে সন্তু চৌধুরীর। সেদিনের সেই করুণাপ্রার্থীর মত স্পর্ধা ভাবতে পারে না। চেঁচিয়ে উঠল, ধরাকে সরা দেখছ এখন তাহলে, মস্ত একজন হয়ে গেছ, কেমন? নিতে চাইলে তুমি ঠেকাতে পারবে?

—চেষ্টা করে দেখ। গলা চড়িও না, ছেলেটা শুনতে পাবে।

—চড়ালে তুমি কি করবে?

—গলাধাক্কা খাবে।

সন্তু চৌধুরী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছাকাছি গিয়েও আবার ফিরল। দুচোখে গলগল করে তপ্ত বিষ ঝরছে।—অপমান মনে থাকবে, নিজের চরিত্র ভুলে এখন এতবড় সাধু হয়ে উঠেছ জানা ছিল না।

বাপী আস্তে আস্তে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে একটি কথাও বলল না। আরো কিছু জানানোর জন্যে ধীরে সামনে এগলো।

মুহূর্তে বিপদ বুঝে সন্তু চৌধুরী এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

ওদিক থেকে মিষ্টি ছুটে এসে বাপীকে টেনে ফেরালো। দু কাঁধ ধরে জোর করে তাকে সোফায় বসিয়ে দিতে দিতে বলে উঠল, এ কি কাণ্ড—অ্যাঁ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি—বোসো বলছি। সত্যি তুমি ভদ্রলোককে মারতে যাচ্ছিলে?

—ও ভদ্রলোক নয়।

—খুব হয়েছে। ঠাণ্ডা হয়ে বোসো এখন।

—বাচ্চু কি করছে?

—ওর ঘরে কাঠ হয়ে বসে আছে।

বাপী বলল, ঠিক আছে, তুমি ওর কাছে যাও।

সোফায় হাত রেখে মিষ্টি দাঁড়িয়ে রইল একটু। পুরুষের এত সংযত অথচ এমন ভয়-ধরানো মূর্তি আর দেখেছে? এদিক-ওদিক দেখে নিল। তারপর চট করে দু-হাতে বাপীর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়েই দ্রুত ভিতরে চলে গেল।

দুদিন বাদে বিকেলের দিকে মিষ্টি নিউ মার্কেট থেকে ফিরল। যখন বেরোয় বাপী

বাড়ি ছিল না। মিষ্টি ফেরার আগে ফিরেছে। বাইরের ঘরে বসেছিল। বলাই তাকে বলেছে দিদিমণি গাড়ি নিয়ে মার্কেটে গেছে। কিন্তু ফিরল খালি হাতে বাপী খেয়াল করল না। ও কাছে আসতে খুশি মুখে বলল, জিতের এবারও ছেলেই হয়েছে—মেয়ের ইচ্ছে ছিল খুব।

কিছু না বলে মিষ্টি চুপচাপ ঘরে চলে যাচ্ছিল। বাপীর তখুনি আবার মনে পড়ল কি। ডাকল, শোনো! উর্মিলার চিঠির জবাব দেওয়া হয়েছিল তো?

মিষ্টি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। থমথমে মুখ। চোখে চোখ।—না।

—কেন? সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত।

—আমার সময় হয়নি, হবেও না। তুমি নিজে লেখো।

চলে গেল।

বাপী ভেবাচাকা খেয়ে গেল প্রথম। কি হতে পারে ভেবে নিল। ওর নিজের মনে চাপা দুঃখ থাকতেই পারে, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা বলে এমন থমথমে মুখ দেখবে বা এমন কথা শুনবে ভাবা যায় না। বাপীর মনে মিষ্টির জায়গা ঈর্ষার অনেক ওপরে। অন্যের আনন্দে খুশি না হতে পারাটা ঈর্ষা ছাড়া আর কি? বাপীরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আশা করল, একটু ঠাণ্ডা হবার পর নিজেই লজ্জা পাবে। ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে উঠে সে-ও হাসিমুখেই ঘরে এলো।

মিষ্টি চুপচাপ খাটে বসে আছে। তেমনি থমথমে মুখ।

—কি ব্যাপার?

জবাবে মিষ্টি অপলক চেয়ে রইল।

বাপীর খটকা লাগল একটু। মনে হল, দু চোখে তার ভেতর দেখছে।

—এই মূর্তি কেন?

এবারে জবাব দিল। ফিরে জিজ্ঞাসা করল, বলব? তোমার আমার মধ্যে লুকোচুরির কিছু থাকতে পারে না, তবু বললে ঠাণ্ডা মাথায় বরদাস্ত করতে পারবে?

যে গোপনীয় ব্যাপারটা এত দিন ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল সেটাই কবুল করবে ধরে নিয়ে হাসি চেপে বাপীরও নিজের মুখখানা সীরিয়াস করে তোলার চেষ্টা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে বসার কুশনটা টেনে নিয়ে ওর দুই হাঁটুতে প্রায় হাঁটু ঠেকিয়ে মুখোমুখি বসল।—পারব। মিষ্টির সবই আমার কাছে মিষ্টি। বলে ফেলো।

উঠে সামনের দরজা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে মিষ্টি আবার জায়গায় ফিরে এলো। —তোমার গৌরী বউদির সেই ভদ্রলোক একটু আগে আমার ওপর দিয়ে তার সেদিনের অপমানের শোধ নিল। সেই মহিলাও পাশে ছিল।

বাপীর সত্তাসুদ্ধ আচমকা ঝাঁকুনি খেল একপ্রস্থ। তপ্ত রক্তকণার ছোটাছুটি। জায়গায় ফিরে স্থির হতে সময় লাগল।—কি অপমান করেছে?

মিষ্টির দু চোখ তার চোখে বিঁধে আছে।—মার্কেটে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেতে খুব খুশির বিনয়ে তোমার বউদির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সম্মান দেখিয়ে আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলল। তুমি কত বড় একজন হয়েছ দুবার করে শোনালো। তারপর আমাকে কংগ্র্যাচুলেট করে বলল, এমন মস্ত মানুষের ঘরে আমাকে আশা করেনি, অন্য একজনকে দেখবে ভেবেছিল।

—কেন? বাপীর দুই চোয়াল শক্ত।

—গাড়িতে আর একজনের অবাঙালী সুন্দরী বউকে পাশে বসিয়ে তোমাকে আনন্দে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে দেখেছে। শুধু সে নয়, তোমার বউদিও দেখেছে। গাড়িতে সেই মেয়েকে বসিয়ে রেখে তুমি নাকি নেমে এসে তাদের সঙ্গে কথাও বলেছ। তুমি তাদের বলেছ, নিজের বউ নয়, অন্যের বউ। তাই আমার বদলে তাকে এখানে দেখবে আশা করেছিল।

বাপীর তখুনি মনে পড়ল। অল্প অল্প মাথা নেড়ে বলল, একদিন দেখেছে—ঠিকই দেখেছে।—তাহলে একথা শুনেই তোমার সব বিশ্বাস ধ্বসে গেছে?

মিষ্টি চেয়ে আছে। নিরুত্তর।

—সেই আর একজনের সুন্দরী বউকে তুমিও দেখেছ। তার নাম ঊর্মিলা। গাড়িতে পাশে সে ছিল। সেই একই দিনের কথা—তোমার অফিস থেকে তাকে নিয়ে ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীটের রাস্তায় তাদের সঙ্গে দেখা।

মিষ্টি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা সুরে বলল, সেদিনের কথা জানতাম না, তবে আমারও ঊর্মিলা বলেই মনে হয়েছিল।

—তাহলে? সে আর কি অপমান করেছে তোমাকে?

মিষ্টি চেয়ে রইল একটু।—শুনলে তোমার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকবে মনে হয় না।

—আমার মাথা সম্পর্কে তোমারও খুব ধারণা নেই। বলো।

—প্রথমবার কলকাতায় এসে তুমি কয়েকমাস বাচ্চুর বাবা-মায়ের আশ্রয়ে ছিলে নিজেই বলেছিলে। আজ শুনলাম বয়সে অত বড় বউদির দিকে তোমার চোখ গেছল বলেই সেখান থেকে তোমাকে তাড়ানো হয়েছিল। সত্যি কিনা তোমার বউদিকেই জিজ্ঞাসা করতে বলল। আমি জিজ্ঞেস করিনি। তোমার বউদি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল।

এ-ই শুনবে বাপী জানত। কুশন ঠেলে ঘরের মধ্যে একবার পায়চারি করে আবার মিষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল।—আমার ভিতরের জানোয়ারকে তুমি ছেলেবেলায় দেখেছ। পরেও তার চোখ অনেকবার অনেক দিকে গেছে। কিন্তু বাপী তরফদার তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চায়নি বলে চাবুক খেয়ে ওটাকে চোখ ফেরাতে হয়েছে। বাচ্চুর মা কোথায় কোন বাড়িতে থাকে জানে কিনা ওকে জিগ্যেস করে এসো!

আগের কথায় ধাক্কা খেয়েছিল। এবারে মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি প্রমাদ গুনল। —জেনে কি হবে, তুমি সেখানে যাবে?

—না গেলে সন্তু চৌধুরী যা বলেছে তার কতটা সত্যি তুমি জানবে কি করে?

উঠে দু-হাত ধরে মিষ্টি তাকে বিছানায় বসাতে চেষ্টা করল। আর কিচ্ছু জেনে কাজ নেই—অপমানে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

তখনকার মতো বাপী ঠাণ্ডা হল বটে, কিন্তু তার পর থেকে সমস্তক্ষণ গুম হয়ে থাকল। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ-ঘর ও-ঘর করল। মিষ্টিকে সামনে দেখলে দাঁড়াচ্ছে। দেখছে। আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। একটু বাদে একটা বই খুলে বসল। কি বই মিষ্টি জানে। আরো দুই-একদিন এ-বইটার পাতা ওল্টাতে দেখা গেছে। নেপোলিয়ন হিল-এর থিংক অ্যাণ্ড গ্রো রিচ। রিচ অর্থাৎ বড়লোক হওয়ার রাস্তা দেখানো হয়েছে ভেবে কৌতূহল হয়ে মিষ্টিও বইটা উল্টেপাল্টে দেখেছিল। আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার দেখে পড়ার উৎসাহ হয়নি।

রাতে চুপচাপ।

মিষ্টির এতক্ষণের চাপা অস্বস্তি এবারে বুকে চেপে বসল।—যেমন মা-ই হোক, ছেলের জন্য কাতর হওয়া স্বাভাবিক। বাচ্চুর মা-ও অনেক কষ্টে ছেলের হদিস পেয়েছে। সেই সঙ্গে ওই ছেলের এখন একমাত্র আশ্রয় কে বা কারা তাও জেনেছে। তবু ছেলের মুখ চেয়েও মহিলা ওই লোকটার অমন কুৎসিত কথাগুলো প্রতিবাদ করল না কেন? সত্যের ছিটেফোঁটাও না থাকলে ওভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারল কি করে?

এর জবাব পরদিন পেল। স্কুল থেকে ফিরে জলখাবার খেয়ে বাচ্চু তার ঘরে গেছে, মিষ্টি ডাইনিং টেবিলে বসে। বাপী নিচের অফিস ঘরে। উঠে এলে একসঙ্গে চা খাবে।

সময় ধরেই উঠে এলো। একলা নয়, তার পিছনে আরো একজন।

—মিষ্টি, গৌরী বউদি, তোমার কাছে এসেছেন।

মিষ্টি নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। সহজাত সৌজন্যে উঠে দাঁড়ানোর কথা। পারা গেল না। অস্ফুট স্বরে বলল, বসুন।

বসল। বেশ সহজ সুরে বলল, বেশি বসার সময় নেই ভাই। বাপীর দিকে ফিরল। চোখে একটু হাসির আভাস।—বউয়ের নাম মিষ্টি তুমি রেখেছ না ও-ই নাম?

বাপীও হাল্কা জবাব দিল, আমার কোনো কেরামতি নেই।

গৌরী বউদি মুখে আর নামের সঙ্গে চেহারার মিলে প্রশংসা করল না। তাড়ার মধ্যে কিছু দরকারী কাজ সেরে যাওয়ার মতো করে বলল, তোমার কাছেই একবার এলাম ভাই...

মহিলার রীতি জানা নেই মিষ্টির। গ্লানি বা পরিতাপ-কাতর মুখ দেখছে না।—কাল যা শুনে এসেছি তা সত্যি নয় জানাতে? গলার স্বর সংযত হলেও সদয় নয় খুব।

গৌরী বউদি তক্ষুনি জবাব দিল, হ্যাঁ। সব মিথ্যে।

—কিন্তু কাল তো একটি কথাও বললেন না।?

গৌরী বউদি চুপচাপ চেয়ে রইল একটু। জবাব দিল, কেন বললাম না, না বুঝে থাকলে বাপীকে জিগ্যেস কোরো।

প্রায় আধ মিনিট কারো মুখে আর কথা নেই। গৌরী বউদি চেয়ার ছেড়ে উঠল। বাপীকে বলল, তোমার বউভাগ্য ভালো, এর থেকে ঢের বেশি রাগ দেখব ভেবেছিলাম। চলি।

বাপী পলকে ভেবে নিল কি। গলা চড়িয়ে ডাকল, বাচ্চু—!

বাচ্চু এলো। তারপরেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কে এসেছে জানত না।

গৌরী বউদি ওর আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। সহজ সুরেই জিজ্ঞাসা করল, কি রে কেমন আছিস?

গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না ছেলেটার। সামান্য মাথা নাড়ল। ভালো আছে।

গৌরী বউদি চুপচাপ দেখল আর একটু। বলল, সব সময় কাকা কাকিমার কথা শুনে চলবি।...

দরজার দিকে পা বাড়ালো। বাপী এগিয়ে এলো।

নীচে গৌরী বউদির ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। তাকে তুলে দিয়ে বাপী দু-মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো। বাচ্চু ঘরে চলে গেছে। বলাই তক্ষুণি চায়ের পট আর পেয়ালা সাজানো ট্রে রেখে গেল।

বাপী চেয়ার টেনে মিষ্টির মুখোমুখি বসল। চা ঢেলে মিষ্টি একটা পেয়ালা তার দিকে এগিয়ে দিল।

বাপী বলল, গৌরী বউদিকে এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে বললে পারতে।

নিজের পেয়ালা মুখের দিকে তুলতে গিয়ে মিষ্টি থমকে তাকালো। চেয়েই রইল একটু। বলল, কি জানি, আমি জানতাম বাচ্চুকে তুমি ওই মায়ের ছায়াও মাড়াতে দিতে চাও না, তাছাড়া সেদিন আর একটা লোককে তুমি গলাধাক্কা দিতে গেছলে দেখে আজ আরো এই ভুলটা হয়ে গেল।

প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু বাপী চুপচাপ হজম করে গেল। ভিতরে একটু অসহিষ্ণুতার তাপ ছড়িয়ে আছে। কেন, নিজেও জানে না। মনের অনুভূতিগুলো সর্বদা যুক্তির পথে চলে না। তাই কেউ বুঝতেও পারে না। যেমন এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে সমস্ত অতীত মুছে দিয়ে এই গৌরী বউদিকে যদি মণিদার কাছে আর তাদের ছেলের কাছে ফিরিয়ে এনে দিতে পারত—দিত। তা হবার নয় বলেই ক্ষোভ হয়ত। কিন্তু মিষ্টি এই ক্ষোভের কি অর্থ খুঁজে পাবে?

একটু বাদে মিষ্টিই আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, অপবাদ দিয়ে তোমাকে তোমার দাদার বাড়ি থেকে তাড়ানোর কথাটাও মিথ্যে তাহলে?

পেয়ালা সামনে রেখে বাপী সোজা হয়ে বসল। সোজা তাকালো। দুজনের মধ্যে কোনো গোপনতা থাকবে না বলেছিল। এই গোপনতার সবটুকু ছিঁড়েখুঁড়ে দিলে কি হয় দেখার তাড়না। জবাব দিল, খুব সত্যি।

মিষ্টি থতমত খেল। অপবাদ সত্যি হলেও এই মুখ দেখবে ভাবেনি। আরো শোনার প্রতীক্ষায় চেয়ে রইল।

চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা গলায় বাপী বলল, কাল আমার ভেতরের যে জানোয়ারটার কথা তোমাকে বলেছিলাম, কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও গৌরী বউদি সেটাকে ঠিক দেখেছিল। দেখে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিল. তার আগে জানোয়ারের টুটি টিপে ধরে বাপী তরফদার ছিটকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই ও-বাড়িতে আর ঠাঁই হয়নি।

নিখাদ সত্যের আলোয় এসে দাঁড়ানোর ফল দেখল বাপী। মিষ্টির চোখে প্রথমে অবিশ্বাস, তারপর সমস্ত মুখ লাল। পাহাড়ের বাংলোয় রেশমার কথা শুনে বুক ভরে গেছল, আজকের অনুভূতিটা তার বিপরীত ধাক্কার মতো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চুপচাপ উঠে চলে গেল।

কিন্তু বাপীর হাল্কা লাগছে। এই সত্যের স্বাদটুকু বিচিত্র লাগছে।

একুশ

এই সকালের একটা সামান্য ব্যাপার মনে পড়ল বাপীর। গাড়ি চালাচ্ছিল। তখন ঝমঝম বৃষ্টি। জোর বাতাস। সামনের কাঁচের ওধারে ওয়াইপারটা উঠছে নামছে। তা সত্ত্বেও কাঁচটা থেকে থেকে ঝাপসা ধূসর হয়ে যাচ্ছিল। ফলে সামনের সবও ঝাপসা। বাপী এক-একবার হাত দিয়ে হিমাভ কাঁচের খানিকটা ঘষে দিচ্ছিল। তক্ষুনি শুধু ওইটুকু জায়গায় ভিতর দিয়ে সামনের যা-কিছু সব তকতকে পরিষ্কার।

সেই গোছেরই কিছু হয়ে গেল। ভিতরের কোনো খুব আবছা আর্দ্র জায়গায় হঠাৎ ঘষা পড়েছে। তার ওধারে ঝকঝকে তকতকে কারো অস্তিত্বের ঝিলিক। দু'চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো ছটা তার। কয়েক পলকের জন্য বাপীর মনে হল শক্ত হাতে জীবনের সব ঝড়-জল-জঞ্জাল ঘষে-মুছে দিতে পারলে তবেই সেখানে পৌঁছনো সম্ভব।

মিষ্টি বেশ একটা ধাক্কা খেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এ-জন্যে বাপীর এতটুকু উদ্বেগ নেই। মিষ্টির ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হবার কথা। তাকে রেশমার কথা বলা হয়েছে। ঊর্মিলার কথা বলা হয়েছে। গৌরী বউদির কথাও বলল। সব বলার পিছনেই গোপনতার সুড়ঙ্গ-পথ থেকে আলোয় আসার তাগিদ বাপীর। মিষ্টির সামনে কোনো মিথ্যের মুখোশ পরে থাকাটা যন্ত্রণার মতো।

ঠাণ্ডা মাথায় মিষ্টি সত্যি ভেবেছে। ভেবে হাল্কা হতে পেরেছে।...ওই লোকের প্রবৃত্তি ছকে বাঁধা হিসেবের শাসন জানে না, আবার নিজেই নিজেকে টেনে তোলে এই জোর না থাকলে অমন বিচ্ছিরি সত্যি কথাও মুখের ওপর বলে দিত না। ও কিছু জানতেও পারত না।...আর সত্যি কথাই বা কতটা সত্যি? তার থেকে মনের তলায় জমা পরিতাপটুকুই হয়তো বেশি সত্যি। কারণ, এত দিনের মধ্যে মিষ্টি কি কোনো জানোয়ারের অস্তিত্ব টের পেয়েছে? পুরুষের দুরন্ত ভোগ হয়তো দেখেছে। ভেসে যাওয়া দেখেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াও দেখেছে। অনুভব করেছে। জানোয়ার স্বার্থপর। একলা ভোগী। জানোয়ার তার দোসরের মন নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মিষ্টির মেজাজ উল্টে এত ভালো হয়ে গেছে যে রাতের প্রগলভ শয্যায় এই ভাবনার আভাসটুকুই দিয়েই ফেলেছে। খুশিতে বুক বোঝাই বাপীর। কিন্তু আকাশ থেকে পড়া মুখ।—সে কি! আমার মধ্যে তুমি জানোয়ার দেখোনি?

মিষ্টি অনায়াসে মাথা নেড়েছে। দেখে নি।

—তোমার দশ বছর বয়সে বানারজুলির সেই জঙ্গলেও না? যার জন্য আজও আমার পিঠে এই দাগ।

তার পিঠের তলায় একটা হাত গুঁজে দিয়ে সেই দাগে আঙুল ঘষতে ঘষতে মিষ্টি জবাব দিয়েছে, জঙ্গলের জীব-জন্তুদের, ভালবাসা-বাসি দেখে দেখে তখন তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছল।

কিন্তু দিনের আলোয় মিষ্টির কাছে আসার রীতি এখন একটু অন্যরকম। এই থেকে কি ধরনের দুশ্চিন্তা ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বাপী আঁচ করতে পারে। সময় সময় কৌতুকও বোধ করে। দামাল ছেলের ঝড়ের মুখে বুক পেতে দেবার স্বভাব হলে তাকে আগলে রাখতেই হয়। বেপরোয়ার মতো জ্বলন্ত আগুনে হাত বাড়ানোর স্বভাব হলে সে-হাত টেনে ধরতেই হয়। মিষ্টির এখন এই গোছের দায়। নিজের সহজ অথচ অনমনীয় ব্যক্তিত্বের ওপর আস্থা খুব। সেটা বড় করে তুলে এমন দুরূহ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা।

হিসেবের বাইরে অজস্র টাকা আসাটা ও কখনো ঝড় ভাবে, কখনো জ্বলন্ত আগুন ভাবে।

পরের পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে বাপী কাজ উপলক্ষে আরো দু'বার বানারজুলি গেছে। সঙ্গে মিষ্টিও গেছে। আবু রব্বানীও বারকতক কলকাতায় এসেছে। মিষ্টির চোখ-কান খোলা। বুদ্ধিও রাখে। টের না পাবার কারণ নেই। আরো কিছু গোপন ব্যবসার খবর

তার জানা হয়ে গেছে। বানারজুলিতে মদের কারবার আর কলকাতায় মদ চোরাই-চালানের খবর। আর কলকাতায়ও বনজ নেশার জিনিসের বাড়তি চালান আসছে এখন তাও বুঝেছে। বুঝবে না কেন। গোপন টাকা আমদানির পরিমাণ তার কাছে তো আর গোপন নেই। আবু রব্বানীকে মিষ্টি জেরার মুখে ফেলেছিল। সে মাথা চুলকে পালিয়ে বেঁচেছে। দোস্তকে সতর্ক করেছে।

সেবারে বানারজুলি থেকে ফিরেই মিষ্টির সাফ কথা!—এসব চলবে না।

বাপী অজ্ঞতার ভান করছে।—কি চলবে না?

—মদের চোরাই কারবার আর চোরাই-চালান। আর ওষুধের নামে নেশা যোগানো—

গুরুদায়িত্ব পালনের মুখখানা দেখে বাপীর মজা লাগছিল। মুখে নিরীহ বিস্ময়। —মদের কারবারে আমাকে পেলে কোথায়—ওসব তো আবু আর জিতের ব্যাপার।

—কার ব্যাপার আমি খুব ভালো করে জানি। বন্ধ করতে না পারো তোমার ক্যাপিট্যাল তুমি তুলে নাও।

—ও-বাব্বা! এও জেনে ফেলেছ?

—আমি ঠাট্টা করছি না। আমার খুব খারাপ লাগছে। আর ওষুধের নামে সব জায়গায় যা চলছে তাও বন্ধ করতে হবে।

আরো একটু উসকে দেবার লোভে বাপী বলল, তুমি চাইলেও লোকে নেশা বন্ধ করবে না। আমি বন্ধ করলে তক্ষুনি আর কেউ এসে শুরু করবে।

—যে করে করবে, তুমি করবে না। তুমি নিজেই বলেছিলে, যা করেছ সব আমার জন্যে করেছ—আমি বলছি আর দরকার নেই।

বাপী হাসছে মিটিমিটি।—সেই কশাইয়ের গল্প শুনেছ—যে সকাল-বিকেল মাংস কাটত অথচ তার কাছেই যোগীরা যোগের পাঠ নিতে যেত?

—শুনেছি। মাংস কাটা কশাইয়ের কাজ ছিল। তাতে চুরি ছিল না। আমি চুরি চাই না। সাদা ব্যবসা করো।

ভিতরে ভিতরে বাপীর এই প্রথম নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। এতক্ষণের মজায় বিপরীত টান ধরল। চেয়ে রইল খানিক।—আমার মধ্যে তুমি তাহলে মস্ত একটা চোর দেখছ...চোর ভালো করার জন্য ক্ষেপে উঠেছ?

মিষ্টি থমকালো।—সোজা কথাকে অমন বেঁকিয়ে দেখো না।

—আমি সব সোজা দেখি। ডান হাতের বুড়ো আঙুল বার দুই নিজের বুকে ঠেকিয়ে বলল, ভেতরে দেখার চোখ থাকলে তুমি এখানে সব সোজা দেখতে, সব সাদা দেখতে।

ক্ষুব্ধস্বরে মিষ্টি জানান দিল, ওখানকার কথা বলছি না. আমি তোমার ব্যবসার কথা বলছি!

ব্যবসাও আমিই! এবারে তুমি বলো, যে করেই হোক, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার বদলে তোমাদের সাদা রাস্তার কোনো চালাঘরের বাপীকে দেখলে তোমার বাবা মা দাদা ফিরে চাইত, না তুমি আমাকে বুঝতে আসতে?

মিষ্টি তেতে উঠছে।—তোমার ক্ষমতা কে অস্বীকার করছে, কিন্তু আর কেন?

—আর নয় কেন? কালো রাস্তায় যা এসে গেছে তাই ঢের ভাবছ? না থামলে সব খোয়াবার ভয়?

ব্যক্তিত্বের ঠোকাঠুকির ফলে এই লোককে একেবারে জল করে দেবার সুযোগ ফসকালো মিষ্টি। এ-কথার জবাবে তার অশান্তিটা সত্যিকারের কেন সেটা খোলাখুলি বলতে পারত। বলতে পারত, আমার সাদা কালো নিয়ে ভয় নয়, ঐশ্বর্য কমা-বাড়া নিয়েও ভয় নয়—আমার ভয় শুধু তোমার জন্য, তোমার কখন বিপদ হয় সেই জন্য। তুমি যদি বিপদ আপদ এত তুচ্ছ না করতে, তাহলে আমারও তোমাকে নিয়ে অত ভয় থাকত না।

কিন্তু তার বদলে অপমানে মুখ লাল হয়েছে।—তুমি তাহলে আমাকে এত ছোট এত নীচ ভাবো?

—আমি মোটেই তা ভাবি না। আমি শুধু বলতে চাই আমার সম্পর্কে তোমার ভাবনা বা ধারণায় কিছু ভুল হচ্ছে। আমি অসিত চ্যাটার্জি না, আমাকে তুমি তার মতো করে চালাতে চেষ্টা করলে আরো ভুল হবে, আরো অসুবিধে হবে।

বাপী ঘর ছেড়ে চলে এলো। একটা বই টেনে নিয়ে বসল। এখন বই বলতে নিজের নিভৃতে চোখ যায় এমন কিছু বই। এ-ধরনের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে কেন নিজেই জানে না। পড়তে পাঁচ মিনিটও ভালো লাগল না। ঘাড়ের পিছনটা ব্যথা-ব্যথা করছে, শক্ত লাগছে। মনে হয় বাষ্পর মতো কিছু জমাট বাঁধছে ওখানে। ইদানীং মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। এই মুহূর্তে নিজের ওপরেই সব থেকে বেশি অসহিষ্ণু। মিষ্টিকে এমন সব কথা বলে এলো কেন? বিয়ের এই আড়াই বছর পরেও মিষ্টি তো তেমনি মিষ্টি। ও যা বলেছে বা ভেবেছে শতেকে একশ জনই তো তাই বলবে, তাই ভাববে। জঙ্গলের রাজ্যে নীতির হিসেব কম। এগারো বছর ধরে বাপী না হয় তাইতেই অভ্যস্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য কেউ অভ্যস্ত না হলে তার এরকম আঁতে ঘা পড়ে কেন? আরো খারাপ লাগছে, ধৈর্য খুইয়ে অসিত চ্যাটার্জিকে এর মধ্যে টেনে আনল বলে। জীবনের সব থেকে বড় যে ভুলটা মিষ্টি মেনেই নিয়েছে, ইতরের মতো সেখানেই ঘা বসিয়ে এলো। এর আগে নিজের মুখে যে সাদা মনের বড়াই করে এলো বাপী, সত্যি ওটা কতটুকু সাদা?

ছটফটানি বাড়তে থাকল। উঠে বাথরুমে গিয়ে ঘাড়ে মাথায় জল দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। এয়ারপোর্টের চাকরির সময় মিষ্টি বারকয়েক করে ঘাড়ে মাথায় মুখে জল চাপড়াতো। প্রথম দিনে হোটেলে বসে ওমনি জল চাপড়ে এসে নিজেই বলেছিল কথাটা। কিন্তু এখন আর জল দেবার দরকার হয় না। তার মানে তখন অশান্তি ছিল, এখন নেই। কিন্তু বাপীর কি অশান্তি? এখন সেই জল ওর নিজের মাথায় চাপড়াতে হয় কেন?

চোখ মুখ মুছে আবার মিষ্টির কাছে এলো। মিষ্টি চুপচাপ বিছানায় বসে। বাপী সামনে এসে দাঁড়াল।

মিষ্টি চোখ তুলে তাকালো। জবাব দিল না।

মাথার পিছনটা বেজায় ভারি লাগছে। শক্ত ঘাড়টা বাপী বার দুই জোরে এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ পর্যন্ত ফিরিয়ে সোজা করল।—আমার আজকাল কি একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, হঠাৎ-হঠাৎ রাগ হয়ে যায়, খানিক আগেও দেখেছ খুশি মনে ছিলাম...

মিষ্টি আলতো মন্তব্য করল, রাজা-বাদশারা শুনেছি ঢালা ফুর্তির সময়েও পান থেকে

চুন খসলে হঠাৎ রেগে গিয়ে গর্দান নিয়ে ফেলত।

উপমাটা বেশ লাগল বাপীর! হেসে জবাব দিল, যা-ই বলো এখন আর রাগাতে পারবে না। রাজা-বাদশা ছেড়ে মাঝে মাঝে নিজেকে ভিখিরির মতো মনে হয়, আরো কত পাওয়ার ছিল—পাচ্ছি না। না, না, টাকা পয়সার কথা বলছি না, আমি কি রকম যেন থেমে যাচ্ছি।

কথাগুলো মিষ্টির দুর্বোধ্য লাগছে। বাপী বোঝাবে কি, যা বলল নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

আবার ঘাড় মাথা বার দুই সামনে পিছনে করল।

মিষ্টি চেয়েই ছিল। হঠাৎ কিছু ব্যতিক্রম চোখে পড়ল।—ওরকম করছ কেন?

—কি রকম যন্ত্রণা হচ্ছে...ঘাড়টাও সেই থেকে শক্ত হয়ে আছে। আজকাল মাঝে মাঝে এরকম হয়, তখন পাখার নিচে বসেও গরম লাগে। যাকগে, আমাকে তো চেনই, রাগ কোরো না।

মিষ্টি উঠে কাছে এসে দাঁড়াল।—চোখ অত লাল কেন?

বাপী আয়নার দিকে ফিরে টান করে নিজের দুচোখ দেখে নিল। বলল, জলের ঝাপটা দিয়ে এলাম বলে বোধ হয়—

শুধু চোখ নয়, শ্যামবর্ণ মুখও কেমন লালচে মনে হল মিষ্টির। হাত ধরে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বলল, আমি একটুও রাগ করিনি, বোসো, আমি আসছি—

ঘর ছেড়ে চলে গেল। বাপীর এখন হালকা লাগছে একটু। গা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যে মিষ্টি ফিরল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করল, ফাঁক পেলে আজকাল তুমি ও-সব কি বই পড়ো বলো তো? আমি তো কিছু বুঝিই না—

বাপী হাসতে লাগল। জবাব দিল, বুঝতে চেষ্টা কোরো না, আমার মতো গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে যাবে। আমিও সব বুঝি না, অথচ নিজেকে যাচাই করার নেশায় পেয়ে বসে।

—কি যাচাই করার?

—নিজের ভিতরে কত সব অজানা অচেনা ভালো মন্দ হিংসে লোভ স্বার্থপরতার ব্যাপার নাকি আছে...যত বাজে ব্যাপার সব।

মিনিট পনেরোর মধ্যে জিত সোজা ভিতরে চলে এলো। সঙ্গে একজন বয়স্ক ডাক্তার। জিতের হাতে তার মোটা ব্যাগ। বাপী অবাক। তক্ষুনি বুঝল, ফোনে জিতকে মিষ্টি ডাক্তার নিয়ে আসতে হুকুম করেছে। ঘাড় মাথা ব্যথা আর চোখ লাল হবার কথাও নিশ্চয় বলেছে। কারণ কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করে ডাক্তার চোখের কোল টেনে ধরে দেখল, পালস দেখল। তারপর ব্যাগ খুলে ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র বার করল।

দেখা হতে যন্ত্র গোটাতে গোটাতে ডাক্তার জানতে চাইল, বরাবরই তার হাই প্রেসার কিনা। বাপী জানালো প্রেসার এই প্রথম দেখা হল।

মিষ্টি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কবল, প্রেসার কত? রোগীর সামনে বলা ঠিক হবে না ভেবে ডাক্তার ইতস্তত করল একটু। মিষ্টির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ওঁর বয়েস কত?

—বত্রিশ...। মিষ্টিই জবাব দিল।

—তেত্রিশ। হালকা গলায় বাপী শুধরে দিল।—ছাব্বিশ সালের জানুয়ারিতে জন্ম, এটা আটান্নর আগস্ট।

আনুষঙ্গিক আরো কিছু পরীক্ষার পর ডাক্তার বাপীর পেশার খোঁজ নিয়ে উঠে দাঁড়াতে জিত্ তাকে বাইরের ঘরে এনে বসালো। মিষ্টিও এলো। ডাক্তারের কথা শুনে উতলা।

প্রেসার বেশ বেশি। ওপরেরটা একশ নব্বুই, নিচেরটা একশ। ব্যবসার টেনশনের দরুন এরকম হতে পারে। কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আজকের মধ্যেই ই সি জি করানোর নির্দেশসহ ডাক্তার প্রেসকৃপশন আর ডায়েট চার্ট লিখে দিয়ে গেল। জিত্ তক্ষুনি ব্যবস্থা করতে ছুটল।

ঘরে ফিরেই মিষ্টি ফতোয়া দিল, এখন টানা রেস্ট, আর কোনো কথা নেই। ব্যবসার কাজকর্ম সব এখন বন্ধ—নো টেনশন।

বাপী হেসে জবাব দিল, ব্যবসার আমি কি পরোয়া করি যে টেনশনের মধ্যে থাকব?

মিষ্টি চেয়ে রইল খানিক। পলকা ঠেসের সুরে মন্তব্য করল, ব্যবসা ছাড়াও সেই ছেলেবেলা থেকে এ পর্যন্ত তুমি টেনশনের মধ্যে কাটিয়ে এসেছ।

বাপী হাসি মুখে সায় দিল, তা খানিকটা সত্যি বটে।

ই সি জি র রিপোর্ট মোটামুটি ভালো। কিন্তু মোটামুটি শুনে মিষ্টি একটুও খুশি নয়। হাই ব্লাডপ্রেসার থেকে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে বাপীর বাবার মারা যাবার ঘটনা অনেক আগেই শোনা ছিল। ফলে বেশ কিছুদিন মিষ্টির কড়া নজর আর কড়া শাসনের মধ্যে থাকতে হল বাপীকে।

ভালো লেগেছে। জীবনের আবার একটা নতুন স্বাদ পেয়েছে।

ঊর্মিলা মা হয়েছে। মেয়ের মা।

টেলিগ্রামে খবর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টিও বিজয় মেহেরা আর ঊর্মিলার নামে গ্রিটিং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে হলেও বাপী হাঁকডাক করে মিষ্টিকে খবরটা দিত। আর যদি বলত, চলো, এবারে আমরা গিয়ে ওদের একবার দেখে আসি —তাহলেও মিষ্টি অস্বাভাবিক কিছু ভাবত না। একবার ঘুরে যাবার জন্য ওরা কম ডাকাডাকি করছে না। কিন্তু বাপী কিছুই না বলে মিষ্টিকে ডেকে সুখবরের টেলিগ্রামটা তার হাতে তুলে দিল।

বাপী ইজিচেয়ারে বসে তখন খবরের কাগজ পড়ছিল। হাতের কাছে সে-রকম পড়ার কিছু না থাকলে সকালের দু-তিনটে খবরের কাগজ নিয়ে দেড় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি বা হোমরাচোমরাদের নিয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। মানুষের খবর খুঁটিয়ে পড়ে। এমনি দুটো খবর মনে দাগ কেটে গেল। একটা বিদেশের ঘটনা। দুই শ্রমিক বন্ধু দশ আনা ছ'আনা ভাগে একখানা লটারির টিকিট কিনেছিল। সেই টিকিট প্রথম হয়েছে। আমাদের টাকার হিসেবে তিন লক্ষর ওপর প্রাপ্য তাদের। কিন্তু এক কপর্দকও ভোগে এলো না কারো। কারণ ছ'আনার গোঁ অর্ধেকের থেকে সে এক পয়সাও ছাড়বে না—টিকিটের গায়ে তো আর বখরার ভাগ লেখা নেই! ফলে ক্রোধে উন্মাদ দশআনার হাতে ছ'আনা খুন। দ্বিতীয় ঘটনা এই কলকাতার। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী তার দুই মেয়ে আর ছোট্ট ছেলে সাজগোজ করে বাড়ির কর্তার সঙ্গে রাতের আনন্দ উৎসবের আমন্ত্রণে যোগ দেবার জন্য তৈরি। কর্তা গেল লন্ড্রিতে তার ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় আনতে। আর ফেরেনি। বাস চাপা পড়ে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই সব শেষ।

খবরের কাগজ কোলের ওপরে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বাপী ভাবছিল, জীবনের তাহলে ব্যাপারখানা কি!

আধ ঘণ্টা বাদে মিষ্টি কাছে এসে বসল। বলল, একটা গ্রিটিং পাঠিয়ে দিয়ে এলাম।

মুখ না তুলে বাপী জবাব দিল, বেশ করেছ।

মিষ্টি চেয়ে রইল একটু। ব্লাডপ্রেসারের রকম-ফের হল কিনা বোঝার চেষ্টা। কিছুটা বুঝতে পারে। রক্তের চাপ সেই থেকে এখনো একটু বাড়তির দিকে, তবে স্থির, বেশি ওষুধ-টষুধ খাইয়ে ডাক্তার সেটা হুট করে টেনে নামাতে চায় না।

প্রেসার বেড়েছে মনে হল না। ফলে কৌতূহল বাড়লো। সাত মাস আগে উর্মিলার চিঠিতে শুধু সম্ভাবনার আভাস পেয়েই যে লোক খুশিতে আটখানা, তিন-চার দিনের মধ্যে সেই চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে মিষ্টিকে বকুনি পর্যন্ত খেতে হয়েছে—আজ এমন সুখবরের পরে তার এই নির্লিপ্ত ভাব দেখে মিষ্টি প্রথমে অবাক, পরে সন্দিগ্ধ। তার কথা ভেবেই উচ্ছ্বাস চেপে আছে কিনা বোঝার চেষ্টা। তাও বোঝা গেল না।

—তোমার শরীর-টরীর খারাপ না তো?

বাপী সোজা হয়ে বসল।—না তো...কেন?

—এত বড় একটা খুশির খবর পেয়েও এমন চুপচাপ যে?

বাপী হাসল।—এত বড় মানে কত বড়?

—খুব বড় নয়?

—তা অবশ্য...। তবে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছে যখন, ছেলেপুলে আসবে এ তো জানা কথাই।

নিজের অগোচরে মিষ্টির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। খানিক চুপ করে থেকে সংযত মেলায়েম সুরে জিগ্যেস করল, আমাদের কত দিন বিয়ে হয়েছে?

এবারে বাপী আত্মস্থ একটু মনে মনে হিসেব করে জবাব দিল, দু' বছর আট মাস।...কেন?

—আমরা তাহলে এই জানা কথার বাইরে পড়ে আছি কেন?...ভেবেছ?

তার দিকে চেয়ে বাপী হাসছে অল্প অল্প।—ভেবে কি হবে। আমাদের ছেলেপুলে হবে না এ তো আমি তুমি ঘরে আসার অনেক আগেই একরকম জেনে বসে আছি।

অবিশ্বাস্য কাতর সুরে মিষ্টি বলে উঠল, তুমি জানতে?

বাপী সাদাসিধে ভাবেই মাথা নাড়ল।—তোমার প্রথমবারের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা দীপুদার মুখে শুনেছিলাম...।

—কিন্তু একেবারে হবেই না দাদা তো জানত না।

—তোমার দাদা না জানলেও সব শুনে আমার তাই মনে হয়েছিল।

মিষ্টির ফর্সা মুখ তেতে উঠছে।—মনে হয়েছিল তাই তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে আছ? ভালো কাউকে দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করার দরকার মনে করো নি?

হঠাৎ এরকম অভিযোগ কেন বাপী বুঝে উঠল না। বলল, চেষ্টা-চরিত্র যা করার তুমি নিজেই তো করেছ।...একজন ছেড়ে মায়ের সঙ্গে একে একে তিনজন এক্সপার্টের সঙ্গে কনসাল্ট করেছ—এরপর আমার আর কি করার থাকতে পারে?

—ও...! অস্ফুট স্বরে মিষ্টি বলল, তুমি এ-ও জেনে বসে আছে তাহলে। তোমার

আর কি-চ্ছু করার নেই? তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারতে না—বাইরের এক্সপার্ট দেখাতে পারতে না?

বাপী এই প্রথম মিষ্টির দুঃখটা অনুভব করল। জবাব দিল, যেতে চাও চলো...কিন্তু আমার ধারণা এ-সব ব্যাপারে আমাদের স্পেশ্যালিস্টরা একটুও পিছিয়ে নেই। মাঝখান থেকে আরো কষ্ট পাবে।

—তুমি ছেলে চাও না? তুমি কষ্ট পাচ্ছ না?

বাপী নির্দ্ধিধায় মাথা নাড়ল।—আমি এ নিয়ে কিছু ভাবিই নি। আমি শুধু তোমাকে চেয়েছি—পেয়েছি। ব্যস।

—ব্যস নয়! মিষ্টির গলার স্বর কঠিন।—সব জেনে তুমি উদার হয়ে বসে আছ —চুপ করে থেকে তুমি আমাকে দয়া করছ।

বাপী অবাক। আহত।—তার মানে।

—তা না হলে ঊর্মিলার মেয়ে হয়েছে শুনে তুমি আনন্দে লাফালাফি করতে— আমার মুখ চেয়ে চুপ করে আছ।

বাপী বুঝল। হাসিই পেল এবারে। তরল সুরে বলল, কোনো এক্সপার্ট দিয়ে আগে তোমার মাথাটা দেখাব ভাবছি। পরেই গলার স্বর গভীর একটু, গম্ভীরও। বলল, আমি ঠিক আগের মতো কেন নেই জানি না...ভেতরে কি হয় নিজেই বুঝি না তোমাকে বোঝাব কি করে। যা-ই হোক আমাকে অবিশ্বাস কোরো না, আমি শুধু তোমাকেই চেয়েছি, তার বেশি আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

মিষ্টির লালচে মুখ। অপলক চেয়ে রইল। একটু বাদে উঠে গেল। এই লোককে অবিশ্বাস করে না। মিথ্যে যে বলে না, তার অনেক প্রমাণ পেয়েছে। তবু ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলতে পারলো না। যা বলল, সত্যি হলে তাকে শুধু ভোগী ছাড়া আর কি বলবে? মিষ্টি শুধু সেই ভোগের দোসর। ভোগের ভোজে কদর তার। মানুষটা আগের মতো নেই তা-ও ঠিক। নিজের ভিতরেই সময় সময় কোথায় তলিয়ে যায় মিষ্টি ঠাওর করে উঠতে পারে না। কিন্তু ভেসে ওঠে যখন, আকণ্ঠ তৃষ্ণা। তখন মিষ্টিকেই সব থেকে বেশি দরকার। মিষ্টি তখন খুব মিষ্টি। মিষ্টি কোনো দিন মা হবে না সেজন্যেও এই লোকের এতটুকু খেদ নেই। মিষ্টি কেবল তার ভোগের জগতের মিষ্টি।

ক্ষোভের মুখে খুব সুবিবেচনা করছে না মিষ্টি তা-ও বোঝে। মনের তলার ক্ষীণ আশাটুকুও নির্মূল। পরিপূর্ণতার অভাব-বোধ যন্ত্রণার মতো। এ যন্ত্রণার ভাগীদার নেই। তাই ক্ষুব্ধ হয়। তাই এ-রকম ভাবে। নইলে, এই লোকের ভালবাসার গভীরতাও যে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করতে হয় তাই বা অস্বীকার করে কি করে?

ঊর্মিলা,

টেলিগ্রামের পর মিষ্টি তোমার চিঠিও পেয়েছে। এতদিনে তুমিও মিষ্টির চিঠি পেয়ে থাকবে। তোমার মেয়ে হয়েছে শোনার পর আমার মনের কথা তোমাকে জানানো হয় নি। ছেলে শুনলে আমি নিশ্চয় এত খুশি হতাম না। কালে দিনে মেয়েটা যেন তোমার থেকে ঢের বেশি দুষ্টু হয়। আর, তুমি তোমার মা-কে যত জ্বালিয়েছ, ও যেন তার মা-কে তার থেকে অনেক বেশি জ্বালায়। আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি মেয়ে

দেখতেও তোমার থেকে সুন্দর হবে।

আমার শরীরের কথা ভেবে অত ঘটা করে উতলা হয়ো না। আসলে মিষ্টি তার নিজের উদ্বেগ খানিকটা তোমার ওপর চাপিয়েছে। ওই প্রেসার-ট্রেসার হয়তো বরাবরই ছিল। আমার তেমন কিছুই অসুবিধে হচ্ছে না। আসল গণ্ডগোলটা অন্য দিকে, যা আমারও জানা ছিল না। বাচ্চা বয়েস থেকে আমার কেবল খোঁজার ধাত, খোঁজার বরাত। যেমন ধরো সেই ছেলেবেলা থেকে মিষ্টিকে খুঁজেছি। ভিখিরির খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাকে পাওয়া যাবে না, বুঝে নিয়ে টাকা খুঁজেছি, ঐশ্বর্য খুঁজেছি। সে-দিকে এগোতে গেলে যা দরকার...অর্থাৎ তোমার মায়ের মনের ভাণ্ডারে ঢুকে পড়ার চাবিটি খুঁজেছি। তারপর একটু একটু করে সব পেয়েছি, মিষ্টির কাছেও পৌঁছে গেছি। কিন্তু তারপর? এই তারপরের গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। সেই ক্ষ্যাপার খোঁজার বাতিক যাবে কোথায়? কি খুঁজব? আরো টাকা আরো টাকা আরো টাকা? মিষ্টির মধ্যে আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি আরো মিষ্টি? জীবন খোঁজার সেটাই শেষ কথা হলে ভেতরের ক্ষ্যাপা থামে না কেন? অত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি কিসের?

যাক আর পাগলামি বাড়াব না। বিজয় তার কাজ নিয়ে সুখে থাকুক। তুমি তোমার মেয়ে নিয়ে সুখে থাকো। তোমাদের আমার এই খাপছাড়া রোগে পেয়ে বসলে মেয়েটার সর্বনাশ। তার থেকে চোখ-কান বুজে তোমরা আপাতত ওই মেয়ের দিকে মন দাও।
—বাপী।

চিঠিটা সামনের টেবিলের ওপর। মিষ্টি স্থাণুর মতো বসে আছে।

দুপুরে রোজ দু'আড়াই ঘণ্টার জন্য নিজের অফিসে নেমে আসে। আজও তাই এসেছিল। বাপীর ব্লাডপ্রেসার চড়ে থাকার পর থেকে মিষ্টিরই এই ব্যবস্থা। বাপীর চেম্বারে বসে তার নির্দেশমতো কিছু কাজকর্ম সেরে রাখে। বাপী সকালের দিকে তেমন দরকার পড়লে বিকেলেও খানিকক্ষণের জন্য নামে।

প্যাডসুদ্ধ চিঠিটা ড্রয়ারে ছিল। ড্রয়ার খুলতেই মিষ্টির চোখে পড়েছে। নিজের হাতে চিঠি আর লেখেই না, চিঠির গোড়ায় ঊর্মিলার নাম দেখে কৌতূহল স্বাভাবিক। প্যাডটা টেনে নিয়ে পড়ল। শেষ হতে আবারও পড়ল।

মিষ্টির মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সে বড় কিছু পুঁজি খুইয়ে বসেছে। সেই যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা টনটন করছে। এরই মধ্যে সে এত সুলভ হয়ে গেছে যে তার মধ্যে ওই লোকের আর খোঁজার কিছু নেই, আর পাওয়ার কিছু নেই। চোখ-কান বুজে বিজয় আর ঊর্মিলাকে তাদের মেয়ের দিকে মন দেবার উপদেশের ফাঁকে একটাই ইঙ্গিত স্পষ্ট মনে হল মিষ্টির। অর্থাৎ ওই লোকের এটুকুও অবলম্বন নেই।

প্যাড থেকে লেখা পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে পরিষ্কার করে দু'ভাজ করল। সেটা হাতে করে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলো। পাশের চেয়ারে জিত বা ওদিকের হল-এর কেরানীরা কেউ টের পেল না।

ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বাপী মোটা বই পড়ছিল একটা। মিষ্টি চুপচাপ সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটা এত তন্ময় যে দু'মিনিটের মধ্যেও টের পেল না।

—ওটা কি পড়ছ?

মুখের কাছ থেকে বইয়ের আড়াল সরল। বাপী দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালো। পৌনে

চারটে। অর্থাৎ এরই মধ্যে উঠে আসবে ভাবে নি। বইটা ঘুরিয়ে মিষ্টির দিকে ধরল।

মিষ্টি জানে কি বই। শ্রীঅরবিন্দর লাইফ ডিভাইন। জিগ্যেস করল, ওতে কি আছে?

হেসে জবাব দিল, কে জানে, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

—তাহলে পড়ছ কেন?

রঙ্গ করে বাপী জবাব দিল, আমি পড়ছি না, আমাকে ঘাড় ধরে কেউ পড়াচ্ছে।

—আমিই বোধ হয়?

মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে এবারে খটকা লাগল বাপীর।...তার মানে?

—তার মানে তোমার টাকা আর টাকার মতো আমাকে নিয়েও তুমি তাহলে এখন খুব ক্লান্ত?

বাপী বিমূঢ় খানিক। মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কি হল বোঝার চেষ্টা।

হাতের ভাঁজ করা চিঠিটা খুলে মিষ্টি সামনে ধরল।—এটা লিখে ডাকে না দিয়ে প্যাডেই রেখে দিয়েছিলে কেন—আমি পড়ব বলে?

এবারে বাপী হাসছে মিটিমিটি।—বাইরের টিকিট ছিল না বলে পাঠানো হয় নি। কিন্তু ওটা পড়ে শেষে কি তুমি এই বুঝলে নাকি?

ঊর্মিলা কি বুঝবে?

বাপী থমকে চেয়ে রইল। তারপর হাত বাড়ালো—দাও ওটা।

মিষ্টি নড়ল না। চোখে চোখ।

—দেখছ কি? ছিঁড়ে ফেলব। ঊর্মিলারও যদি তোমার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা হয় তাহলে মুস্কিলের কথাই!

মিষ্টি ভিতরে ভিতরে অবাক একটু। অপ্রস্তুত হওয়া দূরে থাক, এই উষ্ণ ঝাঁঝেও ভেজাল নেই। জিগ্যেস করল, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় এই চিঠির কি অর্থ দাঁড়ায়?

বাপী আরো অসহিষ্ণু।—যা-ই দাঁড়াক, এতে তোমাকে ছোট করার বা খাটো করার কোনো ব্যাপার নেই। তোমার নাম থাকলেও আমার এই ভাবনার মধ্যে তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই—বুঝলে?

মিষ্টির মুখ লাল।—নিজের দাম জেনে খুশি হলাম।

হাল ছেড়ে বাপী হাতের বইটা পাশের ছোট টেবিলে ফেলে দিল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, মিষ্টি, অনেক লেখা-পড়া শিখেছ বলে বাতাস থেকে অশান্তি টেনে এনো না।

ইজিচেয়ারে আবার শরীর ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

চিঠি হাতে নিয়ে মিষ্টি চলে গেল। একটা দুর্বোধ্য অস্বস্তি ওকেও ছেঁকে ধরেছে এখন।

মাসখানেক বাদে ঊর্মিলার জবাব এলো। মিষ্টিকে লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে লিখেছে, প্রেসার ট্রেসার যা-ই থাক, সব থেকে আগে পত্রপাঠ বড় ডাক্তার ডেকে ফ্রেণ্ডের মাথাখানা খুব ভাল করে দেখিয়ে নাও।

মিষ্টি চুপচাপ চিঠিটা বাপীর দিকে বাড়িয়ে দিল। পড়ে বাপী হাসতে লাগল। বলল, বাঁচা গেল, ঊর্মিলা তবু রোগ কিছুটা বুঝেছে।

বাইশ

'আগে বাঢ়্। মিল যায়গা!'

ভুটান জঙ্গলের উদোম ফকিরের গমগমে গলার স্বর আর কথাগুলো বাপীর প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিনের মানসিকতায় শব্দ চারটে রোমাঞ্চকর কাণ্ড ঘটিয়েছিল। বুকের তলায় ঝংকার তুলেছিল। বিঘ্ন ঠেলে সামনে এগনোর সাদা মন্ত্র কেউ কানে জপে দিয়ে গেছল। কিন্তু এখন কি? জপের মতো কথাগুলো এখনো কানে বাজে কেন? স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাড়া জাগে কেন?

বাপীর তন্ময় হতে সময় লাগে না। প্রকাণ্ড দেবদারু গাছের নিচে ভস্মমাখা সেই উলঙ্গ ফকির বসে। ওর দিকেই চেয়ে আছে। তার দু'চোখে হাসি ঠিকরোচ্ছে কি আলো, বাপী জানে না।

'আগে বাঢ়্। মিল যায়গা!'

ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়াল। পলকে গভীর জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় গেল? সামনে এগলো? কিছু পাওয়ার আশা না থাকলে ফকিরই বা এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? দুর্নিরীক্ষ মহাশূন্যে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে এমন কোনো মহাশক্তিধরের কাছে পৌঁছনোর আশা? খুব ছেলেবেলায় বাপী ভাবত আকাশের ওপারে ঈশ্বরের রাজ্য। ও রকম কোনো অলৌকিক অস্তিত্বে বিশ্বাস এখন নিজের কাছেই হাস্যকর।

'চলা পৃথ্বী—স্থিরভূমি'। দেড় হাজার বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্টের ঘোষণা বাপী বইয়ে পড়েছে। সে বলে গেছে, সূর্য নয়, স্থিরভূমি এই পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে। এই জ্ঞান কোনো ঈশ্বর মহাশূন্য থেকে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল? গত দেড় বছর যাবৎ মানুষের তৈরি উপগ্রহ মহাকাশের রহস্যের আবরণ সরিয়ে চলেছে। স্পুৎনিক আর একসপ্লোরারের জয়-জয়কার। মানুষ খুব শিগগীরই ওই মহাকাশের গ্রহ-উপগ্রহ জয় করবে এমন বিশ্বাস বাপীরও আছে। কিন্তু সব-কিছুর আড়ালে বসে বিচ্ছিন্ন কোনো অলৌকিক পুরুষ এই শক্তির যোগানদারি করছে, বাপী ভাবে না।

অথচ শক্তিটুকু অস্বীকার করার উপায় নেই। একটা শক্তির উৎস কোথাও আছেই। সেটা কোথায়, কত বড়, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই বা কেমন? উলঙ্গ ফকির সম্পর্কেও বাপীর সেই গোছেরই বিস্ময়। হাড়গুঁড়নো রক্তজমানো সেই প্রচণ্ড শীতে লোকটার গায়ে একটা সুতো নেই। শীততাপের অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান থেকে নিজেকে সে এমন অনায়াসে তফাতে সরিয়ে রাখতে পারে কোন শক্তির জোরে? লজ্জা-ভয়ই বা তার কাছে ঘেঁষে না কেন?

নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে বাপীর। ধড়ফড় করে ওঠে। নিজেকে টেনে তোলে। ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাস্তব ভূমির ওপর পা ফেলে চলতে চেষ্টা করে। কাজকর্মে মন দেয় কিন্তু সেই মন আর সেই উৎসাহে ভাটা পড়ছে তাও অনুভব করে।

তা হলেও ব্যবসা সেখানে দাঁড়িয়ে, টাকা আপনি আসছে। আসছেই। অনেকটা খেয়ালের বশেই বাপী, নিঃশব্দে মাঝে মাঝে এই বোঝা কিছু কিছু হালকা করে ফেলে।

দেশের প্রায় সর্বত্র খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বছর বছর পোকামাকড়ের মতো মরে যায়। তাছাড়া অন্ধ আতুর বা আর্তের সেবা প্রতিষ্ঠানই বা এ-দেশের মতো এত আর কোথায় আছে। গোটা দেশটাই যেন দাও-দাও রব তুলে হাত পেতে বসে আছে।

বাপীর নিঃশব্দে দিয়ে যাওয়ার অঙ্কটা ক্রমশ বড় হচ্ছে সেটা একমাত্র মিষ্টি লক্ষ্য করেছে। বাপী ওকেও বলে না। কিন্তু সমস্তই চেকবই পাশবই আর কাঁচা টাকা বোঝাই সিন্দুকের চাবি তার হেপাজতে। লক্ষ্য বা চোখ রাখলে তার না জানার কারণ নেই। এমন সংগোপন দানের বহর দেখেও মিষ্টি অস্বস্তি বোধ করে। ঐশ্বর্যের সবটা সাদা রাস্তায় আসছে না বলেই এভাবে বিবেক পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কিনা বোঝে না।

ঠাট্টার সুরেই একদিন বলে ফেলল, দান করলেও লোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু প্রচার চায়—তুমি যেন খুব চুপি চুপি মস্ত মস্ত এক-একটা দানের পর্ব সেরে ফেলছ?

তার মুখের দিকে চেয়ে বাপী বেশ একটু কৌতুকের খোরাক পেল। ঠোঁটে হাসি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমি দক্ষিণেশ্বরে গেছ কখনো?

প্রশ্ন শুনে মিষ্টি অবাক।—মায়ের সঙ্গে দুই-একবার গেছি। কেন?

—আমি একবারও যাইনি। তোমার কথা শুনে সেখানকার জ্যান্ত ঠাকুরটির একটা কথা মনে পড়ল। বলেছিল, সেবা করতে পারিস, দান করার কে রে শালা তুই?

মিষ্টির ভালো লাগল। হেসে বলল, তুমি তাহলে সেবা করছ?

—আমি কিছুই করছি না। নিজেকে যাচাই করছি।

না বুঝে মিষ্টি চেয়ে রইল।

বাপী বলল, দিতে ইচ্ছে করে না। তখন আরো বেশি করে দিয়ে ফেলে দেখি কেমন লাগে। মানে, দেখি কতটা টাকার গোলাম হয়ে বসে আছি। ছাড়তে না পারার গোলামি বরদাস্ত করতে না চাইলেও ওটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

মিষ্টির দু-চোখ বড় বড়।—শেষে কি আমার ওপর দিয়েও এরকম একসপেরিমেন্ট চলবে নাকি।

বাপী হাসছে।—ঘুরে ফিরে একই ব্যাপার কিন্তু।...সেই আঁকড়ে ধরে থাকার গোলামি।

মিষ্টি আর কিছু বলল না। এই জবাব আশাও করেনি, ভালও লাগেনি।

দিন গড়াতে গড়াতে উনষাট সালের আগস্ট পেরিয়ে সেপ্টেম্বরে পা ফেলল। মাসের প্রথম দিনে বাপীর জীবনের এই গতিও আচমকা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়াল।

গত জুন মাস থেকে পশ্চিমবাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। চালের দর হু হু করে বাড়ছে। বাজারের চাল উধাও হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে প্রতি দিন তিন-চার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ কলকাতায় আসছে খাবার খুঁজতে। মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় খাদ্যনীতির ব্যর্থতার দায় খাদ্যমন্ত্রীর ওপর না চাপিয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকেই গড়াতে থাকল।

এই ব্যর্থতা সামনে রেখে প্রবল আক্রমণে নেমে গেছে বিরোধী দল। সরকারকে উল্টে দেবার হুমকি দিয়ে আসরে নেমেছে তারা। তাদের অসন্তোষ মুখ্যমন্ত্রীর ওপর যত না, তার থেকে ঢের বেশি খাদ্যমন্ত্রীর ওপর। পরের দু-তিন মাসে চালের দর মণ পিছু আরো পাঁচ টাকার ওপর বেড়ে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি আর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি

কোমর বেঁধে গণ-আন্দোলনে নেমেছে। তারা চালের মজুতদারির বিরুদ্ধে যুঝবে, আইন অমান্য করবে, অবস্থান ধর্মঘট করবে, পিকেটিং করবে। অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে লাগল, কারণ খিদের জ্বালায় সাধারণ মানুষও ক্ষিপ্ত। জঠরে আগুন জ্বললে লোকে কান শুনতে ধান শোনে। রাজনীতি বুঝুক না বুঝুক, দুর্দিন ঘোচানোর যুদ্ধে তারাও ছুটে আসবে, হাত মেলাবে।

ধর-পাকড় শুরু হয়ে গেল। শাসনযন্ত্র গণবিক্ষোভের ষাট-পঁয়ষট্টি জন নেতাকে ছেঁকে তুলে আগে-ভাগে গ্রেপ্তার করল। কেউ কেউ আবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গা ঢাকা দিল। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তখন অনেক ছড়িয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ নেবার হুমকি পর্যন্ত শোনা গেল। আগস্ট-এর শেষ দিনে গতকাল সেই রক্তাক্ত গণ-বিক্ষোভের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দুই তরফই প্রস্তুত ছিল। শহরের মানুষ গ্রামের মানুষ স্ত্রীলোক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ পঁচিশ হাজারের এক মিছিল ময়দানের সভার পর এগিয়ে এলো রাজভবনের দিকে।

পথ আগলে সশস্ত্র পুলিশও প্রস্তুত। রাত সাড়ে সাতটায় সেখানে পুলিশ আর জনতার খণ্ডযুদ্ধ। লাঠি-চার্জ টিয়ার গ্যাস। সেখান থেকে অশান্তির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শহরে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। স্টেট বাস আর দুধের বুথ পোড়ানোর হিড়িক পড়ে গেল।

এই দিনে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তিনশ'র ওপর। আহতদের ভিড়ে হাসপাতাল বোঝাই।

বাইরে বাপী এই মানুষগুলোর থেকে অনেক দূরে অনেক বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও ভিতরের মনটা আজও এদেরই দিকে। ব্যক্তিবিশেষে বিধান রায় বাপীর চোখে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষসিংহ। চিকিৎসায় ধন্বন্তরী নাম। শক্ত দুই হাতে এই বাংলার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা সংস্কৃতি পথ পরিবহন স্বাস্থ্য—সব কিছুর শ্রী ফেরানোর হাল ধরে বসে আছেন। বাপীর মানসিক বিরোধ তাঁর সঙ্গে নয়। স্বাধীনতার বারো বছরের মধ্যেও যে-শাসনযন্ত্র ক্ষুধার মুখে অন্ন যোগাতে পারল না, বিরোধ তার সঙ্গে। আন্দোলনও শেষ পর্যন্ত রাজনীতির খেলাই। অজস্র ক্ষুধার্ত জনেরাই বেশির ভাগ এই রাজনীতির প্রথম সারির বলি।

পরদিন অর্থাৎ আজ। পয়লা সেপ্টেম্বর। সকাল থেকে অশান্তির খবর কানে আসছে। আন্দোলনে অনেকখানি দখল চলে গেছে সমাজবিরোধীদের হাতে। বিকেলের মধ্যে পাঁচটা থানা আক্রমণ করে লুটপাট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায় তুমুল হামলা। বড় বড় রাস্তাগুলো ব্যারিকেড করে দেবার ফলে পুলিশ পেট্রল ব্যাহত। টিয়ার গ্যাস বা লাঠিচার্জে কুলোলো না আর। গুলি চলল। সরকারী হিসেবে পঁয়ষট্টি জন গুলিতে আহত আর চার জন নিহত। এ হিসেব কতটা সত্যি সকলেই জানে।

মিষ্টির বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবর পেয়েছিল। গতকাল বিকেলে দুজনে তাঁকে দেখতে যাবে ঠিক করেছিল। গণ্ডগোলের দরুন আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। আজও বিকেল পর্যন্ত বাড়ি বসে থেকে বাপীর একটুও ভালো লাগছিল না। গণ্ডগোল বেশি ঘোঁট পাকিয়েছে উত্তর কলকাতার দিকে। দক্ষিণ দিকের তেমন বড় কিছু ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর কানে আসেনি। বাপী মিষ্টিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবে। বা গণ্ডগোল দেখলে এগোবেই না।

চলেছে। বাপীর গাড়িও ইদানীং ড্রাইভার চালায়। নিজে ড্রাইভ করা ছেড়েছে। রাস্তায় ট্রাম বাস ট্যাক্সি এমন কি আর প্রাইভেট গাড়িও চোখে পড়ছে না। এলগিন রোডের কাছাকাছি আসতে বোঝা গেল ব্যাপার এদিকেও সুবিধের নয়। রাস্তা জুড়ে ভাঙা কাচ ডাবের খোলা ইঁট পাথর জুতো আর ভাঙা কাঠের তক্তার ছড়াছড়ি। ছোট বড় গলির মুখে এক-একটা জটলা। বন্দুক উঁচনো পুলিশের পেট্রল গাড়ি দেখলেই তারা ছুটছাট হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

পরিস্থিতি আর একটু ভালো করে বোঝার জন্যে বাপী গাড়িটা রাস্তার পাশে দাঁড় করাতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে পাঁচ-সাত জন মারমুখী ছেলে ছুটে এসে গাড়িটা ঘিরে ফেলল।—এই দিনে আপনারা গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন?

কেন বেরিয়েছে বাপী তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেই ফাঁকে একজন পিছনের একটা টায়ারের ভাল্ব খুলে দিয়েছে। সশব্দে বাতাস বেরিয়ে টায়ারটা চুপসে গেল। এই দিনে বাইরে বেরুনোর কারণ শুনে হোক বা মিষ্টিকে দেখে হোক, তাদের মাতব্বর টায়ারটা যে ফাঁসিয়েছে তাকে ধমকে উঠল। তারপর বাপীকে বলল, বাড়তি টায়ার থাকে তো এক্ষুনি লাগিয়ে ফিরে যান—সামনে এগোতে পারবেন না—আরো বিপদে পড়বেন।

দূরে পুলিশের পেট্রল গাড়ি চোখে পড়া মাত্র দলটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মিষ্টিও গাড়ি থেকে নেমে এলো। পেট্রলগাড়িটা ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভার পিছনের ক্যারিয়ার থেকে সাজসরঞ্জাম বার করে স্টেপনি লাগানোর কাজে লেগে গেল। মিষ্টি আর বাপী নির্বাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

—তুই আমার হাড়মাস সব খাক করে দিলি। তোকে আমি এবার থেকে ঘরে তালা দিয়ে আটকে রেখে দেব—তুই কত বড় হারামজাদা আমি এবার দেখে নেব!

তারস্বরের ক্ষিপ্ত কথাগুলো কানে আসতে বাপী ফিরে তাকালো। আর সেই মুহূর্তে মাথার ঠিক মধ্যিখানে কেউ বুঝি প্রচণ্ড মুগুরের ঘা বসিয়ে দিল একটা।

কথাগুলো কানে আসতে মিষ্টিও ফিরে তাকিয়েছিল।

...আধ হাত পাকা দাড়ি বোঝাই একটা লোক বছর এগারোর হাফপ্যান্ট হাফশার্ট পরা ঢ্যাঙা এক ছেলের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে রাগে ফোঁস ফোঁস করে ওই কথা বলছে। লোকটার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে মেটে সিঁদুরের চওড়া তিলক।

মিষ্টিকে নয়, বাপীকে দেখেই লোকটা থমকে দাঁড়ালো একটু। আবার এগোতে গিয়েও পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকেই গেল বুঝি। দুই চোখ বিস্ফারিত। সামনে যাকে দেখছে, ঠিক দেখছে কিনা ভেবে পাচ্ছে না।

—বিপুলবাবু আপনি! আপনি আমাদের সেই বিপুলবাবু না?

বাপী নিস্পন্দ নির্বাক।

—আপনি আমাকে চিনতেও পারছেন না বিপুলবাবু! আমি রতন। রতন বণিক! আমাকে...আমার বউ কমলাকে মনেও পড়ছে না আপনার?

মাথার মধ্যে ঝড়। যেভাবে হোক এই ঝড় না থামালে কোথায় ভেসে যাবে বাপী জানে না। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে টেনে তুলল। ওর শক্ত হাতে ধরা ছেলেটার দিকে না তাকাতে চেষ্টা করছে।

—চিনেছি। চিনে তোমার মতোই অবাক হয়ে গেছলাম।

রতন বণিক খুশিতে আটখানা।—আপনি না চিনে পারেন! এমন সুন্দর চেহারা হয়েছে এখন আপনার! এ আপনার গাড়ি? ইনি আপনার পরিবার? ছেলের হাত ছেড়ে দিয়ে বিগলিত মুখে মিষ্টির সামনে মাথা নোয়ালো।—পেন্নাম হই গো মালক্ষ্মী—এই বিপুলবাবু আমাদের কতখানি ছিলেন আপনি জানেন না। উনি আমার বস্তির খুপরি ঘরে থাকতে আমি বলে দিয়েছিলাম, এই দিন থাকবে না—উনি রাজা হবেন! হ্যাঁ বিপুলবাবু, আপনি কলকাতায়—আর আমি জানিও না!

মাথার ভিতরে যা হচ্ছে—হচ্ছে। পিঠেও চাবুক পড়ল একটা। মিষ্টি ভাবছে, একটু আগের বিভ্রাটের দরুণ মানুষটা এই লোকের আনন্দ বা কথায় তেমন সাড়া দিতে পারছে না।

রতন বণিক হঠাৎ ছেলেটার কাঁধ ধরে বাপীর দিকে ঠেলে দিল।—এই ছোঁড়া, পেন্নাম কর শিগগীর। কাকে দেখছিস জানিসও না। আজ ঘরে ফিরে তোর হাড় গুঁড়ো করে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোর জন্যেই বিপুলবাবুর সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে গেল—তাই বেঁচে গেলি।

ছেলেটা দুজনকেই প্রণাম সেরে উঠতে রতনের একমুখ হাসি। আমার ছেলে বিপুলবাবু, ওর নাম মদন। তখুনি আবার রাগের মুখ।—এত বড় পাজী ছেলে আর হয় না—বুঝলেন। খেয়েদেয়ে বেলা বারোটায় আমার চোখে ধুলো দিয়ে মারামারি গোলাগুলির মধ্যে বেরিয়েছে—আমি পাঁচ ঘন্টা ধরে পাগলের মতো খুঁজতে খুঁজতে এইখানে এসে ওকে ধরেছি—এইটুকু বিচ্ছু আমাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ল।

বাপীর চোখ দুটো এবারে কেউ যেন টেনে ছেলেটার মুখের ওপর বসিয়ে দিল।

দেখছে মিষ্টিও। লম্বা গড়ন। রোগা। কালোও নয় ফর্সাও নয়। বাপ যত দুষ্টু বলছে মুখ দেখলে ততো দুষ্টু মনে হয় না। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায় দুষ্টুমিতে ছাওয়া। কিন্তু সব মিলিয়ে ছেলেটা দেখতে বেশ। এত বুড়োর এই ছেলে কেউ ভাববে না, নাতি-টাতি ভাববে।

সহজ ভাবেই মিষ্টি বলল, মায়ের কথা শোনে না বুঝি...

বলে অপ্রস্তুত। রতন বণিক ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বিড়বিড় করে বলল, মা তো নয়, শত্তুর।...ছেলে ছেলে করে পাগল হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ছেলে হবে—হল। আর দুটো বছর না যেতে সেই ছেলে রেখে আমাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল!

বাপী কাঠ। রতনের ছল-ছল দু'চোখ তার মুখের ওপর।—আপনি তো এ খবরও জানেন না বিপুলবাবু। এমন বউকে শত্তুর ছাড়া আর কি বলব? ভরা শীতেও দুবার করে চান করা চাই—কার নিষেধ কে শোনে। বুকে সর্দি বসিয়ে সাতদিনের জ্বরে সব শেষ। যাবার দিন সকালে আপনাকে মনে পড়েছিল...কিছু বলেও গেছল...

গাড়ি রেডি। বাপীর হঠাৎ ফেরার তাড়া। রতনকে বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলে মিষ্টিকে তাড়া দিয়ে গাড়িতে উঠল। রতনকে বলল, গণ্ডগোলের মধ্যে আর বাইরে থেকো না—ঘরে চলে যাও।

বিকেলের আলো আর নেই-ই প্রায়। গাড়ির ভিতরটা আবছা। বাপী পিছনে মাথা

রেখে নিশ্চল বসে আছে। দু চোখ বোজা।

মিষ্টির মনে পড়ছে কিছু। ফিরে তাকালো।—কলকাতায় সেই প্রথম দেখা হতে তুমি বলেছিলে, অফিসের চাকরি যাবার পর সেখানকার কোন্ পিওন আর তার বউ আদর করে তাদের বস্তিঘরে তোমাকে রেখেছিল...এ সেই পিওন নাকি?

জবাব না দিয়ে বাপী শুধু মাথা নাড়ল। সে-ই!

—ওদের কাছে কত দিন ছিলে?

—দু'মাস।

এবারে মিষ্টিও অবাক একটু।—সামান্য লোক হলেও তোমার জন্য এত করেছে, আর এত বছরের মধ্যে তুমি তাদের একটা খবরও নাওনি?

বাপী জবাব দিল না। মাথা পিছনে তেমনি ঠেস দেওয়া। দু'চোখ বোজা।

মিষ্টি এবারে ভালো করে লক্ষ্য করল। উতলা একটু।—শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

এবারেও বাপী সামান্য মাথা নাড়াল কি নাড়াল না।

মিষ্টি ভাবল ছেলেগুলো হঠাৎ ওভাবে হামলা করার দরুন স্নায়ুর ওপর দিয়ে ধকল গেছে। এর থেকে বেশি বিপত্তিও হতে পারত।

রাত্রি। দেড় হাত ফারাকে মিষ্টি ঘুমোচ্ছে। বাপী নিঃশব্দে উঠে বসল। শরীরের রোমে রোমে আগুনের কণা। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে লাগছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। বাপী জানে এই দুঃসহ যন্ত্রণার শেষ এই মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে। যদি সে মিষ্টিকে ডেকে তুলতে পারে, তুলে যদি ওকে বলতে পারে, কথা ছিল তোমার আমার মধ্যে গোপন কিছু থাকবে না—তাই এবারে শেষ কিছু শোনো—শুনে আমাকে দেখো, চেনো।

বাপীর গলায় কুলুপ আঁটা। ডাকা যাবে না। বলা যাবে না। শরীর জ্বলছে। যন্ত্রণা বাড়ছে। শব্দ না করে খাট থেকে নামল। পা দুটো পাথরের মত ভারি। ঝিনঝিন করছে। অন্ধকার ঘর-সংলগ্ন বাথরুমে এলো। কানে মাথায় জলের ঝাপটা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কি-যে হতে লাগল বুঝছে না। পায়ের নিচে ভূমিকম্প। সব কিছু বিষম দুলছে, উল্টে যাচ্ছে। প্রাণপণে বেসিনটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল একটু। দেয়াল হাতড়ে ঘরে এলো। বিছানাটা কদ্দুর। বাপী কি আর নাগাল পাবে?

পেল। তারপর আর মনে নেই।

তেইশ

টানা দু মাস বাদে বাড়ির দোতলায় হাঁটা-চলার অনুমতি পেল বাপী। ডাক্তারের হুকুমে তার ওঠা বসা চলা ফেরা। তার নির্দেশ মিষ্টি একচুল এদিক ওদিক হতে দেবে না। সেই ভীষণ রাতটার কথা মনে নেই বাপীর। কারণ জ্ঞান ছিল না। পরদিন থেকে এই দু'মাস যাবৎ চিকিৎসার ঘটা দেখছে। দেড় মাস পর্যন্ত দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুজন নার্স মোতায়েন ছিল। বাপীর বিরক্তি দেখে দুদিন আগে মিষ্টি রাতের নার্স ছেড়েছে। এখনো তিন দিন অন্তর ডাক্তার আসছে, প্রেসার মাপছে। সপ্তাহে একদিন করে বাড়িতে ই-সি-জি হচ্ছে। প্রেসার আরো ওপরের দিকে চড়ে থাকল বলে মিষ্টির দুশ্চিন্তা। ডাক্তার আশ্বাস দিয়েছে, ওটাই মোটামুটি এখন স্বাভাবিক ধরে নিতে হবে। বেশি ওঠা-নামা করার

থেকে এক জায়গায় বরং স্থির থাকা ভালো।

খবর পেয়ে বানারজুলি থেকে আবু রব্বানী ছুটে এসেছিল। একনাগাড়ে পনের দিন ছিল। তার পরেও আর একবার এসে ওকে দেখে গেছে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাট্টাও করেছে, তোমার এমন পেল্লায় হার্ট কে অ্যাটাক করতে পারে আমি ভেবে পাই না বাপীভাই। যাকগে, এখন আর নো ওয়ার্ক, নো চিন্তা—আমি আছি, জিত আছে, তোমার কিছু ভাবনা নেই।

ব্যবসা বা কাজকর্ম নিয়ে বাপী আর একটুও মাথা ঘামাচ্ছে না। এদিকের একটা মস্ত শেকল যেন ঢিলেঢালা হয়ে খসে খসে যাচ্ছে। একটুও খারাপ লাগছে না। বরং হালকা লাগছে। কিন্তু অস্বস্তি অন্য কারণে। সে কি পালানোর পথ খুঁজছে? দু মাসে আগের সেই ঘুম আর যদি না-ই ভাঙত।—কি হত? বেঁচে যেত?

ভিতর থেকে সায় মেলে না। এমন মৃত্যুর কথা ভাবতেও যন্ত্রণা। জীবনের এক বিরাট মুক্তির স্বাদ কোথাও লেগে আছে। কিন্তু সেটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চোরের মতো এই মৃত্যুর অন্ধকারে সেঁধিয়ে গেলে সেই মুক্তির নাগাল আর কোনদিন পাবে না।

রতন বণিক নিয়মিত আসে। বিপুলবাবুর শরীরের খবর নিয়ে যায়। গোড়ায় দেখাসাক্ষাৎ নিষেধ ছিল। এখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে। বিশেষ করে কপাল দেখে। ওর কপাল দেখার গল্প মিষ্টি এর মধ্যে বাপীর মুখে শুনেছে। তাই ও যখন কপাল দেখে মিষ্টি তখন ওর দিকে উদগ্রীব মুখে চেয়ে থাকে। রতন দোরগোড়ায় এলে দাঁড়ালে সহজ হবার চেষ্টায় বাপীকে সব থেকে বেশি যুঝতে হয়। এক এক সময় হেসে জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখছ?

রতন মাথা নেড়ে জবাব দেয়, ভালই।...ভাববেন না।

কিন্তু লোকটাকে বড় বিমর্ষ আর ক্লান্ত মনে হয় বাপীর। রতন বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ছেলের চিন্তায় সর্বদা উতলা। বিপুলবাবুর এত অসুখ, তাকে নিয়ে আসে কি করে। কিন্তু হাড়-পাজী ছেলে কোত্থেকে যে ওর ঘরে এলো ভগবান জানে!

বাপী পাশ থেকে আধ-পড়া বইটা তুলে নেয়। স্থির মনোযোগে পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু ছাপা লাইনগুলো নড়াচড়া শুরু করে দেয়।

মিষ্টি এখন আবার দেড় দু' ঘন্টার জন্য নিচের অফিস ঘরে বসে কাজকর্ম দেখছে। বাপী সত্যি এখন ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না বলে দায়িত্ববোধ আরো বেশি। ব্যবসা সংক্রান্ত সব পরামর্শ এখন জিতের সঙ্গে। বা চিঠিপত্রে আবু রব্বানীর সঙ্গে।

সেদিন নিচে নেমে দেখে, ছেলের হাত ধরে রতন বণিক আসছে। মিষ্টি বুঝল, ছেলেকে রেখে নিশ্চিন্তে বেশিক্ষণ বসতে পারে না বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মিষ্টি আপিস ঘরে আসতে রতনও সঙ্গে এলো। ছেলেকে ভয় দেখানোর সুরে বলল, এই হল কর্তা-মা, ভয়ংকর রাগী কিন্তু। এখানে এই টুলে একেবারে চুপটি করে বসে থাকবি, নড়বি-চড়বি না। আমি বিপুলবাবুকে একটু দেখে আসি। ও এখানে বসে থাকলে কোন অসুবিধে হবে না তো মা-লক্ষ্মী?

মিষ্টি হাসিমুখে মাথা নাড়ল। অসুবিধে হবে না। ছেলেটা দুষ্টু খুব, সন্দেহ নেই। পাতলা ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা। যা শুনল, অর্থাৎ কর্তা-মা সত্যিই ভয়ংকর রকমের রাগী কিনা বোঝার চেষ্টা। মিষ্টির বেশ লাগল ছেলেটাকে। এইটুকু ছেলের মা

নেই। এ-ও মনে হল। বলল, বাইরে টুলে বসতে হবে না, আমার কাছে ঘরে বসে থাক। রতনকে বলল, ও একটুও দুষ্টুমি করবে না, তুমি ওপরে যাও।

এ-সময়ে এসেছে বলে মিষ্টি অখুশি নয়। একলা থাকলেই ওই লোক বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। কেউ কথাবার্তা কইতে বা গল্প করতে এলে সে সুযোগ হয় না। তাছাড়া রতন বণিককে যে খুব পছন্দ করে মিষ্টি এ-ও বুঝছে।

খুশি মুখে রতন ওপরে উঠে এলো। একগাল হেসে বাপীর সামনে মেঝেতে বসে পড়ে বলল, দরাজ মন আর কাকে বলে। আমি ছেলেকে ভয় দেখালাম কর্তা-মা ভয়ংকর রাগী—চুপ করে বাইরের টুলে বসে থাক—আর উনি আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন—

রতন এলে বাপীর মানসিক প্রতিক্রিয়া একটু হয়ই। জিজ্ঞাসা করল কার কথা বলছ?

—আমাদের মা লক্ষ্মীর কথা বলছিলাম—আমি যা দেখার দেখে নিয়েছি, বড় মন, মায়ামমতা আছে।

বাপীর মাথায় একটা শব্দ ঘুরপাক খেতে লাগল।—তোমার ছেলে কি ওকে কর্তা মা বলে ডাকবে নাকি?

—উনি হলেন গিয়ে রাজরাণী, মেমসায়েব-টায়েব ভালো লাগে না। সচকিত একটু। —উনি রাগ করবেন না তো?

অগত্যা বাপী মাথা নাড়ল, রাগ করবে না। চুপচাপ রতনকে দেখল একটু। বছর তিপ্পান্ন বয়েস হবে এখন। কিন্তু লোকটা বুড়িয়েই গেছে।

কথায় কথায় রতন বণিকের চাপা অভিমানটুকু আগে প্রকাশ পেল।—ও জোর দিয়ে বলেছিল বিপুলবাবুর ভাগ্য একদিন না একদিন ফিরবেই—বিপুলবাবু নিজেও সেদিন সে-কথা বিশ্বাস করেননি। তা রতন যতটা ভাবতে পারে, ভাগ্য তার থেকে ঢের বেশিই ফিরেছে মনে হয়। তা না হলে এমন বাড়ি, এমন দুখানা ঝকঝকে গাড়ি হতে পারে না। ভাগ্যের জোরে রাজরাণীর মতো বউ পর্যন্ত ঘরে এসেছে।—কিন্তু এত বড় হয়ে বিপুলবাবু ওদের এ-ভাবে ভুলে যাবেন ভাবেনি। এতকাল ধরে বিপুলবাবু কলকাতায় আছেন, একটা খবর পেলে রতন ছুটে আসত—কি ঝড়-জলটা না গেছে ওর ওপর দিয়ে—এখনো যাচ্ছে। সবই তার অদৃষ্ট ছাড়া আর কি।

বাপী একটুও বিরূপ হল না। কোন ওজর দেখালো না। এ-রকম বলার অধিকার ওর আছে।

একটু চুপ করে থেকে খাটো গলায় জিজ্ঞাসা কবল, যাবার দিন সকালে তোমার বউয়ের কি মনে পড়েছিল বলেছিলে সেই একদিন—কি বলে গেছল?

—আপনাকে মনে পড়েছিল। বলেছিল, যদি পারো তাঁর খোঁজ কোরো। তুমি যা বলেছিলে ততো বড়টি যদি উনি হয়ে থাকেন, আমার কথা বলে মদনের ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দিও—উনি একভাবে না একভাবে ঠিক ওকে মানুষ করে দেবেন।

বাপী স্থাণুর মতো বসে রইল। অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করল, তুমি সেই ব্রুকলিনের চাকরি করছ এখনো?

বিষণ্ন মুখে রতন মাথা নাড়ল। করছে না। পরে আস্তে আস্তে জানালো, বউ মারা যাবার পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কি-চ্ছু ভালো লাগত না, সর্বদা পাগল পাগল করত।

তাছাড়া সে আপিসে গেলে ছেলে দেখে কে? সেই থেকে নিজের ভাগ্য পুড়িয়ে লোকের ভাগ্য দেখাই পেশা তার। ঘরে বসেই এ-কাজ করত। কিন্তু বস্তিঘরে কোন্ পদের খদ্দেরই বা আসবে। গোড়ায় গোড়ায় যা-ও চলত, এখন আর চলছেই না। ছেলেটা বিনে পয়সায় করপোরেশনের স্কুলে পড়ে—কিন্তু সেখানে পড়া যে কি হয় তাও ভালই জানে।

বাপী উঠে পায়চারি করল খানিক। রক্তশূন্য মুখ। শোবার ঘরে ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে আবার ফিরে এলো। রতনের ছেঁড়া কোর্তার দু পকেটে দু তোড়া নোট গুঁজে দিল। বলল, দুই হাজার টাকা আছে, এখন এই দিয়ে চালাও। ছেলের ভার আমি নেব, কিন্তু এখনো মাসখানেক মাস-দেড়েক আমি বেরুতে পারব না—তাছাড়া ডিসেম্বর মাসটা না গেলে কোনো স্কুলে নতুন করে ভর্তি হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তোমার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, ব্যস্ত হবারও দরকার নেই—সময়মতো ব্যবস্থা যা করার আমিই করব—আমিই তোমাকে খবর দেব।

বলার পরেই ভিতরে বৃশ্চিক দাহ। যে গোপনতার পর্দা ছিঁড়েখুঁড়ে ভিতরের মানুষটা বেরিয়ে আসতে চায়, তাকে আরো আড়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া হল।

রতন বণিক হঠাৎ কেঁদে ফেলে বাপীর দু হাত ধরল।

হাত ছাড়িয়ে বাপী ভিতরে চলে গেল।

জানুয়ারির মাঝামাঝি, ব্যবস্থা যা করার নিঃশব্দেই করে ফেলল। বাপী অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু আরো পনেরটা দিন না যেতে এই ব্যবস্থা যে-ভাবে পণ্ড হয়ে গেল, বাপী নিজেই হতচকিত, বিমূঢ়।

মিষ্টি নিচের আপিস ঘরে ছিল। সাড়ে তিনটে না বাজতে উঠে এলো। বাপী খাটে শুয়ে বই পড়ছিল। বই সরাল। মিষ্টির অবাক মুখ।

—দিন পনের আগে তোমার সেই পিওন রতন বণিকের ছেলেকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নরেন্দ্রপুরে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলে—আর তুমি গার্জেন হয়ে তাকে হস্টেলে রেখে এসেছিলে?

বই রেখে বাপী উঠে বসল। হিসেবের বাইরে কিছু একটা হয়েছে বুঝতে পারছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা একটু। সংযতও।—হ্যাঁ। কেন?

—এই শরীর নিয়ে তুমি এত সব করেছ, আমাকে বলোনি তো?

—আমার শরীর খুব ভাল আছে।...তোমাকে কে বলল?

—রতন নিজেই। ছেলে নিয়ে ওই হলঘরে বসে কান্নাকাটি করছে—দেখগে যাও।

—কান্নাকাটি করছে কেন?

জবাব দেবার আগে শরীরটা কতটা ভাল আছে মিষ্টি তাই দেখে নিল কিনা বোঝা গেল না। বলল, ছেলে কাউকে কিছু না বলে কাল সকালে হস্টেল ছেড়ে এত পথ হেঁটে ঘরে চলে এসেছে। পথ ভুল করার জন্য আসতেও অনেক সময় লেগেছে। রতন বিকেলের মধ্যেই নরেন্দ্রপুর ছুটে গেছল, কিন্তু সেখানকার মহারাজদের হাতে-পায়ে ধরেও ফল হয় নি—তাঁরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এ-ছেলেকে আর রাখা সম্ভব নয়।

বাপী হতভম্ব। খাট থেকে নেমে এলো। হলঘরে এলো। পিছনে মিষ্টি। বিষণ্ণ পাংশু মুখে রতন মেঝেতে বসে আছে। একটু দূরে ছেলেটা ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে। বাপীকে দেখে রতন উঠে দাঁড়াল। সত্যি কাঁদছে। হাতজোড় করে বলল, আমাকে আপনি শুধু

মাপ করে দিন বিপুলবাবু—খুব আক্কেল হয়েছে—গরিবের ছেলে মানুষ করার সাধ মিটেছে।

বাপী সোফায় বসল। থমথমে মুখ। কিন্তু তার পরেই কেন যেন অত রাগ আর থাকল না, ছেলেটার দিকে অপলক চেয়ে রইল খানিক। তারপর মিষ্টির দিকে তাকিয়ে সামনে হাত পাতল। বলল, ওর কান দুটো ছিড়ে এনে আমাকে দাও তো।

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে দু পা সরে গেল। কান ছিঁড়তে যাকে বলা হল সে আসছে কিনা দেখে নিল। ঘাড় ফিরিয়ে খোলা দরজা দুটোর দিকেও তাকালো একবার। সত্যি কেউ কান ছিঁড়তে এলে পালাবার পথ আছে কিনা দেখে রাখল।

বাপীর হঠাৎ হাসিই পাচ্ছে কি রকম। কিন্তু গম্ভীর তেমনি। ছেলেটা ঘাবড়েছে, কিন্তু গোঁ-ধরা মুখ। একটা আঙুল তুলে মুখোমুখি সামনের সোফাটা দেখাল।—ওখানে বোস্।

ছেলেটা মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েই রইল। রতন মারতে এগলো।—হারামজাদা, এর পরেও কথা কানে যাচ্ছে না তোর—তোকে আমি আস্ত রাখব!

—রতন!

ছেলের পিঠে নেমে আসার আগেই রতন বণিকের হাত থেমে গেল।

বাপী বলল, আমি যেখানে ভার নিয়েছি সেখানে তোমার শাসনের আর দরকার নেই। ছেলের দিকে ফিরল।—আমি এক কথা দুবার বলি না মনে থাকে যেন। বোস ওখানে।

এঁকে-বেঁকে ছেলেটা সোফার সামনে গেল। বসল। কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কৌতুকের ব্যাপার ঘটল যেন। বসার জায়গা এমন হয় তার ধারণার বাইরে। নিজের অগোচরেই আধাআধি দাঁড়িয়ে আবার বসল। তারপরেই অপ্রস্তুত মুখে ভয়ে ভয়ে বাপীর দিকে তাকালো। নরম গদীর লোভে আবার ওঠা আর বসাটা ভাল কাজ হল না নিজেই বুঝছে।

মিষ্টি চেষ্টা করে হাসি চাপল। বাপী আড়চোখে একবার তাকে দেখে নিল। তেমনি গম্ভীর। রতনের দিকে ফিরে একটু গলা চড়িয়ে বলল, তুমি কিছু ভেবো না—এ-বয়সে ওর থেকে আমি ঢের বেশি বাঁদর ছিলাম, বিশ্বাস না হয় তোমার রাজরাণীকে জিগ্যেস কর। ওকে ঢিট করার ব্যবস্থা আমি করছি—ও আর কোথাও যাবে না, এখানে থাকবে।

মিষ্টি অবাক। রতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না।

বাপীর দু চোখ রতনের মুখের ওপর।—তুমি চলে যাও এখন। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে ছ'মাসের মধ্যে আর এ-মুখো হবে না। তারপর ইচ্ছে হয়, দেখে যেও—কিন্তু এখন শিগগীর না!

রতন বোকা আদৌ নয়। অকুলপাথার থেকে উঠে এলো। মিষ্টি কিছু বোঝার আগেই চট করে এগিয়ে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠল। তার পর খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে চলে গেল।

ছেলেটা তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ছোটার ইচ্ছে। তার আগেই ধমক খেয়ে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

—বোস।

বসে পড়ল।

মিষ্টি আর চুপ করে থাকতে পারল না।—কি ব্যাপার?

—শুনলে তো। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিল, বাচ্চু।

ভিতরের ঘর থেকে বাচ্চু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। কলেজে পড়ছে। সুঠাম স্বাস্থ্য।

বাপী বলল, এখন থেকে এই ছেলেটা আমাদের এখানে থাকবে। ওর নাম মদন। কাল-পরশুর মধ্যে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করে দিবি। আর সব ব্যবস্থা আমি করছি। ওকে নিয়ে যা—

বাচ্চু অবাক একটু হল বটে, কিন্তু কিছুই জিগ্যেস করল না। এই কাকার বুকের খবর সে রাখে। এত শ্রদ্ধাও বোধ হয় দুনিয়ায় আর কাউকে করে না। মদনের হাত ধরে ভিতরে চলে গেল।

চোখ মুখ ভালো করে লক্ষ্য করে মিষ্টি তেমন জেরা করতে ভরসা পেল না। তার অনুমান প্রেসার একটু-আধটু বেড়েছে। শুধু মন্তব্যের সুরে বলল, ব্যবস্থাটা আর একটু ভেবে-চিন্তে করলে হত না?

—কেন?

—পিওনের ছেলের সঙ্গে লেপটে থাকতে বাচ্চুর ভালো না-ও লাগতে পারে।

—লেপটে থাকতে হবে কেন? এ বাড়িতে ঘরের অভাব নাকি? আর ওই পিওন না থাকলে দুঃসময়ে তার কাকার অস্তিত্ব থাকত না এ কথাটা বাচ্চুকে জানিয়ে দিতেই বা তোমার অসুবিধে কি?

মিষ্টি চেয়ে রইল শুধু। এ-চাউনির অর্থ বাপীর কাছে দুর্বোধ্য নয় একটুও। যার জন্যে এত দরদ, দুঃসময়ে যারা এত করেছে—এতগুলো বছরের মধ্যে তাদের কথা একবারও মনেও পড়ে নি কেন? গাড়িতে পনের মিনিটের পথ...একটা খবর পর্যন্ত নেওয়া হয় নি কেন?

বাপী সোজা হয়ে বসল একটু। এই নীরব প্রশ্নের জবাব দেবে? গোপনতার অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার এমন সুযোগ আর পাবে? জবাব দেবে? দেবে দেবে দেবে?

কিন্তু অদৃশ্য কেউ গলা চেপে ধরেছে তার। দম বন্ধ হয়ে আসচে।

মিষ্টি তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো।—ঠিক আছে, যা করেছ বেশ করেছ, এখন ওঠো তো, মাথা ঠাণ্ডা করে চুপচাপ খানিক শুয়ে থাকো।

এক মাসের মধ্যে মদনের বাইরের ভোল বদলে গেল। কেউ দেখলে বুঝবে না ও এ বাড়ির ছেলে নয়। এমন চকচকে জামা প্যান্ট জুতো আগে চোখেও দেখে নি। তার আলাদা ঘর, আলাদা পড়ার ব্যবস্থা। দুবেলা দু'জন মাস্টারের কাছে পড়তে হয়। স্কুলবাসে যায় আসে। এমন তোয়াজে থাকার ফলে এরই মধ্যে ছেলেটার কচি মুখের শ্রী আরও ফিরে গেছে। মিষ্টিরও লাগে। কিন্তু পিওনের ছেলের জন্য যা করা হচ্ছে তা খুব স্বাভাবিক মনে হয় না তার। ঘরের লোক যা করছে ঝোঁকের বশে করছে ভাবে।

বাপীও ছেলেটাকে লক্ষ্য করে। নিজে কাছে আসে না। কাছে ডাকে না। কিন্তু কিছুই চোখ এড়ায় না। একটা দুরন্ত খাঁচায় এনে পোরা হয়েছে। ফাঁক পেলে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। তক্ষুনি নিজের সেই দুরন্ত ছেলেবেলা চোখে ভাসে। একেবারে জাহান্নামেই যাবার কথা। যায় নি কারণ মাথার ওপর বাবা ছিল, আগলে রাখার মত পিসী ছিল,

আর মিষ্টি নামে এক মেয়ের কাছে পৌঁছনোর একাগ্র লক্ষ্য ছিল। এই ছেলের কি আছে? কে আছে? ভেসে গেলে স্রোতের মতো ভেসে যাবে। ভাবতে গেলেও ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে বাপীর।

দিন গড়ায়। মাস গড়ায়। একে একে দুটো বছরও গড়িয়ে গেল। বাপীর বয়েস এখন সাঁইত্রিশ। কিন্তু মনে হয় এই দেহ-পিঞ্জরের অন্ধকারে সুড়ঙ্গ-গহ্বরে অনন্তকাল ধরে কেউ গুমরে মরছে, বেরিয়ে আসার জন্য মাথা খুঁড়ছে। যতদিন পর্যন্ত কিছু লক্ষ্য ছিল, খোঁজা ছিল, শুধু ততদিনই বাঁচার মত বেঁচেছিল। লক্ষ্যের শেষ, খোঁজার শেষ মানেই মৃত্যু। এই মৃত্যু জীবনের শেষ কথা হতে পারে না, এ-বিশ্বাস এখন বদ্ধমূল। কিন্তু সামনে কে এগোবে? কে খুঁজবে? যে এগোবে যে খুঁজবে সে তো এক মিথ্যেকে আশ্রয় করে গোপনতার অন্ধকার কবরের তলায় ঢুকে বসে আছে।

বাপী খুব আশা করেছিল, এখানে চোখের ওপর থেকে ছেলেটা মিষ্টির মন কাড়বে। মিষ্টির মন ওকে ঘিরে একটু একটু করে মায়ের মন হয়ে উঠবে। তখন বাপী এই গোপনতার কবর থেকে বেরিয়ে আসার কোন না কোন পথ একদিন পাবেই।

তা হল না। মিষ্টির কর্তব্যে ক্রটি নেই। কিন্তু বাচ্চু যত কাছের, এই ছেলে তার ধারে-কাছেও না। দিন কয়েক আগে বলেছিল, স্কুল-কলেজের গরমের ছুটি চলেছে, বাচ্চু ক'দিনই দেখেছে দুপুর রোদে মদন বয়সে বড় বাজে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে নয়তো আড্ডা দিচ্ছে—ডাকলেও ওর কথা শোনে না তুমি ডেকে একটু ধমকে দিও তো।

শোনামাত্র বাপী তেতে উঠেছিল।—কেন, তুমি কিছু বলতে পারো না? তুমি ধমকে দিতে পারো না?

মিষ্টির সাফ জবাব, পরের ছেলেকে নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ—যা করার তুমিই করো।

বাপীর তক্ষুনি মনে হল, মিষ্টির চোখে এই পরের ছেলের সঙ্গে বাচ্চুর মতো পরের ছেলের অনেক তফাৎ। পিওনের বস্তিঘর থেকে এসেছে বলে শাসনের মর্যাদা দিতেও আপত্তি! সেদিনের মাত্রা-ছাড়া শাসনের মুখে মিষ্টিই আবার বাধা দিয়েছে। বেশি উত্তেজনার ফল জানে। মদনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাপীকে বলেছে, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। তুমি চাইলেই—

থেমে গেছে। সে চাইলেই বস্তিঘরের ছেলের স্বভাব এত সহজে বদলাবে না বলতে যাচ্ছিল বোধ হয়। তারপর দেড়-দু'মাসের মধ্যে বাপী তার মুখে এই ছেলের ভালোমন্দ সম্পর্কে কোনো কথা শোনে নি।

...তারপর সমস্ত সত্তা দুমড়নো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বাপীর মুক্তির দিন। গোপনতার শেষ। বাষট্টি সালের জুলাইয়ের দু'তারিখ সেটা।

আগের দিনটা, অর্থাৎ পয়লা জুলাই, দেশের—বিশেষ করে এই বাংলার বিরাট শোকের দিন। ডাক্তার বিধান রায় নেই। বেলা বারোটার পাঁচ মিনিট আগে তাঁর জীবনদীপ নিভেছে। এই দিনে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই দিনেই চলে গেলেন। বাপীর ভিতরটা বিষাদে ছাওয়া। দোষ-গুণ নিয়ে মাটির এমন বিরাট পুরুষ আর কে থাকল?

পরদিন।...অর্থাৎ আজ সকাল। তাঁকে নিয়ে মহাযাত্রা শুরু হয়েছে। তাঁকে শেষ

দেখা দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। বাপীও ঘরে বসে থাকতে পারে নি। পায়ে হেঁটেই রাস্তার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। মহাযাত্রা এগিয়ে গেল। বাপী দেখছিল, দেশের মানুষ অকৃতজ্ঞ নয়। চোখের জলে তারা শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

বাপী ফিরে চলেছে। এ-ও মৃত্যু কি মুক্তি, ভাবছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎ কিছু চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। রাস্তার ও-ধারে পানের দোকানের সামনে চোদ্দ থেকে সতের আঠের বছরের চার-পাঁচটা ছোকরা জটলা করছে আর সিগারেট টানছে। তাদের মধ্যে মদন! তার মুখেও সিগারেট।

বাপী নিঃশব্দে রাস্তা পেরুলো। ডানা ধরে হিঁচড়ে ওকে রাস্তার এ-পারে নিয়ে এলো। ছেলেটা যমের মুখে পড়েছে বুঝছে। বাড়ি। জামার মুঠো ধরেই বাপী তাকে দোতলায় বড় ঘরটায় এনে ফেলল। তারপর পায়ের থেকে জুতো খুলে এলোপাতাড়ি পিটতে লাগল।

ভিতর থেকে মিষ্টি ছুটে এলো। বাচ্চুও। কিন্তু বাপীর মাথায় খুন চেপেছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে ছেলেটা কিন্তু মুখ দিয়ে শব্দ বার করছে না। ওকে একেবারে শেষ না করে বাপী থামবেই না। মিষ্টি কয়েক পলক বিমূঢ়। সত্রাসে এগিয়ে এসে তাকে থামাতে চেষ্টা করল, দু'হাতে আগলে রাখতে চেষ্টা করল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, বাচ্চু মদনকে তুলে নিয়ে শিগগীর ঘরে চলে যা!

বাচ্চু তাই করল। বাপী হাঁপাচ্ছে। চাউনিও অস্বাভাবিক।

হাত থেকে জুতোটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মিষ্টি আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? ও কি করেছে?

জ্বলন্ত চোখে তার দিকে চেয়ে বাপী জবাব দিল, রাস্তায় ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট টানছিল...।

শোনামাত্র মিষ্টিও রেগে গেল কি রকম। বলে উঠল, ছোটলোকের ছেলে, বিড়ি সিগারেট খাবে বেশি কথা কি? তা বলে তুমি এত ক্ষেপে গিয়ে নিজের ক্ষতি করবে কেন?

—কি বললে? প্রাণপণ চেষ্টায় বাপী সংযত করতে চাইল নিজেকে। কিন্তু ভিতরে ভূমিকম্প হচ্ছে। গোপনতার কবরটা সবার আগে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।—ও ছোটলোকের ছেলে হলে সেই ছোটলোক আমি।...ও আমার ছেলে।...শুনতে পাচ্ছ? বুঝতে পারছ? সেই ছোটলোক আমি!

টলতে টলতে বাপী নিজের ঘরে চলে গেল।

মিষ্টি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। দু কানের পরদা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু মগজে কিছু ঢুকছে না। একটু বাদে পায়ে পায়ে সে-ও ঘরে এসে দাঁড়াল। বাপী খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে বসে আছে। উদভ্রান্ত চাউনি। এই মুখের দিকে চেয়ে অশুভ আশংকায় মিষ্টির ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। নিজের অগোচরে দু'পা এগিয়ে এলো।

বাপীর ঘোরালো চাউনি।—কি শুনলে? কি বুঝলে?

মিষ্টি বিড়বিড় করে বলল, এসব কথা থাক এখন...।

—আর থাকবে না। অনেক থেকেছে। উঠে নিজেই দরজা দুটো ভেজিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল।—তোমাকে বলতে না পেরে প্রায় তিন বছর ধরে আমি মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করছি। অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমার আমার মধ্যে গোপনতা থাকবে না বড়াই করে

বলেছিলাম—তার শাস্তি ভোগ করছি।...শোনো, আজ আবার বলছি, আমার যা-কিছু ভালো, যা-কিছু মন্দ—সব তোমার জন্যে—শুধু তোমার জন্যে।...লেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তুমি আমার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছিলে মনে পড়ে? অসিত চ্যাটার্জী আর তার সঙ্গের জনাকতকের অপমানে আমার মাথা মুড়িয়ে দিয়েছিল, মনে পড়ে?'

মিষ্টি বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে। নিজের অগোচরে মাথা নেড়েছে কিনা জানে না।

—সেই রাতে আমি পাগল হয়ে গেছলাম। সমস্ত মেয়ে জাতটাকে ভস্ম করে ফেলতে চেয়েছিলাম। সেই রাতে কমলা বণিক এসেছিল। আমি একটুও প্রস্তুত ছিলাম না। অন্ধকারের জানোয়ার শুধু তোমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মাথা খুঁড়ছিল। সেই অন্ধকারে তোমার বদলে কমলা এসেছিল। সে আমাকে চায়নি ছেলে চেয়েছে। রতন বণিক তার দিদিকে ছেলে দিতে পারে নি, তাকেও দিতে পারবে না বুঝেছিল। আরো দু'রাত আমিই শুধু নরকে ডুবেছিলাম, তারপর চাবুকে-চাবুকে নিজেই নিজেকে রক্তাক্ত করেছি—সজাগ করেছি। পালিয়ে গেছি। কিন্তু কমলাকে ঘৃণা করতে পারি নি। যাবার আগে ও বলেছিল, এরপর তুমি কেবল আমাকে ঘেন্নাই করবে জানি, কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে পূজো করেই যাব, আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভালো রাখে।

মিষ্টি চেয়ে আছে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে এবার তারও জগৎ ভাঙছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কানে যা শুনল তা তলিয়ে ভাবার ফুরসৎ পেল না। তার আগে ভিতরে এ কিসের ঢেউ? ঘৃণা? বিদ্বেষ? সব থেকে বেশি—অবিশ্বাস?

মিষ্টি একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাপী খাটে বসল। শুয়ে পড়ল। দু'চোখ আপনা থেকে বুজে এলো। চোখের সামনে অন্ধকারের সমুদ্র। অথচ আশ্চর্য। এই সমুদ্র সে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে আলোর তট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সব অন্ধকারে খসে খসে দূরে সরে যাচ্ছে!

মিষ্টি বাচ্চুকে বলেছে ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার এসেছে। দেখে গেছে। আবার ই সি জি করা হয়েছে। তার ফল কি বাপী জানে না। কৌতূহলও নেই। ওরা কেন এত করছে ভেবে পায় না। এত ভালো কি বাপী জীবনে থেকেছে? সাতদিনের মধ্যে মিষ্টি একটা কথাও বলে নি। কিন্তু কাছে এসেছে। কর্তব্য করেছে। রাতের জন্য আবার নার্স এনেছে। বাপী না ঘুমনো পর্যন্ত নিজেও ঘরে থেকেছে। তারপর চলে গেছে। ও প্রচণ্ডভাবে নিজের সঙ্গে যুঝছে, বাপী বুঝতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, তার জন্যও বাপীর ভিতরে এতটুকু উদ্বেগ নেই। আজ হোক বা দু'দিন বাদে হোক, মিষ্টি ওকে বুঝবেই। না বুঝে পারে না। না বোঝা মানে সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকা যায় না।

...সকাল থেকেই বাপীর চোখ-মুখের চেহারা সেদিন অন্যরকম। ভিতরে যেন এক অবাক-করা আনন্দের ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে।...কিন্তু মিষ্টি জিত্ বাচ্চু তার মুখের দিকে চেয়ে কি বুঝছে? কি বুঝছে? বাপীর হাসি পেয়ে গেল। ওরা ঘাবড়াচ্ছে। আনন্দের ছিটেফোঁটাও টের পাচ্ছে না।

মিষ্টি সারাক্ষণ প্রায় কাছে কাছে আছে। দু-বার করে ডাক্তার এসে দেখে গেল। ডাক্তারের মতে প্রেসার বোধ হয় বেশি হাই। বাপীর হাসি পাচ্ছে। হাতের খোলা বইটা খোলা অবস্থাতেই উল্টে রেখে সকলের মুখগুলো দেখতে লাগল।

বিকেল। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য মিষ্টি ঘর ছেড়ে গেছল। ফিরে এসে মিষ্টি দেখল বিছানা খালি। খোলা বইটা তেমনি উপুড় করা। ভাবল বাথরুমে গেছে। উঠে তাও যাবার কথা নয়।

মিষ্টি বইটা তুলে নিল। সকাল থেকে মোটা কালিতে লাল দাগ মারা একটা জায়গায় বহুবার করে পড়তে দেখেছে লোকটাকে। পড়েছে। তারপর চোখ বুজেছে। আর নিজের মনেই যেন হেসেছে। হাসিটা যে কি রকম অদ্ভুত লেগেছে মিষ্টির।

এখনো সেই লাল দাগ-মারা পাতা। মিষ্টি পড়ল। ছাপা অক্ষরে ছোট ছেলেদের উপকথার মতো গল্প একটু।

—গরিব কাঠুরে জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেছল আর মনে মনে দুরবস্থার জন্য নিজেকে অভিসম্পাত করেছিল। সাধুর রূপ ধরে ভাগ্য এসে তার সামনে দাঁড়াল। বলল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল—পেয়ে যাবি। সাহস করে কাঠুরে সেদিন অনেক দূরে চলে গেল। তারপর অবাক কাণ্ড! সামনে মস্ত একটা চন্দনের পাহাড়। আনন্দে কাঠুরের পাগল হবার অবস্থা। তার দিন ফিরেছে। চন্দন কাঠে থলে বোঝাই করল। আর ভাবল, আস্তে আস্তে সমস্ত পাহাড়টাই তুলে নিয়ে যাবে।

কিছুদিন বাদেই কাঠুরের মনে হল, সাধু তো তাকে থামতে বলে নি—এগিয়ে যেতে বলেছিল। সামনে কি তাহলে আরো বেশি লোভের কিছু আছে নাকি? এগিয়ে চলল। এবারে টাকার পাহাড়! কাঠুরে আনন্দে দিশেহারা। দিন-কতক পাগলের মতো টাকা তোলার পর আবার সেই কথাই মনে হল। সাধু সামনে এগোতে বলেছিল। সামনে আরো কি? আবার চলল। এবারে সোনার পাহাড়। তারপর আবার সেই। আরো সামনে কি? হীরে মুক্তো মানিকের পাহাড়। ব্যস, চাওয়ার বা পাওয়ার আর কি থাকতে পারে।

কিছুকাল মত্ত আনন্দে কাটানোর পর বিবেকের আবার সেই তাড়না। সাধু থামতে বলে নি। এগোতে বলেছিল। কিন্তু যা পাবার সব তো পেয়ে গেছে। আর কি পাবে? কোন দিকে এগোবে? বাইরে আর এগোবার কোনো দিক নেই নিজের ভিতরের দিকে চোখ গেল তার। কাঠুরে সেই পথ ধরে এগোতে লাগল। তারপর কি আশ্চর্য? সেখানে যে ঐশ্বর্য—তার আভাতেই যে দু'চোখ ঠিকরে যায়। এমন ঐশ্বর্য যে তার চারিদিকে জ্যোতির সমুদ্র।

খোলা বইটা মিষ্টি তেমনি উল্টে রেখে দিল। একটু বাদেই খেয়াল হল, বাথরুমের এদিকে ছিটকিনি টানা। অর্থাৎ সেখানে কেউ নেই। ত্রস্তে উঠে দাঁড়াল। সব কটা ঘর খুঁজল নেই। নিচে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে চলল। মাস কয়েকের মধ্যে নিচে নামতে দেখে নি। ছাদে বেড়াতে দেখেছে।

তাই। লম্বা ছাদের, এ-মাথা ও মাথা করছে। নড়া-চড়া একেবারে বারণ!

বাপী দেখতেও পেল না। আর একবার ছাদের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেল।

ফিরছে। মিষ্টি সামনে মুখোমুখি এগিয়ে গেল। বাপী থমকে দাঁড়াল। মুখে আলগা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখ অস্বাভাবিক চকচক করছে। অনেক দূরের কোথাও থেকে ফিরল যেন। ভালো করে দেখতে লাগল। খুব নরম গলায় বলল, মিষ্টি অবিশ্বাস কোরো না, অবিশ্বাস করে কষ্ট পেও না।

মিষ্টির বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। একটা অজ্ঞাত ভয় তাকে ছেঁকে ধরেছে।

এক হাতে বাপীর একটা হাত ধরল। অন্য হাতে শক্ত করে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক আছে, চলো—

মিষ্টির মনে হতে লাগল সিঁড়িগুলো বুঝি আর ফুরোবে না। একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল, দেখে পা ফেলো—কাঁপছ কেন?

বাপী টেনে টেনে হেসে হেসে জবাব দিল, আনন্দে আনন্দে।

টের পেয়ে বাচ্চুও ছুটে এসেছে। ধরাধরি করে দুজনে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মিষ্টির চোখের ইশারায় বাচ্চু ডাক্তারকে ফোন করতে ছুটল।

বাপী বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে শুলো। চোখ বুজল। ঠোঁটে হাসি।

কি একটা চমকের মধ্যে ঘোর কেটে গেল তার। মাঝে কতক্ষণ বা কটা দিন গেছে ঠাওর করতে পারছে না। ঘর ভরতি লোক। একটা অস্পষ্ট কোলাহলের মতো কানে আসছে। কি কাণ্ড, আবু রব্বানীর সঙ্গে এবারে দুলারিও এসেছে! কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে ওদের চোখে জল কেন? ঘরের মধ্যে জিত মালহোত্রা...শ্বশুর শাশুড়ী দীপুদা...বাচ্চু--দরজার কাছে মদন...বিছানায় মিষ্টি। মিষ্টি চেঁচিয়ে বলছে কিছু। ও এত কাছে...কিন্তু কথাগুলো অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে মনে হচ্ছে কেন? মিষ্টি বলছে আমাব সব ভুল ভেঙ্গে গেছে, আমি আর কক্ষনো তোমাকে অবিশ্বাস করবো না, মদন আমার কাছেই থাকবে, আমাকে মা বলে ডাকবে—শুনছ?

...ভালো কথা তো! এত ভালো আর কি হতে পারে? কিন্তু মিষ্টি কাঁদছে কেন? কান্না বাপীর কোন দিন ভালো লাগে না।

...এ কি! এ যে আরো অবাক কাণ্ড! এত কাছের এই মানুষগুলো এতদিন ছিল কোথায়? তারা এত সুন্দরই বা হল কি করে?

—বাবা! আমার দিকে চেয়ে এভাবে দেখছ কি? আর আমার একটুও রাগ নেই তোমার ওপর!

—পিসী? কত দিন দেখো নি আমাকে আচ্ছা। জব্দ! আর পালাবে?

—বাঃ! রেশমা! দুষ্টু মেয়ে...এমন করে? সাপের কামড়ের আর একটুও জ্বালা-যন্ত্রণা নেই তো?

—আর একজন...ঠিক এক রকমই আছে, এই মুখ বাপী কখনো ভুলতে পারে? ...ঠোঁটের ফাঁকে চুল-চেরা হাসি, দাপটের চাউনি...কিন্তু মুখখানা গায়ত্রী রাইয়ের অত ফ্যাকাশে নয় আর, লালচে। গায়ত্রী মা, তোমার মেয়ে-জামাই খুব ভালো আছে, সুখে আছে—ফুটফুটে একটা নাতনি হয়েছে তোমার জানো তো?

—আমি খুব...খুব অন্যায় করেছি মাস্টারমশায়—কিন্তু আপনি তবু আমাকে বকছেন না কেন? অত হাসছেন কেন?

...সকলের সঙ্গে দেখা হল খুব ভালো হল। কিন্তু তার কি বসে থাকার জো আছে...খুঁজতে হবে না? সামনে এগোতে হবে না? পেতে হবে না? চন্দন কাঠের পাহাড়, টাকার পাহাড়, সোনার পাহাড়, হীরে-মণি-মুক্তোর পাহাড়ের পর আর কি কোনো ঐশ্বর্য নেই নাকি? সেই সোনার হরিণ চাও তো ভিতরে খোঁজো। বাইরে কোথাও নেই। বাপী তার আভা দেখেছে, জ্যোতি দেখেছে। বাপী চেয়েছে অথচ পায় নি এমন কিছু আছে?

না, বাপী তরফদারের থামার সময় নেই।

খনির নতুন মণি

শ্রীঅরুণকুমার দত্ত ও শ্রীমতী উমা দত্তর
করকমলে

কাক-ডাকা ফিকে আঁধার মুছে মুছে পূব-আকাশে জবাকুসুমসংকাশ সোনার চাকতিটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আর ভোরের কালচে মেঘগুলোর ভিতর দিয়ে রঙের পিচকিরি ছোটাচ্ছে। আর, টুপ করে ওটা আকাশের বুকে উঠে বসে আকাশ মাটি গাছপালা সব কিছু রাঙা আলোর জোয়ারে স্নান করানোর মতলব আঁটছে।...যদি এমন হয়, ওই রং-সমুদ্রের একটা ঢেউ পরীরাণীর চোখের ভিতর দিয়ে হোক বা গোটা শরীরটার চামড়া মাংস অস্থি মজ্জা ফুঁড়ে হোক, একবারটি ওর এই কাঠামোর একেবারে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে...তাহলে?

তাহলে পরীরাণী নামে এক সাদামাটা মেয়েও টুকরো টুকরো কালো মেঘে ছাওয়া ওই আকাশটার মতো ঠিক অমনি করেই রাঙিয়ে উঠতে পারত, আর তার চারদিকের সমস্ত অন্ধকার-মুখো মেয়ে পুরুষগুলোর ভিতরেও অমনি টকটকে তাজা রঙের এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়তে পারত।

রেলিংয়ের ওপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল একটু। রাস্তায় আবছা মূর্তি একটা। এদিকের রাস্তার আলোগুলো সপ্তাহের মধ্যে চার-পাঁচদিন জ্বলেই না। কালও সন্ধ্যে থেকে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। দূরের আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলেও দু'দিকে গায়ে গায়ে লাগা সারি সারি বাড়ির দরুন এ-রাস্তাটার বরাতে ভোরের প্রথম আলোর স্পর্শ জোটে না। (মানুষগুলোর কি কস্মিনকালে জোটে।) যাক, এ-রাস্তায় এখনো ভালো করে চোখ চলে না বলে ভোরের ওই প্রথম মূর্তিটা দেখার জন্য পরীরাণী দোতলার নড়বড়ে রেলিংএ ভর করে নীচের দিকে ঝুঁকল।

সঙ্গে সঙ্গে চিনল। কি কাণ্ড। এক হাতে বেঁটে মোটা শলাঝাঁটা, অন্য হাতে আবর্জনা তোলার টিনের কানেস্তারা। পাড়ার মেথর লখিয়া। রাস্তার দু'দিকে বেশ ভালো করে দেখে নিল লোকটা। আবছা আলোতেও কোথায় কি-রকম আবর্জনা জমে আছে ও ঠাওর করতে পারে বোধহয়। দেখা শেষ করে ঝুঁকে কাজ শুরু করে দিল। আর তাইতেই বেশ একটা একাগ্রতা দেখা গেল। আবর্জনা স্খালনের এক তন্ময় ছন্দে লোকটা ঘাড় গুঁজে কাজ করছে আর সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

দূরের আকাশে লালের ছটা দ্বিগুণ, চারগুণ ছড়িয়েছে। সোনার চাকতিটা একখণ্ড এবড়োখেবড়ো মেঘের মুণ্ডুর ওপর চেপে বসে হাসছে আর গলগল করে কাঁচা সোনা ছড়াচ্ছে। কাছের দূরের সব অন্ধকারের আবর্জনা নিঃশেষ করে ছাড়ল।...নীচের ওই লোকটা, ওই লখিয়াও কতকগুলো স্থূল আবর্জনা সরাচ্ছে। দুটো কাজের মধ্যে কোথায় যেন খুব সূক্ষ্ম একটা মিল আছে। বড় আশ্চর্য মিল।...যদি এমন হয়, পরীরাণীর হাতে কেউ অমনি শক্ত-পোক্ত একটা অদৃশ্য ঝাঁটা আর আবর্জনা নিকাশের ওই রকম একটা অলক্ষ্য কানেস্তারা তুলে দিয়েছে...তাহলে?

তাহলেও পরীরাণী নামে মেয়েটা কি কাণ্ড করে ছাড়তে পারত ভাবতে গিয়ে গলা দিয়ে অস্ফুট হাসির শব্দ বেরিয়ে এলো একটু। নিজেই সচকিত, এই সাত সকালে হাসির শব্দ কারো কানে গেলে পাগল ভাববে।

ও-ধারে পরিচিত সড়সড় শব্দ একটা। ঘাড় ফেরালো। এখন আর অস্পষ্ট কিছু নেই। এও আধ-বুড়ো চেনা মুখ একটা। পাইপে করে রাস্তায় গঙ্গাজল ছড়ায়, রাস্তা ধোয়। পাইপের ভিতর দিয়ে তোড়ে জল ছুটেছে। ধনুকের মতো ছোট-বড় জলের বৃত্তগুলো

মুখ থুবড়ে পড়ে রাস্তার ময়লা ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ লোকটাও যেন আবর্জনা স্খালনের শিল্প-কর্মে মগ্ন। গঙ্গাজলের মুখ বন্ধ করে পাইপ কাঁধে পরের গঙ্গাজলের মুখটার দিকে ছুটল।

না, এ নিয়েও আবার কোন যদির চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে কাজ নেই, এবার হয়ত জোরেই হেসে উঠবে তাহলে। মোট কথা পরীরাণীর ভালো লাগছে। কাজের লোক ক'টা আর দেখেছে এই বয়েস পর্যন্ত— ওই লোকগুলোকে সত্যিকারের কাজের লোক ভাবতে ইচ্ছে করছে। সেই সঙ্গে নিজের ভিতরটাও অনেক পরিষ্কার লাগছে।

এই অনুভূতিটা আর বেশিক্ষণ থাকবে না। সামনের নাম-না-জানা আধমরা গাছটার মাথার দিকের শিশিরে ভেজা সবুজ পাতাগুলো কাঁচা আলোয় চিকচিক করছে। একটু বাদে চেকনাই মুছে যাবে, তারও পরে খরখরে ধূসর দেখাবে। পরীরাণীরও ঠিক সেই দশা হবে। ভোরের এই কাঁচা তাজা স্পর্শ মুছে গিয়ে খরখরে টান ধরবে। অনেক চেষ্টা করেও এটুকু আঁকড়ে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

...দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপরে, খেয়াল চাপলে তখনো এক-এক সময় এই রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দা এমন তেতে থাকে যে পাঁচ মিনিটে পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে যাবার মতো হয়। তবু দাঁড়ায়। দু'চোখ টান করে ঝপ করে একবার মাথা তুলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঝলসে যায়, একরাশ তপ্ত ছুঁচ বেঁধে। দু'চোখ বন্ধ করে ফেলতে হয়। পূব আকাশের ওই রঙে ঢল-ঢল কাঁচা সূর্যটারই তখন অত জ্বালা অত তেজ অত আক্রোশ। আসলে ওটা এই পৃথিবীর থেকেও কোটি কোটি গুণ বড় আগুনের পিণ্ড একটা। ও জানে। ওটার দিকে ও-ভাবে তাকানো নিষেধ জেনেও তাকিয়ে পরখ করে। তারপর ভাবে, ওই আগুন-পিণ্ডের লক্ষ কোটি কণার এক কণাও যদি ওর অস্তিত্বের সঙ্গে এসে মিশত, তাহলে?

তাহলে নিষেধের বেড়া টপকে যে-কেউ কাছে আসতে চাইলে, এমনকি, মুখ তুলে তাকানোর স্পর্ধা দেখালেও পরীরাণী নামে এক মেয়ে তাকেও ঝলসে পুড়িয়ে গলিত আগুনের স্রোত বইয়ে দিতে পারত।

কিন্তু এমন কিছুই ঘটে না। এমন কিছুই হয় না। পরীরাণী নামে মেয়েটা যা চায় তার কিছুই পারে না।

মুহূর্তের জন্য সচকিত আবার। তারপর দু'চোখ রাস্তার ও-ধারে দুটো দালান ছাড়িয়ে ছাল-চামড়া ছাড়ানো তেরছামুখো ওই আধ-ধসা বাড়িটার দোতলার খোলা জানলার দিকে স্থির। জানলায় গরাদ নেই, শুধু দুটো রং-ওঠা খড়খড়ি-ভাঙা পাল্লা। জানলায় দাঁড়িয়ে ছেলেটা দাঁতন করছে, আর একটা চোখ একটু ছোট করে ওর দিকে চেয়ে আছে, আর চোখাচোখি হবার পর ওই একটা ছোট চোখ আরো ছোট করছে আর সেই সঙ্গে দাঁতন করার মধ্যেও ঠোঁটে আর গালে হাসি-মাখা একটা তির্যক ভাঁজ পড়ছে। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে পরীরাণী চলে আসে, ঘরে সেঁধিয়ে যায়। কিন্তু আজ আর নড়ল না। দাঁড়িয়ে রইল। আর সরাসরি মুখের দিকে চেয়েই রইল।

আর তারপর আরো বেশি মনে হল এতক্ষণ যা ভাবছিল তার কিছুই ঘটে না, কিছুই হয় না। আবর্জনার জমাট-বাঁধা স্তূপের মতো ওই মূর্তি দাঁড়িয়েই আছে।

কিন্তু তবু চেয়ে আছে, পরীরাণী নামে এই মেয়ে তবু প্রাণপণে চাইছে অন্য দিনের তুলনায় এই দিনটার কিছু তফাত হোক, কিছু ব্যতিক্রম ঘটুক।

ব্যতিক্রম কিছু ঘটল। পিছনে চাপা তীক্ষ্ণ গলার স্বর ছুঁচের মতো কানে বিঁধল।

—সাত সকালে ঝেঁটিয়ে তোর শুভদৃষ্টি গেলা বার করে দেব!

পরীরাণী নামে মেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। রাস্তার ও-ধারে পিছনের ওই খোলা জানলায় এক জোড়া চোখের হুল, কিন্তু সামনে তিন জোড়া। সামনে বলতে বারান্দায় তিন হাতের মধ্যে এক জোড়া। মায়ের। তার পিছনে ঘরের মধ্যে দু'জোড়া। দাদার আর বীরু মামুর। মায়ের এত সকালে ঘুম ভাঙাটাও নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রায় রাতেই কি ওষুধ-টসুধ খেয়ে ঘুমোয়, অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙে। তারপরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝিমোয়। মায়ের এই ঘুমের ওষুধ-খাওয়া নিয়েও দাদা এক-এক সময় বিতিকিচ্ছিরি রসিকতা করে। রসিকতার অর্থ পরীরাণী বলতে পারে, কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করে।

মা, বলতে সং মা। পরীরাণীর থেকে তেরো বছরের বড়। আর দাদার থেকে ন' বছরের। পরীরাণীর বয়েস যখন দশ আর দাদার চৌদ্দ তখন তেইশ বছরের এই মা-টিকে বাবা ঘরে এনেছিল। আজ থেকে এগারো বছর আগে। পরীরাণীর বয়েস এখন একুশ, দাদার পঁচিশ, আর মায়ের চৌত্রিশ। আড়ালে দাদা মাকে মা বলে না বড়। দাদা সাধারণত দু'রকম মুডে থাকে। রাগের মুড আর রগড়ের মুড। আড়ালে এই দুই সময়েই মাকে বলে হাসি দেবী। মায়ের নাম সুহাস। একেবারে গোড়ায় নাম ছিল সুহাসিনী। কেটে ছেঁটে নিজেই শুধু হাসিতে দাঁড় করিয়েছে। আড়ালে নয়, নেশার ঝোঁকে থাকলে দাদা সামনেও হাসি দেবীর আগে পিছনে বিশেষণ জুড়ে মাতৃ সম্ভাষণ জানিয়ে থাকে। পরে তার ফলও ভুগতে হয়। মা ঝাড়া হাত পায়ে একলা এই সংসারে আসেনি। ওই বীরু মামুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার নিজের ভাই। দাদার একেবারে সমবয়সী। দু'জনে গলায়-গলায় ভাব। আবার বড় রকমের ঝগড়াও হয়ে যায় কখনো-সখনো। রসিকতা দানা বাঁধলে নিরাপদ ব্যবধানে বসে দিদিকে দিদি না বলে সেও হাসি দেবী বলে থাকে।

মায়ের ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা দু'চোখ পরীরাণীর মুখ থেকে বুক হয়ে নীচের দিকে নামল একবার। তারপর আবার মুখের ওপর উঠে এলো। গলার চাপা স্বরে ঝাঁঝের সঙ্গে ঘেন্না মিশল।—জামা গায়ে না দিয়ে এ-ভাবে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াতে তোর লজ্জা করে না বেহায়া কোথাকার!

পরীরাণী ত্রস্তে নিজের দিকে তাকালো একবার। আট আঙুল চওড়া ছোট জামার ওপর ঘন আকাশী রঙের মোটা শাড়িটা ভালো করেই জড়ানো, যে-সময়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন দশ হাত দূরেও চোখ চলে না। এখনও রাস্তায় তেমন লোক চলাচল শুরু হয়নি। অন্য দিনের তুলনায় এরাই বরং অনেক সকালে বিছানা থেকে গা তুলেছে। তবে এও সত্যি কথা, এতক্ষণ যে চিন্তার কারিকুরি চলছিল ওর মাথার মধ্যে সে-সব এই গোছের স্থূল বাস্তবের ঊর্ধ্বে, তাই খেয়াল ছিল না। আবর্জনাশূন্য এক শুচিতার ভেলায় চেপে ভেসে চলেছিল পরীরাণী নামে এক মেয়ে, তারপর পিছনের ওই শয়তানকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আর গল-গল করে বিষ ঢুকেছে। বিষ বিষ বিষ! তখনো আপন অঙ্গের প্রতি সচেতন ছিল না, তার প্রথম কারণ ওই দুটো লুব্ধ চোখের সামনে নিজেকে সাত পরতে ঢাকা না ঢাকা সমান। দ্বিতীয় কারণ, ভোরের শুচিতার আমেজটুকু ওই দুটো চোখের বিষে এমন আচমকা তচনচ হবার ফলে এই প্রথম একটু বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ওরও ভিতর থেকে চোখের দিকে উঠে আসছিল। নইলে অন্য দিন

বা অন্য সময়ে ওই মূর্তির ছায়া দেখলেও তো আড়াল নেবার তাড়না অনুভব করে।

পাশ কাটাবার জন্য পা বাড়িয়েও পরীরাণীর দু'চোখ চৌতিরিশ বছরের সৎ মা হাসি দেবীর মুখ আর বুকের ওপর এক সঙ্গে থমকালো মুহূর্তের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে চোখে কি যেন বিঁধল কটকট করে, ওর তবু ঘন নীল শাড়ির নীচে আছে কিছু, মায়ের শাদা জমিনের পাতলা শাড়ির ওধারে অন্তর্বাসের বালাইটুকুও নেই। তার ওপর মোটার দিক ঘেঁষা শরীর আর রীতিমত ফর্সা রঙ। মোটা শাড়ি অঙ্গে সয় না। জ্বালা করে নাকি।

সেই মুহূর্তের মধ্যেই পরীরাণী পিছন-পানে ঘুরে তাকালো একবার। শয়তানটার দাঁতে দাঁতন ঠেকে আছে শুধু, হাত নড়ছে না। ড্যাবড্যাব করে চেয়েই আছে আর মজা গিলছে। মজার প্রহসন কিছু একটা চলেছে এখানে, সেটা ওই হারামজাদা ঠিক বুঝে নিয়েছে। পরীরাণী দ্রুত ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

মেয়েটার এই আচমকা কটাক্ষের ধাক্কায় হাসি দেবী থতমত খেল একপ্রস্থ। দু'চোখ নিজের অগোচরেই পাতলা কাপড় জড়ানো বুকের দিকে নেমে এলো একবার। তারপর রাস্তার ও-ধারের ওই ভাঙা বাড়ির ভাঙা জানলার দিকে ঘুরলো। একটু ভ্রূকুটির চাবুক চালিয়ে সেও ঘুরে নিজের ঘরের দিকে পা চালালো। মেয়েটার ভাব-ভঙ্গি দেখে মাঝে মাঝে অবাক লাগে তার। যা বোঝাবার এক পলক তাকিয়েই বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। যত বোকা ভাবে, সময়-সময় যেন ততটা মনে হয় না হাসিদেবীর।

দাদা আর বীরু মামুর চোখের ওপর দিয়ে সামনের ঘরটা পেরুতে গিয়ে পরীরাণী আড়চোখে তাকালো একবার। ওরা দু'জনে যে-যার মাটির বাসি শয্যায় বসে। মাটিতে দু'দিকের দুই দেয়াল ঘেঁসে দুটো বিছানা হয় ওদের। এই ঘর অথবা বাবা-মায়ের ঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দায় আসতে হয়। পরীরাণী থাকে ও-দিকের বন্ধ একটা খুপরি ঘরে। আলো বাতাসের ছিটে ফোঁটা নেই। দিনের পর দিন ওর কষ্ট দেখে দাদা দয়া করে গেল বছর একটা ঝরঝরে টেবিল ফ্যান এনে বসিয়ে দিয়েছে। ওটার শব্দেও ঘুম হওয়া দায়। তা ছাড়া বাইরের বাতাস ওই বন্ধ খুপরিতে না ঢোকার ফলে ওই পাখার বাতাসও গরম হয়ে ওঠে। ঘরের দরুন কিনা বলা যায় না, রোজই অন্ধকার থাকতে ঘুম ভাঙে পরীরাণীর। চোখ সিঁটকে তারপরেও বিছানায় পড়ে থাকতে চেষ্টা করে। জোর করেই আরো একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। পারে না। পিঠে কেউ যেন খোঁচা মেরে তুলে দেয়। একটু ঠাণ্ডা আলো আর ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য ভিতরে হাঁপ ধরে। সন্তর্পণে তখন দাদা আর বীরু মামুর ঘরের ভিতর দিয়ে এই বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। ওদের ঘুম ভাঙার আগেই ফিরে যায়। টের পেলে বীরু মামু এই সামান্য হাওয়া খাওয়া নিয়েও ঠাট্টা ঠিসারা জুড়ে দেবে। আগে বাবার ঘরের ভিতর দিয়ে এই বারান্দায় আসত ও। কিন্তু মায়ের শোয়ার ছিরি ছারা বিচ্ছিরি। শোয়ার ছিরি এদেরও ভালো নয়, তবে দু'জনেই পা জামা পরে শোয়, চোখ-কান বুজে এ-ঘরের ভিতর দিয়ে তবু আসা যায়।

সকালে-বিকেলে গা-জুড়নোর সব থেকে ভালো জায়গা ছিল ছাতটা। সিঁড়িগুলো ভাঙা, রেলিংগুলো ভাঙা। তবু ছাতে একবার উঠে গেলে শান্তি। বছর চৌদ্দ বয়েস পর্যন্ত এই ছাতটাই ছিল ওর খেলা-ধূলো হুটোপুটি করার জায়গা। আশ-পাশ বাড়ির সমবয়সী মেয়েরাও আসত তখন। আর সকালের রোদ না চড়া পর্যন্ত ছাতে ঘুরে ঘুরে স্কুলের পড়াও মুখস্থ করত।

আজ সাত বছর ধরে ওর ছাতে ওঠা একেবারে বন্ধ। কেন, তার বিশেষ কারণ আছে।...যাক, সেটা এই মুহূর্তের প্রসঙ্গ নয়।

ঘর পেরিয়ে যেতে পরীরাণী আড় চোখে একবার দুই মূর্তির দিকে দেখে নিল, কারণ একটু আগে ওদের তির্যক চাউনি ভোলেনি। এখনো মনে হল গাম্ভীর্যের হাল্কা পর্দার আড়ালে ওদের চোখে কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এদের যেন সবেতে ফুর্তি। মায়ের দ্বিতীয় দফা শাসানিও ওদের কানে গেছে নিশ্চয়। ঝাঁঝিয়ে কথা বলা মায়ের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কানের নীচের দু'পাশ গরম ঠেকছে পরীরাণীর।

দ্রুত পেরিয়ে গেল ঘরটা। না, ও কাউকে বিশ্বাস করে না। মাকে না, বাবাকে না, দাদাকে না, বীরু মামুকে না, কাউকে না—এই দুনিয়ার কাউকে না। অবশ্য এক-একজনের প্রতি এক-এক ধরনের অবিশ্বাস। তবু সব মিলিয়ে সকলের প্রতি নিটোল একটা হাঁপ-ধরা গোছের অবিশ্বাস। দাদা বেশি নেশা করেছে মনে হলে অনেক সময় এই খুপরি ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে পরীরাণী। দাদা তখন যা-তা বলে, এন্তার হাসে, আর বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি রসিকতা শুরু করে দেয়। কখনো বীরু মামুকে নিয়ে পড়ে, কখনো চেনা-জানা মেয়ে-পুরুষদের—উপলক্ষ পেলে বাবা মাকেও বাদ দেয় না। আর নেশার ওপর রাগ চড়লে তো কথাই নেই। বোনের ওপর দরদ একটুও নেই পরীরাণী একেবারে অস্বীকার করতে পারবে না। দরদ আছে তার প্রমাণই বরং অনেকবার পেয়েছে। কিন্তু সেই অবস্থায়, মানে নেশা চড়লে আর মেজাজ বিগড়লে সপাসপ মেরে বসতে পর্যন্ত পারে। মাসখানেক আগের সেই পেল্লায় চড় পরীরাণী আজও ভোলেনি। তিনদিন পর্যন্ত গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে ছিল। নেশার আগুন মাথায় চড়লে আরো কত কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসতে পারে ঠিক কি।

বীরু মামুর আসল নেশা বলতে বিড়ির নেশা। ঘণ্টায় চার পাঁচটা বিড়ি টানে। বিড়ি যখন খায় না তখনো মুখ দিয়ে থেকে থেকে হিসহিস শব্দ বার করে। বিড়ির ধোঁয়ায় দুই ঠোঁট কুচকুচে কালো। সামনে এসে দাঁড়ালে বা পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও গন্ধ পায় পরীরাণী। এক-এক সময় গা ঘিনঘিন করে। তবে দাদার সঙ্গে অত ভাব সত্ত্বেও বীরুমামু অন্য নেশা করে বলে মনে হয় না। তাহলে একদিন না একদিন ধরা পড়তই। আর দাদাও তাহলে কথায়-কথায় ওই সাত্ত্বিকতা নিয়ে তাকে অত ঠাসত না। অন্য নেশা করে না বলে দাদার বরং মনে মনে একটু রাগই আছে বলে পরীরাণীর ধারণা। কিন্তু দাদার থেকে বীরু মামুকে কেন যেন আরো কম বিশ্বাস করে পরীরাণী। তার কুতকুতে চাউনি আর মুখ-টেপা হাসি দেখলেই মনে হয় লোকটা বাইরে যা ভিতরে তা নয়।

দাদ আর বীরু মামু বাদ গেলে এ সংসারে আর বাকি থাকল বাবা-মা। বাবা বড় দুঃখী মানুষ। মাথার মধ্যে সর্বদা ভয় গিসগিস করছে। মরাব ভয়। কেউ একটু শব্দ করে নড়লে চড়লে চমকে ওঠে। এই বুঝি গেল সব।

ডাক্তার বলে মনের বিকার। এটা বাড়ছেই বাড়ছেই। বুকে একটু সর্দি বসলে বাবা বলবে ডবল নিউমোনিয়া—এবার চললাম। নিরেনব্বুই জ্বর উঠল তো প্রলাপ শুরু হল। আধ-ঘণ্টা অন্তর থার্মোমিটার মুখে গুঁজে বসে থাকবে। আর বলবে, এবার হয়ে এলো। কেউ কিছু খেতে দিলে, বিশেষ করে মা দিলে, শরীরের প্রাণখানা দুই চোখের মধ্যে টেনে নিয়ে গণগণে চোখে দেখবে কি দেওয়া হল। ছলে কৌশলে আগে কাউকে সে-

খাবারের একটু ভাগ দেবে। কাউকে না পেলে মিনি বেড়ালটা তো আছেই। ওটাকে খাইয়ে খাইয়ে বাবাই অমন কোঁতকা করে তুলেছে। বাবার কাছে কেউ কিছু খাবার নিয়ে গেলেই ওই বজ্জাত আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পায়ের কাছে বসবে আর মিউ মিউ করে জানান দেবে। উদার মুখ করে বাবা আগেই ওকে কিছু ভাগ দেবে।

পরীরাণীর ধারণা, বাবার ভয় মা তার খাবারে বিষ মেশাতে পারে। অন্যেরাও পারে, তবে মাকেই বেশি ভয় বাবার। মা তার ওষুধ-পত্রে হাত ছোঁয়ালে কোন না কোন ছুতোয় সে-ওষুধ ফেলে দেবে। এ-রকম কতবার ফেলে দিয়েছে ঠিক নেই। মা টের পেলে কুরুক্ষেত্র, কিন্তু বাবা তখন বোবা। পরে পরীরাণীকে ডেকে কতদিন চুপি চুপি বলেছে, আমার খাবারটা তুই দিবি, তুই না রাঁধলে আমার খেতে ভালো লাগে না—পেটই ভরে না মোটে। তুই নিজের হাতে করবি, নিজের হাতে দিবি। দিবি তো?

রাস্তার এই মোড়ের মাথায় এক ডাক্তার আছে, তার নাম ব্রজগোপাল। এক কালে তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব ছিল বাবার। খাতিরটা এখন এক তরফা, অর্থাৎ বাবাই শুধু খাতির করে তাকে। ব্রজ ডাক্তার ব্যস্ত মানুষ। তার পসার দিনকে দিন বাড়ছে। এদিকে বাবা ফি দেবে না, অথচ শরীরের একটা না একটা রোগের উপসর্গ আবিষ্কার করে ওষুধ আর চিকিৎসার আশায় প্রায়ই সেখানে গিয়ে বসে থাকবে। আর ব্লাডপ্রেসার কমে গেছে বা বেড়ে গেছে মনে হলে কথাই নেই। চেক করে না দেওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের অব্যাহতি নেই। প্রেসার একটু কমে গেছে শুনলে বাবার পায়ের নীচে মাটি দুলবে, আর একটু বেড়েছে শুনলেও মাথা ঝিমঝিম করবে।

মোট কথা, গেলাম-গেলাম করে বাবা আধা-আধি যেতে বসেছে। হাজার বোঝালেও বুঝতে চায় না যে তার কিচ্ছু হয়নি। উল্টে রেগে যায়। মানুষ মরতে এত ভয় করে কেন পরীরাণী ভেবে পায় না। বেঁচে থাকলে এত কি সুখ, এমন কি চতুর্বর্গ লাভ? বরং মরাটাকেই এক-এক সময় নিশ্চিন্ত ঘুমের মতো মনে হয় পরীরাণীর। মাসখানেক আগে খুব ঠাণ্ডা মাথাতেই তো পরীরাণী মরবে ঠিক করেছিল। হাতের কাছে তখন মরার রসদ পেলে এতদিনে পরীরাণী নামে এক মেয়ে কোথায় কোন জগতে পাড়ী দিত ঠিক নেই। সুযোগের অভাবে মরা হয়নি। অবশ্য পরে মরার চিন্তা বাতিল করার খুব একটা সঙ্গোপন কারণ আছে। সে-কারণটা পরীরাণীর মনের তলায় চুপি চুপি লালনের বস্তু। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

আসল কথা, মাসখানেক আগে মরার উপায় নিয়ে পরীরাণী রীতিমত মাথা ঘামিয়েছে। মায়ের মতো, অর্থাৎ ওর নিজের মায়ের মতো মরার চিন্তাটাও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। শিউরে উঠে তক্ষুনি সে-উপায়টা বাতিল করেছে।...সর্বাঙ্গ দুমড়ানো ভাঙ্গাচোরা একটা দেহ...মাগো!

মায়ের সে-মূর্তি অবশ্য ও দেখেনি। দেখবে কি করে, তখন তো স্কুলে ও। মা নেই টের পেয়েছে যখন, থানা পুলিস হয়ে মায়ের সেই দেহ তখন চিতায় উঠেছে। কিন্তু পরে যা শুনেছে তাই থেকেই মায়ের সেই বিকৃত বীভৎস মৃত রূপ কল্পনা করতে পারে। যা ঘটেনি অথচ ঘটতে পারে তারও তাজা রূপ ওর কল্পনায় আসে—এ-তো ঘটেইছে। না, ও-ভাবে মরতে ও চায় না। নিখরচায় মরার দ্বিতীয় যে-উপায়টা মাথায় এসেছিল তাও ওই একই কারণে বাতিল। ঘরের কড়িকাঠে শাড়ী বেঁধে ঝুলে পড়া।

কিন্তু নিজের সেই শব দেহও কল্পনায় দেখেছে পরীরাণী। জিভ বেরিয়ে এসেছে...দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে...যে দেখছে সে-ই আঁতকে উঠছে। নিজেই শিউরে ওঠে, ও ভাবে মরার চিন্তা ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে। মরার পর শবের একটা রূপই তার পছন্দ। ...চৌকির বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে, গভীর ঘুম যেন। মরে যে গেছে তাও প্রথমে কেউ বুঝবে না, ডেকে আর ঠেলে ওর ঘুম ভাঙ্গাতে চেষ্টা করবে। তারপর দেখবে মরে গেছে তারপর সাজিয়ে পরিপাটি শয্যায় ওকে শুইয়ে গলা থেকে পা পর্যন্ত যুঁই বেল রজনীগন্ধা ছড়িয়ে মৃদু গম্ভীর হরিধ্বনি দিয়ে কাঁধে তুলে নেবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে দিনে দুই একটা শবদেহ নিয়ে যাওয়া হয়ই। হরিধ্বনি কানে এলেই পরীরাণী দোতলার রেলিংএ এসে দাঁড়ায়। খুঁটিয়ে দেখে। পুরুষ না মেয়ে, কত বয়েস, কি-ভাবে চলল ইত্যাদি। একটুও ভয় করে না। ভয় বরং মায়ের করে। বলহরি শুনলেই ঘরে গিয়ে সেঁধোয়। আজকাল আবার কতকগুলো ছেলে-ছোকরা পিলে-চমকানো তারস্বরে হরিধ্বনি হৈ-হুল্লোড় করে শব নিয়ে যায়। যেন মস্ত ফূর্তি আর উৎসবের ব্যাপার কিছু। সে-ব্যাপারটা পরীরাণীরও বিচ্ছিরি লাগে। মনে হয় যে চলল তার শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ওরা। কিন্তু মায়ের মতো ভয় পায় না একটুও। সেই বিকট শব্দ কানে এলেই মা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে, আর পরে কটুকাটব্য ছোড়ে।

মড়া নিয়ে যেতে দেখলে বাবা ভয় করে না। তার শুধু নিজের মরার ভয়।

যাক, এই বাবার প্রতি তার মায়া আছে, দরদ আছে—কিন্তু বিশ্বাস নেই। মনে হয়, বাবা কোন একদিন ভয়ানক গোছের একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিছু। যার জন্য তার এই দশা আর সংসারের এই হাল। অনেক, অনেক দিন আগের, প্রায় এক যুগ আগের একটা ধূ-ধূ চিত্র ওর মনের তলা থেকে ভেসে-ভেসে ওঠে। ওর ন'বছর বয়েসে নিজের মা গেছে। তার আগের চিত্র। মা ওকে সাজিয়ে দিত। ও ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত। ফিরে এসে হাত-মুখ ধোয়া হলে মা ওকে আর দাদাকে খেতে দিত। আদরও দাদার থেকে ওকেই বেশি করত মা। কারণ, দাদা তখন থেকেই রাস্তার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশত আর নানারকম নষ্টামি দুষ্টুমি করত। অবশ্য রাগলে বা দোষ করলে মা ওকেও বকাঝকা করত, মারত। তবু তখন যেন এই বাড়িতেই বেশ একটা সাদাসিধে জগতে বাস করত ওরা। ছুটির দিনে সেই মা ওকে নিয়ে পার্কেও বেড়াতে যেত। শেষের দিকে মায়ের সঙ্গে বাবার খটাখটি লেগেই থাকত, তখন তার কারণ বুঝত না, এখন অনুমান করতে পারে। তবু তখনো বাবার খাওয়া-দাওয়া সুখ-সুবিধের দিকে মায়ের সজাগ চোখ ছিল।

...আত্মঘাতী হবার আগে মায়ের নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছল। কিছু যে হয়েছিল পরীরাণী সেটা টের পেত। মায়ের অনেক রকম অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখেছে তখন। কিন্তু যা-ই হোক, সব-কিছুর মূলে যে বাবা, এ-সন্দেহ আজ ওর মনে বদ্ধমূল। বাবার প্রতি ওর দয়া-মায়া আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই।

আর ঠিক এই কারণেই বিশ্বাস এই নতুন মায়ের ওপরেও নেই। নতুন মা এগারো বছরের পুরনো হয়েছে এখন—আর এগারো বছর ধরেই তার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কমেছে পরীরাণীর। প্রথম কথা, বাবাই যাকে বিশ্বাস করে না, উল্টে ভয় করে—ও তাকে বিশ্বাস করবে কেমন করে? তাছাড়া, মায়ের বিসদৃশ ব্যাপারগুলো এতদিনে চোখ-সওয়া গা-

সওয়া হয়ে গেছে বটে, ওদের ছেড়ে পাড়ার মানুষদেরও হয়েছে—তা বলে বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এই মাকে পরীরাণী মেনে নিয়েছে, তার সঙ্গে দাদার মতো ব্যবহার করে না, তার সম্পর্কে দাদার মতো কটু কথাও বলে না—আর তার ফলে এই মায়ের কাছে ও নিজেও ইদানীং মন্দ প্রশ্রয় পায় না। কিন্তু বিশ্বাস ভিন্ন বস্তু।

বছরখানেক হল ওর প্রতি মায়ের আচরণে তফাত দেখছে একটু। মেজাজ-পত্র ভালো থাকলে ওর সঙ্গে অনেক সময় সমবয়সীর মতো কথা-বার্তা বলে। সঙ্গীর অভাবে মাঝে-মধ্যে ওকে নিয়েই সিনেমা দেখতে যায়। কেনা-কাটার ব্যাপারেও ও সঙ্গী। মেজাজ খুব ভালো থাকলে নিজের হাতে চুল বেঁধে দেয় আর তখন একটু-আধটু রসিকতাও করে। অবশ্য এ-সবই ব্যতিক্রমের মধ্যে। বাড়ির হাওয়ায় মায়ের মেজাজ কমই প্রসন্ন থাকে। ইদানীং, অর্থাৎ মাসখানেক ধরে তো গরম হয়েই আছে। কারণ এই সময়ের মধ্যেই পরীরাণীর জীবনে এক বিষম বিপর্যয় ঘটে গেছে। এমন বিপর্যয় যে নিজের মায়ের রাস্তা ধরে এই দুনিয়া থেকে পালাবার মতলব মাথায় ঠেসে বসেছিল। পালাবার চেষ্টাও করেছিল। এই সময় থেকেই এই নতুন মায়ের ব্যবহারও কিছুটা অকরুণ হয়ে উঠেছে। উঠতে বসতে ধমক আর ঝাঁঝ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বছরখানেক ধরে যে ব্যাপারটা ওর চোখে পড়ছিল তার পরিবর্তন হয়নি।...বিমনা অবকাশে এই মা'টি ওর দিকে চেয়ে থাকে, খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে ওকে, বেশ মেপে মেপে দেখার মতো চাউনিটা। সে-সময় হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে পরীরাণী তাকে একটু-আধটু অপ্রস্তুত হতেও দেখেছে। গত একমাস যাবৎ মায়ের এই গোছের লক্ষ্য করাটা আরো বেড়েছে বই কমেনি।

গোড়ায় গোড়ায়, অর্থাৎ একবছর আগে ওর প্রতি মায়ের এই যাচাইয়ের চোখ দেখলে মজা লাগত। ঈর্ষা ভাবত, বাবার পাশে মাকে এখনো অবশ্য খুবই ছেলেমানুষ দেখায়। আর বাবার তুলনায় মা ছেলেমানুষ তো বটেই। কম করে সতের বছরের ছোট বাবার থেকে। একান্ন বছর বয়েসেব বাবাকে রীতিমত বুড়ো দেখায়। এই জন্যেই যে মা বাবার সঙ্গে সহজে কোথাও বেরুতে চায় না, পরীরাণী তাও ভালোই বোঝে। বাবার কথা ছেড়ে মায়ের চাকচিক্যের বয়েসটাও যে কিন্তু দ্রুত ভাঁটার দিকে গড়াচ্ছে, সে-তো আর অস্বীকার করা যায় না। রূপের না হোক, মায়ের আসল গর্ব ছিল রঙের আর স্বাস্থ্যের। এই দুটো থাকলে বয়েসকালের অনেক মেয়েই রূপের বাজারে চড়া দামে বিকোয়। এ-দুটোই আসল পুঁজি মায়েরও। কিন্তু অত ফর্সা রঙেরও জ্যোতি কমছে এখন, তাই প্রসাধনে সেটুকু অটুট রাখার পরিশ্রম বাড়ছে। ঘণ্টাখানেক লাগে সাজগোজ করতে। লম্বা শরীরখানা একটু মোটার দিকে ঘেঁষার ফলে ঢিলে-ঢালা ভাবটা আঁট-বসনে মনের মতো শাসন মানে না। তাই গোড়ায় পরীরাণী ভাবত এই খেদেই মা এইভাবে ওর দিকে তাকায়, এ-ভাবে ওকে লক্ষ্য করে। গায়ের রং মায়ের এখনো ওর তুলনায় তিন গুণ ফর্সা। মায়ের পাশে লোকে ওকে কালোই বলবে। ও রূপসী মোটেই নয়, কিন্তু ওর নাক-মুখ-চোখ যে মায়ের থেকে ঢের ভালো এ ও নিজেই বেশ জানে। বিশেষ করে চোখ। ফ্রক-পরে দাপাদাপি ঝাঁপাঝাপি করত যখন অনেক মেয়ের মায়ের মুখে তখন 'ঢলঢলে মিষ্টি মেয়ে'র চোখের প্রশংসা শুনত। দৌড়ঝাঁপের ফলে স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো ছিল। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সেও এখন একটা স্থির রূপ নিয়েছে। ষোল থেকে বিশ বছর পর্যন্ত কেউ যেন ভিতর থেকে নতুন ছাঁদে গড়েছে ওকে। আর কিছু না হোক, বয়েসের এই

ছাঁদ-ছিরির জোরেই ইচ্ছে করলে মায়ের সঙ্গে ও অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে এখন।

ভাবত, সখেদে মা এটুকুই দেখে, এটুকুই লক্ষ্য করে। কিন্তু ইদানীং সে-রকম মনে হয় না। মাসখানেক আগের ওই কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর থেকে। মা যদি ওর ওপর নৃশংস হয়ে উঠত তাহলেও খুব অস্বাভাবিক লাগত না পরীরাণীর। তার পর থেকে মায়ের ব্যবহার একটু রূঢ় হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা ওপর-ওপর। ভিতরে যেন খুব একটা নাড়া-চাড়া পড়েনি। সেই রকম যাচাইয়ের চোখে ওকে লক্ষ্য করাটা আরো বেড়েছে। ও যেন মায়ের বিশ্লেষণের বস্তু। তাই দেখে আগের মতো আর মজা লাগে না পরীরাণীর। উল্টে অস্বস্তি বোধ করে কেমন। অজ্ঞাত শঙ্কা উঁকিঝুঁকি দেয়। মনে হয় মায়ের চাউনিতে কি একটা অভিসন্ধি মেশানো। মনে হয়, ওকে নিয়েই মায়ের মাথায় কিছু একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে। সে মতলব আর যা-ই হোক, শুভ কিছুতে নয়।

তাই অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের এক পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে ডুবে আছে পরীরাণী। অবিশ্বাসের রোগে ধরেছে ওকে। বিশ্বাস এ-জীবনে বোধ হয় আর কাউকেই করতে পারবে না।

...কিন্তু তাই কি?

ভিতরটা সজাগ হল হঠাৎ। চৌকিতে বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। খুপরি ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের সিঁড়ির দিকের ফালি বারান্দায় এলো। সন্তর্পণে জানলাটা খুলে নীচের দিকে ঝুঁকে তাকালো। কাউকে দেখা গেল না। কান পাতলো। কারো গম্ভীর গলাও কানে এলো না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রাজকার্য সেরে তবে ও-ছেলে শোয়। এত সকালে দেখা পাবে কি করে, গলাই বা শুনবে কি করে। তবু উৎসুক মুখেই নীচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইল পরীরাণী।

একটু বাদেই মুখ তুলে সরে এলো দু-পা। নীচের দাওয়ায় চার আঙুল দাড়িগোঁফভরা জঙ্গুলে মুখ একখানা। মাস্টারমশাই।...মাস্টারমশাইয়ের ছেলে এক নবীন মাস্টারমশাইকে দেখার লোভে অমনি ঝুঁকেছিল পরীরাণী। দেখতে না পেলেও মুখখানা চোখের সামনে ভাসছে। আর তার গুরুগম্ভীর গলার রেশও যেন কানে এসে লাগল। ওই বয়েসের ছেলের গলার স্বর অমন ভারী আর ভরাট হয় কি করে পরীরাণী ভেবে পায় না। অথচ মিষ্টি। ঢাকের গুড়গুড় কোমল আওয়াজের মতো মিষ্টি। যে কোন মানুষকে চুম্বকের মতো কাছে টানবেই এমন গলা।

বিশ্বাস এ জীবনে আর কাউকে করতে পারবে না মনে হতে ওই গলাতেই গম্ভীর পরিহাস মাখা একটা অস্ফুট স্বর যেন কানে এসেছিল, অনুযোগভরা চোখে কেউ যেন ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাই কি?

কিছু একটা বেইমানি করে আচমকা ধরা পড়ে গেলে যেমন হয় পরীরাণীর তেমনি মুখ। এতক্ষণ যা ভাবছিল প্রাণপণে সেটা অস্বীকারের চেষ্টা, বাতিল করার চেষ্টা। জীবনের সমস্ত বিশ্বাস যদি খোয়া গিয়ে থাকে তাহলে নতুন করে আবার জীবনে ফেরার এত তাগিদ এত আকুতি কেন ওর? একটু সুস্থ তাপ আর একটু সুস্থ আলো বাতাসের জন্য এত তৃষ্ণা কেন? সবতো শেষ করে দিতেই বসেছিল, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটাকে কালের হাত থেকে ছিনিয়ে টেনে এনে দেখার জন্য বুকের তলায় তো এক নিষ্ঠুর মশাল জ্বেলে বসেছিল। বিশ্বাস মরে গিয়ে থাকলে সেটা নিভল কেন?

—পরী! ও লো মুখপুড়ী পরীরাণী!

চিন্তার সূতোগুলো সব একসঙ্গে ছিঁড়ল। দাদার গলা। সাড়া না পেলে সম্ভাষণের বচন আরো তরল আর ঝাঁঝালো হবে জেনেও সাড়া দিতে ইচ্ছে করল না। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে পরীরাণী নিঃশব্দে ওই ঘরের দিকে এগুলো।

—ও লো কান-পুড়ী মুখপুড়ী পরীরাণী, বলি বেঁচে আছিস?

চৌকাঠ পেরিয়ে পরীরাণী ঘরে পা দিল। দু'জনেই যে-যার বিছানায় বসে তখনো। বীরুমামু বিড়ি টানছে আর দরজার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ওকে দেখেই দাদা খেঁকিয়ে উঠল, এই যে বোবারাণী চাঁদবদনী, বলি সকাল থেকে কোন্ রাজ্যে আছিস তুই, আমাদের একটু চা-টা দেবার সময় হয়নি।

—চিনি নেই। কৌটোর দুধও ফুরিয়েছে।

—বা বা বা! কি আনন্দ, নেই গো নেই, কিছু নেই—কিচ্ছু নেই। হেঁড়ে গলায় সুর টেনে দাদা বলল, কোনদিন দেখব এ শালার বাড়িটাও ফুরিয়ে গেছে।

বিড়ির শেষটুকু টিনে গুঁজে বীরুমামু টিপ্পনী কাটল, ও আছে কিনা জিজ্ঞেস কর তো—

বারান্দার দরজা দিয়ে হাসি দেবীর প্রবেশ। দু'ঘরের মাঝের দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে। চোখে-মুখে অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি।—ঝি বেটি সেই কখন উনুন ধরিয়ে কয়লা ঠেসে দিয়ে গেছে, খালি উনুন গনগন করে জ্বলে যাচ্ছে—চিনি দুধ নেই এতক্ষণে খেয়াল হল? কাল বলে ব্যবস্থা করে রাখিসনি কেন?

ঠাণ্ডা দুই চোখ পরীরাণী তার দিকে ফেরালো, কাল কখন বলব, তুমি তো ফিরলে সেই রাত এগারোটার পর।

শোনা মাত্র মায়ের রুদ্র মূর্তি। চেঁচিয়ে ধমকে উঠল, দ্যাখ্, মুখের ওপর কথা বলবি না, সব্বো যজ্ঞে আমি ছাড়া আর বাড়িতে লোক দেখিস না, কেমন?

পরীরাণী তবু অবুঝের মতো মুখ করে জানান দিল, দাদা আর মামু তো তোমারও পরে ফিরেছে।

—লাও ঠ্যালা, আবার আমাদের নিয়ে কেন! বোনের মুখে-মুখে কথা বলার মতো সামান্য সাহসটুকু দেখেই দাদা যেন খুশি একটু। ফয়সলার মুখ করে বলল, মামু, রেগে গিয়ে ব্যবস্থা করে ফ্যাল তো, ছুটে দুধ-চিনি নিয়ে আয়—মায়ের থেকে পয়সা নিয়ে যা।

—হুঁঃ! প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়ে মামু জবাব দিল, এই সকালে দোকান খুলে তোর জন্যে দুধ-চিনি নিয়ে বসে আছে সব।...পরী নীচের ওদের থেকে একটু দুধ-চিনি চেয়ে আনুক না—

—আমি পারব না। ক্ষুদ্র ঝঙ্কার তুলে পরীরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। রাত পোহাতে সকালটাকে এরা সকলে মিলে যেন আস্তাকুঁড়ের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে রাগটা বীরু মামুর ওপরেই বেশি। সাদা মুখ করে বললেও ওর শয়তানী বুঝতে বাকি নেই। নীচের তলার ওদের সঙ্গে ইদানীং একটু বেশি খাতির দেখে ওই রকম ঠেস দেওয়া হল।

বেরিয়ে এসে পরীরাণী আবার ফালি বারান্দার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে। ঘরের

কথা শুনতে পাচ্ছে। মা বিরক্ত। ঘুম থেকে উঠেই হাতের কাছে চা না পেলে তার মাথা ধরে। মা বলছে, ওরই বা দোষ কি, তোরা যদি কোনদিকে না তাকাস তাহলে চলে কি করে—

—দোহাই মা! দাদার গলা, এই সকালে আমাকে ছেড়ে তোমার ভাইকে ধরে যত খুশি লেকচার দাও।

মায়ের সাড়া পেল না। সরে গেছে বোধহয়। পরীরাণীর হাসি পেল হঠাৎ। মায়ের সঙ্গে দাদার সব থেকে বেশি খটাখটি লাগে, অথচ দু'জনেই দু'জনকে ভয় করে। লাগল যখন তুমুল হয়ে গেল, কিন্তু লাগতে সহজে কেউ চায় না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বীরু মামু বাথরুমের দিকে চলল। মুখে বিড়ি। পাশ কাটিয়ে দু-পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে হাসি লুকিয়ে ভুরু কোঁচকাল।—তোকে নীচে থেকে দুধ-চিনি আনতে বললাম বলে অমন রেগে গেলি কেন?

মুখের দিকে তাকিয়েই গা জ্বালা করছে পরীরাণীর। কথা শুনে আরো বেশি। জবাব না দিয়ে চুপচাপ চেয়ে রইল। রাগের মুখেও এমনি চুপ করে থাকতে পারে বলে ওদের অনেক সুবিধে, আবার অনেক অসুবিধেও।

বিড়ি মুখে তুলে হাসি চাপা দিয়ে বীরু মামু ওদিক ফিরল। বিরক্তিতে পিছন থেকে একটা ভেঙচি কেটে পরীরাণী নিজের খুপরি ঘরে চলে এলো। এক হাত প্রমাণ জানলাটার সামনে দাঁড়াল। অদূরে তিন রাস্তার মোড়ে উঠোনের মতো ত্রি-কোণ পার্ক একটা। নোংরা, এবড়োখেবড়ো—একটা ঘাসের শিষও নেই কোথাও। বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ওখানেই হুটোপুটি করে। আছাড় খেলে গা-হাত-পা ছড়ে যায়, তখন ভ্যা করে কাঁদে। অথচ একটু তোয়াজ আর যত্ন করলেই ওই মাটিতে সুন্দর কচি কচি ঘাস হতে পারে। হয় না। ঠিক এই বাড়ির দশা। সব হতে পারে, কিন্তু কিছুই হয় না। হবে কি করে। রুচির লেশমাত্র নেই কারো মধ্যে।

...দিন কয়েক আগে বীরু মামুর কিছু কথা ওর কানে গেছে। আসলে হালকাভাবে দাদার কাছে নালিশই করছিল, কিন্তু নালিশের সুর ছি[illegible] না। বলছিল, নীচের তলার মাস্টারমশায়ের ওই বিদ্বান ছেলের সঙ্গে আমাদের পরীরাণীর আজকাল বেশ একটু ভাব-সাব দেখছি—খেয়াল করেছিস?

পরীরাণী ওদের চোখের আড়ালে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেছল। রাগ যত নয় তার থেকে দাদার মেজাজের কথা ভেবে চিন্তা। কোন মেজাজে আছে কে জানে। তাই কান পেতেছিল। জড়ানো সুরে দাদা প্রসঙ্গ বাতিল করতে চেয়েছে, কি দরকার—

ইনিয়ে বিনিয়ে গলার স্বর রকমারি করে বীরুমামু তার মন্তব্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিল।—না, বলছিলাম ওই বসন্ত-ফসন্তদের তবু বোঝা যায়, কিন্তু লেখাপড়ায় জলুসঅলা ছোঁড়াগুলোকে বোঝা ভার—আবার না ফেঁসে যায়।

দাদার পেটে বোধ হয় বেশ রসদ পড়েছিল সেদিন। তাই দর্শন আওড়ানোর ঝোঁক ছিল।—গুলী মেরে দে, তুই ফেঁসেছিস, আমি ফেঁসেছি, এ শালার দেশসুদ্ধু ফেঁসে ফালা-ফালা, না ফেঁসে আস্ত আর কে থাকছে। তারপরই হেসে উঠেছিল, তুই ব্যাটা মামু হয়ে মরেছিস, তাই অন্যের সঙ্গে ফাঁসছে দেখে তোর হিংসে হচ্ছে।

ওদের ঘরের ভেতরের বারান্দার দিকের জানালায় ঠিকি দেওয়া লেপ-তোষক।

বারান্দায় আলো নেই। তাই জানালার ওধারে কে দাঁড়িয়ে ওরা জানে না। ওদিকে মা-ও বাড়ি নেই, বাবা ডাক্তারের চেম্বারে। পরীরাণীর এ-সময়ে রান্নাঘরে থাকার কথা। তাই খোলাখুলি বাক্যালাপ চলছিল দু'জনের।

বীরুমামু তেতে উঠেছে—নেশা করলেই তুই একটা জানোয়ার বনে যাস, যা মুখে আসে তাই বলিস—ভালোর জন্যে বললাম, ভালো না লাগে তো চুপ করে থাক—

দাদা হেসে উঠল আবারও।—ভালো লাগছে, মাইরি বলছি খুব ভালো লাগছে। তা মাস্টারের ছেলে ওই মাস্টারও তো শুনি শিক্ষক সমিতির তরুণ তুর্কি—সামনে এলো তো ভক্তিশ্রদ্ধায় গদ-গদ মুখ দেখি তোর—তাকেও ভয়!

—তা বলে তার পেটে খিদে নেই তোকে কে বলল, তোর বোন না হয়ে ভাই হলে কিছু বলতাম না—যখন তখন নীচে ডেকে নিয়ে বই জোগাচ্ছে, জ্ঞান দিচ্ছে—সেদিন দেখলাম দোতলার ওই খুপরি ঘরে বসে কত রকমের জ্ঞানের কথা আওড়াচ্ছে আর তোর বোন রসগোল্লাটির মতো ওর মুখের সামনে বসে আছে—এ তো আর ওই বসন্ত নয়, টুপ করে কোনদিন গিলে বসে থাকবে, টেরও পাবি না।

রাগে দু-কান ঝাঁঝাঁ করছিল পরীরাণীর। তবু নড়তে পারছিল না। দাদার তরল উক্তি কানে এসেছে।—পরীটা বোবা মুখ করে থাকলেও চালাক মেয়ে বলতে হবে। ও নিজেও কিছু লেখাপড়া শিখেছে, কাউকে গাঁথতে যদি চায় তো ওরকম লেখাপড়া জানা চৌকস ছেলেই মনে ধরার কথা, তোর আমার মতো গবেটের সামনে রসগোল্লাটি হয়ে বসতে চাইবে কেন?

—গেলে তো গিলুক।

নেশার ঝোঁকেই হয়তো হঠাৎ বিপরীত সুরে গলা চড়ল দাদার।—ভাগ্নির চিন্তায় তুই একেবারে অস্থির দেখি, আঁ? তোর ইচ্ছেটা কি, মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে দেব দু'ঘা বসিয়ে?

সিঁড়িতে হেঁচড়ানো চটির শব্দ। বাবা ওই রকম করে সিঁড়ি ভাঙে। আর না দাঁড়িয়ে পরীরাণী দ্রুত সরে গেছল।

আজও রাগে ভিতরটা জ্বলছে। কিন্তু বাইরে সে-রাগ কমই প্রকাশ পায়।...নীচে থেকে ওকে ওপরে উঠতে দেখলেই বীরুমামুর মুখে ওই রকম বিচ্ছিরি হাসির ফাটল ধরে, আর চোখ দুটো ঘোরালো হয়ে ওঠে। আজকের এ-রকম ঠাট্টার অর্থ দাদা তো বুঝেইছে, মা-ও বুঝেছে বোধহয়। নীচে থেকে ডাক এলে বা নীচের একজনকে ওপরে উঠতে দেখলেই ইদানীং মায়ের চোখও গোল হয়ে ওর মুখের ওপর ঘোরাফেরা করে। দাদার সেদিনের কথাগুলো শুনতে যত খারাপই লাগুক, মিথ্যে নয়। নেশার ঝোঁকে দাদা ওই রকম বিচ্ছিরিভাবে অনেক সত্যি কথা বলে দেয়। বীরুমামুর ভিতরটা হিংসেয় কালি। তাই দাদাকে তাতানোর চেষ্টা।

...বেশি দিনের কথা নয়। নীচের ও-ছেলে তখনো অত ডাকাডাকি করত না বা যখন তখন ঝিয়ের মারফত ডেকে পাঠাত না। অর্থাৎ তখনো ওর দিকে অতটা মনোযোগ পড়েনি। সে সময়ে পাড়ার কাছাকাছি বাড়ির এক মেয়ে নিজের মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে কোথায় চলে গেছল আর তার দিন সাতেক বাদে ধরাও পড়েছিল। তাই নিয়ে পাড়ায় ঢি-ঢি। কাগজেও সেই সব রসের খবর ফলাও করে বেরিয়েছিল। এদিকে পাড়ার

লোকে যাচ্ছেতাই বলেছে, কোন তিনজন একত্র হলেই ওই নিয়ে জটলা করেছে। কিন্তু আশ্চর্য, একমাত্র বীরুমামু ওই ছেলে আর ওই মেয়ের প্রতি সদয়। কথায় কথায় পরীরাণীকেই শুনিয়েছে, সম্পর্ক আছে বলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল নাকি! আর সম্পর্ক না থাকলেই সাত খুন মাপ! সম্পর্ক জিনিসটা একটা সামাজিক সংস্কার মাত্র, বুঝলি? নইলে সেকালে কি না হত?

এরপর দিন কয়েক দেখা গেল দাদা বাড়ি না থাকলেই বীরুমামু ওর কাছাকাছি ঘুরঘুর করে। ফাঁক পেলে সামনে বসে। বিড়ির ধোঁয়ায় কালচে ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে। আর এ-কথা সে-কথার পরেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের প্রসঙ্গ টেনে এনে ওকে কিছু জ্ঞান দিতে চেষ্টা করে। পরীরাণী বোকা-বোকা চোখে টলমল করে চেয়ে চেয়ে শোনে। শেষে বীরুমামু একদিন বলেই ফেলল, এই যে তুই দিদির সঙ্গে সম্পর্ক ধরে আমাকে মামু ডাকিস এটাও হাসির ব্যাপার নয়? মজা দেখ, কোন রকম রক্তের যোগ পর্যন্ত নেই, অথচ আমি তোর মামু হয়ে গেলাম।

বিরক্তি সত্ত্বেও পরীরাণীর একটু মজাই লেগেছিল। ঢং করে আরো বোকা সেজে বলেছিল, মায়ের ভাই তো মামাই হয়!

—কি মুশকিল, আসল মায়ের ভাই মামা হয়, দিদি কি তোর আসল মা?

পরীরাণী হেসে উঠেছিল।—আজ থেকে তোমাকে তাহলে নকল মামু বলে ডাকব? আরো হাসি।—দাদা আসুক, দাদাকে বলছি নকল মামু বললে তুমি বেশি খুশি হও!

দাদার নাম শুনে বীরুমামুর সম্পর্ক বিশ্লেষণের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। ওকে এক নম্বরের গবেটই ধরে নিয়েছিল, নইলে এ আলোচনা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে প াত। এ-সব মনে পড়লেও পরীরাণীর বিরক্তি, তবু মনে পড়েই।

সিঁড়িতে দু-তিন জোড়া ভারী পায়ের শব্দ। মচ মচ জুতোর শব্দ করে ওপরে উঠে আসছে কারা। এই সকালে কে বা কারা আসতে পারে পরীরাণী ভেবে পেল না। উৎকর্ণ বিস্ময়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে এল।

তারপরেই দু'চক্ষু স্থির। সাদা হাফ-প্যান্ট সাদা হাফ-কোট পরা ব্যাজ আঁটা পুলিসের লোক একজন। কোমরের বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে চামড়ার কেস-এ রিভলভার। তার পিছনে দু'জন কনস্টেবল।

অফিসার গোছের লোকটা শেষ সিঁড়ির আগের সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে পরীরাণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল। এ রকম দেখাটা অনাত্মীয় পুরুষ মাত্রেরই স্বভাবের অঙ্গ বলে জানে পরীরাণী। কিন্তু এই মুহূর্তে নির্বাক বিমূঢ়।

—পরিতোষ দত্ত?

দাদার নাম। ভদ্রলোক কি জিজ্ঞাসা করছে বা কি জানতে চাইছে পরীরাণী বুঝে উঠতে পারল না।

—পরিতোষ দত্ত এ বাড়ির দোতলায় থাকে শুনলাম...আছে সে?

হুঁশ ফিরল যেন। সভয়ে পরীরাণী শুধু পাশের ঘরেব দরজার দিকে তাকাল একবার।

—এই ঘরে?

জবাব দেবার আগে বীরুমামু ওদিকের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। তারপরেই ভয়ে

মুখ শাদা। তার পিছনে দাদার গলা, কে রে মামু—?

লোক তিনজন ততক্ষণে সামনের সরু বারান্দায় উঠে এসেছে। বীরুমামুর পিছনে দাদার মুখ দেখে পুলিশ ভদ্রলোক সামান্য অবাক যেন।—ও, তোমার নাম পরিতোষ দত্ত?

—ইয়েস সার, হ্যাঁ সার। মামুকে ঠেলে শশব্যস্তে কাছে এসে দাদা বিস্ফারিত বিস্ময়ে আপ্যায়ন জানালো, আসুন সার, কি ভাগ্য, আমার নাম পরিতোষ, এই হল আমার মামু বীরু দাস, এই আমার বোন পরীরাণী—আর ওই ইয়ে—আমার বাবা-মা—

বারান্দার ও মাথার দরজার কাছে বিস্মিত বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ দত্ত এবং হাসি দেবী। বোনের পর তাদের দিকে চোখ পড়তে হড়বড় করে পরিতোষ পরিচয়-পর্ব সমাধা করল।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য পুলিসের লোকটার তীক্ষ্ণ দুটো চোখ দাদার মুখের ওপর বিঁধে থাকতে দেখল পরীরাণী। তারপর ঠোঁটের ডগায় হাসি ভাঙল একটু।—বেশ, তুমি এত চেনা অথচ তোমার নামটাই মনে ছিল না। জামা পরে আমার সঙ্গে এস তো একটু, কয়েকটা দরকারী কথা আছে।

—কোথায়, থানায়?

পুলিস অফিসার মাথা নাড়ল। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরতে পাবে, চট করে জামাটা গায়ে চড়িয়ে এস।

তবুও ঈষৎ শঙ্কাভরে পরিতোষ দত্ত পুলিসের অমায়িক মুখখানা লক্ষ্য করল একটু। —থানায় নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙাবেন নাকি সার?

ভদ্রলোকের চাউনি সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আবার।—কেন, তুমি কি করেছ?

—কিছু করিনি।...আপনারা তো মাঝে মাঝে কিছু করেছি কিনা জানার জন্যেও ঠেঙিয়ে থাকেন—ওই পরী মুখপুড়ীটার জন্য সকাল থেকে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত পেটে পড়েনি, এখন কি আছে অদেষ্টে কে জানে—

অফিসারটি হাসল।—তোমার কিছু ভয় নেই, চা-ও আমিই খাওয়াব'খন, তাড়াতাড়ি এসো—

জামা-কাপড় পরার জন্য সে ঘরে ঢুকতে অফিসার পরীরাণীর দিকে এগিয়ে এলো একটু।

—আপনার...তোমার দাদা কাল রাতে কখন বাড়ি ফিরেছে?

পরীরাণীর উতলা দুই চোখ তার মুখের ওপর থমকালো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। ঈষৎ আগ্রহসহকারে জবাব দিল, সাড়ে এগারোটার পর—সুধীর সান্যালের বাড়ির বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল...সকাল থেকেই সমস্ত দিন সেখানেই ছিল।

সুধীর সান্যাল পাড়ার কৃতী এবং নামী মানুষ। পৈতৃক টাকা আছে, নিজের কয়েক রকমের ব্যবসা আছে। এছাড়া নিজের দল-বল আছে আর রাজনীতির উঁচু পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। অনেক প্রাক্তন মিনিস্টার, এমএলএ, আর হোমরা-চোমরার আনাগোনা তার বাড়িতে। এই সুবাদে স্থানীয় থানার কর্মকর্তাদের সে ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। এদিকের খোদ বড় কর্তার সঙ্গে তার দহরম মহরম।

জবাব শুনে অফিসারের মুখের পরিবর্তন দেখল যেন পরীরাণী। আর কিছু না জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোক গটগট করে সোজা দাদার ঘরে ঢুকে গেল।

ওদিকের দরজায় বাবা আর মা সন্ত্রাসে পরীরাণীর দিকে চেয়ে আছে।

পরিতোষ পাজামা বদলে প্যান্ট পরেছে। গায়ে বুশ শার্ট গলাতে গিয়ে ঘুরে তাকালো। অফিসারটি ঘরের চারিদিক, বিশেষ করে দড়িতে ঝোলানো জামা-কাপড়গুলো বেশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখছে আর মৃদু-মৃদু শিস দিচ্ছে।

হয়েছে? এসো।

সকলের বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে পরিতোষ দত্তকে নিয়ে নীচে নেমে গেল তারা। পরীরাণী ছুটে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে ওর দু'চোখ ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। নীচে সরু ফুটপাথের পাশে পুলিসের কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তার দু'দিকে লোক জমা হয়েছে। জোড়া-জোড়া কৌতূহলী চোখ। আশ-পাশের বাড়ির বারান্দাগুলোতেও। সকলেই জানে এ-বাড়িতে পুলিস ঢুকেছে। ফলাফল দেখা এবং বোঝার জন্য উদগ্রীব ওরা।

দাদাকে নিয়ে বেরুল তারা। পুলিস অফিসারের পাশে নীচের তলার মাস্টারমশায়ের ছেলে শেখর ভাদুড়ী, আদুড় গায়ের ওপর কাপড়ের খুঁট জড়ানো। পুলিসের লোকটির সঙ্গে কথা কইছে, বোধ হয় জানতে চাইছে কি ব্যাপার!

ভয়ের কিছু কি না পরীরাণী জানে না। তবু রীতিমত ভয়ই করছিল। ওদের ভিতর-বার সব জানে। দাদা যাদের সঙ্গে মেশে তারা কেউ লোক ভালো নয়। কোথাও বড় রকমের খুন-জখম বা হাঙ্গামা-টাঙ্গামা হয়ে গেলে দাদার জন্যে পরীরাণীর বুকের ভিতরটা ধুকপুক করতে থাকে।...কথা নেই-বার্তা নেই পুলিস সরাসরি দোতলায় উঠে এলো কেন? কোথায় কি কাণ্ড করে বসে আছে ঠিক কি। ওই একজনকে দেখা-মাত্র একটু যেন বল-ভরসা পেল—শেখর ভাদুড়ীকে দেখে। আলাদা জাতের আলাদা ধাতের মানুষ। চারদিকের ভিতর-কালো মানুষগুলোর মধ্যে একখানা পরিষ্কার মুখ।

পুলিস ভদ্রলোক তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে দাদাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল। জোড়া জোড়া উদগ্রীব চোখের ওপর দিয়ে গাড়িটা চলে গেল।

শেখর ভাদুড়ী ঘুরে ওপর দিকে তাকালো একবার। চোখাচোখি হল। নীচে থেকে নীরবে অভয় দিল যেন একটু। ওই লোকের এই রকমই ধরনধারণ। শুধু চোখে তাকিয়েই অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে, ভরসা দিতে পারে। শেখর ভাদুড়ী ফুটপাথ থেকে বাড়িতে উঠে গেল।

পরীরাণীর দু'চোখ সব থেকে বেশি ধাক্কা খেল এতক্ষণ বাদে। সেই সঙ্গে ভিতরটা রি-রি করে উঠল। রাস্তার ওপারে দুটো দালান ছাড়িয়ে ছাল-চামড়া ছাড়ানো ওই তেরছা-মুখো বাড়িটার দোতলার জানালায় সেই ছেলেটা দাঁড়িয়ে। সকালে যে দাঁতন করছিল আর একটা চোখ ছোট করে তাকাচ্ছিল আর ভোরের শুচিতার ওপর কালি ছড়াচ্ছিল। বসন্ত সরখেল। এখনো ধূর্ত শয়তানের মতো চেয়ে আছে এই দিকেই। দুনিয়ায় আর যেন কিছু দেখার নেই ওর। চোখাচোখি হওয়া মাত্র একটা চোখ ছোট হব-হব করছে। আর ঠোঁটে হাসি টিপ টিপ করছে। পরীরাণীর মনে হল একটা সাপ যেন কুণ্ডলী পাকাচ্ছে লোকটার মধ্যে। এতদিন...প্রায় এক মাস ধরে ওটা ঘুমুচ্ছিল। কিছু একটা আঁচ লাগতে নতুন করে আবার যেন আড়মোড়া ভাঙছে।

পরীরাণী এখনো সরে এলো না। স্থির চোখে চেয়ে রইল। ওকে দেখামাত্র দু'চোখ

অমনি স্থির হয়। ওর আপাদমস্তক দগ্ধে দিতে চায়। গত এক মাস যাবৎ শয়তানটা অনেকখানি কুঁকড়ে ছিল। কাছে ঘেঁষেনি। ছায়া ফেলেনি। সামনা-সামনি পড়ে গেলে অচেনার মতো অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে।

আজ ব্যতিক্রমের আভাস পাচ্ছে। সকালেই পেয়েছিল।

যা, ঘরে যা!

ঘুরে দাঁড়াল। মা। মায়ের মৃদু গম্ভীর অনুশাসন। ওই জানালার মূর্তি মায়ের চোখে পড়েছে। তার পাশে বীরুমামুর চোখেও পড়েছে। ও-ধারে বাবার শুধু ফ্যালফ্যাল চাউনি। দাদাকে নিয়ে পুলিশ নীচে নেমে যেতে সকলেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

মায়ের ত্রাসটুকুই বড় আপাতত। ও ঘরে পা দিতেই ছেঁকে ধরল।—পুলিসের লোকটা তোকে কি জিজ্ঞেস করছিল, পরিতোষকে থানায় নিয়ে গেল কেন?

জবাবে পরীরাণী মাথা নাড়ল শুধু। জানে না। বিড়বিড় করে বলল, রাতে দাদা কখন বাড়ি ফিরেছে জিজ্ঞেস করছিল।

মায়ের চোখ বীরুমামুর ওপর চড়াও হল। কি রে, গুণধর কি করে এসেছে বলবি, না তোকেও ধরে দুটো ঝাঁকানি দিতে হবে?

—বা রে! বীরুমামুর কালো ঠোঁট দুটো শুকিয়ে খরখরে যেন।—আমিও তো তোমাদের মতই কিছু বুঝতে পারছি না!...কাল তো আমিও বিকেল থেকে ওই সান্যাল বাড়িতে ছিলাম, রাতে খেয়ে-দেয়ে দু'জনে একসঙ্গে ফিরলাম।

নতুন মা তার ভাইকে অবিশ্বাস করল না। দাদাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস। দাদা সাংঘাতিক কিছু একটা করে বসেছে তাতে তার একটুও সন্দেহ নেই। আর, যা করেছে তার ভাইয়ের চোখে ধুলো দিয়েই করেছে। বীরুমামুর মুখের ওপর থেকে তার ধারালো দু'চোখ বাবার দিকে ফিরল।

বাবার দুর্বোধ্য বিস্ময়ভরা চোখ দুটো এতক্ষণ সকলের মুখের ওপরেই ঘোরাফেরা করছিল। মায়ের চাউনির ধাক্কা খেয়ে একটু সম্বিত ফিরল যেন। মুখ কাচুমাচু করে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

মিনিট দশেকের মধ্যে পরীরাণী নিঃশব্দে নীচে নেমে এলো। ওদেরই বাড়ি, ওদেরই নীচের ভাড়াটে ওরা। তবু চোরের পা পরীরাণীর। ভয় মাস্টারমশায়কে নয়। অরবিন্দ ভাদুড়ী সদাশিব মানুষ। এত ভক্তি-শ্রদ্ধা পরীরাণী বোধ হয় আর কাউকে করে না। তাঁর বয়েস হয়েছে। আগের কালের মাস্টারমশায়দের মতই বুকের তলায় একটা সাদা আদর্শ পুষছেন। তাঁর ছেলের মতে অবশ্য বাপের আদর্শ অবাস্তব, যাকে বলে আনপ্র্যাকটিক্যাল। বৃদ্ধটিকে তবু ভারি ভালো লাগে পরীরাণীর। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞও কম নয়। দু'বছর আগে তাঁরই দয়ায় দ্বিতীয় বিভাগে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করতে পেরেছিল। পরীক্ষা দেবার জন্য সেবার কোমর বেঁধে লেগেছিল। তার আগের বছর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি বাবার অসুখের দরুন। সেই সঙ্গে সংসারের সতের ঝক্কি ঝামেলা। পরের বারেও পরীক্ষা দেওয়া না হলে আর হবে না ধরেই নিয়েছিল। তাই মরিয়া হয়ে লেগেছিল। নিজের মায়ের নাম-মাত্র দু'খানা গয়না ওর হেপাজতে আছে। পরের মা-টি ওদিকে নজর দেয়নি ভয়ে। গয়নাসুদ্ধু দখল করেছে দেখলে আত্মঘাতিনী সতীন ঘাড় মটকাতে আসবে কি না কে

জানে। পরীরাণী বেশ বড়-সড় হয়ে উঠতে বাবা একদিন চুপিচুপি মায়ের ট্রাঙ্কটাই ওর ঘরে চালান করে দিয়েছিল। সেই ট্রাঙ্কে মায়ের জামা-কাপড় আর গয়না ছিল। দু'গাছা পাতলা বালা, ছ'গাছা সরু চুড়ি, দুটো দুল, একছড়া পলকা হার আর একটা আংটি।

যক্ষের ধনের মতই সেগুলো আগলে রেখেছিল পরীরাণী। তবু তার থেকে কিছু কিছু খরচ হয়েছে। বালা দুটো বিক্রী করে সেবারে স্কুলের বাকি মাইনে আর পরীক্ষার ফী যোগাতে হয়েছিল। পরীক্ষার তিন মাস আগে পর্যন্ত অর্ধেক বই নেই। যা-ও আছে তার বেশির ভাগই দুর্বোধ্য। বাড়ির কাজ আর রান্না-বান্না সেরে পড়ার সময় আর কতটুকু পেয়েছে, আর মাসের মধ্যে স্কুলেই বা গেছে ক'দিন।

তার বছরখানেক আগে মাস্টারমশায় এ-বাড়ির ভাড়াটে হয়ে এসেছেন। কর্তা-গিন্নি দুটো প্রাণী শুধু। তাঁদের এই ছেলে তখন গ্রামে। ছেলের প্রসঙ্গে তার মা তখন বলতেন, গাঁয়ে পচে-পচে রাজ্য উদ্ধার করছে, আমাদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে, সগ্‌গে ঠেলে তুলবে আমাদের সব!

মাস্টারমশায়ের যে ছেলে-পড়ানোর নাম-ডাক খুব, পরীরাণী সেটা টের পেত। বিকেল পেরুলেই অনেকগুলো ছেলে আসত তাঁর কাছে পড়তে। ছুটির দিনে সকাল দুপুরেও আসত। এখনো আসে। তবে রিটায়ার করার পর থেকে মাস্টারমশায়ের শরীর কিছু ভেঙেছে বলে বাড়ির ছাত্রের সংখ্যা ইদানীং কম। তার ওপর ছেলের কড়াকড়ি। বাপের এই বয়সে বেশি খাটা-খাটনি পছন্দ নয়। কিন্তু পরীরাণীর ধারণা ছেলে না পড়াতে পেলেই মাস্টাবমশায়ের শরীর আরো বেশি ভাঙবে। যাক, সে-সময়ে ঘরে বসে পড়াতে মাথা-পিছু তিরিশ টাকা করে নিতেন মাস্টারমশায়। তাঁর গিন্নির কাছ থেকে পরীরাণী এটা কৌশলে জেনে নিয়েছিল। হিউম্যানিটিজের সব ক'টা বিষয় পড়ানোর বিনিময়ে এ টাকা কিছুই নয়। কিন্তু পরীরাণীর কাছে তিরিশ টাকা তিন হাজারের সামিল।

যখন শিরে সংক্রান্তি, পরীরাণী মরিয়া হয়েই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল। বলেছিল, গেলবারে আমার পরীক্ষা দেবার কথা ছিল, এবারেও কিছুই তৈরি হয়নি, আমাকে একটু পড়াবেন?

মাস্টারমশায় তক্ষুনি ধমকে উঠলেন, এতদিন বলিসনি কেন?

—বা-বাবার টাকা নেই।

—ও, এখন বুঝি টাকা হয়েছে?

পায়েব নখে মাটি খুঁটতে খুঁটতে পরীরাণী মাথা নেড়েছিল। অর্থাৎ এখনো নেই।

মাস্টারমশায় যা বোঝবার বুঝে নিয়েছিলেন। তিনটে মাস নিয়মিত পড়িয়েছেন। নিজের বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। মাস্টারমশায় খেতে ভালবাসেন। পরীরাণী নিজের হাতে এটা-ওটা রেঁধে এনেছে। মাস্টারমশায় মহাখুশি, কিন্তু তাতেও ঝামেলা। তাঁর মহিলাটির ছুচিবাই। রান্নার বাটি পর্যন্ত হেঁসেলে ঢুকতে দিতে আপত্তি।

দ্বিতীয় বিভাগে পাসটা করে ফেলার পর পরীরাণীর আক্ষেপ হয়েছিল। আর তিনটে মাস আগে মাস্টারমশায়ের ওপর চড়াও হতে পারলে নির্ঘাত ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করত।

মাস্টারমশায়ের উৎসাহে আর দাদার আর নিজের উৎসাহে কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বি-এ পার্ট ওয়ানই শেষ করতে পারেনি। বাড়ির এই জাঁতা-কলের থেকে মুক্তি

পেলে ছোট ছেলেমেয়ে পড়িয়েও কলেজের পড়া চালাতে পারত। পারেনি। সব থেকে বেশি বাধা এসেছে এই নতুন মায়ের কাছ থেকে। মা সংসারের হাল ধরলে ওর পড়া হতই। রাগে দুঃখে কত কেঁদেছে এ-জন্যে ঠিক নেই। শেষে নিজেই হাল ছেড়েছে।

নীচের তলায় হাওয়া বদলেছে, মাস্টারমশায়ের ছেলে শেখর ভাদুড়ী গ্রাম ছেড়ে কলকাতার এই বাড়িতে কায়েম হয়ে বসার পর। মাত্র বছর খানেকের কথা। তার আগে ওই ছেলেকে পরীরাণী ক্বচিৎ কখনো দেখেছে। ছেলে তখন গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করত। কলকাতায় মাস্টারি জোটেনি বলে নয়, নতুন বয়সের উদ্দীপনায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এক-বয়েসী পঁচিশ-তিরিশটি ছেলে গ্রাম বাংলার ছেলে তৈরি করার আদর্শে মেতে উঠেছিল তখন। এখনো নিজেকে আদর্শচ্যুত ভাবে না শেখর ভাদুড়ী। অমন তেজী ছেলের কোন বড় চাকরিতে ঢোকার অসুবিধে ছিল না, কিন্তু সে-তদবিরে মাথা গলায়নি। চার পুরুষের বিদ্যাদান পেশা, সে-ও এটা সম্মানের পেশাই ভাবে।

এক সময় বাপের মতই স্বাধীনতার প্রাচীন যোদ্ধাদের ভক্ত ছিল সে। কিন্তু বিশ বছরের মেরুদণ্ডহীন অপশাসনের ফলে এখন উগ্র বিদ্রোহীর ভূমিকা তার। কোন রাজনৈতিক দলে নাম লেখায়নি। ফাঁক পেলে প্রকাশ্যে আর কাগজে-কলমে সকলেরই তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে থাকে। সঙ্ঘবদ্ধ এক বৃহৎ শিক্ষক-জগতের স্বপ্ন দেখে সে। পৃথিবীর সকল দেশগুলির স্কুলের শিক্ষকদের জীবন-যাপনের চিত্র তার চোখের সামনে। তাদের সম্পর্কে অনেক পড়াশোনা করেছে। প্রাইমারি থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার বেসরকারী আর আধা সরকারী স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা কম করে সত্তর পঁচাত্তর হাজার হবে। সরকারী স্কুলগুলোকে সে আপাতত তার হিসেবের খাতা থেকে বাতিল করেছে। বাদ বাকি শিক্ষকরা যদি আধা-আধিও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে একদিন তো সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হবে।

যে সহকর্মীদের নিয়ে গ্রাম বাংলার ছেলে তৈরির আদর্শে মেতেছিল একদিন, তাদের সাহায্যেই অফুরন্ত উদ্দীপনা নিয়ে কাজে নেমেছিল শেখর ভাদুড়ী। গ্রামে গ্রামে আর শহরে শহরে ঘুরে বহু তরুণ শিক্ষককে নিয়ে রাজনৈতিক সংস্রবশূন্য একটা জোরদার সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে তারা।

শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আদায় আর তাদের জীবন ধারণের মান বাড়ানোর সংঘর্ষে শেখর ভাদুড়ী দলমতনির্বিশেষে প্রথম সারির যোদ্ধা। ফলে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মতবাদের অনেক তরুণ শিক্ষক ভিতরে ভিতরে অনুরাগী তার। শেখর ভাদুড়ীর মনে মনে আশা, স্বার্থের দিকটা সফল করে তুলতে পারলে তার শিক্ষকজগতে সর্বদলের মানুষ সার বেঁধে আসবে।

ছুটি-ছাটায়ও তখন ওই ছেলে বাড়িতে বাস করার সময় পেত না। বিভিন্ন মতবাদের গ্রামীন কর্মীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তখনই তাদের কাজের মৌসুম। পরীরাণী তার মায়ের গজগজানি শুনত। এই ছেলের স্বভাবের দরুন মা-টি তিক্ত-বিরক্ত। বাড়ি এলেও নিজের কাজেই ডুবে থাকত, আর কাজ শেষ হলে আবার দিন কয়েকের মধ্যেই চলে যেত। বছর তিনেক বাইরে কাটানোর পর এখন বাবা-মায়ের কাছে আছে। এখানকার এক স্কুলে চাকরি নিয়েছে। প্রধান কারণ তার শিক্ষক জগতের পুষ্টিলাভ। কলকাতা তার কর্মকেন্দ্র। এখানে পাকাপোক্ত আপিসের পত্তন হয়েছে। কর্ণধারেরও তাই বাইরে থাকলে

চলে না। কিন্তু ছুটির দিনে এখন আবার তার টিকির দেখা মেলে না বড়। সঙ্গী-সাথী নিয়ে তখন বাইরে বাইরে সংগঠন সফরে বেরোয়। কারণে-অকারণে কলকাতার স্কুলে ছুটি তো লেগেই আছে ইদানীং।

ঠিক এই বছর খানেক ধরে, অর্থাৎ ছেলে বাড়িতে স্থিতি হবার পর থেকেই নীচের তলার গৃহিণীর আচরণ বদলাচ্ছে। তাঁর ছুঁচিবাই বেড়েছে, গজরগজর বেড়েছে, ছেলের উদ্দেশে হাওয়ায় অভিযোগ ছোঁড়াও বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে পরীরাণীর প্রতি ব্যবহারও খারাপের দিকে গড়াচ্ছে। উল্টে তাঁর একটু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মাস ছয় আগে তাঁর জল-বসন্ত হয়েছিল। গুটিতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেছল। স্বামী আর ছেলেকে রান্না করে খাওয়ায় কে, আর তাঁকেই বা পথ্য দেয় কে। অবশ্য শুনেছে, শেখর ভাদুড়ী গ্রামে থাকতে নিজেই রান্না করে খেত। আবার বহুদিন চিঁড়ে মুড়ির ওপর দিয়েই চলে যেত। এখানে আপাতত রোজ রান্নার ব্যাপারটা একটা সমস্যাই ভাবছিল সে। অত সময়ই বা কোথায়, স্কুলের চাকরি ছাড়াও কাজের অন্ত নেই তার।

মাস্টারমশায়ের কাছে পরীরাণী প্রস্তাব দিয়েছিল যা-যা রাঁধতে হবে ঝিকে দিয়ে সব জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলে আমি রেঁধে দিতে পারি।

শুনে মাস্টারমশায় মহানিশ্চিন্ত। ছেলের সঙ্গে তখন পরীরাণীর দুই-একটা মৌখিক কথা হয় কি হয় না। সে যে জগতে বাস করছে তার নাগাল পাওয়া ভার। পরীরাণী নাগাল পেতেও চায়নি কখনো, দূর থেকে ভয়ে ভয়ে শুধু লক্ষ্য করত। রান্নার প্রস্তাব শুনে সে হেসে ঠাট্টা করেছিল, জিনিস পাঠালে তবে রেঁধে দিতে পারো, নইলে নয়?

যে-জন্যেই হোক পরীরাণীর ধারণা, এই গোছের লোকের সোজা সত্যি উত্তরই পছন্দ। জবাব দিয়েছিল, নইলে দেব কি করে, আমাদের তো নেই।

গত ছ'মাসে যা হয়নি ওই এক জবাবে তাই হয়েছে। শেখর ভাদুড়ী ওকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করেছে। টানা একমাসের আগে ভাদুড়ী গৃহিণী হেঁসেলে ঢুকতে পারেননি। সেই একমাসই নীচের তলার দু'বেলার আহার্য ওপর থেকে রেঁধে পাঠিয়েছে পরীরাণী। রোগিনীর পথ্যও সে-ই করে দিয়েছে। রোগের যাতনায় আর লোকাভাবে কিছুদিনের জন্য তাঁর ছুচিবাই মাথায় উঠেছে। এক ভাত ছাড়া পরীরাণীর হাতের সমস্ত রান্নাই তাঁকে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। যে রোগের নাম শুনলে সামনে থেকে মানুষ পালায়, প্রত্যহ। দু'বেলা চানের আগে পরীরাণী সেই রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষাও করেছে। তার ভয় হয়নি, উল্টে আনন্দ পেয়েছে। মনে হয়েছে, মাস্টারমশায়ের ঋণ যে-ভাবে হোক একটু পরিশোধ করতে পারছে। এ-জন্যে দাদা বকেছে, বীরুমামু ঠেস দিয়েছে, বাবা ভয়ের চোটে ওর হাতের রান্না খেতে চায়নি। কিন্তু পরীরাণী কারও পরোয়া করেনি।

সেই থেকেই শেখর ভাদুড়ীর সঙ্গে ওর কথা-বার্তা আলাপচারী সহজ হয়ে এসেছিল। খুশিমুখেই শেখর একদিন বলেছিল, তুমি তো মানুষের খুব সেবা-যত্ন করতে পারো।

পরীরাণী জবাব দিয়েছিল, সে আর বেশি কি। সবাই পারে।

—সবাই পারে তুমি জানো? তোমার মা পারেন?

পরীরাণী হকচকিয়ে গেছল একটু। তারপর জবাব দিয়েছিল, মাস্টারমশায় আমার জন্যে যা করেছেন সে-তুলনায় এ কিছুই নয়।

মাস্টারমশায় কি করেছে জানে। কিন্তু সবেতে ফোঁস করে ওঠা বোধহয় স্বভাব

মানুষটার। জবাব দিয়েছিল, মাস্টারমশায় কি করেছেন, তোমাদের টাকা নেই তবু তোমাকে পড়িয়ে পাস করিয়ে দিয়েছেন, এই তো? কিন্তু আমি বলছি মাস্টারমশায় সামান্য কর্তব্য ভিন্ন তোমার জন্যে আর কিছুই করেননি। বিদ্বানের পাশে মূর্খ থাকলে যে বিদ্বান তার পাপ। একজন খেতে পেলে আর একজন না পেলে ভাগ না দিয়ে যে খাচ্ছে তার পাপ। একটু খুঁটিয়ে ভাবলে দেখবে, শুধু এই পাপে দেশটার আজ এই অবস্থা।

পরীরাণীর দম বন্ধ হবার দাখিল। লোকটার দু'চোখে যেন আলো ঠিকরোতে দেখেছিল।

আর একদিন। ওকে একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি পড়া ছাড়লে কেন? বাবার কাছে শুনলাম তোমার বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল—

শোনামাত্র পরীরাণীর বুকের তলায় অজানা আনন্দের ছোঁয়া লেগেছিল। ওর বুদ্ধি আছে এ-কথা শুনলে মা হাসবে, দাদা হাসবে, বীরুমামু হাসবে। তা ছাড়া এই লোকের মতো একজন ওর কথা চিন্তা করেছে এও রোমাঞ্চকর বই কি। ওর এই জীবনের গাছে আজ পর্যন্ত কোনো আশার ফুল ছেড়ে মুকুলও কি ধরেছে? যে-দিকে তাকায় ঝাঁ-ঝাঁ মরুভূমি। সেই কারণে নিজের দিকেও ভালো করে তাকাতে ভয় ওর।

জবাব দিয়েছিল, হল না...

—কেন হল না, বাপ দাদার টাকা নেই বলে?

নিরুত্তরে পরীরাণী শুধু মুখের দিকে তাকিয়েছিল একবার।

—এ-সব ছেঁদো অজুহাত, বুঝলে? বাধা এলে মারমুখো হয়ে সে-সব ছেঁটে দেবার দিন এসেছে। নইলে আজীবন শুধু কাঁদতে হবে।...মেয়েরা তো প্রাইভেটেও বি.এ পরীক্ষা দিতে পারে, সে-চেষ্টা কর না কেন?

মা বাবা দাদা বীরুমামুর অনেক কথায় ও নিরুত্তর থাকে। কথা কম বলাই ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। পরীরাণীর দুনিয়াটা ছোট। সে বেশি মানুষ দেখেনি। তার মধ্যে নীচের তলার এই একজনকেই বোধহয় মনে মনে সব থেকে বেশী সমীহ করে, ভক্তি শ্রদ্ধা করে। অমন আদর্শ-প্রাণ মাস্টারমশায়কেও ছেলের সঙ্গে দু'কথার পর তিন কথায় চুপ মেরে যেতে দেখেছে। বেশি অবুঝপনা করলে তার ছুঁচিবাইগ্রস্ত মাকে অনুচ্চ গম্ভীর এক দাবড়ানিতে থামিয়ে দিতে দেখেছে। কাজের নিষ্ঠায় আর ঝোঁকে কতদিন এই লোকের আহারনিদ্রা ঘুচতে দেখেছে। কিন্তু মনে যা-ই থাক, সামনা-সামনি এই লোকের সামনেই শুধু বোবা মুখ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া সে-ক্ষেত্রে অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে ওঠার ভয়।

তাই সহজ প্রতিবাদের সুরেই জবাব দিয়েছিল, আমি পড়া নিয়ে থাকলে রাঁধবে কে?

এ-ই যেন শুনতে চেয়েছিল। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেছে। দু'চোখে আলো ঠিকরেছে। রাঁধবে কে! তুমি নিজেকে কেটেকুটে রেঁধে বেড়ে দিলেও অবিচারের খিদে মেটবার নয়, বুঝলে? সাহস করে দু'দিন হাত গুটিয়ে বসে থেকে দেখো, খিদে পেলে সব কাঁচা চাল চিবিয়ে খাবে।

হ্যাঁ, পরীরাণীর এই একুশ বছরের অন্ধকারে কেউ যদি এতটুকু আশার আলো জ্বেলে থাকে, কেউ যদি এতটুকু জীবনের তাপ ছড়িয়ে থাকে তো তার জন্যে একজনের কাছেই

ঋণী সে—এই শেখর ভাদুড়ীর কাছে। কত যে ঋণী আর কৃতজ্ঞ সেটা এই লোকও ঠিক-ঠিক জানে না বোধহয়। মাত্র একমাস আগে যা ঘটে গেছে সেই পাঁক থেকে নিজেকে মুক্ত করার তাড়ানায় দেহ থেকে নিজের প্রাণটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই শুধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল সে। দয়া-মায়া-মমতা শূন্য কদর্য নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল এই জগতটাকে। ক'টা দিন কেবল সব ছাই করে দেবার আগুন জ্বেলে বসে ছিল দুই চোখে। শুধু সময় আর সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল।

সেই আত্মঘাতী আগুন এই লোক নিভিয়েছে। এই শেখর ভাদুড়ী। জীবন এখন কোন্ সমুদ্র ধরে শেষে কোন্ মোহনায় এসে ভিড়বে জানে না। ভিড়বে না শুধু ভেসেই যাবে, জানে না। তবু বাঁচতে সাধ। নিজের দুটো পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে সাধ। ওর এই সাধ, ওই তৃষ্ণা এই লোক জাগিয়েছে।

অসুখের সেতু ধরে ছেলের সঙ্গে যেটুকু হৃদ্যতা, ভাদুড়ী গৃহিণীর চোখে সেটুকুই অবাঞ্ছিত। একুশ বছরের একটা সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে নিজের উনত্রিশ বছরের অবিবাহিত ছেলের স্বাভাবিক মেলামেশাটুকুও স্বাভাবিক চোখে দেখতেন না তিনি। সেরে ওঠার পর পরীরাণীকে নীচে নামতে দেখলেই চাউনি ঘোরালো হত তাঁর। ছেলেও ঠিক অতটা নির্লিপ্ত আর বে-পরোয়া না হলে মহিলার ওই ভ্রূকুটিতে পরীরাণী নীচের দিক মাড়াত কিনা সন্দেহ। দরকার পড়লে ছেলে নিজেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ডাকত ওকে। ক'দিন না এলে বুঝত কেন আসেনি। একদিন হেসে বলেছিল, মায়েদের ওই আদ্যিকালের ত্রুটি ধরলে তোমার দ্বারা কোনদিন কিছু হবে না। আবার মায়ের উদ্দেশেই একদিন গর্জে উঠতে শুনেছে, ফের যদি তুমি ওই পূজোর ঘর আর রান্নাঘর ছেড়ে এদিকে আসবে তো আমি বাড়ি থেকেই বেরিয়ে যাব, বলে দিলাম! কি উপলক্ষে এই গর্জন পরীরাণী জানে না, কিন্তু অনুমান করতে পারে। খুব সম্ভব ওকে নিয়েই ছেলেকে বলতে এসেছিল কিছু।

তখনই এই, এখন তো ওকে দেখলে ত্রাস মহিলার। এখন বলতে একমাস আগে ওই কুৎসিত ব্যাপারটা ঘটে যাবার পর। এখন বোধহয় ওকে দেখলে মনে মনে শাপশাপান্ত করেন মহিলা। কিন্তু তবু পরীরাণী না এসে পারে না। দম বন্ধ হলে মানুষ দম নেবার জায়গায় ছুটে না এসে পারে কি করে? মৃত্যুর অন্ধকারে আচ্ছন্ন পতঙ্গ আলোর ঠিকানা পেলে অন্ধ আবেগে ছুটে না এসে পারে কি করে?

আসে। আসতে হয়। তবে আগের থেকে কম আসে। দুঃস্বপ্নের মতো ওই ঘটনার পর এই একমাসের মধ্যে দিন তিনেক মাত্র নীচের সংসারে পদার্পণ করেছে। সেও ওই শেখর ভাদুড়ী ডেকেছে বলে। এটুকু বাধা তুচ্ছ করতে না পারলে অন্ধকার সমুদ্রের ওই দিকদিশারীর অপমান। তবু সেদিন বলেছিল, আমাকে না ডেকে আপনি ওপরে যান না কেন, আমার আসতে ভয় করে।

হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।—মায়ের ভয়! তোমাকে উপদেশ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা সমান। লোকে চাঁদে যাচ্ছে আর মাকে এখনো সেই আদ্যিকালের চাঁদ ভর করে আছে। আসলে উল্টে মা-ই তোমাকে ভয় করে, বুঝলে? ওই ভয়ের সংস্কার থেকে তাকে টেনে তুলতে পারলে তোমার বাহাদুরী। ও-সব ভয়-ভাবনা মন থেকে ছেঁটে দাও।

মা কেন ওকে ভয় করে বোঝামাত্র মুখে লালের ছোপ লেগেছিল পরীরাণীর।

লেকচারের মুডে লোকটা ভালো করে তাকে লক্ষ্য করেনি বলেই রক্ষা।

খেয়াল হলে শেখর ভাদুড়ীই অবশ্য ওপরে উঠে আসে আজকাল। তবে সে-ও খুব কম। যত ভরসাই দিক, নীচে ওদের ঘরে ঢোকার নামে পরীরাণীর পা দুটো এখনো আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

না ডাকতে এক মাসের মধ্যে আজ এই প্রথম ওই ঘরের উদ্দেশে ভয়ে ভয়ে নীচে নামল সে। দাদাকে কেন পুলিসের লোক এসে টেনে নিয়ে গেল না জানা পর্যন্ত ঘরে তিষ্ঠোবে কেমন করে। দাদা যেমনই হোক, তাকে যে ও একটু বেশিই ভালবাসে সেটা টের পায় যখন দাদার মাথায় কোনো বিপদের খাঁড়া ঝুলছে বলে মনে হয়।

ফাড়া কাটল। ঠাকরোনের মুখোমুখি পড়তে হল না।

শেখর চা খাচ্ছিল। হেসে ডাকল, এসো, খুব ঘাবড়েছ বুঝি? চা খেয়ে আমিই ওপরে যেতাম—পটে আরো চা আছে, খাবে?

মুখ দেখে পরীরাণীর মনে হল গুরুতর ব্যাপার কিছু নয়। তা ছাড়া যে-কোনো ব্যাপারে বেশি উতলা হলে এই লোকের কাছ থেকে ধমক খেতে হয়। স্নায়ু সর্বদা শক্ত সবল দেখতে চায়। অতএব পরীরাণী স্বাভাবিকভাবেই মাথা নাড়ল, চা খাবে। ভয়ের প্রসঙ্গ উহ্য থাকল।

—ও'-ঘর থেকে একটা পেয়ালা নিয়ে এসো।

ও-ঘর থেকে অর্থাৎ তার মায়ের সমুখ থেকে। কি বোকার মতোই না চা খেতে চেয়েছে। সামনের কাঠের টেবিলে কাঁচের গেলাসটা দেখে বাঁচলো। আধ-খাওয়া জল রয়েছে। সেটা ফেলে দিয়ে কোণের কুঁজোর জলে গেলাসটা একটু ধুয়ে নিয়ে সামনে রাখল।—এতে দিন।

শেখর ভাদুড়ীর জোড়া ভুরুর মাঝে হালকা ভাঁজ পড়ল একটু, দু'চোখ ওর মুখের ওপর।—বুঝলাম। মাকে তুমি অত ভয় কর কেন?

ধরা পড়ে পরীরাণী হেসে ফেলল।—আমি ভয় করতে যাব কেন, আমাকে দেখলেই উনি বিরক্ত হন...তার ওপর সকালে উঠেই এই পুলিসের হাঙ্গামা।...আপনার সঙ্গে তো কথা হল, দাদাকে থানায় নিয়ে গেল কেন?

কাঁচের গেলাসে পটের অবশিষ্ট চা ঢেলে দিয়ে শেখর নিস্পৃহ জবাব দিল, কাল রাতে তোমার দাদার কে একটা চেনা লোক মার্ডার হয়েছে কোথায়, সেইজন্যে।

আঁতকে ওঠার ফলে খানিকটা গরম চা পরীরাণীর ঠোঁটে এসে লাগল।—দাদাকে নিয়ে গেল কেন, ও তো কাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সান্যালদের বিয়েবাড়িতে ছিল!

ভুরু কুঁচকে তাকাল শেখর ভাদুড়ী।—তোমার দাদাই মার্ডার করেছে একথা বলা হয়েছে? এত ঘাবড়াও কেন, তোমাকে বলেছি না, যে দিন আসছে অনেক রক্তারক্তির কথা শুনবে আর অনেক রক্তারক্তি কাণ্ড দেখবে।

বলেছে বটে। অনেক সময়ই বলে। আর এমন ঠাণ্ডা মুখ করে বলে যে পরীরাণীর অবাক লাগে, ভাবে মানুষকে যারা সত্যিই ভালবাসে, মানুষ সম্পর্কে তারা অত নির্লিপ্ত হয় কি করে। কিন্তু সে-সব শোনার মুহূর্ত আর সদ্য বর্তমানের এই পরিস্থিতি এক নয়। অনুশাসন সত্ত্বেও উদগ্রীব মুখে চেয়ে রইল।

হাতের পেয়ালা রাখতে রাখতে শেখর বলল, তোমার দাদার চেনা লোক, তাই

কাকে সন্দেহ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে গেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে—

পরীরাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু খুব স্বস্তি বোধ করছে না। আজকাল কাগজ বোঝাই শুধু খুন-জখম মারামারি গুলী বোমার খবর। পড়তে পড়তে মাথা ঝিমঝিম করে। ওদের দোতলায় খবরের কাগজ আসে না। কে পড়বে? এই বাপ-ছেলের পড়া হলে তাদের কাগজ ওপরে চালান যায়। ঝিয়ের মারফত এই ছেলেই পাঠিয়ে দেয়। আদ্যোপান্ত পড়তে হয় ওকে। না পড়লে বকুনি। কিন্তু কাগজ হাতে নিলেই বুকের তলায় শিরশির করে কেমন। কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। যে যা করছে সবই নাকি দেশের জন্যে। এমন দেশের কস্মিনকালে ভালো হবে কি করে পরীরাণী ভেবে পায় না।

শেখর ভাদুড়ীর দুটো চোখ ওর মুখের ওপর উৎসুক হতে দেখল যেন। চোখ দুটো নড়াচড়া করল একটু, ওঠা-নামা করল।—তোমাকে সেদিন যা বলেছিলাম তার কি হল?

পরীরাণী হঠাৎ স্মরণ করতে পারল না কি বলেছিল। তেমন কিছু হলে মনে থাকার কথা। কোন কিছু ও চট করে ভোলে না। এই লোকের কথা তো নয়ই। কিন্তু সকালটাই কেমন ওলট-পালট আজ।

...কি?

—বেশ! বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়েও কি মনে হতে ঠোঁটে হাসির আভাস দেখা গেল। বলল, গাঁয়ে যখন মাস্টারি করতাম তখন এক মাঝবয়সী অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশায়ের ওপর স্কুল কমিটি খুব অবিচার করেছিল। হেডমাস্টারের পোস্ট খালি হতে সেক্রেটারীর এক অল্পবয়সী পেয়ারের লোককে বাইরে থেকে এনে মাথার ওপর বসানোর তোড়জোড় চলছিল। আমরা তখন সেই মাঝবয়সী অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারকে এমন তাতিয়ে তুললাম যে ভদ্রলোক ফেটে পড়ে-পড়ে। ঠিক হল, দরকার হলে স্কুলে স্ট্রাইক পর্যন্ত হবে। তাব আগে ওই ভদ্রলোককে সামনে রেখে আমরা সব দল বেঁধে একদিন কমিটির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাব। সেইদিন আসতে ভদ্রলোক বলল, সব ঠিক আছে, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে আমার হাঁটু দুটো কেমন কাঁপে। কনফারেন্স ঘবে যাবার সময় যদি থেমে যাই তোমরা আমাকে পিছন থেকে একটু ঠেলে-ঠুলে দিও।...তা তোমারও দেখি সেই অবস্থা, এত কথার পর এখন পিছন থেকে ঠেলতে বাকি। পড়াশোনা করার কথা হয়েছিল, বি. এ পরীক্ষা দেবার কথা হয়েছিল—তার কি হল?

পরীরাণীর ঠোঁটের ফাঁকেও এবারে হাসি দেখা দিল। চেয়ে রইল। এক কথা শুনতে শুনতে ও চট করে অন্য কিছু ভেবে নিতে পারে।... দাদার জন্যে দুশ্চিন্তা নিয়ে এসেছিল। সেটা দু'কথায় বাতিল করে দিয়ে কিনা এই কথা। ওর কেমন মনে হল, আসলে এক্ষুণি ওকে উঠতে দেবার মতলব নেই। পুরুষের চোখ মন্দ চেনে না। এক-একজনের এক-একরকম। এ ঠিক সে-রকম নয়। সে-রকম হবেই বা কি করে, বাবারে বাবা, ভিতরে ভিতরে যে চাঁছাছোলা মেজাজের দেমাক...তবু এ চাউনিতে একটু যেন অন্তরঙ্গ ছোঁয়া আছে। পড়াশোনার কথা হয়েছিল বটে কিন্তু সেও এক্ষুণি জবাবদিহি করার মতো এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক ভাবে হয়নি। পরীরাণীর খারাপ লাগছে না, এ-রকম অনুভূতির একটা লোভনীয় স্বাদ আছে। কিন্তু সেটা বুঝতে পারলে ও-দিকের মেজাজ তিরিক্ষি হবে।

—বাঃ সেদিনই বললাম না পড়াশোনা আর হওয়া শক্ত।

—আর আমি যে বললাম কিচ্ছু শক্ত নয়, হবে ঠিক করলেই হবে। তোমার নিজের ভালো-মন্দ তুমি নিজে না বুঝতে চাইলে কে বুঝবে?

ইন্ধন যোগাতে পারলে এবারে বেশ জোরালো গোছের কথা শোনা যেতে পারে। পরীরাণীর শুনতে ভালো লাগে। নিজের সম্পর্কে হলে এই ভালো-লাগাটা প্রায় লোভের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বিমর্ষ মুখ করে তাই মাথা খাটিয়ে একটা ভারী জবাবই দিল। বলল, আমাদের মতো মেয়েদের ভালো-মন্দ বোঝার অধিকারও নেই বোধহয়।

এটুকুতেই কাজ হল। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।—অধিকার নেই? অধিকার তোমার সামনে এসে নেচে বেড়াবে, কেমন? অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার অর্জন করে নিতে হয়, বুঝলে?

বোঝার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে বোকা-বোকা মুখ করে চেয়ে রইল পরীরাণী।

উদ্দীপনার রসদ মিলেছে। চৌকি ছেড়ে শেখর ভাদুড়ী উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এসে হাঁক দিল, মা, আর দু'পেয়ালা চা পাঠাও তো—

সঙ্গে সঙ্গে পরীরাণীর মুখে শঙ্কার ছায়া। বলে উঠল, না না, আমি আর চা খাব না, এখন যাই—

ঘুরে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওই চোখে তার ভয়টা ঠিকই ধরা পড়ল। গম্ভীর। কোনো কিছুতে ভয়ের আভাস পেলেই সব থেকে বেশি রেগে যায়।

—বোসো—

পট, পেয়ালা-প্লেট আর ওর খাওয়া গেলাসটা তুলে নিয়ে ভিতরে চলে গেল। সেগুলো রেখে একটু বাদেই আবার ফিরে এল। চৌকিতে মুখোমুখি বসল।

—ভালো-মন্দ বোঝার অধিকার আছে কি নেই সাহস করে এটুকুও ভাবতে পারো না?...তোমার জীবন কাটবে কি করে, ওই শেলাই-ফোঁড়াই করে?

ঝাঁঝের মুখে এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল যে ভিতরে ভিতরে পরীরাণী ধাক্কাই খেল একটু। মাস ছয় হল, বাড়ির কাছেই এক প্রতিষ্ঠানে সেলাই শিখছে। ওর নিজের মায়ের এটা ছিল শখের জিনিস। তার নিজের একটা সেলাইয়ের কল ছিল। সেটা এখন পরীরাণীর সম্পত্তি। আর মায়ের হাতের কাগজগুলোও। দেখার মতই পরিচ্ছন্ন হাতের কাজ ছিল মায়ের। তার কিছু নজির এখনো পরীরাণীর খুপরি ঘরে দেওয়ালে টাঙানো আছে। সে-সব দেখে পরীরাণীর মনে হত ভিতরে ভিতরে সেই মা'টি শিল্পী ছিল। বাচ্চা বয়েস থেকে এই শিল্পকর্মটি ওরও পছন্দ। মা অবশ্য তখনো তার মেসিনে বেশি হাত দিতে দিত না। মায়ের দেখাদেখি পরীরাণীও ছুঁচ সুতো, পুরনো কাপড় বা নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে শেলাইয়ে বসত। কি করে কি করতে হয় মা ওকে দেখিয়ে দিত।

বাড়ি বসে যখন পাগল-পাগল অবস্থা পরীরাণীর তখন হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল সেলাইয়ের ইস্কুলে সেলাই শিখলে কেমন হয়? অবশ্য তখন ঘরের সেলাই ও ভালোই করে। নিজের আর নতুন মায়ের ব্লাউস-ট্রাউস বানায়। দাদা আর মামুর আণ্ডার-অ্যায়ারগুলোও ওর হাতের। বাবার জামা রিপু করে দেয়। নীচের তলার এই মাস্টারমশায়ের একটা পুরনো দামী শালের কতগুলো ফুটো এমন রিপু করে দিয়েছিল যে মাস্টারমশায় ধরতেই পারেননি কোথায়-কোথায় মেরামত হয়েছে। ও সেলাইয়ের ইস্কুলে ভর্তি হতে

পারলে নিশ্চয় খুব ভালো সেলাই শিখবে। যেতে-আসতে দুপুরে-বিকালে কত মেয়ে বউকে তো সেলাই-হাতে স্কুলে ঢুকতে দেখে। একদিন সাহস করে নিজেও ওই দুই ঘরের স্কুলে ঢুকে পড়ল। সব দেখেশুনে ভারী পছন্দ হল। কত রকমের সেলাই শেখানো হয়। বছর বছর দস্তুরমত পরীক্ষা হয়—ডিপ্লোমা দেয়। যারা শেখায় তারা তো এই বিদ্যে ভাঙিয়েই নিজেদের খরচ চালিয়ে নিচ্ছে।

সেদিনই দাদাকে ধরে পড়েছিল, সেলাইয়ের ইস্কুলে ভর্তি হবেই ও। বীরুমামু ঠাট্টা করেছিল, সেলাই শিখে দরজী হবি?

পাল্টা ঝাঁঝে পরীরাণী বলে উঠেছিল, তোমরা যা করে বেড়াচ্ছ তার থেকে খারাপ সেটা?

দাদার সবটাই মন্দ নয়। সাধ্যের বাইরে না হলে বোনের আব্দার রাখে। ঝোঁক চাপলে নেশার পয়সাও অনেক সময় ওর জন্য খরচ করে ফেলে। পরে অবশ্য গালাগাল করে। কিন্তু বোনের কষ্ট দেখলে তারও যে দুঃখু হয় সেটা পরীরাণী অনুভব করতে পারে। পড়া হল না বলে ওকে কাঁদতে দেখে তার মন খারাপ হয়েছিল। নিজের খরচ চালানোর ক্ষমতা নেই তাই বাবার উদ্দেশে বিচ্ছিরি গালাগালি করেছিল। অল্প পয়সার ব্যাপার হলে নিজেই ঝুঁকি নিত। কিন্তু কলেজে পড়া মানে তো শুধু পড়া নয়—সঙ্গে অনেক খরচ। মাইনে, বই-পত্র, বাড়তি জামা-কাপড়, দু'মাইল দূরের কলেজে যাতায়াতের ট্রামবাস ভাড়া, তাছাড়া, ও পড়াশুনো নিয়ে থাকলে একটা রাঁধুনি রাখার দায়—হিসেবের দু'মাথা মেলানো অসম্ভব ব্যাপার। ছ'মাস কলেজে পড়েছিল, তাইতেই বাড়িতে ভূতের নৃত্য রোজ। ছেড়ে-ছুড়ে বসতে সকলে নিশ্চিন্ত।

যাই হোক, দাদা সহায় ছিল বলেই নতুন মা বাদ সাধেনি। দুপুরে কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, তার অসুবিধের কারণ নেই। বিবেচনা দৈন্য দেখে মা কেবল ভাইয়ের মতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। সে-রকম মেয়ে হলে কত কিছু ভাবতে পারত। হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করেছিলি, কলেজে পড়া হল না যখন টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখে কোন হোমরা-চোমরা লোকের স্টেনো হয়ে বসতে পারতিস। মোটামুটি ভালো চেহারার ক'টা মেয়ে এই করে কোথায় উঠে গেছে সে-খবর হাসি দেবীর নিজেরই জানা আছে। তাদের সময়ের শিখা ভটচার্যকে তো হিংসেই করত সকলে। খোদকর্তার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সে কি দাপট। পাঁচ ছেলে-মেয়ের বাপ ওই ভদ্রলোককে কলের পুতুল বানিয়ে ছেড়েছিল একেবারে। হাসিদেবী গুণমুগ্ধ ভক্ত ওই বান্ধবীর, কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যদোষে সে এক চুনোপুঁটি ধরেছিল—তাইতেই এই হাল আজ। সেই চুনোপুঁটি পরীরাণীর বাপ। তার মেয়ে সেলাইয়ের বেশি আর কি স্বপ্ন দেখবে। মেয়েকে হাসিদেবী টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ড শিখতে বলেছিল, শিখা ভটচার্যের গল্পও করেছিল, কিন্তু পলাশ গোলাপ হবে কেমন করে?

উৎসাহ নিয়েই সেলাইয়ের ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল পরীরাণী। সেই উৎসাহে এখনো টান ধরেনি, বরং বেড়েছে। অন্য মেয়ের তুলনায় এই ছ'মাসে ও ঢের বেশি শিখেছে। দাদাকে ধরে আর মায়ের সামান্য গয়নার কিছুটা ভেঙে মায়ের হাত-মেসিনটাকে পা-মেসিন করে নিয়েছে। ডিজাইনের বই কিনেছে, বোনের আসবাব, হাতের কাজের ফ্রেম-ট্রেম কিনেছে। ওগুলো শুধু কাজের সামগ্রি নয় ওর কাছে, নিঃসঙ্গ অবকাশ যাপনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীও বটে। চুপচাপ কত সময় বসে ওই পা-মেসিনটার ঠাণ্ডা গায়ে হাত বুলোয়। ওটা যেন ওর মনের কথা মনের ব্যথা বোঝে।

এই জন্যেই শেখর ভাদুড়ীর শ্লেষ শুনে পরীরাণী ভিতরে ভিতরে ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। কারো সামান্য পুঁজি নিয়ে ঠাট্টা-ঠিসারা করলে যেমন লাগে, সেই রকম লাগল। বলতে ইচ্ছে করল, তুমি নিজেও তো অত বিদ্যের জাহাজ হয়ে করছ ইস্কুল মাস্টারি, অত কথা কিসের। বলল না। বলা স্বভাব নয়। ও অনেক ভাবতে পারে কিন্তু সহজে জিভ নাড়তে পারে না। তাছাড়া ও-রকম কথা বললে রক্ষে নেই। মুখ বুজে অনেক কথা শুনতে হবে তাহলে। তার মতে এ-দেশের অর্ধেক শিক্ষিত মানুষের স্কুল মাস্টার হওয়া দরকার, কারণ দেশের কোটি কোটি কাঁচা-তাজা মাথার ছেলেগুলোই হল আসল প্রাণ। বিপ্লবের হাতিয়ার। গোড়া থেকে ওই সব মাথায় নতুন চেতনা না ঢোকাতে পারলে, ওদের প্রস্তুত করে তুলতে না পারলে কোনদিন কিছু হবে না।

নিজের কথার খেই ধরে তেমনি ঝাঁঝালো সুরে শেখর ভাদুড়ী আবার বলল, জীবনটা কি ছেঁড়া কাঁথা ছেঁড়া কাপড় যে রিপু করে করে চালিয়ে দেবে?

পরীরাণী ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, সেলাই ফোঁড়াইয়ে অনেক নতুন জিনিসও তো হয়, শুধু রিপু কেন...

চায়ের পট আর পেয়ালা হাতে ঝি ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারে ওগুলো রেখে চলে গেল। দাবড়ানি খাবাব জন্যে প্রস্তুত হয়েই পরীরাণী একটা পেয়ালায় চা ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিল। সেই ফাঁকে মনে হল দুটো চোখ নিঃশব্দে ওর মুখখানাকে জরীপ করছে।

কি ভাবছিল সে-ই জানে। পরীরাণী নিজের জন্য চা ঢালল না তাও খেযাল করল না। সত্যিই আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না, বাবার এখন পর্যন্ত এক পেয়ালাও জোটেনি।

পেয়ালা তুলে নিয়ে শেখর ভাদুড়ী ফস করে জিজ্ঞাসা করল, তোমাব বয়স কত?

গম্ভীর হাওয়ায় হঠাৎ এ-রকম একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না পরীরাণী। থতমত খেয়ে মুখের দিকে তাকাল।

একুশ...

—একেবারে ঠিক-ঠিক বয়স কত?

নিজেরই কানের দু-পাশ গরম ঠেকল সঙ্গে সঙ্গে।—মা বলে আঠের-উনিশ, আমি জানি একুশ। মিথ্যে বলতে যাব কোন দুঃখে?

—না...। দু'চোখ মুখ থেকে নীচের দিকে নামল একবার। তারপর আবার ওপরের দিকে উঠল।—আর একটু বেশী দেখায়।

—যার যেমন গড়ন তেমন দেখায়। মাসিমা বলেন আপনার বয়েস আটাশ-উনত্রিশ, দেখায় তো আটত্রিশ-উনচল্লিশ।

হেসে ফেলল পরীরাণী। মুখ লাল হল। কিন্তু বলতে পেরে মজাই লাগছে। রোগা-রোগা মুখ দেখলে আর তার সঙ্গে অমন মোটা পুরুষ্টু গলা শুনলে আটাশ-উনত্রিশ কেউ বলবে না সত্যি কথাই।

মজা বোধহয় যে শুনল তারও লাগছে। গম্ভীর মুখে হাসির ফাটল ধরেছে একটু। হালকা সুরেই জবাব দিল, আমার আসল বয়েস বোধহয় অষ্টআশি-উননব্বুই। যাক, একুশ হলে হাতে এখনো ঢের সময় আছে, চেষ্টা-চরিত্র করে বি-এটা এখনো পাস করে ফেলা উচিত।

একবার ইচ্ছে মতো মুখ খুলতে পেরে পরীরাণীর সুবিধে হয়েছে।—পাস করে কি হবে?

—কিছুই হবে না, ওটা একটা দরকারী জঞ্জাল। ডিগ্রী থাকলে কিছুই না, না থাকলে লোকের চোখ-কান টানতে অসুবিধে।

পরীরাণীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত।—পাস করে আমি লোকের চোখ-কান টানব। আর বি-এ পাস করতে তেইশ-চব্বিশ গড়াবে বলে বয়েসটা আর একটু কম হলে ভালো হত।

সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত মুখ।—কিছুই বোঝ না। এ চোখ-কান টানার অর্থ বুঝিয়ে শুনিয়ে লোক বশ করার ক্ষমতা, বি-এ পাসও না, জানলে কেউ আজকাল পাত্তাই দিতে চায় না।...বয়েসের কথাটা সে-জন্যে জিজ্ঞেস করিনি, ষোল সতের বছর বয়সে তোমাকে পেলে আমার আরো সুবিধে হত...

বোধগম্য না হলেও পরীরাণীর মুখে চকিত লালের আভাস একটু। যে-ভাবে বলল যেন দেরিতে হলেও ওকে একেবারে পেয়ে বসে আছে। কি সুবিধে হত শোনার লোভ। জিজ্ঞাসাটা চোখে ফুটে উঠল।

শেখর ভাদুড়ী বলল, জগতটা আজ কোন অবধারিত রাস্তায় চলেছে, আর সেই অনুযায়ী আমাদের কি ভালো কি মন্দ ঠিক-ঠিক বুঝতে হলে পৃথিবীর বহু ইতিহাস আর বহু ঘটনা জানা চাই। আর তার জন্যে কম করে দশটি বছরের পড়াশোনা চিন্তা আর সাধনা দরকার। সেই জন্যেই বলছিলাম আরো কম বয়সে তোমাকে পেলে সুবিধে হত। সেই মন আর সেই চোখ তৈরি হলে অধিকার সম্পর্কে অন্যরকম বিশ্বাস জন্মাবে। নিজের ভাল-মন্দ দেখে নেবে না বুঝে নেবে না, নিজেকে অমন ছোট করে দেখার অধিকারই বা তোমাকে কে দিয়েছে?

ডাগর দু'চোখ মেলে পরীরাণী তেমনি চেয়ে রইল খানিক। তারপর আলতো করে বলে বসল, কেউ দেয়নি, নিজেই অর্জন করেছি বোধহয়...

শেখর ভাদুড়ী থমকাল একদফা। তারপর হেসেই ফেলল। খানিক আগে ঝাঁঝের মুখে সে-ই বলেছিল, অধিকার কেউ দেয় না, অর্জন করে নিতে হয়।

ওই হাসির ফাঁকে পরীরাণী ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। হাসছিল নিজেও। দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোতে হঠাৎ মুখে যেন গনগনে ছ্যাঁকা লাগল একপ্রস্থ। সিঁড়ির পাশের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে মাসিমা...শেখর ভাদুড়ীর মা। কি জন্যে এসেছিলেন এ-দিকে জানে না। ও আসছে টের পেয়েই বোধহয় দাঁড়িয়ে গেছেন। দেখছেন ওকে। কঠিন দুই চোখ দিয়ে শাদাটে আগুন ঠিকরোচ্ছে।

এই দশ বারো হাত জায়গা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছনো দায় যেন পরীরাণীর। কোনরকমে এগুলো। এক সিঁড়ি দু'সিঁড়ি করে পাঁচ ছ'টা ধাপ উঠল। তারপরেই মাথার মধ্যে কি-যে ঘটে গেল নিজেই জানে না। ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সোজা মুখের দিকে তাকিয়েছে। তারপর আবার নেমে এসেছে।

কাছে এল। মহিলার একেবারে দু'হাতের মধ্যে। ওই জ্বলন্ত চোখে চোখ রেখেই অভিমানাহত ঠাণ্ডা সুরে বলল, আমি কি করেছি?

অত রাগ সত্ত্বেও ফিরে আবার নেমে আসার কারণটা ভাদুড়ী গিন্নি বুঝতে পারেননি। অভিযোগের মূর্তি দেখে আর কথা শুনে হকচকিয়ে গেলেন একটু। তারপর ঘুরে প্রস্থান।

জোরে জোরে পা ফেলে পরীরাণী ওপরে উঠে এল। রাগের মুখে হঠাৎ হাসিই

পেল আবার। ঠিক হয়েছে। যত মুখ সেলাই করে থাকে তত যেন পেয়ে বসে সব। ওকে দেখলেই ওই মুখ মাসিমার। কেন, ও কি কিছু চুরি ডাকাতি করার মতলবে আছে?

✦

ভিতরটা উতলা আবার। দাদাটাকে কেন যে সাত সকালে ধরে নিয়ে গেল কে জানে। নিয়ে গিয়ে মার-ধর করবে কিনা ঠিক কি। কিন্তু এ-জন্যে কারো যেন সে-রকম একটা উদ্বেগ নেই। নীচের তলার লোক তো এককথায় নিষ্পত্তি করে দিল। ওপরতলার মানুষগুলোরও তেমন তাপ উত্তাপ নেই। অবশ্য ও ওপরে ওঠার পরেই বীরুমামু আর তার দিদি এগিয়ে এসেছে। বাবাও তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দাদাকে কেন নিয়ে গেছে শোনার পর মায়ের মুখ রাগে লাল হয়েছে। বাবার দিকে ঝাঁঝিয়ে মন্তব্য করেছে, যত সব গুণ্ডা-বদমাসের সঙ্গে বন্ধুত্ব, এখন দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়—আমি কাউকে বিশ্বাস করি না!

না, পরীরাণীর দেখার ভুল নয়। ও ঠিকই লক্ষ্য করেছে মায়ের ঝাঁঝালো মুখের দিকে বাবা ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল, কিন্তু মা পাশ কাটিয়ে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওই দুটো চোখ দু'খানা ছুরির ফলা। পিছন থেকে মাকে ফালা-ফালা করছে। পরীরাণী সচকিত। বীরুমামু আবার ওকেই লক্ষ্য করছে ভালো করে। বাবা সরে যেতে ভালো মুখ করে জিজ্ঞেস করল, নীচে থেকে এই খবরটুকু আনতে তোর এতক্ষণ লাগল?

—হ্যাঁ, চা-টাও খেয়ে এলাম।

—বাঃ, কি ভাগ্যি তোর। আমাদের তো আজ জুটলই না।...চা কে খাওয়াল, ভাদুড়ী গিন্নি?

পরীরাণীর ডাগর চোখের সরলতায় চিড় খেল না একটুও। এটুকু প্রকৃতির দাক্ষিণ্য তার ওপর। এই আড়ালটুকুর ওপর নিজেরও আস্থা ইদানীং।

—না। তার ছেলে।

—ছেলে! তাহলে অমৃত খেয়ে এলি বল?

—হ্যাঁ, আর কিছু হোক না হোক চায়ের বাবুয়ানী আছে, চা'টি ভালো চাই।

—বেশ বেশ। বীরুমামুর পরিতুষ্ট মুখ। কিন্তু ভিতরের কালো হিজিবিজিও পরীরাণী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তেরছা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বিড়ির খোঁজে ফতুয়ার পকেটে তিনটে আঙুল ঢুকিয়েছে। নেই। বিড়িতে লম্বা টান দেবার মতো করে মুখ দিয়ে শব্দ বার করল একটা।—আমি ভাবলাম নীচে গিয়ে তুই বুঝি দাদার জন্য কান্নাকাটিই শুরু করেছিস।...যাই, পারিস তো আজ জামাইবাবুকেই বাজারে পাঠা, আমি সুধীর সান্যালকে খবরটা দিয়ে গুটিগুটি থানার দিকে এগোই, ছোঁড়াটা কি ফ্যাসাদে পড়ল আবার কে জানে, তুই আর কি করবি, ভালো চায়ের স্বাদ ভাব বসে বসে, আমাদের চা তো চামড়ার গুঁড়ো—

ঠোঁটের ফাঁকে তির্যক হাসির ভাঁজ ফেলে চলে গেল। পরীরাণীর সরল চোখে এবারে কঠিন ছায়া নামার কথা। ততটা নামল না। বীরুমামু দাদাকে যে ভালবাসে এটা ঠিক। যতটুকু সাধ্য খোঁজ-খবর সে-ই করবে।

উনুনটা সেই থেকে জ্বলে যাচ্ছে। খেয়াল হলেই মা আবার বচন শোনাতে আসবে। ভালো লাগছে না, তবু উঠতে হল। ভাতটা চড়িয়ে দিলে খানিকক্ষণের জন্য নিষ্কৃতি।

দোতলায় ও-কোণের চিলতে খুপরিতে আলগা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা। এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দু'কানে গরম তেলের ছ্যাঁকা পড়ল। গরম তেল নয়, পুরুষের গমগমে গলার স্বর।

ওপর তলায় গানের মহড়া শুরু হল। ভাঙা-ভাঙা হেঁড়ে গলার গান, তারও বেশির ভাগ সপ্তমে চড়া। থেকে থেকে খোঁচ আর গিটকিরির আসুরিক বিন্যাস।

'—নাগরী তুমি গাগরি কাঁখে ঠমকি ঠমকি যাও।'

দাঁড়িয়ে পড়ে পরীরাণী ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু ঠোঁটে হাসি ভাঙার দাখিল। এই পদাবিষ্কার নতুন। এর আগে টানা দেড় মাস 'কালো নয়নের বিজলি পরশে' পাড়ার লোকের কান ঝালা-পালা। কম করে দেড়-দু' মাস নাগরী এখন গাগরি কাঁখে সুরের নানা ঝড়তুফানের মধ্য দিয়ে ঠমকি-ঠমকি যাবেই। কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না।

'—না-আ-গরী-ই-ই। ন্-না-আ-গ-রী-ই।'

বাজখাঁই গলা নাগরীর পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে খেয়ে ভেঙে পড়ছে। খনখনে হারমোনিয়ামটার ওপরেই তবলায় চাঁটি পড়ছে। তারপরেই আবার হারমোনিয়াম আর গলার যুগল আর্তনাদ। গাগরি কাঁখে নাগরীর ঠমক গায়কের নিজের দিকে ফেরানোর আকুতি। কখনো ক্রুদ্ধ গমক কখনো বশ-না-মানা মোটা গলার করুণ মিনতি। নতুন গানের পদ-বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন, বড় জোর আর এক পংক্তি যোগ হতে পারে। ওই এক লাইনই কোনদিন কালোয়াতি, কোনদিন ঠুংরি, কোনদিন গজল আবার কোনদিন কীর্তনের পথে মাতামাতি করবে। সুরাঙ্গনার কমল বনে মত্ত হস্তীর বিচরণ। রোজ সকালে হারমোনিয়াম সহযোগে যে মহড়ার শুরু, শেষের আধ-ঘণ্টা ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে পথের মানুষের দু'কান ভরাট করার পর তার বিরতি। পথ-চলতি যারা চেনে না তাকে, ওই আসুরিক গানের ঝাপটা খেয়ে তারা ওপরের দিকে তাকাবেই। গায়ক তখন হাত-পা নেড়ে মাথা-ঝাঁকিয়ে আরো দরাজ সুরে তাদের অভ্যর্থনা জানাবে। যারা ভালোরকম চেনে তারা তাকাবে না, আর ছাদের গায়ক তখন সরোষে তাদের দিকে গানের কলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করবে। রাস্তা থেকে পরীরাণী এই মনোহর দৃশ্যও অনেকবার দেখেছে। রাস্তায় অল্প বা মাঝবয়সী মেয়ে শ্রোতা পেলে গানের ভাবাবেগ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। তারা হেসে ফেললে গায়ক সপুলকে মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের স্তুতি জানায় কিন্তু গান থামায় না।

নাম পল্টু ঘোষাল। কেউ বলে ঘোষাল পাগল, কেউ বলে ঘোষাল গোঁসাই। কমবয়সী ফাজিল ছেলেগুলো ডাকে শিল্পী দাদা। দৈবাৎ কোন সকালে গান শোনা না গেলে তারা রাস্তা থেকে চিৎকার করে, কই শিল্পী দাদা, গান কই?

বছর চল্লিশ একচল্লিশ বয়েস হবে এখন। দেখায় পঞ্চাশের ওপরে। কালো ঢ্যাঙা চেহারা। এক-মাথা চুল তেল-জল-চিরুনির পালিশে পিছনের ঘাড় বেয়ে নামে। চোয়ালের হাড় উঁচনো, চোখ দুটো গর্তে আর সর্বদা লাল। দাদা আর বীরুমামু বলে সকালেই কষে গাঁজায় দম দিয়ে ঘোষাল পাগলা গান নিয়ে বসে। রাতে গাঁজার মাত্রা চার গুণ চড়ে বলে গান শোনা যায় না। পুলিশের পদার্পণে আজ সকালটাই ছেতরে গেছে বলে হয়তো একটু দেরীতে গানের মেজাজ এসেছে।

সিঁড়িতে ঠিক সকাল দশটায় তার ভারী জুতোর শব্দ শোনা যাবে। পরীরাণী তখন

বাইরে থাকলে তাড়াতাড়ি আড়াল নেবে। স্নান সেরে, পরিপাটি করে লম্বা চুল পিছন দিকে ঘুরিয়ে, মোটা কাপড়ের ওপর মোটা পাঞ্জাবী আর তার ওপর ছিটের সুতী কোট চড়িয়ে দশটার সময় থুপ থুপ করে নিচে নেমে যাবে। পায়ে রঙ-চটা শু। হাতে তেমনি রঙ-ওঠা পেল্লায় চামড়ার ব্যাগ একটা। ওটার পেটে হরেক রকমের লোভনীয় প্রসাধনের সামগ্রী ঠাসা। পরীরাণী জানে, কারণ সাত বছর আগে ও নিজে ওই ব্যাগ অনেকবার ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। খুব যেটা মনে ধরেছে সেটা পেয়েছেও। তখন লজেন্স চকোলেট বিস্কুট আরো কত কি পেয়েছে ঠিক নেই। লোকটা কোন এক প্রসাধন কোম্পানির পাবলিসিটি অফিসার নাকি। তার মুখেই শুনেছে প্রসাধনের স্যাম্পল নিয়ে তাকে বহু বড় বড় জায়গায় টুঁ মেরে বেড়াতে হয়। তার প্রচারের দাপটে অস্থির তারা। আগে মানুষটা আরো শৌখিন ছিল, চেহারার মতো এখন বেশভূষাও নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। গাঁজার মহিমা সম্ভবত।...আনুষঙ্গিক আরো কারণ থাকতে পারে।

ফেরে রাত্রির দিকে। কোনদিন বেশ রাত হয়। হাতে তখন প্রায়ই খাবারের ঠোঙা থাকে একটা। তার চিলেকোঠায় রাতে রান্নার পাট নেই। সকালের আহার বারো মাস বাইরে সারে। রাতে মুখ বদলাবার তাগিদে মাঝে মাঝে ঠোঙা হাতে ফেরে। পায়ের শব্দ পেলে তখনো পরীরাণী আড়াল নেয়। দৈবাৎ কখনো সামনা-সামনি পড়ে গেলে লালচে চোখ ঘোলাটে হতে দেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দেয় পরীরাণীর। একটা বিচ্ছিরি স্পর্শ সমস্ত গায়ে ওঠা-নামা করতে থাকে। দাদা এ-পর্যন্ত অনেকবার লোকটাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর মতলব এঁটেছে। তার এক কারণ লোকটার হেঁড়ে গলার গান শুনলে দাদার অনেক সময় মেজাজ বিগড়োয়। তার থেকেও বড় কারণ, লোকটা গত দশ বছর ধরে রান্নাঘর-বিহীন এই চিলেকোঠায় মাত্র পনের টাকা ভাড়া গুনে আসছে। যেমন ঘরই হোক, ওকে সরিয়ে নতুন লোক আনতে পারলে এই দিনে মাসে কম করে তিরিশ টাকা ভাড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ওকে তোলবার কথা তুললেই মা বাদ সাধে, বলে, আহা পাগল মানুষ, এতকাল ধরে আছে, থাক। তাছাড়া ঘরে এত বড় মেয়ে, কে না কে আসবে—সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। মায়ের প্রসাধনে রুচি বলেই প্রসাধন-সচিবটির প্রতি করুণা কিনা জানে না। মায়ের ড্রেসিং টেবিলে বহু রকমের প্রসাধন সামগ্রী সর্বদাই মজুত থাকে।

গাগরি কাঁখে নাগরির নতুন আবির্ভাবের ঠমকে পরীরাণীর মুখে প্রথম হাসি ভাঙলেও দেখতে দেখতে খরখরে টান ধরল।

...ওর মস্ত সুবিধে, সকলে ওকে প্রায় বোকাগোছের সরল ভাবে। অনেক কিছুই বোঝে না ভাবে। কলেজে মাত্র মাসকতক পড়েছিল। সমবয়সী চৌকস মেয়েরা তখন ওকে নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে ঠিক নেই। বলত আমাদের পরীরাণী পরীর মতই মায়ায়-ভরা, সরল। ক্লাসের কোন পাজী ছেলে যখন চিঠি দুমড়ে পাকিয়ে ফাঁক বুঝে ওর গায়ে ছুঁড়ে মারত, ও তখন হাঁ করে চেয়ে থাকত। অন্য মেয়েরা সেই মোড়ক কুড়িয়ে নিয়ে খুলে পড়ত। ওর গায়ে ঢলে পড়ে ওকে শোনাত। পরীরাণীর তখনো ওই একই মূর্তি, এক রকম ডাগর চাউনি।...পম্পা মিনতি শেফালি...কতদিন ওর জিম্মায় বইখাতা রেখে কোন ছেলের সঙ্গে একঘণ্টা দু' ঘণ্টার জন্য ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কোথায় কোথায় চলে গেছে, এমন কি ম্যাটিনি সিনেমাও দেখতে গেছে—ফিরে এসে খুশিতে

ভেঙে পড়েছে, ঠারে-ঠোরে কত রকমের কথা বলে ওকে আনন্দের ভাগ দিতে চেষ্টা করেছে—তার পরেও ওই হাঁ-করা চাউনি দেখে হতাশ হয়ে গালে ঠোনা মেরেছে, বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝে না, বিয়ের পর বর তোকে কিলোবে ধরে।

কিন্তু তখনো ওরা কেউ জানত না, পরীরাণী সব বোঝে, সব বুঝতে শিখেছে ওদেরও ঢের আগে থেকে। বয়েস যখন মাত্র চোদ্দ, ফ্রক ছেড়ে যখনো শাড়ি ধরেনি—সেই তখন থেকে। বয়েসের তুলনায় পাড়ার সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে ও-ই সবার থেকে হৃষ্ট-পুষ্ট ডাগর-ডোগর ছিল। হেসে-খেলে নেচে-কুঁদে বেড়াত, ফুটপাথে ঘর কেটে ঘুঁটি ফেলে এক্কা-দোক্কা খেলত। ধারে-কাছে বড়রা না থাকলে চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলো তখন বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি শিস দিয়ে উঠত, গা ঘেঁষে আসা-যাওয়ার ফাঁকে মুখ দিয়ে উঃ—আঃ শব্দ বার করত। ওই দজ্জাল বসন্ত পাজীটা তখন কতদিন খপ করে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে আর গায়ে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়েছে, ঠিক নেই। পরীরাণী তখন থেকেই ভয় করত ওকে। মনের তলায় রহস্য তখনো উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু অজ্ঞতার আবরণে তখনো ঢাকা সেটা। অনেকদিন কৌতূহল হয়েছে ওরা এ-রকম করে কেন?

ওই আবরণ একটু একটু পাতলা হয়ে আসছিল মায়ের আচরণে। এই নতুন মায়ের। প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই মায়ের কাছে তখন জনাকয়েক বেশ শৌখিন ভদ্রলোক আসত। নিচের তলায় তখন কোন ভাড়াটে ছিল না। কোণের দিকের যে-ঘরটায় এখন শেখর ভাদুড়ী থাকে, সেটা ওদের বৈঠকখানা ছিল। অনেকদিন বেশ রাত পর্যন্ত গল্প-গুজবের আসর বসত সেখানে। বাবারও চেনা লোক সব, বাবাও মাঝে মাঝে থাকত, কিন্তু পরীরাণী লক্ষ্য করত বাবা না থাকলেই সকলের আনন্দটা যেন বেশি জমত। আর দাদা তখন ওপরের ঘরে বসে বীরুমামুকে শুনিয়ে অনেক রকমের দুর্বোধ্য টীকা-টিপ্পনী কাটত। রাগ হলেও বীরুমামু চুপ করে থাকত। এর সব রহস্য পরীরাণী ধরতে ছুঁতে পারত না। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকমের চিন্তার স্রোতে সাঁতার কাটত। এরই মধ্যে ওর ভিতরে ভিতরে কিছু একটা পরিবর্তনের কারিকুরি চলেছে। শরীরটার ধাঁচ যেন বদল হতে চলেছে। ভিতরে তার কানাকানির আঁচ পাচ্ছে।

অজ্ঞতার পরদাটা আচমকা ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার করে দিয়েছিল ওই পল্টু ঘোষাল, গাগরি কাঁখে নাগরীর ঠমক দেখে যে আর্তনাদ করছে। ওই লোকের সঙ্গেই পরীরাণীর তখন সব থেকে বেশি খাতির। তাকে নিয়ে কত রকমের মজা করত ঠিক নেই। ওর নিজের মা ও-ভাবে মারা যাবার পর বেশ কিছুকাল ছাদে ওঠা বন্ধ ছিল। সন্ধ্যার দিকে তো উঠতই না। গা ছমছম করত। ওই ছাদ থেকেই মা মরণ-ঝাঁপ দিয়েছিল।

ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল পাগলা ঘোষাল। কেন ছাদে ওঠা বন্ধ টের পাবার পর নানা অছিলায় ওকে ধরে নিয়ে যেত। আটকে রাখত। বলত, মরে পেত্নী হয়ে তোর মা তোরই ঘাড় মটকাবে নাকি—ভয় পেতে লজ্জা করে না? ওকে সাহস দেবার জন্যেই অন্ধকারে একলা ছাদে ঘুরে ঘুরে অনেক রাত পর্যন্ত গলা ছেড়ে গান গাইত।

ভয় ভাঙতে পরীরাণীর ছাদে ওঠা ক্রমে বাড়ছিল। ছাদে পড়াশোনা, ছাদে হুটোপুটি করা, গান শোনা। সেই সঙ্গে লোকটার ঘুষ দেওয়াও বাড়ছিল। লজেন্স চকোলেট বিস্কুট আচার স্নো পাউডার। এ-সব পাওয়ার একমাত্র শর্ত গান শুনতে হবে।

যখন তখন বলত, এই, গান শুনবি? পরীরাণী তক্ষুণি মাথা ঝাঁকাত, শুনবে না।

—শুনলে লাভ হবে, না শুনলে পস্তাবি।

পস্তাতে আর কে চায়, লাভের লোভে গান শুনতে বসত। দম ফেটে হাসি পেলেও পস্তাবার ভয়ে হাসতে পারত না। গান শেষ হলে লাভের জিনিসটা মিলত। এ ছাড়াও লোকটার ওপর মায়া পড়ে গেছল পরীরাণীর। আ-হা, তিন কূলে কেউ কোথাও নেই, গানের পাগলামী মাথায় চেপে আছে, হাসি চেপে না হয় শুনলই খানিকক্ষণ বসে। তাছাড়া মজাও তো মন্দ লাগে না, গানের সময় হাত-পা ছোঁড়া আর অঙ্গভঙ্গি দেখলেও না হেসে থাকতে পারাটা কি কম ব্যাপার। অনেক চেষ্টা করে পরীরাণী মুখ বুজে সমঝদারের মতো শোনাটা রপ্ত করেছিল। প্রতিদানে পরীরাণীর লাভের পরিমাণও বাড়ছিল।

...সাত বছর আগের কথা, পরীরাণীর মাত্র চোদ্দ বছর বয়েস তখন, আর এই লোকের তেত্রিশ চৌত্রিশ। ও-রকম একটা বিভীষিকা কে কল্পনা করতে পারে?...সন্ধ্যার পর ওপরে ওঠার মুখে দেখা। বলল, আমার ঘরে আয়, নতুন জিনিস পাবি একটা—

কৌতূহল সত্ত্বেও পরীরাণী বলেছিল, আমি বাপু এখন গান শুনতে পারব না, স্কুলের অনেক পড়া আছে—

—তাহলে পাবি না।

—কি নতুন জিনিস?

—কাটলেট।

শোনামাত্র পরীরাণীর জিভে জল। এমন উপাদেয় বস্তু পৃথিবীতে আর ক'টা আছে। দাদা ক্বচিৎ কখনো রেস্টুরেন্ট থেকে এনে দেয়। ক'দিন পর্যন্ত মুখে যেন তার স্বাদ লেগে থাকে।

খানিক বাদে ওপরে উঠেছিল। হাত-মুখ ধুয়ে লোকটা তখন হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে। হাসি-হাসি মুখে কি গাইল জানে না। কিন্তু কথাগুলো কেমন বিচ্ছিরি লাগছিল কানে। ঠুংরি গান নাকি। থামতে পরীরাণী বলেছিল, অত জোরে গেয়ো না, একতলায় মায়ের কাছে ভদ্রলোকেরা এসেছে, মা রেগে গেলে তেড়ে আসবে।

থমকে লোকটা মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর কি রকম করে যেন হেসেছিল। —মায়ের কাছে ভদ্রলোকেরা এসেছে, তোর বাবা কোথায়?

—বাড়ি নেই।

—তোর দাদা আর মামু?

—তারাও নেই। কাটলেট কই?

—হবে হবে। হারমোনিয়ামে এবারে চাপা গলায় গান ধরল। ওর দিকেই চেয়ে ছিল। হাসছিল। চাউনি আর হাসি দুই-ই কি-রকম লাগছিল। গানের মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ক'টা কাটলেট খাবি?

একটার বেশি কখনো খায়নি পরীরাণী।—ক'টা এনেছ?

—তিনটে। হারমোনিয়াম ঠেলে সরাল।

—এদিকে আয়।

কাটলেটের প্রত্যাশায় একটু কাছে আসতেই কাঁধ ধরে ওকে একেবারে গায়ের ওপর টেনে নিল লোকটা। গায়ে পিঠে হাত দেওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু সেই রাতের ভাবগতিক একেবারে নতুন ঠেকল। পরীরাণী হঠাৎ দিশেহারা হতচকিত একেবারে।

কাটলেট দেবার বদলে যেন গায়ের মাংস টেনে ছিঁড়ে খাবার মতলব লোকটার। সেই সঙ্গে হাড়গোড় সুদ্ধ ভাঙতে চায়। পরীরাণী কাতরে উঠতে ফিসফিস করে বলল, চুপ। কিচ্ছু ভয় নেই, তোর মা এখন ফূর্তিতে আছে, আমি দেখে এসেছি—তিনটে কাটলেটই তোকে দেব—

ভয়ে বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত পরীরাণীর। মুখের ওপর ধক-ধক করছে দুটো চোখ, দু-হাতে গায়ের মাংস ছিঁড়ছে আর হাড় ভাঙছে, একটা পশু যেন খাবে ওকে এবার, খাবেই। তারপর কি যে হল পরীরাণী জানে না, নিজের একটা আর্তনাদ কানে এল, আর আচমকা আঘাতে লোকটার হাত-দুটো ওর শরীর থেকে খসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে নিচে ছুটল পরীরাণী।

...তারপর এই সাত বছরের মধ্যে আর ছাদে ওঠেনি। মা কাপড়-চোপড় শুকোতে দেবার কথা বললেও মুখ ঝামটা দিয়েছে, পারব না। কাউকে কিছু বলতে পারেনি। শুধু মুখ বুজে গুমরেছে।

পুরুষ মানুষ নামে এক জীব সম্পর্কে সেই চোদ্দ বছর বয়েস থেকেই সচেতন পরীরাণী।

বেলা দশটা বেজে গেল। দাদার দেখা নেই এখনো। বীরুমামুরও না। পরীরাণীর ভিতরটা উতলা আবার। তরকারির কড়াটা নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাবু এতক্ষণে খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে যাবার তোড়জোড় করছে নিশ্চয়। ওর দুশ্চিন্তা দেখলে ধমকাবে তবু আর একবার নিচে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওই ঠাকরোনটির জন্য, শেখর ভাদুড়ীর মায়ের ভয়ে সেদিকে পা সরল না।

ছাল-ওঠা তেরছা-মুখো বাড়িটার দিকে চোখ পড়তে ধাক্কা খেয়ে উঠল একপ্রস্থ। দোতলার জানালায় ওই আর এক পশু দাঁড়িয়ে। তিনতলার আধ-বয়সী পল্টু ঘোষালের মতো নয়। ঢের ঢের বেশি দুর্দান্ত আর বেপরোয়া শয়তান। বসন্ত সরখেল। বয়েস মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ। পাড়ায় ছোট-বড় সকলে ভয় করে, আর সম্ভব হলে এড়িয়ে চলে। এই একজনকে যদি কেউ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারে পরীরাণীর আফশোস হয় না। শনি শনি, ওর জীবনের সব থেকে বড় শনি ওই বসন্ত সরখেল।

...সেই দুঃস্বপ্নের বোঝা ঘুমের মধ্যে এখনো বুকে চেপে বসে।

ড্যাব ড্যাব করে চেয়েছিল ওর দিকে। চোখাচোখি হতেই কুৎসিত হাসি। কপালে মস্ত একটা পুরনো ক্ষতচিহ্ন, সেটাও যেন হাসছে।

একটা ঝাঁকুনি খেয়েই ঘরে ফিরে এলো পরীরাণী। মাঝে একটা মাসের জন্য এই উপদ্রব বন্ধ হয়েছিল। দাদা আশ্বাস দিয়েছিল, বসন্ত সরখেল টিট হয়ে গেছে, আর তোকে ভয় করতে হবে না।

একটা মাসের মধ্যে পরীরাণী সত্যিই আর কোন রকম বেচাল দেখেনি। ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলেও অচেনা মানুষের মতো অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে বসন্ত সরখেল। পরীরাণী কত যে নিশ্চিন্ত হয়েছিল ও-ই জানে। মনে মনে এজন্যে আর এক অ-দেখা অ-জানা দুর্দান্ত মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কিন্তু আজ আবার হঠাৎ এ কি দেখছে? শয়তানটার ভয় ভেঙে গেল নাকি! সকালে উঠেই ওই কুৎসিত চাউনি আর

কুৎসিত হাসি দেখেছে। হঠাৎ যোগাযোগ ভেবেছিল! কিন্তু এখন সে-রকম লাগছে না।

বঁটি নিয়ে বসল। বাজার হয়নি, মাছের বালাই নেই। একটু ভাজা-ভুজি না হলে বাবা খেতে পারবে না। দুটো আলু ছাড়াতে বসে মনে মনে এই বঁটিটাই পাজীটার গলায় বসাতে ইচ্ছে করছিল পরীরাণীর। সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। খুব ছোট ছিল যখন তখন হাত ধরে টেনেছে, ফাঁক পেলে গায়ে ধাক্কা দিয়েছে। তারপর পাজীটার ষোল সতের বছর বয়েস হতে ওই চোখ দেখেই একশো হাত দূরে পালাতে ইচ্ছে করেছে পরীরাণীর। চাউনিটা দিনে দিনে কুৎসিত হয়েছে—পরীরাণীর পনের ষোল বছর বয়েসের পর থেকে যে করে তাকাত, মনে হত ওই চোখ দিয়েই যেন গায়ের কাপড় খসিয়ে নিচ্ছে। শেষে এই মাসখানেক আগে...

ইস!

তপ্ত মুখে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে আলু কাটতে গিয়ে বঁটিতে আঙুল কেটে গেল। ভালো রকমই কাটল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত। অন্য হাতে কাটা আঙুলটা চেপে ধরল পরীরাণী। তারপর বাবা আসছে দেখেই আঙুলটা তাড়াতাড়ি মুখে পুরল।

—কি করছিস? বাবা সামনে এসে দাঁড়াল।

জবাব দিল না। চট করে বাবা একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল। মায়ের অগোচরে কিছু বলতে চায়। মা বাথরুমে! গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁরে, তোর দাদাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল কেন? তোর মাকে তখন কি বলছিলি? কে খুন হয়েছে?

—জানি না। দাদার চেনা, তার কাকে সন্দেহ হয় জানার জন্যে...

—হুঁঃ, বলল আর তুই বিশ্বাস করলি। ও-সব ভাঁওতা, আসলে পুলিশ তোর দাদাকেই সন্দেহ করেছে, বুঝলি? বীরু থানায় গেছল, ফিরছে না কেন—ওকেও আটকেছে নিশ্চয়।

কাটা আঙুল ভুলে পরীরাণী বিমূঢ় মুখে বাবার দিকে তাকাল। ভয় বা দুশ্চিন্তা দূরের কথা, বাবার চোখে-মুখে খুব চাপা আনন্দ উছলে উঠছে।

বাবা আরো কাছে সরে এল। আরো ফিসফিস করে বলল, এদের সকলের এই দশা হবে, সকলের—বুঝলি? শোন, আমাব যদি হঠাৎ শরীর খুব খারাপ হয়েছে দেখিস তো আগে পুলিসে খবর দিবি, পবে ডাক্তারকে। ভালো করে শুনে রাখ, ভুলিস না, আগে পুলিস পরে ডাক্তার—তারপর দেখবি মজাখানা কি রকম হয়। আমাকে কাঁচা ছেলে ভেবেছে সব—কি হতে পারে না পারে থানায় আমি রিপোর্ট করেই রেখেছি—বুঝলি? খবদ্দার কাউকে বলবি না—কাউকে না—আরে বোকা, বাড়িটা তো তখন তোর একলার হবে, তোর খাওয়া-পরার ভাবনা কি—ওই বীরু হারামজাদা যদি তোর দাদার সঙ্গে কলে নাও পড়ে ওর দিদির সঙ্গে পড়বেই, তুই নিশ্চিন্ত থাক—

বাবার মুখে হাসি, চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে। এমন একটা আনন্দেব খোরাক যেন শিগগির জোটেনি। ওকে নিশ্চিন্ত করে যেমন এসেছিল তেমনি সরে গেল। পরীরাণী নির্বাক বসে।

দুপুর গড়াতে চলল। দাদা বা বীরুমামুর দেখা নেই। পরীরাণীর মনে এখন সত্যিকারের ভয় ঢুকেছে। ঘুরে ফিরে ক'বার রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক নেই। তার মধ্যে আরো বার দুই তিন ওই তেরছামুখো ছাল-ওঠা বাড়ির শয়তানটার সঙ্গে দেখা হয়েছে, চোখাচোখি হয়েছে। আর তক্ষুণি ওকে বারান্দা থেকে চলে আসতে

হয়েছে।...সেই আগের মতোই কুৎসিত কদর্য লোভী চাউনি। দাদাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আর এক শঙ্কাও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ওই পাজী বসন্ত সরখেলের সম্পর্কে একটা মাস নিশ্চিন্ত ছিল, সাপের মাথায় ধুলো পড়েছিল। হঠাৎ আজ আবার ওর রকম-সকম অন্য রকম লাগছে। যে অদেখা লোকটার দাপটে আর শাসানিতে ওই পাজী একটা মাস ভাল-মানুষ সেজে বসে ছিল—তার ভয়-ডর ভেঙে গেল নাকি? একমাস বাদে এই সাহস কেন?

পরীরাণীর কিছু ভাল লাগছে না। কিচ্ছু না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা মনের তলায় জমাট বাঁধছে। আশঙ্কা দাদাকে নিয়ে, বাবাকে নিয়ে, কিছুটা মা আর বীরুমামাকে নিয়ে—সব থেকে বেশি নিজেকে নিয়ে।...সকালটা আজ অন্যরকম মনে হয়েছিল। আবর্জনা স্খলনের দিন মনে হয়েছিল। কিন্তু উল্টে এই দিনের আবর্জনা আরো দ্বিগুণ জমে গেল।

মা-বাবা সময়মত খেয়ে দেয়ে ঘুমুচ্ছে এখন। বেলা দেড়টা নাগাদ পরীরাণীও খেয়ে নিয়েছিল। দাদা আর বীরুমামুর খাবারটা ঢাকা আছে। ও-রকম প্রায়ই থাকে। পরীরাণী ভেবেছিল ওরা ফিরলেই ঘটনাটা শুনে নিয়ে ও সেলাইয়ের স্কুলে চলে যাবে। পারতপক্ষে একদিনের জন্যও সেলাইয়ের স্কুল কামাই করে না। দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওই কয়েক ঘণ্টার জন্য যেন সুস্থ আলো-বাতাসের স্বাদ মেলে। তাছাড়া ওখানকার শিক্ষাটুকুই পুঁজি এখন। সেখানকার মায়াদি অর্থাৎ বড়দির সঙ্গে এরই মধ্যে ওর খুব ভাব হয়ে গেছে। ওর কাজ দেখে আর আগ্রহ দেখে মহিলা স্নেহ করে ওকে। গল্পের ছলে পরীরাণীর ঘরের কথা অনেক জেনে নিয়েছে। ভালো করে কাজ শিখলে আর সব ক'টা ডিপ্লোমা ভালোভাবে দখল করে বসতে পারলে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই কিছু একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে। হবে না কেন, কত জনের তো হচ্ছে। এই মায়াদিই শুনেছে এখানে এসেছিল পঁচিশ বছর বয়েসে বিধবা হয়ে। লেখাপড়া জানত না, নিঃসম্বল। এখন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস তার, বাড়িতে তিন-চারটে পোষ্য—দিব্বি চালাচ্ছে। এই কলকাতাতেই সংস্থার বহু শাখা, কলকাতার বাইরেও অনেক আছে—কাজের জোরে সেভাবে চোখে পড়তে পারলে ওরই বা হবে না কেন? ন'মাসের প্রথম ডিপ্লোমা তো ছ'মাসেই পেয়ে বসে আছে, তাও যেমন তেমন করে নয়, সক্কলকে ডিঙিয়ে।

তিনটে বেজে যাবার পরেও দাদা বা বীরুমামুর দেখা নেই। দুশ্চিন্তা নিয়ে আর ঘরে বসে থাকা গেল না। সেলাইয়ের স্কুল গেলে খানিকটা সময় কেটে যাবে। স্কুল থেকে এসে নিশ্চয় দেখবে দাদা ফিরেছে। কি আর হতে পারে, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দাদা যে কাল সুধীর সান্যালদের বিয়েবাড়িতে ছিল তাতে তো আর সন্দেহ নেই। দরকার হলে সেই ভদ্রলোকই সাক্ষী দেবে। সুধীর সান্যালদের খবর দিয়েই বীরুমামুর থানায় যাবার কথা, দেখা পেয়েছে কিনা কে জানে। নইলে ভদ্রলোকের একটা টেলিফোনেই তো কাজ হবার কথা—মন্ত্রী আর বড় বড় হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে দহরম-মহরম, তাই থানার লোকেরাও তাকে রীতিমত সমীহ করে।

যাক, ফিরে এলেই শোনা যাবে সব।

হাতে-কাচা মাড়-দেওয়া আর গরম ঘটি দিয়ে ইস্ত্রি-করা জামা আর শাড়িটা পরে সেলাইয়ের থলে হাতে নিচে নেমে এল। রাস্তায় নামার আগে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কোণের

ঘরের বাইরের দিকের দরজা খোলা। অর্থাৎ ঘরের বাসিন্দা স্কুল সেরে ফিরে এসেছে। নির্ভরতা বেশির ভাগ সময়ে মানুষকে দুর্বল করে। পরীরাণীরও তাই হল। তাড়াতাড়ি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।...সামনে কাগজ-পত্র ছড়ানো, ঘাড় গুঁজে লিখছে কি।

—দাদারা তো এখন ফিরলো না।

শেখর ভাদুড়ী মুখ তুলে তাকাল। ওর দুশ্চিন্তার কারণটাও চট করে মনে পড়ল না যেন। তারপর পড়ল।—ও...দাদারা মানে?

—বীরুমামুও সেই সকালেই থানায় খোঁজ করতে গেছল।

—আর সেই থেকে বসে বসে ভাবছ তুমি?...মেয়ে আর কাকে বলে। তারা তো সুবোধ বালক নয় যে ফাঁক পেলেই ঘরে এসে বসে থাকবে। দেখি, না ফেরে তো রাত্তিরের দিকে খবর নেব'খন, এর আগে আর সময় পাব না, বিকেলে ময়দানে বড় মিটিং আছে একটা, সেই কাজ করছি। চাউনিটা ঈষৎ উৎসুক যেন।—তুমি যাবে সঙ্গে? চল না—কেবল ঘরে বসে থাকলে আর সেলাই করলে চোখ খুলবে কেন?

পরীরাণী সভয়ে বলে উঠল, মিটিং-এ গিয়ে আমি কি করব?

—কত লোক আর কত মেয়ে যাবে দেখ'খন, মেয়ে টিচার কলকাতার শহরে কম নাকি! বাইরে থেকেও অনেকে আসবে। ভিতরে এসে বোসো, চারটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।

—না না, আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি...আপনি ফিরে এলে শুনব'খন।

—সেলাইয়ের স্কুল? হাসির ফাঁকে ব্যঙ্গ ছড়াল একটু।

পরীরাণীর হঠাৎ রাগ হয়ে গেল কেমন। মুখের ওপর কথা বলতে এই লোকই শেখাচ্ছে ওকে। জবাব দিল, সেলাইয়ের স্কুলই তো, আপনাদেরগুলো লাট-বেলাট হবার স্কুল নাকি?

না দাঁড়িয়ে তর-তর করে রাস্তায় নেমে এল। তারপরেই হাসি পেল। ওদিকে বাবুরও রাগ হয়ে গেল বোধহয়। হোক গে। যা বলবে তাই করা চাই—কেন? আরো বেশি হাসি পাচ্ছে। আসলে ইচ্ছে হয়েছিল, ও সঙ্গে যাক। উৎসুক চাউনি দেখেই বুঝে নিয়েছে। সকালে ওই গোছেরই দেখেছিল। এখন আর একটু বেশি।...কেন?

ভাবতে লজ্জা পাচ্ছে পরীরাণী, কিন্তু না ভেবে পারছে না। ওর ভালো জামা বা ভালো শাড়ি নেই একখানাও। দু-একখানা মোটামুটি গোছের ভালো আছে, বেশি পরলে ছিঁড়বে ভয়ে সেগুলি কমই পরে। নিজের হাতে কেচে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে এই শাদামাটা জামা-কাপড়ই পরে সর্বদা। বাইরে বেরুবার সময় আর একটু যত্ন করে পরে, এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতেও রাস্তার অনেক ছেলের দৃষ্টি ওর দিকে ঘোরে-ফেরে লক্ষ্য করেছে। অনেকের বিরক্তিকর লোভের আঁচও গায়ে বেঁধে অনেক সময়। অথচ ও যে রূপসী নয় নিজেও জানে। মা-বাবা বাড়ি না থাকলে মায়ের ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অনেকবার খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে নিজেকে। মুখখানা নিজের চোখেই ঢলঢলে মিষ্টি লাগে অবশ্য, আর স্বাস্থ্যও অবাধ্যরকমের ভালো মনে হয়, তা বলে চোখের মাথা খেয়ে নিজেকে রূপসী বলতে রাজী নয় পরীরাণী। ওর টানা কালো চোখের প্রশংসা অবশ্য সকলেই করে (পরীরাণী নিজেও), কিন্তু এ-দেশে রূপের আসল বিচার যেটা অর্থাৎ গায়ের রঙের পরীক্ষায় তো টায়ে-টোয়ে পাশ বললেও বেশি বলা হবে যদি মা সামনে থাকে। দাদাও ওর থেকে ফর্সা। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে এত দেখেছে যে পুরুষের চাউনির রকম-

ফের ও ভালোই বুঝতে পারে। অনেক সময় রাগ হয় বটে, আবার মজাও মন্দ লাগে না। মাসখানেক আগে, সেই সর্বনাশা দুর্যোগে পড়ার আগে, মজার সঙ্গে একটা খুশির আমেজ লেগে থাকত। এখন পুরুষের চাউনির এই রকম-ফের দেখলে ভিতরে ভিতরে জ্বলে ওঠে। চোখগুলোকে উপড়ে তুলে আনতে ইচ্ছে করে।

...শেখর ভাদুড়ীর চাউনিতে আর ওকে সঙ্গে নেবার আগ্রহে সেই রকম-ফেরেরই আভাস পেয়েছে। ও বুঝতে পেরেছে জানলে বাবুর অহঙ্কারে ঘা পড়বে, বকে-ঝকে ওকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে, কিন্তু না বোঝার মতো অত কাঁচা মেয়ে নয় পরীরাণী।...এই একজনের বেলায় রাগ দূরে থাক উল্টে ভালো লাগছে। তাই নিজের কাছে নিজের সংগোপন লজ্জা।

সেলাইয়ে তেমন মন বসল না আজ। দাদা ফিরল কিনা কে জানে। ঘণ্টা দেড়েক নিজেকে জোর করে আটকে রেখে আবার বেরিয়ে পড়ল।

একটু বাদেই বিষম চমকে উঠল। তারপর স্নায়ুতে স্নায়ুতে দাপাদাপি। মুখ লাল। কোথাও ওৎ পেতে ছিল নিশ্চয়, একেবারে গা ঘেসে এসে দাঁড়াল। ওর জীবনের মূর্তিমান উপগ্রহ বসন্ত সরখেল।

—কি খবর?

পরীরাণী কি করবে, হাতের সেলাইয়ের ঝোলাটা সজোরে মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবে, না যত জোর আছে গালের ওপর চড় কসাবে একটা? হন হন করে পা বাড়াল। কিন্তু ওই ঢ্যাঙা লোকের সঙ্গে পারবে কেন। সেও সঙ্গ নিল। মুখের হাসিতে যেন কালি ঝরছে। বলল, মিছিমিছি অত জোরে হেঁটে হাঁপাচ্ছিস কেন—

পরীরাণী চকিতে রাস্তার দু'পাশ দেখে নিল। দিনমানে এত লোক চলাচলের মধ্যে ত্রাসের কারণ নেই। তবু বুকের তলায় কাঁপুনি. ধুপধাপ হাতুড়ির ঘা। সেই সঙ্গে রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ। অফুরন্ত।

মুরুব্বির সুরে বসন্ত সরখেল বলল, সেলাই চলছে কেমন, প্যান্ট শার্টের কাজ শিখেছিস? আমারটা বানিয়ে দিলে ভালো মজুরী দেব—

মাঝের ব্যবধান বাড়াতে চেষ্টা করে দ্রুত হাঁটছে পরীরাণী। রাস্তার লোকের সাহায্য নেবে কিনা তাও ভাবছে। সামনের বাঁক নিলে বড় রাস্তা ফুরোবে—সেখানে লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম। হাব-ভাব যা দেখছে গায়ে হাতও দিতে পারে। নরকের কীট, আর তেমনি দুর্দান্ত বেপরোয়া। পাশে পাশে চলেছে, তাইতেই যেন একটা পিচ্ছিল স্পর্শ সর্বাঙ্গে কিলবিল করছে।

বাঁক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা দুর্বার ক্রোধের আকার নিল। রাস্তার ধারে সরে যেতে চেষ্টা করে জ্বলন্ত চোখে তাকাল একবার। একটু বেচাল দেখলে মরুক-বাঁচুক পায়ের থেকে স্যাণ্ডেল খুলে নাকে চোখে মুখে আচমকা বসিয়ে দেবে কয়েক ঘা।

—ওঃ! ভস্ম করবি নাকি আমাকে? চাপা গলায় হেসে উঠল।—মাইরি বলছি, তোর ওই চোখ দেখেই মরেছি আমি, এখন ছুরির ফলার মতো দেখাচ্ছে, তাইতে আরো ভালো লাগছে।

পরীরাণী স্যাণ্ডেল খোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কথার ফাঁকে-ফাঁকে যে-রকম এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, গায়ে হাত দেবে মনে হয়।

মুখ দেখে পাজীটা মতলব টের পেল কিনা জানে না। গলার সুর বদলাল, মুখের হাসিও। চাপা হিসহিস শাসানি।—তোর গুমোর আমি ভাঙছি। সম্মান দিতে চেয়েছিলাম সেটা পায়ে ঠেলেছিস, তোকে খাবই আমি, দেখি কে রক্ষা করে—

আর সঙ্গ নিল না। শেষ দণ্ড ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে গেল। একবারও ফিরে না তাকিয়ে পরীরাণী আরো দ্রুত হেঁটে চলেছে। মুখ ঘেমে উঠেছে, জামার ভিতরেও। বুকের ধপধপানি বাড়ছে বই কমছে না।

আবার বাঁয়ে বাঁক নিতে সামনে বাড়ি। চলার গতি শিথিল হল। হাঁপিয়ে গেছে। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ভিতরে যেন প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে একটা। পরীরাণী ভালো করে ভাবতে পারছে না কিছু। যে দুঃস্বপ্নের বোঝা অপগত ভেবেছিল সেটা আবার ফিরে এল কি করে বুঝতে পারছে না। যে ভয়ে একটা মাস নখ-দন্ত গুটিয়ে ছিল শয়তানটা, সে ভয় তার ভাঙল কি করে ভেবে পাচ্ছে না। এই একটা মাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরে একটু একটু করে পরীরাণীর মনের রঙ বদলাচ্ছিল, তার ওপর কদর্য থকথকে কালি পড়ে গেল। শয়তানের ভয় ভেঙেছে বুঝতে পারছে। সকাল থেকেই তার নজির মিলছে। কিন্তু কেন ভেঙেছে? কেন কেন কেন?

বাড়ি। নীচের কোণের ঘর বন্ধ। এতবড় দুনিয়ায় ওকে একটু আশ্রয়, একটু নির্ভরতা দেবার যেন কেউ নেই এমনি একটা শিথিল অবসাদ নিয়ে পা দুটোকে টেনে টেনে ওপরে উঠে এল।

সামনের ঘরে শতরঞ্চি পেতে দাদা আর বীরুমামু বসে। একটু আগে দুজনেই স্নান করেছে মনে হয়। তবু দুজনেরই ক্লান্ত মুখ। বীরুমামু নিঃশব্দে বিড়ি টানছে।

ওকে দেখে দাদা বলল, অবেলায় আর ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, দু'খানা রুটি করে দে না, যা আছে তাই দিয়ে খেয়ে নিই।

—দিচ্ছি।...এত দেরী হল কেন, কোথায় গেছলে?

—শ্মশানে। কাজ চুকিয়ে এলাম।

পরীরাণী নির্বাক হঠাৎ। কার অঘটন জানে না, তবু অনাগত ছায়ার মতো একটাই শঙ্কার পদক্ষেপ মনের তলায়।

তাই। তাই। পরীরাণীর আগেই বোঝা উচিত ছিল। আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। বোবা মূর্তি। দাদার কথাগুলো মগজের মধ্যে কেটে বসেছে।

...খুন হয়েছে মাখন মজুমদার। কোথাকার একটা জলার ধারে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পেটে বুকে পিঠে মাথায় মুখে কম করে বিশ বাইশটা ছুরির ঘায়ে খতম করা হয়েছে তাকে। পুলিসের হাত থেকে ডেড-বডি পেতে দেরি হয়ে গেল, তারপর লোকটার বিধবা মায়ের সে-কি আছাড়ি-পিছাড়ি আর্তনাদ, আর কচি বউটার সেই পাথর মূর্তি। বউটা দেখতে বেশ সুশ্রী। সেখান থেকে শ্মশানে, তারপর কাজ চুকিয়ে বাড়ি। সান্যাল মশাইও শ্মশানে গেছল দেখতে, বউটার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না, তাকে দেবার জন্য আমার হাতে পাঁচশ টাকা দিয়েছে—এই নে, তোর বাক্সয় খুব সাবধানে রাখ, কাল নেব।

হাঁটুর নিচে চাপা টাকাগুলো তুলে ওর সামনে ধরল।

হাত বাড়িয়ে পরীরাণী টাকা নিল। ভিতরে ভিতরে একটা কাটা-ছেঁড়া চলেছে, থেকে থেকে শিউরে উঠছে, কিন্তু বাইরে কলের মূর্তি। মাখন মজুমদার নামে কোন মানুষকে পরীরাণী চোখেও দেখেনি কোনদিন। দাদার সঙ্গে আগে তার অল্প-সল্প পরিচয় ছিল, ইদানীং খাতিরটা জমাট বেঁধেছিল পরীরাণীকে কেন্দ্র করে। খাতির করিয়ে দিয়েছিল দাদার মুরুব্বি সুধীর সান্যাল। মাখন মজুমদার তার ডান হাত। নানা কারণে ও-রকম দু-একটা হাত টাকার জোরে দখলে রাখতে হয়। একটা মস্ত এলাকার ত্রাস ছিল যে, সে মাখন মজুমদার, পাড়া ছেড়ে বেপাড়ার মানুষও তার বিরাগভাজন হতে চাইত না। দাদা বলত, মাখন গুণ্ডার নাম শুনলেই সকলের মুখে মাখনের দলা। যেমন বুকের পাটা, তেমনি শত্রু নিধনে সিদ্ধহস্ত। এই গোছের শৌর্যের প্রশংসা বা তার সঙ্গে মাখামাখি পরীরাণীর একটুও পছন্দ নয়। বরং স্বভাবগত আর রুচিগত বিতৃষ্ণা। তবু ওই এক অদেখা অচেনা লোককেই মনে মনে শ্রদ্ধা করত পরীরাণী। তার মঙ্গল আর সেই সঙ্গে তার সুমতিও কামনা করত।

...কারণ ওই লোকই একটা মাসের জন্য রাহুর ছায়ামুক্ত করেছিল তাকে। তার ভয়েই বসন্ত সরখেল ভদ্রতার মুখোশ পরে আড়ালে সরে ছিল।

হঠাৎ কি মনে হতে একটা ঝাকুনি খেয়ে সচেতন হল যেন।

—দাদা!

পরীরাণীর গলার স্বর চাপা কিন্তু তীক্ষ্ণ। দাদা আর বীরুমামু দুজনেই অবাক একটু।

—পুলিসের কাছে কাকে সন্দেহ হয় বলেছ? বসন্ত সরখেলের নাম করেছ?

—বসন্ত সরখেল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠল পরীরাণীর, মুখ লাল।—আজ ভোর হতে না হতে তার অন্যরকম হাবভাব, সেই সকাল থেকেই তার অন্য রকম ব্যবহার...আগের মতো। তার মানে গত রাতের খুনের খবর সে ভোর হবার আগেই জানে। দলে না থাকলে কি করে জানে?

বোনের কথা শুনে আর সেই সঙ্গে চাপা উত্তেজনা দেখে দাদা পরিতোষ হকচকিয়ে গেছল একটু। সবটা শোনার পর মন্তব্য করল, জানে বলেই দলে ছিল নাকি, জানে তো সকলেই, কাল রাতে এ পাড়ায় পর্যন্ত এ নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে শুনলাম, বিয়েবাড়িতে ছিলাম বলে কেবল আমরাই জানতাম না।...সুধীর সান্যালের কাছেও কাল রাতেই খবর গেছল, বিয়েবাড়ি বলে ভদ্রলোক চেপে গেছে।

একটা অব্যর্থ অস্ত্র ফসকালে যেমন অবস্থা হয়, উত্তেজনা গিয়ে পরীরাণীর তক্ষুনি সেই রকম মনের অবস্থা। কিন্তু এবারে দাদার চোখ দুটো খরখরে!—সকাল থেকে বসন্তের অন্যরকম ব্যবহার বললি, কি করেছে?

জবাব শোনার জন্য বীরুমামুও উৎকর্ণ। পরীরাণী দুজনের দিকেই তাকালো একে একে। তারপর ঠাণ্ডা মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ওদের খাবার বানাতে বসার আগে শাড়িটা বদলাবার জন্য নিজের খুপরি ঘরে ঢুকল। শরীরটা যেন অবসাদে ভেঙে পড়ার দাখিল। একটু শুতে পারলে হত। ও কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পায়, শুনতে পায়। কিন্তু সব সময় দেখতে চায় না, শুনতে চায় না। এখন একটুও চাইছে না। তবু সেগুলো আসছে। একটা বুড়ীর আর্তনাদ। আর সদ্যবিধবা একটা

কচি বউয়ের বোবা মুখ। বউটা দেখতেও সুশ্রী নাকি। কিন্তু পরীরাণীর এই মনের অবস্থা কি ঠিক সেই কারণে?...না, ওই এক অদেখা অজানা লোকের মৃত্যুতে ওরও নিরাপত্তা গেছে, একধরনের নির্ভরতা গেছে। আর, একান্ত নিভৃতে মনের তলায় রং বদলের যে সূক্ষ্ম কারুকার্য চলছিল, অজ্ঞাত আশঙ্কায় সেটা বিবর্ণ ঠেকছে।

◆

...সেই আতঙ্ক, সেই দুঃস্বপ্নের বোঝা ঘুমের মধ্যে এখনো পরীরাণীর বুকের ওপর চেপে বসে।

ঘটনাটা ঘটেছিল আজ থেকে এক মাস দশ দিন আগে। তারও অনেক আগে থেকে এর প্রস্তুতি চলেছিল। ঝড়ের খবর সকলেই রাখে, কিন্তু ঝড়ের মুখে না পড়া পর্যন্ত তার আতঙ্ক ঠিক-ঠিক অনুভব করবে কি করে?

পরীরাণী ঝড়ের নিশানা দেখেছিল। কিন্তু তা বলে একেবারে ওটার হাঁ-করা মুখে গিয়ে পড়বে ভাবেনি। কেউ ভাবেনি। দাদা না, বাবা না, মা না, বীরুমামু না। নিচের ঘরে শেখর ভাদুড়ীও না। না, নিচের ওই একজন ঝড়ের খবরও রাখত না, কিছু জানতই না।

পরীরাণী যখন কলেজে যাতায়াত করে তখন থেকে ওই বসন্ত সরখেল বেশ প্রস্তুত হয়ে এর পিছনে লেগেছিল। তার আগে রাশি রাশি কটাক্ষ আর হাসি ছোড়া, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর ফাঁক পেলে কাছে ঘেঁষার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তিক্ত বিরক্ত হলেও পরীরাণী গায়ে না মাখতেই চেষ্টা করেছে। ডানপিটে রকবাজ ছেলের ফষ্টিনষ্টি ভিন্ন আর কিছু ভাবেনি। কলেজে যাতায়াতের পথে সে দু'বেলা নিয়মিত সঙ্গ নিতে থাকল। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পেত, আর বিকেলে বাস থেকে নামলেই।

প্রথম দিন টের পায়নি বোধ হয়, দ্বিতীয় দিনে যাবার পথে ওর ওপর চড়াও হয়েছিল।—কলেজে ভর্তি হয়েছিস শুনলাম?

ছেলেবেলা থেকে দেখছে, তুই-তোকারি করে কথা বলত। এখন সেটা খচখচ করে কানে বেঁধে পরীরাণীর। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। পাজীটাকে বরাবরই ভয় আর সমীহ করে চলে। সেই ছেলেবেলা থেকে হামলা তো কম করেনি ওর ওপর। তাছাড়া পাড়ার মেয়েগুলো ছাড়া ভয় ছেলেগুলোও করে ওকে। তেরছা প্রশ্নের জবাবে পরীরাণী শুধু মাথা নেড়েছিল। ভর্তি হয়েছে।

হিংসেয় মুখটা যেন কালো হয়ে গেল তক্ষুনি। নিজে থার্ড ডিভিসনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে পড়াশুনায় সেই কবেই জলাঞ্জলি দিয়েছে। কোন একটা কলে ট্রাক চালানোর চাকরি করত নাকি। সেখানে দল পাকিয়ে মারামারি করার ফলে দু'বছর হল সেখানকার চাকরি খতম। শুনেছে বীরুমামুর মুখে, সে পাড়ার লোকের হাঁড়ির খবর রাখতে চেষ্টা করে। পড়ার আর চাকরির পাট শেষ করে এখন রকের পাকাপোক্ত সর্দার হয়ে বসেছে। অনেক সাঙ্গপাঙ্গ শিষ্য তার। সাজ-পোশাকের বাবুয়ানী আছে, প্রায়ই ফ্যাক-ফ্যাক করে সিগারেট টানে। পয়সা কোথা থেকে জোটে পরীরাণী তখন জানত না, পরে জেনেছে। অল্প বয়েস থেকে লোকটা তার দাদাদের সংসারে আছে। তারা আগে কড়া রকমের শাসন করত ভাইকে, এখন ভয় করে। বারো বছর আগেও ওকে বাড়ির রাস্তার

ফুটপাথে ধরে জুতো-পেটা করতে দেখেছে ওই দাদাদের। গুণধর ভাই বেশি রাগলে সেই দাদারাই নাকি এখন ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখে।

—ও! কলেজে পড়ে বিদুষী হবি! তারপর ভালো চাকরি করবি আর ভালো বিয়ে করবি আর আমাকে কলা দেখাবি—কেমন?

কথা বলতে ঘেন্না করে। কিন্তু ভয় অন্য জিনিস।—তোমাকে কলা দেখাব মানে?

জবাব শুনে পরীরাণী তাজ্জব হয়েছিল, পরে রাগে জ্বলেছিল। ঠোঁট বেকিয়ে টেনে-টেনে বসন্ত বলেছিল, তুই কচি খুকি, কিছু বুঝিস না, কেমন? বিদুষী হয়ে মনের সুখে তোকে অন্য লোকের বুকে গড়াতে দেখলে আমি সহ্য করব ভেবেছিস? আগে তোকে খতম করব, তারপর সেই শালাকে খতম করব—বুঝলি? আমি শালা হাওয়া খাওয়ার জন্যে এতকাল পিতীক্ষেয় বসে আছি!

সে-যে প্রতীক্ষায় আছে পরীরাণী সেই প্রথম জানলো। ইচ্ছে করছিল কপালের ওই মস্ত ক্ষত চিহ্নটার ওপরই আবার পাথর ঠুকে রক্ত বার করে দেয়। শুনেছে, মারামারি করতে গিয়ে একবার কারা নাকি পাথর ঠুকেই কপালে ওই পাকা দাগ করে দিয়েছিল। দশদিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল।

তারপর থেকে নিয়মিত সঙ্গ নিয়েছে। রাগের চোটে পরীরাণী এক-একদিন কলেজ কামাই করে বসেছে। বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে পাজীটা সেদিন কুটিল চোখে ওর ওপর নজর রেখেছে। তারপর দিন আবার ঠিক ধরেছে ওকে। আগের দিনের কামাই নিয়ে কুৎসিত মস্করা করেছে। তাকে কাটান দিতে চেষ্টা করলে বিপদ হবে, এ-কথা বলে বহুবার শাসিয়েছে। ভালো-মন্দ পরামর্শ দিতে চেষ্টা করেছে, যেন সে-ই গার্জেন ওর। অত সাদা-মাটা পোশাকে যাতায়াত করতে দেখে একটু ভালো শাড়ি আর জামা কিনে দিতে চেয়েছে, রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়াতে চেয়েছে আর সিনেমা থিয়েটার দেখাবার প্রস্তাবও করেছে। কিন্তু পরীরাণীর মুখে সেলাই, আর কানে তুলো পিঠে কুলো। চোখ দুটো শুধু অবাধ্য হয়েছে, ওকে দেখামাত্র ঘণা উছলে উঠেছে।

এমনি করে মাসের পর মাস জ্বালিয়েছে ওকে।

...একদিন কলেজে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ছুটি হতে কলেজের ছেলের মতই ওর পাশ ঘেঁষে হাসিমুখে বেরিয়ে এসেছিল। অন্য মেয়েরা দেখে অবাক হয়েছে, ভেবেছে বাইরে হাবা-গোবা কিন্তু ডুবেডুবে জল খায়। পাজীটা ওর সঙ্গেই ঠেলে-ঠুলে ভিড়ের বাসে উঠেছে, চেঁচামেচি করে লেডিস সীটে ওর বসার জায়গা করে দিয়েছে। পরীরাণী বসেছে, তারপর রাগে ফুলেছে। কণ্ডাকটরের কাছ থেকে দুটো দশ পয়সার টিকিট কাটতে দেখল। রাগে তখন চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কণ্ডাকটার কাছে আসতে নিজের পয়সা বার করল, দশ পয়সার একটা—

একটু দ্বিধায় পড়ে কণ্ডাকটার বলল, আপনার টিকিট উনি করলেন যে—

রুক্ষ গলায় পরীরাণী বলে উঠল, আমার টিকিট আমি করছি, পয়সা নিয়ে টিকিট দিন!

বাসসুদ্ধু লোকের চোখ তক্ষুনি ওদের দিকে। একজন রসিক লোক বলে উঠল, বেশ ভায়া বেশ, কারবার ভালো দেখছি—

তার পাশ থেকে আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, বাসের মধ্যে এরকম কারবারের ফল দেখিয়ে দিন ওকে, ঘাড় ধরে নামিয়ে দিন—

ব্যাপার কোন্ দিকে গড়াচ্ছে দেখে পরীরাণীর বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছিল। কিন্তু শয়তানটার সাহস দেখে অবাক। হাসিখুশি মুখ করে তেড়ে-ওঠা লোকটার দিকে মুখ করে বলল, কে দাদা, ঘাড় ধরে নামাচ্ছেন, উঠে আসুন, দেখে চক্ষু সার্থক করি। ওর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক না জেনেই এত বীরত্ব উথলে উঠল কেন—মনে ধরেছে বুঝি? পরক্ষণে ওর দিকে তাকিয়ে খুব মোলায়েম সুরে বলল, দেখলি তো, তোর কাণ্ডজ্ঞান আর কবে হবে? কণ্ডাকটারের দিকে ফিরল, বলল, আমি টিকিট করেছি, ঠিক আছে। পরীরাণী আড় চোখে লক্ষ্য করল, মাথার ওপর একটা আঙুল ঘুরিয়ে চট করে কি বুঝিয়ে দিল কণ্ডাকটারকে, আর সেই সঙ্গে বাসের অনেককেও।

কি বোঝালো পরীরাণীরও আঁচ করতে ভুল হল না। রাগে সর্বাঙ্গ কাঁপছিল ওর। আবার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, পারেনি। গন্তব্যস্থলে এসে আবার ঠেলাঠেলি করে রাস্তা করে দিয়ে ওকে নামিয়েছে। নেমেই অস্ফুট মন্তব্য করেছে, সব শালাকে চিনি, মেয়েছেলে দেখলেই ভালো মুখ করে একটু ঠেলাঠেলি করে নিতে চায়, নিজেই কত করেছি—

ভুরু কুঁচকে তাকালো ওর দিকে।—তোর টানে আমি কলেজে গিয়ে হাজির হলাম, আর এক বাস লোকের মধ্যে তুই আমাকে নাজেহাল করতে চেষ্টা করলি? কোনদিন তোর হাড়মাস গুঁড়িয়ে দেব আমি, আমাকে চিনিস না—

ওর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে পেয়ে শয়তানটার অসহিষ্ণুতা বাড়ছিল আর অসভ্যতা বাড়ছিল। এর মধ্যে অনেকবার বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে। বলেছে, একটা বউ পোষার মুরোদ আছে তার, বলেছে, মূর্খের বিদুষী বউ হলেও আপত্তি নেই—সেটা ভাবতে বরং এখন ভালই লাগছে। কোন বাড়ির এক বিদুষী মেয়ে তাদের ষণ্ডা-মার্কা ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে এখন দিব্বি সুখে আছে, বিচ্ছিরি হেসে হেসে সেই গল্পও করেছে।

ফ্রক-পরা বয়সের সময় এই হতভাগাদের বাড়িতে দুই একবার যেতেও হয়েছে। তখন কেন যেন আশ-পাশের অনেক বাড়ির মেয়ে বউরা ডাকত ওকে। ওদের বাড়ির তিন বউয়ের মধ্যে মেজ বউটিই বেশি ডাকত। তার নাম শ্যামলী। রোগাটে ধরনের হাসিখুশি বউটা। তখনো ওই বসন্ত বজ্জাত যে-ভাবে তাকাতো ওর দিকে, যে-ভাবে জ্বালাতন করতে চেষ্টা করত—তাই দেখে তিন বউই হাসত আর ঠারে-ঠোরে নিজেদের মধ্যে কি যেন ইশারা করত। পরীরাণী তখন অবশ্য প্রায় কিছুই বুঝত না।

...ছোটকে বাদ দিলে ভাইদের মধ্যে ওই ন'বউ শ্যামলীর স্বামীর অবস্থাই সব থেকে খারাপ। ফ্যাক্টরীতে অল্প মাইনেয় কাজ করে। শ্যামলীকেও তাই দুপুরে কাজে বেরুতে হয়। কি একটা কোম্পানির মেয়ে-বিভাগে কার্ড-বোর্ড কেস বানানোর কাজ। পরীরাণী যখন কলেজে পড়ে ওই ন'ভাইয়ের তখন ফ্যাক্টরী বন্ধ। বীরুমামুর মুখে শুনেছিল, দাবি-দাওয়ার চোটে অতিষ্ঠ হয়ে ফ্যাক্টরীর মালিকরা নাকি তালা লটকে দিয়েছে। এর কিছুকাল আগে থেকেই ওই শ্যামলী বউ অসুস্থ। ছেলে হওয়ার ব্যাপারে কি বিভ্রাট হয়েছিল নাকি। তারও কার্ড-বোর্ড কেস্ বানানোর কাজ ঢের আগে থেকেই বন্ধ। সে-সময় ওই বউটার দিকে তাকালে পরীরাণীর সত্যিই খুব কষ্ট হত। রক্তশূন্য মুখ, হাড়ের ওপর চামড়া বসানো। দেখলেই বোঝা যেত খুব দৈন্যদশার মধ্যে দিন চলেছে।

...কি কারণে সেদিন কলেজ ছিল না, মনে নেই। সকালের দিকে বারান্দায় এসে

দাঁড়ালেই অনেকবার ওই হতচ্ছাড়ার হাসি-হাসি মুখ চোখে পড়েছে। চোখ দুটো গেলে দিতে পারলে তবে পরীরাণীর মেজাজ ঠাণ্ডা হয় যেন। সবে তখন দুপুর, দাদা বা বীরুমামু বাড়ি নেই, মায়ের দিবা-নিদ্রা শুরু হয়ে গেছে—বাবাও চোখ বুজে ওই ঘরেই পড়ে আছে। বারান্দায় পা দিয়েই পরীরাণী অবাক একটু। দুপুরের রোদের তাতে রাস্তায় জনমানব নেই, তার মধ্যে ওই তেরছা বাড়ির শ্যামলী বউ রাস্তায় নেমে নিজেদের বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এ-বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। পরীরাণীর মনে হল যেন ওর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ চোখাচোখি হতেই শুকনো মুখে হাসি ফুটিয়ে হাত তুলে ইশারায় ডাকল ওকে।

পরীরাণী থমকে দাঁড়াল, চেয়ে রইল একটু। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার কিছু আগে থেকেই ও-বাড়ির বউদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল না। ওই পাজীটার জন্যেই ছিল না। বউরা হাসি-হাসি মুখে ডাকলেও পরীরাণী যেত না।

কিন্তু আজ ওর চাউনি দেখেই মনে হল বউটির যেন ভারী দরকার ওকে। আবার নেমে আসতে ইশারা করল ওকে। অনেকটা অনুনয়ের মতো করে। অনেকটা নিজের অগোচরেই পরীরাণী একখানা হাত তুলে জানালো, আসছে।

নীচে নেমে আসার ফাঁকে শঙ্কার ছায়া পড়ল একটু। কারণ বীরুমামুর মুখে শুনেছে পাড়ায় হেন চেনা মুখ নেই যার কাছে শ্যামলী বউয়ের স্বামী ধার-ধোর না করেছে। নিজে ধার না পেয়ে এখন বউকে ওই কাজে লাগিয়েছে এমন কথাও কানে এসেছে। পরীরাণীর কাছে টাকা চাইলে ও দেবে কোত্থেকে? বাসে যাতায়াতের গোটা কয়েক ত টাকা মাত্র ওর হাতে আসে। তার থেকে দিতে গেলে কলেজ বন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল, ও দিতেই বা যাবে কেন, গুণধর দেওর কতভাবে টাকা ওড়ায় ঠিক নেই, সে পারে না সাহায্য করতে।

নিচের বারান্দায় এসে আবার দাঁড়িয়ে গেল। এবারে শুকনো মুখে আরো বেশি হাসি ফুটিয়ে বউটা কাছে ডাকল। চকিতে একবার ওদের বাড়ির দোতলার জানলার দিকে তাকালো। না, কেউ কোথাও নেই। তবু নেমে যেতে কেন মন সরল না। হাত তুলে পাল্টা ইশারায় শ্যামলী বউকেই তার কাছে আসতে বলল।

অগত্যা তাকেই আসতে হল। বারান্দায় উঠে রেলিং-এর সামনে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখে হাসি টেনে বলল, আজ তো তোমার কলেজ নেই দেখছি, কি কচ্ছিলে?

আগে 'তুই' করে কথা বলত। পরীরাণী জবাব দিল, কিছু না।

অন্তরঙ্গ মুখে শ্যামলী বউ হাত ধরল ওর।—তাহলে আমার ঘরেই চলো না, বাড়িতে কেউ নেই, আর বাচ্চারাও একলা পড়ে আছে—কতদিন যে তোমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে, আজ তোমার কলেজ নেই মনে হতে তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম—সত্যি বলছি।

পরীরাণী যথার্থই অবাক। আর তলায় তলায় সন্দিগ্ধ। এই দুপুরে শুধু গল্প করার জন্য নিচে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাস করবে কি করে। রমণীটির কাঁধ ঘেঁষে ওর দু'চোখ আর একবার ওই তেরছা বাড়ির দোতলার জানলার দিকে ধাওয়া করল। না, এখনো কেউ নেই।

...এখন যেতে পারছি না, পড়াশুনা নিয়ে বসতে হবে।

—হ্যাঁ, এই দুপুরের তাতে কারো পড়ায় মন আসে! এসোই না।

—আপনি কি জন্যে আমায় ডাকছেন তাই বলুন।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বউটা থমকালো একটু। আগের মতো আর কচি-কাঁচাটি নেই সেটাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল। এ-দিক ও-দিক তাকালো একবার। এ-বাড়িতেও নিরিবিলির ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা নেই। গলার স্বরে অন্তরঙ্গ মিনতি ঢেলে বলল, আমার একটা কথা রাখবে? লক্ষ্মীটি—

পরীরাণী চেয়ে আছে। বিস্মিত, জিজ্ঞাসু চাউনি।

—আমি পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে একটাও সিনেমা দেখিনি, আজ হঠাৎ হাতে দুটো টিকিট এলো—এই দেখো। আঁচলের আড়াল থেকে হাতের মুঠো খুলে দুটো টিকিট দেখালো। আমার এক দূর সম্পর্কের ভাই দিয়ে গেছে, কিন্তু একলা গিয়ে তো অভ্যেস নেই, তাছাড়া এমন গরিবের সঙ্গে জায়েরাও কেউ যাবে না—তুমি ভাই চলো আমার সঙ্গে। খু-উ-ব ভালো ছবি—দুপুরের শো, বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব—যাবে তো?

আশ্চর্য, সক্কলে কি বোকাই ভাবে পরীরাণীকে। রাগের চোটে ভিতরে ভিতরে শরীরের মাংসসুদ্ধ যেন দুমড়ে যাচ্ছে। তার মুখের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে পরীরাণী অনুচ্চ গলায় বলল, আপনার হাতে দু'খানা টিকিট আছে, আর একখানা আছে আপনার দেওরের হাতে—এ-ভাবে এসে মিথ্যে কথা বলতে আপনার লজ্জা করে না?

বউটা থমকে তাকালো ওর দিকে। তারপর শুকনো মুখে একটা দুটো করে যেন হিংস্র রেখা ফুটে উঠতে থাকল। অস্ফুট নীরস গলায় বলল, লজ্জা আবার কি, দেওর থাকলেই বা, আমার সামনে সে তোমাকে খেয়ে ফেলবে?...কথা দিচ্ছি, ছবি ভাঙলেই নিজে সঙ্গে করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। যাবে?

জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ করছিল পরীরাণী। সেটা বুঝেই চাপা হিসহিস গলায় বউটা আবার বলল, তুমি যাবে না তাহলে?...এই একটুখানি রঙ্গ-রসের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আমি ছবি দেখা ছাড়াও নগদ দশটাকা পেতাম। তার মানে আমার আধা-উপোসী ছেলের কুড়ি দিনের দুধের পয়সা হত। তোমাদের রঙ্গ-রস যেদিকে গড়াবার গড়াবেই —তখন আর তোমার লজ্জা সরমের কোন বালাই থাকবে না—আশা করি ওই দেওরটি কি মানুষ তুমি ভালই জানো—মাঝখান থেকে আমাকে আর আমার ছেলেটাকে বঞ্চিত করবে—আমার লজ্জা করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

রাগে অপমানে ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল পরীরাণীর। কিন্তু পা দুটো হঠাৎ যেন স্থাণুর মতো মাটির সঙ্গে আটকে গেছে। হাড় উঁচনো শীর্ণ মুখে বিচ্ছিরি একটু ঝাঁঝালো হাসি ফুটিয়ে ওই বউ আবার বলল, শুধু ছবি দেখানো আর দশটাকা দেওয়া কেন, আমি মাঝে থেকে তোমাদের বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে দুশো টাকা পাওয়ার কথা আমার—বুঝলে? ও যখন ধরেছে, তোমাদের বিয়ে হবে সব হবে, মাঝখান থেকে আমি শুধু বঞ্চিত হব, বুঝলে? তখন আমার দিকে চেয়ে তোমার লজ্জা হবে না? তুমি পার পেলে আমার নামে কুকুর পুষো, আর অত দেমাকই বা কিসের তোমার? টাকার গন্ধ পেলে তোমার ওই বাবা-মা-দাদাই বেচে দেবে তোমাকে—তাদের তুমি জানো না? আধ-মরা ছেলেটার জন্যে আমি দুটো পয়সা পেতে চাইলেই দোষ—কেমন? বড় আশা নিয়ে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে এসেছিলাম, আমাকে বঞ্চিত করলে তোমাদের অভিসম্পাত লাগবে জেনে রেখো।

হন হন করে চলে গেল। একটা প্রেতিনী যেন সামনের থেকে উধাও হল। প্রচণ্ড রাগ সত্ত্বেও প্রায় হতভম্ব মুখেই দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলো। শেষ পর্যন্ত বিকৃতই মনে হল ওই বউটাকে। মাথাই খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়। নইলে এ-ভাবে কেউ আসতে পারে, এ-রকম করে কেউ বলতে পারে!

রাগ সবটাই ওই হাড়-পাজী বসন্ত সরখেলের ওপর। কিন্তু বউটার ওপর কেমন মায়া হচ্ছে পরীরাণীর। সম্ভব হলে তার হাতে কিছু টাকা দিত। কোন মায়ের মুখে তার আধ-মরা ছেলের কথা শুনতে এমন বিচ্ছিরি লাগে অথচ ভিতরটা টনটন করে, জানত না।

চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে পারা গেল না। আধঘন্টার মধ্যেই উঠে আবার দোতলার বারান্দায় এলো।

...তেরেছা বাড়ির জানলায় মূর্তিমান শয়তান দাঁড়িয়ে। ওকে দেখামাত্র দাঁত বার করে হাসতে লাগল। উনুনে আগুন নেই, থাকলে পরীরাণী একটা জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে এনে ওকে দেখাতো।

তারপর আবার একদিন।

কলেজের শেষ দিন সেটা। শেষ দিন যে পরীরাণী জানত। ভিতরটা ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল তাই। বাসে ফেরার সময় মুষলধারে বৃষ্টি। জায়গায় এসে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নামতে হল। নেমেই ছুটে সামনেব শেডটার নিচে চলে এলো। ছাতার আড়ালে যে-মানুষটা সেখানে দাঁড়িয়ে, আগে তার মুখ দেখতে পায়নি। ও এসে দাঁড়াতে ছাতা তুলে হেসে ওর দিকে ঘুরল।

ওই নরকের শয়তান। বসন্ত সরখেল।

একগাল হেসে ছাতাটা বাড়িয়ে ওর মাথার ওপর ধরে মোলায়েম করে বলল, টান দেখেছিস? জল-ঝড়ের পরোয়া নেই, চল—

পরীরাণী অন্য দিকে সরে ঘুরে দাঁড়াল।

দাঁত বার করে হাসতে হাসতে ও আবার সামনে এসে দাঁড়াল।—তোর দেমাক দেখতেও ভালো লাগে, মাইরি বলছি! যাবি তো চল, নইলে বুঝব আমি হাত ধরে টানি এই তোর ইচ্ছে।

পরীরাণী হনহন করে জলের মধ্যেই পা বাড়িয়ে দিল। ও ছুটে এসে মাথায় ছাতা ধরল। বলল, বেশি মেজাজ দেখালে হাতের এক ধাক্কায় ওই জলে মুখ থুবড়ে পড়বি বলে দিলাম। তারপর জাপটে ধরে টেনে তুলব।

কলেজের পড়া শেষ হতে পারে সেই শোকে পরীরাণীর মেজাজ সেদিন এত খারাপ যে ভয়-ডরও অর্ধেক উবে গেছে। চোখের আগুনে ওই মুখ এক-দফা ঝলসে নিয়ে ছাতার তলায় চলতে লাগল। বসন্ত বলল, হচ্ছে না, ভিজে যাচ্ছিস, তুই ধর ছাতাটা, আমি ভিজলে কিছু হবে না, তুই ভিজলে লোকে মজা লুটবে।

চোখে দ্বিতীয় দফা আগুন ছড়িয়ে পরীরাণী চলতে লাগল। ছাতা ধরল না। অগত্যা বসন্ত নিজে ভিজে ছাতার চার ভাগের তিন ভাগ ওর মাথার ওপর ধরে এগোতে লাগল। গায়ে গা ঠেকছে এক-একবার। পরীরাণীর ধারণা ইচ্ছে করে ঠেকাচ্ছে। পরীরাণীর মাথায়

রক্ত উঠছে। দু'পা এগিয়ে বসন্ত বলল, তোকে ধরব বলে সেই দুপুর থেকে পাঁয়তারা কষছি, আমাকে দেখলেই তোর এমন ব্যাভার কেন?

—কেন জানো না? পরীরাণীর ভয়-ডর তখনকার মতো রসাতলে।—তুমি ছোটলোক বলে, তুমি ইতর বলে।

এক হাতে ছাতা, বসন্তের অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে নিসপিস করে উঠল।—দেখ পরী, আজ পর্যন্ত মেয়েমানুষের গায়ে আমার হাতে ওঠেনি, আমাকে রাগাস না বলছি। ...আমি ছোটলোক আর তোরা খুব ভদ্দরলোক, কেমন? তোর ওই সৎ-মা এই বয়েসেও মক্কেল ধরে বেড়াচ্ছে, তোর দাদা বড়লোকের পায়ে তেল দিয়ে নেশার পয়সা জোটাচ্ছে, আর ওই মামু না কে হারামজাদা পাড়ার ভালো বয়সের মেয়েগুলোকে চোখ দিয়েই সাবড়ে বেড়াচ্ছে—আমি ছোটলোক, আর তোরা ভদ্রলোক? হাটে হাঁড়ি ভাঙি না বলে? আমি না থাকলে এতদিনে বাপের বয়সী ওই পল্টু পাগলাই গিলে বসে থাকত তোকে, বুঝলি? তোকে ফুঁসলে বার করার মতলবে এক বছর আগে আমারই নাকের ডগায় কড়কড়ে একশো টাকার নোট দুলিয়েছিল—আমি পকেট থেকে ছোরা বার করে বুকের ডগায় ছোঁয়াতে তখন আঁ-আঁ-আঁ। ওকে বলেছি ফের তোর দিকে চোখ দিলে ওই চোখ উপড়ে বার করে নেব। আমি ছোটলোক, আর একেবারে সগগের পরিবেশে নিবাস তোর —কেমন? ফের এই কথা বলবি তো তোর জিভ টেনে ছিঁড়ব আমি—তু করে ডাকলে তোর মতো অনেক মেয়ে এই শর্মার কাছে ছুটে আসে--

মোড় ঘুরেছে। ওই বাড়ি। ছাতার তলা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেছল পরীরাণী। লোকটা প্রস্তুত ছিল না বলেই আর ওর নাগাল পায়নি।

পরদিন থেকে কলেজ বন্ধ। কেন বন্ধ শয়তানটা তাও টের পেয়েছে। একদিন সন্ধ্যার পর খুপরি ঘরের আলো জ্বেলে দেখে মেঝেতে খাম পড়ে আছে একটা। খামে কাঁচা হাতে ওর নাম লেখা। ডাকটিকিট নেই, অর্থাৎ কেউ এনে ফেলে দিয়ে গেছে। খুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জলবিছুটি। যেমন চরিত্র তেমনি ভুল-বানানের প্যাচালো হাতের লেখা। বসন্ত সরখেল লিখেছে, কলেজে পড়া খতম কেন মামুকে সেদিন রাস্তায় ধরে জেনে নিয়েছে। আর, পড়া হয় না বলে খুব কান্নাকাটি করেছে তাও শুনেছে। শুনে ওরও মন খারাপ (ব) হয়েছে। তাই প্রস্তাব বাকি দেড়টা বছর পড়ার খরচ সে-ই চালিয়ে দেবে—পরী(ি)রাণী যেন পড়া বন্ধ(ন্দ) না করে—আর অতি অবিশ্যি পরদিন দুপুরে (দুকুরে) বাস স্ট্যাণ্ডে ওর সঙ্গে দেখা করে।

রাগের পরে বিস্ময়। এ-চিঠি তার ঘরে এলো কি করে? কে ফেলে দিয়ে গেল? ...সন্দেহ সঙ্গে সঙ্গে বীরুমামুর ওপর গিয়ে পড়ল। বেইমান কাপুরুষ নেমকহারাম। দাদা বাড়ি থাকলে চিঠিটা তক্ষুনি তার হাতে দিয়ে মামুর সঙ্গে বোঝাপড়া করত। দুজনের কেউ বাড়ি ছিল না তখন। পরে এ-নিয়ে হৈ-চৈ করতে সঙ্কোচ হল, রুচিতে বাধল।

সেই থেকে চিঠির অত্যাচার শুরু। ডাকে আসে না। ডাকে এলে সন্দেহ হবে, কেউ হয়তো খুলে পড়বে। গোপনে নাম-লেখা খামটা কেউ ওর ঘরের মধ্যে নয়তো ঘরের সামনে ফেলে দিয়ে যায়। ওর সাড়া না পেয়ে চিঠিতে তর্জন-গর্জন আর শাসানী বাড়তে থাকল। সেই সঙ্গে শোধ নেবার কুৎসিত ইঙ্গিতও। সপ্তাহে কম করে দু-তিনটে চিঠি পেতে লাগল পরীরাণী। শেষের দিকে না পড়েই চিঠি কুটিকুটি করে ছিঁড়েছে।

ছিড়েছে। একদিন পাজীটা যখন জানালায় দাঁড়িয়ে, বারান্দায় এসে ওকে দেখিয়েই চিঠি কুটিকুটি করে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছে পরীরাণী। ফলে পরদিন আরো জঘন্য চিঠি। তার জবাবে পরীরাণীর বাইরের বারান্দাটা ঝাঁট দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছিল, তারপর জানলায় ওই মূর্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঝাঁটার ভাষা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

শেষে নিজের ওপর রাগ হয়েছে। ও ইতর বলে পরীরাণী কেন এ-রকম করতে গেল। মুখ ফিরিয়ে থাকলেই তো হত। ওদিকে চিঠি কার মারফত আসে তাও হাতে-নাতে ধরেছে। প্রথমে বীরুমামুর ওপরেই সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল, কিন্তু মামা আর দাদা দু'দিনের জন্য দীঘায় বেড়াতে গেল, তার মধ্যেও চিঠি পেল। সন্দেহটা তখন গিয়ে পড়েছিল নিচের তলার ঝিয়ের ওপর, ফাঁক মত মাসে সাত টাকার কড়ারে যে ওদের বাসনক'টাও মেজে দিয়ে যায় আর সকালে দু'কলসি আর বিকেলে দু'কলসি টিউবওয়েলের জল দিয়ে যায়। ওত পেতে থেকে পরীরাণী তাকে ধরতে গিয়ে ধরে বসল তিনতলার পল্টু ঘোষালকে। একদিন সন্ধ্যের দিকে ওর জল দেবার সময় হতে ইচ্ছে করেই ওর চোখের সামনে দিয়ে পরীরাণী নিচের মাসিমার কাছে চলে এলো। মাসিমাটি তখনো মোটামুটি সদয় চোখেই দেখত ওকে। ঝি কলসি নিয়ে বাড়ির বার হবার সঙ্গে সঙ্গে ও ওপরে চলে এলো। ঘরের আলো নিবিয়ে দরজার একটা পাট বন্ধ করে তার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদে সিঁড়িতে চেনা পায়ের শব্দ। পল্টু ঘোষাল উঠে আসছে। টুপ করে ঘরের মধ্যে খাম পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সুইচটা টিপে এক ঝটকায় বাইরে এসে দাঁড়াল পরীরাণী।

পল্টু ঘোষাল ভ্যাবাচেকা। তারপর মাথা নিচু করে গোঁ-ভরে বলেছে, এই পিওনের কাজ করার জন্য বুকে ছুরি ঠেকিয়ে শাসালে আমি কি করব! সকলেরই প্রাণের মায়া আছে—

বলতে বলতে ওপরে উঠে গেছল। পরীরাণী তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

চিঠি ছোঁড়ার পাট শেষ হল। ঝাঁটা দেখে বসন্ত সরখেলের মাথায় রক্ত উঠেছিল বোধহয়। শেষ চিঠি এলো সরাসরি বাবার নামে এবং ডাকে। চিঠির চাঁচাছোলা ভাষা আর বানান ভুলে ভরা। বক্তব্য, বহুদিন ধরেই সে ঠিক করে বসে আছে পরীরাণীকে বিয়ে করবে। এ-প্রস্তাব বাতিল করলে সেটা কারো পক্ষে ভালো হবে না। অতএব বিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত। বাবার অনুমতি পেলেই সে এসে দেখা করবে।

চিঠি পেয়ে বাবার শুকনো মাটিতে আছাড় খাবার দাখিল। দাদা আর বীরুমামুর মুখ কালো। মায়ের ঘোরালো চোখ আর ভ্রূকুটি। পরীরাণীর কান-মুখ লাল, আর চোখে সাদা আগুন। বাবা নিজের দুশ্চিন্তার বোঝা কাঁধে নিয়ে নিজের জগতে বাস করে। নাকের ডগার ওই ছেলে কে বা কি, খবরও রাখে না।

নির্বোধ বিস্ময়ে মেয়ের দিকে ফিরল।—তোকে জানিয়েই এই চিঠি পাঠিয়েছে নাকি?

জবাব না দিয়ে মেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি দেবী ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, আসকারা না পেলে ছোটলোক বাউণ্ডুলে ছেলের এত সাহস হয় কি করে?

কি করে হয় সে-জবাব এলো দাদা পরিতোষের কাছ থেকে। বলল, সাহসের জন্য ওই ছেলের আসকারার দরকার হয় না—তুমি ওকে ছোটলোক আর বাউণ্ডুলে বলেছ শুধু এ-খবরটা পেলেই ওর সাহস কতদূর গড়ায় যাচাই করে দেখতে পারো।

হাসি দেবী ঘাবড়ে গেল। সেই সঙ্গে রাগও চড়ল।—আমরা ঘরে বসে কথা কইছি এর মধ্যে ওর জানার কথা ওঠে কি করে? তুই-ই গিয়ে জানিয়ে আয় তাহলে!

ব্যাপার সুবিধের নয় বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বাবার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি তখনো। —তোরা যে বললি সামনের ওই সরখেল বাড়ির ছেলে, বেশ ভদ্র ঘর তো...ছেলেটা কি পাশ? কি করে?

মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে চিঠির ধাক্কায় সেটা এই বোধহয় প্রথম অনুভব করল ভদ্রলোক। নি-খরচায় মেয়েকে সুপাত্রস্থ করার চিন্তাটা মাথায় আসা স্বাভাবিক। কালো ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে এবারে জবাব দিল বীরুমামু।—থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাস।...মোটর ড্রাইভিং শিখে এক বড় কারখানায় ট্রাক চালানোর চাকরি করেছিল বছর দুই। মাথা ফাটাফাটি করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এখন অবশ্য আরো বেশী রোজগার করে—

—কি করে?

—ব্যবসা। ঘরে বসে বোমা বানায়। ওর খদ্দেররা এখন আর দরকারেও উকিলের বাড়ি আর কোর্ট-কাচারি করে জুতো ক্ষয় করে না। বসন্ত সরখেলের নাগাল পেলেই হল, দু'চারটে বোমাতেই মামলার ফয়সালা। বীরুমামু বাবার হাঁ-করা মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।—আমাদের চেনা এক পয়সা-অলা বাড়ি-অলা চার ব-চ্ছ-র মামলা করে তার একতলার দজ্জাল ভাড়াটেকে তুলতে পারছিল না—বসন্ত দেড় হাজার টাকার চুক্তিতে সেই ঘর ছ'দিনে খালি করে দিল। নাকের ডগায় তিনটে, আর কাছাকাছি আরো তিরিশটা বোমা ফাটিয়ে সক্কলের স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে হুমকি দিতেই কেল্লা ফতে। দাদার দিকে ফিরল বীরুমামু।—আর ওই নন্দ দে'র বউটাকে কি করে স্বোয়ামীর ঘরে ঢোকালে? দাদাদের সঙ্গে সড় করে বউটা স্বোয়ামীর বিরুদ্ধে ছাড়াছাড়ির কেস্ ঠুকে দিয়েছিল। নন্দ দে নিজের মুদী দোকানের তবিল ভেঙে একশটি টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে পরে আরো চারশ' টাকার কড়ার করতে সাত দিনের মধ্যে বউ আর তার দাদারা সব টিট্। রাত দশটার পর আচমকা দুটো বোমা ফাটিয়ে দলের ক'টা ছেলেকে নিয়ে বসন্ত সরখেল সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দাদা ক'টাকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে বার করেছিল—সক্কলের হাতে ছোরা দেখে ওদের সে কি ভেউ ভেউ করে কান্না! নন্দ মুদীর বউ এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো স্বোয়ামীর ঘর-সংসার করছে।

দিদি আর ভগ্নীপতির ভয়ত্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে বীরুমামু উপসংহার টানল।—এখন তো জোর প্র্যাকটিস ওর, পেতে হলে অনেক আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয় শুনেছি।

বাবার মুখের অবস্থা দেখে পরীরাণীর এত রাগ হয়ে গেছল যে আর সেখানে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। কাপুরুষের অধম যত সব—

গঞ্জনা বাড়তে থাকলে অতি নিরীহ গো-বেচারাও সময় সময় ফোঁস করে ওঠে। পরীরাণী বাইরে যেমনই হোক, ভিতরে ভিতরে নিরীহ নয় খুব। তার রাগ আর গোঁ

দুই-ই আছে। নিরুপায় বলেই যতক্ষণ পারে চুপচাপ থাকে। কিন্তু এবারে সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বাবা মায়ের কথা না-হয় ছেড়েই দিল, সব জানার পর দাদা আর বীরুমামু যে মুখ সেলাই করে আছে, এটা অসহ্য। বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর জো নেই। ওর দেখা পেলেই দূরের জানালায় দাঁড়িয়ে অসভ্য বাঁদরটা ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, বিয়ের প্রস্তাবের বিবেচনাটা কতদূর এগলো। ওকে রাস্তায় নেমে আসতে বলে, দরকারী কথা আছে বোঝাতে চেষ্টা করে। আর তার পরেও ওকে নির্বাক দেখে ভ্রূকুটি করে শাসায়।

এর ওপর বীরুমামুর দুশ্চিন্তা দেখে সেদিন সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরে গেল। ফাঁক পেয়ে ওর ঘরে এসে নড়বড়ে চৌকিটার একধারে বসল।—কি যে করা যায় বুঝতে পারছি না, বসন্ত শয়তানটার রকম-সকম তো ভালো দেখছি না, আজ আমাকেও ধরে শাসিয়ে দিলে, জামাইবাবুর কাছ থেকে চিঠির জবাব না পেয়ে ও নাকি অপমানিত বোধ করছে।

পরীরাণী ঝলসে উঠল, করবে আবার কি, বাড়ি থেকে না বেরিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকো!

রাগের আঁচ পেয়েও বীরুমামু বলল, আমি তো সব্বোক্ষণই ভাবছি, তোর দাদার সঙ্গে পরামর্শও ক'চ্ছি—কিন্তু ওটারও তো মাথা ঠিক থাকে না আজকাল, নেশা বেড়েই চলেছে।...দিদি আবার ভাবছে চট করে অন্য কোথাও তোর বিয়ে দিয়ে ফেলা যায় কিনা, পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করছিল, তার জানাশোনার মধ্যে একজন পয়সাঅলা লোক আছে, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, প্রথম বউ মরে গেছে, ছেলেপুলে নেই—চেষ্টা করে দেখবে কি না। তোর দাদা তো বলে দিল, এক্ষুনি দেখ।...কাল পরশুর মধ্যে সেই লোক হয়তো তোকে দেখতে আসবে।

শুনে পরীরাণীর কানের ভিতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। জ্বলন্ত চোখে বীরুমামুর মুখখানাই ঝলসে দিচ্ছে। চিন্তিত মুখে বীরুমামু আবার বলল, কিন্তু আমার কেমন ভালো লাগছে না, বুঝলি...

কথাটা কানে লাগতে রাগ সামলে পরীরাণী জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—ইয়ে, ভয়ে ভয়ে একবার দরজার দিকে তাকালো বীরুমামু, মানে...তোর বয়েস তো সবে কুড়ি গড়িয়ে একুশ...ওই লোকের পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস শুনছি...

—পঁয়ষট্টি হলেই বা তোমার কি?

মুখের ওপর এ-ভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠতে বীরুমামু কমই দেখেছে। শেষ পর্যন্ত ভিতরের দুশ্চিন্তাটা ফাঁস করেই ফেলল। বলল, দিদির সঙ্গে যাদের চেনা জানা তাদের অনেককেই তো চিনি...দিদির চিঠি নিয়ে মাঝে মাঝে টাকা পয়সা চাইতে যেতে হয়, বিপদে পড়ে দিদি এখন পার করতে চাইছে, কিন্তু পরে যদি তোকে পস্তাতে হয়। মানে, আমি তোর ভালোর জন্যেই বলছি...

কেন বলছে পরীরাণী সেটা খুব ভালই আঁচ করতে পারে। ইচ্ছে করল মুখের ওপর সেটা বলে দেয়। কিন্তু কি লাভ। জীবনটাই ওর একটা বোঝার মতো। আর যেন টেনে হিঁচড়ে ওটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। যা খুশি হোক গে। আর ভাবতে পারে না। পরীরাণী ক্লান্ত।

ঘর থেকে যাবার আগে বীরুমামু চিন্তিত মুখে বলে গেল, দিনকতক তুই আর এখন ওই সেলাইয়ের ইস্কুলে যাস নে, ওই বদমাশটা সারাক্ষণ ওত পেতে আছে মনে হয়—

মাথা ঠাণ্ডা থাকলে বীরুমামুর এই উপদেশটা অন্তত পরীরাণী শুনত। দু'দিন না যেতে যা ঘটে গেল, প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে পরীরাণী তখনকার মতো প্রায় ক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু তার তলায় তলায় একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়েই থাকল। সেলাইয়ের স্কুল থেকে বিকেলে বেরিয়েই দেখে অদূরে ওই দুঃস্বপ্নের মূর্তি দাঁড়িয়ে। বসন্ত সরখেল, চোখে মুখে একটা বেপরোয়া ভাব। পরীরাণীর সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে আছে, একটু বাদে তারা সোজা রাস্তায় চলে গেলেই ও এগিয়ে আসবে জানা কথা। মেয়ে দুটি বয়স্ক, তাদের বললে তারা বাড়ির কাছাকাছি অন্তত এগিয়ে দিতে পারত। কিন্তু বলা গেল না। এ উপদ্রব তো একদিনের নয়, ক'দিন এই করে রেহাই পাবে।

মেয়ে দুটো তাদের বাড়িমুখো হল। পরীরাণী এবার একলা। দাঁতে করে একদিকের ঠোঁটের কোণ কামড়ে বসন্ত সরখেল ওর দিকে এগলো। অতএব পরীরাণী বাড়ির রাস্তায় না গিয়ে উল্টো দিকে অর্থাৎ বড় রাস্তার দিকে চলল। ওদিকে লোকজন আছে। বিশ তিরিশ গজ এগোতে পিছনে চাপা শাসানী কানে এলো, ভাল চাস তো দাঁড়া, কথা আছে- --পালাবি কার কাছে, কোনো শালার পরোয়া করি আমি--

সামনেই ফুটপাথের ধারে জনা চারেক অচেনা সভ্য-ভব্য তরুণ মূর্তি। পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ওদের কেউ সামনের বড় স্টেশনারী দোকান থেকে কিছু কেনা-কাটা করতে নেমেছে বোধহয়। বাকি ক'জন গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আরো একটু জোরে পা চালিয়ে পরীরাণী লক্ষ্য করল, ছেলে চারটেই আড়চোখে দেখছে ওকে। ছেলেদের এই গোছের উসখুস চোরা চাউনি দেখে অনেক দিন ধরে অভ্যস্ত পরীরাণী। রাগের মাথায় হঠাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সংকল্পে ঝলসে উঠল যেন। সোজা ওদের সামনে এসেই গনগনে মুখে পিছনে আঙুল দেখিয়ে বলল, দেখুন, ওই পাজী লোকটা আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করছে, আর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার জন্য কিভাবে এগিয়ে আসছে।

চারজনই বেশ জোয়ান ছেলে আর বে-পাড়ার ছেলে। পরীরাণীর চোখ মুখের ওই অবস্থা দেখেই হয়তো ওদের পুরুষকার তেতে উঠল। বসন্ত সরখেল তিন গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়েছে। তার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে সে হয়ত কিছু একটা চাতুরীর রাস্তা ধরত। কিন্তু তার বদলে ধারালো চোখে পরীরাণীর দিকে চেয়ে রইল।

ছেলে ক'টি চটপট ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কড়া করে চোখ পাকালো।--কি মতলব?

বসন্ত সরখেল ঝাঁঝালো জবাব দিল, আপনারা নিজেদের কাজে যান, ও আমার পরিচিত, আমার দরকারী কথা আছে ওর সঙ্গে।

চাপা তীক্ষ্ণ গলায় পরীরাণী বলে উঠল, কোনো কথা নেই, ওর সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই, রাস্তায় মেয়েদের দেখলেই ও অপমান করে, ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিলেও আপনাদের কোনো অন্যায় হবে না--নয়তো ওকে থানায় দিয়ে আসুন--আপনারা চলে গেলেই ও আমাকে আরো বেশি অপমান করবে।

চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে, আবার জলও এসে যাচ্ছে। বসন্তকে ঘিরে আরো দু'একজন লোক জুটেছে। ওই তরুণদের মধ্যে দু'জন সবলে ওকে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, তোমার দাঁত ক'টা আজ উপড়ে তুলব, পাজী, বদমাশ--

দুই একটা চড়চাপড় পড়ত, কিন্তু এ-রকম অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেও বসন্ত সরখেল জানে। মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ, গম্ভীর। গলার স্বরও ভারী।--দাঁড়ান

দাদারা, গায়ে হাত তোলার জন্য অত ব্যস্ত হবেন না—আমার নাম বসন্ত সরখেল, আপনারা এ-পাড়ার লোক হলে চিনতেন, কাছেই আমাদের বাড়ি, চলে আসুন—আমার সঙ্গে ওই মেয়ের কথা থাকতে পারে কিনা পাড়ার লোকের মুখেই শুনবেন—

ঠাণ্ডা মেয়েটার উন্মাদিনী মূর্তি যেন হঠাৎ। বলে উঠল, ও আপনাদের ভোলাচ্ছে, ওর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলুন—

কিন্তু তরুণ ক'টির উদ্যত হাত থেমেই গেছে। ছোঁড়াটার হাব-ভাব দেখে ভরসা করে আর নায়কোচিত কিছু করে উঠতে পারল না। ওদের মধ্যে একজন পরীরাণীকে বলল, আচ্ছা, আপনি বাড়ি চলে যান, আমরা ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করছি—

পায়ের তলায় যেন মাটি পিষতে পিষতে পরীরাণী বাড়ি ফিরল। কিন্তু নিজের খুপরি ঘরে ঢোকারও ফুরসত পেল না। সিঁড়ির বারান্দায় ব্যস্ত মুখে হাসি দেবী দাঁড়িয়ে ওকে দেখেই চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, সেই কতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখেছি আর তোর এতক্ষণে ফেরার সময় হল। তোদের ভালো করতে যাওয়াও ঝকমারি—সংয়ের মতো চেয়ে দেখছিস কি, চট করে শাড়িটা বদলে মুখ হাত ধুয়ে একটু পাউডার বুলিয়ে আমার ঘরে চলে আয়, বেশ নম্র-সম্রভাবে ঢুকবি—

পরীরাণী দোতলায় পা দিয়ে তবু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাগে তখনো মগজ ফুটছে, তার মধ্যে ঘরে পা দিতে না দিতে এই। কিন্তু মায়ের ততো লক্ষ্য করার চোখ নেই আপাতত, অবাধ্যতা চক্ষুশূল। আবারও ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার কথা তোর কানে যাচ্ছে!

প্রায় চিৎকার করেই পরীরাণী কিছু একটা বলে উঠতে যাচ্ছিল। স্বভাবের বাইরে একটা বড় কাণ্ডই করে এসেছে, আর সেই মেজাজেই আছে। কিন্তু তার আগেই চোখে পড়ল নিজের ঘর থেকে দাদা এগিয়ে আসছে। পা বাড়ানোর এই ধরনটা পরীরাণীর জানা আছে। দাদা এই বিকেলের মধ্যেই নেশা করে এসেছে।

সামনে এসে ভ্রূভঙ্গি করে মায়ের দিকেই তাকালো।—ওকে কি বলছ, ও সেজেগুজে তোমার ঘরে যাবে কেন?

একটা গন্ধ নাকে আসছে যেন, বিরক্তিতে মা সেইভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করল। কিন্তু রাগারাগি না করে সংযত সুরেই বলল, তোর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে—এই সেদিন পরীর বিয়ে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা হল না! এটা সেটা বলে ধরে এনেছি, আলাপ করিয়ে দি, তারপর দেখা যাক, ভালো অবস্থা—

কথার মাঝেই দাদার আমেজী বিস্ময় যেন আছাড় খেয়ে পড়ল, ঘরে যে লোকটা বসে আছে সে পরীকে দেখতে এসেছে? অ্যাঁ, এই পরীকে? পছন্দ হলে তুমি ওর হাতে মেয়ে গছিয়ে দেবে? সোজাসুজি বলো না ছাই, বুঝতেই তো পারছ, এ সময়ে আমি না ভালো দেখতে পাচ্ছি, না শুনতে—

মায়ের মুখ শুকিয়ে আসছে, তবু চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, একেবারে জাহান্নমে গেছিস, আস্তে কথা বল, বয়েস একটু বেশি কিন্তু লোকটা খারাপ কিসে হল?

গলা দিয়ে শব্দ বার না করেই পরিতোষ গলগল করে হাসতে লাগল। তারপর চাপা উৎফুল্ল স্বরে বলে উঠল, মাইরি বলছি হাসি দেবী, তোমার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে আমার—ওই যে এসেছে তোমার ঘরে তাকে খারাপ বলে কোন্ শা—থুড়ি, ও একখানা ধোয়া তুলসী পাতা! আরে পকেটে পয়সা থাকলে ভালো জিনিস কিনতে

গিয়ে কতদিন ওর শ্রীমুখের দর্শন পেয়েছি ঠিক আছে! একটু আগে বীরুমামুকে বলছিলাম, একটু বুদ্ধি খাটালেই ওর মাথায় ডাঙস মেরে কিছু খসাতে পারে, আর তুমি কিনা এই বুদ্ধির প্যাঁচ কষছিলে। পরীর জন্য ওকে!

প্রগল্‌ভ হাসি আর উচ্ছ্বাসের মুখেই থমকালো একপ্রস্থ। পরক্ষণে দু'চোখ লাল। বোনের দিকে ফিরল, ঘরে যা, বেরুবি তো পা ভেঙে দেব।

রক্ষা পেয়ে পরীরাণী ত্রস্তে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। দাদার নেশা করাটাকে ও নিজেও ঘৃণা করে। কিন্তু আজ দাদাকে তার একটুও খারাপ লাগল না। খুপরি ঘরে ঢোকার পরেও দাদার রুক্ষ গলার স্বর কানে এলো। মা-কে বলছে, তোমার আদরের ভদ্রলোককে বিদেয় করতে অসুবিধে হলে আমি যাব? সাহায্য করব একটু?

মায়ের গলা শোনা গেল না। পালিয়েছে নিশ্চয়। এর দুর্ভোগ শেষ পর্যন্ত বাবাকে ভুগতে হবে। বাক্যবাণে বাবার গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নিতে চাইবে মা। যা নয় তাই বলে শাসাবে আর কটুকাটব্য করবে। বেচারা বাবা...তবু দাদার ওপর আজ তুষ্ট পরীরাণী। এই মেজাজে দাদা যদি একবার ওই পাজী হতচ্ছাড়া শয়তানের মুখোমুখি হত একবার...নেশা করুক আর যাই করুক, পরীরাণী রোজ একবার করে দাদার পায়ের ধুলো নিত তাহলে।

এই মুহূর্তের বিপাক ভুলে চৌকিতে বসে দুই জ্বলন্ত চোখে অনুপস্থিত বসন্ত সরখেলের মুখটাই ভস্ম করতে লাগল পরীরাণী।

এর ঠিক পনের দিন পরে সেই কালান্তক ঘটনা।

বাড়ির এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই ওদিকের জানালায় এই ক'দিন দুই-একবার করে বসন্ত সরখেলের দেখা পেয়েছিল। চাউনি আরো কুটিল কুৎসিত মনে হয়েছিল। কিন্তু ওর মতলব সেদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

দুপুরে সেলাইয়ের ইস্কুলে যাবে বলে সবে তৈরি হয়েছে এমন সময় বাড়ির দোরে তিন চারবার মোটরের হর্ন বেজে উঠল। তারপর নিচের তলায় কড়া নাড়ার শব্দও কানে এলো। পরীরাণী বারান্দায় এসে দেখে ওদের দোরগোড়াতেই চারদিক বন্ধ চৌকো পুরনো একটা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে। ভ্যানের সামনে একটা আলগা বোর্ডের ওপর বড় বড় হরফে ওদেরই সেলাইয়ের স্কুলের নাম লেখা। ড্রাইভার রাস্তায় নেমে এ-বাড়িরই দোতলার দিকে চেয়ে আছে।

ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, পরীরাণী দত্ত কার নাম?

ড্রাইভার একটা খাম দেখিয়ে জানিয়ে দিল, চিঠি আছে।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে পরীরাণী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলো। লোকটার হাত থেকে খামটা নিল। ওদেরই স্কুলের ছাপ-মারা খাম। তার মধ্যে তেমনি ছাপ-মারা প্যাডের কাগজে চিঠি একটা। নীচের স্বাক্ষর মায়া মিত্র—অর্থাৎ, এ-দিকের শাখার বড়দি মায়াদি লিখেছে। লিখেছে, সে এখন হেড আপিসে আছে, গাড়ি পাঠানো হল, পরীরাণী যেন ওখানকার সেলাইয়ের স্কুলে না গিয়ে পত্রপাঠ এই গাড়িতে হেড আপিসে চলে আসে—বিশেষ সুখবর আছে।

বুকের তলায় একটা আনন্দের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল পরীরাণীর। কি সুখবর হতে পারে ধারণা নেই। নিশ্চয় এমন কিছু যার জন্যে বড়দি হেড আপিসে বসে থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

—আসছি।

মিনিট তিন চারের মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলো। খালি হাতেই এলো, সেলাইয়ের ঝোলাটাও সঙ্গে নেয়নি। হেড আপিসে নিশ্চয় কেউ সেলাই করতে বলবে না ওকে। ওদিকে বাবা-মা ঘুমুচ্ছে। দাদা বা বীরুমামু কোনদিনই দুপুরে ঘরে থাকে না, সেদিনও ছিল না। নিচের তলার ভাদুড়ী মশাই আর তাঁর গিন্নিও ঘুমুচ্ছে, তাঁদের ছেলে ইস্কুলে।

ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে দিল। পরীরাণী উঠে বসল।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল ঠিক জানে না। চিঠির কথা ভাবছিল। মায়াদির কথা ভাবছিল। বিশেষ সুখবর কি হতে পারে ভাবছিল। দুপুরের একটা ফাঁকা রাস্তা ধরে ভ্যান ছুটেছে। পিছনের উঁচু তারের জালের ভিতর দিয়ে তাকালো একবার। কোন্ রাস্তা ধরে চলেছে ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

ভ্যানটা হঠাৎ দাঁড়াল এক জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে তিনজন লোক লাফিয়ে ভিতরে ঢোকামাত্র সবেগে গাড়ি ছুটল আবার। পরীরাণী প্রথমে বিমূঢ়, পরে স্তব্ধ বিবর্ণ। দুটো লোক অচেনা, আর একজন বসন্ত সরখেল। লোক দুটোর হাতে ঝকঝকে ছোরা, চোখে কুটিল হিংস্র হাসি। বসন্তর হাতে ছোট কাঠের বাক্স একটা। পরীরাণী যদি চীৎকার করে ওঠে তাহলে ওর মুখ বা গলা চেপে ধরার জন্যে তিনজনেই প্রস্তুত।

বসন্ত সরখেল একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ল। আনন্দ আর সেই সঙ্গে চাপা রাগে হিসহিস করে বলল, এবারে, এবারে বুঝতে পেরেছিস কার পাল্লায় পড়েছিস? একটা টুঁ শব্দ করলে একেবারে শেষ হয়ে যাবি। মুখ বুজে থাক. এতে কি আছে. দেখ—

হাতের কাঠের বাক্সটার ঢাকনা টানতে ভিতের একটা রুমালের মতো দেখা গেল। ঢাকনা বন্ধ করল।—এটা নাকে চেপে ধরলে অজ্ঞান হতে আধ মিনিট লাগবে, তারপর কেটেকুটে তোকে এমন জায়গায় পুঁতে আসব যে দুনিয়ার কেউ কোনদিন টের পাবে না। ভালো চাস তো একেবারে মুখ সেলাই করে বসে থাক।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে পরীরাণীর। চারদিকে কালো কালো কিসব দেখছে। শরীরের সমস্ত রক্ত সিরসির সিরসির করে পা বেয়ে নামছে। ওই রকম করে না শাসালেও গলা দিয়ে শব্দ বার করার শক্তি নেই পরীরাণীর। কাঠ হয়ে বসে আছে আর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে বসন্ত সরখেল ওর ছোট হাত ব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলল। আনা কয়েক পয়সা, একটা সস্তা কলম, আর খামের ওই চিঠি—মায়াদির চিঠি। এটাই দরকার ছিল বোঝা গেল। খামশুদ্ধ চিঠিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ল। একজন সাগরেদের হাতে দিতে সে ছেঁড়া টুকরোগুলো রাস্তায় ফেলে দিল। হাসি-হাসি মুখে বসন্ত বলল. কত সহজে টোপ গিলেছিস দেখলি তো? ভালো কথায় কান দিলি না, এখন তোকে রক্ষা করবে কে? সেদিন তো রাস্তায় চার-চারটে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলি—আজ কি করবি?

এবারে কিছু ভাবতে পারছে পরীরাণী। সেলাই স্কুলের খাম আর প্যাডের কাগজ যোগাড় করে কোনো মেয়েছেলেকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছে...ওর সেই ছোট দাদার বউকে দিয়েও হতে পারে...গাড়ির সামনে আলগা বোর্ডে সেলাই প্রতিষ্ঠানের নাম ঝুলিয়েছে। সত্যি হলে গাড়ির গায়ে নাম লেখা থাকত। ওর মতো বোকা দুনিয়ায় আর কে আছে, ও মরবে না তো কে মরবে?

গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে বসে বসন্ত সরখেল এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে আছে। একটু গণ্ডগোলের আভাস পেলেই মুখ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত। খোলা ছোরা হাতে প্রস্তুত সঙ্গের লোক দুজনও। ওদের চোখগুলো লোভে চকচক করছে, শরীরটার আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করছে। একজন ওর ও-পাশে গা ঠেকিয়ে বসতেই বসন্ত সরখেল কড়া হুকুম করল, সুবলা সরে বোস।

সুবলা (সুবল) অবাক যেন একটু। সামান্য ব্যবধান রচনা করে বলে উঠল, সে কি গো গুরু, তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি?

বসন্ত সুর পালটালো তক্ষুনি।—না রে, ভয়ে কেমন সিঁটিয়ে আছে দেখছিস না, হার্ট ফেল-টেল করলে শেষে মরা শরীরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবি নাকি?

এবার অন্যজন হেসে উঠল একটু। ছোরা হাতে পরীরাণীর পায়ের সামনে মেঝেতে ধুপ করে বসে পড়ল।—হার্ট ফেল করার মতো মেয়ে তো মনে হচ্ছে না, গুরু একটু পটেছে মনে হচ্ছে, চোখে মুখে প্রেম-প্রেম ভাব দেখছি।

হাসি-মাখা দু-চোখ পরীরাণীর বুকে মুখে একবার বুলিয়ে নিয়ে বসন্ত বলল, তা একটু টান তো হবেই, ওর যখন ন-বছর বয়েস আর আমার তেরো-চোদ্দ তখন থেকে পাশবালিশ সাপটে ধরে ভাবতাম ওকে বুকে চেপে আছি। পাজী মেয়ে আমার কথা শুনলে কি আজ তোদের দলে টানতে হত!

অন্য দু-জন চু-চু করে হেসে উঠল। মেঝের লোকটা পরীরাণীর পা-দুটো টেনে নিজের কোলের ওপর তুলে ফেলল।—রাখো না চাঁদ, লজ্জা কি, লক্ষ্মী মেয়ের মতো থাকলে এই পা কোলে ছেড়ে মাথায় করে রাখব—কালে দিনে তুমি আমাদের দেবী চৌধুরাণী হবে, আর অন্য দিকে তিন মালিকের দ্রৌপদী। অর্জুনের মতো গুরুর দিকে যদি একটু বেশি নেকনজর করো—তাতেও আপত্তি করব না, কি বলিস রে সুবলা?

লোলুপ তিনটে ইতর-মুখ দেখছে পরীরাণী, ইতর রসিকতা আর ইতর হাসি কানে আসছে। ভিতরটা কাঁপছে ঠক ঠক করে, বাইরেটা ভাবলেশশূন্য মূর্তির মতো। পা থেকে স্যাণ্ডেল জোড়া খসে গেছে। লোকটা ওর পায়ে আর গোড়ালির ওপর পর্যন্ত হাত বুলোচ্ছে। বসন্ত সরখেল সুবলের কাছ থেকে সরিয়ে রাখার মতো করে ওকে নিজের দিকে একটু টেনে ধরে আছে। আর বসন্তর চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুবল ওর ও-পাশের হাতখানায় এক-একবার চাপ দিচ্ছে। কতকগুলো সাপ যেন পরীরাণীর সর্বাঙ্গে কিলবিল করছে—অথচ শরীরটা এমন কাঠ যে ও শিউরেও উঠতে পারছে না। শরীরের রক্ত শুধু সিরসির করে পা বেয়ে নামছে—নামছেই।

পায়ে হাত বুলোচ্ছে যে লোকটা তার নাম হারু। হঠাৎ কি হল পরীরাণী নিজেও জানে না। আচমকা ওর দু'পায়ের ধাক্কায় লোকটা বসা থেকে চিৎ। সঙ্গে সঙ্গে সুবল ওর মুখের ওপর ছোরা উঁচিয়ে ধরল। আর কাঁধের ওপর বসন্তর হাতের চাপ বাড়ল। তারপরেই ব্যাপারখানা বুঝে এরা দু'জন অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল। হারু আবার উঠে বসতে বসতে হাসল একটু।—বেড়ে তেজী দেখি গুরু, আর তুমি বলছ হার্টফেল করবে! আর দুই একবার বুকের ওপর ওই পা চললে তোমার সঙ্গেই আমি ডুয়েল লড়ব বলে দিলাম গুরু—

হাসি আর রসালাপের বিরাম নেই। বিশেষ করে সুবল আর হারুর। বসন্ত সরখেল

সব সময় যোগ দিচ্ছে না তাতে। থেকে থেকে ওকে দেখছে, লক্ষ্য করছে। গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। কোথায় কোন মৃত্যুর দিকে পরীরাণী জানে না। মনে হল নির্জন রাস্তায় গাড়িটা একটা বিশাল চত্বর ধরে ঘুরছে কেবল। বসন্ত এক-একবার উঠে সামনের জালে মুখ ঠেকিয়ে ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আসছে। শরীরের রক্ত নামা প্রায় শেষ যেন, পরীরাণী ভালো করে কিছু ভাবতে পারছে না। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়া যায় না?

গাড়িটা এক সময় থামতে ও সচকিত। দিনের আলোয় ভালোমতো টান ধরেছে তখন। কোথায় কত শ' মাইল দূরে এসে গেছে ও? আর কত রক্ত আছে এই শরীরটাতে? আবার পা বেয়ে নামতে লেগেছে।

দরজা খোলা হল। একদিকে সুবল অন্যদিকে বসন্ত ওকে ধরে নামালো। বাইরে আবছা অন্ধকার। সামনে একটা বা দুটো ঘরের ভাঙা দালানের মতো একটা। তার চারদিকে আগাছা। ওকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সুবলের হাতের ছোরাটা ওর পাঁজরে ঠেকল। কঠিন চাপা গলায় বসন্ত বলল, খবরদার। ট্যাঁ-ফোঁ করলে মরবি।

টেনে ওকে দালানের সামনের ঘরে আনা হল। পাশে আর একটা খুপরি ঘর। মেঝেতে একটা নোংরা শতরঞ্চি বিছানো। কাঁধ চেপে বসন্ত দেওয়ালের ধারে বসিয়ে দিল ওকে। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গন্ধ একটা। বসন্ত বলল, ওই দিকের জানালা খুলে দে, চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ টের পাবে না।

হারু আর সুবল বেরিয়ে গেল। মিনিটকতক বাদে দুটো বোতল আর একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ফিরল তারা। হাসি মুখে বসন্ত দরজা বন্ধ করে দিল।

পরীরাণীর দু'হাতের মধ্যে নরকের আসর বসল। বসন্ত একটা বোতলের ছিপি খুলে তিনটে গেলাসে অনেকটা করে মদ ঢালল। গেলাসে গেলাস ঠেকিয়ে উৎসব শুরু করল তারা। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একরাশ চপ আর কাটলেট বার করা হল। টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনাটাতে খানকতক তুলে বসন্ত পরীরাণীর সামনে রাখল।—অনর্থক বোকার মতো কষ্ট করিস না, খেয়ে নে, অবাধ্য হলে তোর কপালে আরো বেশি দুঃখ আছে বলে দিলাম।

পরীরাণী স্পর্শও করল না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মূর্তির মতো বসে আছে। সুবল আর হারু গোগ্রাসে চপ কাটলেট গিলছে আর মদ গিলছে। বসন্ত তার গেলাস এক একবার ঠোঁটে ঠেকাচ্ছে আর ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছে। হারু বলে উঠল, লজ্জা কি গো দেবী চৌধুরাণী, কাটলেট ভেঙে মুখে দাও একটু। তোমার জন্য গুরুর আজ কত খরচ জানো, ওই ড্রাইভার ব্যাটাকেই গুণে কড়কড়ে তিনশটি টাকা দিতে হবে—তার ওপর এই সবের খরচ—

গেলাস হাতে বসন্ত উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গিয়ে সামনের খুপরি ঘরটাতে ঢুকল। একটু বাদে ফিরে এসে হাসি-হাসি মুখে বলল, বেড়ে জায়গাটি ঠিক করেছিস রে হারু—এক্কেবারে নন্দন কানন।

দেখা গেল তার হাতের গেলাস খালি। টলছে একটু একটু। বসল ধুপ করে। বোতলটা খালি করে তিন গেলাসে মদ ঢালল আবার। ফিরে ফিরে দেখছে পরীরাণীকে আর হাসছে। সুবল আর হারু অশ্লীল জঘন্য রসিকতা শুরু করেছে ওকে লক্ষ্য করে,

চপ কাটলেট চিবুচ্ছে আর মদ খাচ্ছে। গুরুর সায় পেয়ে ওদের রসিকতার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়েছে।

বসন্তর হঠাৎ যেন মনে পড়ল কি। কতগুলো চপ কাটলেট হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর অন্য হাতে নিজের গেলাসটা নিয়ে বলল, ড্রাইভার ব্যাটা সেই থেকে মুখ শুকিয়ে আছে মনে করবি তো, দিয়ে আসি গোটা-কতক। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, আর একটু বাদে খালি গেলাস হাতে টলতে টলতে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করল।

এবারে দ্বিতীয় বোতল খোলা হল। সুবল টেনে টেনে বলল, বড় যে তাড়াতাড়ি সাপটানো হচ্ছে গুরু—

—তাড়াতাড়ি না তো কি, রাত ভোর করবি এখানে। কত দূর পাড়ি দিতে হবে এরপর খেয়াল আছে—কলকাতায় তো আর পনের দিনের মধ্যে ফিরছি না—

হারু বলল, দেবী চৌধুরাণী তার আগেই টিট হয়ে যাবে, কেমন লক্ষ্মী মেয়ের মতো বসে আছে দেখছ না?...কিন্তু ও যে কিছুই খাচ্ছে না গুরু, আমার কষ্ট হচ্ছে।

বসন্ত দাঁত বার করে হেসে বলল, তুই আদর করে খাইয়ে দে না...

হারু সানন্দে একটা শিস দিয়ে এগিয়ে গেল। জোর করেই একটা কাটলেট ওর মুখে গুঁজে দিতে চেষ্টা করল। তারপরেই হাতের ধাক্কায় চিৎপাত। অন্য দুজন হেসে উঠল। হারু নিজেও। বসন্ত বলল, সুবলা তোর হাতে খাবে বোধ হয়, তুই চেষ্টা কর—

সুবল বসে বসে সে-দিকে এগোতে বসন্ত নিজের গেলাস হাতে তুলে নিল। সুবল শক্ত হাতে পরীরাণীর কাঁধ বেড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে বলল, আমার হাতে না খেলে দাঁতে করে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাব আমি চাঁদ, আমার নাম সুবলসখা—

কিন্তু মদের নেশায় সেও সজুত করতে পারছে না। হারু আর সুবল দুজনে কাটলেট হাতে ওকে ধরে টানাটানি করছে।

ঠক করে হাতের গেলাস নামিয়ে রাখল বসন্ত সরখেল। গেলাসের বস্তু চার ভাগের তিন ভাগ খালি। সে এগিয়ে এলো।—সর, মুরোদ বোঝা গেছে তোদের।

এক ঝটকায় পরীরাণীকে বসা থেকে একেবারে টেনে তুলল। তারপর কাঁধ ধরে আরো জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিল গোটা দুই। শক্ত হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল খুপরি ঘরের দিকে। ঘুরে বলল, দু'ঘণ্টার আগে কেউ এদিকে আসবি তো খুন করে ফেলব বলে দিলাম—

—হিয়ার হিয়ার! হিয়ার হিয়ার! গুরু ইজ গ্রেট। সমস্বরে ওরা আনন্দে ভেঙে পড়ে যে যার গেলাসে চুমুক দিয়ে শুভেচ্ছা জানালো।

একটা জড় দেহকে যেন টানতে টানতে বসন্ত সামনের ছোট ঘরে নিয়ে এলো। দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিল। তারপর শক্ত দু' হাত ওর কাঁধে রেখে ক্রুর শাণিত চোখে চেয়ে রইল। ঠোটের ফাঁকে ছুরির ফলার মতো হাসির রেখা।

পরীরাণীর এবারে অন্ততঃ চিৎকার করে কেঁদে ওঠার কথা, কেঁদে ওর দু'পায়ে লুটিয়ে পড়ে মুক্তি ভিক্ষা করার কথা। কিন্তু কিছুই করল না। কিছুই পারল না। নিষ্পলক দুটো চোখ শুধু ওর চোখের ওপর। নেশার ফলে একটু ধাক্কা খাবার সঙ্গে সঙ্গে ওই লোক দুটো ছিটকে পড়ছিল—কিন্তু এই শয়তানের গায়ে যেন অসুরের শক্তি, থাবার মতো দুটো হাত ওর কাঁধে চেপে বসে আছে। নাকে মদের গন্ধও আসছে না।

—আমিও মদ খেয়ে ওদের মতো বেহুঁশ হলে তোর বাঁচার আশা আছে ভেবেছিলি কেমন? দু' চোখে নিষ্ঠুর আনন্দ যেন গলে গলে পড়ছে, দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বলল, আমি মদ জিভে ঠেকাইনি, কেবল তোর জন্য এখনো একটু দরদ আছে বলে, বুঝলি? তোকে দেখার পর থেকে দরদ হচ্ছে—দু'বার গেলাসের মদ ফেলে দিয়েছি, আর শেষবার ওদের গেলাসে ঢেলেছি। আরো একটু সামনে ঝুঁকে তেমনি নিষ্ঠুর জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইল খানিক।

—বাঁচতে চাস?

পরীরাণীও নির্বাক চেয়ে আছে।

আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা টানটান হয়ে ঘুমুবে। সেই ফাঁকে বাঁচতে চাস? নেশা ছুটলে আজ হোক কাল হোক ওরা সুদ্ধু তোকে শকুনির মতো ছিঁড়ে খাবে। বাঁচতে চাস?

মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয় ফেরার তাগিদ। সেই আকুতি নিয়ে পরীরাণী মাথা নাড়ল। বাঁচতে চায়।

—আর অবাধ্য হবি?

মাথা নাড়ল। অবাধ্য হবে না।

—আমার কথা ঠিক ঠিক শুনবি?

মাথা নাড়ল। শুনবে।

ওকে ধরে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে রইল বসন্ত সরখেল। সে-যেন একটা যুগ। তারপর খুপরি ঘরের ওদিকের দরজার কাছে এলো। খুব সন্তর্পণে ছিটকিনি খুলল। পরীরাণীর হাত ধরে বাইরে এসে দরজাটা আবার ঠেলে দিয়ে দালান থেকে নেমে পড়ল।

অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না পরীরাণী। ওর হাত ধরে একজন টেনে নিয়ে চলেছে আর ও অন্ধের মতো চলেছে। প্রায় একশ গজ হাঁটার পর একটা গাছের নীচে কালো ভ্যানটার সামনে এসে দাঁড়াল। পথ চলতি কারো চোখে না পড়ে সেই জন্যেই ড্রাইভারকে খাবার দিতে এসে গাড়িটা এখানে রাখতে বলেছিল বসন্ত। তার আসল উদ্দেশ্য ড্রাইভারও বোঝেনি।

ড্রাইভারকে ডেকে ওকে গাড়িতে তুলল। নিজেও উঠে হুকুম করল, চালাও—।

ড্রাইভার অবাক হয়েছিল বটে। কিন্তু টাকার সম্পর্ক যার সঙ্গে তার কথায় কাজ। দ্বিরুক্তি না করে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটেছে। পরীরাণীর মাথা আরো সক্রিয় ততক্ষণে। ও কি বাঁচবে? বাঁচতে চলেছে? অন্ধকার থেকে জীবনের আলোয় চলেছে? এই লোকটা কি করবে এখন? কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে? রাত কত এখন জানে না। বাড়ির লোকেরা কি ভাবছে? দাদা আর বীরুমামু কি ওকে খুঁজতে বেরিয়েছে?...আর নিজের তলার শেখর ভাদুড়ী? সেও কি নিশ্চেষ্ট বসে আছে? না, তা হতে পারে না।

খুক করে একটু হাসির শব্দ হতে পরীরাণী সচকিত। বসন্ত সরখেল নিজের মনেই হেসে উঠেছে। ওর গা ঘেঁষেই বসে আছে। গাড়ির ভিতরে আবছা অন্ধকার। পরীরাণী সন্তর্পণে একটু সরে বসতে চেষ্টা করে আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো তার দিকে।

চকচকে চোখ দেখল আর ঝকঝকে দাঁত দেখল।

বসন্ত বলল, ওই শালা সুবলা আর হারু এরপর আমাকে জ্যান্ত পুঁততে চাইবে, বাগে পেলে একেবারে খতম করবে, মরুক গে, ওদের হিম্মত জানা আছে। তাছাড়া তোকে পেলে আমি জানের পরোয়া করি না। বিয়েই যখন করব পরিবারের ভাগ দেয় কোন্ শালা—

উঠে জালের ফাঁক দিয়ে ড্রাইভারকে কি বলে এসে গা-ঘেঁষে ঘন হয়ে বসল আবার। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। জলের গুঁড়ি পরীরাণীর মাথায় আর মুখে লাগছে। শরীরটা আপনা থেকেই কুঁকড়ে যেতে চাইল আবার। লোকটার একটা সর্পিল হাত ওর পিঠ ঘিরে কাঁধের ওপর উঠে এসেছে। ঝুঁকে হাসি-মাখা লোলুপ চোখে দেখছে ওকে।

—দেখ তো, তোর জন্যেই কি কাণ্ড না হয়ে গেল। আমার কথা যদি শুনতিস এই দুর্ভোগ হত? কবে মিসেস সরখেল হয়ে বসে থাকতিস—

হেসে উঠল।—কোথায় যাচ্ছি বল তো?

...বাড়ি যাব।

—বাড়ি! মাইরি আর কি, বাড়ি গিয়ে আমাকে কলা দেখাবার মতলব? শীগগির এখন বাড়ির কথা তুলবি তো খুন হয়ে যাবি। হেসে উঠল, সেই কোন দক্ষিণে তোর বাড়ি আর আমরা কোন্ উত্তরে...তোদের বাড়ি যখন ঢুকব একেবারে পাকাপোক্ত জামাই হয়ে ঢুকব, বুঝলি?

শরীরের রক্ত সেই রকম সিরসির করছে আবার।...কাঁধের ওপর আঙুলের চাপ বাড়ছে, চোখের লোলুপতা বাড়ছে। নিঃশ্বাস নেওয়া-ফেলার তারতম্য টের পাচ্ছে। পিঠে এক হাত জড়ানোই ছিল, অন্য হাত সামনের দিকে উঠে এলো। বসা থেকে সজোরে বুকের ওপর টেনে নিল ওকে। ক্ষিপ্র নিষ্পেষণে বুকের পাঁজরগুলো টনটন করে উঠল। পরীরাণী প্রাণপণে বাধা দিতে চাইছে, কিন্তু সর্ব অঙ্গ অবশ, এতটুকু শক্তি নেই যেন। একটা যন্ত্রণা কেবল সর্বাঙ্গে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে।

—উঃ! গাড়িটা আচমকা ব্রেক কষতে পুরুষ গলায় অস্ফুট শব্দ। ওকে একটু ঠেলে সরিয়ে বসন্ত তাড়াতাড়ি কোমরে হাত ঢোকালো। কোমর থেকে চকচকে একটা ছোরা বার করে চাপা উত্তেজনায় বলল, শালার খোঁচা লেগে গেল! তারপরেই খুক খুক হাসি, সুবলার মাল হাতিয়ে এনেছি, ভাবলাম কি কাজে লাগে ঠিক কি।

ছোরাটা সামনের সীটে ছুঁড়ে ফেলে উঠল। ড্রাইভারকে আবার কি নির্দেশ দিতে গেল। সেই মুহূর্তে সব ক'টা স্নায়ু টান-টান পরীরাণীর। ওই ধারালো অস্ত্রটাই একমাত্র ভরসা—ওটা তুলে নিয়ে নিজের বা ওর যে কোনো একজনের বুকে বসাতে পারলে হয়। ছিটকে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কোমরের শাড়ির বাঁধন খুলে গেছে। সহজাত অনুভূতিতে সেটাই তাড়াতাড়ি ঠিক করে নিতে গেল।

তাইতেই দেরি হয়ে গেল। বসন্ত সরখেল ঘুরে এগিয়ে এলো! মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি সংশয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তারপর ত্রস্ত বসন সামলাবার দায় ধরে নিয়ে পিচ্ছিল হাসি ঝরল মুখে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই আবার তাকে বুকে জাপটে ধরে চাপা আনন্দে বলল, ভিতরে তো শুধু আমি, অত লজ্জার কি আছে তোর। পরীরাণীর মাথাটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে, একটা পাঁকের কুণ্ডের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

গাড়িটা এক জায়গায় থামতে ওকে ছেড়ে দিল। উঁচু জালের ফাঁক দিয়ে শহরের

আলো দেখা যাচ্ছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে তখনো। গাড়িটা খানিক থেমেই রইল। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভার নেমে গেছল বোঝা গেল, কারণ তার ওঠার আর দরজা বন্ধ করার শব্দ এলো। তারপরেই জালের খুপরির ভিতরে হাত বাড়িয়ে বলল, নিন সার—

উঠে গিয়ে বসন্ত তার হাত থেকে কি নিয়ে পকেটে পুরল বোঝা গেল না। সেই ফাঁকে পরীরাণী সতৃষ্ণ চোখে আবার সামনের দিকে তাকিয়েছে। ছোরাটার দিকে। কিন্তু সুযোগ আর মিলবে না জানে।

আবার মিনিট দশেক চলার পর গাড়িটা থামল। বসন্ত উঠে ছোরাটা ট্যাঁকে গুঁজল। তারপর ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকালো।—কোনরকম শয়তানী করবি না?

জবাব দেবার শক্তি নেই, শ্রান্ত দু'চোখ তুলে পরীরাণী তাকালো শুধু।

এতটুকু অবাধ্য হলে আর কোনরকম শয়তানীর মতলব দেখলে এই ছোরা তোর বুকে বসাব মনে থাকে যেন—কোনো শালা ঠেকাতে পারবে না। আয়—

হাত ধরে টেনে তুলল ওকে। দরজা খুলল। ধরে নামালো। শক্ত মুঠোয় হাত ধরেই থাকল। ড্রাইভারকে ফিসফিস করে কি বলল। পরীরাণী বিমূঢ়। কোথায় এসেছে ঠাহর করতে পারছে না। রাত বেশি হয়নি বোঝা যাচ্ছে। মিনিট চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ আগে গাড়িতে উঠেছিল। একটা বিশাল এলাকা। দূরে দূরে দু-পাঁচ জন মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছে। ছাতা মাথায় এদিক ওদিক চলেছে। সামনের একটা ছোট মন্দিরে আলো জ্বলছে। কাছেই এধারে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। লোক বাঁচিয়ে বসন্ত ওকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আর দাঁতে দাঁত চেপে মাঝে মাঝে সতর্ক করছে ওকে।—সাবধান...একটু গণ্ডগোল করবি তো একেবারে খতম করে দেব।

লোক এড়িয়ে আর একটু এগোতেই সামনে বিশাল গঙ্গা। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পরীরাণী সচেতন। চিনেছে। দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। অন্ধকার সত্ত্বেও এবারে অদূরে মায়ের মন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

...কিন্তু এখানে কেন! এখানে আসার পরেও মা কি ওকে রক্ষা করবে না? সতৃষ্ণ চোখে তাকালো। বৃষ্টির দরুন লোক নেই। যা-ও আছে এই শয়তান তাদের কাছে এগোবে না।

বলল, মাকে প্রণাম কর এখান থেকেই।

কলের মূর্তির মতো পরীরাণী প্রণাম করল। দু'হাত জুড়ে ও নিজেও প্রণাম সারল। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করল কি। ছোট একটা প্যাকেট ছিঁড়ল মনে হল। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে এই জিনিসটাই ওকে এনে দিয়েছিল মনে হল।

সত্রাসে পরীরাণী দেখল। সিঁদুরের প্যাকেট। খানিকটা সিঁদুর ওর কপালে আর সিঁথিতে ঘষে দিল। বলল, মা কালীকে সাক্ষী রেখে আজ তোকে আমি বিয়ে করলাম। এর পরে পুরুত ডেকে ফাঁক মতো বিয়ে হবে'খন, আসল বিয়ে এই হয়ে গেল।

পরীরাণী কাঠ। হাত ধরে আবার তাকে কালো ভ্যানটার দিকে টেনে নিয়ে চলল। ড্রাইভারকে কি বলে তার পাশের সীটে ওকে তুলে বসিয়ে দিল। নিজে চালকের আসনে বসল। ড্রাইভার ভিতরে ঢুকে গেল।

মিনিট পনেরর মধ্যে গাড়ি একটা গলির মুখে থামল। বাইরে তখনো ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। বসন্ত সরখেল গম্ভীর কঠিন মুখে একটু ঘুরে বসল, তারপর দু-হাতে পরীরাণীর

মুখটা ধরে নিজের দিকে ফেরালো। বলল, এখন যেখানে যাচ্ছি সে আমার বিশ্বাসী পুরনো বন্ধু, নাম বিমল বিশ্বাস, অনেক দুর্দান্ত লোক, ঘরে তার বউ আছে, সেখানে দু-তিনদিন থাকব আমরা...ওখানে এই মুখ করে থাকলে চলবে না, হাসতে হবে, যদি এতটুকু বেচাল দেখি তাহলে রক্ষা থাকবে না, এই শেষবারের মতো বলে দিলাম—

লাফ দিয়ে নামল। এদিকে ঘুরে এসে ওকেও হাত ধরে নামালো। তারপর মুখের দিকে এক মুহূর্ত থমকে তাকিয়ে নিজের হাতে ওর শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। ও-দিকে ড্রাইভার আগেই নেমেছে, ইশারায় তাকে কাছে ডাকল।

এক মিনিটের মধ্যে তার হিসেব মিটানো হয়ে গেল। এই অবকাশটুকুর মধ্যেই পরীরাণীর সমস্ত সত্তা আবছা অন্ধকারে দিশেহারা ছুট লাগাবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু পারল না, ওই লোকটা যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে গ্রাস করেছে।

হাত ধরে বসন্ত সরখেল ওকে গলির অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলল। পরীরাণীর মনে হল জীবন থেকে শেষ আলোর আশাটুকুও খসে গেল।

সারি সারি একতলা পুরনো ঘর কতগুলো। তারই একটার সামনে এসে বন্ধ দরজার কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দরজা খুলে দিল।

—বিমলদা আমি বসন্ত, বসন্ত সরখেল, চিনতে পারছ তো?

সঙ্গে রমণী দেখে লোকটা অবাক, কি আশ্চর্য, আয় ভিতরে আয়, কি ব্যাপার?

—ব্যাপার সাংঘাতিক। হাসি মুখে পরীরাণীকে নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল বসন্ত, বিমলদার কাছে যখন এসে গেছি আর কিচ্ছু ভাবনা নেই গো, বিমলদা আমাদের ঢের আগে এই পথ দেখিয়েছে। আর একদফা হেসে ওই লোকের দিকে ফিরল, তুমি একেবারে হাঁ হয়ে গেলে দেখি বিমলদা, বুঝতে পারছ না?...আমার বউ, সব বলছি রোসো, শুনলে তুমি আনন্দে আটখানা হয়ে শিষ্যের পিঠ চাপড়াবে, মালতী বউদি কোথায় ডাকো—

ডাকতে হল না, পাশের ঘরের দরজায় বছর পঁচিশ-ছাব্বিশের একটি বউ এসে হতভম্ব প্রথম, তারপর সবিস্ময়ে বলে উঠল, এ-কি কাণ্ড!

খুশির আতিশয্যে বসন্ত এগিয়ে এসে তার পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল, তারপর পরীরাণীর হাত ধরে তার কাছে টেনে এনে বলল, প্রণাম করো, প্রণাম করো, কার কাছে এসেছ জানলে পরে তোমার ভয়-ভাবনা কিচ্ছু থাকবে না, মালতী বউদির তুলনায় তুমি একটি খুকীর মতো ভীতু!

প্রণাম করতে হল না, সপুলক বিস্ময়ে মালতী বউদি দু'হাতে তাকে ধরে মুখখানা দেখল।—বাঃ, কি মিষ্টি! বসন্তর দিকে তাকালো, এই ব্যাপার, অ্যাঁঃ! আমি আরো ভাবছিলাম, এমন হরিহর আত্মা দুজনের অথচ তিন-চার মাসের মধ্যে টিকির দেখা নেই কেন!

ও-ঘরের চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে বছর পাঁচেকের এক কচি মেয়ে হাঁ করে পরীরাণীর দিকে চেয়ে আছে। বসন্ত হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে তাকে মাথার ওপর তুলে বার দুই ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, কি দেখছিস, তোর কাকিমা—!

তাকে নামিয়ে এদিকে এগিয়ে এলো—শোনো বিমলদা, শোনো বউদি, আজ আর কাল দুটো দিন আমরা তোমাদের অতিথি, সব বলছি, ইয়ে—আচ্ছা তুমি এ-ঘরে এসো তো পরী, খুকুর সঙ্গে গল্প করো, কি আশ্চর্য, তোমার মুখখানা এত শুকনো কেন, এখনো ভয় নাকি, যা হবার তো হয়েই গেছে, এসো—

হাত ধরে টেনে পরীরাণীকে ভিতরের ঘরে ঠেলে ঢোকালো। চাপা ফিসফিস করে বলল, সাবধান, এতটুকু অবাধ্য হলে জ্যান্ত ফিরতে হবে না।

মেয়েটার সঙ্গে ওকে ভিতরের ঘরে রেখে দরজা দুটো বাইরে থেকে টেনে দিল।

পরীরাণী নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। মেয়েটা তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। পা দুটো অবশ পরীরাণীর, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। সামনের চৌকিতে একটা শয্যা বিছানো, কিন্তু ওখানে গিয়ে বসতেও মন সরল না।

মিনিট দশেক বাদে মাঝের দরজা খোলা হল যখন পরীরাণী তেমনি দাঁড়িয়ে, আর ছোট মেয়েটা সেই বোবা ঘর থেকে বেরুনোর জন্যে অস্থির।

বউদি অর্থাৎ মালতী হাসি মুখে এগিয়ে এলো, পিছনে বসন্ত। মালতী সাদরে তার হাত ধরে বলল, কি আশ্চর্য, সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছ...এত সাহস দেখিয়ে এখন এত ঘাবড়ালে চলে! এসো, বোসো—

হাত ধরে টেনে শয্যায় বসালো তাকে।—বিয়ে যখন হয়েই গেছে কে আর কি করবে, তার ওপর তো আমার মতো মুখ্যু নও, দস্তুরমত লেখাপড়া জানা মেয়ে—কোর্ট-কাছারি করেও কেউ সুবিধে করতে পারবে না, আর দু-দুদিন ছেড়ে দশ-বিশ দিনও থাকতে পারো, এখানে কেউ জোর দেখাতে এলে ওর এক ডাকে বিশ-পঞ্চাশজন মরদ এসে দাঁড়িয়ে যাবে—

ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল পরীরাণী, বলতে ইচ্ছে করল, সব মিথ্যে, যা তাদের বলা হয়েছে সব মিথ্যে! কিন্তু গলা দিয়ে একটি শব্দ বার করতে পারল না, নিষ্প্রাণ মূর্তির মতই বসে রইল।

হেসে হেসে বসন্ত সরখেল বলল, তোমার সাহসের সঙ্গে কারো তুলনা! তার এক কণাও যদি থাকত, নরককুণ্ড থেকে বেরুবার জনা কান্নাকাটি আবার সব চুকিয়ে বুকিয়ে এখন বুক ধুকপুক। হাসি-হাসি মুখে যেন সাহসই দিতে চেষ্টা করল পরীরাণীকে, বউদির হিম্মতের কথা শুনলে তাজ্জব হয়ে যাবে, সব শালাকে কলা দেখিয়ে কার্ফুর রাতে পুলিশের গুলী তুচ্ছ করে দাদাকে নিয়ে কি-রকম সটকান দিলে—

খুশির বিড়ম্বনা চেপে মালতী ফিসফিস করে শাসালো তাকে, এই ঠাকুরপো, মেয়েটা হাঁ করে শুনছে—

পরীরাণীর বিচার বিশ্লেষণের চোখ থাকলে মনে হতে পারত পালানোর ব্যাপারে মালতীর গরজ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তার নাক চাপা, কপাল উঁচু, চোখ ছোট, কেবল স্বাস্থ্যটি ভালো। সে-তুলনায় বিমল বিশ্বাস লোকটি বেশ সুপুরুষ। কিন্তু পরীরাণীর কিছুই যেন কানে ঢোকে নি, মাথায়ও না।

—তোমরা বোসো ভাই, যা-হোক একটু ব্যবস্থা করি তোমাদের জন্যে, তোমার দাদা আবার এ-সময় কিছু পেলে হয়। মেয়ের হাত ধরল, এই আয়, তোকেও খাইয়ে দিই—

বসন্ত বলল, এই রাতে দাদাকে পাঠাবার কি দরকার ছিল, আমি তো খাবই না কিছু বললাম, ওকেও একটু দুধ-টুধ কিছু খাইয়ে দিলে হত...যে ধকল গেছে, একটু শুতে পারলে বাঁচি।

মেয়েকে সামনের খুপরির দিকে ঠেলে দিয়ে মালতী বউদি হাসি-হাসি মুখে ঘুরে

দাঁড়াল।—করছি বাঁচার ব্যবস্থা, বেহায়া আর কাকে বলে। পরীরাণীর দিকে একটা চটুল দৃষ্টি হেনে সে পাশের ঘরে ঢোকার মুখে দরজা দুটো টেনে দিল।

এক লাফে পরীরাণীর সামনে এসে দাঁড়াল বসন্ত সরখেল। দু' কাঁধ ধরে সজোরে গোটাকতক ঝাঁকুনি দিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তুই কি বোবা? কথা বলতে পারিস না—হাসতে পারিস না একটু? আর অবাধ্য হবি না বলেছিলি না?—কথা শুনবি বলেছিলি না?... ওদের যদি এতটুকু সন্দেহ হয় তোকে আমি আস্ত রাখব না—এই শেষবারের মতো বলে দিলাম।

মালতী জোর করেই পরীরাণীর মুখে কিছু গুঁজে দিয়েছে। বসন্তর উদ্দেশে ঠাট্টা করেছে, তোমার বউকে ভালো করে সাহস দাও, ভয়ে কাঠ হয়ে আছে এখনো—

খাওয়ার পাট চুকতে সামনের ঘরে নিয়ে এসেছে। চৌকির ওপর দুজনের শয্যা পাতা। শয্যায় কিছু ফুল ছড়ানো। বসন্তর দিকে চেয়ে মালতী কপট হেসে বলল, এমন হুট করে এসেছে যে গরীব বউদি ভালো করে বিছানা পর্যন্ত সাজাতে পারল না। পরীরাণীকে শয্যার দিকে ঠেলে দিল, যাও গো, তোমাদের নাকি বড় ঘুম পেয়েছে।

হেলে দুলে নিজের ঘরে পা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। হাসি মুখে মাঝের দরজাটা বন্ধ করতে উদ্যত হল সে।

সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে পরীরাণীর সমস্ত অন্তরাত্মা প্রবল এক ঝাঁকুনি খেয়ে সজাগ হল বুঝি। শেষ মুহূর্তে একটা শেষ চেষ্টা বাকি। চোখের পলকে মাঝের দরজার দিকে ছুটে গেল, পাগলের মতই মালতীকে ঠেলে সরিয়ে ও ঘরে ঢুকল। চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল বিমল বিশ্বাস। দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে তার দু'পা আঁকড়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল, আমাকে বাঁচান, দাদা, আমাকে বাঁচান, সব মিথ্যে কথা বলেছে, আমাকে ভাঁওতা দিয়ে ধরে এনেছে—আপনার ওই মেয়ের মুখ চেয়ে আমাকে বাঁচান দাদা! বাঁচান, বাঁচান—

বিমূঢ় হতচকিত মালতী আর বিমল বিশ্বাস। বসন্ত সরখেল ঘরে ঢুকতে তাদের চমক ভাঙল। দু'হাতে বিমল বিশ্বাসের দু'পা আঁকড়ে ধরে আছে পরীরাণী, বসন্ত সেদিকে এগিয়ে আসছে, হিংস্র কুটিল গম্ভীর। জামা আর শাড়ি সুদ্ধু কাঁধের কাছটা খামছে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলতে চেষ্টা করল ওকে, কিন্তু পরীরাণী আরো জোরে বিমল বিশ্বাসের পা আঁকড়ে ধরেছে, ফলে জামা আর শাড়ি দুই-ই ছিঁড়ে গেল।

—এই ও!

বিষম গর্জন করে বিমল বিশ্বাস চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সেই গর্জনে তার ঘুমন্ত মেয়েটাও চমকে উঠল একবার। বসন্ত সরখেলও দু'পা পিছনে সরে দাঁড়াল, তার এক হাত কোমরে।

—তোমার কোনো ভয় নেই দিদি, পা ছাড়ো। বসন্তের দিকে তাকালো, পুরুত তোদের বিয়ে দিয়েছে বলেছিলি, মিথ্যে কথা?

হিস-হিস সুরে বসন্ত জবাব দিল, ও আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে...সত্যি হোক মিথ্যে হোক তুমি ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে কি-না?

—কে বেইমানি করেছে?

—তুমি ছেড়ে দেবে কি-না? অসহিষ্ণু রাগে বসন্ত চেঁচিয়েই উঠল।

—কি? তুই আমাকে চোখ রাঙাতে এসেছিস...কোমরে হাত কেন, ছোরা বার করবি? জানালার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল, হাঁক দেব? দেখবি কি হয়?

বসন্তর নিষ্পলক দু' চোখ পশুর মতো জ্বলছে।

—বেরো! বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে। চাপা গর্জন করে কাছে এগিয়ে এলো বিমল বিশ্বাস।

কোমর থেকে ছোরাটা আধখানা উঠে এসেছিল, বসন্ত সরখেল সেটা আবার গুঁজে দিল। কিন্তু তার গলার স্বর ছোরার মতই ধারালো আর ভয়াবহ।—বিমলদা বন্ধু ভেবে আমি তোমার কাছে এসেছি, কাজটা ভালো করছ না...ওকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি—

পাল্টা ঝাঝে বিমল বিশ্বাস তেড়ে এলো, এক্ষুনি না বেরুলে ওই ছোরা সুদ্ধু তোকে আমি পুলিশে দেব। বেরো, বেরো বলছি এক্ষুনি!

বসন্ত সরখেল স্তব্ধ কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। অতি লোভের নিশ্চিত শিকার হাত ছাড়া হলে যেমন হয় তেমনি মুখ তেমনি হিংস্র চাউনি তার। ওই শিকার সামনেই বসে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে চাইছে—কিন্তু যে লোক ওই শিকার আগলে আছে সেও প্রস্তুত।

শেষবার পরীরাণীর দিকে একটা নৃশংস দৃষ্টি হেনে আহত বাঘের মতই বসন্ত সরখেল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঝড়ের পরের স্তব্ধতা। দু' হাতে মুখ ঢেকে পরীরাণী মেঝেতেই বসে আছে। খানিক বাদে বিমল বিশ্বাস কথা বলল প্রথম, গলার স্বর ঈষৎ সন্দিগ্ধ রূঢ়।

—ওঠো। চৌকিতে উঠে বোসো।

যন্ত্রচালিতের মতই আদেশ পালন করল পরীরাণী।

—ও তোমাকে এপর্যন্ত নিয়ে আসতে পারল কি করে?

বিপদ কেটেছে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ হতে পারছে পরীরাণী। জেরা করতে হল না, নিজে থেকেই আস্তে আস্তে জানালো, কি-ভাবে তাকে বাড়ি থেকে বার করে এ-পর্যন্ত আনা হয়েছে।

বিমল বিশ্বাস বা মালতী কেউ অবিশ্বাস করল না। মালতী এসে তার গা ঘেঁষে বসেছে, একটা হাত পিঠের ওপর রেখে নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। বিমল বিশ্বাস ভাবছিল কিছু, বলল, তোমাকে থানায় রেখে আসা উচিত এখন, কিন্তু কোনো শালাকে বিশ্বাস করি না আমি...একটা ট্যাকসি যোগাড় করে বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি, কিন্তু এত রাতে কোনো ব্যাটা যেতে রাজি হবে না বোধহয়, তাছাড়া পথ-ঘাট ভালো না।

পরীরাণী চেয়ে আছে তার দিকে, ব্যাকুল দৃষ্টি। বিমল বিশ্বাস বলল, আমাকে দাদা বলেছ যখন তোমার কিছু ভয় নেই দিদি, এই জান থাকতে কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। কাল ভোরে আমি নিজে সঙ্গে করে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

তাই দিয়েছে।

উত্তর প্রান্ত থেকে ভোরের প্রথম বাস ধরেছে তারা। মধ্য কলকাতায় বাস বদল করে বাড়ীর দোরে পা দিয়েছে যখন, সকাল সাতটাও নয় তখন।

পরীরাণী সামনের ছাল-ওঠা বাড়িটার দিকে তাকালো একবার, সঙ্গে সঙ্গে এক দুর্জয় ক্রোধে সমস্ত মুখ লাল। দিনের আলোয় এই মুহূর্তে অন্তত ওর ভয়-ডরের লেশ মাত্র নেই। ইচ্ছে হল এগিয়ে গিয়ে হন-হন করে ওই বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখে শয়তান ফিরেছে কি-না।

মুখ তুলে নিজেদের দোতলার দিকে তাকালো। দোতলার বারান্দায় কেউ নেই। ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে পল্টু ঘোষাল, ওকেই দেখছে। তার গান বন্ধ, ব্যতিক্রম শুধু এইটুকু। পরীরাণীর মনে হল, বাড়ির একটা মেয়ে যে চুলোতেই যাক, কারো ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি।

বিমল বিশ্বাসকে সঙ্গে করে ভিতরে ঢুকল। ও-দিক থেকে বৃদ্ধ অরবিন্দ ভাদুড়ী এগিয়ে এলেন, আর সিঁড়ির কাছে তাঁর স্ত্রী। মাস্টারমশাইয়ের বিমূঢ় চাউনি, স্ত্রীর সন্দিগ্ধ চোখ। পরীরাণীর ভিতর থেকে একটা দুর্বোধ্য ক্রোধ যেন ঠেলে উঠছে আবার। মহিলাকে তুচ্ছ করে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকালো।—শেখরদা ঘুমুচ্ছে?

আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে অরবিন্দ ভাদুড়ী মাথা নাড়লেন।—না, সকালে উঠেই থানায় গেছে, তোর জন্যেই...

শোনার পরেও ভিতরের তাপ কমল না তেমন। ওঁদের শুনিয়ে বিমল বিশ্বাসকে ডাকল, আসুন দাদা।

না, পরীরাণী যা ভেবেছিল তা নয়। নিশ্চিন্ত মনে কেউ ঘুমুচ্ছে না, এমন কি অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমনো অভ্যেস যার সেই মা-ও না। দাদার ঘরের মেঝেতে দাদা আর বীরুমামা বসে, দাদার উসকো-খুসকো মূর্তি। তাদের সামনে মা দাঁড়িয়ে আর পিছনের দিকের দরজার সামনে নিস্প্রাণ-মূর্তি বাবা।

ওরা এসে দাঁড়ানো মাত্র ঘরের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল এক প্রস্থ। ঠিক দেখছে কি দেখছে না সেই সংশয়। তারপর পরিতোষই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রথম।

ঘটনাটা সংক্ষেপে বলে মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যে বিমল বিশ্বাস চলে গেল। পরীরাণী লক্ষ্য করল, কারো চোখ-মুখ কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল না।...মা ওর কাঁধ ছেঁড়া জামাটা দেখছে, আর ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখছে।...বীরুমামুর চাউনিও সরল নয়। বাবার মুখে কোনো বিকার নেই। বোবা চাউনি। দাদার মুখ থমথমে। বিমল বিশ্বাস চলে গেল, এক পেয়ালা চা-ও কেউ খেয়ে যেতে বলল না তাকে।

...দাদা এগিয়ে আসছে। কেন, পরীরাণী জানে না। চোখের দিকে ভালো করে তাকানোর অবকাশ মিলল না। তার আগেই গাল বেড়িয়ে প্রচণ্ড এক চড়, পাঁচ-পাঁচটা শক্ত আঙুলের দাগ গালের ওপর বসে গেল। পরীরাণী পড়ে যেতে যেতে টাল সামলে নিল কোন রকমে।

আবারও হাত উঠেছে দাদার, সেই সঙ্গে অস্ফুট গর্জন, তোকে আমি খুন করে তবে নিশ্চিন্ত হব, টেনে নিয়ে গেছল তো মরতে আবার এলি কেন?

কিন্তু দ্বিতীয় চড়টা গালের ওপর পড়ল না। পড়লে পরীরাণী বাধা দিত না। তবু

নিজের অগোচরে বাধা পড়েছে। বোনের দু'চোখের একটা ঘৃণার ঝাপটা খেয়ে পরিতোষের হাত নেমে এসেছে।

কারো মুখে আর কথা নেই। কারো দিকে কারো চোখ নেই। পরীরাণীই দেখছে শুধু। তার দেহের ওপর মায়ের আর বীরুমামার সেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। বাবার ধকধক চাউনি এখন, দাদার মুখটাকে দগ্ধাচ্ছে।

নিজের ঘরে এসে নড়বড়ে চৌকিটায় বসল পরীরাণী। একটা দিনের মধ্যে যেন জীবনের এক বিচিত্র প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে ধূ-ধূ মরুভূমি। কোথাও একটু মরীচিকার হাতছানিও নেই। ও কি করবে এখন জানে না।

...বিমল বিশ্বাস বলে গেল ওকে সঙ্গে করে থানায় চলে যেতে। ভবিষ্যতে বসন্ত সরখেল আরো দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে। মেরুদণ্ডহীন ঘরের মানুষগুলো কি করবে পরীরাণীর জানার আগ্রহ নেই। সিঁথির কাছটা চিড়চিড় করে উঠল কেমন।...রাতে জল দিয়ে ঘষে ঘষে সিঁদুব তুলে দিয়েছিল মালতী বউদি। সকালের আলোয় দেখে সিঁদুরের দাগ একেবারে মিলোয় নি। তাই সকালে আবার জল-সাবান নিয়ে ঘষতে হয়েছে। ওই জায়গাটাই কটকট করছে কেমন।...সেই সঙ্গে আরো কতগুলো পিচ্ছিল স্পর্শ যেন সর্বাঙ্গ ছেঁকে ধরতে লাগল। নরক আর কতদূরে ছিল?

পরীরাণী চেষ্টা করল উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু সর্বাঙ্গ অসাড় অবশ। তক্ষুনি চান করে আসার কথা মনে হয়েছিল। সমস্ত দিনভর স্নান করলেও কি ওই স্পর্শগুলো ধুয়ে মুছে যাবে?

দাদা পরিতোষ ঘরে ঢুকল, মুখ গম্ভীর, হাতে এক পেয়ালা চা।

—খেয়ে নে। পেয়ালাটা সামনে রাখল।

দাদা নিজের হাতে চা বানিয়ে এনে খেতে বলছে এও এক অবাক ব্যাপার। চেয়ে রইল।

ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিতোষ ভুরু কোঁচকালো একটু। বোনের গালে নিজের পাঁচ পাঁচটা আঙুলের দাগ ফুটে আছে। গাম্ভীর্যে ফাটল ধরল, মুখে খেদ ঝরল।...তোর লেগেছে খুব, আমার মাথার ঠিক ছিল না, কাল রাত তিনটে পর্যন্ত তোর খোঁজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি...চা-টা ঠাণ্ডা করিস না, খেয়ে নে...ওই শয়তানের মুখ আমি এবার ভোঁতা করে ছাড়ব তুই দেখে নিস!

ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে উঠছিল পরীরাণীর। প্রায় অনভ্যস্ত এই দরদের তাপটুকু ঠেলে সরাতে চাইল। কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই, দাদার দিকে চেয়েই আছে।

একটু বাদে বীরুমামুকে সঙ্গে করে দাদাকে নিচে নেমে যেতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে মায়ের পদার্পণ। খুঁটিয়ে দেখল আর একপ্রস্থ।

—তোর গায়ের জামাটা ছিঁড়ল কি করে রে?

আড়চোখে পরীরাণী নিজের দিকেই তাকালো একবার। শাড়ির আঁচল সরে যাওয়ায় ছেঁড়া জামার ফাঁক দিয়ে চার'ছ আঙুল কাঁধ দেখা যাচ্ছে। আঁচল টেনে দেবার কথা, তাও দিল না। আশ্চর্য, মায়ের চোখে চোখ রেখে কেন যেন ঠাণ্ডা জবাব দিতেও অসুবিধে হল না।

—ছিঁড়ে দিয়েছে।

—কে, ওই বসন্ত?

পরীরাণী জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল তেমনি।

মায়ের গলায় চাপা অসহিষ্ণু ঝাঁঝ।

—মুখপুড়ি, কি হয়েছে না হয়েছে আমাকে বলবি, না বলবি না?

পরীরাণী কি হাসতেও পারে ইচ্ছে করলে? ইচ্ছে নেই।—বলা তো হয়েছে।

—বলা হয়েছে! গলার স্বর চড়ল আরো একটু।—ওই লোকটা যা বলে গেল তাই বিশ্বাস করার মতো হাঁদা পেয়েছিস আমাকে? ভালো চাসতো সব খুলে বল, নইলে তোকে বঁটি দিয়ে কাটব আমি।

একটা দিন একটা রাতের মধ্যে জীবনের সমস্ত আশা আর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মুকুলসুদ্ধ ঝরে গেছে। অস্তিত্বের এই কাঠামো নিয়ে সমস্ত বিড়ম্বনার অবসান যেন। অস্ফুট ঠাণ্ডা স্বরে পরীরাণী জিজ্ঞাসা করল, বঁটি আনব?

দুটো চোখের ছুরির ফলায় ওকে খানিক বিঁধে মা চলে গেল। এবার বাবা আসবে জানে। আসবে ভীত খরগোশের মতো।...কিন্তু খরগোশও নিজের শাবককে অভয়ের আশ্বাস দেয়?

ঘরে ঢুকে বাবা গুটিগুটি খুব কাছে এগিয়ে এলো। হাত দিয়ে ওর মাথাটা একটু কাত করে একদিকের গালটা দেখল। রাগে আর যন্ত্রণায় ঘোলাটে চোখ চকচক করে উঠল কয়েক নিমেষের জন্য। চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, তোর দাদার ওই হাত দুমড়ে মুচড়ে ভাঙবে একদিন কেউ, দেখে নিস, আর তোর ওই মা কি বলতে এসেছিল তোকে? শাসন করতে এসেছিল বুঝি? নিজে কেমন তার...

সামলে নিয়ে চকিতে পিছন ফিরে দেখে নিল একবার। তারপর ফিসফিস গলার স্বর তবল করে মেয়েকে চাঙ্গা করে তুলতে চাইল।—কিচ্ছু ভাবিস না, কোনো ভাবনা নেই তোর, ওরা কেউ থাকবে না, শুধু তুই থাকবি—এই বাড়ি ঘরদোর সব তোর একলার হবে!

ও-দিক থেকে মায়ের গলা কানে আসতে চকিতে প্রস্থান করল। এ-বেলা তাকে রাঁধতে হবে বলে মেজাজ খারাপ। আনাজের ডালা খালি, মাছ তো নেইই, নিজের মাথাটা কেটে মুড়িঘণ্ট রাঁধবে কিনা শূন্যে সেই প্রশ্ন ছুঁড়ছে।

পরীরাণী বসে আছে। চোখ আছে দেখতে পাচ্ছে, কান আছে শুনতে পাচ্ছে। ...সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ, পল্টু ঘোষাল নীচে নেমে আসছে। আজ তার গান জমল না বলেই হয়তো সময়ের আগে কাজে চলল। সিঁড়ির বাঁকে পায়ের শব্দ থামল একটু। ...দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালেও পরীরাণীর নির্লিপ্ত দু'চোখের ভিতর দিয়ে কোনো অনুভূতি ভিতর পর্যন্ত পৌঁছুবে না বোধ হয়।

তার পরেও কতক্ষণ কেটেছে জানে না। হঠাৎ সচকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল। অতর্কিতে অনড় দেহ সজাগ হয়ে উঠল। সামনের দরজার দু'দিকে দু'পা রেখে শেখর ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে, দুই ভুরুর মাঝে সামান্য ভাঁজ পড়েছে। দেখছে ওকে।

পরীরাণী যদি তেমনি নির্লিপ্ত অনুভূতি-শূন্য চোখে তার দিকেও চেয়ে থাকতে পারতো সমস্যা থাকত না। তার বদলে মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত রক্তকণাগুলো বুঝি মুখের দিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। একটা হাত নিজের অগোচরে বাঁ-দিকের গালরে ওপরে উঠে এলো। দাদার চড়ের দাগ আড়াল করতে চাইল কিনা জানে না।

এগিয়ে এসে শেখর ওর হাত দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াল। পরীরাণী তার মধ্যেই আত্মস্থ কিছুটা। গালে হাত রেখেই চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে।

গলার স্বরে উত্তেজনা নেই, এমন কি বাড়তি একটু কৌতূহলও নেই। শেখর বলল, রাস্তায় পরিতোষের সঙ্গে দেখা হল, সব শুনলাম...তোমাকে থানায় নিয়ে যাবার কথা বলতে ও কানেই তুলল না, বলল থানায় নিয়ে গিয়ে কিছু লাভ হবে না, মাঝখান থেকে কেলেঙ্কারি বাড়বে শুধু, ও অন্য কিছু ব্যবস্থা ভাবছে বলল।...আর ডাক্তার ধরের ডিসপেনসারির সামনে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা, থানার নাম করতে তিনি তো ভয়ে আঁতকে উঠলেন একেবারে।...তিনি এ-সময় ডাক্তারের কাছে কেন, তোমার শরীর-টরীর খারাপ নয় তো?

পরীরাণী চেয়ে আছে। এই একজনও ঠিক কি হয়েছে জানতে চায়? মা যা জানতে এসেছিল বুঝতে এসেছিল, তাই? জবাবে মাথা নাড়তে পেরেছে কি পরীরাণী? বোধহয় পেরেছে, কারণ ভারী গলার স্বর আরো নিশ্চিন্ত সহজ শোনালো শেখর ভাদুড়ীর। বলল, যাক, তোমার নার্ভের ওপর দিয়ে খুব একটা ধকল গেছে বুঝতে পারছি, কত রকমের লোক আছে দুনিয়ায় এটাই জানার ব্যাপার, অত ঘাবড়াবার কি আছে! বেশ করে চান করে খেয়ে দেয়ে লম্বা একটা ঘুম দাও, পরে কথা হবে—

মুখের ওপর আর এক দফা চোখ বুলিয়ে নিয়ে চলে গেল। যেন সত্যিই কিছু ভাবার নেই। গালেব ওপর থেকে হাতটা নেমে এলো পরীরাণীর। নিস্পন্দ দেহটার ভিতরে নতুন কি একটা যন্ত্রণা যেন ওঠা-নামা করতে লাগল। ও কি অন্যরকম কিছু আশা করেছিল? দাদার বা বাবার থেকে এই লোকের ভিন্ন কিছু প্রতিক্রিয়া, ভিন্ন কোনো আচরণ? এসেই যদি হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে চৌকি থেকে ওকে টেনে তুলত, গলার ওই গুড়ুগুড়ু স্বরে যদি পুরুষের চাপা ক্রোধ ঝলসাতো, যদি বলত, কোনো কথা শুনতে চাই না, কারো কথা শুনতে চাই না, এক্ষুনি থানায় যেতে হবে—তাহলে, যাক বা না যাক, পরীরাণীর আশা করার মতো একটু সম্বল থাকত যেন। অনেক গ্লানি মুছে যেত, অনেক তাপ জুড়িয়ে যেত। তার বদলে এই সহজ নির্লিপ্ত উদারতা যেন একটা শূন্য গহ্বরের দিকেই ঠেলে দিলে ওকে।

আবারও মনে হল, যাবার আগে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখে গেল.. মা যা দেখতে এসেছিল বুঝতে এসেছিল, তাই? গত দিনের সেই পিচ্ছিল স্পর্শগুলি সর্বাঙ্গে নতুন করে ছোবল বসাচ্ছে আবার, সিঁথির কাছটা জ্বলে যাচ্ছে।

সকাল থেকে দুপুর, তারপর যথারীতি বিকেল সন্ধ্যা রাত্রি। পরীরাণী তার খুপরি ঘরের মধ্যেই সেঁধিয়ে আছে। মা তাকে ঠেলে চানে পাঠিয়েছে, দু'বেলাই চাপা রাগে গরগর করতে করতে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ভাত গিলিয়ে ছেড়েছে। ওর আচরণেই মায়ের সংশয় আরো বাড়ছে টের পাচ্ছে। কিন্তু পরীরাণীর সেটা দূর করার কোনো চেষ্টাও নেই, আগ্রহও নেই। হিঁচড়ে টেনে আনা তার এই একুশ বছরের জীবনের সমস্ত চেষ্টা সমস্ত আগ্রহ একদিনে বরবাদ হয়ে গেছে।

রাত্রিতে অন্যদিনের তুলনায় দাদা আর বীরুমামু সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। মা-ও। দাদা নেশা করেনি বোঝা যায়, নেশা করলে মুখে কথার খই ফোটে। বীরুমামুর ঠোঁটে বিড়ি ঝুলছেই। দু'জনেই অনেকবার করে ওর ঘরের সামনে পায়চারি করেছে।

বীরুমামু দুই একবার দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেও। দাদার ভয়েই হয়তো ঘরে ঢুকে উত্যক্ত করেনি।

রাত্রি গভীর। চোখে ঘুম নেই পরীরাণীর। অথচ ঘুমের কথাই ভাবছে সে। একেবারে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব ঘুম। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। এ-সময়েই উঠে দাদাদের ঘরের ভিতর দিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানোর অভ্যেস। তার ব্যতিক্রম ঘটল। ঘুমের চিন্তাটাই মাথার মধ্যে কুণ্ডলি পাকাচ্ছে।

দাদা আজও সকালে চা করে ঘরে দিয়ে গেল। একটু বেলা হতে না হতে মায়ের গজগজানি কানে আসছে। আজ অন্তত পরীরাণী হেঁসেলে ঢুকবে আশা করেছিল। সে-রকম লক্ষণ না দেখে তার মেজাজ বিগড়েছে। দাদা একেবারে ফোঁস করে উঠতে তবে চুপ। দাদা বলছিল, হেঁসেলে ঢুকে পিণ্ডি চটকানো তো আছেই, দুটো দিন ওকে একটু ঠাণ্ডা হতে দাও না। নিজে না পারো তো হোটেল থেকে রুটি তরকারী আনিয়ে খাও সব।

...গালে এত জোরে চড়টা মেরেছিল দাদা যে কাল চোখে খানিকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার দেখেছিল পরীরাণী। সেই চড়ের দাগ আজও গালে লেগে আছে কিনা আয়নায় দেখেনি। অথচ এই দাদার জন্যই এখন আবার সেই ঘুমের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতে পারছে না কেন যেন।

সকাল গড়িয়ে দুপুর তখন। দাদা বা বীরুমামু বাড়ি নেই। বাবা মা তাদের ঘরে ঘুমিয়ে। পরীরাণীও ঘুমিয়ে পড়তে না পারলে পাগল হয়ে যাবে। দুটো ঘুমের মধ্যে তফাত কি? একটা লম্বা ঘুম একটা ছোট। একটাতে ফিরে আবার জাগার যন্ত্রণা, অন্যটাতে চির শান্তির প্রলেপ। কিন্তু কোন পথ ধরে ঘুমের পালঙ্কে পৌছুবে ও?

...মায়ের মতো ছাদে উঠে যাবার চিন্তা মাথায় আসতে শিউরে উঠেছে। ঘরের কড়িকাঠের দিকে চোখ যেতেও তাই। দুটোই বীভৎস। যে ঘুম চায় তার একটা রূপই পছন্দ...তার এমনই শ্রী যে কেউ প্রথমে বুঝবেই না ও ঘুম আর ভাঙার নয়। অবাক চোখে সেই ঘুম যারা দেখছে তাদের মধ্যে একখানা বিমূঢ় মূর্তিই পরীরাণীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিচের তলার একজনের মুখ।

...অমন ঘুমের রসদ কিনতে হলে টাকা লাগে। সেটাই যেন সব থেকে বড় সমস্যা এই মুহূর্তে। টাকা পেলে কি রসদ কিনবে, কোথা থেকে কি-ভাবে কিনবে কিছুই জানে না। আগে টাকা চাই, টাকা কোথায়?

বিষম চমকে উঠল। বসা থেকে দাঁড়িয়ে উঠল একেবারে। সর্বাঙ্গ থরথর কেঁপে উঠল বার কয়েক।...টাকা তো আছে! তার হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে। কোণের রঙচটা ট্রাঙ্কটার দিকে তাকালো। টাকা ওর মধ্যেই আছে। মায়ের সরু হারটা বার করে নিলেই টাকা।...সেই মা বীভৎস ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেও ওর জন্য শান্তির ঘুমের ব্যবস্থা করে গেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে শাড়ির আড়ালে হাতের মুঠোয় একটা রুমালের পুঁটলি নিয়ে নিচে নেমে এলো। দেরি করলে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে যেন। নিচের তলাটা নিঝুম। বাড়ি ছেড়ে পথে নামার মুখেও বাঁয়ে তাকিয়ে নিল একবার। দরজা বন্ধ থাকার কথা, বন্ধই আছে।

—কোথায় চললে?

দু'পা না যেতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ঘুরে তাকালো। শেখর ভাদুড়ী তার ঘরের সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ মুখ পরীরাণীর। সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, কাজ আছে।

হনহন করে হেঁটে চলল। সামনের বাঁকের আড়াল পেতে তবে স্বস্তি। ভিতরের একটা চাপা অভিমান সমস্ত মুখে আক্রোশের তাপ ছড়াতে লাগল।

—শোনো!

পরীরাণী থমকে দাঁড়াল। মুখ লাল, চোখ লাল। বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করে উঠল বারকয়েক। শেখর কাছে এলো। গেঞ্জির ওপর গায়ে এখন পাঞ্জাবি চড়ানো, অর্থাৎ সঙ্গ নেবে বলেই বেরিয়েছে।

পরীরাণীর স্তব্ধ লালচে মুখ আর চাউনি কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।—এমন ব্যস্তসমস্তভাবে চললে কোথায়?

দোকানে...

কি কিনবে? চলো...

একটা চাপা অসহিষ্ণুতা যেন বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল পরীরাণীর।—আপনার কষ্ট করার কি দরকার, আপনি যান...

মেয়েটোর মানসিক অবস্থা খানিকটা অনুমান করতে পারছে শেখর ভাদুড়ী। কিন্তু এ যেন বেশি অস্বাভাবিক লাগছে। হেসেই জবাব দিল, কষ্ট ভাবলে আসতুম না, আমি সঙ্গে থাকলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে?

মুখের ওপর বলে দিতে ইচ্ছে করল, অসুবিধে হচ্ছে! বলা গেল না। চাপা যন্ত্রণাটা কেন যেন এখন চোখে এসে জমছে, সেটা যদি জল হয়ে ঝরে, পরীরাণী নিজেকেই ক্ষমা করবে না!

—এসো। সামনের দিকে পা বাড়ালো শেখর ভাদুড়ী।

নিরুপায় পরীরাণীও। শেখর ভাবছিল কি-ভাবে বিগত অঘটনের প্রসঙ্গটা তুলে দু'পাঁচ কথা বলে মেয়েটাকে ঠাণ্ডা করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে বেরিয়ে এসেছে। দোকানের কাজ সারা হলে কথাটা তুলবে ভাবল। কিন্তু মেয়েটা তার সঙ্গে পায়ে পায়ে অনেকটা পথ হেঁটেই চলল শুধু, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যেন বেরোয় নি।

শেখর ভাদুড়ী অবাক আবারও। চলতে চলতে পাশের দিকে তাকালো।—কি কিনবে?

জবাব পেল না। আবার খানিকটা চলার পর শেখর ভাদুড়ী দাঁড়িয়েই গেল।—কোথায় চলেছ? কি কিনবে?

মনের এই অবস্থায় একটা মুহূর্তের মধ্যে কি-যে ঘটে যেতে পারে পরীরাণী নিজেই কি জানত? শান্তির ঘুমের আশা বরবাদ হয়ে গেল বলেই এই অসহিষ্ণুতা কিনা তাও জানে না। অপলক কঠিন দুই চোখ তার চোখের ওপর স্থির কয়েক নিমেষ।—কিনতে যাচ্ছি না, বেচতে যাচ্ছি।

শেখর ভাদুড়ী বিমূঢ় খানিক। দু'চোখ মুখের ওপর থেকে হাতের দিকে নেমে এলো। হাতের মুঠোয় রুমালে কিছু আছে কিনা বোঝা গেল না।

—বেচতে...কি বেচতে?

পরীরাণী চেয়ে রইল শুধু, ভিতরের তাপ গলতে দেবে না বলে চাউনিটা আরো কঠিন।

হাত বাড়িয়ে শেখর ভাদুড়ী তার মুঠোকরা হাতটা ধরে সামনে তুলল। পরীরাণী বাধা দিল না, হাতের মুঠো খুলতে দিল। দুপুরের নিরিবিলিতে দু'চারজন পথের লোক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে এদিকে সে হুঁশও নেই।

রুমালের পুঁটলি খুলে সরু হার-ছড়া বার করে শেখর ভাদুড়ী আরো হতভম্ব।
—এটা কার? তোমার?

পরীরাণী চেয়েই আছে। চোখের তারায় স্তব্ধ আহত আক্রোশ।

—এটা বেচবে কেন? হঠাৎ টাকার এত কি দরকার হল তোমার?

অস্ফুট তপ্ত স্বরে পরীরাণী এবার জবাব দিল, টাকার কি দরকার বুঝতে পারছেন না? সকলের দয়ার পাত্রী হয়ে কেন বেঁচে থাকব? কেন কেন? আমি মুছে গেলে কি হয়?

সঙ্গে সঙ্গে শেখর ভাদুড়ীর একটা ষষ্ঠ চেতনা সজাগ হয়ে উঠল। এতক্ষণের অস্বাভাবিকতা দেখে অনেক আগেই তার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। ভিতরে উত্তেজনার স্রোত বয়ে গেল একপ্রস্থ। হারটা নিজের পকেটে ফেলে পুরুষোচিত গাম্ভীর্যে হাত ধরে টানল।

—এসো।

—না, ছাড়ুন।

—রাস্তার লোক দেখছে, এসো। বিপরীত রাস্তায় কয়েক পা এগিয়ে হাত ছেড়ে দিল। অনুচ্চ কঠিন গলায় বলল, ফের কোনরকম বাজে মতলব মাথায় আনবে তো তোমার ভালো-রকম শাস্তির ব্যবস্থা করব আমি।

নিজেরই কোনো অগোচর সত্তার আত্মরক্ষার তাগিদে মতলবটা এ-ভাবে প্রকাশ হয়ে গেল কিনা পরীরাণী জানে না। অনুশাসনের এই স্পর্শটুকুর ফলে চোখের জল ধরে রাখা আরো কঠিন হয়ে উঠল। সে চেষ্টার ফলে দু'চোখ অন্য দিকে ফিরে আছে।

থেমে শেখর ভাদুড়ী ট্রাম লাইনটার ও-দিকে তাকালো একবার। তারপর হাত ধরেই ওকে রাস্তা পার করল। ট্রাম লাইনের ওপাশে খানিকটা ঘাস-জমির ওপর একটা বড় গাছের ছায়ায় বেঞ্চি পাতা একটা।

—বোসো।

শেখর নিজেও পাশে বসল। এ-দিক-ও-দিকের দু-একটা লোক পথ চলতে চলতে তাকাচ্ছে সেদিকে। একটা ট্রাম বেরিয়ে গেল, তার যাত্রীরাও কেউ কেউ দৃষ্টি-বাণ ছুঁড়ল ওদের দিকে। স্বাভাবিক অবস্থায় দিনে-দুপুরে এই লোকের পাশে এভাবে বসতে হলে লজ্জায় ঘেমে উঠত পরীরাণী। সেই অনুভূতিটুকুও অনুপস্থিত এখন।

একটু ভেবে নিয়ে শেখর ভাদুড়ী মুখ তুলে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করল, ওরা মানে যারা তোমাকে ধরে নিয়ে গেছল...তারা কি তোমার খুব বেশী ক্ষতি করেছে?

পরীরাণী নিমেষে সচকিত। একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়ে এই প্রথম যেন বস্তুজগতে ফিরে এলো সে। কোন্ মতলবে ও গয়না বেচতে যাচ্ছিল সেটা বোঝার পর

ওই চরম ক্ষতি ছাড়া আর কি ভাববে, আর কি ভাবতে পারে? হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি হঠাৎ, ওর মতলব যদি সফল হত, সেই ক্ষতিটাই তো সকলের চোখে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠত! রুদ্ধ আবেগে মাথা নাড়ল বার কয়েক, অস্ফুট সুরে বলল, না না, আপনারা যা ভাবছেন সে-রকম ক্ষতি কিছু হয়নি, এ-রকম জীবন টেনে কি লাভ।

আর বলতে পারল না, গলা ধরে এলো, দু'চোখের কোণ ঠেলে জল বেরিয়ে আসার উপক্রম।

শেখর ভাদুড়ী সোজা হয়ে বসল, প্রায় ধমকের সুরেই বলল, জীবন সম্পর্কে তোমার তো মস্ত জ্ঞান দেখছি, একটা দাগ পড়ল, কি না পড়ল অমনি সেটা শেষ করে দিতে হবে, জীবন এমনি ঠুনকো জিনিস, কেমন?

পরীবাণীর দু'চোখ অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই ফিরল তার দিকে। তেমনি চাপা তপ্ত গলায় শেখর ভাদুড়ী বলে গেল, জীবনের মাশুল আদায় করাটাই জীবনের আসল কাজ, আর যতদিন তা না পারা যায় মাথা উঁচিয়ে সেই চেষ্টা করে যাওয়াটাও তেমনি বড় কাজ। এর সঙ্গে আর কিছুর আপস নেই, সে-রকম ক্ষতি কিছু ঘটে গেলেও না, আমি অন্তত ও-সব পরোয়াই করি না—আর. কোথাও কিছু ঘটেইনি তবু তুমি এ-সব ওয়ার্থলেস মতলব আঁটছ বসে বসে?

পরীরাণী নির্বাক, কিন্তু তার নীরব চাউনিতে আবো কিছু শোনার আকুতি। এই লোকটার তপ্ত কথার মধ্যেও পায়ের নিচে একটা আশ্রয়ের তীরভূমির স্পর্শ পাচ্ছে।

শেখর ভাদুড়ী বলল, শোনো, যতদিন না এইদিনের চেহারাই বদলে যাচ্ছে, ততদিন শক্ত দু'হাতে অঘটন ঠেলে ঠেলেই দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে আমাদের—এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারকে তার বেশী সম্মান দিতে গেলে হারবে ঠকবে। তাছাড়া তোমাকে দয়ার চোখে দেখবে না, জীবন নিয়ে তোমার এই যোঝাযুঝিটাকে ঢের বেশী বড় করে দেখবে এমন মানুষ একজন অন্তত আছে এ বিশ্বাসটুকু রাখতে পারো—বুঝলে?

...সেই একদিন পরীরাণী নামে এক সাধারণ মেয়ে যা খোয়াতে বসেছিল তার বহুগুণ ফিরে পেয়েছিল যেন। সব থেকে বড় কথা একটা সতেজ বাঁচার মন্ত্র তার কানের ভিতর দিয়ে সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

সন্ধ্যার পর দাদার সেই জ্বলন্ত মূর্তি দেখে পরীরাণী হতভম্ব প্রথম। বিগত কয়েক ঘণ্টার একটা ছন্দোবদ্ধ সুর যেন আচমকা তছনছ। ও-দিক ফিরে পরীরাণী রাতের রান্নার ব্যবস্থায় মন দিয়েছিল। পিছন থেকে দাদা সাতখানা হয়ে ফেটে পড়ল।—তোকে আমি মেরে ফেলব, তোকে আমি নিজের হাতে খুন করে তোর শেষ সাধ মিটিয়ে দেব—পাজী হতচ্ছাড়ী মেয়ে, তুমি আমাকে চেনো না এখনো!

পরীরাণী ঘুরে বসল তার দিকে, বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল। দাদার পিছনে বীরুমামু দাঁড়িয়ে, তারও গম্ভীর মুখ। দাদার হুঙ্কার শুনে ও-দিকে দরজায় মা এসে দাঁড়িয়েছে, তার পিছনে বাবা। দাদা এগিয়ে এসে এক হ্যাঁচকা টানে বাহু ধরে মাটি থেকে তুলে ফেলল ওকে, তারপর হিড় হিড় করে খুপরি ঘরের সামনে টেনে নিয়ে গেল। ঠিক তক্ষুনি সিঁড়ি দিয়ে পল্টু ঘোষাল উঠে আসছে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে-ও তিনতলার দিকে পা বাড়াতে ভুলে গেল।

দাদার এ-দিকে মুখ, আর কোনো দিকে চোখ-কান নেই। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল, মরার সাধ হয়েছে তোর, কেমন? হার বেচে বিষ কিনে খাবি ভেবেছিলি? কেন আমার দুটো হাত নেই, আমি তোকে শেষ করে দিতে পারি না?

এতক্ষণে দাদার চণ্ডাল ক্রোধের কারণ বোঝা গেল। কিন্তু পল্টু ঘোষাল দাঁড়িয়ে তখনো। অসহায় চোখে পরীরাণী সে-দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দাদাও ঘাড় ফেরালো। তারপর ওই পল্টু ঘোষালই যেন আসামী।—কি মশাই, ওপরের রাস্তা ভুলে গেছেন? দেখিয়ে দিতে হবে?

ভারী জুতোর শব্দ তুলে পল্টু ঘোষাল হাঁসফাঁস করতে করতে ওপরে উঠে গেল। পরীরাণীর হাত ধরে দাদা এবারে ওকে তার খুপরি ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলো। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠল, কেন এ-কাজ করতে গেছলি বল্ শীগ্গির, নইলে তোর মনের সাধ আমিই মিটিয়ে দেব—আর কক্ষনো করবি কিনা বল্!

এই প্রথম পরীরাণী লক্ষ্য করল দাদার দু'চোখ অদ্ভুত চকচক করছে, আর সেই দুই চোখের তারা থেকে একটা দিশেহারা ভয় যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুহূর্তের একটা বিচিত্র অনুভূতি সামলে নিল পরীরাণী। এ একটা দিন বটে ওর জীবনে।

আর করব না।

আমার গা ছুঁয়ে বল!

পরীরাণী কি হেসে ফেলবে? জবাব দিল, হাত তো ধরেই আছ!

এতক্ষণে দাদা আত্মস্থ হল একটু। তবু রাগ যায় না, হাত ছেড়ে বলে উঠল, কিন্তু কেন তুই এ-কাজ করতে গেছলি পাজী মেয়ে কোথাকারের।

চকিতে মাথায় কি খেলে গেল পরীরাণীর। দরজার ও-ধারে বীরুমামু আর মায়ের মুখ তো দেখাই যাচ্ছে, আড়ালে বাবাও দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়। সকলের সব নোংরা সংশয় নিরসনের এ একটা সুযোগ যেন। অভিমানাহত গলার স্বর একটু চড়িয়ে পরীরাণী জবাব দিল, নিজেরা কোনো ব্যবস্থা করতে পারে না অথচ শাসনের বেলায় খুব—বিনা দোষে কাল তুমি ও-ভাবে আমাকে মারলে কেন? দেখো তো, আজও গালে দাগ পড়ে আছে—

মুহূর্তে অপ্রস্তুত মুখ দাদার, আর অবাকও তেমনি। ঘাড় কাত করে ওর গালটা দেখে নিল একবার।—এই জন্যে তুই...কি আশ্চর্য, তুই একটা গাধা মেয়ে...আমার কি তখন...

চৌকিতে বসল, হাত ধরে ওকেও টেনে পাশে বসালো। তারপর কি বলতে গিয়ে দরজার ও-ধারে দু'চোখ থমকালো। দরজার সামনেই বীরুমামু তার পাশে মা, তার পিছনে বাবার মুখের আধখানা। সকলকে ছেড়ে বীরুমামুকেই খেঁকিয়ে উঠল দাদা।—দ্যাখ মামু, নিজের বোনের সঙ্গে দুটো কথা বলব বলে বসেছি, তার মধ্যেও দাঁড়িয়ে তোর মজা গেলা চাই, কাজ না থাকে তো ঘরে বসে বিড়ি টানগে যা—

সব ক'টি মূর্তি মুহূর্তে উধাও।

খানিক আগে পরীরাণীর ভিতরের যে ছন্দোবদ্ধ সুরটা খানখান্ হয়ে গেছল, তাও যেন দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এলো আবার।

রাতের রান্না সারতে সারতে নিজের অগোচরেই বারকয়েক ভুরু কুঁচকেছে পরীরাণী। ঠোঁটের কোণে একটু সংগোপনে হাসির ছোঁয়া লেগে আছে।...নিজে একরাশ

লেকচার ঝেড়েও বাবুর বিশ্বাস হয়নি, দাদাকে ডেকে বলা হয়েছে আবার, কি বুদ্ধি!

...পরীরাণীর জীবনে সত্যিই কি দক্ষিণের জানালা-দরজা গোছের কিছু একটা খুলে গেল! নইলে পরদিন যে খবরটা এনে দাদা ওর কানে ঢালল, তা-ও কি সম্ভব! পরদিন সকাল থেকে বেলা দেড়টা দুটো পর্যন্ত দাদার বা বীরুমামুর দেখা নেই। তারপর সিঁড়ি থেকেই হাঁক দিতে দিতে দাদা উঠে এলো।—পরী! ও-লো পরী—সাংঘাতিক খবর—কেল্লা ফতে একেবারে।

সসঙ্গী অর্থাৎ বীরুমামুকে নিয়ে একেবারে দিগ্বিজয় করে ফিরল যেন দাদা। ডগমগ মুখ। পরীরাণী সামনে আসতে সেই খুশি ভেঙে পড়ল।—আর তোকে ভয় করে চলতে হবে না, ওই বসন্ত সরখেলকে জীবনে আর মাথা তুলে ট্যাঁ-ফোঁ করতে হবে না—সাপের মাথায় মোক্ষম ওঝার ধূলো পড়েছে, বুঝলি?

কিছুই না বুঝে পরীরাণী হাঁ করে চেয়ে রইল।

এঁরপর দাদা যে ফিরিস্তি দিল শুনে পরীরাণী বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারও একটা নিশ্চিন্ততার প্রলেপ পড়তে লাগল।

...সকালে উঠেই বীরুমামুকে সঙ্গে করে গেছল তার মুরুব্বি পাড়ার ডাকসাইটে মানুষ সুধীর সান্যালের কাছে। বসন্ত সরখেলের সমস্ত অত্যাচারের কথা তাকে বলেছে, তার সাহায্য ভিক্ষা করেছে। সুধীর সান্যাল তখন তার হাতের সেরা ওস্তাদ মাখন মজুমদারকে ডেকে পাঠিয়েছে। টাকার টোপ ফেলে ও-রকম দুই-একটা দুর্দান্ত লোককে আজকালকার অনেক বড় লোক হাতে রেখে থাকে নাকি। এই মাখন মজুমদারের সঙ্গে দাদার আগেও অল্পস্বল্প আলাপ ছিল। থাকবে না কেন, মুরুব্বির সঙ্গে সে-ও কম করে, হপ্তায় তিনদিন দেখাসাক্ষাৎ করে যেত। সুধীর সান্যালের হুকুমে দাদাই তার বাড়ি গিয়ে তাকে ডেকে এনেছে। সুধীর সান্যাল তাকে বলেছে, এই ব্যাপার, বসন্ত সরখেলকে একটু সমঝে দাও। দাদা আর বীরুমামুকে সঙ্গে করে মাখন মজুমদার খানিক আগে বসন্ত সরখেলের বাড়িতে হানা দিয়েছে। মাখন মজুমদারকে দেখেই ছোঁড়ার মুখ আমসি একেবারে। হবে না কেন, মাখন মজুমদারের নাম এ তল্লাটে কে না জানে, আর তাকে ভয়ই বা কে না করে।

বসন্ত সরখেল কাছে আসতেই মাখন মজুমদার খপ করে তার চুলের মুঠি ধরে বড়সড় ঝাঁকুনি দিয়েছে দুটো। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, ঘাড়ে ক'টা মাথা?

বসন্ত সরখেল বোবা।

মাখন মজুমদার আবার ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, ক'টা মাথা ঘাড়ে?

বসন্ত সরখেল মিনমিন করে জবাব দিয়েছে, একটা...

দাদাকে দেখিয়ে মাখন মজুমদার বলেছে, ফের এর বোনের দিকে মুখ তুলে তাকালে সেটা আর থাকবে না, মনে থাকে যেন।

হি-হি করে হেসে দাদা বলেছে, এবারে তুই নিশ্চিন্ত, আবার যদি ও কোনো মতলব পাকায় তো এই—

নিজের একটা হাত গলায় ঠেকিয়ে গলা-কাটা দেখিয়েছে দাদা।

...হ্যাঁ, তারপর থেকে এই একটা মাস ধরে রাস্তার ওধারের ওই তেরছামুখো ছাল-চামড়া-ওঠা বাড়ির জানালায় ওই অশুভ মূর্তি আর দেখা যায়নি। রাস্তায় দৈবাৎ কখনো

সামনাসামনি পড়ে গেলেও অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে, যেন চেনেই না ওকে।

...মাখন মজুমদার যেমন লোকই হোক, ওই অ-দেখা মানুষটাকে পরীরাণী অন্তত মনে মনে শ্রদ্ধাই করেছে। এই সূত্রেই দাদার জন্য অবশ্য তলায় তলায় একটু আশঙ্কাও ছিল তার। কারণ, বীরুমামুর মুখে শুনেছে, দাদা নাকি ইদানীং তার মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছে, আর তারই সঙ্গগুণে দাদার সাহসও নাকি আগের থেকে ঢের বেড়েছে। এসব শুনলে অস্বস্তি একটু হতেই পারে। দাদার অসাক্ষাতে বীরুমামু অবশ্য রসালো টিপ্পনীও কেটেছে দুই-একদিন, মাখন মজুমদার যত দুর্দান্তই হোক, দরাজ মেজাজের লোক, বাড়ি গেলেই চা-টা খাওয়ায়, তার বউ নিজের হাতে সেই চা-টা কপ্নে দিয়ে যায়...ওই বউটা দিব্বি দেখতে, বুঝলি...বয়সের তুলনায় আরো কচি দেখায়, আর বয়সই বা কত, মাখন মজুমদারই তো আমাদের থেকে বছর দু-একের বড় হবে মাত্র...তা ওই বউটার হাতের চা ইদানীং আমাদের পরিতোষবাবুর বড় পছন্দ বুঝলি।

পরীরাণীর বিচ্ছিরি লেগেছিল শুনতে। বীরুমামুর ওই রকমই মন। রাগের মাথায় মনে হয়েছিল দাদাকে বলে দেবে। সেও ওর দ্বারা সম্ভব নয়, কোন রকমে অশান্তির ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না।

হ্যাঁ, এই একটা মাস জীবনে যেন নতুন তাপ এসেছিল ওর, অকারণ উদ্দীপনার স্রোত বইতে শুরু করেছিল, আর ভিতরে ভিতরে এক ধরনের রং-বদলের কারুকার্য চলছিল।...একটা দিনের মধ্যে সব যেন স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল। লাঠি ভেঙে গেছে, নিষ্কণ্টক সাপ আবার ফণা তুলেছে।

...সকালে উঠেই আজ আবার ওই শনির কদর্য মুখ দেখেছে। আর বিকেলে রাস্তায় ধরে তেমনি কদর্যভাবেই ওকে শাসিয়েছে। শয়তানের সেই কুৎসিত কথাগুলো এখনো কানে বিঁধে আছে।

সোজা শক্ত হয়ে বসল পরীরাণী। কে রক্ষা করবে ভাবতে হবে না, নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পাববে এরপর। তা যদি না পারে তো মরাই ভালো।

...অদেখা মাখন মজুমদারের অদেখা সুশ্রী কচি বউটার কথা ভাবতে চেষ্টা করল পরীরাণী—আচমকা শোকে যে মেয়েটা পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু ভাবা যাচ্ছে না, মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো কেমন হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে, আর ঘুম পাচ্ছে।...সন্ধ্যা থেকে আজ চুপচাপ বসে কাটিয়েছে বলেই বোধহয়। আজ আবার মায়ের কি খেয়াল হতে নিজেই এগিয়ে এসে ভালো-মন্দ দুই একটা পদ রেঁধেছে, আর সকলের পরে ওকে ডেকে নিয়ে এক সঙ্গে বসে খেয়েছে।

মেজাজ খারাপ বুঝেই হয়ত মা আজ ওর ওপর সদয় একটু।

খাওয়া শেষ করে ঘরে এসে বসতে না বসতে ঘুম পাচ্ছে। এ-রকমটা বড় হয় না। এটা সত্যিই ঘুম কি অবসাদ জানে না। পরীরাণীর এখন জেগে থাকারই তাগিদ বেশী। সব ভয়ভাবনা ঘুচিয়ে দেবার সংকল্প। মাথা খাটিয়ে সেই পথ বার করার তাগিদ। কিন্তু না, বড় ঘুমই পাচ্ছে।

◆

বেশ জোরেই একটা ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল পরীরাণী। সামনে অবাক চোখে দাদা দাঁড়িয়ে। ত্রস্তে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল।

দাদা বলল, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিস, তোর শরীর খারাপ নাকি?

মাথাটা এখনো ঝিমঝিম করছে কেমন, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমলো কি করে পরীরাণী নিজেও ভেবে পেল না। মাথা নাড়ল, শরীর খারাপ নয়।

--টাকাগুলো দে, দিয়ে আসি।

পরীরাণী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, হঠাৎ মাথায় ঢুকল না দাদা কিসের টাকা চাইছে।

—কি রে! সুধীর সান্যালের দেওয়া পাঁচশ টাকা কাল যে তোকে রাখতে দিলাম —মাখন মজুমদারের মায়ের হাতে দিয়ে আসতে হবে—তুই চোখ চেয়ে ঘুমুচ্ছিস নাকি?

মনে পড়ল।—তুমি যাও, আমি মুখ হাত ধুয়ে এসে বার করে দিচ্ছি।

দাদা চলে যেতে তাড়াতাড়ি জামা পরে চোখে মুখে জল দিয়ে এলো। বালিশের নিচে চাবির গোছাটা নেই। বালিশের নিচেই থাকে, বাড়ির সব ক'টা তালার সব চাবিই ওর কাছে থাকে। বিছানার শিয়রের দিকটা ওলটালো। সেখানেও নেই।

বা রে বা! অসহিষ্ণু হাতে বিছানাটাই তুলে দেখল খাট থেকে। নেই। অবাক চোখে পরীরাণী ঘরের চারদিকে খুঁজতে লাগল। ওই তো চাবি! চোখের সামনেই সেলাইয়ের পা মেশিনের ওপর পড়ে আছে। পরীরাণী নিজের ওপরেই বিরক্ত, কি যে হয়েছে মাথায় ওর।

ট্রাংক খুলতে গিয়ে বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। ট্রাংকের খোলা তালা আংটায় ঝুলছে! বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা গোটাকতক, তাড়াতাড়ি ডালাটা তুলেই আরো বিমূঢ়। নোট ভর্তি খামটা একেবারে ওপরে পড়ে আছে। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, ওই টাকার খাম কাল শাড়ির একেবারে তলায় গুঁজে রেখেছিল। শাড়িগুলোও ওলোট-পালট।

পরীরাণীর সমস্ত শরীরটা কাঁপছে থরথর করে। খাম থেকে টাকার বাণ্ডিল বার করে রুদ্ধশ্বাসে গুনতে লাগল। অনভ্যস্ত হাতে পঞ্চাশখানা দশটাকার নোট গুনে উঠতে সময় লাগছে।

—কি রে, আবার গুনতে বসলি কেন। দেরি দেখে দাদা আবার ঘরে ঢুকেছে। জবাব না দিয়ে ও গুনেই চলল দেখে দাদা হাসছে।—এতগুলো টাকা একসঙ্গে হাতে পাসনি বলে গুনে দেখছিস বুঝি কেমন লাগে?

—ঠিক আছে নাও।

—ঠিক থাকবে না কেন, সুধীর সান্যাল কি পাঁচশ বলে কম দেবে নাকি!

পরীরাণীর ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনার স্রোত বইছে এখনো। মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিল, তা না, ট্রাংকটা খোলা পড়ে ছিল, আর টাকাগুলোও তলায় রেখেছিলাম, অথচ...

দাদার অত শোনার সময় নেই। বলল, হুঁঃ, কি দিয়ে কি করিস আজকাল, তোর কি মাথার ঠিক আছে নাকি!

চলে গেল। খোলা ট্রাংকের সামনে পরীরাণী স্থাণুর মতো বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ট্রাংক বন্ধ করে দাদাদের ঘরে এলো।

বীরুমামু বসে বিড়ি টানছে। ওকে দেখে হাসি হাসি মুখে বলল, আমাকে ফেলে তোর দাদা একাই মাখন মজুমদারের বউকে টাকা দিতে আর সান্ত্বনা দিতে চলে

গেল...শোকের মুখে বেশি লোক গিয়ে ভিড় করার কোনো মানে হয় না, কি বলিস?

পরীরাণী মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক, কি বলল বীরুমামু কানে গেলেও মগজে ঢোকেনি। যা বোঝবার বুঝে নিয়ে চলে এলো।...না, ওর ট্রাংকে বীরুমামুর হাত পড়ে নি, পড়লে মুখ দেখে ও ঠিক বুঝে নিত।

কি মনে পড়তে বুকের তলায় দাপাদাপি হঠাৎ আবার। কাল রাতে তার অত ঘুম পাচ্ছিল কেন? সমস্ত রাত এমন ঘুমলোই বা কি করে?...শেষের রান্না ক'টা কাল মা রেঁধেছিল, আর সকলের শেষে ওকে ডেকে পাশাপাশি বসে খেয়েছিল। প্রায়ই রাতে মা কি-সব খেয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। এ-ঘরে বসে দাদা তাই নিয়ে অনেক সময় ঠাট্টা-তামাশা করে। আর বীরুমামু তখন মুখ কালো করে বসে থাকে।

...তাহলে? টাকাগুলো আবার ট্রাংকে রেখে গেল কে? বাবা?

হঠাৎ বাবার জন্য ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল পরীরাণী। বাবা আপাতত বাড়ি নেই, ডাক্তার ব্রজগোপালের ওখানে গেছে। ডাক্তার ব্রজগোপালের কাছে বাবা এমনিতেই আজকাল একটু বেশি যাতায়াত করছে। ভয় দূর করার ওষুধ চিকিৎসা শাস্ত্রে আছে কিনা পরীরাণী জানে না। বাবার ওটাই আসল রোগ।...কিন্তু আজ তার কি অবস্থা? মায়ের নেওয়া টাকা বাবা সাহস করে আবার ওর ট্রাংকে রেখে যায়নি, রেখেছে ঝোঁকের মাথায়। রেখেছে মেয়েকে রক্ষা করার তাগিদে।...তারপর? তারপর সমস্ত রাত ঘুমোয়নি হয়তো। মায়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ঠকঠক করে কেঁপেছে। সকাল হতে না হতে ব্রজগোপালের ডিসপেনসারিতে ছুটেছে।

...বাবা টাকা দিতে পারে না তবু ওই ডাক্তারটি তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে না কখনো। বরং সাহায্যের সদয় প্রতিশ্রুতি দেয়, বিনে পয়সায় ওষুধও দেয়।...যা-ই দিক, বাবা অন্তত সেগুলোকে ওষুধ ভাবে। হয়তো ওগুলো সাদা পাউডারের গুঁড়ো কিছু। তবু পরীরাণী মনে মনে কৃতজ্ঞ ওই লোকটির ওপর।

সামনের দিকে ঝুঁকে দেখল একটু, মায়ের ঘরের দরজা ভেজানো, সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

বেলা বাড়ছে, অথচ রান্না করা দূরে থাক নড়েচড়ে বসতেই ইচ্ছে করছে না পরীরাণীর। বাইরের দিকের বারান্দায় পা দিতেই দু'চোখ ওই তেরছা-মুখো বাড়ির জানালায় থমকালো। শয়তান ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। বসন্ত সরখেল। কিন্তু আজ চোখ ছোট করছে না, ঠোঁটে কুৎসিত হাসিও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে না, তার বদলে গম্ভীর মুখে ওর দিকে চেয়ে আছে। কিছু একটা মতলব আঁটছে মনে হয়। অপলক থমথমে চোখে পরীরাণীও চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অসহিষ্ণু পায়ে আবার খুপরি ঘরের দিকে ফিরে চলল।

আর তক্ষুনি কানের পরদার ভিতরসুদ্ধু কিরকির করে উঠল।

—'নাগরী তুমি গাগরি কাঁখে ঠমকি ঠমকি যাও।'

ওপরতলায় গানের গমক। দুপদাপ পা ফেলে পরীরাণী খুপরি ঘরে ঢুকে ধুপ করে চৌকিতে বসে পড়ল। চারদিক থেকে সকলে মিলে বুঝি মাথাটা খারাপ করে দেবে ওর। নিরুপায় রাগে দাঁত মুখ সিঁটকে চার আঙুল জিভ বার করে শূন্যের মধ্যেই নিদারুণ একটা ভেংচি ছুঁড়ে মারল।

...ও কি!

পরীরাণী চমকে লাফিয়েই উঠল প্রায়। কানের ডগা পর্যন্ত লাল পর মুহূর্তে। শেখর ভাদুড়ী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। সুচারু দৃশ্য দর্শনের বিস্ময় কাটতে একটু সময় লাগল যেন। তারপর ঘরে পা দিয়ে পলকা গাম্ভীর্যে জিজ্ঞাসা করল, ভাগ্যবানটি কে...কাকে ভেংচাচ্ছিলে?

জবাব দেবার দরকার হল না। '—না-আ-গরী-ই-ই...ন্-নাগরী নাগরী না-আ-গরীই।' বাজখাঁই সুর নাগরীর পায়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে ওপর থেকে।

উদ্‌গত হাসি সামলাতে গিয়ে পরীরাণী চৌকিতে বসে পড়ল আবার। তারপর দু' হাতে মুখ চেপে হাসির বেগ সামলোনোর চেষ্টায় কুঁকড়ে গেল।

শেখর ভাদুড়ী এ-দৃশ্যটাও দেখল চেয়ে চেয়ে। তারপর ছোট মন্তব্য করল, ভাগ্যিস এসেছিলাম—

তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে করে মুখ মুছে নিল পরীরাণী। কিন্তু লালের ছোপ মুছবে কি করে।!

শেখর ভাদুড়ী তার স্বভাবগত বাস্তবে ফিরল। বলল, সবই বঞ্চনার খেসারত, বুঝলে? কেউ মদ খেয়ে নিজেকে ভোলায়, কেউ বা ওই রকম নাগরীর পায়ে মাথা ঠুকে—ওতে রাগেরও কিছু নেই, হাসারও না।...যে কথা বলতে এসেছিলাম, যে লোকটার ভয়ে সামনের বাড়ির ওই ছেলেটা, বসন্ত না কি নাম বলছিল তোমার বীরুমামা—এতদিন চুপ করে ছিল, পরশু রাতে সেই লোকটাই নাকি খুন হয়েছে। তোমার বীরুমামু ভয় পাচ্ছে এ-ছেলেটা আবারও হয়তো শয়তানী শুরু করবে।

পরীরাণীর চাউনি সজাগ তক্ষুনি। ওর বিপদের সম্ভাবনায় এই লোক কতটা এগিয়ে আসতে পারে তাই যেন বুঝে নিতে চায়। তাই নির্দ্বিধায় জবাবও দিল, বলল, পারে কেন, শুরু করেইছে, কালই রাস্তায় ধরেছিল আমাকে। যাচ্ছেতাই কথা বলেছে—

কি বলেছে?

মুহূর্তে রেগে ওঠার দাখিল পরীরাণীর। কি বলেছে মনে পড়লেও মাথায় খুন চাপে, বলেছিল, 'তোর গুমোর আমি ভাঙছি', বলেছিল, 'সম্মান দিতে চেয়েছিলাম সেটা পায়ে ঠেলেছিস, তোকে খাবই আমি, দেখি কে রক্ষা করে—'। পরীরাণীর ইচ্ছে করেছিল সরাসরি বলে দেয়, এই-এই বলেছিল। কিন্তু ওকে কাটলেও এ-সব কথা মুখ দিয়ে বার হবে না।

অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠল, সে আর শুনতে হবে না, এখন কি করবেন ভাবুন।

ওপর তলার গাগরি কাঁখে নাগরীর পায়ে অ-সুরের আছাড়ি-বিছাড়ি এক-একবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে, অর্থাৎ ছাদে ঘুরে গানের মহড়া চলেছে এখন।

—জ্বালিয়ে খেলে দেখছি। কথার ব্যাঘাত ঘটছে বলেই শেখর ভাদুড়ীর সামান্য বিরক্তি। দরজার একটা পাট বন্ধ করে আর একটা পাটের দিকে হাত বাড়াতে পরীরাণীর বুকের ভেতরটা ধপধপ করে উঠল।...যাক, বাস্তব জ্ঞান আছে একটু, হাতে করে দুটো দরজাই আবার ঠেলে দিয়েছে।

একটু ভেবে শেখর ভাদুড়ী বলল, একটা বিরাট প্ল্যানে হাত দিয়েছি আমরা, কাগজপত্রের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আসল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে...সাকসেসফুল হলে—হলে কেন হবেই—দেশে একটা সাড়া পড়ে যাবে, পরে একসময় বুঝিয়ে বলব'খন

সব...এতে তোমারও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কতবার বললাম বি-এটা পাস করে নাও, তাহলে ডাইরেক্ট স্কুলেই ঢুকিয়ে দিতে পারতাম...যাক্, এ-কাজটা শুরু হলে তার জন্য আটকাবে না, কিন্তু এখনো কিছুদিন সময় লাগবে...তুমি না হয় এ-ক'টা দিন বাড়িতেই থাকো, দুপুরে একলা সেলাইয়ের স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।

শোনা মাত্র অসহিষ্ণু ঝাঁঝে পরীরাণী বলে উঠল, কি? ওই বাঁদরটার ভয়ে বাড়িতে বসে থাকব? আমি যাবই সেলাইয়ের স্কুলে—

সেলাইয়ের স্কুলে যাওয়াটা নয়, এই সাহসটুকুই যেন পছন্দ হল। শেখর ভাদুড়ী বলল, তাহলে এক কাজ করা যাক, ঝি-টাকে বলে দিচ্ছি যাবার সময় তোমাকে নিয়ে যাবে আর ফেরার সময়ে দিয়ে যাবে, সঙ্গে কেউ থাকলে দিনদুপুরে অত ভাবনার কিছু নেই।

—ঝি রাজি হবে কেন?

অবান্তর কথা যেন। শেখর ভাদুড়ী জবাব দিল, রাজি কেন হবে সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দিতে পারার সত্যিকারের স্বাদ কি পরীরাণীর জানা আছে? ওপর তলার আসুরিক গান বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর যেন একটা অদ্ভুত অজানা সুরের গুঞ্জন উঠছে।

কর্কশভাবে সেটা ভাঙতেও অবশ্য সময় লাগল না বেশি। শেখর চলে যাবার পরেও মিনিট দশেক পরীরাণী সেই ঘরেই বসে ছিল চুপচাপ। তারপর বেরিয়েই দেখে বারান্দার ও-মাথার দরজার কাছেই মা দাঁড়িয়ে, মাথায় কাপড় নেই, আলুথালু চুলের বোঝার কিছুটা দুই গাল দিয়ে বেয়ে নেমেছে, চোখের তপ্ত দৃষ্টি এ-দিকেই।

সঙ্গে সঙ্গে পরীরাণীর মনে পড়ল, এই মা নিজে থেকে কাল রাতে কিছু রান্নাবান্না করেছিল, ওকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছিল...খাওয়ার পর ওর ভয়ানক ঘুম পেয়েছিল...সকালে বালিশের নিচে চাবি ছিল না...ট্রাংকের টাকার তাড়া নিচে থেকে ওপরে উঠে এসেছিল।

কয়েক পা এগিয়ে মা হিসহিস করে বলে উঠল, দেখছিস কি হাঁ করে, আলাপ শেষ হবার পরেও আর ঘর ছেড়ে বেরুতে ইচ্ছে করে না—কেমন? উনুন খাঁ-খাঁ করে জ্বলে গেল, পিণ্ডি না গিললে চলবে?

...বাবা? বাবা কোথায়? বাবা কি এখনো ফেরেনি! বাবার জন্য চাপা ত্রাসটা হঠাৎ যেন মাথায় উঠল পরীরাণীর। চট করে পাশের ঘরে অর্থাৎ দাদাদের ঘরে ঢুকে পড়ল। বাবা সেখানেই বসে আছে চুপচাপ।

—বাবা, তুমি সকালে উঠেই ডাক্তারের কাছে গেছলে কেন? শরীর খারাপ নাকি?

স্ত্রীর কটূক্তি কানে আসার দরুন প্রিয়তোষবাবুর বিরূপ মুখ। মেয়ের কথায় সেই মুখই বিগলিত পরক্ষণে।—আমার আবার শরীর, রাতে ভাল ঘুম হল না তাই প্রেসারটা চেক করিয়ে এলাম...ক'দিন আর, হয়েই তো এলো। হাতের ইশারায় কাছে ডাকল, তারপর ফিসফিস করে বলল, বসে না থেকে রাঁধগে যা না, তুই না রাঁধলে কারো রোচে!

...না বাবাও না, মায়ের নেওয়া টাকা বাবা রেখে গিয়ে থাকলে তার অন্যরকম ভয়ার্ত মুখ দেখত পরীরাণী। দেখেই ঠিক বুঝতে পারত।...তাহলে? তাহলে কি হতে পারে।

কি হতে পারে বোঝার তাড়নায় এরপর ঘণ্টা দুই তিন পরীরাণী মা-কে লক্ষ্য করে গেল। যখনই চোখ ফেরায় দেখে মা তার দিকে কঠিন চোখে চেয়ে আছে। আবার হাসি দেবীও লক্ষ্য করেছে মেয়ের দু'চোখ অনেকবার করে তার দিকে ঘুরছে।

শেষে একবার চেয়েই রইল দু'জনে দু'জনের দিকে।

হাসি দেবী সামনে এগিয়ে এলো। খুব চাপা রূঢ় ঝাঁঝে বলে উঠল, চোর ধরার মতো সেই থেকে চেয়ে দেখছিস কি আমার দিকে—বাক্সের টাকার ঘাটতি হয়েছে তোর?

ঠাণ্ডা সুরে পরীরাণী জিজ্ঞাসা করল, টাকাটা তাহলে তুমিই নিয়েছিলে?

—নিয়েছিলাম কিনা তুই জানিস না? যেন প্রশ্ন করাটাই অপরাধ।—ওই হারামজাদাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই টাকাটা নিয়ে আটকে রাখব ভেবেছিলাম...এদিকে সংসার কি করে চলছে সে হুঁশ নেই, অন্যের পায়ে টাকা ঢেলে কৃতার্থ করতে চলেছেন...সদ্য সদ্য মরা মানুষের ঘরের বরাদ্দ টাকা...ভিতরটা খচখচ করতে থাকল বলেই ফিরিয়ে দিলাম, নইলে ওকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম আমি!...তা সোহাগের দাদাকে কিছু বলেছিস, না বলিসনি?

সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না, চৌতিরিশ বছরের এই মায়ের সুশ্রী মুখখানাই শুধু দেখছে পরীরাণী। কিন্তু মা আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না, রাগত মুখেই চলে গেল।

তাড়াতাড়ি উনুন থেকে কড়াটা নামালো পরীরাণী। পুড়েই গেল বোধহয়। মগজে দ্রুত আঁচড় পড়ে চলেছে।...মায়ের টাকা নেওয়া আর রেখে যাওয়া দুইই সত্যি, কিন্তু এ-ছাড়া আর কতটুকু সত্যি? টাকা ফিরিয়ে রেখে গেছে মরা মানুষের ঘরের বরাদ্দ টাকা সেই ভয়ে না দাদার ভয়ে? হয়তো দুটোই।...কিন্তু মা বোকার মতো ধরা পড়ল কেন? ঘুমের ওষুধ খাবার পরেও শান্তি-মতো ঘুমুতে পারছিল না বলে ঘুম-চোখে যেমন-তেমন করে রেখে গেছে?

হাসিই পেল পরীরাণীর। আবার শিউরেও উঠল, টাকাটা সত্যিই বাক্সে না পাওয়া গেলে কি হ'ত?

◆

দিন পনের কুড়ি নিচের তলার ঝিয়ের সঙ্গেই সেলাইয়ের স্কুলে গেল আর ফিরল। গোড়ায় গোড়ায় পরীরাণীর সংকোচ কাটতে চায়নি, কেন এই ব্যবস্থা ঝি-টাও মনে মনে আঁচ করেছে হয়তো।...বেরুবার মুখে ওই তেরছা-মুখো বাড়ির জানালায় ওই গা-জ্বালানো মূর্তি রোজই দাঁড়িয়ে থাকে। ফেরার রাস্তায় ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে কয়েকদিন। কিন্তু সঙ্গে লোক দেখেই কাছে আসেনি হয়তো। গোল-গোল চোখ করে ওদের দেখেই শুধু। পরীরাণীর কেবলই মনে হয়েছে ঝি-কে দেখে ভয় পাবার লোক ও নয়, কিছু একটা মতলব আঁটছে। দুশ্চিন্তার আরো কারণ আছে। এক নজরও ভালো করে না তাকিয়েই পরীরাণী লক্ষ্য করেছে এখন আর ওই শয়তান আগের মতো কুৎসিতভাবে একটা চোখ ছোট করে না, বা ঠোঁটের ফাঁকে সেই কুৎসিত হাসি ঝরে না। মতলবই যে আঁটছে তাতে কিছু ভুল নেই। কিন্তু দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও পরীরাণীও যেন ভয়ে সিঁটিয়ে যাবার মতো সেই মেয়ে নয় আর। ভয় জয় না করতে পারলে নিজেরই অযোগ্যতা। এর মধ্যে একদিন আবার নিচের তলার ওই ছেলেও ওকে সেলাই স্কুলে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তার স্কুল ছুটি থাকার দরুন সেই সময়েই নিজের কি কাজে বেরুচ্ছিল, অতএব ঝিয়ের আসার

দরকার কি। পরীরাণী লজ্জা পেয়েছিল, আর মনে মনে বলেছিল, কাজ আছে না ছাই, কাজের ছুতো। সেদিনও ওই পাজী তার জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল আর ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে ছিল। তখন কি যেন এক প্রচ্ছন্ন আক্রোশে পরীরাণী সামনের বাঁক পর্যন্ত পাশের লোকের প্রায় গা ঘেঁষেই হেঁটে এসেছিল, আর একটু বেশী হেসে হামেশা স্কুল ছুটির ব্যাপার নিয়ে দুই-একটা ঠাট্টার কথা বলেছিল। বাঁক পেরিয়েই অর্থাৎ ওই পাজীর চোখ ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাঝের ফাঁক বাড়িয়ে দিয়েছিল আর মুখের হাসির রাশ টেনে ধরেছিল।

সেদিন সেলাইয়ের স্কুল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে প্রায়, বাইরে থেকে একজন শিক্ষয়িত্রী ঘরে ঢুকে খবর দিল, তোমাকে বসার ঘরে কে একজন ডাকছে দেখো, তোমাদের বাড়ির নিচের তলায় থাকে বলল।

খবরটা দিতে দিতে মহিলা সামনের দিকে এগিয়ে গেল বলেই ওর মুখের লালের ছোপ লক্ষ্য করল না। সেলাইয়ের জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পর পর দুটো ঘরে সেলাই শেখানো হয় আর বারান্দায় ও-ধারের ছোট ঘরটা মায়াদির আপিস ঘরও, বসার ঘরও। বড়দি না থাকলে ওটা খালিই পড়ে থাকে সর্বদা।

ঘরে ঢোকার আগে চোখমুখের অবস্থা একটু স্বাভাবিক করে নেওয়ার তাড়নায় পরীরাণী দরজার কাছে দাঁড়াল একটু।...এখানে আসার কি দরকার ছিল বাপু, দু'পাঁচদিন এরকম এলে কে কি ভাববে ঠিক আছে। বাবু না হয় কারো ভাবাভাবির ধার ধারেন না তা'বলে ওরও তো চোখ-কান কাটা নয়।

ঘরে ঢুকেই অবাক, কেউ নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চমকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর বুকের রক্ত হিম কয়েক মুহূর্তের জন্য।...দরজার খোলা-পাটের আড়ালে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল নিশ্চয়, ও ঘরের মধ্যে দু'পা ঢোকা মাত্র দরজার সে-পাটটা নিঃশব্দে বন্ধ করে বেরুবার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। অন্য পাটটা খোলা।

বসন্ত সরখেল।

পরনে ভালো ট্রাউজার, গায়ে টেরিলিনের শার্ট। চেনা না থাকলে যে কেউ ভদ্রলোকই ভাববে। এমন বেপরোয়া সাহস।

পরীরাণীর কল্পনার বাইরে। চেঁচিয়েই উঠত হয়তো, কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল। জমাট-বাঁধা ঠাণ্ডা গলায় বসন্ত বলল, চেঁচামিচি করে কোনো লাভ হবে না, এখানকার এই মেয়ের দঙ্গল আমার কিছুই করতে পারবে না, মাঝখান থেকে আমি এমন সব কথা বলব যা শুনে ওরা হাঁ হয়ে যাবে...পরীরাণীর সুনামের হানি হবে। এই দিনেদুপুরে আমি এখানে শয়তানী করতে আসিনি, এই শেষবারের মতো আমি যা বলতে এসেছি চুপচাপ শুনে জবাব দিলেই আমি চলে যাব।

পরীরাণী চেয়ে আছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিস্পন্দ ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। শয়তানের এই হুঁশিয়ারিতে আর চাউনিতে অমোঘ কিছু আছে, এতটুকু বেগতিক দেখলে মরণঝাঁপই দিতে পারে যেন। তাছাড়া পরীরাণীর যা স্বভাব, দশজনের হৈ-চৈ চেঁচামেচির কুৎসিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়া ওর কাছে মৃত্যুতুল্য।...সাহস সঞ্চয়ের রসদ এই শয়তানই জুগিয়েছে, এ-সময় আশপাশের এত মেয়ের মধ্যে কি এমন করতে পারে।

বসন্ত সরখেলের গলার স্বরে চাপা হিসহিস ব্যঙ্গ ঝরল যেন একপ্রস্থ।—ঘরে শেখর ভাদুড়ীর বদলে এই পাপ মুখ দেখে ভয়ানক ধাক্কা লেগেছে, তাই না?

—হ্যাঁ। দরজা খুলে দাঁড়াও!

নিজের কণ্ঠস্বর কানে আসতে পরীরাণী নিজেও যেন পা'দুটোর ওপর জোর পেল অনেকখানি।

—চোখ দেখাস না, আমি কারো চোখের ধার ধারি না। হাতের টানে দরজার বন্ধ পাটটা খুলে দিয়ে ঘরের মেঝের চেয়ার ক'টা দেখিয়ে বলল, ওখানে বসতে হবে—

পরীরাণী নড়ল না, অপলক চেয়েই রইল। বসন্ত সরখেল সোজা তার দিকে এগিয়ে এলো কয়েক পা, বেশ কাছে। পরীরাণী তবু দাঁড়িয়ে আছে, তবু চেয়ে আছে। কি করে এত জোর পাচ্ছে জানে না, আর চার আঙুল এগোলে যে হাতটা প্রস্তুত সেই হাতের নাগালেব মধ্যে পাবে ওকে।

—আমি কথা দিচ্ছি কোনরকম অভদ্র ব্যবহার করব না, সাত-আট মিনিটের জন্যে ওখানে বসে শুনতে হবে। তারপর জবাব পেলেই আমি চলে যাব—

এবার পরীরাণী সরে দাঁড়াল খানিকটা। কিন্তু বসল না, দাঁড়িয়েই রইল, আর চেয়ে রইল। ভয় আর নেই বললেই হয়।

হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ার সামনে টেনে তার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল বসন্ত সরখেল। দরজার দিকে পিঠ। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, ওব পাশ না কাটিয়ে দরজার দিকে এগোতে পারবে না, এবং সে চেষ্টা করলে ও পথ আগলে বাধা দিতে পারবে।

কয়েক পলকের নিশ্চল দৃষ্টি-বিনিময়। পরীরাণী কেমন করে যেন অনুভব করছে শয়তান যতটা তেজ দেখিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ভিতরে যেন অতটা তেজ নেই। এবারের গলার স্বরও অন্যরকম ঠেকল কানে।

বসন্ত বলল, যা বলার একটা চিঠিতে লিখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু গুছিয়ে লেখা-টেখা ধাতে নেই, আর এ-বিদ্যেয় কুলোয় না!...তাছাড়া পল্টু ঘোষাল আমাকে ভয় করলেও চিঠি নিয়ে যেতে রাজি হল না, বলল, সেই একদিন আমার হাত থেকে বেঁচে এসে বাড়ি ফিরে তুই নাকি আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছিলি।...মাত্র তিনদিন আগে ওর মুখে এ-খবরটা শুনেছি আর ওই তিন রাত ধরেই আমি ঘুমুতে পারিনি, বুঝলি?

চোখ পাকিয়ে তাকালো। যেন ঘুমুতে না পারাটাও পরীরাণীর অপরাধ। এই প্রথম পরীরাণীর মনে হল, এবারে চেয়ারসুদ্ধ ওকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে ঘর ছেড়ে চলেও যেতে পারে। কিন্তু সে-চেষ্টা না করে স্থির চোখে চেয়ে রইল শুধু!

গলার স্বরে একটু বাড়তি জোর দিতে চেষ্টা করল বসন্ত সরখেল। সেই হারু আর সুবলাকে মনে আছে তোর, দল পাকিয়ে ওরা আমাকে খুন করার মতলবে ছিল, আমি সটান ওদের কাছে গিয়ে বলেছি কেন আমি তোকে নিয়ে পালিয়েছিলাম, তোকে সিঁদুর পরানোটা আজও মিথ্যে ভাবিনে বলে আমি প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ওদের কাছে গিয়ে সব বলতে পেরেছিলাম। ওই পাজীরাও আমাকে বুঝেছে, বলেছে, আবার সিঁদুর পরানোর ব্যবস্থা কর, সেটা যাতে পাকাপোক্ত হয় আমরা দেখব।...আমার লোভ হয়েছিল, কিন্তু ঘোষালের মুখে ওই আত্মহত্যা করার চেষ্টার খবরটা শোনার পর কেন যেন তোর ওপর আমার আশ্চর্য রকম মায়া হয়েছে, আর আগের থেকেও তোকে ঢের বেশি ভালো

লেগেছে।...শোন পরী, আমি একটুও মিথ্যে ভেবে তোকে সিঁদুর পরাইনি, তোর জন্যে আমি কত বছর ধরে বসে আছি ঠিক নেই, আমি কথা দিচ্ছি তুই বললে আমি অন্যভাবে চলব, যেমন বলবি সেই রকম থাকব।

আত্মবিশ্বাসের এই পর্যায়ে পরীরাণীর দুই অপলক চোখে ঘৃণা উপছে উঠল একপ্রস্থ। দেড়মাস-দু'মাস আগের সেই ঘৃণ্য আচরণ মনে পড়েছে, সেই ক্লেদ স্পর্শ আজও যেন মুছে যায়নি। বেগতিক দেখে শয়তান এখন নতুন মুখোশ পরেছে—দুই হাতের আঙুলের দশ নখে সেটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করল পরীরাণীর।

চোখে চোখ রেখে চেয়েই রইল কয়েক নিমেষ।—কথা শেষ হয়েছে?

বসন্তর চাউনি ঘোরালো ঈষৎ।

এবারে জবাব চাই।

মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

জবাবটাও পরীরাণী চকিতেই ভেবে নিতে পেরেছে।—সুধীর সান্যালকে চেন? তাঁর হাতে আরো মাখন মজুমদার আছে। তাছাড়া থানাতেও তিনি তোমার নামে ডায়রি করে রেখেছেন আর বলেছেন তুমি এতটুকু বিরক্ত করলে তাঁকে জানাতে।...আজই জানাব, এরপর কুকুর-বেড়ালের মতো পালিয়ে না বেড়ালে আমার জবাব খুব ভালো করেই পাবে।

...ও। চকিত বিভ্রম কাটিয়ে বসন্ত সরখেল বলে উঠল, আর তোর ওই সুধীর সান্যাল বুঝি ধোয়া তুলসী পাতা একখানা!

যেমনই হোক তুমি তার পায়ের নখের যোগ্য নও—এই মুহূর্তে বেরুবে কিনা এখান থেকে?

হ্যাঁ, মুখোশটা ছিঁড়েখুঁড়েই দিতে পেরেছে পরীরাণী। ঠোঁটে গালে ভুরুর মাঝে কুৎসিত রেখা পড়েছে, চাউনিটা দগদগে হয়ে উঠেছে। মনে হল শয়তান বুঝি এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর।

সমস্ত কদর্যতা গলিত আগুনের মতো গলা দিয়ে বার করে দিয়ে গেল।—তোর জন্য বসন্ত সরখেল জানের পরোয়া করে না এ তোকে আমি বুঝিয়ে ছাড়ব।...ওই পিরিতের ইস্কুল মাস্টার যদি তোকে বিয়েও করে তো একদিন না একদিন তোকে বিধবা হতে হবে জেনে রাখিস...আর তারপর যখন পাব তোকে, আত্মহত্যারও সুযোগ মিলবে না এই বলে গেলাম।

এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে চলে গেল। তারপরেও পরীরাণী স্তব্ধ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। কপালে আর ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। অবসন্ন লাগছে। সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

তক্ষুনি উঠে পড়ল আবার। কে আসবে, এ-ভাবে বসে থাকতে দেখে কে কি জিজ্ঞাসা করবে ঠিক নেই।

দশ মিনিটের পথ ভেঙে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। একতলায় সামনের দরজাটা খোলা। কিছু না ভেবেই ঢুকে পড়ল। ঘরে শেখর ভাদুড়ী নেই, সরু বাশের ঝাড়ন হাতে তাঁর মা ঝুল ঝাড়ছেন। থমকে তাকালেন, অপ্রসন্ন মুখ।

বেরিয়ে এসে পরীরাণী সোজা দোতলায় উঠে গেল। মাথা আরো গরম এখন। ...সামনের ঘরে দাদা আর বীরুমামুর গলা, দাদাকে এ-সময় পাবে আশা করেনি। দরজার

কাছে দাঁড়িয়ে থমথমে উত্তেজনায় ডাকল, দাদা শোনো—

নিজের খুপরি ঘরে চলে এলো। পরিতোষ তক্ষুনি উঠে এসেছে। এ-রকম ডাক শুনে আর এই মুখ দেখে অবাক বেশ। অসহিষ্ণু ঝাঁঝে পরীরাণী বলে উঠল, তোমাদের মাখন মজুমদার তো নেই, ওই বসন্ত সরখেলের কি ব্যবস্থা করবে এখন?

পরিতোষের মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল। চেয়ে আছে বোনের দিকে।—কি করেছে সে?

মাখন মজুমদার মারা যাবার পরদিন সকাল থেকেই আবার অপমান করতে শুরু করেছে, আজ সেলাইয়ের স্কুলে গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে আমাকে বসার ঘরে ডাকিয়ে এনে অকথ্যভাবে শাসিয়েছে—

দাদার ফর্সা মুখে যেন ঝপ করে আলগা রক্ত উঠল একপ্রস্থ। চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভালো করে কিছু বোঝার আগেই এক-দেড় মিনিটের মধ্যে দাদাকে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে একলা তরতর করে নিচে নেমে যেতে দেখল। আর তার পরেই সামনে বীরুমামুর সত্রাস মূর্তি।

—কি হয়েছে? ও বাক্স থেকে ছোরা বার করে নিয়ে ছুটল কেন?

শোনামাত্র পরীরাণীর গায়ের রক্ত হিম যেন। হতভম্বের মতো বীরুমামুর দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আবার ঝাঁকুনি খেয়েই বাইরের বারান্দার দিকে ছুটল। কিন্তু ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে রাস্তা দিয়ে ঠিক এই সময়েই সারি সারি ট্রাক চলেছে। দাদাকে দেখাই যাচ্ছে না।

পরীরাণীর বুকের কাঁপুনি থামল, দাদা ফিরে আসছে। বারান্দা ছেড়ে সিঁড়ির দিকে চলে এলো আবার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাদা বলল, পেলাম না—

পরীরাণী চেঁচিয়ে উঠল, তুমি ছোরা নিয়ে বেরিয়েছিলে কেন? পেলে খুনোখুনি করে আসতে?

দোতলায় পা দিয়ে পরিতোষ জবাব দিল, কিছুই করতাম না, ওটা দেখলেই ওর রক্ত জল হয়ে যেত। তুই কিছু ভাবিস না, ওকে আমি ঠাণ্ডা করছি।

—তোমাকে কে সর্দারি করতে বলেছে? আগের বারের মতো সান্যালমশাইকেই গিয়ে বল না, যা ব্যবস্থা করার তিনি করবেন—

পরিতোষ পাল্টা ধমক দিয়ে উঠল, সান্যালমশাইয়ের ব্যবস্থা করার কি দায় পড়েছে? তাছাড়া তাকে বলতে যাব কেন, আমার দুটো করে হাত-পা নেই?

বিরক্ত মুখ করে ঘরে ঢুকে গেল। বীরুমামু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে পরীরাণীর দিকে তাকালো। তার কালো ঠোঁটে তির্যক হাসির মতো কিছু দেখা গেল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু ওর মাথায় তখন অন্য কিছু নেই, দাদার নতুন রকমের হাত-পা হয়েছে সেটুকুই যেন অনুভব করছে।

নিজের চিন্তা থেকেও দাদার জন্য একটা অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা পরীরাণীর মনের তলায় থিতিয়ে আছে সেই থেকে। দাদার পকেটে আজকাল ছোরা-ছুরি থাকে জানত না। বিকেলে দাদাকে একলাই একটু সেজেগুজে বেরুতে দেখল। আজকাল রোজই প্রায় নিজের হাতে জামা-কাপড় কাচে, মাড় দেয়, গেলাস গরম করে ইস্তিরি করে। মাঝে

মাঝে ইদানীং একাই বেরুতে দেখছে, বীরুমামু তখন ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে বিড়ির পর বিড়ি টানে। আগে ছায়া-কায়ার মতো একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করত দু'জনে।

এছাড়া আরো কিছু বিক্ষিপ্ত চিন্তা টুকটাক মাথার মধ্যে ঢুকে পড়ছে আর বেরিয়ে যাচ্ছে।...যতবার মনে পড়েছে বসন্ত সরখেলের মুখটা থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করছে পরীরাণীর।...গত ক'দিন ওকে দেখে এক চোখ ছোট করেনি আর ইতরের মতো হাসেনি...আর পল্টু ঘোষালের মুখে ওর আত্মহত্যার চেষ্টার কথা শুনে তিন রাত্তির ঘুমুতে পারেনি বলেছে, শেষের ওই কদর্য শাসানির কথাগুলো তপ্ত শলার মতো কানে না বিঁধে থাকলে পরীরাণী হয়তো হাসতেও পারত। হাসির বদলে ভিতর থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে এখনো।

বীরুমামু সামনের বারান্দায় ঘুরঘুর করছিল এতক্ষণ, এবারে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েই গেল। মুখ দেখেই বুঝল বলতে চায় কিছু। যা-ই বলুক পরীরাণীর ভালো লাগবে না জানা কথাই।

—ওই বসন্তটা আবার তোর পেছনে লেগেছে বুঝি?

জবাব না দিয়ে পরীরাণী অন্যদিকে মুখ ফেরালো। অর্থাৎ বাক্যালাপের ইচ্ছেও নেই।

—তা তোর দাদাকে সান্যালমশাইয়ের কাছে যেতে বলেছিলি কেন? ও নিজেই এখন আধাআধি মাখন মজুমদার হয়ে বসেছে...গোটাগুটি হবার আশা রাখে...ওই সান্যালমশাইয়ের সঙ্গেও আগের মতো ভাবসাব দেখছি না, ভদ্রলোক আজকাল টাকা-পয়সাও তেমন দেয় না।

ঘাড় ফিরিয়ে পরীরাণী চকিতে বীরুমামুর দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না।

—কাউকে না বলিস তো তোর দাদার সম্পর্কে তোকে দুই-একটা কথা বলি...মানে তোর জেনে রাখা দরকার—

পরীরাণী উঠে পড়ল, বীরুমামুর গা ঘেঁষেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে অস্ফুটস্বরে বলল, আমার এখন অনেক কাজ—

ও-দিকের কোণ থেকে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে কাজ শুরু করে দিল। আড়চোখে দেখল বীরুমামু নিজেদের ঘরে সেঁধোলো। পরীরাণী ঝাঁট দিয়ে চলেছে, ভিতর-বাইরের সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে দূর করতে ইচ্ছে করছে তার। ও যেন জানত সুযোগ পেলে বীরুমামু কি কথা বলবে।...মাখন মজুমদারের সুশ্রী কচি বউ শেফালির কথা বলবে...মাখন মজুমদার বেঁচে থাকতেই যার হাতের চা দাদার ভালো লাগত। শুধু শেফালির কথা বললে পরীরাণী আগ্রহভরে শুনত...কিন্তু বীরুমামু শেফালির কথা বলবে আর দাদার কথা বলবে।

কিন্তু দু'দিন না যেতে কথা দাদা নিজেই বলল আর মাখন মজুমদারের বউ সেই শেফালির কথাই বলল। বলতে গেলে একরকম সকাল থেকেই দাদা বাড়িতে সেদিন। ঘুরে ফিরে ওর কাছে কত বার এসেছে ঠিক নেই। রান্নার সময় এসেছে। গরমে আর আগুনের তাতে ওর কষ্ট হচ্ছে দেখে মায়ের উদ্দেশে অস্ফুট বিরূপ মন্তব্য করেছে। বলেছে, নিজে রাজ-রাণীটি হয়ে বসে আছেন, আর তুই যেন তার দাসী বাঁদী। আমি মুখের ওপরে স্পষ্ট বলে দেব হপ্তায় তিন দিন অন্তত তাকে হাতা খুন্তি ধরতে হবে।

পরীরাণী অবাক প্রথম। তারপর কি-রকম যেন খটকা লেগেছে একটা। দাদার দরদ আছে ওর ওপর সেটা অনেকবার অনেকরকম ভাবে টের পেয়েছে। কিন্তু গলার এই সুরটা আর বলার এই ধরনটা নতুন যেন। মায়ের ওপর এই বিরক্তি আর ওর ওপর

এই দরদের কোনোটাই যেন অকৃত্রিম নয় খুব। দাদা নেশা করুক বা যে মেজাজেই থাকুক, ভিতরটা সাদা-সাপটা। ফলে বিরক্তিসূচক কথাগুলো অনেকটা অপটু ছেলের কাঁচা ভণিতার মতো শোনাল। কথার জবাব না দিয়ে পরীরাণী ঘাড় ফিরিয়ে একবার মুখের দিকে তাকালো শুধু, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

ঘর আর বারান্দায় আর একটা চক্কর মেরে পরিতোষ আবার পিছনে এসে দাঁড়াল। —কি অত রাঁধছিস সেই থেকে?

এবার পরীরাণী সোজাসুজি খানিক চেয়েই রইল তার দিকে।—বলবে কিছু?

পরিতোষ বাঁকা রাস্তা ছেড়ে ঝপ করেই জবাব দিল, বলব তো, কিন্তু তুই তো সেই থেকে রান্না নিয়েই ব্যস্ত।...বীরুমামুটাও বাড়ি নেই, ঘরে থাকলে ও আমাকে সর্বক্ষণ চোখে আগলাচ্ছে, ভাবছিলাম এই ফাঁকে একটা দরকারী কথা সেরে নিই তোর সঙ্গে।

উনুন থেকে কড়াটা নামাল পরীরাণী। দাদার এই কথাগুলোও কেন যেন অস্বস্তির কারণ। যে মানুষটা কোনোরকম সংকোচের ধার ধারে না কোনো দিন তার মুখে এ-রকম কাঁচা লজ্জা-লজ্জা ভাব।

—বল।

—এখানে বলব কি! ঘরে আয় না—না হয় তোর ঘরেই চল।

পরীরাণীর সন্দিগ্ধ দুটো চোখ আর একবার দাদার মুখের ওপর বিচরণ করল। উঠল তারপর। দাদা আগে আগে ওই খুপরি ঘরের দিকে চলল। পরীরাণী পিছনে।...ও ছোট বোন। রাগলে ওর ওপরেও দাদার প্রচণ্ড দাপট। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর যেন বড় বোনের ভূমিকা। এ-রকম কখনো হয়নি। এটা ভালও লাগছে না আদৌ। ও যেন নিঃসংশয়ে জানে দাদা কি বলবে। পরীরাণীর কথা নয়, বাবা মা বা বীরুমামুর কথা নয়। বাইরের একটি মেয়ের কথা বলবে দাদা...মাখন মজুমদারের বউ শেফালির কথা বলবে।

বলবেই। কিন্তু পরীরাণী শুনতে চায় না, কিছু জানতে বুঝতেও চায় না। অথচ শুনতেই যাচ্ছে। যেতে হচ্ছে।

সিঁড়ির পাশ দিয়ে নিজের খুপরি ঘরে ঢোকার আগেই বাধা। সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলার ঝি ওপরে উঠে আসছে। ওকে দেখে জানান দিল, দাদাবাবু এক্ষুনি একবার নিচে ডাকছে তোমায় দিদিমণি।

পরীরাণী দাঁড়িয়ে গেল। সামনে দাদাও। ঝিয়ের কথা শোনার আগে ওকে দেখেই একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেছল পরীরাণী। তলব শুনে সেটা আরো বাড়ল। দাদার চোখে চোখ পড়তে নিচের তলার ওই লোকের প্রতি বিরক্ত। গম্ভীর মুখে ঝিয়ের দিকে ফিরে বলল, একটু বাদে যাচ্ছি বলোগে—

—দাদাবাবু বললেন এক্ষুনি আসতে, পাঁচ মিনিটের জন্যে—

ওর ওপরেই ঝাঁঝিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল পরীরাণীর। কিন্তু কিছু বলার আগে ব্যস্তসমস্ত মুখে দাদা বলে উঠল, তুই যা, আগে শুনে আয়, নিশ্চয় বিশেষ কিছু দরকার।

পরীরাণী দাদার দিকে তাকালো একবার। এই বিঘ্নের দরুন দাদার মুখে অখুশির ছায়া পড়েনি একটুও। উল্টে বরং খুশি দেখাচ্ছে তাকে। নিচের তলার ওই ঝিয়ের বদলে যদি বীরুমামুর মূর্তি দেখত, মুখের ওপর কটু-কাটব্য করে উঠত হয়ত। মা বা বাবা ডাকলেও তার মেজাজ ঠিক থাকত না। ঠিক এই মুহূর্তে নিচেব তলার ওই একজন

ডেকেছে বলেই শুধু অখুশি নয়। এর ফলে নিজের ব্যাপারে সে যেন কোথায় একটা জোরের রসদ পেয়েছে।

—যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চট করে শুনে আয়। আমি অপেক্ষা করছি।

আর বাধা না দিয়ে পরীরাণী নিচে নেমে গেল।

সামনেই মাস্টারমশাই। শেখর ভাদুড়ীর বাবা। একটা বই হাতে ভিতরের বারান্দায় চুপচাপ পায়চারি করছেন। পরীরাণীর কেমন মনে হল, ভদ্রলোক পড়ছিলেন, কিন্তু যে-কারণেই হোক পড়ায় বিঘ্ন ঘটেছে। ওকে দেখে উনি অন্তত হেসে দুই একটা কথা বলতেন। তাও বলতে পারলেন না। অপ্রতিভ মুখে একবার সামনের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাতের বইটা খুললেন।

পাশ কাটাবার ফাঁকে সামনের ওই ঘরে তাঁর গৃহিণীর অবস্থান চোখে না দেখেও অনুভব করা গেল। ভিতরে ভিতরে ওই শেখর ভাদুড়ীর ওপরেই রাগ হয়ে গেল পরীরাণীর। সে না-হয় দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না, কিন্তু অপরকে এ-রকম বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলার অর্থ কি।

বাইরে এসে বারান্দার দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল পরীরাণী। জামাকাপড় পরে বাইরে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল শেখর ভাদুড়ী। টিপ্পনীর সুরে বলল, ওপর থেকে নিচে নেমে আসতে সাত মিনিট, নাও একটা সই করো—

দরখাস্ত গোছের একটা টাইপ করা কাগজ ওর সামনে রেখে পেনটা এগিয়ে দিল।

টাইপ করা কাগজটার দিকে চোখ রেখে পরীরাণী জিজ্ঞাসা করল, কি এটা?

হালকা বিরক্তিসূচক ব্যস্ততায় শেখর ভাদুড়ী জবাব দিল, সই সাবুদ করিয়ে তোমার সমস্ত সম্পত্তি দখলের মতলব বুঝতে পারছ না--যা শোনার পরে শুনো, কষ্ট করে আগে সইটি করে দাও, এক্ষুনি বেরুতে হবে—

তাড়া খাবার ফলে কলম হাতে নিয়েও কোথায় সই করতে হবে পরীরাণী চট করে হদিস পেয়ে উঠল না। কোথায় সই করব?

—কি মুশকিল, একটা দরখাস্তও সই করতে জানো না, তোমাদের দিয়ে হবে কি! এইখানে এইখানে—ইয়োরস ফেথফুলির তলায়—

একেবারে কাছে এসে কলমসুদ্ধ ওর হাতের মুঠি ধরে সইয়ের জায়গায় বসিয়ে দিল শেখর ভাদুড়ী। তারপর হাত ছাড়ল বটে, কিন্তু পাশ থেকে নড়ল না। কাঁধে কাঁধ ঠেকে আছে বলতে গেলে, বাহুতে গরম নিঃশ্বাসের স্পর্শ। একটা সই করে উঠতে ঘেমে নেয়ে ওঠার দাখিল পরীরাণীর। সইটা একটু বেঁকেচুরেও গেল।

কাগজটা হাতে নিয়ে ভুরু কুঁচকে সইটা একবার দেখে নিল শেখর ভাদুড়ী। আবার একটা বিরক্তিসূচক মন্তব্য করার মুখেও থমকাল। কানের পাশটা গরম ঠেকছিল পরীরাণীর, মুখ লাল হয়েছিল কিনা জানে না। তখনো পাশ থেকে সরেনি শেখর ভাদুড়ী। চাউনিটা চকিতে ওঠা-নামা করল একটু। হাসি চেপে আর গলা খাটো করে অস্ফুট উক্তি করল, মেয়ে আর কাকে বলে—

ওদিকে সরে গিয়ে স্যাণ্ডালটা পায়ে গলিয়ে নিল। ব্যস্ততা সত্ত্বেও ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। দরখাস্তটা ভাঁজ করে পকেটে রাখার অছিলায় দেরি করছে একটু আর মুখের দিকে চেয়েই আছে।

—কি? সহজ হবার তাড়নায় পরীরাণীর গলা দিয়ে স্বরটা বেরুল।

—বললাম না বেরুতে হবে এক্ষুনি!

—বেরুতে হবে তো বেরোন।

শেখর ভাদুড়ী তক্ষুনি সত্যিকারের ব্যস্ততার মধ্যে ফিরে এলো। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে এগোতে বলে গেল, এ-দরজা দুটো বন্ধ করে তুমি ভিতর দিয়ে চলে যাও। বিকেলের দিকে একবার এসো, কথা আছে—

চলে গেল। পরীরাণী নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত। বাইরের এই দরজা বন্ধ করে ভিতর দিয়ে যাওয়া মানে ভাদুড়ী গিন্নির নাকের ডগা দিয়ে যাওয়া। বাইরের দরজা খুলে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক নয়, কিন্তু এটা আরো শক্ত।

বই-হাতে পায়ে পায়ে মাস্টারমশায় এবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। পরীরাণী হাঁপ ফেলে বাঁচল যেন। তক্ষুনি বেরিয়ে এসে বলল, আপনি ওই ঘরে গিয়ে বসুন, দরজা দুটো খোলা পড়ে থাকল—

কথা শেষ করার আগেই পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুবার আগে দু'পা আবারও থেমে যাওয়ার উপক্রম। সিঁড়ির পাশের ঘরের দু'হাত অন্দরে ভাদুড়ী গিন্নি দাঁড়িয়ে। না, পরীরাণী সাহস করে বা ভালো করে তাকায়নি তার দিকে। তবু খরখরে মুখখানা দেখে নিতে পেরেছে। আর তক্ষুনি মনে হয়েছে, ওপরে ঝি পাঠিয়ে ওকে ডেকে আনার খবর যেমন রাখে মহিলা, টাইপ-করা কাগজে সই করানোর পর্বটিও তেমনি অগোচর নয়।

কি জন্যে দরখাস্ত আর কেন তাতে সই করার জন্য ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে আপাতত সে কৌতূহলও উবে গেছে পরীরাণীর। সেই সঙ্গে ওই ছেলের চকিত প্রসন্নতার কথা মনে হতেও কানের কাছটা গরম। ওটা বিশ্লেষণের বস্তু নয়, অনুভবের বস্তু।

দোতলায় পা দিয়েই দাদার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আবার, ভাবতেও বিরক্তি। কিন্তু বিরক্তির পরমুহূর্তে দাদার জন্য এক-ধরনের মায়া-মেশানো দুশ্চিন্তা একটা। যে-কারণে দাদার কথা ভেবে অস্বস্তি ওর, ঠিক সেই রকম একটা অবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করেই তো শেখর ভাদুড়ীর বাবা-মায়ের এই অস্বস্তি, বিশেষ করে তার মায়ের এই ব্যবহার। বিশদ করে চিন্তা করতে গেলে দুটো পরিস্থিতির মধ্যে অনেক তফাত। কিন্তু অস্বস্তির তাড়নাটা একই রকমের।

দাদা ওর চৌকিতেই হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে আর ভিতরের ছাল-ওঠা ছাদ দেখছে। কোনো একটা সুখ-চিন্তায় বিভোর মনে হয়। নিজের অগোচরে হাসছে একটু একটু আর পা নাড়ছে। পরীরাণী সামনে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত টের পায়নি। ওর চলাফেরাটা টের না পাওয়ার মতই নিঃশব্দ অবশ্য।

সচকিত পরিতোষ তড়াক করে চৌকিতে উঠে বসল।—হয়ে গেল? শেখরবাবু কেন ডেকেছিলেন রে?

দাদার এই সদয় কৌতূহলেরও যেন একটা কারণ অনুভব করতে পারছে পরীরাণী। নির্লিপ্ত জবাব দিল, কি একটা কাগজ সই করানোর জন্য!

দাদা শুনে অবাক যেন।—কি কাগজ জেনে বুঝে না নিয়েই সই করে দিয়ে এলি? জানিস নিশ্চয়, আমাকে বলছিস না—

বিরক্তিকর। এই গোছের নরম-গরম কথাবার্তাও দাদাকে মানায় না যেন। কিন্তু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করার ধাত নয় পরীরাণীর। জবাব দিল, আমি জানি না, কোনো দরখাস্ত-টরখাস্ত হতে পারে, সই করতে বলল, করে দিলাম।

আরো অন্তরঙ্গভাবে দাদা সামনের দিকে ঝুঁকল একটু।—আচ্ছা, শেখরবাবু খুব ভালো লোক আর তুই তাকে খুব বিশ্বাস করিস, না?

জবাবে পরীরাণী তার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল একটু। দাদা সরল মানুষ বলেই ওর ভিতরটা যেন আয়নায় দেখার মতো করে দেখতে পাচ্ছে পরীরাণী। ভিতরে ভিতরে তার কোন প্রসন্নতার কারিকুরি চলেছে তাও অনুভব করতে পারে। এই সদয় কৌতূহল শুধু সেই কারণে।

পরীরাণী দরজার দিকে পা বড়াল, সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাঁ-হাঁ করে উঠল।—ও কি, চললি যে! আমার কথাই তো বলা হল না, শোন শিগগীর—

পরীরাণী ফিরল আবার।—বল, আমার সব রান্না পড়ে আছে।

মনের যে অবস্থা, স্থূল রান্নার কথা শুনে দাদার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠার দাখিল। অগত্যা সোজা তার দরকারী কথার মধ্যে চলে এলো।—বিকেল চারটে সাড়ে চারটের সময় আজ তোকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

পরীরাণী এতটা ভাবেনি। কিছুদিন ধরে দাদা যে-বাতাস সাঁতরে বেড়াচ্ছে সেটা আর নিজের মধ্যে ধরছে না এটুকুই শুধু আঁচ করেছিল। কিছু শুনতে হবে ভেবেই মনে মনে তটস্থ হয়েছিল, তার বদলে কিনা ওকে ধরে টানাটানি!

জবাব দিল না। জিজ্ঞাসাও করল না কোথায় যেতে হবে বা কেন যেতে হবে। চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু।

পরিতোষের সেটা পছন্দ হল না।—হাঁ করে দেখছিস কি, কথাগুলো কানে গেল?

মাথা নাড়ল, গেছে।

—কি মুশকিল, তোর কি অসুবিধে আছে নাকি...ওই ইয়ে, শেখরবাবুর সঙ্গে বিকেলে কিছু অ্যাপয়েন্টমেন্ট-টেন্ট হয়নি তো? তাহলে কাল ব্যবস্থা করা যাবে—

মনে মনে পরীরাণী ভয়ানক বিরক্ত বোধ করল এবার। দাদা নিজের অবস্থার সঙ্গে ওর অবস্থাটা এক করে দেখছে আর সেই জন্যেই ছোট বোনের সঙ্গে এই আলোচনায় সঙ্কোচ নেই খুব।...শেখর ভাদুড়ী অবশ্য বিকেলে দেখা করতে বলেছে, কিন্তু সেটা এমন কিছু জরুরী নয়। মুখ ফুটে জবাব দিল এবার। বলল, না।...কিন্তু ও-সব ব্যাপারে আবার আমাকে কেন?

যাওয়ার ইচ্ছে যে একেবারেই নেই কথার সুরে সেটুকু অন্তত বুঝিয়ে দিতে চাইল।

—ও-সব ব্যাপারে মানে! তোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি বুঝতে পেরেছিস?

পরীরাণী মাথা নাড়ল। পেরেছে।

পরিতোষ উৎসুক।—কোথায় বল তো?

—তোমার সেই বন্ধু মাখন মজুমদারের বউয়ের ওখানে।

ইচ্ছে করলেই বলতে পারত শেফালির বাড়ি। তার বদলে বন্ধুর নাম করল, আর তার সঙ্গে বউ কথাটা যুক্ত করল। কিন্তু দাদা ও-সব ঘোরপ্যাঁচের ধার দিয়েও গেল না। সত্যিকারের অবাক, আর তলায় তলায় উৎফুল্লও একটু। তুই জানলি কি করে?...ও,

মামু কিছু বলেছে বুঝি? কিন্তু মামুই বা জানবে কি করে, তাকে সেখানে নিয়ে যাবার কথা তো কাউকে বলিনি! তুই বুঝলি কি করে?

—তোমার মুখ দেখে।

—যাঃ! লজ্জা-লজ্জা মুখ দাদার। তুই তো আচ্ছা মেয়ে, আর সারাক্ষণ এমন মুখ করে থাকিস যেন ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানিস না। যাক, বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে তুই রেডি হয়ে থাকবি তাহলে—একটু ভালো শাড়ি-টাড়ি পরে নিস, বুঝলি?

যে-টুকু বুঝেছে পরীরাণীর তাতেই আপত্তি। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার মতো কেন যে তেমন জোর পাচ্ছে না জানে না। দাদার যা অবস্থা, বিপরীত কিছু আঁচ পেলে তক্ষুনি হয়তো শেখর ভাদুড়ীর প্রসঙ্গ টেনে আনবে। বীরুমামু আর কিছু না পারুক, নিচের তলার ওই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগের একটাই তাৎপর্য দাদার মাথার মধ্যে ভালোরকম ঠেসে দিয়েছে। আপত্তিটা ঘুরিয়ে প্রকাশ করল। বলল, চিনি না জানি না আমি গিয়ে কি করব?

মাথা ঝাঁকিয়ে দাদা বলল, না গেলে চেনা-জানা হবে কি করে—তোর কিচ্ছু চিন্তা নেই, শেফালি খুব ভাল মেয়ে, তোকে কত খাতির করে দেখিস'খন, তোকে নিয়ে যাবার কথা আমাকে কতদিন বলেছে। কি মনে পড়তে হেসে উঠল, তুই কলেজে-পড়া মেয়ে শুনে ওর আবার তোর সঙ্গে আলাপ করতে ভয়—তুই ভাবিস দাদা তোকে ভালোবাসে না, তোর গল্প আমি ওর কাছে কত করেছি জানিস!...মাখন মজুমদার আর নেই, এই সেদিনও তাই শেফালি জিজ্ঞেস করছিল ওই শয়তান ছেলেটা আবার তোর পিছনে লেগেছে কি না।

শুধু অস্বস্তি নয়, ভিতরে ভিতরে বিরক্তিরও একশেষ। এখন ঘর ছেড়ে বেরুতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু পরিতোষ ওকে অব্যাহতি দিলে না। অনেক দিনের একটা রুদ্ধ ভাবের বাষ্প মুক্তির পথ পেয়েছে, সঙ্কোচেব আগল ভেঙেছে। গলগল করে এরপর অনেক কথাই বলে গেল। বলল, মেয়েটা সত্যিই বড় ভালো, আর ভারী বুদ্ধিমতী, বুঝলি। আগে অতটা বোঝা যায়নি, মাখন মজুমদারের দাপটের মধ্যে ছিল তো!...লোকটা মরে যাক তা কোনদিনই চায়নি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওকে খুব একটা পছন্দও করত না—একেবারে কাঠ-খোট্টা লোক ছিল তো, মেজাজ বিগড়োলে ঠাস-ঠাস মেরে বসত। স্বোয়ামী সেয়ানা পুরুষ হোক এটা সকলেই চায়, কিন্তু মার-ধোর করলে সেটা কোন বউ পছন্দ করে? তা ছাড়া লোকটা যে-সব কাজ করে বেড়াত কোন বুদ্ধিমতী বউ তা পছন্দ করতে পারে না।

বলতে বলতে মুখের লাগাম দাদা আরো ছেড়ে দিয়েছে। কথাবার্তার ঢং-ঢাং জোরালো শুনিয়েছে আরো। মেয়েটাকে যত দেখছি তত আমার ভালো লাগছে, শুনলে কে কি বলবে না বলবে আমি তার ধার ধারি না।...ভালোভাবে কি করে রোজগার-পাতি করা যায় এখন শুধু সেই চিন্তা করছি, বুঝলি? মনের মতো একটা কাজ-টাজ পেয়ে গেলে আর কারো পরোয়া করি না, আমি যদি বিধবা ঘরে আনি তাতে কার কি, মেয়েটার অতবড় জীবন কাটবে কি করে? তখন কোন শালা কিছু বলতে এলে—

কল্পিত বাধার সম্ভাবনা চিন্তা করেই উগ্র মূর্তি দাদার। একটু বাদেই ঠাণ্ডা আবার।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। কিন্তু কি করে যে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারি ভেবেই পাচ্ছি না। ...সুধীর সান্যালের ভরসা করেছিলাম, কিন্তু লোকটার ভিতরে জিলিপির প্যাঁচ, দরাজ হাতে সে-ই এখনো মাখন মজুমদারের মা-কে খরচা জুগিয়ে আসছে, কিন্তু আসলে লোকটার মতলব ভালো মনে হয় না। আগে আমার হাত দিয়ে টাকা পাঠাত, আজকাল নিজে গিয়ে দিয়ে আসছে।...আমার অত বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, কিন্তু কোন্‌টা ভালো আর কোন্‌টা খারাপ ভগবান ঠিক বুঝিয়ে দেয়, খারাপ কাজ করলে জেনে শুনেই করি...ওই লোকটা আমাকে চিনির বলদ ঠাউরেছিল আগে, এখন আমার সঙ্গে খটাখটি লেগেই চলেছে, ভেবেছে চোখ রাঙালেই আমি কুঁকড়ে যাব—ওর সাহায্য করাটা আমি যে করে হোক বন্ধ করব, বুঝলি...একটা বুড়িকে শুধু-মুদু সাহায্য করার পাত্তর নয় ও, এ-কথা একজনকে বলে ফেলেছিলাম, সে আবার সান্যাল মশাইকে গিয়ে লাগিয়েছে—শুনে সে-কি রাগ, যেন মাথাটা চিবিয়ে খাবে আমার। আমিও বুক ফুলিয়ে চলে এসেছি—কিছু একটা কাজে লেগে যেতে পারলে ও কত বড় ত্যাঁদোড় আমি দেখে নেব—অথচ কি যে করব তাও ভেবে পাচ্ছি না...জীবনটাকে নিজের দোষেই মাটি করেছি।

পরীরাণী চেয়ে আছে। দাদাকে দেখছে। কি এক অনুভূত মায়ায় ভিতরটা যেন ভরে যাচ্ছে। অথচ সেই সঙ্গে ভিতরটা কেন যেন উতলাও আবার।

পরিতোষ আধাআধি বাস্তবে ফিরল যেন এবার। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের ব্যাপারে একমাত্র আপনার জন এই বোনটির সমর্থনলাভের প্রত্যাশা। হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, এই সব শোনার পর আমাকে খুব খারাপ মনে হচ্ছে তোর, না?

মাথা নেড়ে পরীরাণী জানাল খারাপ মনে হচ্ছে না। কিন্তু দাদা যদি এ-সব সংস্রব থেকে মুক্ত থাকত তাহলে যেন অনেক বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করত। ও ঘর ছেড়ে যাবার আগে দাদা আবার মনে করিয়ে দিল, ঠিক সাড়ে চারটের মধ্যে রেডি থাকিস কিন্তু—

বেরুতে বেরুতে সাড়ে চারটের জায়গায় পাঁচটা গড়িয়ে গেল। পরীরাণীর সাজগোজ করতে সময় লাগে না, সাজগোজ করেও না বিশেষ। তবু, দাদার নীরব তাড়া সত্ত্বেও কেন যে দেরিই হয়ে গেল একটু, জানে না। আসলে, নিজের যাওয়া দূরে থাক, দাদাকেও যদি আগলে রাখার ক্ষমতা থাকত তাহলে সেই চেষ্টাই করত বোধ করি। আর যাওয়ার মুখে একে একে যে-সব মূর্তির সামনা-সামনি পড়তে হল তার প্রতিক্রিয়াও যেন অনুকূল নয় খুব।

দাদার সঙ্গে বোন চলল কোথায় বাড়িতে এও যেন একটা নীরব বিস্ময়ের ব্যাপার। কোথায় চলল, সেটা একমাত্র বীরুমামুই বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে। প্রথমে অবাক মুখ তার, তারপর বিড়ি-খাওয়া কুচকুচে কালো ঠোঁটে তির্যক ভাঁজ পড়েছে। অদূরে মায়ের সন্দিগ্ধ চাউনি। তার ওধারে নিজের দোরগোড়ায় বাবা দাঁড়িয়ে। তার দুর্বোধ্য দৃষ্টিটাও ওদের ওপরেই।

মা-কে দাদা কি বলে রেখেছে সে-ই জানে, দাদার পিছনে পিছনে পরীরাণী নেমে এলো। বাইরের বারান্দায় এসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ওধারের দরজার দিকে গেল। দোরগোড়ায় শেখর ভাদুড়ী দাঁড়িয়ে, খালি গা, সামনের রাস্তা দেখছে। পায়ের শব্দে এদিকে তাকালো, তারও চোখে নীরব কৌতূহল।

চুপচাপ চলে যাওয়া যেত, কারণ শেখর ভাদুড়ী কিছুই জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু দাদাটা যেন কি। অপ্রতিভ মুখে হেসে যেন জবাবদিহি করার মতো করে বলল, ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুচ্ছি একটু, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরব।

শেখর ভাদুড়ী সামান্য মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। দাদার ওপর হঠাৎ একটু রাগই হল পরীরাণীর, পাঁচটা বেজে গেছে, সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা হবে না জানা কথা। তবু ও-কথা বলল, লোকটা যেন এটুকু সান্ত্বনার প্রত্যাশাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু রাস্তায় নেমে এ নিয়ে আর কিছু ভাবারও ফুরসত পেল না। তার আগেই দু'চোখে যেন পট-পট করে কাঁটা বিঁধল দুটো। তেরছা বাড়ির দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে বসন্ত সরখেল যেন গরাদের ফাঁক দিয়ে মুণ্ড বার করে দেখছে ওদের। ওদের নয়, শুধু ওকেই। এই দেখার মধ্যে নষ্টামি দুষ্টামি নেই, দুই চোখে যেন একটা হিংস্র ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। আবার দাদাকে সঙ্গে দেখে অবাকও বোধহয় একটু। কিন্তু ওর ছায়া দেখলেই পরীরাণীর মাথায় রক্ত উঠবেই। সরোষে সামনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

...কিন্তু দাদার চোখেও পড়েছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। রুষ্ট চাউনি, বোনের ভয়-ডর ঘুচিয়ে দেবার বাসনা। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, ওকে ডেকে নামিয়ে তোর পিছনে লাগার মজাখানা বুঝিয়ে দেব?

পরীরাণী চকিতে পিছন ফিরে তাকালো একবার। শেখর ভাদুড়ী তখনো বাইরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছে। চাপা গলায় দাদাকে তাড়া দিয়ে বলল, এখন কিছু বোঝাতে হবে না, চল—

খানিকটা এগোবার পর দাদা নিজের হাওয়ায় ভাসতে লাগল আবার। খুশি খুশি মুখ। বলল, পকেটে পয়সা থাকলে তোকে আজ ঠিক ট্যাক্সি চড়িয়ে যেতাম, কবে যে এ শালার দিনের চাকা ঘুরবে—

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে জানালায় ওই মূর্তি দেখেই পরীরাণীর মেজাজ বিগড়ে গেছে। যাত্রাটাই শুভ মনে হয়নি। তার প্রমাণ মিলল গন্তব্য স্থানে পা দেবার মিনিটখানেকের মধ্যেই। ট্রাম থেকে নেমে খানিকটা এগোলে একটা গলির মধ্যে সারি সারি ঘর কতগুলো। গলিতে ভ্যাপসা গন্ধ একটা, ঘরগুলোর চুন-বালি খসা ভগ্নদশা। একটা দরজার সামনে এসে দাদা বারকয়েক কড়া নাড়তে ভিতর থেকে দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। পরীরাণী লক্ষ্য করল দাদার মুখের রঙ বদলাচ্ছে, খুশির ঝিলিক চাপতে চেষ্টা করছে যেন।

কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দপতন। দরজা খুলেছে এক বয়স্কা রমণী। আদুড় গায়ে আধময়লা থান জড়ানো।

হাসতে চেষ্টা করে দাদা দেউড়ি পেরুল। তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ঢুকে ফেলল একটা।—মাসি কেমন আছ?

থানের আঁচলটা মাথার দিকে টানতে চেষ্টা করে মাসি জবাব দিল, আর বাবা, আমাদের আবার থাকা-থাকি।

পরীরাণীর মনে হল দাদাকে দেখে রমণীটি যেন বিশেষ খুশি হয়নি। পরক্ষণে ওর দিকেই চোখ পড়ল।—ও কে?

—আমার বোন পরী—পরীরাণী।

দাদা প্রণাম করেছে যখন, অনিচ্ছেসত্ত্বেই ওকেও একটা প্রণাম সারতে হল। পরিচয়টা একতরফা হলে এ কে, পরীরাণীর বুঝতে বাকি নেই। মাখন মজুমদারের মা, শেফালির শাশুড়ি। কিন্তু রমণীটির যেন আপ্যায়নের মেজাজ নয় একটুও। কিছু বললও না, ভিতরে ডাকলও না। বিরস মুখ, চাউনিটাও ঠাণ্ডা নয় তেমন। কিন্তু দাদার কোনদিকে লক্ষ্য নেই। বলল, পরীকে আনার জন্য শেফালি কতদিন তাগিদ দিয়েছে, আলাপ করার ইচ্ছে, কিন্তু আমার সময় হয় তো ওর হয় না, ওর সময় হয় তো আমার হয় না। আজ নিয়ে এলাম।

এর পরেও শেফালির শাশুড়ি-ঠাকরোনের নির্লিপ্ত মুখ, নিরুত্তাপ গলা। বলল, বউমা তো বাড়ি নেই—বেরিয়েছে।

শুনে দাদা একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, বাড়ি নেই মানে!...কোথায় গেছে?

ঈষৎ রুক্ষ জবাব এলো, আমি কি জানি, যে যেখানে যায় আমাকে বলে যায় নাকি?

—কখন গেছে? দাদার গলার স্বরও একটু যেন কঠিন শোনাল কানে।

—দুপুরে।

—সিনেমা-টিনেমায় গেছে?

—যেতে পারে, কপাল যা পোড়ার তো পুড়েইছে, কোথাও গিয়ে দু'দণ্ড যদি আনন্দ পায় তো আমি আটকাব কেন?

দাদার চোখমুখ স্পষ্ট নীরস হয়ে উঠছে।—কার সঙ্গে গেছে?

ঘরের বউ সম্পর্কে বাইরের মানুষের এ-রকম জেরা কারো বরদাস্ত করার কথা নয়। কিন্তু শেফালির শাশুড়ি এর পরেও তেমনি নির্লিপ্ত। জবাব দিল, আশ-পাশ ঘরের মেয়ে-বউরা কেউ গিয়ে থাকতে পারে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কি একটা অস্বস্তি যেন পরীরাণীকেই ছেঁকে ধরছে! বিড়বিড় করে সময়ের হিসেব করে দাদা বলল, ম্যাটিনি শো সাড়ে পাঁচটায় ভাঙে, এখন পৌনে ছ'টা বাজে বোধহয় —একটু বসেই যাই, ছ'টার মধ্যে এসে পড়বে।

এই কথার পরেও রমণীটি যেন প্রকারান্তরে আপত্তিই জানাল।—কে জানে কখন আসবে, একবার বেরুলে এই দম-বন্ধ গরমের মধ্যে কে আর সাত তাড়াতাড়ি ফিরতে চায়।...তাছাড়া বউমা ঘরও তালা-বন্ধ করে গেছে, দিনে দুপুরেও চোর ছ্যাঁচোড়ের তো আর অভাব নেই।

কিন্তু দাদারও যেন গণ্ডারের চামড়া, বলল, তাহলেও অপেক্ষা করে যাই একটু, পরীর কবে আবার আসার সুবিধে হবে না হবে—তোমার ঘর খোলা আছে তো?

—তা থাকবে না কেন, এসো। শেফালির শাশুড়ি ঠাণ্ডা আহ্বান জানাল।

পরীরাণী পালাবার জন্য হাঁসফাঁস করছে, কিন্তু দাদা তার দিকে একবার তাকালও না যে ইশারায় কিছু বলবে।

—পরী আয়। উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে চলল।

অগত্যা দাদার পিছনে পিছনে পরীরাণীও উঠোন পেরিয়ে একটা ঘরে এসে দাঁড়াল। পাশের ঘরটা সত্যিই তালা-বন্ধ দেখল। যে ঘরটায় এসেছে সেটা পরীরাণীর খুপরির থেকেও ছোট বোধ হয়। সরঞ্জামের মধ্যে দড়ির একটা খাটিয়া পাতা, কোণের দড়িতে ময়লা একটা থান আর শেমিজ ঝুলছে—তার নিচে একটা রংচটা টিনের তোরঙ্গ।

দড়ির খাটিয়ায় বসার ইচ্ছে নেই পরীরাণীর, রমণীটি চোখের আড়াল হলেই দাদাকে ফেরার তাগিদ দেবার ইচ্ছে। শেফালির শাশুড়ি সরে গেল বটে, কিন্তু তাগিদ দেবার ফুরসত পরীরাণী আর পেল না। সচকিত মুখে দাদা বাইরের দিকে তাকালো, এরই মধ্যে কারো প্রত্যাবর্তনের আভাস পেল যেন। তক্ষুনি দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

দাদার নির্ভুল অনুমান বটে। পরীরাণী দেখছে বাইরে থেকে উঠোনে পদার্পণ ঘটল একজনের। নিঃসংশয়ে বুঝে নিল কে হতে পারে। শেফালি। আধা ফরসা রং, লাবণ্যভরা মুখ। পরনে বেশ দামী কালো-পেড়ে ফরাসডাঙার শাড়ি, গায়ে সিল্কের সাদা ব্লাউস। পায়ে চক্‌চকে স্যাণ্ডল।

ঘরের ভিতরে তাকায়নি, দোরগোড়ায় দাদাকে দেখে অপ্রতিভ মুখ।—ও-মা আপনি! দাঁড়ান, ঘর খুলি—

এদিক থেকে দাদা গম্ভীর মুখে জানান দিল, আমার বোন পরীও এসেছে, মাসিমা চলে যেতে বলেছিল, আমি জোর করে অপেক্ষা করছি।

ঘব খোলার জন্যেই ওদিকে এগিয়ে গেছে হয়তো, পরীরাণী শেফালির মুখ দেখতে পেল না, কিন্তু কথা শুনতে পেল।—মায়ের কাণ্ড! কোথায় সে?

জবাব না দিয়ে দাদাও ও-দিকে এগিয়ে গেল। একলা ঘরে বিমূঢ় মুখে পরীরাণী দাড়িয়ে। শেফালির শাশুড়িটি কোথায় কোনদিকে গেল ঠাওর করতে পারল না। পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপরেই দাদার ক্রুদ্ধ চাপা গলা কানে আসতে ওরই হাঁসফাঁস অবস্থা যেন। লাগালাগি ঘর, যেখানে দাঁড়িয়েছে কথাও স্পষ্ট শোনা যায়।

—সাড়ে পাঁচটায় শো ভেঙেছে, এরই মধ্যে ফিরলে কি করে? কারো হাওয়া গাড়িতে এলে নাকি?

খুব চাপা হাসি মেশানো হালকা জবাব, এলেই বা আপনার আপত্তি কেন, পথে ঘাটে অবলা মেয়েছেলে দেখলে কত লোকে উপকার করার জন্য হাওয়া গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর দাদার গলায় অসহিষ্ণু শ্লেষ আবার।—শাড়িখানাও তো আনকোরা নতুন আর দামী মনে হচ্ছে, কে দিলে?

—দুঃখী মানুষকে দেবার লোকের অভাব! এখন সরুন দেখি, আপনার বোনকে ডাকি।

কিন্তু দাদার মেজাজ বোধহয় চরমে তখন। গলার স্বরও চড়েছে একটু।—আমি জানতে চাই এ-সবের অর্থ কি, আমরা আসছি জেনেও কোন্ আক্কেলে তুমি সিনেমা দেখতে চলে গেলে?

—আসছেন বলেননি তো, বলেছিলেন আসতে পারি।

—তার মানেই আসব, তুমি জেনে শুনেই চলে গেছ।

—বেশ করেছি। এবারে রমণী কণ্ঠের খুব চাপা অথচ কড়া জবাব।—আমি আপনার কেনা দাসী বাঁদী নই যে এ-ভাবে চোখ রাঙাবেন। বেশি রাগ হয়ে থাকে তো বাইরে গিয়ে হাওয়া খানগে যান, আমি পরীরাণীর সঙ্গে দুটো কথা বলি...

বাইরে এসেই শেফালি থমকাল একটু। তারপর হাসি মুখে এগিয়ে এসে পরীরাণীর হাত ধরল, প্রথম দিন এলে আর কি কাণ্ড দেখ, বাড়ি ছিলাম না বলে তোমার দাদা

রেগে আগুন—সত্যি সত্যি আসবে ভাবিনি, তাই লোভ সামলাতে না পেরে চলে গেলাম। এসো, এ ঘরে এসে বসি।

হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো। দাদার থমথমে মুখ। ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

এ-ঘরখানা অপেক্ষাকৃত বড়, আর দিব্বি ছিমছাম সাজানো। ছোট খাট আছে একটা, কোণের দিকে আলনা আর তার পাশে সস্তা দামের একটা ড্রেসিং টেবিলও। শেফালি ওকে হাত ধরে টেনে এনে খাটের বিছানায় বসিয়ে দিল।

ঘরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগছিল। শেফালি ঘরের সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তারপর ওর সামনে বসে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল, তুমিও কি তোমার দাদার মতো রাগী নাকি?

পরীরাণী হাসতে চেষ্টা করল একটু। অস্বস্তির একশেষ। এমন একটা পরিস্থিতিতে জীবনে পড়েনি বোধহয়। এ-রকম পরিবেশে এই খাট ড্রেসিং-টেবিল ইলেকট্রিক আলো, এমন কি এই বউটিও মানায় না যেন। গুণ্ডা মাখন মজুমদারের ঘরে এ-রকম বউ থাকতে পারে কল্পনাও করেনি। এত কাছ থেকে পরনের শাড়িটা সত্যিই রীতিমত দামী মনে হল। পরীরাণী পরিষ্কার অনুমান করতে পারছে এ-শাড়ি কার উপহার হতে পারে, কল্পনা করতে পারছে কার তাগিদে ওরা আসছে জেনেও সিনেমা দেখতে চলে গেছল, অনুমান করতে পারছে, সবটা পথ না হোক, হাওয়া গাড়িতে খানিকটা অন্তত কে একে এগিয়ে দিয়ে গেছে। অদেখা সুধীর সান্যালের অস্তিত্ব যেন এই ঘরের মধ্যেই অনুভব করতে পারছে। পরীরাণী স্বস্তি বোধ করবে কি করে?

ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের তারায় হাসি চিকচিক করছে যেন শেফালির। এই সহজ সরলতা একটু বাড়তি ঠেকছে পরীরাণীর চোখে। মনে হচ্ছে প্রাণের দায়ে যে জটিল পথে মেয়েটার বিচরণ শুরু তারই অপটু অভিনয় এটা। লেখা-পড়া না জানুক বুদ্ধির দীপ্তি আছে একটু, আর চেহারাও সুশ্রী তাই একেবারে বেখাপ্পা লাগে না।

দুই এক পলক পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে শেফালি শুধাল, সত্যিই অনেকক্ষণ এসেছ নাকি?

অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, না...।

তোমার দাদার মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি, তোমার দাদা বলে তুমি নাকি কালো, কিন্তু এখন দেখছি যেখানে যাবে সেই ঘর আলো হয়ে যাবে। একটা পাশ দিয়ে কলেজে পড়েছ শুনে ভেবেছিলাম কথা বলতেই ভয় করবে, কিন্তু সত্যি ভাই তোমাকে দেখেই ভালো লেগেছে।

পরীরাণী হাসতে চেষ্টা করল একটু। তরল সুরে শেফালি আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি কথা বার্তা কম বল?

পরীরাণী জবাব দিতে পারত, ইচ্ছে করলে কথা বেশিও কইতে পারি, কিন্তু যার মধ্যে এসে পড়েছি ইচ্ছে খুব করছে না। বলা যায় না। আবারও হাসল শুধু।

শেফালি খাট থেকে নামল।—দাঁড়াও, একটু চা খাওয়াই তোমাকে।

—না না না, চা আমি বেশি খাইও না, দাদা কোথায়, সন্ধ্যের মধ্যে ফেরার কথা—

আসলে নিজের রুচি অরুচির খবর পরীরাণী নিজেই ভালো জানত না। কেবল মনে হল এখানে বসে চা গিলতে হলে সেটা শাস্তিবিশেষ হবে। উঠতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু শেফালি কানেও তুলল না। বলল, আমিও তো খাব গো—! ঘরের কোণেই ছোট্ট হিটার একটা, অ্যালুমিনিয়ামের বড় বাটিতে চায়ের জল চড়িয়ে দিল। তারপর ওই দামী শাড়ি নিয়ে সেখানেই মেঝের ওপর বসে পড়ে তার দিকে ফিরল।—তুমি শেলাইয়ের স্কুলে শেলাই শিখছ শুনলাম, ও দিয়ে কি হবে?

পরীরাণী সাদাসিধে জবাব দিল, একেবারে কিছু না করার থেকে ভালো বোধহয়...

শেফালি চেয়ে রইল একটু, তারপর মাথা দুলিয়ে সায় দিল, তা অবিশ্যি, কোন গুণ ফেলা যায় না। চায়ের জল ফুটল কিনা দেখে নিয়ে আবার ওর দিকে ফিরল, তোমাদের বাড়ির কাছে ওই যে একটা শয়তান ছেলের কথা শুনেছিলাম সে নাকি আবার গণ্ডগোল শুরু করেছে, তোমার দাদা বলছিল সে-ই এবার ওকে টিট করবে...তোমাদের নিচের তলায় যে ভদ্রলোক থাকে সে-তো বেশ চৌকস লোক শুনেছি, তাকে বল না কিছু ফাঁদে ফেলে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিক—ও-সব বাজে ছেলের সঙ্গে মারামারি করে কি হবে?

শোনামাত্র ভিতরটা বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল পরীরাণীর। কোনরকম শালীনতা বোধ থাকলে আধঘণ্টার আলাপে অন্যের ব্যাপারে এ-ভাবে কেউ মাথা গলায় না। হতে পারে দাদা মারামারি করুক সেটা পছন্দ নয়, কিন্তু সমস্যা সমাধানের যে উপায়টা বলে দিল সেটা পলকা স্বভাব আর পাকামী ছাড়া আর কিছু ভাবা গেল না। পরীরাণী ঠাণ্ডা জবাব দিল, নিচের তলার ভদ্রলোক এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবেন কেন?

শেফালির চোখে মুখে কৌতুকের ছায়া একটু। ফিরে প্রশ্ন করল, যাবে না?

পরীরাণী জবাব দিল না। দুই এক পলক চোখে চোখ রেখে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। সামনের দেয়ালে মা-কালীর পট একখানা। সংযত স্বভাব না হলে এই মুখ ফেরানো থেকেই ওর ভিতরের উষ্মা বোঝা যেত।

তিনটে পেয়ালায় চা করা হল। খাটের শয্যায় একটা কাগজ বিছিয়ে দুটো পেয়ালা তার ওপর রাখল শেফালি। তারপব তৃতীয় পেয়ালাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের পেয়ালার চা এই ফাঁকে জানালা দিয়ে ঢেলে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল পরীরাণীর। রাগ সব থেকে বেশি হচ্ছে দাদার ওপর।...নিচের তলার লোকের গল্প পর্যন্ত এর কাছে করা হয়েছে, যেন এত আপনার জন আর হয় না।

একটু বাদে শূন্য হাতে আর হাসি-হাসি মুখে শেফালি ফিরল। ওর মুখোমুখি বসে নিজের পেয়ালা তুলে নিল।—তোমাকে বিস্কুট দেব দু'খানা?

পেয়ালা তুলে নিয়ে পরীরাণী মাথা নাড়ল। বিস্কুট দরকার নেই। নিজের চায়ের পেয়ালায় ঘন ঘন গোটা কতক চুমুক দিল শেফালি। এটুকুতেও যেন সুরুচির অভাব মনে হল পরীরাণীর। সেই ফাঁকে শেফালি ওকে লক্ষ্য করছে, আর চোখে যেন কৌতুক চিকচিক করছে একটু।

নিজের পেয়ালা কোনরকমে আধাআধি খালি করে সেটা পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে রাখল পরীরাণী। হালকা সুরে শেফালি বলল, তোমার দাদা বেজায় চটেছে আজ,

চা উঠোনে ঢেলে দিয়েছে, পেয়ালাটা আছড়ে ভাঙেনি তাই রক্ষা।

রাজ্যের বিতৃষ্ণা আবার। মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না পরীরাণীর।

পেয়ালাটা কোলের কাছে দু'হাতের মধ্যে রেখে শেফালি একেবারে সোজাসুজি চেয়ে রইল তার দিকে কয়েক পলক।—আচ্ছা, তোমার দাদাকে তুমি খুব ভালোবাস...তাই না?

জবাবে পরীরাণীও তার ভিতর দেখে নিতে চেষ্টা করল। স্পষ্ট করেই মাথা নাড়ল, ভালবাসে।

—তাহলে তাকে এখানে আসতে দাও কেন, আর তুমি নিজেই বা এলে কেন? তোমার দাদা খুব ভালো লোক, কিন্তু এত ভালো হওয়ার কোন অর্থ হয় না, বুঝলে? পারো তো সেটা তাকে বুঝিয়ে দিও, নইলে নিজেই মুশকিলে পড়বে কোনদিন—

বলেই পেয়ালা হাতে খাট থেকে নামল। ঝুঁকে মাটির দ্বিতীয় পেয়ালাটাও তুলে নিয়ে দ্রুত ঘরের কোণের দিকে চলে গেল।

পরীরাণী বিমূঢ় হঠাৎ।...ওই মুহূর্তেও শেফালির দু'চোখ চিকচিক করতে দেখেছে। কিন্তু সেটা যেন নিছক কৌতুক নয়।

ফেরার পথে দাদার সঙ্গে একটিও কথা হয়নি। দাদা অতিরিক্ত গম্ভীর। ট্রাম থেকে নেমে পাশাপাশি দু'জন নিঃশব্দে হাঁটছে। পরীরাণীর খুব ইচ্ছে করছিল দাদার সঙ্গে দুটো কথা বলে। দাদার জন্যে ওর কত মায়া নিজেই যেন ভালো জানত না। কিন্তু কিছুই বলা গেল না।

রাস্তার ও-ধারে ব্রজ ডাক্তারের ডিসপেনসারি। বাইরের ঘরে জোরালো আলো জ্বলছে। রোগী মাত্র দু'তিনজন বসে। সেদিকে তাকিয়ে পরীরাণী সচকিত একটু। ডাক্তারের অপেক্ষায় যারা বসে আছে তাদের মধ্যে একজন মা হাসিদেবী। বাবাকে দেখলে অবাক হত না, কিন্তু মা নিজে বড় আসে না। তার মাথাধরার ওষুধ-টষুধ বীরুমামুই এনে দিয়ে থাকে।

দাদা ওদিকে তাকায়ই-নি। পরীরাণীও থামল না, যদিও মনে হল একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল, কি হয়েছে।...বাড়িতে পা দিয়ে মায়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু রান্না চাপাতে হবে ভেবে বিরক্তি একটু।

ওকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দাদা আবার কোথায় চলে গেল কে জানে। দাওয়ায় পা দিয়ে পরীরাণী পাশের ঘরের দিকে তাকালো একবার। ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু দরজা বন্ধ। হঠাৎ ভিতরের ইচ্ছেটা ধরা পড়তে পরীরাণী নিজের উদ্দেশেই ভ্রূকুটি করল একপ্রস্থ।...ওই বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে উঁকি দিতে ইচ্ছে করছিল।...সকালে কি দরখাস্ত সই করিয়ে নিয়ে গেল জানেও না।...বিকেলে একবার আসতে বলেছিল। কিন্তু ইচ্ছেটা ঠিক ওই কারণেই নয় সেটা ধরা পড়েছে বলেই ভ্রূকুটি।

কোনরকম শব্দ না করে সোজা দোতলায় উঠে গেল। কিন্তু এই মুহূর্তে যে মূর্তিটি সব থেকে অবাঞ্ছিত সে-ই সামনে দাঁড়িয়ে—বীরুমামু! কালো ঠোঁটে হাসির আভাস, উৎসুক চাউনি।

—বাবা কোথায়?

—ঘরে শুয়ে আছে।

—শরীর খারাপ না তো?

—জানি না তো, কেন?

—মা-কে ডাক্তারবাবুর ডিসপেনসারিতে দেখলাম...

বীরুমামুও অবাক একটু।—কি জানি, আমি বাড়ি ছিলাম না, নিজের জন্যেই কিছু আনতে-টানতে গেছে বোধ হয়।...পরিতোষ বাবুর প্রেয়সী দর্শন হল?

এই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই বাবার শরীরের কথা তুলেছিল পরীরাণী। বীরুমামুর প্রশ্ন আর হাসি দুই-ই বিরুক্তকর। জবাব না দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

—আ-হা, শোন না, তোর হাবভাবও দেখি তোর দাদার মতোই হয়ে উঠছে। ...শেফালি দেবীর সঙ্গে দেখা হল?

ঘুরে দাঁড়িয়ে পরীরাণী জবাব দিল, হল।

—খুব আদর যত্ন করল তোদের?

—করল।

—কেমন দেখলি?

—খুব ভালো।

—বেশ, বেশ।...কিন্তু ভালোটা কোনদিকে গড়াবে শেষ পর্যন্ত?

—সে ভাবনা দাদা ভাবুক, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো।

—ও...। হঠাৎ বিবস মুখ আর নীরস গলা বীরুমামুর।—কিন্তু নিজের ভাবনা ভাবার মতো কাণ্ডজ্ঞান তোর দাদার আছে? হঠাৎ বেশ কাছে এগিয়ে এলো বীরুমামু! গলা চেপে রাগত সুরে বলল, আমি বারণ করি তাই আজকাল আমাকে পছন্দ নয় ওর, তোরা আসকারা দিলে তার ফল ভালো হবে না, বুঝলি? আমাকে বাজে লোক ভাবিস তাই কেউ তোরা আমার কথা শুনতে চাস না—

ফিরে হনহন করে ঘরে চলে গেল। কথাবার্তার এই সুরটা নতুন ঠেকল পরীরাণীর কানে।

...রাতে ভালো ঘুম হল না। কি একটা অস্বস্তিতে অনেক রাত পর্যন্ত এ-পাশ ও-পাশ করে কাটল। শেফালির মুখখানা থেকে থেকে চোখে ভাসছে। না, কেন যেন ওকে নিছক মন্দ বা দাদার ওপর অকরুণ ভাবতে পারছে না।

...তবু ওকে ঘিরে বুকের তলায় যে সম্ভাবনার ছায়া পড়ছে, আর যাই হোক সেটাকে শুভ ভাবতে পারছে না পরীরাণী।

✦

...বুকের তলায় অনাগত কিছুর ছায়া আজ আবার দুলছে!

বিকেলের দিকে মায়ের ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে মাটিতে বসে মা বেশ যত্ন করে চুল বেঁধে দিচ্ছে ওর। যত্ন করে বাঁধছে বটে কিন্তু আয়নায় মায়ের বিমনা মুখ দেখছে পরীরাণী। থেকে-থেকে মায়ের দু'চোখ ওর শরীরটার ওপর বিচরণ করছে যেন।

সন্ধ্যায় মা আজ ওকে একজনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে নিয়ে যাবে। বিকেলের আগেই বলে রেখেছে। উদ্দেশ্য পরীরাণীর জন্য ভালো একটা চাকরি যোগাড় করা, সংসার প্রায় অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে নাকি, দাদার আশা করা বৃথা, অতএব পরীরাণীও যদি

নড়েচড়ে না বসতে চায় তো চলে কি করে? যে-ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, তার নাম অসীম ঘোষ, মস্ত কন্ট্রাকটর, সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছে, এখন কাঁচা টাকাই হয়তো আছে লাখ-দশেক। মায়ের দীর্ঘকালের পরিচিত ভালো মানুষ। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে মা তাকে ওর একটা চাকরির জন্য বলেছে। সব শুনে ভদ্রলোক নাকি অনুযোগ করেছে অনেক আগেই তাকে বলা উচিত ছিল। আজ সন্ধ্যায় ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেছে। মায়ের ধারণা, অসীম ঘোষ ইচ্ছে করলে পরীরাণীকে যে-কোন ভালো চাকরিতেই ঢুকিয়ে দিতে পারে, তার সুপারিশ থাকলে ডিগ্রীর ছাপের জন্য আটকায় না। সরকারী বে-সরকারী অফিসের অনেক হোমরা-চোমরা মানুষেরা অসীম ঘোষের তাঁবেদারি করে থাকে।

সংসারে অনটন সত্যিই যেন হাঁ করে গিলতে আসছে মনে হয় আজকাল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছেই, বাড়ছেই। যত বাড়ছে, ভাগ্য যেন তত দাঁত বার করে ভেঙচি কাটছে ওদের। মায়ের মুখে অসীম ঘোষের সহৃদয়তা লাভের সম্ভাবনায় পরীরাণী উৎসাহিত বোধ করেছিল অনেক কারণে।...শেলাই শিখে কবে দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে তার নিশ্চয়তা কিছু নেই। সেখানকার শিক্ষার পাট শেষ হয়ে এলো, কিন্তু কাজ কবে জুটবে, আদৌ জুটবে কি না তার নিশ্চয়তা কিছু নেই। সেখানেও দরিদ্র মেয়ে-বউয়ের ভিড় বাড়ছেই। আজ কাজ পেলেও গোড়ায় অন্তত যে-টাকা হাতে আসবে তাতে এ সংসারের অনটনের ফাঁকগুলো তেমনি হাঁ করেই থাকবে।

দ্বিতীয় কারণ, মায়ের বহু প্রশংসার ওই অসীম ঘোষকে বাবাও চেনে। সে-কথা মা-ই ওকে বলেছে। এককালে ভদ্রলোক নাকি বাবার আপিসেই চাকরি করত, কিন্তু সত্যিকারের পুরুষকারসম্পন্ন মানুষ ওই ছেঁদো চাকরির মধ্যে বরাবর আটকে থাকবে কেন। নিজের মাথা আর চেষ্টার জোরে তার এই অবস্থা। মায়ের সব কথা পরীরাণী সবসময়ে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। তাই ভদ্রলোকের সম্পর্কে বাবাকেই জিজ্ঞাসা করেছিল।

ভুরু কুঁচকে বাবা মনে করতে চেষ্টা করেছে। তারপর মনে পড়েছে। পুরনো স্মৃতির আলোয় বাবার মুখখানা উজ্জ্বল দেখেছে।—অসীম ঘোষ! তাকে কখনো ভুলতে পারি! যেমন খোড় বুদ্ধি, তেমনি ভদ্র। নিজের কপাল নিজে তৈরি করেছে। কেন, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি তোর?

—আলাপ হয়নি, হতে পারে। একটা চাকরির জন্য মা আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে চাইছে—যাব?

মা নিয়ে যেতে চাইছে শুনে বাবা যেন মুহূর্তের জন্য থমকেছিল। কারণ ভালো-মন্দ যে-কোন ব্যাপারে মায়ের যোগ আছে শুনলেই বাবা ওই রকম সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সায়ই দিয়েছিল। বলেছিল, লোকটা অন্য ধাতের মানুষ, না-ও বদলে থাকতে পারে। যেতে পারিস, সে ইচ্ছে করলে ভালো মাইনের কাজই দিতে পারে বোধ হয়। দেখা হলে আমার কথাও বলিস।

...এসব ছাড়াও তৃতীয় কারণ একটা আছে। নিচের তলার ওই ছেলেও খুব সম্ভব ওর জন্য একটা চাকরির চেষ্টায় আছে। সেদিনের দরখাস্ত সইয়ের আর কোন কারণ থাকতে পারে না। এর মধ্যে নিজের চেষ্টায় যদি হুট করে একটা ভালো চাকরি পেয়ে

যায় তো হাঁ হয়ে যাবে। ওর কদর কিছু বাড়বেই তাতে। নিজে স্কুল মাস্টারি করে কত আর পায়, বি, এ, পাস না-করা মেয়ের জন্য সে আর কত মাইনের চাকরি জোটাবে! বি, এ-টা পাস না করার জন্য ফাঁক পেলেই খোঁটা দেয়। এর মধ্যে যদি একটা ভালো মাইনের চাকরি পেয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে তাহলে মজাটা মন্দ হয় না।...এই সব মিলিয়েই তারও অসীম ঘোষের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ।

চুল-বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, আয়নার ভিতর দিয়ে মা ওর দিকেই চেয়ে আছে। পরীরাণীও যে চেয়ে আছে সেটা যেন হঠাৎ খেয়াল হল।

—কি দেখছিস?

—তোমাকে। তুমি কি দেখছ?

আয়নার ভিতর দিয়েই মাকে থতমত খেতে দেখল পরীরাণী।

—চুল বাঁধা কেমন হল দেখছি, তুই আমাকে দেখছিস মানে?

মাথায় হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধি চাপল পরীরাণীর। ভালো মুখ করেই জবাব দিল, দেখছিলাম...তুমি এ-বয়সেও কত সুন্দর দেখতে।

হেসে ফেলে মা ওর মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল।—খুব ফাজিল হয়েছিস।

চুল বাঁধা হতে হাত ভালো করে মুছে মা নিজের বাক্স থেকে একটা পছন্দ-মতো শাড়ি ব্লাউস বার করে ওর হাতে দিল।—নে, বেশ করে গা-হাত-মুখ ধুয়ে এটা পর।

মায়ের জামা পরীরাণীর আজকাল একটু টাইট হয়। কিন্তু এ-শাড়ির সঙ্গে নিজের কোন ব্লাউস মানাবে না বলে ও দুটো নিয়ে পরীরাণী ঘর থেকে চলে গেল। ঘরের বাইরে পা দেওয়ামাত্র মনের তলায় আবার সেই ছায়াটা দুলছে। মনে হচ্ছে কোথাও না যেতে হলেই ভালো হত। কিন্তু না গিয়েই বা পারে কি করে, আপাতত খুব কম মাইনেতেও মোটামুটি পছন্দমতো একটা চাকরি পেলে বেঁচে যায়।

সন্ধ্যার পর ট্রাম থেকে নেমে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা-পথ পেরিয়ে মায়ের সঙ্গে জড়সড় অবস্থায় যেখানে এসে উপস্থিত সেটা অভিজাত মেয়ে-পুরুষদের একটা ক্লাব বলে মনে হল। আসার সময় সহজ সপ্রতিভ হাসিমুখে থাকার জন্য মা ওকে অনেকবার তালিম দিয়েছে। কিন্তু জড়সড় অবস্থাটা পরীরাণী কিছুতে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। এখানে এসে অবস্থা যেন আরো কাহিল ওর। মহিলা আরো আছে পাঁচ-সাতজন, কিন্তু ঠিক ওর বয়সী মেয়ে একটিও নেই।

বিশাল হলঘরটা টিউব আলোয় দিনের মতো সাদাটে দেখাচ্ছে। বিলিয়ার্ড খেলা হচ্ছে, পিংপং খেলা হচ্ছে, অন্যদিকে দাবা আর তাসের আসর বসেছে। সামনের দিকে এক অল্পবয়সী মহিলা বসে টুংটাং করে পিয়ানো বাজাচ্ছে, আর ঝুঁকে-পড়া দুটো লোকের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছে।

ওকে এক জায়গায় বসিয়ে মা হাসি-খুশি মুখে এক-একবার এক-এক দিকের ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। পরীরাণীর কেমন মনে হল, সকলেই মা-কে চেনে বটে, কিন্তু মায়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ যেন কারো নেই। বরং একটা নতুন মেয়ে অর্থাৎ ওকে দেখে কাছ থেকে বা দূর থেকে অনেকেই যেন ঘুরেফিরে দেখছে।

পরীরাণীর অস্বস্তির একশেষ।

ওকে দেখিয়ে মাকে অন্তরঙ্গ মুখে দুই-একজন কিছু জিজ্ঞাসাও করছে চোখে পড়ল। মা কি বলল জানে না, তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার মায়ের কোন আগ্রহ দেখা গেল না বলেই বাঁচোয়া যেন।

হলঘরের লাগোয়া সারি সারি কতকগুলো ছোট ঘর। ও-দিকটায় বেয়ারা-খানসামাদেরও ঘুর-ঘুর করতে দেখল পরীরাণী। উঠে সবকিছু দেখার কৌতূহল, কিন্তু পা-দুটো যেন অসাড় হয়ে আছে সেই থেকে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজনের পদার্পণে ঘরের হাওয়া যেন বদলালো একটু। অনেকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো তাকে, একজন মহিলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মা প্রায় ছুটে আগে তার কাছে উপস্থিত। তার দু' হাত ধরে গোটা-দুয়েক অন্তরঙ্গ ঝাঁকুনি দিয়ে গড়গড় করে কিছু বলে গেল। তারপর আঙুলের ইশারায় অদূরের সোফায় বসা পরীরাণীকে দেখিয়ে দিল।

ভদ্রলোক এদিকে তাকাবার আগেই পরীরাণী মুখ ফিরিয়ে নিল। বুকের ভিতরে দুরু-দুরু হঠাৎ। এ-ই অসীম ঘোষ জানা কথা।

হাসিমুখে অনেকের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হল-এর এ-মাথার একটা ঘরে ঢুকে গেল ভদ্রলোক। মা তার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলো। দূর থেকেই পরীরাণীর দিকে তাকিয়ে চোখের অর্থপূর্ণ ইশারা করল একটা, অর্থাৎ এরই কাছে আসা।

মিনিট পনের কাটল প্রায়, ঘুরে ঘুরে মা এর-ওর সঙ্গে কথা কইছে বটে, কিন্তু অসীম ঘোষ যে-ঘরে ঢুকেছে সেদিকে যেন খর দৃষ্টি রেখেছে।

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে অসীম ঘোষ যখন ঘর থেকে বেরুলো পরীরাণী অবাকই একটু। পরনে দামী স্যুট-প্যান্টের বদলে ধপধপে সাদা ঢোলা পা-জামা আর পাঞ্জাবি--এরই মধ্যে চানও সেরে নিয়েছে মনে হল।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরুতে মা আস্তে আস্তে পরীরাণীর কাছে এসে পাশের সোফায় বসল। গলা খাটো করে বলল, উনি এলে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করবি, তারপর বসবি। কিছুই তো জানিস না...মুখ অমন আমসি করে বসে আছিস কেন, তোর ভয়ের কি আছে।

মিথ্যে বলেনি, পরীরাণী এখন সহজ মুখ করে মায়েব সঙ্গেও দুটো কথা বলতে পারবে কিনা সন্দেহ।...কিন্তু মায়ের চোখ আর ওর দিকে নেই, ভদ্রলোক যে-দিকে যাচ্ছে যার সঙ্গে কথা বলছে সেই দিকে তারও দুই চোখ ঘোরাফেরা করছে।

আরো মিনিট দশেক বাদে ভদ্রলোকের যেন খেয়াল হল কিছু। ঘুরে এ-দিকে তাকালো। তারপর পাশের দু'জন পুরুষ আর তিনটি মহিলাকে কি বলে হাসি মুখে লম্বা লম্বা পা ফেলে এ-দিকে এগলো।

মা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। অগত্যা আস্তে আস্তে পরীরাণীও। অসীম ঘোষ কাছে এসে হাসি মুখে আগে ওকেই একনজর দেখে নিল। নমস্কারের জবাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বোসো বোসো—

মায়ের দিকে ফিরল, এই মেয়ে? মা বিগলিত হবার আগেই মন্তব্য করল, বেশ মিষ্টি মেয়ে তো! ধুপ করে মুখোমুখি সোফায় বসে পড়ে আবার ওর দিকেই ফিরল —কি নাম?

...পরীরাণী দত্ত।

—বাঃ, খাসা নাম দেখি!...এর মধ্যেই চাকরির খোঁজ কেন, বি-এটা পাস করে নিলে ভালো হত না?

ঈষৎ অনুযোগের সুরে মা জবাব দিলেন, আপনাকে তো বলেছি সব।

—তা বটে, হাসিমুখেই অনুযোগটা স্বীকার করে নিল।—বলছিলাম, আমি যদি পড়াশুনার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারি?

মিষ্টি করেই মা সেই সম্ভাবনাও বাতিল করে দিতে চাইল।—অনেকদিন ছেড়েছুড়ে বসে আছে, ও আর হবে-টবে না, আমি তো চিনি ওকে! এবারে মেয়ের দিকেই সহাস্য কটাক্ষ একটা।

—বুঝলাম। পরীরাণীর দিকে আর একটু ভালো করে ঘুরে বসল অসীম ঘোষ। —চাকরিই চাই তাহলে? হাঁটুতে বারকয়েক আঙুল ঠুকে ভেবে নিল একটু।—পরশু, না পরশু হবে না, শনিবার এই সময়ে আমার বাড়িতে এসো একবার, ওই সামনেই বাড়ি, তোমার মা দেখিয়ে দেবেন'খন—ষ্টীলের আয়েঙ্গারের আসার কথা আছে, সে একজন স্মার্ট রিসেপসনিস্ট-এর কথা বলছিল, তাছাড়া আর কি সুযোগ হতে পারে আমি একটু ভেবে দেখি, কেমন? উঠে দাঁড়াল, তাহলে শনিবার কথা হবে—সে বিটুইন সেভেন অ্যাণ্ড সেভেন থার্টি, ও, কে?

মা-ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন মাথা নেড়েছে। কিন্তু পরীরাণীর নড়তে চড়তেও যেন বে-খাপ্পা রকমের সময় লাগছে।

হালকা শিস দিতে দিতে ভদ্রলোক চলে গেল। মা চাপা বিরক্তিতে বলে উঠল, কি-যে মেয়ে তুই, এই রকম জবুথবু হয়ে থাকলে কিছু হবে?

বাইরের বাতাস গায়ে লাগতে হাঁপ ফেলে বাঁচল পরীরাণী। অথচ ভদ্রলোকটিকে অর্থাৎ অসীম ঘোষকে সত্যিই ভালো লেগেছে। বছর বিয়াল্লিশ হবে বয়েস, কালোর ওপর মুখখানা কমনীয়, অল্প অল্প হাসিটুকুও খুশি করে দেয়। ওই বয়সে মাথার চুলের চারভাগের একভাগ অন্তত সাদা, কিন্তু ভদ্রলোককে তাইতে যেন আরো ভালো মানিয়েছে। সব থেকে জীবন্ত যেন তাঁর হাসির ছোয়া-লাগা চোখ দুটো। একেবারে স্বচ্ছ অথচ ধার নেই, উল্টে গভীরে যেন একটু দরদ লুকিয়ে আছে। এই লোককে সামনাসামনি দেখার আগে বা তার কথাবার্তা শোনার আগে একটু অস্বস্তিকর অনুভূতি ছেঁকে ধরেছিল পরীরাণীকে। সেটা আর নেই। এমন কি চাকরির আশায় শনিবার সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করার দ্বিধাও নেই আর একটুও। যেটুকু সংকোচ বা দ্বিধা সেটা ভদ্রলোকের সহজ অথচ চোখে পড়ার মতো ব্যক্তিত্বের দরুন।

সমস্ত পথ মা-ও অসীম ঘোষের অজস্র প্রশংসা করতে করতে এলো। ক্লাবের ওই একজনই ভদ্রলোক, আর সব বাঁদরবিশেষ। খুব ছোট থেকে বড় হয়েছে তাই লোকের জন্য মায়া মমতা আছে। বাবা যা বলেছিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই সব কথাই বলে চলল মা।...ভদ্রলোকের তুখোড় বুদ্ধি।...বাবার আপিসে মায়ের মতই সামান্য চাকরি করত, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি এই লোকের মগজে ধার কত। আপিসের সমস্ত আট-ঘাট বুঝে নিয়ে চাকরি ছেড়ে ওই আপিসেই মাল সাপ্লাইয়ের কণ্ট্রাক্টরি নিয়েছে। সকলেই চেনা-জানা, সুবিধেও হয়েছে। তারপরে বড় বড় কাজ ধরে ফেঁপে উঠেছে। আর ওর

বাবার মতো যারা কলম পিষত তারা হাঁ করে দেখেছে শুধু ইত্যাদি। এই সঙ্গে পরীরাণীকেও অনেক উপদেশ দিয়েছে। এমন একটা যোগাযোগ ঘটেছে যখন, ওর ভাগ্য বলতে গেলে তৈরি, এখন সব কিছু ওর চেষ্টা আর বুদ্ধি আর তৎপরতার ওপর নির্ভর করছে। অসীম ঘোষ কাউকে উঁচুতে তুলবে মনে করলে অনেক উঁচুতে তুলতে পারে—সেটা যাতে সে করে মেয়ের সেটুকু জ্ঞানবুদ্ধি রেখে চলা দরকার।

উপদেশের মধ্যে জটিলতা কিছু নেই, তবু মায়ের কথাগুলো কেন যেন ভালো লাগছিল না পরীরাণীর। উল্টে একটা প্রশ্ন ওর মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।...সংসারের অনটনের দরুন ওকে চাকরির চেষ্টায় টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু বাবার অসময়ের নামমাত্র পেনসন আর বাড়ি ভাড়ার ওই বাঁধা আয়ে সংসার এ-ভাবেই বা চলছে কি করে এতদিন ধরে?

প্রশ্নটা ভিতর থেকেই তাড়াতাড়ি বাতিল করে দিতে চেষ্টা করল পরীরাণী।

শনিবার দিনটা যেন প্রতীক্ষারও, আবার ভয়েরও। ভয় বেশির ভাগ নিজের কথা ভেবে। মা যে এই দিনে আবার ওকে আরো ভালো করে সাজিয়ে গুজিয়ে একটা আকাট মুখ্যুকে যোগ্যতার দরবারে চৌকস বলে চালাতে চাইছে, তাতে পরীরাণীর নিজেরও সন্দেহ নেই।

সেদিনও মায়ের অনেক উপদেশ শুনতে হয়েছে মুখ বুজে। আর তাইতেই ওর ভয় বেড়েছে বই কমেনি।...বাবা বলেছিল, লোকটা অন্যধাতের মানুষ, না-ও বদলে থাকতে পারে।...বাবার ওই কথাগুলো মনে করেই বল সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছে পরীরাণী। মায়ের চেনা-জানা ওই ক্লাবটাকে একটুও ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু মা-ই তো বলেছে, ভদ্রলোক ওই একজন আর সব বাঁদরবিশেষ।

কিন্তু ওকে অভয় দেবার জন্য মা কত সময় ফিসফিস করে কত কি যে বলে চলেছে পরীরাণী ঠিক বুঝে উঠছে না। বলেছে, ঘাবড়াবি না, ঘাবড়ালে অসীম ঘোষের মতো পুরুষের মায়া-দয়া হয় না। বেশি কথা বলতে না পারিস সে যা বলবে তাইতেই হাসিমুখে সায় দিবি। আর কিছু জিজ্ঞেস করলে সোজা মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিবি। বলেছে, আজকালকার মেয়ে তুই, অত ভয়ডরের কি আছে! যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বেশ সপ্রতিভ মুখে তার সঙ্গে কথা বলবি। আর চেষ্টা করবি, তার নিজের কিছু কাজেই যেন তোকে লাগিয়ে দেয়, ফাঁক পেলে মুখের ওপর ঝপ করে তোর ইচ্ছেটা জানিয়ে দিবি।...কত মেয়ে কত রকমের বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে কোথায় উঠে গেল আজ তাদের ধরা ছোঁয়া পায় কে?

পরীরাণীর কেমন মনে হয়েছে, মা যেন ওকে আরো কিছু বলতে বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে মা বলল, ওই বাড়ি, যা—। ওপরে বসার ঘর, সোজা দোতলায় চলে যা, ভিতরের ঘরে থাকলে বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠাবি—ওপরে উঠলেই দুটো বেয়ারা বসে আছে দেখবি।

পরীরাণী আঁতকেই উঠল প্রায়, তুমি আসবে না?

মা-ও অবাক তেমনি, আমি যাব কি রে...কোনো আদব-কায়দা যদি জানতিস, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল তোর সঙ্গে আর আমি তোকে আগলে নিয়ে উপস্থিত হব? তোর ভয়টা কি? আর সমস্ত দিন ধরে তোকে বোঝালামই বা কি?...যা জিগেস করবে ফড়ফড় করে বলে দিবি, ভালো জবাব যদি কিছু মাথায় না আসে তো হেসে বলবি আমি কিছু জানি না, কিন্তু চাকরি চাই। যা চলে যা, কিছু ভয় নেই—

আবার বাধা পড়ার ভয়েই যেন মা দ্রুত ফুটপাথ থেকে নেমে হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

এবারে সত্যিকারের অসহায় বোধ করছে পরীরাণী। ভদ্রলোকের হাসি মুখখানা মনে পড়তে জোর করে সাহস টেনে আনতে চেষ্টা করল, শেষে মরিয়া হয়েই বাড়িটার দিকে এগলো।

ভিতরে পা দিতেই সামনে সিঁড়ি। ডাইনে বাঁয়ের বন্ধ ঘর দুটো চাকর-বাকরদের হবে। কান পাতল। কোন সাড়াশব্দ নেই। নিঝুম পুরী যেন।

দোতলায় উঠতে লাগল। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে। সামনে বারান্দা। বারান্দার ওধারে মস্ত ড্রইং-রুম, সামনে একজন বেয়ারাও বসে। দরজা খোলা ড্রইং-রুমে কেউ নেই বোঝা গেল।

বেয়ারা শশব্যস্তে উঠে এলো। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না পরীরাণীর। কোনরকমে জানান দিল, ওর আসার কথা ছিল, অমুকের মেয়ে, একটা খবর দিতে হবে।

বেয়ারা সবিনয়ে জানালো, খবর দেবার দরকার নেই, সাহেব তাকে বলেই রেখেছে। ব্যস্ত আহ্বান জানালো, এদিকে আসুন—

পরীরাণী বিমূঢ় আবার, ড্রইং-রুমে নয়, বেয়ারা ওকে সামনের দিকে নিয়ে চলেছে। যন্ত্রচালিতের মতোই অনুসরণ করল।

একটা বড় ঘরের সামনের পুরু পরদা টেনে ধরে থেকে বেয়ারা বলল, ভিতরে যান।

পরীরাণী থমকালো দুই এক মুহূর্ত, তারপর ঘরে পা দিতেই যেন বড়-সড় ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। অসীম ঘোষের শয়ন ঘর এটা। দামী পালঙ্কে ভদ্রলোক অর্ধ-শয়ান। পাশের ছোট টেবিলে মদের বোতল, সোডার বোতল আর গেলাস। গেলাসের তরল পদার্থ আধাআধি উদরস্থ হয়েছে। তার সামনের সোফায় বসে গাম্ভীর্যে মোড়া একটি মহিলা। মায়ের কাছাকাছি বয়েস হবে, কিন্তু এ বয়সেও সুশ্রী দেখতে। পলকের মধ্যেই পরীরাণী দেখে নিয়েছে তার সিঁথিতে বা কপালে সিঁদুরের চিহ্ন নেই, কিন্তু বেশ-ভূষায় পারিপাটা আছে।

পালাবারও পথ নেই, ভদ্রলোক দেখে ফেলেছে ওকে। সোজা হয়ে বসে হাসিমুখে দরাজ আহ্বান জানালো, এসো পরীরাণী এসো, দেখ তোমার নামটাও মনে আছে আমার।

কি যে করবে ভেবে না পেয়ে পরীরাণী এগিয়েই এলো। এই পরিবেশে ঘরে তৃতীয় একজন থাকতে বাঁচোয়া। কিন্তু সেই একজন কঠিন গাম্ভীর্যে নিরীক্ষণ করছে ওকে।

গেলাস তুলে দু-চুমুক খেয়ে নিয়ে অসীম ঘোষ মহিলার উদ্দেশ্যে বলল, ওই কথাই থাকল, বিল-টিল সব আমার কাছে পাঠালে আমি পেমেন্টের ব্যবস্থা করে দেব।

থমথমে চোখে মহিলা তার দিকে তাকালো। মৃদু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলল, এই কথা বলার জন্য তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

আবারও চেয়ে রইল কয়েক পলক।—চলি তাহলে?

—হ্যাঁ।

সোফা ছেড়ে উঠতে মহিলা আড়চোখে পরীরাণীর দিকে তাকালো একবার। এরও মুখখানা যেন অসীম ঘোষের মতোই সুশ্রী আর কমনীয়, কিন্তু এর মুখে হাসির ছিটে ফোঁটা নেই। মহিলা দরজার আড়াল হতে না হতে পরীরাণী একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হল। অথৈ জলে পড়েছে যেন। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তাড়াতাড়ি বলল, আমিও আজ যাই...

অসীম ঘোষ সকৌতুকে তাকালো ওর দিকে। কিন্তু গলার স্বর গম্ভীর।—বোসো। গেলাসটা তুলে নিঃশেষ করে টেবিলে রাখল।—তোমার মা কোথায়?

...ক্লাবে বোধহয়।

হাসছে মিটিমিটি।—চাকরির তদবিরে তুমি কার কাছে মানে কি-রকম লোকের কাছে আসছ, তোমার মা বলেনি কিছু?

প্রাণান্ত দশা যেন পরীরাণীর। অস্ফুট জবাব দিল, বাবা আর মা দুজনেই আপনার খুব প্রশংসা করেছিলেন...

একটু শব্দ করেই হাসল। হাসিটা এখনো মিষ্টি, চাউনি এখনো কমনীয়। ওর দুরবস্থাটাই যেন ভালো করে দেখে নিল আগে। বলল, তোমার মা তোমারও অনেক প্রশংসা করেছেন আমার কাছে। মুখে নয়, দুই চোখে যেন একটা হাসির আভাস জ্বলজ্বল করছে। ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, তোমাকে কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল শুনলাম, সেটা সত্যি না মিথ্যে?

উঠে ছুটে পালাতে পারলে পালাতো পরীরাণী। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবশ, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই যেন।

বোতলের জিনিস আবার গেলাসে ঢালতে গিয়েও কি ভেবে ঢালল না, ঠেলে সরিয়ে রেখে দিল।—তোমাকে চা কফি, কোল্ড ড্রিংক কি দেবে?

পরীরাণী মাথা নাড়ল। কিছু না। অসীম ঘোষের হাসি মাখা দু'চোখ ওর মুখের ওপর চক্কর খেল একপ্রস্থ।—তোমার বাবাকে অনেক কাল দেখি না, কেমন আছেন?

—ভা-ভালো।

—ব্রজধর এখনো তাঁর চিকিৎসা চালাচ্ছে?

পরীরাণী সামান্য মাথা নাড়ল।

—আর তোমার মা-কেও বেশ পছন্দমাফিক ঘুমের ওষুধ জুগিয়ে চলেছে?

পরীরাণী হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল। চকিতে সেই রাতের দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। ও আর দাদা গেছল শেফালির সঙ্গে দেখা করতে, বীরুমামুও বাড়ি ছিল না—মা তখন ব্রজডাক্তারের ডিসপেনসারিতে বসে।

অসীম ঘোষ যেন মজার খোরাক পেয়েছে কিছু, হাসছে মৃদু মৃদু। তুমি তো কিছুই জানো না দেখছি, তোমার এই মায়ের আমি কোলিগ ছিলাম একসময় জানো তো? তোমার বাবার আণ্ডারে কাজ করেছি। তোমার মা হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে চাকরিতে ঢুকেছিলেন, আর তখনকার অবস্থায় ভেবেছিলেন তোমার বাবাকে বশ করতে পারলেই

সেটা ডোবাপুকুর থেকে একেবারে নদীতে ভাসার মতো হবে।...বেচারী হাসি দেবী, তোমার বাবা ভালো মতো বশ হতে বুঝলেন আসলে তিনি সমুদ্রে ভাসতে চেয়েছিলেন, তাঁর ম'না চৌকস মেয়েরা সেই ভাগ্য নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তোমার বাবা নদীও নয়, টান-ধরা শুকনো ডোবা একটা। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, তোমার নিজের মায়ের জায়গা খালি করে সাত-তাড়াতাড়ি সেখানে বসে পড়েছে...জীবনটা এভাবে ব্যর্থ হবার ফলে তার সব রাগ তোমার বাবার ওপরেই গিয়ে পড়েছিল।...অবশ্য সেই হতাশার সময় থেকে পছন্দমতো ঘুমের ওষুধ জুগিয়ে ব্রজধর তাকে অনেকটা সাহায্য করতে পেরেছে।

নিজের অগোচরে পরীরাণীর ডাগর চোখ দুটো তার মুখের ওপরে আটকে আছে। ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি করে এইসব কথা কেন বলছে ও বুঝতে পারছে না। অথচ সঙ্কোচ না হোক, কেন যেন ভয় কমে আসছে। তার হাসিমাখা দৃষ্টিটা ওর সর্বাঙ্গে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে দেখেও।

একটু থেমে অসীম ঘোষ আবার বলল, আর এই যে একটু আগে মহিলাটি উঠে গেল দেখলে, সে অবশ্য তোমার মায়ের মতো ভুল করেনি, নিজের চেষ্টায় দস্তুরমতো উঁচু মহলে তার কদর হয়েছে, আর তখন শুধু নিজের কেন, আমারও কত উপকার করেছে ঠিক নেই, কণ্ট্রাক্টারির গোড়ার দিকে ও না থাকলে আমাকে এতটা উঠতে হত না।...এ বেচারীরও কম মুশকিল চলছে না এখন—এখনো বড় চাকরিই করে, কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় তিন গুণ, ধার-দেনায় তলিয়ে আছে।...বয়েস হয়ে গেছে এখন আর ওর বাড়তি খরচগুলো কে টানে বলো, আমি টেলিফোনে ডাকতে খুব আশা নিয়ে এসেছিল, ভেবেছিল, ডেকেছি যখন মোটা টাকাই কিছু হাতে তুলে দেব। মেয়েটি কে জানো?

হঠাৎ অনুচ্চ কঠিন এই প্রশ্নটা শুনে পরীরাণী হকচকিয়ে গেল কেমন। মাথা নেড়েছে কিনা জানে না।

—আমার বোন। নিজের ছোট বোন। আমরাও খুব গরীব ছিলাম এক সময়। লেখা-পড়া শিখে চৌকস মেয়ের মতোই ও সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে এগিয়েছে, আমাকেও সাহায্য করেছে।...হঠাৎ কি খেয়াল হল, তোমাকে দেখাব বলেই ওকে ডাকলাম আজ।

ঝুঁকে বোতল আর গেলাস, দু'হাতে টেনে নিল অসীম ঘোষ। বোতলের পদার্থ অনেকখানি গেলাসে ঢেলে ঢক-ঢক করে জঠরে চালান দিয়ে সমস্ত মুখ বিকৃত করল একবার। তারপর আগের মতোই আত্মস্থ হাসি-হাসি মুখ। বলল, বড় হবে আশা নিয়ে এসেছে, এ-সব সামান্য জিনিস দেখে ঘাবড়ালে চলে! এ-তো অতি ভদ্র জিনিস...

সুরা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য। পরীরাণীর কেমন মনে হল, ভদ্রলোক ওকে দেখাবার জন্য যেমন বোনকে ডেকেছে, তেমনি ওকে দেখাবার জন্যেই এ-সময়ে মদ খাচ্ছে।

এতক্ষণের প্রসঙ্গ বাতিল করে কাজের মানুষ সোজা যেন কাজের কথায় এসে গেল।—যাক, চাকরি চাইলে চাকরি পাবে, আর তোমার মায়ের ধারণাও ঠিক, কালে-দিনে বড় হতেও পারবে।...কিন্তু সেদিন ক্লাবে তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছে তোমার মায়ের থেকে তোমার চিন্তার কিছু তফাৎ হতে পারে। আমি যাদের কাছে তোমার চাকরির সুপারিশ করব, চাকরি দেবার জন্যে তারা হাত বাড়িয়েই আছে। চাকরি চাও?

গম্ভীর চাউনি। গলার স্বর ঈষৎ ঝাঁঝালো আবার। পরীরাণীর মনে হল, একটা চাপা

আক্রোশের তলায় কি এক বেদনাও থিতিয়ে আছে। ওর ভয় গেছে, সংকোচ গেছে, উল্টে শ্রদ্ধার পাত্র মনে হয়েছে মানুষটাকে।

স্পষ্ট করেই মাথা নাড়ল পরীরাণী। চাকরি চায় না।

রাস্তাটা পার হয়েই দেখে আবছা অন্ধকারে মা দাঁড়িয়ে। মন্থর পায়ে পরীরাণী সামনে আসতে রুদ্ধশ্বাসে মা জিজ্ঞাসা করল, এরই মধ্যে কথা-বার্তা হয়ে গেল? ব্যবস্থা হল কিছু? আয়েঙ্গার এসেছিল?

অন্ধকার ফুঁড়ে মায়ের মুখখানা একপ্রস্থ ভালো করে দেখে নিল পরীরাণী। মায়ের প্রথম প্রশ্নের জবাবে একটা পাল্টা প্রশ্ন ঠোঁটের ডগায় এসে গেছল। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কথা-বার্তা শেষ হতে কতক্ষণ সময় লাগবে তুমি ভেবেছিলে? বলল না। মাথার মধ্যে কি-রকম যেন হচ্ছে। তবু ঠাণ্ডা সংযত মুখ। না থেমে ট্রাম-স্টপের দিকে এগলো। পাশে মায়ের উদ্‌গ্রীব মুখ। ধীরে সুস্থে জবাব দিল, আয়েঙ্গার আসেনি।...চাকরির ব্যবস্থা উনি নিজেই অনায়াসে করে দিতে পারেন বললেন...মদ খাচ্ছিলেন, তাই মেজাজও ভালো ছিল।

ওর এই বলার ধরনটাই মায়ের শংকার কারণ হয়তো। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কবল, তোব সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি তো?

—না, খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। চাপা রাগের ফলে পরীরাণীর ভিতরে কেমন একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। ওর বিশ্বাস, বসন্ত সরখেল ওকে ধরে নিয়ে গেছল বলেই মায়ের ধারণা ওকে এবার এই বড় হওয়ার রাস্তায় ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। নইলে ধরে নিয়ে যাবার কথাটা অসীম ঘোষকে বলবে কেন? ট্রাম-স্টপের আলোয় মায়ের মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে একটু। তার মুখের দিকে চেয়ে পরীরাণী বলল, অসীম ঘোষ জানালেন, চাকরি পাওয়া আর বড় হওয়া দুই-ই সহজ ব্যাপার...সেই সঙ্গে সামান্য যা লোকসান হতে পারে তাও ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।...উনি যা বললেন বাড়ি গিয়ে দাদাকে সব বলি, দাদা কি পরামর্শ দেয় দেখি।

মায়ের ফর্সা মুখে রক্ত উঠতে দেখছে পরীরাণী। হ্যাঁ, যা বোঝবার ঠিকই বুঝে নিয়েছে। মুখ ভালো করে আরক্ত হবার আগেই আস্তে আস্তে বিবর্ণ আবার। ট্রাম এসে গেছে। দুজনেই উঠল। ট্রামে মাঝারি ভিড়। দুজনে দুই সীটে বসার জায়গা পেল। নামার স্টপে আসার আগে পর্যন্ত যতবার পরীরাণী ঘাড় ফিরিয়েছে মাকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখেছে। উগ্র ধারালো দৃষ্টি।

মিনিট সাতেকের হাঁটা পথ ফুরোলে বাড়ি। ট্রাম রাস্তা পার হয়েই আলগা ঝাঁঝে মা বলল, লোকটা তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি বুঝতে পারছি, আর যা-তা বলেছে বোধহয়...টাকার দেমাকে এমন উচ্ছন্নে গেছে জানতুম না, অথচ আগে ভালো লোক ছিল।

—এখনো খুব ভালো লোক। কত ভালো তুমিও জানো না বোধহয়। থমকে তাকালো সামনের দিকে। সামনে ব্রজ ডাক্তারের ডিসপেনসারী। শিরার রক্ত আরো বেশি ফুটে উঠল যেন। গলার স্বর তেমনি ঠাণ্ডা।—তোমার ঘুমের ওষুধের দরকার থাকে তো নিয়ে যাও।

কয়েক পলকের জন্য মায়ের এমন হতচকিত মূর্তি আর কি দেখেছে পরীরাণী? চূড়ান্ত ঘা পড়ে গেছে, তাই উগ্র হয়ে উঠতেও সময় লাগল না। চাপা কটু গলায় বলে উঠল, তুই ভয় দেখাস কাকে—তোর দাদা মাথা কাটবে আমার! সংসার চলে না, তাই ভালো করতে গেছলাম, যা পারিস করগে যা—আর ও পাজীকেও মজা দেখাচ্ছি, টাকা হয়েছে বলে ধরাকে সরা দেখছে!

হনহন করে আগে আগে চলল। পরীরাণীর মাথায় সেই পুরনো চিন্তাটাই উঁকিঝুঁকি দিল আবার।...সংসার চলে না, চলার কথাও নয়, অথচ এতদিন চলছে কি করে?

সিঁড়ির মাঝামাঝি পা দিতেই দাদার গলার হালকা গান কানে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা যেন আর এক দফা বিষিয়ে গেল পরীরাণীর। দাদা আজ নেশা করে এসেছে। মাঝে অনেকগুলো দিন বাদ গেছল, পরীরাণী আশা করেছিল, এই দোষটা বুঝি কাটল। নেশা কাটার মূলে কারো সুশ্রী বিধবা বউয়ের হাত থাকবে সে সম্ভাবনাটা জোর করেই মনে আনতে চাইত না পরীরাণী।

দোতলায় উঠে মা একবার অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। অর্থাৎ নালিশ যার কাছে করবি সে কেমন দেখে রাখ।

মা জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরে চলে গেল। দাদা টের পেয়েছে ওরা ফিরল। গান থামিয়ে হাঁক দিল, এই পরী, ইধার আও।

পরীরাণী দরজার কাছে দাঁড়াল। খুশির আমেজে পরিতোষ বলল, বসন্ত সরখেলের সঙ্গে আজ আমার ফয়শালা হয়ে গেছে...ও আর বোধহয় তোর পিছনে লাগতে সাহস করবে না। তবে একটা সত্যি কথা বাপু বলি তোকে, যতটা বদমাস ওকে ভেবেছিলাম ততটা নয়। হেসে উঠে বিছানায় তবলা ঠুকে আবার গান ধরল, পিয়ার সাচ হ্যায় তো গলদমে আগ লাগে—

পরীরাণী নিজের খুপরিতে চলে এলো।...শেফালির সঙ্গে নতুন করে আশাপ্রদ কিছু বোঝাপড়া হয়ে থাকবে হয়তো। তাই এত আনন্দ। কিন্তু তার ফলে পরীরাণীর ভিতরটা যেন আরো বিষিয়ে গেল। ওই শয়তান অর্থাৎ বসন্ত সখখেলের সঙ্গে কি ফয়শালা হল বা কেমন করে হল শোনার কৌতূহল ছিলই। কিন্তু দাদার এই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও বিরক্ত। বীরুমামুর চোখেই বা অমন কৌতুক নাচছে কেন? ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

রাতের খাওয়া সারা হওয়া মাত্র দাদা বিছানা নিল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক ডাকতে লাগল। বিড়ি ফেলে বীরুমামু হাসি-হাসি মুখ করে ওর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।—আজ বসন্ত সরখেল বেশ কলে পড়ে গেছল, কিন্তু শেষে দিব্বি একটা নাটকের মতো হয়ে গেল, বুঝলি? আর মনে ফুর্তি হওয়ায় তোর দাদার অনেকদিন বাদে হঠাৎ নেশার তেষ্টা পেয়ে গেল—আমার হাতে কিছু পয়সা ছিল, কেড়ে নিল। সুধীর সান্যাল তো ওকে টাকা দেওয়া বন্ধই করেছে প্রায়, নেশার পয়সা পাবে কোথায়!

পরীরাণী তার মুখের দিকে চেয়ে রইল—বীরুমামু এ-সময়ে ঘরে ঢুকুক চায় না, চুপচাপ শোনার ইচ্ছে। সেটা বুঝেই বীরুমামু একটু এগিয়ে ঘরের মধ্যে এক পা রেখে দাঁড়াল। আর সবটা শোনার পর পরীরাণীর দাদার ওপরে সুদ্ধু তেতে উঠল।

...বিকেলে বে-জায়গায় একেবারে দাদার হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে গেছল ওই পাজী বসন্ত সরখেল। দাদার সঙ্গে বীরুমামু ছিল আর মাখন মজুমদারের জনাতিনেক চেলা ছিল। এখন ওরা দাদার ভক্ত হয়ে উঠেছে। নাগালের মধ্যে পেয়েই দাদা বসন্ত সরখেলের টুঁটি চেপে ধরেছিল প্রায়। বোনের অপমানের কৈফিয়ত তলব করেছিল।

বেগতিক বুঝে বসন্ত সরখেল বলেছে, দল বেঁধে আমাকে মারতে এসেছিস?

দাদা জবাব দিয়েছে, মারতে নয়, দরকার হলে খুন করা হবে তাকে। ঝাঁকুনি দিয়ে শাসিয়েছে, একবার নিষেধ করা সত্ত্বেও কোন সাহসে তুমি আমার বোনের পিছনে লেগেছ?

বসন্ত সরখেল তখন একটু নরম হয়েই দাদাকে অনুরোধ করেছে, এ-দিকে আয়, বলছি। দলের থেকে দাদাকে একটু তফাতে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিপদ হতে পারে বুঝে বীরুমামু অবশ্য ওদের সঙ্গ ছাড়েনি।

বসন্ত সরখেল বলেছে, অপমান করার জন্যে নয়, ছেলেবেলা থেকে তার বোনকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে বলেই বার বার এ-ভাবে ওর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বিপদ জেনেও এক-এক সময় কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসছে। তারপর দাদাকেই জিজ্ঞাসা করেছে, তুই যে মাখন মজুমদারের বউকে এত ভালবাসিস, ভয় দেখিয়ে তোকে কেউ ওর কাছ থেকে সরাতে চাইলেও এক-এক সময় কি তোর মাথায়ও আগুন জ্বলে উঠবে না? সত্যিকারের ভালো বাসলে তুই মুখ বুজে সরে থাকতে পারবি?

ওই কথা শোনামাত্র দাদা ঘায়েল একেবারে। তবু ঝাঁঝ দেখিয়ে বলেছে, ওই মেয়ে আমাকে পছন্দ করে, কিন্তু আমার বোন তোমাকে ঘেন্না করে।

বসন্ত সরখেল জবাব দিয়েছে, তার শাস্তি তো পাচ্ছি, দিন-রাত জ্বলছি, তোকে যেন অমন জ্বলতে না হয়। তোর বোনকে বুঝিয়ে বলিস, সে আমাকে ঘেন্না করে জানি, কিন্তু সেদিন সেলাই স্কুলে দেখা করে আমি ওকে অপমান করতে চাইনি।

সেই কথা বলেই বসন্ত সরখেল বুক ফুলিয়ে চলে গেল, আর দাদা হাবাগোবার মতো সেইদিকে চেয়ে রইল। তারপরেই তার মনে হঠাৎ ফুর্তি এলো আর চেলাদের বিদায় করে নেশা করতে ছুটল।

এরপর যথার্থই একটু ব্যতিক্রম চোখে পড়তে থাকল পরীরাণীর। সামনের ওই তেরছা বাড়ির জানালায় মাঝে মাঝে ওই মূর্তি চোখে পড়ে। চোখ ছোট করে না বা অভদ্র আচরণ করে না বটে, এক নীরব আক্রোশে শুধু ফুলতে থাকে যেন। সেলাইয়ের স্কুলে যেতে আসতেও দিন দুই দেখা হয়েছে। দাঁড়িয়ে গেছে। দূরে দাঁড়িয়েই দুই চোখে যেন ভস্ম করতে চেয়েছে ওকে। কিন্তু পরীরাণী পরোয়া করেনি। তার সাহসও দ্বিগুণ বেড়েছে।

ব্যতিক্রম ঘরের দিকে তাকালেও চোখে পড়ে। বিশেষ করে মায়ের দিকে তাকালে। চাকরির তদবিরের সেই ঘটনার পরে প্রথম দিনকতক মা হয়তো কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিল। দাদাকে সত্যিই ও কিছু বলে কিনা সেদিকে খর দৃষ্টি ছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে বুঝে নিয়েছে বলবে না। তারপর থেকে ক্রমশ তার মুখ কঠিন, চাউনি ধারালো। কিছু জিজ্ঞাসা করলেও চট করে জবাব দেয় না। মায়ের সমস্ত অস্তিত্বের ওপর যেন একটা ক্রূরতার বর্ম আঁটা। সন্ধ্যার পর কমই বেরোয়, ঘুমের ওষুধ খেয়ে বেলা পর্যন্ত ঘুমনোও প্রায় বন্ধ।

উতলা মুখে বাবা চুপিচুপি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে, তোর মায়ের আজকাল কি হয়েছে বল তো...আমার যে ভয় করে।

এই মায়ের মুখের দিকে তাকালে পরীরাণীরও মনে হয় বাবার ভয় যেন একেবারে অমূলক নয়।

পরিবর্তনের স্রোতে দাদাও কম ভাসছে না। তার সাজপোশাকের প্রীতি বেড়েছে। ও-দিকে হাত-টান লেগেই আছে। সুধীর সান্যাল তাকে কেন ছেঁটে দিয়েছে পরীরাণী জানে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে পয়সার অভাবে দাদার মেজাজ বিগড়েই আছে। তবে বাড়িতে কমই থাকে।

দাদার সঙ্গচ্যুত হবার ফলে বীরুমামু ইদানীং দিনের বেশির ভাগ সময় একলা ঘরে শুয়ে বিড়ি টানে। সন্ধ্যার দিকে বেরোয়। যতদূর ধারণা সুধীর সান্যালের সঙ্গে তার একটু ভাব-সাব হয়েছে। কারণ পরীরাণী দু'চার দিন তাকে সান্যালের বাইরের ঘরে বসে থাকতে দেখেছে। দাদাকে কিছু বলেনি। সান্যালের ফাই-ফরমাস খেটে দু'পাঁচ টাকা পায় হয়তো। পাক, পরীরাণী কারো পিছনে লাগতে চায় না।

বীরুমামু হেসে হেসে একদিন বলছিল, দাদা নাকি এখন রোজগারের ধান্ধায় আছে। এই বসন্ত সবখেলের সঙ্গে এখন তার বেশ ভাব। ড্রাইভিং শিখিয়ে দেবার জন্য তাকেই ধরেছে। সে নাকি কথা দিয়েছে চেষ্টা করবে, তবে নিজের দখলে কোন গাড়ি নেই বলেই যা অসুবিধে।

আগে হলে পরীরাণী ঘাবড়ে যেত, কিন্তু এখন বিরক্তি। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর, ওই ধূর্তকে জানতে বুঝতে দাদার এ জন্ম কেটে যাবে। দাদাকে হাত করার ব্যাপারে তার মতলব সম্পর্কে পরীরাণী নিঃসংশয়। কিন্তু এ নিয়ে দাদাকে আর কিছু বলতেও বিতৃষ্ণা। নিজের জোরের ওপরেই তাকে দাঁড়াতে হবে, আর দরকার হলে ওই শয়তানের মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে।

...শুধু নিজের জোরের ওপর?

না, আর একজনের জোরের ওপরও পরীরাণী মনে মনে অন্তত অনেক ভরসা পাচ্ছে। নিচের তলার একজনের ওপর।

. .পর পর দু'দিন ওকে নিচে ডেকে পাঠিয়েও দেখা পায়নি। পরীরাণী যায়নি। নিজের তালে নিজের ঝোঁকে আছে, ক'টা দিনের মধ্যে ওর ওপর দিয়ে কত রকমের ঝড় যাচ্ছে টের পাবে কি করে। কিন্তু আশ্চর্য, টের পেয়েছে। ও গেল না দেখে সরাসরি নিজেই ওপরে উঠে এসেছে। স্বভাবগত বিরক্তির সুরেই জিজ্ঞাসা করেছে, দু'দিন ধরে তোমাকে ডেকে পাচ্ছি না, কি ব্যাপাব?

ও-ঘরে দাদা আর বীরুমামু, ঘরে বাবা, মা বারান্দায় পায়চারী করছে। কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এই লোক সরাসরি তার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। আগেও ক্বচিৎ কখনো এসেছে অবশ্য, কিন্তু আগের থেকেও এই আসার জোরটার যেন অনেক তফাৎ। পরীরাণী সঙ্কোচ বোধ করেছে কিন্তু ভালও লেগেছে।

—কেন ডেকেছিলেন?

—কেন ডেকেছিলাম সেটা আমাকে ওপরে এসে বলতে হবে, তুমি দয়া করে একবার নিচে নামতে পারোনি?

পরীরাণীও স্পষ্ট করে জবাব দিয়েছে, আমার অসুবিধে হয় আপনি বুঝতে পারেন না? এরপর কেউ অপমান করে নিচে থেকে তাড়িয়ে দিলে তবে বুঝবেন?

চিরাচরিত অসহিষ্ণুতার বদলে শেখর ভাদুড়ীর মুখখানা গম্ভীর দেখিয়েছে শুধু। ওর মুখের দিকে চেয়ে ভিতরের অশান্তির আঁচ পেয়েছে যেন। গলার স্বর আরো ভারী। অনেক বারের শোনা কথাই আবার কান পেতে শুনেছে পরীরাণী।

—দেখ, যারা অপমান করার সাহস পায় তারা জানে অপমান তুমি মাথা পেতে নেবে। আর যতদিন মাথা পেতে নেবে ততদিন তোমার দাম কেউ দেবে না—আমিও না। এ-সব কথা শুনলে তোমার জন্যে বড় জোর মায়া হতে পারে, তার বেশি কিছু না। দয়া আর অনুকম্পা না চেয়ে একবার ফুঁসে উঠে দেখ না কি হয়?...যাক, তোমার বীরুমামুর মুখে শুনলাম, খুব অশান্তির মধ্যে আছ আর চাকরি-বাকরির খোঁজ করে বেড়াচ্ছ?

শেষের প্রশ্নটা শুনে পরীরাণী হকচকিয়ে গেছল। তারপর বীরুমামুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেছল। জবাবও দিতে পারেনি। কিন্তু এই ছেলে চলে যাবার পরে বীরুমামুর ওপর আর রাগের লেশমাত্র ছিল না।

—শোন, তুমি আমার ওপর একটু নির্ভর করতে পারো। তোমার কাজের চেষ্টা আমি করছি, আর শিগগীরই সেটা হবেও। কিন্তু কাজ পাওয়াটা বড় কথা নয়, তার পরেও যতটা সম্ভব এগিয়ে যাওয়াটাই বড় কথা। সে-চেষ্টা যদি না দেখি তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বনবে না মনে রেখো। একবার কাজে ঢুকলে তখন বুঝবে সামনে কত কাজের পাহাড় জমে আছে। দুটো দিন সবুব কর—

নিচে নেমে গেছে। ভারী কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে মাথার থেকে যেন বুকের দিকে নেমেছে। কি মনে পড়তে মুখে লালের ছোপও লেগেছিল একপ্রস্থ। হ্যাঁ, বনে যাতে সেই চেষ্টাই ওকে করতে হবে। কাজের চাপে মুখ দিয়ে রক্ত উঠলেও সে-চেষ্টা ছাড়বে না। নির্ভর এই দুনিয়ায় সে ওই একজনের ওপরেই করতে পারে।

✦

নিজের জীবনটা যে পরিবর্তনের কোন্ ঢেউয়ের ওপর ভাসছে পরীরাণীর সেটা কল্পনার বাইরে।

তিন মাস হল সে চাকরি করছে। এই তিন মাসে ওর এমন চোখ খুলেছে যে ও যেন এক নতুন দিগন্তের হদিশ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে এক ছেলের অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সে যেন ওর কাছ থেকেই ওকে ছিনিয়ে নিয়ে এক দুর্দম ইচ্ছার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

চাকরি হয়েছে শেখর ভাদুড়ীর শিক্ষক সঙ্ঘের আপিসে। যে বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টায় শেখর ভাদুড়ীর আহার-নিদ্রা ঘুচতে বসেছিল, সেটার ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। সাফল্যের সেটা অঙ্কুরাবস্থা। ভবিষ্যতের মহীরূহটা শেখর ভাদুড়ী অন্তত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আর তার কর্মীরা অতটা স্পষ্ট না হোক তার আভাস পাচ্ছে। শেখর ভাদুড়ী পরীরাণীকে বলেছিল তার স্কীম সফল হলে দেশে একটা সাড়া পড়ে যাবে। তার কাছে দেশ বলতে শিক্ষক জগৎ। তা এই জগতে সাড়া যে কিছুটা পড়েছে সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

এই নতুন পরিকল্পনার দরুন শিক্ষক সঙ্ঘে জনাকতক উৎসাহী কর্মী নিতে হয়েছে। যারা আপাতত মাইনেটা বড় করে না দেখে কাজে ডুবে থাকবে। বলা বাহুল্য, তারা কেউ শিক্ষক নয়। এদের মধ্যে পরীরাণীই শুধু মেয়ে, আর সকলে পুরুষ।

মাইনে সর্বসাকুল্যে মাসে একশ পঁচিশ টাকা আপাতত। শেখর ভাদুড়ী আশ্বাস দিয়েছে মাইনের জন্যে ভেবো না, কয়েক বছরের মধ্যেই কি হয় দেখ।

একশ পঁচিশ টাকাই যে কত টাকা আর কত বড় সম্বল তা শুধু পরীরাণীই জানে। ওর চাকরি পাবার ফলে দাদা খুশি, বাবা খুশি। দাদা শুনেই বলেছিল, দরকার হলে আমাকে মাসে দু'দশ টাকা দিস কিন্তু। মা খুশি কি অখুশি বোঝা যায় না। সকালের রান্না তার ঘাড়ে পড়েছে। সকাল ন'টার মধ্যে খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়, রান্নার সময় পাবে কখন? ওদিকে পাঁচ মিনিট লেট হলে নিচের বাবুর মেজাজ চড়ল।

রাতে রাঁধে। তারও ঢালা অবকাশ মেলে না। আপিসের কাজ বাড়িতে টেনে আনতে হয়। কাগজে কলমে টাকা পয়সার লেনদেনের হিসেব রাখতে গিয়ে হিমসিম অবস্থা। কোথাও ভুল হলেই বকুনি। তাছাড়া সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে বার দুই অন্তত নিচের তলব আসে। এটা কর, ওটার দেরি কেন, ইত্যাদি। মুখ বুজে ওই ছেলের লেকচার শোনাটাও যেন দরকারী কাজ কিছু। অন্য ঘরে তার মায়ের গোমড়া মুখ আরো গোমড়া হয়, আর তার বাবাটি যেন দিনকে দিন নিরাসক্ত মৌনী মানুষ হয়ে উঠছেন।

তিনটে মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল পরীরাণী ভেবে পায় না। ওর শেলাইয়ের স্কুল সপ্তাহে একদিনে এসে ঠেকেছে—রবিবার দুপুরে। সেও শেখর ভাদুড়ীর সঙ্গে কোথাও কাজে না বেরুতে হলে। ছেড়েই দিত, আর ক'দিন বাদে দ্বিতীয় ডিপ্লোমা পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ও-পাট চুকিয়ে দিতে হবে। ও সেলাইয়ের স্কুল ছাড়ছে না দেখে শেখর ভাদুড়ী তিক্ত-বিরক্ত এক-এক সময়। কতদিন বলেছে, দু-নৌকোয় পা দিলে কোনদিন কিছু হবে না, বুঝলে?

পরীরাণী কেমন করে বোঝাবে তাকে, সেলাই ছাড়াটা ওর সেই ছেলেবেলার এক হারানো মা-কে ছাড়ার সামিল।

কাজ কাজ কাজ। সকালে কাজ, দুপুরে কাজ, বিকেলে কাজ, রাত্তিরে কাজ। মানুষটার সঙ্গে পরীরাণীও যেন একটা কাজের ভেলায় চেপে ভেসে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্য, এক এক সময় ফাপর-ফাপর লাগে বটে, কিন্তু পরীরাণীর ক্লান্তি নেই, বিরক্তি তো নেই-ই।

শেখর ভাদুড়ীর চমকপ্রদ সাড়াজাগানো স্কিম এতদিনে ওরও মাথার মধ্যে পুরোপুরি বসে গেছে। ফলে প্রকাশ করুক বা না করুক, নিজেরও উৎসাহ বা উদ্দীপনার অভাব নেই। মানুষটার প্রখর চিন্তাশক্তির কথা ভাবলে সত্যিই বিস্ময় জাগে।

সমস্ত পরিকল্পনাটা নিখুঁতভাবে বুঝে নিতে পেরেছে পরীরাণী।

পশ্চিম বাংলায় বে-সরকারী প্রাইমারী থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষক সংখ্যা আনুমানিক পঁচাত্তর হাজার। আর সেই সব স্কুলের কেরানি বেয়ারা চাপরাশি মালি ঝাড়ুদার ইত্যাদির আনুমানিক সংখ্যা হাজার পঁচিশেক। অর্থাৎ মোট কর্মীর সংখ্যা এক লক্ষের মতো। এরা কেউ মরে গেলে বা অবসর নিলে তাদের সংসার অপরিসীম দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবল।

কিন্তু বাঁচার রাস্তা আছে। সেই রাস্তাই দেখিয়ে দিয়েছে শেখর ভাদুড়ী।

এক লক্ষ স্কুল কর্মীর মধ্যে আপাতত পঞ্চাশ হাজারকে বাতিল করা হয়েছে, বাকি পঞ্চাশ হাজারকে সঙ্ঘের আওতায় আনা লক্ষ্য তাদের। পরিকল্পনাটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে এই ক'মাসের মধ্যেই পঁচিশ হাজার সভ্য সংগ্রহ হয়েছে, আর রোজই সভ্য সংখ্যা বাড়ছে —আশা করা যায় এ-বছরের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজারের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। যে পঞ্চাশ হাজারকে বাতিল করা হয়েছে, এই উন্নতি দেখে আশা করা যাচ্ছে, তারাও হুড়মুর করে এসে যোগ দিল বলে।

কেন, কোন লোভে আসছে বা আসবে সকলে? নিজের বাঁচার লোভে আর নিজের অবর্তমানে পরিবারবর্গকে বাঁচানোর তাগিদে।

এবারে একটু অঙ্কের হিসেব, কিন্তু শেখর ভাদুড়ীর বিশ্লেষণে জটিলতা কিছু নেই। ধরা যাক সঙ্ঘের মোট সভ্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। এদের মধ্যে ধরা যাক চল্লিশ হাজার শিক্ষিত আর দশ হাজার অশিক্ষক কর্মী। শিক্ষক কর্মীরা মাসে চাঁদা দেবে দু-আনা করে, আর অশিক্ষক কর্মীরা মাসে এক আনা করে। এই থেকে মাসে চাঁদা উঠবে পাঁচ হাজার ছ-শ পঁচিশ টাকা। এর থেকে আপিস এবং যাবতীয় সংগঠন বাবদ মাসে আপাতত এক হাজার ছ'-শ পঁচিশ বাদ দিলেও থাকল চার হাজার অর্থাৎ বছরে আটচল্লিশ হাজার। এই টাকার বেশির ভাগ সঙ্ঘের ফাণ্ড হিসেবে মোটা সুদে খাটানো হবে।

এ-পর্যন্ত মামুলি ব্যাপার। তার পরেই চমকপ্রদ আশ্বাস।

ক-বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে, পঞ্চাশ হাজার কর্মীর মধ্যে বছরে গড়পড়তা মারা যায় পাঁচ জন, আর অবসর নেয় পঁচাত্তর থেকে একশ জন।

যে কোন একজন সভ্য মারা গেলে তবেই ডেথ-পুল তোলা হবে। কারো মৃত্যু ঘটলে প্রতিটি শিক্ষক দেবে আট আনা করে এবং অ-শিক্ষক চার আনা করে। তাতে একজন মারা গেলেই ডেথ-পুল উঠবে বাইশ হাজার পাঁচশ টাকা। এর মধ্যে আঠের হাজার টাকা দেওয়া হবে মৃতের পরিবারকে, আর বাকি চার হাজার পাঁচশর খরচ বাদে যা থাকবে সেটা সঙ্ঘের ফাণ্ড-এ যাবে। অতএব বছরে যদি পাঁচ সাতজন শিক্ষক আর অ-শিক্ষকও মারা যায়, শিক্ষকদের বছরে খরচ পড়বে আড়াই টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা, আর অশিক্ষকদের পাঁচ সিকে থেকে এক টাকা বারো আনা। তার বদলে মৃত্যু ঘটলে তাদের পরিবারের আঠের হাজার টাকা নিশ্চিত প্রাপ্তি। কোন অঘটনে বছরে বারোজন মারা গেলেও প্রাপ্তির তুলনায় খরচ কিছুই নয়।

অতঃপর পেনসন স্কীম। আপাত দৃষ্টিতে প্রচণ্ড লোভনীয় না হলেও কালে দিনে অনেক বেশি যে ফলপ্রসূ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই স্কীমেও প্রতি শিক্ষক সভ্যকে চাঁদা দিতে হবে মাসে চার আনা করে আর অ-শিক্ষককে দু-আনা করে। এই হারে মোট আদায় হবে মাসে সাড়ে বারো হাজার, বছরে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। বর্তমান থেকে দশ বছর পর্যন্ত যাদের চাকরির মেয়াদ, তারাই এই পেনসন স্কীমের আওতায় আসবে, অর্থাৎ দশ বছর বাদে যারা অবসর নেবে তারা মাসিক পেনসন পাবে। তার আগে যারা রিটায়ার করবে তারাও চাঁদা দিয়ে যাবে, তাদের জন্য সুদ আর ডোনেশানের টাকা থেকে একটা থোক টাকা তুলে দেওয়া হবে। শেখর ভাদুড়ী হিসেব করে দেখিয়ে দিয়েছে মোট সভ্যের গড়পড়তা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শিক্ষক এবং

অ-শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ বিশ বছরের কম নয়। অর্থাৎ বিশ বছরের দীর্ঘ-মেয়াদী সভ্য সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ। এদের মধ্যে তিরিশ হাজার শিক্ষক সভ্য আর সাত হাজার পাঁচশ অ-শিক্ষক সভ্য ধরলে তাদের মাসে চার আনা আর দু' আনা হারে পেনসন স্কীমের চাঁদার মোট দাঁড়াবে বছরে এক লক্ষ বারোশ পঞ্চাশ টাকা। সে-টাকা কোম্পানির মোটা সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে খাটালে বিশ বছরে মূলধন দাঁড়াবে তিরিশ লক্ষ টাকার ওপর। ততদিনে সংস্থার জেনারেল ফাণ্ডেও বহু লক্ষ টাকা জমবে। অতএব শুধু সুদ থেকেই প্রতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে মাসে দু'শ টাকার ওপর পেনসন অনায়াসে দেওয়া যাবে। আর অসময়ে কোন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মারা গেলে কয়েক বছরের প্রাপ্তি হিসেব করে তখন তার পরিবারবর্গের হাতেও অনায়াসে মোটা টাকা তুলে দেওয়া যাবে।

এতবড় নিশ্চিত আশ্বাসের বিনিময়ে প্রতিটি সভ্যের বছরে দিতে হচ্ছে কত? শিক্ষকরা দেবে চাঁদা দেড় টাকা, ডেথ-পুল আড়াই টাকার মতো, আর পেনসন স্কীমে তিন টাকা—সর্বসাকুল্যে বছরে সাত সাড়ে সাত টাকা, মাসে গড়পড়তা সাড়ে ন' আনা। আর অ-শিক্ষক সভ্যদের গড়পড়তা মাসে চাঁদার হার পড়বে সাড়ে চার আনা। এই চাঁদার হার গায়ে লাগা দূরের কথা, কেউ টেরও পাবে না।

এ ছাড়া সংগঠনের একটা বড় কাজ ডোনেশান তোলা। সঙ্ঘের ফাণ্ড যত বেশি পুষ্ট হবে, পেনসন স্কীম বড় করা আর মেম্বারদের অন্যান্য সুবিধে দেওয়াও তত বেশি সহজ হবে। শিক্ষাব্রতী তো দেশে কম নেই, ঠিক মতো বোঝাতে পারলে অনেকেই অকৃপণ হাতে ডোনেশান দেবে। শিক্ষকদের সার্বিক মুক্তি ভিন্ন দেশে শিক্ষার প্রসার সম্ভব কি? মোটামুটি অবস্থার লোকের কাছ থেকে দু-পাঁচ টাকা করে আদায় করতে পারলেও তো কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা কঠিন কাজ নয় খুব।

গোড়ায় গোড়ায় স্কীমের খুঁটিনাটি বুঝতে গিয়ে পরীবাণীর মাথা ঝিমঝিম করত। কিন্তু এখন সবকিছু এমন রপ্ত যে ও নিজেই যে কোন অজ্ঞ লোককে হিসেব কষে আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে দিতে পারে। সভ্য সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তাই তাদের কাজও বাড়ছে। কাগজে কাগজে শেখর ভাদুড়ীর এই পরিকল্পনা যে-রকম সুখ্যাতি বেরিয়েছে, দলমতনির্বিশেষে সভ্য সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে এক লক্ষ হওয়াও বিচিত্র নয়।

সংগঠন আর সেই সঙ্গে বাইরে থেকে ডোনেশান তোলার একটা বড় দায়িত্ব শেখর ভাদুড়ী নিজের হাতে নিয়েছে। চেয়ারে বসে কর্তামী করার মানুষ নয় সে। প্রথমে কলকাতার মধ্যে বা কাছাকাছি কোন জায়গায় এ-সব কাজে বেরুলে পরীরাণীকে সঙ্গে নিত। কিন্তু এর পর দু-চার দিনের জন্যে বাইরে বেরুতে হলেও হুকুম করত সঙ্গে যেতে হবে। প্রথম প্রথম পরীরাণীর ভয়ানক সঙ্কোচ হত। লক্ষ্যের দিকে তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এই লোকের মাথায় আর কিছু যেন আসেই না। মেজাজ-পত্র খুব ভালো থাকলে শেখর ভাদুড়ী এক-এক সময় রসিকতা যে না করে এমন নয়। সে-দিন বলেছিল, যে-কোন অর্গানাইজেশনের ব্যাপারে মোটামুটি একটা সুশ্রী মেয়ে সঙ্গে থাকলে লোকে খুশি হয় আর তাতে কাজও এগোয়—ডোনেশান তোলার ব্যাপারে সুবিধে তো হয়ই।

পরীরাণী রাগ দেখিয়ে বলে উঠেছিল, যান, আর কক্ষনো যদি আপনার সঙ্গে কোথাও গেছি!

কিন্তু না গিয়ে অব্যাহতি নেই। তাছাড়া মেজাজ-পত্র কমই ভালো থাকে শেখর

ভাদুড়ীর। এই নিয়ে পরীরাণীও এক-আধ সময় রসিকতা করে, বলে, সকলের সব টাকা নিঃস্বার্থভাবে আপনার স্কীমে এনে ঢাললে তবেই বোধহয় আপনি খুশি হন।

শেখর ভাদুড়ী জবাব দেয়, তা না...তবে আমরা যা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি পাওয়া উচিত।

এই ঢের বেশি পাওয়ার তাগিদটা মাথায় যেন চেপে বসেছে তার। কিছুতে আর সন্তুষ্ট নয়।

তার সঙ্গে দু-চারদিনের জন্য বাইরে যেতে এখন আর সঙ্কোচ বোধ করে না পরীরাণী। কিসের সঙ্কোচ, লোকটার আর কোনদিকে হুঁশ থাকলে তো। তাছাড়া যেখানেই যাক, সেখানকার কোন বিবাহিত মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে থাকে—দু' তিনদিনের মধ্যেই তাদের বউদের সঙ্গে এমন খাতির হয়ে যায় যে তারা ছাড়তেই চায় না। তাই, বাইরে কোথাও বেরুতে হলে পরীরাণী উল্টে মনে মনে বরং খুশিই হয়। অবশ্য সেটা প্রকাশ করার মতো বোকা মেয়ে সে নয়। বেরুবার হুকুম হলে বরং বিস্ময় প্রকাশ করে, এরই মধ্যে আবার!

মজাদার অস্বস্তির ব্যাপারও ঘটেছে দুই একবার। সেবারের কথা মনে হলে পরীরাণীর হাসিই পায়।...যে শিক্ষকের বাড়িতে উঠেছিল তাদের একখানা মাত্র ঘর। প্রাইমারি স্কুলের টিচার ভদ্রলোক। গরীব হলেও মনটা দরাজ।

ঠিক হল, মেয়েরা দুজন ঘরে শোবে, আর পুরুষ দুটি বাইরের ঢাকা বারান্দায়। ঢাকা হলেও শেখর ভাদুড়ীর সেবারে জ্বর-জ্বর ভাব, সর্দিতে ঢপ ঢপ করছে। তার বাইরে শোয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মফঃস্বল শহরের কনকনে ঠাণ্ডা। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকটি রসিকতা করে প্রস্তাব করল, আমরা দুজন বাইরে শুই, আপনারা দুজন ভিতরে থাকুন।

আমরা দুজন বলতে সে আর তার স্ত্রী। শেখর ভাদুড়ীর শরীর খারাপ হলেও মেজাজ ভালো ছিল। সেই সকালেই ভালো বিজনেস হয়েছে, অর্থাৎ, অনেক সভ্য আর কিছু ডোনেশানের আশ্বাস পাওয়া গেছে। সে পাল্টা রসিকতা করে বলল, তার থেকে উল্টে পাল্টে নেওয়া যাক না—

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ভুরু নাচিযে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

—তার মানে, আমি আর আপনার স্ত্রী ভিতরে থাকি, আপনি আর পরীরাণী বাইরে।

ওই ভদ্রলোক আনন্দে উৎফুল্ল। তক্ষুনি সায় দিল, ওনার আপত্তি না হলে আমার কি আপত্তি!

স্থূল রসিকতা বটে ; কিন্তু পরিস্থিতি গুণে জিভ আলগা সকলেরই। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ভদ্রলোকের বউ কৃত্রিম ঝাঁঝে শেখর ভাদুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল, উল্টে পাল্টে নেওয়ার অর্থটা কি? আমি না-হয় একজনের বউ, কিন্তু পরীরাণী দেবী এখন পর্যন্ত আপনার কে? আপনারাই বা একঘরে থাকবেন কি করে?

থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে শেখর ভাদুড়ী হার মেনেছে, তাও তো বটে।

কিন্তু পরীরাণীর মুখ লাল অন্য কারণে। মহিলা বলেছে, এখন পর্যন্ত পরীরাণী দেবী আপনার কে? অর্থাৎ ভবিষ্যতে কেউ যে হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরীরাণীর ব্যবস্থাই মেনে নিতে হয়েছে। মেয়েরা দুজন বাইরে শুয়েছে আর ছেলেরা দুজন ভিতরে। আর রসিকতা করে পরীরাণীও বলতে পেরেছে, আমরা দোকানের খেলনাপাতি নই যে, ইচ্ছে মতন পরখ করে দেখা যাবে।

একটা ব্যাপার পরীরাণী ইদানীং সংগোপনে কৌতুক অনুভব করে থাকে। ওদের দুজনকে একসঙ্গে কাজে মেতে থাকতে দেখে কারো চোখে এমন আর একটা বিশেষ কৌতূহল চিকিয়ে উঠতে দেখে না। তার কারণ, ভবিষ্যতের একটা স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি সকলেই ধরে নিয়েছে। পরীরাণী নিজেও। যদিও এ নিয়ে সত্যিই নিজেদের মধ্যে এ-যাবৎ কোন কথা হয়নি। কিন্তু কথাই কি সব? কোথাও একলা বেরুতে হলে বাবুর মেজাজ তিরিক্ষি। একবার তুচ্ছ অজুহাতে পরীরাণী তিনদিনের এক সফর বাতিল করেছিল। গোঁ ধরে বাবু একাই বেরিয়েছিল, কিন্তু পরদিনই ফিরে এসেছে। আর সে-ও যেন ওরই অপরাধে।

...নিচের তলার গিন্নির মুখ আজকাল এত থমথমে কেন সর্বদা, তা-ও জানে। ছেলেকে কিছু বলতে এসে ভালো হাতে দাবড়ানী খেয়েছে। ছেলে বলেছে, ভবিষ্যতে আমি কি করব না করব তা নিয়ে মাথা ঘামালে আমাকে ভিন্ন বাসা করতে হবে। গুণধর নিজেই এ-কথা পরীরাণীকে বলেছে।

...আর একদিনের কথা মনে পড়লে লজ্জায় মুখ রাঙা হয় পরীরাণীর। নিজের পছন্দ-মতো কয়েকখানা মোটামুটি ভালো শাড়ি কিনেছিল আর সেগুলোর সঙ্গে ম্যাচ করে নিজের হাতে কয়েকটা জামা বানিয়েছিল। তার মধ্যে একটা লাল নকশাপাড়ের উজ্জ্বল চাঁপা-রঙা শাড়িটা সেবারেই সবে কিনেছে। সেটার সঙ্গে ম্যাচ করা টকটকে লাল ভেলভেটের ব্লাউস বানিয়েছে একটা। দিন-দুয়েকের জন্য হুগলীর দিকে গেছল। তখন সেই জামা আর শাড়ি পরেছিল। এমনিতে বাবুর কিছুই আর চোখে পড়ে না, সদা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু সেদিন ঘুরে-ফিরে যে কতবার করে তার চোখ এদিকে ওঠা-নামা করেছে ঠিক নেই।

পরদিন অন্য জামা-কাপড় পরে আর এক জায়গায় ডোনেশান তুলতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ওর বেশ-বাস দেখেই ওই ছেলে কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। তারপর বলেই ফেলল, কালকের সেই জামা আর শাড়িটা পরো না—

অগত্যা পরতে হয়েছে। অন্য সময় বেরুতে দেরি হলে বিরক্তি, কিন্তু এই বেলায় যেন অঢেল সময় হাতে। বাইরে বেরিয়ে অবশ্য পরীরাণী তার কথা শুনে রেগেই গেছল। শেখর ভাদুড়ী হেসে ঠাট্টা করেছিল, গতকাল ওই শাড়ি আর জামার কল্যাণে মন্দ প্রাপ্তি হয়নি, আজও সেই আশাতেই তোমাকে শাড়ি-জামা বদলে নিতে বললাম, বুঝলে?

পরীরাণীও ঠোঁটকাটার মতই জবাব দিয়েছিল, সব বুঝেছি, চলুন এখন—।

এই ক'টা মাস বাড়ির কারো দিকে যেন ভালো করে তাকানোর ফুরসত মেলেনি তার। সকাল বা রাতে মাঝে মাঝে ওই তেরছা-মুখো বাড়ির শয়তানটাকে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শেখর ভাদুড়ীর সঙ্গে কাজে বেরুবার সময়ও। হিংসায় আর নিষ্ফল রাগে মুখখানা কালীবর্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পরীরাণী ভ্রূক্ষেপ করে না আর। নিজের দুটো পায়ের নিচে মাটি এখন এত শক্ত যে তেমন বেচাল দেখলে ওর মতো পাজীকে পায়ে করে থেঁতলেও দিতে পারে।

সে-দিনটা রবিবার ছিল। সকাল থেকে নিচের মানুষ ব্যস্ত। বিকেলে নানান জায়গার অর্গানাইজাররা আসবে, তাদের নিয়ে বড় রকমের বৈঠক বসবে একটা সংঘের আপিসে।

স্কীমের অগ্রগতির ব্যাপারে সে খুশি নয় আদৌ। বিশেষ করে ডোনেশান তোলাটা তার মনের মতো হচ্ছে না। সে আর পরীরাণী মিলে যত টাকা তুলেছে, অন্য সংগঠকরা সকলে মিলে অতটা তুলতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। তাই কড়া রকমের মিটিং করা দরকার হয়েছে একটা। এছাড়া অন্যান্য কিছু জরুরী পন্থা নিয়েও আলোচনা হবে। শেখর ভাদুড়ী সকাল থেকেই ব্যস্ত, সে বাড়ি নেই। পরীরাণীকে বলে গেছে সাড়ে তিনটে নাগাত ফিরবে, সাড়ে চারটেয় আবার ওকে নিয়ে বেরুবে।

অতএব সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ছুটি।

এদিকে গতকাল থেকে শহরের অবস্থা একটু থমথমে। উত্তর কলকাতায় কোথায় কোথায় লাঠিচার্জ হয়েছে, গুলী-বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। ছাত্রদের একটা বড় দল ক্ষেপে আছে, তাদের উত্তেজনার ইন্ধন জোগাচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা। এ-রকম দুর্যোগ প্রায়ই লেগে আছে আজকাল।...কিন্তু ভোরে উঠে শেখর ভাদুড়ী উত্তর কলকাতার দিকেই গেছে বলে পরীরাণীর ভিতরটা একটু উতলা হয়ে আছে।

বারান্দায় পাঁচ মিনিট দাঁড়াবার পরেই লক্ষ্য করল, জানালার কাছে বসন্ত সরখেল দাঁড়িয়ে আছে। তার কালো মুখ থমথমে। ওর দিকেই নিষ্পলক চেয়ে আছে।

সোজাসুজি তাকালো পরীরাণীও। চোখে চোখ রেখে রইল খানিক। ওর ভয়ডর যে নিঃশেষ হয়ে গেছে তাই বুঝিয়ে দিতে চাইল। তাছাড়া, পাল্টা তেজ দেখলে কুঁকড়ে যায় কিনা পরখ করার ইচ্ছে।...কুঁকড়ে গেল না। চেয়েই রইল।

খানিক বাদে ধীর পায়ে পরীরাণী ঘরে চলে এলো। তারপরেও বারকয়েক বারান্দায় এসেছে, তেমনি থমথমে মুখে ওকে জানালায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

দুপুর প্রায় তিনটের সময় নিচের তলার লোক ফিরল কিনা বোঝার জন্য, অর্থাৎ নিচের ঘরের বাইরের দিকের দরজা খোলা কিনা দেখার জন্য রেলিংয়ের ওধারে প্রায় আধখানা শরীর বার করে দিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল। ফেরে নি মনে হল। মাটিতে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি। তেরছা বাড়ির জানালায় ওই মূর্তি এরই মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে আবার। নিচের দিকে ওর এ-ভাবে ঝুঁকে দেখাটাও ভালো করেই লক্ষ্য করেছে সন্দেহ নেই।

বে-পরোয়ার মতই একটা বিরক্তির কটাক্ষ হেনে পরীরাণী চলে গেল।

কিন্তু এর খানিক বাদে আবার বারান্দায় এসেই অবাক সে। ওই তেরছা বাড়ির সামনে একটা টেম্পো দাঁড়িয়ে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে দাদা আর বসন্ত সরখেল। বসন্ত সরখেলের পরনে ট্রাউজার, গায়ে টেরিলিনের শার্ট। টেম্পোতে মালপত্র তোলা হচ্ছে। বাক্স-বিছানা কিছু হাঁড়ি-কড়াই, আরো এটা সেটা। দাদা সেই মাল তোলার তদারক করছে।

বসন্ত সরখেল এদিকে তাকালো। এক রকমই থমথমে মুখ। তারপর দাদাকে বলল কি। তদারকিতে ব্যস্ত দাদাও ঘুরে দোতলার দিকে অর্থাৎ পরীরাণীর দিকে তাকালো একবার। বোঝা গেল ওর সম্পর্কেই দাদাকে কিছু বলেছে।

মাল তোলা হতে বসন্ত সরখেল শেষ বারের মতই যেন একটা গভীর দৃষ্টি ছুঁড়ল এদিকে, তারপর টেম্পোর সামনে ড্রাইভারের পাশে উঠে বসল। টেম্পো চলে গেল, দাদা পায় পায় বাড়ির দিকে ফিরল।

বিছানা-পেঁটরা নিয়ে পাজীটা কোন্ সফরে বেরুলো ঠিক বোধগম্য হল না। যে চুলোয় খুশি যাক, দাদার সঙ্গে ওর এই খাতিরটাই বিরক্তির কারণ।

দোতলায় উঠে দাদাও বারান্দায় এলো, হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, তুই বুঝি রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকেছিলি?

নীরস সুরে পরীরাণী পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন?

—ওই বসন্ত বলে গেল, তোর বোনকে রেলিং টপকে ও-ভাবে ঝুঁকতে বারণ করিস, একটু এদিক-ওদিক হলেই ভবিষ্যতের সব আশা আর আনন্দ একসঙ্গে ঘুচে যাবে।

—যায় যাবে, ওর তাতে কি? আর ওর সঙ্গে তোমারই বা এত খাতির কিসের?

—খাতির আবার কোথায় দেখলি, এতকাল পাড়ায় ছিল, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তাই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

পরীরাণী এবারে অবাক একটু।—বাড়ি ছেড়ে চলে গেল মানে?

মানে যা শুনল, পরীরাণী ভিতরে ভিতরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। ভয়ডর আর ছিল না বটে তবু চোখের সামনে দেখলে ভিতরে একটা জ্বালা ধরতই। তার নারীত্বের ওপর যেটুকু হোক প্রথম হামলা ওই শয়তানই করেছে। মনে পড়লে আজও সর্বাঙ্গ বিষিয়ে ওঠে।...আর দেখতে হবে না। ছোট ভাই এখানে থাকার ফলে দাদাদের প্রতি পদে অসুবিধে হচ্ছিল নাকি! (হবে না, যে গুণধর ভাই!) ওদিকে অসুবিধে বসন্ত সরখেলেরও হচ্ছিল একটু-আধটু। নিজস্ব আলাদা একটা আস্তানা না হলে কাজকর্মের অসুবিধে হচ্ছিল। তার দলের লোকেরা অনেকবার তাকে আলাদা দুটো ঘর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এই পৈতৃক বাড়ির মালিক ওরা তিন ভাই। বসন্ত সরখেল সকলের ছোট। বসন্ত তাদের প্রস্তাব দিয়েছিল বাড়ি আর জায়গার দাম ধরে ওকে তিনভাগের এক ভাগ দিয়ে দিলে তার অংশ সে দাদাদের নামে লিখে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। বড় দুই দাদা এতদিনে সেই টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছে। বাড়ির দাম ধরা হয়েছে সর্বসমেত বিয়াল্লিশ হাজার টাকা (বসন্তও জানে দাদারা ঠকালো তাকে), তার তিনভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ বুঝে নিয়ে বসন্ত সরখেল বাড়ির অধিকার ছেড়ে চলে গেল। সামনের ওই ব্রিজটার ও-ধারে বন্ধুদের আর নিজের দাপটে সামান্য ভাড়ায় দুটো ঘর নিয়ে আজ তল্পিতল্পা গোটালো সে।

হাড় জুড়লো। নিজের কাজ বলতে তো গুণ্ডামী আর বোমাবাজী করে টাকা রোজগার করা। ঘর ভাড়া নিয়ে এর পর বেশি দিন আর হাজতের বাইরে থাকতে হবে না।

নীচ-তলা থেকে একটা হাঁক শুনে চমকে উঠল পরীরাণী। বিকেলের মিটিংয়ের কথাই ভুলে গেছল খানিকক্ষণের জন্য। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্তুত হয়ে নিচে নেমে এলো। শেখর ভাদুড়ীর তাতেও বিরক্তি।—কি ব্যাপার, তোমাকে তৈরি থাকতে বলেছিলাম না?

—একেবারে তৈরি। চলুন।

শেখর ভাদুড়ী কটাক্ষে ওকে দেখে নিল একবার। মুখ দেখেই পরীরাণী বুঝল দ্রুততালের এই সামান্য সাজ-সজ্জা তেমন মনে ধরেনি। ভিতরে ভিতরে একটু মজাই লাগল যেন। ভালো মুখ করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, চাঁপা-রঙা শাড়ি আর লাল ব্লাউসটা পরে আসবে নাকি।...না, অত সাহস নেই বাবা।

কিন্তু মিটিং করা দূরে থাক, গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতেই পারল না তারা। এক আচমকা দুর্যোগের মধ্যে পড়ে হঠাৎ যেন দিশেহারা অবস্থা দুজনারই। রাস্তাঘাটের অবস্থা থমথমে ছিল। ট্রাম-বাসের সংখ্যাও কম। অনেক জায়গায় লাঠিচার্জ আর গুলী চলেছে নাকি। গত দিনের গোলযোগের জের। যে-বাসে চলেছিল ওরা, পেট্রল আর বোমা নিয়ে কতগুলো ছেলে চড়াও হয়ে সেই বাসটা থামিয়ে দিল। তাদের হুকুম, দু'মিনিটের মধ্যে নেমে যেতে হবে, বাসে আগুন দেওয়া হবে।

দু'মিনিটের মধ্যেই বাস ফাঁকা। ছেলেগুলো বাস সংহারে মেতে উঠল। ঠিক এই সময়েই একটা মিলিটারি ট্রাক এসে হাজির। এলোপাথাড়ি গুলী চালিয়ে দিল তারা। আর্তনাদ করে তিন-তিনটে ছেলে মুখ থুবড়ে পড়ল। এদের মধ্যে একটি মাত্র ওই দলের ছেলে, বাকি দুজন মজা দেখার দর্শক।

পরীরাণী থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাজা রক্তে মাটি ভেসে যেতে দেখছে।

একখানা বাহুতে ওকে জড়িয়ে ধরে শেখর ভাদুড়ী প্রাণপণে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পরীরাণীর পা অবশ, চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার।

বাড়ি থেকে মাইল-দেড়েক দূরে এই ঘটনা। এর পর না পারে সামনের দিকে এগোতে, না বাড়ির দিকে। ট্রাম নেই, বাস নেই, ট্যাক্সি নেই, এমন কি একটা রিকশা পর্যন্ত নেই। দেখতে দেখতে রাস্তা ফাঁকা। বন্দুক উঁচিয়ে কেবল মিলিটারি ট্রাক চলাচল করছে।

রাস্তায় লোক নেই বটে, কিন্তু দূরে দূরে গলির মুখে ছেলেরা ওঁত পেতে আছে। ফাঁকা পেলেই তারা বোমা ছুঁড়ছে, অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ছে। জবাবে গুলী। কিন্তু সেই গুলী কারো লাগছে কি লাগছে না বোঝা যাচ্ছে না।

দেড় মাইল পথ ভেঙে একরকম টেনে-হিঁচড়েই পরীরাণীকে নিয়ে বাড়ি ফিরল শেখর ভাদুড়ী। পথে অনেকবার ধমকেছে ওকে, এমন দুর্বলচিত্ত মেয়ে আর দেখিনি, কি এমন হয়েছে!

...পরীরাণীর মাথাটা অসম্ভব ঝিমঝিম করছিল। এখনো করছে। ছেলে তিনটের সেই মুখ-থুবড়ে-পড়া রক্তাক্ত দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরছে না। বাড়ির রাস্তায় বাঁক নেবার পর খেয়াল হল পাশের লোক তখনো এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলেছে। তখন সন্ধ্যা, রাস্তার আলো জ্বলছে না, অর্থাৎ দুর্যোগ এদিকটাতেও ছড়িয়েছে, এদিকের ডানপিটে ছেলেরা রাস্তার আলো নিভিয়ে ফেলেছে।

এক হাতে আস্তে আস্তে তার হাতটা সরাতে চেষ্টা করতে অস্ফুট বাধা পেল।—থাক, আর লজ্জা করতে হবে না, একটা মরা শরীর টেনে নিয়ে এলাম যেন এতক্ষণ ধরে—

কথার সঙ্গে সঙ্গে পরীরাণী অনুভব করল কাঁধের ওপর হাতের চাপ আরো বাড়ল বই কমল না। বাঁয়ে বাড়ির রাস্তায় পা ফেলার আগে একটু চেষ্টা করেই হাতটা সরিয়ে দিল পরীরাণী। আবছা অন্ধকারে এই সান্নিধ্যও হঠাৎ অস্বস্তিকর ঠেকল কেমন।

দোতলায় উঠে নিজের খুপরি ঘরে ঢুকে সটান শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে পরীরাণী। জামা-কাপড়ও বদলানো হয়নি। সেই রক্তাক্ত দৃশ্য কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছে না।

আধঘণ্টা না যেতে মনে হল অন্ধকারে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেউ। পরীরাণী ধড়মড় করে উঠে বলে।—কে?

—আমি শেখর, ঘরের আলো জ্বালনি কেন?

শাড়ির আঁচলটা তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে পরীরাণী উঠে আলো জ্বালল। শেখর ভাদুড়ী দুই-এক লহমায় খুঁটিয়ে দেখে নিল ওকে। তারপর বলল, নিচে এসো, কড়া করে দু' কাপ চা বানিয়েছি, খেলেই চাঙা হয়ে উঠবে।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অগত্যা পরীরাণীও অনুসবণ করল তাকে।...এক পেয়ালা চা এখন ভালই লাগবে বটে।

নামতে নামতে শেখর ভাদুড়ী বলল, এসেই শুনলাম মা আবার পাড়ায় কোথায় নাম গান শুনতে গেছে। কোথায় নিজে চা করে আমাকে ডাকবে, না উল্টো হল।

এই দুর্যোগের মধ্যে মা ঘরে নেই বলেও ছেলের এতটুকু উতলা মুখ দেখল না পরীরাণী। মাস্টারমশাই তো এতক্ষণে নিশ্চয় আহ্নিকে বসে গেছেন। ভাবল, বেশ নিশ্চিন্তই থাকতে পারে এরা। অথচ এরই মধ্যে দাদার কথা কতবার ভেবেছে পরীরাণী ঠিক নেই; মনে হয়েছে দাদা ঘরে ফিরলে বাঁচে।

চায়েব পেয়ালা এগিয়ে দেবার আগে শেখর ভাদুড়ী এক গেলাস জল ওর সামনে ধরল।—ওই জানালার সামনে গিয়ে আগে চোখে-মুখে জল দিয়ে নাও, না কি সে-ও আমাকে কবে দিতে হবে?

গলার স্বরে পলকা গাম্ভীর্য। অন্য দিন হলে পরীরাণী ভিতরে ভিতরে খুশি হত কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ যেন স্নায়ুগুলো এখনো বশে নেই তার।

চা খাওয়া শেষ হতেও শেখর ভাদুড়ী উঠতে দিল না ওকে। বলল, বোসো, তাড়া কি। সেদিন মিটিং না হওয়াতে কত কাজ বেড়ে গেল, পরদিন কি করতে হবে না হবে সে-আলোচনায় মগ্ন হল সে।

কথাব মাঝে বাধা দিয়ে পরীরাণী বলল, আজ ও-সব কিছু আর মাথায় ঢুকছে না, কেবল ওই ছেলে-তিনটের কথা মনে পড়ছে, মা-গো...কিভাবে পড়ল! সর্বাঙ্গে ভয়ার্ত শিহরণ একটা।

শেখর ভাদুড়ী সঙ্গে সঙ্গে বিবক্ত। ছাড়ো তো! এ-দেশের অর্ধেক ছেলে ওইভাবে মরার জন্যে জন্মায়, বুঝলে? অত ভাবতে বসলে চলে না—

পরীরাণী যেন ভিতরে ভিতরে ধাক্কাই খেল একটা। অনেকদিন আগের বিস্ময়-মেশানো একটা চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে গেল আবার।...মানুষের ভালো করার জন্য যার এত চিন্তা, এত উদ্দীপনা, মানুষ সম্পর্কে সে-ই আবার এমন নির্লিপ্ত উদাসীন হয় কি করে? চোখাচোখি হতে এবারে হঠাৎ তার মনে হল ওই দুটো চোখ থেকে থেকে অনেকবার ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ দেখেছে।...কাঁধ জড়িয়ে ধরে দেড় মাইল পথ হাঁটার ব্যাপারটাও মনে পড়ল।...তার পরেও ছাড়তে চায়নি। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিকর অনুভূতি একটা। মনে হল, পথের ওই দুর্যোগের দরুন লোকটা অখুশি নয়, এমন কি মা বাড়ি নেই বলেও নয়—বাড়ি নেই বলেই নিজের হাতে চা করে ওকে ঘর থেকে ডেকে এনেছে, আর এই সব কাজের কথা বলছে ওকে সামনে বসিয়ে রাখতে চান বলেই।

পরীরাণী উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, আজ কিচ্ছু ভালো লাগছে না, কাল

শুনব, এর ওপর এখন গিয়ে আবার রান্না চড়াতে হবে—

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পরীরাণীর হঠাৎ নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে কেন জানে না।

দুদিন না যেতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সঙ্গোপন খুশির প্রতিক্রিয়াও বলা যেতে পারে। ...ওই একজনের ও-রকম প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা অবাঞ্ছিত নয় আদৌ। গুলী-খাওয়া ছেলে তিনটের সেই বীভৎস দুর্দশা দেখে আসলে মাথাটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেছল পরীরাণীর।

এ-দিকে দাদার হঠাৎ কি-রকম একটু পরিবর্তন দেখছে। প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফেরে। নেশা করেই না বলতে গেলে। অন্যের সঙ্গে ছেড়ে বীরুমামুর সঙ্গেও বাক্যালাপ শোনে না বড়। মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি খরখরে। হাব-ভাব অসহিষ্ণু। নিজের মনে চুপচাপ ভাবে কি, ভাবনার ব্যাঘাত ঘটালে অকারণে তেড়ে আসে। প্রায়ই দুটো একটা টাকা চাইত ওর কাছে, ইদানীং তাও চায় না।

বিকেলের দিকে সেদিন নিচের তলায় বসে কাজের কথাই হচ্ছিল শেখর ভাদুড়ীর সঙ্গে। শিগগীরই পনের দিনের জন্য উত্তর বাংলায় সফরে বেরুতে হবে তার সঙ্গে। পনের দিনের বেশিও লাগতে পারে, কারণ একজন শাঁসালো মক্কেলের সন্ধান পাওয়া গেছে সেখানে।...ভদ্রলোক বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। নাম নয়ন চৌধুরী। অঢেল টাকা তার। হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। ওদিকে শিক্ষানুরাগীও। কারণ তাঁর বাপের তৈরি মায়ের নামের ইস্কুলটাতে বছর গেলে প্রচুর টাকা ঢালেন তিনি। সেখানকার একজন পরিচিত কর্মী শেখর ভাদুড়ীকে চিঠি লিখে জানিয়েছে ভদ্রলোকটিকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বশ করতে পারলে সঙ্ঘের কি পরিমাণ লাভ হতে পারে সেটা কল্পনার বিষয়। মোট কথা এদিকের অর্গানাইজেশনে এসে সর্বাধিনায়কটি যদি ওই খামখেয়ালী ভদ্রলোককে একবার বাজিয়ে দেখে যায় তো সব থেকে ভালো হয়।

চিঠি পড়েই উত্তেজনায় শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠেছিল শেখর ভাদুড়ীর। ভদ্রলোকের মায়ের নামে স্কুল যখন একটা আছে আর সে-স্কুলের ওপর ওই টাকাওয়ালার টানও আছে যখন, আধা-আধি রাস্তা পেয়েই গেছে। এর পরেও অমন লোককে বাগে আনতে না পারার মতো আত্মবিশ্বাসের অভাব শেখর ভাদুড়ীর অন্তত নেই।

উত্তর বাংলার ওই আসন্ন সফর সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছিল।

পরীরাণীর হঠাৎ মনে হল বাইরে থেকে দাদার নাম ধরে ডাকছে কেউ। উঠে দেখতে এলো। পর মুহূর্তে দু'চোখ নিষ্পলক কঠিন।

দাদাকে ডাকছে বসন্ত সরখেল।

ওকে নিচের এই ঘর থেকে বেরুতে দেখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সে-ও। সমস্ত মুখে ঈর্ষার কালো ছায়া। কিছু একটা কটূক্তি করে ওঠার মতো হাব-ভাব। তা না করে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, পরিতোষ আছে?

স্পষ্ট ঝাঁঝে পরীরাণী জবাব দিল, নেই। ফিরে চলল।

—শোন!

পরীরাণী ঘুরে দাঁড়াল। এ-ভাবে ডাকার দিন গেছে বুঝিয়ে দেবার ইচ্ছে।

তার আগে বসন্ত সরখেল বলল, এ শর্মা কারো দেমাকের ধার ধারে না। পরিতোষ এলে জানাতে হবে আমি এসেছিলাম, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।

আক্রোশটা পায়ের নিচের মাটির ওপর ফলাতে ফলাতে প্রস্থান করল বসন্ত সরখেল। পরীরাণী নিষ্ফল রাগে চেয়ে রইল খানিক। এই ক'মাসে মনের দিক থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ে উঠে এসেছে বলেই এই সংস্রব আরো যেন অবাঞ্ছিত।

দিন তিনেক পরের কথা। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর পরীরাণী ট্রাঙ্ক গোছাতে বসেছিল। কালকের দিনটা কাটলে পরশু বেরিয়ে পড়তে হবে। দিনে ট্রাঙ্ক গোছানোর সময় হয় না বড়।

দাদা বাড়ি নেই। তার জন্যেও অপেক্ষা করতে হবে। শুধু শুধু বসে না থেকে কাজ সেরে রাখছিল।

বিড়ি ফেলে বীরুমামু দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দু'দিন আগেই পরীরাণী তাকে বিড়ি হাতে ওর ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছিল।

বীরুমামু ভিতরে ভিতরে যে ওর ওপর তুষ্ট নয় একটুও সেটা অনায়াসে বুঝতে পারে। দাদার সঙ্গেও কি-যেন একটা ঠাণ্ডা রেষারেষি চলেছে তার।

পরীরাণী মুখ তুলে তাকাতে বীরুমামু বলল, তোর সঙ্গে দরকারী কথা ছিল কিছু, শোনার সময় হবে?

বিরক্তি চেপে পরীরাণী জিজ্ঞাসু নেত্রেই তাকালো। দরকারী কথা মানেই দাদার কথা। দাদার সম্পর্কে কি একটা অগোচরের শঙ্কা থিতিয়েই আছে মনের তলায়।

—পরশু তোর যাওয়া ঠিক?

পরীরাণী মাথা নাড়ল, ঠিক।

—ক'দিনের জন্যে?

—পনের বিশ দিনের কম নয়, কেন?

...পরিতোষের সম্পর্কে তোর কিছু জেনে রাখা দরকার, ও বিপদের রাস্তায় এগোচ্ছে, আমি কিছু বলেছি শুনলে ও রেগে যাবে, কিন্তু তোরা যে যা-ই ভাবিস, আমি ওকে ভালবাসি, তাই ওর জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।

ঠাণ্ডা চোখে পরীরাণী খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। অবিশ্বাস হল না।—কি বলবে, বলো—

বীরুমামু বলল, আমার সন্দেহ হচ্ছে সুধীর সান্যালকে ভালো রকমের ঘা দেবার জন্য ও কিছু একটা মতলব আঁটছে।...কিন্তু সুধীর সান্যাল সোজা লোক নয়, পরিতোষ কিছু যদি একটা করেও বসে তাহলেও ধরা পড়বেই আর বিপদেও পড়বেই। থানা পুলিশের ওপর ভদ্রলোকেব অনেকখানি জোর, ইচ্ছে করলেই সে যা-খুশি করতে পারে।

উতলা মুখে পরীরাণী জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সুধীর সান্যালের সঙ্গে দাদা লাগতে যাবে কেন?

দ্বিধা দূর করে বীরুমামু জবাব দিল, লাগতে যাবে। মাখন মজুমদারের বউ শেফালির জন্যে। মাখন মজুমদার খুন হতে সুধীর সান্যাল কড়কড়ে পাঁচশ টাকা দিলে, নিজে শ্মশানে গেল, তারপরেও অনেকবার পরিতোষের হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়েছে, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, তোর দাদাকে বলেছিলামও সেই কথা, শুনে তখন আমাকে এই মারে

তো সেই মারে। পরে আস্তে আস্তে বুঝেছে, আর এখন তো খুব ভালো করেই বুঝছে। টাকা পয়সা সুধীর সান্যাল এখন নিজেই মাখন মজুমদারের মায়ের হাতে দিয়ে আসে, শেফালিকেও আলাদা কিছু দেয় কিনা বলতে পারব না। ওই বুড়ীকে সান্যাল এখন এমন হাত করেছে যে পরিতোষকে দেখলেই সে এখন ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে মারতে আসে। তাছাড়া পরিতোষের সন্দেহ, শেফালিরও হাবভাব বদলাচ্ছে। দাঁত কড়মড় করে পরিতোষ সেদিন আমাকে বলেই ফেলল, ওই সান্যালের মৃত্যুবাণ নাকি ওর হাতে, এমন শিক্ষা দেবে যে চোখ তুলে আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাবে না।

এতগুলো কথা বলার পর বীরুমামু চুপচাপ ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল একটু। তারপর আবার বলল, ওই বসন্ত সরখেল ওকে সাহস যোগাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না...দু'জনেই এক ব্যথার ব্যথী বলে গলায় গলায় ভাব এখন।

শোনামাত্র ঘেন্নায় ভিতরটা রি-রি করে উঠল পরীরাণীর। দুজনেই এক ব্যথার ব্যথী মানে ভালবাসার ব্যথায় ব্যথী দুজনেই। এমন একটা নোংরা ব্যাপারে এ-ভাবে জড়িয়ে পড়েছে বলে দুশ্চিন্তার থেকে দাদার ওপর রাগই বেশি হচ্ছে। রুষ্ট মুখে পরীরাণী বলল, তা আমি এর কি বিহিত করতে পারি?

—আমি জানি না। বীরুমামু সত্যিই চিন্তাচ্ছন্ন।—আমার ভয় ধরেছে বলেই তোকে বললাম সব। শেফালির ওপর তোর দাদার কত টান সুধীর সান্যাল সে-খবর ভালই রাখে ...অমন একটা জাঁদরেল লোকের ক্ষতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে মারের চোটে আধমরা হয়ে ওকে হাজতে পচতে হবে।...কিন্তু কিছু বলতে গেলেও ফিরে মারতে আসে আমাকে।

সেই রাতে দাদার সাক্ষাৎ আর পেলই না পরীরাণী। সন্দেহ, দাদা বসন্ত সরখেলের ডেরায় রাত কাটিয়েছে। পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজে ব্যস্ত ছিল। দুপুরের দিকে দাদাই একবার ধরেছিল ওকে। বলেছিল, গোটা পাঁচেক টাকা দিবি? মুখের দিকে ওকে চেয়ে থাকতে দেখে দাদা চাপা ঝাঝে বলে উঠেছে, দেখছিস কি, ড্রাইভিংটা শিখে চাকরি পেলে তোর সব টাকা কড়াক্রান্তিতে শোধ করে দেব।

পরীরাণী টাকা বার করে দিয়েছে। সেই প্রথম মনে হয়েছে দাদা যেন রোগা হয়ে গেছে একটু। আর চাউনিও খুব স্বাভাবিক নয়, একটা চাপা আক্রোশ যেন ঠেলে বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। টাকা দিয়ে বলেছে, আমি কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছি, রাত্রিতে তাড়াতাড়ি ফিরো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দাদার দু'চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে দেখেছে।

রাতের নিরিবিলিতে দাদাই ওর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি বলবি?

কি বলবে বা কিভাবে বলবে, পরীরাণী জানে না। দুপুরের থেকেও বেশি অসহিষ্ণু মুখ দাদার। পরীরাণী চেয়ে রইল একটু।

—কিছু বলছিস না কেন? ওই বীরুমামু তোর কানে ঢুকিয়েছে কিছু, সেই জন্যেই তোর ভাবনা হয়েছে, কেমন? দাদার গলার স্বর দ্বিগুণ চড়ল হঠাৎ, ওই বীরুমামুকে সাবধান করে দিস, সে যার তেল দিচ্ছে দিক, কারো ব্যাপারে যেন নাক গলাতে না আসে—

পরীরাণীর মনে হল দাদা রাগে কাঁপছে। ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা করল, তা না হয় করব, কিন্তু তোমাকে সাবধান করবে কে?

জ্বলন্ত আক্রোশের মুখেই দাদার গলার স্বর নেমে গেল। কাছে এসে হিসহিস করে বলল, আমাকে সাবধান করতে হলে তাকে ফিরে আবার জন্মাতে হবে, ওই সুধীর সান্যালকে আমি শিক্ষা দিতে না পারি তো আমাকে কুকুর বলিস, আজ সে গলায় হাত দিয়ে অপমান করেছে আমাকে...

আরো কি বলার মুখে থমকে থেমে গেল। চাউনি আরো ঘোরালো ধারালো হয়ে উঠল।—তোকে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে কে বলেছে, নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও, আমার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না—সমস্ত ভদ্দরলোককে আমার চেনা হয়ে গেছে, বুঝলি? ও এসেছে আমাকে সাবধান করতে—

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর মুহূর্তের মধ্যে বিতৃষ্ণায় ভিতরটা ছেয়ে গেল পরীরাণীর। দাদার শেষের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সমস্ত ভদ্রলোককে চেনা হয়ে গেছে বলে উল্টে ওকেই যেন চাবুক হেনে গেল একটা।...এত ভাব এখন যে বসন্ত সরখেলের জন্য দরদ উথলে উঠেছে বলেই হয়তো এ-রকম হীন উক্তিও মুখে আটকালো না।

যা খুশি হোক, যা খুশি হোক, এদের জন্যে ভাবা মিথ্যে।

✦

উত্তর বাংলার সফর দু'সপ্তাহ গিয়ে তৃতীয় সপ্তাহও পার হতে চলল। কিন্তু শেখর ভাদুড়ীর ফেরার নাম নেই। তার হাবভাব দেখলে মনে হয় আপাতত এখানেই সে ঘাঁটি নিয়ে বসেছে। তার অসহিষ্ণু অথচ সঙ্কল্পবদ্ধ মুখের দিকে তাকালে পরীরাণী ইদানীং অস্বস্তি বোধ করে কেমন। তিন সপ্তাহ পার হবার মুখে বারকয়েক ফেরার কথা বলাতে পরীরাণী তাড়াই খেয়েছে। শেখর ভাদুড়ী বলেছে, এখানে কি হাওয়া খেতে বসে আছি নাকি আমরা, কাজ হচ্ছে কিনা দেখতে পাচ্ছ না?

সংগঠনের কাজ ভালই হয়েছে এদিকে এসে, সন্দেহ নেই। এর আগে মাত্র দুদিনের জন্য শেখর ভাদুড়ী একবার উত্তর বাংলায় এসেছিল। কিন্তু কাজে নামলে এতবড় এলাকার কাজ সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। জলপাইগুড়কে কেন্দ্র করে এর মধ্যে বহু জায়গায় ঘুরেছে তারা। জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, এমন কি বাস-এ করে কুচবিহারেও এবারের সংগঠন প্রসারিত হয়েছে। আর, সর্বত্র আশাতীত সাড়া যে মিলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় প্রতিটি স্কুলের চার ভাগের তিন ভাগ শিক্ষক সাগ্রহে হাত মিলিয়েছে ওদের সঙ্গে।

অথচ শেখর ভাদুড়ীর ক্ষোভ বাড়ছে, অসহিষ্ণুতা বাড়ছে।

তার একমাত্র কারণ, পরীরাণী মানে সব থেকে বড় যে আশার আলোটা কল্পনায় শেখর ভাদুড়ী চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে দেখছে, বাস্তবে তাতে কোনরকম শিখার আঁচ লাগছে না।

সেই আশার আলো নয়ন চৌধুরীর দাবিদারশূন্য বিত্ত। এই বিত্ত লক্ষ্য করেই কলকাতা থেকে এ-পর্যন্ত ছুটে আসা।

সেই বিত্তের পরিমাণ যে কত সেটা এখানে আসার পর ওরা ভালো করে জেনেছে। এখানকার কর্মীর চিঠি পেয়ে শেখর ভাদুড়ীর মনে হয়েছিল পাঁচ সাত লক্ষ টাকা হতে পারে। কিন্তু এখানে পদার্পণের দুদিনের মধ্যে জেনেছে, এখানকার সকলের ধারণা কম করে পঁচিশ তিরিশ লক্ষ নগদ টাকাই আছে ভদ্রলোকের। তাছাড়া বাড়ি আছে বহু

জায়গায়। এমন কি তাঁর মায়ের নামে যে স্থানীয় মেয়ে স্কুল, সেই বিরাট দালানেরও একচ্ছত্র মালিক নয়ন চৌধুরী।

এই বিত্তের মূল উৎস গুটি তিনেক চালু চা-বাগানের পৈতৃক অংশ। একটু আধটু অংশ নয়, একটা চা-বাগানের তো প্রায় আধা-আধি মালিকানা ছিল নয়ন চৌধুরীর বাবার। ভাগ্যবানই বলতে হবে নয়ন চৌধুরী মানুষটিকে। ভাগ্য বলতে বিত্ত-প্রাপ্তির ভাগ্য। স্বল্প আয়ুর গুষ্টি নাকি পরিবারটি। সে গল্প নয়ন চৌধুরী নিজেই করেছেন। ওঁদের ঠাকুরদা মারা গেছেন বাহান্ন বছর বয়সে, বাবা ঠিক উনপঞ্চাশে। তিন ভাই ছিলেন নয়নবাবুরা। নয়নবাবু সব থেকে ছোট। বড় দুই ভাই সংসারী হবার আগেই চোখ বুজেছেন। তাঁর বাবা-মা জীবিত তখনো। সব থেকে বড় ভাই মারা গেছেন ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারে। পরের ভাই জিপ অ্যাকসিডেন্টে। বাবা যখন মারা যান নয়ন চৌধুরীর বয়স তখন বাইশ। এর দু' বছর আগেই অর্থাৎ কুড়ি না পুরোতেই তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বড় দুই ভাইয়ের বিয়ে দেওয়ার ফুরসত মেলেনি বলেই বাবা-মা তাঁর বেলায় আর দেরি করেননি। সেই স্ত্রী ভদ্রলোকের জীবনে মাত্র বারোটি বছর বেঁচেছিলেন। অর্থাৎ মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস থেকেই ভদ্রলোক বিপত্নীক। নিঃসন্তান এবং এমন অঢেল সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হয়েও ভদ্রলোক আর কেন বিয়ে করেননি সেটা বিস্ময়করই বটে। কারণ—তখন তাঁর বয়েসটা কি, ওই বয়সের ঢের পরেও তো কত লোক প্রথমবার বিয়ে করে থাকে।

কিন্তু পরে যেটুকু তথ্য আহরণ করেছে শেখর ভাদুড়ী সেটা বরং মোটামুটি এই বিত্তের এবং এই স্বভাবের মানুষের সঙ্গে খাপ খায়। এখানকার অনেকেরই ধারণা বিয়ে নয়ন চৌধুরী আবারও করেছিলেন। সেই রমণী বাঙালী নয়, পাহাড়ী এবং দস্তুরমতো সুশ্রী। মহিলাটি এখানে অর্থাৎ এই শহরে নয়ন চৌধুরীর ঘর কমই করেছে। তবু দুই-একবার তাকে এখানেও দেখেছে কেউ কেউ। তার পাকা ডেরা দার্জিলিং কি কার্সিয়াং কি কালিম্পং-এ ছিল কেউ বলতে পারে না। কারণ ওই তিন জায়গাতেই নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে তাকে বসবাস করতে দেখেছে অনেকে। এই এক রমণীকে নিয়ে এক সময়ে একটা রটনাও বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। যথা ওই পাহাড়ী রমণী ছিল নয়ন চৌধুরীরই চা-বাগানের কোনো শিক্ষিত এবং পদস্থ পাহাড়ী কর্মচারীর ঘরণী। সেই ঘর ভেঙে মহিলা স্বামীর খোদ মালিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

...স্থানীয় লোক জেনেছে বউ-মরা কপাল ভদ্রলোকের। তিন বছর না যেতে সেই শক্ত-সমর্থ রমণীও নাকি কি ব্যাধিতে অকাল-গতা হয়েছে। কিন্তু অনেকে তখন কানাকানি করেছে, ওই তিন বছরেই নাকি পাহাড়িনীর বাঙালী-প্রীতি আর বিত্তের লোভ দুই-ই বিলীন হয়ে গেছে। এই ঘর ভেঙে দিয়ে সে নাকি আবার কোন স্বজাতীয়ের ঘর আলো করতে গেছে। তার মাত্র দিনকয়েক আগে পাহাড়ী রাস্তায় ঝড় বৃষ্টির দরুন ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্টে শয্যাশায়ী ছিলেন নয়ন চৌধুরী। অনেকের বিশ্বাস সেই সময়ে তাঁর পাহাড়ী প্রেয়সী শয্যালগ্ন স্বামীর বেশ মোটা টাকা আত্মসাৎ করেই বিদায় নিয়ে গেছে।

এর মাস ছয়েকের মধ্যে বেশ ভেবেচিন্তে বুদ্ধিমানের মতো একটা কাজ করেছেন নয়ন চৌধুরী। কার জন্যে ব্যবসা, কার জন্যে এত মেহনত? সব ক'টা চা-বাগানের সমস্ত অংশ আর মালিকানা নগদ দামে বেচে দিয়েছেন তিনি। নিজেই কথায় কথায় গল্প করেছেন জলের দরে বেচেও লাখ কুড়ি টাকা হাতে পেয়েছিলেন তখন।

...মনে মনে একটা হিসেব করতে গিয়ে কান মাথা গরম হয়েছে শেখর ভাদুড়ীর। পঁয়তিরিশ বছর বয়সে পাওয়া শুধু ওই কুড়ি লাখ টাকাই এই উনিশ বছরে সুদে আসলে কত দাঁড়াতে পারে! নব উত্তেজনায় তাকে সেই হিসেব করতে দেখে পরীরাণী হেসেই ফেলেছিল।

নয়ন চৌধুরীর বয়স এখন চুয়ান্ন। একটু খাটোর ওপর মোটাসোটা মানুষ। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। এমনি দেখলে বোঝা যায় না এতবড় বৈভবের অধিপতি তিনি। প্রাসাদের মতো বাড়ি আর দু'খানা ঝকঝকে গাড়ির আওতার বাইরে তাঁকে সাদা-সিধে চালচলনের মানুষ মনে হয়। সদালাপী এবং তাঁর আচার-ব্যবহারও সদাশয়। গল্প করতে বসলে সহজে ছাড়তে চান না, আর তাঁর দরাজ আতিথেয়তা দেখেও শেখর ভাদুড়ী গোড়া থেকেই একটা বড় রকমের আশা পোষণ করছে। মানুষটি সঙ্গী পেলে কথা বলেন বেশ, কিন্তু মৃদুভাষী। তার একটা কারণ সম্ভবত সমস্ত রকমের উত্তেজনা পরিহার করে চলার ব্যাপারে প্রায় অভ্যস্ত এখন। কারণ, এরই মধ্যে অর্থাৎ বছর পাঁচেক আগে বড় রকমের স্ট্রোক হয়ে গেছে একটা। তারপর দু'বছর আগেও আর একটা স্ট্রোক হব-হব হয়েছিল। এর পরের দফা আক্রান্ত হলে যে চোখ উল্টে দিতে হবে সেটা তিনি নিজেও জানেন এবং নিজেই বলেন সে-কথা। বছরের পর বছর নিয়মিত ব্লাড-প্রেসারের ওষুধ খেয়ে চলেছেন, তা সত্ত্বেও রক্তের চাপ সর্বদাই তুঙ্গে চড়ে আছে। কিন্তু কখন অঘটন ঘটে তা নিয়ে তেমন দুর্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সেদিনও শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিলেন, আমার আবার শরীর, হিসেবের খাতায় নাম লেখাই আছে—ওভারড্রাফট এর ওপর চলছে।

সব কথাতেই ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি হাসেন বেশ।

আট দশ দিন না যেতে তো ভদ্রলোকের দস্তুরমত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ওরা। প্রথম আলাপেই হেসে বলেছিলেন, আমার মেয়ে-স্কুলের টিচারদের বিগড়ে দিতে এসেছেন শুনলাম?

কিভাবে বিগড়ে দিতে এসেছে শেখর ভাদুড়ী সেটা সমস্ত আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে বুঝিয়েছে তাকে। একদিনে না হোক, দিন কয়েকের চেষ্টার পব ভদ্রলোক মন দিয়েই শুনেছেন আর সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেছেনও। ব্যবসাদার মানুষ ছিলেন, না বোঝার কিছু নেই। শেষে হেসে তারিফও করেছেন, ভালো প্ল্যান, আপনার মাথা আছে বটে।

এত করে বোঝাবার শোনাবার পরে আর অন্তরঙ্গতা গোড়ার দিকের থেকে চারগুণ বেড়ে ওঠার পরেও এই মানুষকে ঘায়েল করে উঠতে পারা গেল না এই তিন সপ্তাহেও, শেখর ভাদুড়ীর মেজাজ ঠিক থাকে কি করে? এক-একদিন তো তাঁর সদয় কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে অভাবিত অঙ্কের একটা চেক এই বুঝি লিখেই বসলেন। ডোনেশানের কথা তুলতে ছদ্ম ত্রাসে প্রথম তো আঁতকেই উঠেছিলেন, তারপর সদয় হেসে বলেছিলেন, দেখি কি করতে পারি।

শেখর ভাদুড়ী তাঁকে বলেছে, আপনি বাংলা দেশের সমস্ত শিক্ষকদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারেন, শিক্ষক-জগতের কাছে চিরকালের মতো আপনার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে—তাঁরা নিজেদের বাবার নামের আগে আপনার নাম নেবে। তাছাড়া আপনার নামে আমরা একটা জার্নাল করব, আমাদের কাছে আপনি বরাবর বেঁচে

থাকবেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষকদের জীবনের হাল যদি আপনি ফিরিয়ে দেন, দেশের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাও অন্য হাওয়ায় বইবে—দশ বছর বাদে দেশের চেহারাই বদলে যাবে এ-প্রতিশ্রুতির শপথ আপনার কাছে নেব আমরা।

ঘাবড়ে যাবার মুখ করে ভদ্রলোক বলেছেন, থামো থামো, এমনিতেই ব্লাড-প্রেসার বেশি আমার, তোমার পাল্লায় পড়ে আরো চড়ে যাচ্ছে। সাত আট দিনের মধ্যেই ভদ্রলোক আপনি থেকে তুমিতে এসে গেছেন।

পরোক্ষভাবে নয়ন চৌধুরী এরই মধ্যে সাহায্য যে অনেক করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটা গাড়ি তো বলতে গেলে তাদেরই ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। সেই গাড়িতে তারা দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং এমনকি কুচবিহারের কাজ পর্যন্ত সেরে এসেছে। এখানে কাছে দূরে সর্বত্র তাঁর গাড়িতেই টহল দিচ্ছে। গোড়ার দিকে বাসে কেবলমাত্র পশ্চিম দিনাজপুরে গেছল। এখানকার বিশিষ্ট লোকদের কাছে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সহায়তায় কম করে চারজন শাঁসালো ধনী বন্ধুর কাছ থেকে যে ডোনেশান পাওয়া গেছে অন্যত্র সেটা পেলে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবত শেখর ভাদুড়ী। কিন্তু যে আশার আলোয় তার মনের আকাশ জ্বলজ্বল করছে সে তুলনায় এইসব প্রাপ্তি খুদ-কুঁড়োর সামিল।

দরাজ মনে ওদের এখানে থাকার সুব্যবস্থাও নয়ন চৌধুরীই করে দিয়েছেন। প্রথমে নিজের প্রাসাদের একটা অংশ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরীরাণীর চোখে শঙ্কার ছায়া দেখে শেখর ভাদুড়ী ইচ্ছা সত্ত্বেও সে-ব্যবস্থায় রাজী হয়নি। এতবড় একটা বাড়ির এক বিচ্ছিন্ন অংশে ওরা দুজনেই বা থাকে কি করে। তাদের এখানকার কর্মী শিক্ষক তার নিজের বাড়িতে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তারও দরকার হল না। নয়ন চৌধুরী তার থেকে ঢের ভালো ব্যবস্থাই করে দিলেন। নিজে সঙ্গে করে ওদেব নিয়ে এলেন তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে। ছিমছাম একটা ছোট বাড়ি দুটো ফ্ল্যাটে ভাগ করা। প্রধান শিক্ষয়িত্রী আর সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ওই ফ্ল্যাট দুটি। তিনখানা করে ঘর, সবটাই স্কুলের অর্থাৎ নয়ন চৌধুরীর সম্পত্তি। কিন্তু সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী যিনি, তাঁব নিজের বসত-বাড়ী আছে এখানে, তাই সামান্য ভাড়া হলেও তিনি নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে থাকেন না।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নাম মীনাক্ষী নন্দী, বছর পঁয়তাল্লিশ বড় জোর বয়েস, সুশ্রী কিন্তু একটু বেশি গম্ভীর। সেটা স্বভাবের দরুন কি পদমর্যাদার দরুন বোঝা যায় না। অবিবাহিত কি বিধবা তাও গোড়ার দিকে জানা যায়নি। পরীরাণী পরে জেনেছে ভদ্রমহিলা কোনদিন বিয়েই করেননি। মনে মনে অন্তত পরীরাণীর সেজন্য মহিলার সম্পর্কে একটু কৌতূহল ছিল। বাড়ি থেকে গজ পঁচিশ-তিরিশ দূরে আরো দুটো ঘর। স্কুলের মালী আর দরোয়ান থাকে সে দুটোতে। দরোয়ানটা রান্নায় পটু, মীনাক্ষী নন্দীর রান্নাও সে-ই করে থাকে।

বাড়ির খালি অংশের তিনখানা ঘরের একটাতে শেখর ভাদুড়ীর থাকা ঠিক হল। পরীরাণী থাকবে ওদিকের অংশে অর্থাৎ হেড-মিসট্রেসের অংশে, তাঁর সঙ্গে। খোদমালিকের অনুরোধে তাদের খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধানের ভারও মীনাক্ষী নন্দী সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করলেন মনে হল।

নয়ন চৌধুরীর কথাবার্তা মৃদু কোমল বটে কিন্তু পরিষ্কার। সোজাসুজি বলে দিলেন,

এঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন, আমাদের অতিথি, কোনরকম অসুবিধা না হয় একটু লক্ষ্য রেখো। এঁদের জন্যে স্কুলের কোনো বেয়ারাকেও এনে রাখতে পারো—তোমার সঙ্গে ওদের রান্নাও হীরাই করবে, খরচ সব আমার।

হেড-মিস্ট্রেস মীনাক্ষী নন্দী হাসি-হাসি মুখ করেই সায় দিয়েছেন। না, পরেও মহিলার আতিথ্যে কোনরকম ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখেনি ওরা। শিক্ষিতা তো বটেই, দস্তুরমত মার্জিতরুচিসম্পন্নাও বটে। কিন্তু লক্ষ্য করার মতই স্বল্পভাষিণী। কাছে থাকলেও মনে হয় সর্বদাই একটা ব্যবধানের গণ্ডীর মধ্যে বাস ওঁর।

সব কিছুই মনের মতো হয়েছে এ-যাবৎ, কেবল আসল উদ্দেশ্যসিদ্ধিটুকু ছাড়া। আর সেটা হচ্ছে না বলেই দিনকে দিন সহিষ্ণুতা কমছে শেখর ভাদুড়ীর। ওই এক ব্যাপারে বিফলমনোরথ হলে সেটা একেবারে তীরে এসে তরী ডোবার মতই মর্মান্তিক হবে। শেখর ভাদুড়ীর কাছে তো বটেই, অনেকটা পরীরাণীর কাছেও।

পরীরাণীর চোখে বিত্তশালী নয়ন চৌধুরী ধনকুবের বিশেষ। মানুষটাকে প্রথম থেকেই একটু বিচিত্র ধরনের মনে হয়েছিল তারও। তাঁকে দেখে আর এক বিচিত্র মানুষের মুখ মনে পড়েছে ওর। মায়ের ক্লাবের বন্ধু অসীম ঘোষ—মা যার কাছে ওকে চাকরির তদবিরে পাঠিয়েছিল। এতটা না হলেও সে-ও বড়লোক, অকৃতদার, আর মদ যে কত খায় সে তো নিজের চোখেই দেখেছে। কিন্তু ক্রমশ মনে হয়েছে, দুটো খেয়ালী মানুষের মধ্যে অনেক তফাত। অসীম ঘোষের ভোগ আর দাক্ষিণ্য দুই-ই পুরুষকারের প্রতীক। পরীরাণীর মনে আজও সে শ্রদ্ধার আসনে বসে আছে। নয়ন চৌধুরীও ভোগী, কিন্তু তার দাক্ষিণ্য যেন পুরুষাকারে স্বতোৎসারিত নয়। সেটা যেন তিনি টোপের মতো ব্যবহার করে আত্মতুষ্টিতে মগ্ন হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য, দুজনের বয়েসের তফাত অনেক, ওই একজন যৌবন ধর্মে এখনো বেপরোয়া হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, আর এই একজনের যৌবন গত, হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। মৃত্যু তাঁর ওপর থাবা বসিয়ে হার মেনেছে বটে কিন্তু সে যে থাবা উঁচিয়েই আছে সে-সম্পর্কে নিজেই সর্বদা সচেতন তিনি।...তবু এই লোকের হাসি-মাখা চাউনির মধ্যে এক ধরনের আসক্তি চোখে পড়ে যেটা পরীরাণীর অন্তত ভয়ানক অস্বস্তির কারণ। মৃত্যুর থাবা তাঁকে সংযত করছে বটে, কিন্তু আসল সংযম যেন ভিন্ন বস্তু।

মেয়েদের প্রতি তাঁর এক ধরনের দুর্বলতার আভাস শেখর ভাদুড়ীও টের না পেয়েছে এমন নয়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি হাসি-ঠাট্টায় সেটা কৌতুকের বস্তু হয়ে উঠেছে। অন্তরঙ্গতার মধ্য পর্যায়ে শেখর ভাদুড়ী নিজেই বলেছে, ব্যাটা শ্মশানে এক পা বাড়িয়ে বসে থাকলে হবে কি, রসকষ আছে এখনো। গত দু'দিন তোমাকে না দেখে দশবার করে তোমার খবর করেছে, আর কোনো আলোচনাতেই মন বসাতে পারেনি। তোমার শরীর ভালো আছে কিনা, এখানে তোমার কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা সে-চিন্তায় অস্থির একেবারে।

ছদ্ম কোপে পরীরাণী বলেছে, এবার কোনদিন আমি গেলে ঠিক ওকে মেসোমশাই কি কাকাবাবু একটা কিছু ডেকে বসব।

শোনামাত্র শেখর ভাদুড়ীও সন্ত্রস্ত যেন, খবরদার! উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগে অমন কম্মও কোরো না, পরে তুমি কাকাবাবু ছেড়ে ঠাকুরদা বললেও আপত্তি করব না।

এই গোছের কথাবার্তার ফলে পরে ভদ্রলোকের একটু-আধটু দুর্বলতার আভাস পেলেও নিজেদের মধ্যে ওরা তাই নিয়ে খোলাখুলি হাসাহাসির রসদ পেয়েছে। পরীরাণী কিছু বললে সমনোযোগে ওর মুখের দিকে চেয়ে নয়ন চৌধুরী সাগ্রহে শোনেন। শিক্ষকজগতের স্কীম নিয়ে আরো অনেক আলোচনা হয়েছে—বলতে গেলে পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি। ফাঁক পেলেই শেখর ভাদুড়ী গম্ভীর মুখে পরীরাণীকে এগিয়ে দেয়, বলে, তুমি তো এসব নিয়ে আমার থেকে ঢের বেশি ভাবো—তুমি বুঝিয়ে বলো না ওঁকে।

অগত্যা পরীরাণীকেই কাণ্ডারীর ভূমিকা নিতে হয়, নয়ন চৌধুরী মৃদু মৃদু হাসেন, আর মুগ্ধ বিস্ময়েই যেন কিছু নতুন আলোর সন্ধান পান। শোনার পর সায় দেন, তারিফও করেন।

...সেদিনও বড়সড় একটা বক্তৃতার পুনরুক্তি করে উঠল পরীরাণী। এক সঙ্গে অত কথা বলার ফলে হাঁপ ধরার দাখিল। যে-রকম আগ্রহ নিয়ে শুনলেন ভদ্রলোক, এর পর ড্রয়ার থেকে চেক বই বার করলেও দু'জনের কেউ খুব একটা অবাক হত না। মনে মনে এই লোককে বশ করার একটা ঝোঁক পরীরাণীকেও পেয়ে বসেছিল তখনকার মতো। বক্তৃতায় নতুন কথা খুব একটা না থাকলেও নতুন ঢং-এ বক্তব্যটা বিস্তৃত করে উপসংহারে আবেদনের ধাক্কাটা জোরালো করে তুলতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, বাড়ি ঘর আত্মীয় পরিজন ছেড়ে এই যে বাউণ্ডুলেব মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা, এর পরেও আপনাদের সাড়া না পেলে ঠিক বিবাগী হয়ে যাব বলে দিলাম।

...কথার মাঝে বা শেষে আজকাল এই গোছের রসালো অনুপ্রাসও জুড়ে দিতে শিখেছে পরীরাণী।

অপলক চোখে ওর দিকে চেয়ে থেকে নয়ন চৌধুরী একাগ্র মনোযোগে শুনেছেন। কান জুড়োবার তৃপ্তিতে ঠোঁটের হাসিটুকু সমস্ত মুখে ছড়িয়েছে। তারপর বেল টিপে চাকরকে ডেকে ফ্রীজের আইসক্রিম আনতে হুকুম করেছেন। চাকর চলে যেতে পরীরাণীর দিকে চোখ তুলেছেন আবার। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটিফুটি করেছে।—দুজনে একসঙ্গে বিবাগী হতে পারলে যা আশা করছ সেই লাভটা কি তার থেকে কম?

থতমত খেয়ে পরীরাণী লজ্জায় রাঙিয়ে উঠেছে, আর সেটুকুও যেন খুশি চিত্তে উপভোগ করেছেন ভদ্রলোক।

চেক বই বার করতে না পারলেও লোকটার মেজাজ দেখে আশান্বিত হয়েছে শেখর ভাদুড়ী। বাইরে বেরিয়ে বলেছে, ভদ্রলোককে তুমিই শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করতে পারবে মনে হচ্ছে, সারাক্ষণ যে-ভাবে তোমাকে দেখছিল আর তোমার কথা শুনছিল, আমি ভাবছিলাম আজই কেল্লা ফতে। সেল্‌সম্যান-শিপটা তুমি আর একটু ভালো করে রপ্ত করতে পারলেই—

পরীরাণী রাগ করে বলে উঠেছে, আমি আর যাবই না ওঁর কাছে।

শেখর ভাদুড়ী হাসি চেপে গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, এ-রকম নখদন্তশূন্য বাঘের সঙ্গে গলাগলি করেও যদি কার্য উদ্ধার করতে পারো আমার তাতে আপত্তি হবে না।

...এবারের সফরে নিজের আর ওই শেখর ভাদুড়ীর আরো একটা সহজ পরিবর্তন পরীরাণী অন্তত সপুলকে অনুভব করছে। এবারে যেন দুজনে আরো অনেক কাছাকাছি

এসে গেছে। একজনকে ছেড়ে ভবিষ্যতে আর একজনের যে চলতে পারে না, এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওর সাজপোশাকের ব্যাপারটুকু সে প্রকাশ্যেই লক্ষ্য করে আর সরস মন্তব্যও করে তাই নিয়ে। কাজের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের মধ্যে কখনো বা ওই লোকের দু'চোখ উৎসুক হয়ে উঠতে দেখে। ভালো লাগে আবার লজ্জাও পায়। কুচবিহার থেকে ফেরার পথে সে-দিন কি কাণ্ডই হল। বাংলা অক্ষরজ্ঞানশূন্য নেপালী ড্রাইভার বেশ জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিল। সবে তখন সন্ধ্যা পার হয়েছে, নির্জন পথ। তার আগে অনেকবার পাশের লোক আড়ে আড়ে লক্ষ্য করেছে ওকে। পরীরাণীর দুই গালে তাইতেই লালের ছোপ লাগার দাখিল। সন্ধ্যা হয়ে আসতে হাঁপ ফেলে বাঁচল যেন। কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া খেল এক প্রস্থ। গলা খাটো করে শেখর ভাদুড়ী বলল, একেবারে দরজায় লেগে বসে আছ কেন, আমি কি অচ্ছুত নাকি! এ-দিকে সরে এসো না...

যত লজ্জাই পাক, পরীরাণী ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে না তাকিয়ে পারেনি। পরে স্বাভাবিক হবার তাড়নায় হেসেই বলেছে, এখানকার কাজ ভালো হওয়ায় আপনার মেজাজও খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে।

শেখর ভাদুড়ী হেসে তেমনি চাপা স্বরে জবাব দিয়েছে, মেজাজ সে-জন্যে ভালো কি কি-জন্যে কে জানে...হঠাৎ সেদিন লক্ষ্য করলাম তোমার চেহারাখানা যেন দিনকে দিন ভালো হচ্ছে।

পরীরাণীর যে কি মনের অবস্থা সেদিন। তবু চেষ্টা করে সহজ কৌতুকের সুরেই টিপ্পনী কেটেছে, আপনার চোখ বদলাচ্ছে।

শেখর ভাদুড়ী হাসি মুখেই সায় দিয়েছে, সেটাও ঠিক, আর আমি যা বললাম তাও ঠিক। এবারে বাড়ি গিয়ে মায়ের সঙ্গে একটা বড় রকমের বোঝা-পড়া না করে ফেললেই নয় ভেবে ভাবনা ধরছে।

আবছা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না বলে রক্ষা, পরীরাণীর সমস্ত মুখ রাঙিয়েই উঠেছিল। পরক্ষণে আরো সচকিত, পাশের লোক এক-হাত প্রমাণ ব্যবধানটুকু আধহাতেরও বেশি কমিয়ে আনল। তারপর ওর হাঁটুর ওপরের হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিল।

পরীরাণী সভয়ে সামনের দিকে অর্থাৎ ড্রাইভারের দিকে তাকালো। আরো মজা পেয়ে শেখর ভাদুড়ী আশ্বাস দিল যেন, বলল, কিচ্ছু ভাবনা নেই, ও বাংলা এক বর্ণও বোঝে না।

পরীরাণী বলে ফেলল, বাংলা না বুঝুক, এটা তো বোঝে—।

শেখর ভাদুড়ী একটু শব্দ করেই হেসে উঠেছিল। ওর হাতের ওপর আরো ভালো করে দখল নিয়ে বলেছিল, হাত ধরাটা ও দেখতে পাচ্ছে না, কাছে আসাটা বোঝে বলছ?

পরীরাণীর ঘেমে ওঠার দাখিল। শেখর ভাদুড়ী তেমনি চাপা হাল্কা সুরে আবার বলেছিল, ওর মনিব চৌধুরী মশাইর মতই যদি রসিক হয় লোকটা তাহলে এটুকু বোঝার জন্যে ওর মেজাজ শরিফ হবার কথা।

সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে পরীরাণী পাল্টা জবাব দিয়েছে, যে জোরে চালাচ্ছে এর ওপর মেজাজ শরিফ হলে অ্যাকসিডেন্ট করে বসতে পারে।

ওই একটা দিনের স্মৃতি পরীরাণীর বুকের তলার কোন পুঁজিতে যেন সঙ্গোপনে

জমা হয়ে আছে। তার স্বাদ ভোলবার নয়। তার ফলে এই লোকের সামনে তার চাল-চলন কথাবার্তা আগের থেকে চতুর্গুন সহজ হয়ে উঠেছে। এরও একটা লোভনীয় ছটা যে ওই লোকের চোখে ধরা পড়েছে তাও অনায়াসে বুঝতে পারে।

কিন্তু সতের-আঠারো দিন পরেও সব থেকে বড় আশার আলোটা ঝলসে ওঠার লক্ষণ না দেখে শেখর ভাদুড়ীর মেজাজ তেমন ঠাণ্ডা থাকছে না। ইদানীং প্রায়ই নয়ন চৌধুরীর সম্পর্কে কটুকাটব্য করে, বলে, লোকটা যেমন ধুরন্ধর তেমনি গেঁতো—আধখানা যমের মুঠোয় চলে গেছে জেনেও নিজের মুঠো ঢিলে করতে চায় না।

নিরীহ মুখে পরীরাণী সেদিন নিজেই উসকানি দিল, আমি চেষ্টা করে দেখব ঢিলে করা যায় কি না।

শেখর ভাদুড়ীও হেসে ফেলেছে, তারপরে বিরক্ত।—চেষ্টা করে দেখ না, পারলে তোমাকে কাঁধে তুলে নাচব।

নিজের জিভের ডগায় যে সরস ধার কিছু আছে, এ কি পরীরাণী নিজেই জানত এতদিন! আলতো করে বলে বসেছিল, শেষে দক্ষ যজ্ঞের সতীর দশা হবে না তো আমার!

ওই এক কথায় এই লোকের চোখে খুশির আমেজ দেখেছে।...একটু আধটু লোভেরও কি? মনে হওয়া মাত্র নিজেকেই সকোপে চোখ রাঙাতে চেষ্টা করেছে পরীরাণী।

কাজের ব্যাপারে সাড়া নেই, অথচ রোজই ওদের নিয়ে গাড়িতে বেড়িয়ে আনার বদান্যতা আছে নয়ন চৌধুরীর। বিকেলের দিকে তাঁর গাড়ি আসে। শেখর ভাদুড়ী তার মধ্যে অনেক দিন ঘরে থাকে না, কাজে বেরোয়। তার সকাল থেকে রাতে শোবার আগে পর্যন্ত কাজ, নয়তো কাজের ভাবনা। তার অনুপস্থিতিতে দিন দুই গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিল পরীরাণী। কিন্তু শেখর ভাদুড়ীর তাতেও বিরক্তি এবং আপত্তি। বলেছে, ডোন্ট বি আনপ্র্যাকটিক্যাল পরী, যতক্ষণ না কাজ হচ্ছে ততক্ষণ এই লোকের সংস্রব আঁকড়ে থাকতেই হবে, এত বড় সুযোগ যদি হাতছাড়া হয় বুঝতে হবে আমরাই অপদার্থ। এর মধ্যে কোন মেয়েলি সংকোচের জায়গা নেই, বুঝলে? ওকে ঘায়েল করতেই হবে, বাই হুক অর ক্রুক—এতবড় মওকা জীবনে বার বার আসে না।

কথাটা যে সত্যি পরীরাণী নিজেও অস্বীকার করতে পারে না। তবু কেন যেন শুনতে ভালো লাগে না খুব।

শেখর ভাদুড়ীর অনুপস্থিতিতে গাড়ি এলে এরপর পরীরাণী একাই বেরিয়ে পড়েছে। হেড-মিসট্রেস মীনাক্ষী নন্দী সেই সময় উপস্থিত থাকলে অবশ্য পরীরাণীর গাড়ি ফিরিয়ে দিতেই ইচ্ছে করে। কি এক সংকোচ যেন ছেঁকে ধরে ওকে। অথচ ভদ্রমহিলা এ-ব্যাপারে একই রকম নির্লিপ্ত উদাসীন। গাড়ি এলো কি এলো না খেয়ালও করেন না অনেক সময়। ...হেড-মিসট্রেস মীনাক্ষী নন্দীর সঙ্গে নয়ন চৌধুরীর কোন দিন কোন বিশেষ যোগাযোগ থাকা সম্ভব কিনা, এ-সম্ভাবনার কথা মনের তলায় কেন যে এক-এক সময় উঁকিঝুঁকি দেয়, পরীরাণী ভেবে পায় না। আবার নিজেরই চপল চিন্তা ভেবে উড়িয়ে দেয় সেটা। অত শিক্ষিত আর অমন গম্ভীর মহিলার সঙ্গে বিশেষ কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয় নয়ন চৌধুরীর মতো মানুষের। মীনাক্ষী নন্দী অবিবাহিতা বলেই হয়তো এ-সব কল্পনা মাথায় আসে। কিন্তু এও আবার মনে হয়, বারো বছর ধরে এই এক স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী

হয়ে আছেন মীনাক্ষী নন্দী, আর তার আগেও বছর চারেক এখানেই সহকারী হেড-মিসট্রেস ছিলেন—বরাবরই মহিলা এমনি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন কি না কে জানে?

শেখর ভাদুড়ীর অনুপস্থিতিতে মাঝে-সাজে নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে একলা বেড়াতে বেরুলে অথবা তাঁর বাড়িতে একলা তাঁর সঙ্গে গল্প করতে বসলে ভদ্রলোক যে একটু বেশিই খুশি হন ইদানীং পরীরাণী তাও অনুভব করতে পারে। কিন্তু এই থেকে নিজের ওপর একটা আশ্চর্য রকমের দখলও নিজেই যেন আবিষ্কার করেছে ও। অবশ্য এ জোরের সমস্ত বাহাদুরীই আর একজনের প্রাপ্য জানে। নিজের দুটো পায়ের ওপর শক্তভাবে দাঁড়ানোর অবস্থা ওই লোকই এনে দিয়েছে। প্রথম দিনের প্রাথমিক সঙ্কোচও ধুয়ে মুছে যেতে সময় লাগেনি, নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করতে করতে প্রায় মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত চলে গেছল। সেখানে চৌধুরী মশাইয়ের এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আর তার ফলে সঙ্ঘের বাণিজ্যও মন্দ হয়নি। নয়ন চৌধুরীর হালকা প্রশ্রয় পেয়ে ওই বন্ধুকে সবিস্তারে ওদের স্কীম বুঝিয়ে ডোনেশানের আবেদন জানিয়েছিল পরীরাণী। জবাবে তিনি পাঁচশ টাকার একখানা চেক লিখে ওর হাতে দিয়েছিল।

ফেরার সময় পরীরাণীর লোভ হয়েছিল বলে, এ-তো হল কিন্তু আপনি নিজে আমাদের জন্য কি করছেন? পরীরাণীর ধারণা, বলতে পারবে, আর একটু সময় যাক। শেখর ভাদুড়ীর মতো সবেতে তাড়াহুড়ো করা ওর স্বভাব নয়। মনে মনে সে-ও নতুন স্বপ্নের জাল বুনছে। এই ধনকুবেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে হঠাৎ সত্যিই যদি একটা আশাতীত অঙ্কের চেক ও-ই বার করে আনতে পারে—শেখর ভাদুড়ীর আনন্দে ভরপুর উত্তেজিত মুখখানা তখন দেখতে কেমন হবে?

কল্পনা করতেও ভালো লেগেছে। আর সে-চেষ্টা করার ইচ্ছেও মনে মনে আছে। নিজের ওপর আস্থা ক্রমেই বাড়ছে পরীরাণীর।...নয়ন চৌধুরী এমনিতে দিব্বি রসিক মানুষ। ওকে একলা পেলে শেখর ভাদুড়ীকে নিয়ে এক এক সময় সুশালীন ঠাট্টাও করেন বেশ। সেদিন বলেছিলেন, ওর কাঁধে কাজের ভূত চেপে আছে একটা, আর সঙ্গে তুমিও এভাবে তাল ঠুকলে নিজেই পস্তাবে একদিন—অল ওয়ার্ক অ্যাণ্ড নো প্লে ইজ নো গুড। আর একদিনও সে এলো না দেখে ঠাট্টা করেছিলেন, ও তো দেখি একটা বাম বোকা--এভাবে ছেড়ে দেয়!

অর্থাৎ ওদের দুজনের ভবিষ্যত সম্পর্কটা উনি ভালো করেই জেনে নিয়েছেন বা বুঝে নিয়েছেন। এই জানা বা বোঝার ব্যাপারে ওই ছেলের হাত কতটা থাকা সম্ভব পরীরাণী সপুলকে আঁচ করতে চেষ্টা করেছে। তারপর ঘরে ফিরে জিজ্ঞাসা করতে বাবু তো সোজাই অস্বীকার করেছে। কিন্তু পরীরাণীর খুব বিশ্বাস হয়নি।

তিন সপ্তাহ পার হওয়া সত্ত্বেও আশার লক্ষণ না দেখে শেখর ভাদুড়ীর মেজাজ যখন প্রায় সর্বদাই তপ্ত, সেই সময় পরীরাণী একদিন তার সামনেই নয়ন চৌধুরীকে ঝপ করে জিজ্ঞেস করে বসল, আর কতদিন আমাদের এভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন?

সামনের লোকের অর্থাৎ শেখর ভাদুড়ীর মুখ দেখেই বোঝা গেছে এই অতর্কিত দাবিটা মনঃপূত হয়েছে বেশ। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসতে দেখেছে তাকে। ওদিকে যাকে বলা হল সেই নয়ন চৌধুরীর খুশি খুশি অবাক মুখ। সে-কি গো, আমি তোমাদের ঝুলিয়ে রাখলাম মানে!

তেমনি দাবির সুরেই পরীরাণী বলল, মানে আপনি ভালোই জানেন, বাড়িঘর ছেড়ে আর কতদিন এখানে বসে থাকব?

—কি কাণ্ড! তেমনি খুশি খুশি নিরীহ বিস্ময় নয়ন চৌধুরীর, আমি ভাবলাম কাজকর্ম সারতে সারতে গরমের ছুটি এসেই গেল বলে তোমরা আরো কিছুদিন এখানে কাটিয়ে যাচ্ছ, আরো কিছু কাজ সেরে তারপর যাবে...

শেখর ভাদুড়ী সামনে ঝুঁকে খুব স্পষ্ট করে বলল, ঠিকই ভেবেছেন, আসল কাজটা আপনার সঙ্গে আর সেটাই বাকি, সেটা না সেরে যেতে পারছি না...

কয়েক পলক তার দিকে চেয়ে থেকে সোজা পরীরাণীর দিকে ফিরলেন নয়ন চৌধুরী।—আমার কাছে ঠিক কি আশা কর বলো শুনি।

চকিতে শেখরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো পরীরাণী, কিন্তু হাসিমাখা মুখখানা ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়ে তক্ষুনি বাধা দিলেন নয়ন চৌধুরী।—উঁহু নো হেল্‌প, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি বলো।

ভিতরে ভিতরে ফাঁপরে পড়ল পরীরাণী, কি বলে ফেলে পরে দাবড়ানি খাবে ঠিক আছে! তিন কূলে কেউ যখন নেই, সঙ্গের একজন তো তার সব-কিছু হাতের মুঠোয় পুরতে পারলে খুশি। দ্রুত ভেবে নিয়ে শেখর ভাদুড়ীরই বহুবারের শোনা একটা বুলি আউড়ে দিল।—আপনি বরাবরকার মতো আমাদের শিক্ষক জগৎকে বাঁচিয়ে তুলে দেশের চেহারা বদলে দিতে পারেন—আপনার কাছে আমাদের আশাও অত বড়ই, তার জন্যে যা করা দরকার সবই আপনি করবেন।

আড় চোখে সামনের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল কথাগুলো মনের মতো হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি, অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে বলা, তিনি মিটিমিটি হাসছেন ওর দিকে চেয়ে। একটু পরে বললেন, এ কথা তো অনেক বার শুনেছি, কিন্তু পাছে কম পাও সেই ভয়ে তোমরা কতটা চাও একবারও বলোনি। হাসছেন।—কিছু দিলে কিছু লাভ হয় বটে, আসলে কেউ কাউকে বাঁচায় না...সব যে যার নিজের তাগিদে বাঁচে। যাক, সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার কি লাভ?

হাসি মুখের শেষের প্রশ্নটা খট করে কানে লাগল পরীরাণীর, জবাবের আশায় শেখরের দিকে তাকালো।

জুতসই কথা না পেয়ে শেখর ভাদুড়ী বলল, আপনার লাভ তো ওপরওয়ালাই খতিয়ে রেখেছে, মানুষের কাছে—

কথার মাঝেই রসিকতা করে বসলেন নয়ন চৌধুরী।—হ্যাঁ, ওপরওয়ালা পেয়াদা পাঠিয়েই রেখেছে, হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে টেনে তোলার ফিকিরে আছে—

অন্তরঙ্গ দাবির সুরে পরীরাণীই হাল ধরতে চাইল আবার।—এতদিন বাদে আপনার এ-সব কথা শুনতে চাই না, এত বড় একটা স্কুল চালাচ্ছেন কোন্ লাভের আশায়?

নয়ন চৌধুরীও তেমনি অন্তরঙ্গ জবাবই দিলেন, বললেন, মেয়েগুলো পড়তে পাচ্ছে, ওদের টিচাররাও ভালো মাইনে পাচ্ছে...তাছাড়া বছর গেলে স্কুলকমিটি স্কুল থেকেও ভালো লাভই করে, লোকসান কোথাও নেই।

শেখর ভাদুড়ীর সহিষ্ণুতা এটুকুতেই চিড় খাচ্ছে। সামনে ঝুঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাহলে কি লাভের আশা করেন আমাদের কাছে?

নয়ন চৌধুরীর দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর পলকের জন্য রুক্ষ হয়ে উঠল কিনা ঠিক বোঝা গেল না। পরমুহূর্তে ঠোঁটে হাসি ভাঙল, গলার স্বরেও আগের মতই কৌতুকের আমেজ।—তোমার দেখি কথার ঘায়ে অভিমান, তুমি বড় কাজ করবে কি করে। হাসতে লাগলেন। আমি কিছু আশা করিনি, আশার কথা তোমরাই বলছ, এক কালে ব্যবসায় ডুবে ছিলাম বলে লাভ লোকসানের হিসাবটা আমার খানিকটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বলতে পারো।...আচ্ছা, পরে এসো এক সময়, ভেবে দেখি।

ফেরার সময় শেখর ভাদুড়ী বিড় বিড় করে বলেছে, লোকটা ধড়িবাজ, কতদূর কি করবে সন্দেহ হচ্ছে—

পরদিন সকালে একলাই বেরিয়েছিল সে। কিছু কাজকর্ম সেরে নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে ফিরবে। কি ভেবে পরীরাণী সেদিন সকালে আর বেরুল না। বেশ সকালের দিকে হেড-মিসট্রেস মীনাক্ষী নন্দী দার্জিলিং রওনা হয়ে গেছেন কি কাজে, সন্ধ্যার পর ফেরার কথা। ছুটিতে সচরাচর এখানে থাকেন না, কিন্তু প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ নয়ন চৌধুরী নাকি তাকে বলেছেন, তিনি চলে গেলে অতিথিদের একটু অসুবিধে হতে পারে। প্রকারান্তরে তাঁকে থাকতে বলা বুঝেই তিনি ছুটিতেও এখানেই আছেন। শুনে পরীরাণী বিব্রত বোধ করেছে, উনি চলে গেলে মুশকিল তো বটেই। বলেছে, আমরা ভারী অসুবিধে করলাম আপনার।

মীনাক্ষী নন্দী বলেছেন, কিছু না।

কিন্তু এই দিনে বিশেষ কাজে দার্জিলিং একবার যেতেই হচ্ছে তাঁকে। সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে ফিরবেন।

শেখর ভাদুড়ী বাইরের টহল সেরে ঘরে ঢুকেছে বেলা দেড়টার পর। মাথায় তখন বেশ যন্ত্রণা তার। সকাল থেকে ঘোরাঘুরির ফলে হতে পারে, আবার নয়ন চৌধুরীর কাছ থেকে কোন আশার ইঙ্গিত এত দিনেও মিলল না, সেই ক্ষোভ তার ক্লান্তিতেও হতে পারে। আজ নাকি ভদ্রলোক একটু রুক্ষ সুরেই বলেছে, তোমার তাড়া থাকতে পারে, কিন্তু আমার তাড়া কিসের—ভাবতে সময় লাগবে একটু।

প্রায় বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালো, কিন্তু মাথার যন্ত্রণা তাতেও ছাড়ল না। উল্টে বলল, জ্বর জ্বর লাগছে।

ব্যস্ত হয়ে পরীরাণী কপালে হাত দিল। তারপর একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল, জ্বর তো লাগছে না, বেলা পর্যন্ত ঘোরাঘুরির ফলে ওই রকম হয়েছে।

এদিকে দুপুর না গড়াতে আকাশ কালীবর্ণ হয়ে ছিল। মেঘের গুরু গুরু ডাক শুরু হয়েছে সেই থেকে। বিকেলের দিকে সেই ডাক আর ঘনঘটা আরো বেড়েছে। প্রচণ্ড ঝড়জল হবে মনে হয়। উতলা মুখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে পরীরাণী বলল, আকাশের যা অবস্থা দেখছি, দার্জিলিং-এ কি হচ্ছে কে জানে, সে-রকম হলে ভদ্রমহিলা ফিরবেন কি করে।

শেখর ভাদুড়ী শুয়ে ছিল, মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। চেয়েই রইল একটু। তারপর নিস্পৃহ জবাব দিল, সে-রকম হলে ফিরবেন না।

শোনা মাত্র হঠাৎ কি যেন একটা অস্বস্তি পরীরাণীর। গোপন করার চেষ্টা সত্ত্বেও মনে হল ওই চোখে সেটা ধরা পড়েছে।

সন্ধ্যা হতে না হতে মুষলধারে যেন গোটা আকাশটাই ভেঙে পড়ল। তারপর সেই বৃষ্টি চলল তো চললই। সমস্ত শহর ভাসিয়ে দেবে বুঝি। সারা রাত ধরে এ-বৃষ্টি চলা অসম্ভব নয়।

রাত যত বাড়ছে, পরীরাণীর অস্বস্তিও বাড়ছে তত। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ। কারণ বৃষ্টির ছাট আসছিল ঘরের মধ্যে। শেখর ভাদুড়ী শুয়ে আছে, আর পরীরাণী পাশে বসে আছে। মনে হল, ইচ্ছে করেই যেন লোকটা কম কথা বলছে এখন, আর মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে দুরবস্থাটা দেখছে।

দরোয়ান এই ঘরেই দুজনের খাবার দিয়ে গেল। মুখ বুজে খেয়ে নিল দুজনে। দরোয়ান উচ্ছিষ্ট নিয়ে চলে যেতে পরীরাণীর মনে হল এবার নিজের ঘরে পালাতে পারলে বাঁচে। এই বৃষ্টির মধ্যে কিছু যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে, বাইরের ঝমঝম শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যেও। সেই সঙ্গে এই লোকের চাউনিও যেন অন্যরকম লাগছে।

আবার শয্যা নিয়ে শেখর ভাদুড়ী বলল, মাথাটা ছাড়লই না সেই থেকে, জ্বর এলো কিনা দেখ তো।

অগত্যা সামনে এসে পরীরাণী কপালে হাত ছোঁয়াল। কপাল যেন সত্যি বেশ ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে এখন। ভালো করে লক্ষ্য করল, মুখটাও একটু ফোলা আর লালচে দেখাচ্ছে। বলল, গরমই তো লাগছে একটু, খেলেন কেন?

—ও কিছু না, হাত ধরে টেনে পাশে বসালো ওকে।—মাথাটা একটু টিপে দাও তো।

দ্বিগুণ অস্বস্তি আবার। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করেই মাথা টিপল খানিক। কিন্তু এই ঠাণ্ডায়ও ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছে ও। শেষে বলেই ফেলল, আপনি ঘুমোন, আমারও ঘুম পেয়ে গেছে, এ ছাইয়ের বৃষ্টি আজ আর থামবেই না...

শেখর ভাদুড়ী একটা হাত ধরে বসিয়েই রাখল ওকে। চেয়ে আছে। চেয়েই আছে। পরীরাণীর বুকের ভিতরে বিষম কাঁপুনি হঠাৎ, মুহূর্তের মধ্যে ও যেন খাঁচায় পোরা পাখি একটা, যত ঝটপটই করুক, পালাবার উপায় নেই।

—তোমার একটুও ঘুম পায়নি।

পরীরাণী নিস্পন্দ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাঁপছে তেমনি।

শেখর ভাদুড়ী দু'হাত বাড়িয়ে বুকের ওপর টেনে নিল ওকে। তারপর একটা রুদ্ধ ক্ষুধার লাগাম ছেড়ে দিল যেন। পরীরাণী অসহায়, সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে তার। ঘরে আলো জ্বলছে। ভগবান...দ্বিধা হও।

কিন্তু লোকটার কি মাথায় খুন চেপেছে। ওকে একেবারে নিঃশেষ করে দেবে? হঠাৎ ওকে তেমনি আঁকড়ে ধরে থেকেই আধাআধি উঠে বসল। দেখল একটু। সেই ক'টা মুহূর্তের জন্য পরীরাণী শেষবারের মতো ধড়ফড় করে উঠে ছাড়াতে চেষ্টা করল নিজেকে।...পারা গেল না। তার আগেই ওই লোকের একটা হাত দেয়ালের সুইচটার দিকে ধেয়ে গেছে।

...সমর্পণ ভিন্ন আর মুক্তির উপায় নেই।

ঘুম ভেঙে দেখে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের অবিশ্বাস্য বিভ্রম। ও কি একটা বিতিকিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে উঠল?

পর মুহূর্তে সমস্ত মুখ আরক্ত। স্বপ্ন যে নয় সেই বাস্তব যেন ওর অস্তিত্বের সমস্ত কণায় ছড়িয়ে আছে। ও-দিকের ঘর থেকে অনেকবার ডাক আসা সত্ত্বেও ঘর ছেড়ে ও মুখো হতে পারল না। শুধু ওই লোক কেন, আপাততঃ দুনিয়ার সকলের কাছ থেকে আড়াল নিতে পারলে বাঁচে যেন।

হাসি চেপে শেখর ভাদুড়ীই এ-ঘরে এসে দাঁড়াল শেষে। ছদ্ম বিরক্তির সুরে বলল, দেখ অত ছেলেমানুষি কোরো না, এমন কিছু সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যায়নি। বাবাজীর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসা যাক চল।

নয়ন চৌধুরীকে মাঝে মাঝে সে এই গোছের বিশেষণে ভূষিত করছে আজকাল। চেষ্টা করেও পরীরাণী তার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, আমি এখন কোথাও বেরুতে পারব না।

—কেন, একলা বাড়িতে বসে কি করবে? নিরীহ মূর্তি।...দরোয়ানটার সঙ্গে বসে গল্প করবে?

একটা মুখ ঝামটা দিয়েই তাকে বিদায় করার ইচ্ছে ছিল পরীরাণীর, কিন্তু তাও পারা গেল না। হাসতে হাসতে চলে গেল সেটা না তাকিয়েও বুঝেছে। পরীরাণীর ভয়ানক রাগ হচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য, ভিতরে ভিতরে কেমন হাসিও পাচ্ছে।

বেলা হতে হেড-মিসট্রেস মীনাক্ষী নন্দী ফিরেছেন। সহজ হবার তাড়নায় পরীরাণী তখনো নিজের সঙ্গে যুঝছে। মীনাক্ষী নন্দী দুর্যোগে আটকে গেছলেন জানিয়ে খোঁজ নিয়েছেন কোনরকম অসুবিধা হয়েছিল কিনা। পরীরাণী জবাব না দিয়ে মাথা নেড়েছে, অসুবিধে হয়নি।

দুপুরে তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেও মীনাক্ষী নন্দী গত দিনের দুর্যোগের কথা বলেছেন। পথ-ঘাটের যা অবস্থা, নিতান্ত ঝুঁকি নিয়েই নাকি ফিরেছেন তিনি।

শেখর ভাদুড়ী খাওয়া বন্ধ করে যেভাবে তাকিয়েছিল তার দিকে, তার একটা মাত্র অর্থ পরীরাণীরই শুধু বোধগম্য হয়েছে। চোখ দিয়েই যেন বলছে, অত ঝুঁকি নিয়ে ফেরার কি দরকার পড়েছিল।

পরীরাণী হেসে ফেলার দাখিল। কিন্তু মেজাজ আসলে আজও চড়েই আছে শেখর ভাদুড়ীর। খাওয়া দাওয়ার পর ওকে বলেছে, আজও তোমাকে না দেখে আমাদের নয়নমণি ভিতরে ভিতরে চটেই গেছে, এতবার করে বললাম চল, তোমার যদি একটু বুদ্ধি থাকত।

পরীরাণী সকোপে জবাব দিল, আমার আর বুদ্ধি কোনকালে হবে না।

একদিনের মধ্যে নিজের পরিবর্তন দেখে নিজেই মনে মনে অবাক।

কিন্তু মুখের হাসি পরীরাণীরও মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে ওই এক রাতের স্মৃতি মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। আরো একটা সপ্তাহ কাটাল, অর্থাৎ এখানে অবস্থানের এক মাস পার হল। একটা দুর্জয় ক্ষোভ যেন শেখর ভাদুড়ীর মুখে এঁটে বসছে। নয়ন চৌধুরীর মতো অবুঝ লোককে সে বুঝি খুন করে তাঁর টাকাগুলো দখল করতে পারলে করত। ওদিকে কোন কথা বা আচরণ মনের মতো না হলে পরীরাণী ধমক খেয়ে মরেছে।

গত সাতটা দিন রোজই প্রায় ওই লোকের সঙ্গে নয়ন চৌধুরীর ওখানে গেছে। কোন কোন দিন দুবেলাও গেছে। ওকে দেখলে ভদ্রলোক সেই আগের মতই হাসিখুশি, গল্প-রসিক, অতিথিপরায়ণ। তাছাড়া এই সাত দিনের মধ্যে দু'দিন ওদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন। অথচ আসল ব্যাপারের ধারে কাছে ঘেঁষছেন না।

ভদ্রলোক অনেকভাবে সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু নিজে কিছু দেবেন কিনা পরীরাণীরও সেই সন্দেহ এখন। বিশেষ করে আজ বিকেলে তাঁর কথা শুনে সন্দেহ প্রায় বদ্ধমূল এখন। শেখর বাদুড়ী স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করেছিল, ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার ভাবতে আর কতদিন লাগবে?

নয়ন চৌধুরী দুই পলক দেখে নিলেন ওকে। তারপর অমায়িক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তোমার ধৈর্য কমে আসছে?

—তা না...তবে এক মাস ধরে তো ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছি।

আরো অমায়িক হেসে তিনি বললেন, সেটা খুব বেশি মনে কর তো দিচ্ছ কেন, তা'ছাড়া আমার ভাবনাটা যে তোমার ইচ্ছের দিকেই গড়াবে তারই বা ঠিক কি?

মুখ লাল করে ঘরে ফিরেছে। নিজের মনেই গালি-গালাজ করেছে। আর সেই থেকেই পরীরাণীর মনের তলায় কি-যেন এক অশুভ ছায়া পড়ছে। রাত্রিতে ও বলেই ফেলল, ভদ্রলোক কিছু দেবেন বলে মনে হয় না, ওকে বাদ দিলে এখানকার কাজ তো ভালই হয়েছে, চল কালই আমরা চলে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু রাগে চোখ-মুখ ফেটে পড়ার দাখিল। মোটা গলার স্বরে আগুন ঝরল যেন। বলে উঠল, যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না, যা চাই তার জন্য এখানে এক বছর বসে থাকতে হলেও থাকব—বুঝলে?

মনের তলার সেই অজ্ঞাত অশুভ ছায়াটা যেন সজোরে দুলে উঠল।

পরদিন থেকে শেখর ভাদুড়ী একাই বেরুতে লাগল। ওকে ডাকে না। কোথায় যায় কি করে, কিছু বলেও না। মুখে কঠিন রেখা পড়ছে একে একে। নিজের সঙ্গেই কিছু একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ায় মগ্ন যেন। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকায়। সেই চাউনিও সঙ্কল্পবদ্ধ অটল-কঠিন মনে হয়। কিছু একটা মর্মান্তিক সম্ভাবনার হিজিবিজি দাগ পড়তে থাকে পরীরাণীর মাথার মধ্যে, ও জোর করেই চেষ্টা করে সেগুলো মুছে ফেলতে।

দিন পাঁচেক পরে। রাত্রি। অনাগত বিপর্যয়ের ছায়াটা পরীরাণী কিছুতে আর ঠেলে সরাতে পারছে না। সেটা এগিয়ে আসছে। এগিয়ে এসেছে। আজই চরম কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

...গেল।

শেখর ভাদুড়ীর এই চেহারাই অন্যরকম। ইস্পাত-কঠিন। কাছে ডাকল, শোন—

পরীরাণী কাছে এলো।

শাণিত দৃষ্টিতে শেখর ভাদুড়ী ওর ভিতরশুদ্ধ দেখে নিল যেন—আমাকে তুমি ভালবাসো?

পরীরাণীও অপলক চেয়ে আছে।—কি মনে হয়?

—আমি যা বলব, করবে?

—বল।

—আমি কোন সংস্কার কোন সেন্টিমেন্টের ধার ধারি না। কাজ বুঝি, কাজ চাই-—সেটাই পুরুষকার। ওই টাকার কুমীর কি চায় তুমিও জানো আমিও জানি। নয়ন চৌধুরীর সঙ্গে আজ আমার পরিষ্কার কথা হয়ে গেছে। সে তোমাকে এখানে রেখে আমাকে চলে যেতে বলেছিল। আমি তাতে রাজি হইনি, উল্টে ভয় দেখিয়েছি। শেষে আমার কথা-মতো সে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে, এ-ছাড়া তোমাকে পাবার আর কোন পথ নেই বুঝেছ—রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই আমাদের ফাণ্ডএ এক লক্ষ টাকা দেবে।...কিন্তু আমার কাছে সেটাই বড় কথা নয়, বাড়িগুলো ছাড়াও ব্যাঙ্কে তিরিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা আছে তাঁর...আমাদের বরাত খুব খারাপ হলে বড় জোর এক বছর দু'বছর বাঁচবে আর, তার ডাক্তারের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে আমার, ওই ডাক্তার নয়ন চৌধুরীর খুব আপনার লোক ভেবেছে আমায়, তার ধারণা অতদিনও টিকবে না...মোট কথা দু'দিন আগে হোক পরে হোক্, ওই বিরাট সম্পত্তির সবটাই তোমার দখলে আসবে...আর তোমাকে কথা দিচ্ছি, এই এক-আধটা বছরের জন্য আমাদের সম্পর্ক এতটুকু চিড় খাবে না—বরং ঢের বড় হয়ে উঠবে।

পরীরাণী চেয়ে আছে, দেখছে। একটা অফুরন্ত ঘৃণা যেন সত্তা নিংড়ে ঠেলে উঠতে চাইছে, পরীরাণী উঠতে দিচ্ছে না। ও শুধু দেখছে।...হ্যাঁ, ওর মনে অনাগত বিপর্যয়ের ছায়া পড়ে, এ-রকম একটা সম্ভাবনাই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ও অক্লান্ত চেষ্টায় সেটা গোচরে আনতে চায়নি।

এই নীরবতাও অসহ্য যেন, শেখর ভাদুড়ী ছটফট করে উঠল, বি প্র্যাকটিক্যাল, কথা বলছ না কেন?

স্পষ্ট মৃদু স্বরে পরীরাণী বলল, সেদিনের বৃষ্টির রাতটা ভুলে গেছ তাহলে?

—কিছুই ভুলিনি। আরো অধীব যেন, ও-সব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামিও না, একটা সাময়িক ব্যাপারকে বড় করে তুলো না। ও-রকম একটা রাত তোমার কলকাতায় বসন্ত সরখেলের সঙ্গেও কেটেছে, তার জন্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি।

পরীরাণীর পায়ের নিচে মাটি সজোরে দুলে উঠল হঠাৎ। চোখে অন্ধকার দেখছে, মনে হল পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ে গেল না।...এই। এই অবিশ্বাস নিয়ে বসে আছে এই লোক। এই অবজ্ঞা নিয়ে বসে আছে বলেই বৃষ্টিঝরা সেই এক রাতের পরেও স্বার্থের লোভে এমন অনায়াসে বাপের বয়সী ওই লোকের ক্ষুধার আগুনে ওকে ঠেলে দিতে পারছে! পরীরাণী দু'চোখ টান করে চেয়ে আছে, আদর্শের মুখোশের তলায় এমন কুৎসিত মুখও থাকে কারো।

টলতে টলতে দরজার দিকে এগলো। পিছনে চাপা হুংকার।—চললে কোথায়? শোন, আমি মন স্থির করে ফেলেছি, এ-ব্যবস্থার আর নড়চড় হবে না। কাল সকালে আমি একবার বালুরঘাট যাব, পরশু ফিরব, নয়ন চৌধুরী তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, তুমি কাল সকালেই যাবে তার কাছে—মোট কথা পরশু ফিরে এসে আমি সমস্ত ব্যবস্থা পাকা দেখতে চাই, বুঝলে?

পরীরাণী ফিরে তাকায়নি। চলে গেছে।

রাত কেটেছে। কি ভাবে কেটেছে পরীরাণী জানে না। সকাল থেকে অনেকবার মীনাক্ষী নন্দী ঈষৎ অবাক চোখে ওকে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু পরীরাণী খেয়াল করেনি।

ওর মাথাটা শূন্য হয়ে গেছে, কিছু ভাবতে পারছে না, ভাবতে চেষ্টা করছে না।

দুপুর। পরীরাণী মেঝেয় বসে আছে।

দাওয়ার সামনে গাড়ি দাঁড়াল একটা। নয়ন চৌধুরীর গাড়ি। নয়ন চৌধুরীকে নামতে দেখল গাড়ি থেকে। একটু বাদে সেই হাসি-হাসি মুখে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

—এ-ভাবে বসে যে?

পরীরাণী মুখ তুলে তাকালো শুধু।

...বুঝলাম। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ভাঙল আবার। জরা ঠেলে ওঠা দুটো ক্ষুধার্ত চোখ। —শেখরের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে তাহলে।...তা কি ভাবছ?

—আপনার কথাই। আপনার মতো আমার ভাবতে অত সময় লাগবে না, শিগগীরই জানতে পারবেন। আপনি যান এখন—

আশ্চর্য, পরীরাণী খুব স্পষ্ট করেই বলতে পারল কথাগুলো। অথচ সত্যিই কিছু ভাবছিল না, আর, কিছু ভেবেও বলল না কথাগুলো।

নয়ন চৌধুরী আর একটু খুঁটিয়ে দেখলেন ওকে। বললেন, শেখরের কথা শুনে ভাববার কিছু আছে বলে মনে হয়নি। আচ্ছা, ভাবো...

চলে গেলেন। আর একখানা মুখ চোখের সামনে ভাসল পরীরাণীর। মায়ের ক্লাবের অসীম ঘোষের মুখ। দিন আর রাতের তফাত।

একটু বাদে হেড-মিসট্রেস মীনাক্ষী নন্দী ফিরলেন। বিকেল না গড়ালে ফেরেন না বড়, আজ আগেই ফিরেছেন। সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে দরোয়ানের মুখ থেকে কিছু শুনলেন যেন। কর্তা এসেছিলেন সেই খবর হয়তো। তারপর দাওয়ার দিকে পা বাড়ালেন।

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে। পরীরাণী মেঝেতে বসে, উনি সামনে তিন হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে। এই প্রথম পরীরাণী তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু স্বতোৎসারিত হাসির আভাস দেখছে যেন। আচম্বিতে সেই মুহূর্তে এখানকার নাটকের শেষ মোচড়।

—টেলিগ্রাম!

মীনাক্ষী নন্দী ঘুরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে সই করে টেলিগ্রাম নিলেন। তারপর আবার ঘরে এসে টেলিগ্রামের হলদে খাম ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পরীরাণী তেমনিই বিমূঢ় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে খামটা হাতে নিল।...পরীরাণী দত্ত...ওরই নাম তো!

চোখে ঝাপসা দেখছে। অক্ষরগুলো ঘুরছে বনবন করে, কিছুতে স্থির হচ্ছে না...দাদা। দাদার আবার কি হতে পারে? টেলিগ্রাম বীরুমামু পাঠিয়েছে, লিখেছে দাদার গুরুতর অবস্থা, খবর পাওয়া মাত্র যেন চলে আসে।

মীনাক্ষী দত্ত ঝুঁকে টেলিগ্রাম ওর হাত থেকে নিলেন। পড়লেন। তারপর আবার তাকালেন ওর দিকে। পরীরাণীও বাহ্যজ্ঞানরহিতের মতো চেয়েই আছে।

—পরিতোষ কে?

...দাদা।

—তার তো গুরুতর অবস্থা দেখছি, তোমার কি তার থেকেও বেশি?

পরীরাণী নিরুত্তর। হাঁ করে তাকেই দেখছে।

ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই রকম হাসি।—যাওয়ার থেকে থাকাটা বেশি লাভের

হবে কিনা ভেবে নাও তাহলে। পরে অবশ্য সবটাই লোকসান মনে হলেও আর যাওয়ার পথ থাকবে না।

অন্য ঘরে চলে গেলেন। পরীরাণীর বিমূঢ় দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেল যেন।

এই মীনাক্ষী নন্দীও কোন একদিন ওই প্রৌঢ় নয়ন চৌধুরীর বিকারগ্রস্ত যৌবনবাস্তবের দোসর ছিলেন তাতে আর একটুও সংশয় নেই।

...মা-গো, এই দুনিয়াটা কি!

...কিন্তু ও কোথায় যাবে? কলকাতায়? কলকাতায় কে আছে।...দাদা আছে? দাদার আবার কি হতে পারে? বীরুমামু একটা বিতিকিচ্ছিরি বাজে লোক, দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

কিন্তু মন বলছে, দাদার কিছু হয়েইছে। ওর মন অনেক কিছুই ওকে আগে-ভাগে জানান দেয়।

ও-ই মনের কথা শোনে না, শুনতে চায় না।

◆

এই সকাল আটটায় বাড়ি যেন নিঝুম পুরী। নিচের তলার দরজা জানালা সব বন্ধ। দোতলার বারান্দায়ও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।...কিছু ঘটেছে। বাড়িটার দিকে তাকিয়েই পরীরাণী বলে দিতে পারে কিছু ঘটেছে।

ভিতরে ঢুকল। মাস্টারমশাই আহ্নিকে বসেছেন হয়তো আর তার স্ত্রী রান্নাঘরে...তাদের ছেলে এতক্ষণে বালুরঘাট থেকে সেখানকার সেই ঘরে ফিরেছে হয়তো...ওকে না দেখে কি করছে? থাক।

দোতলায় উঠতে লাগল। দুই কান উৎকর্ণ।...ঘটেইছে কিছু। এতক্ষণে ছাদের গান কানে আসার কথা। আসছে না। কেউ গান গাইছে না।

সামনে মা। ওকে দেখে থমকে দাড়াল। দোতলায় না ওঠা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই রইল। তারপর হনহন করে নিজের ঘরের দিকে চলল।...এক মাস সাত দিন বাদে ও বাড়ি ফিরেছে, মায়ের এই ব্যবহার কেন? কি হয়েছে, কি ঘটেছে? শোকের কিছু ঘটে থাকলে মায়ের এমন কঠিন মূর্তি কেন?

মায়ের ঘরের দিক থেকে বাবার মুখ দেখা গেল একবার। এদিকেই আসছিল, কিন্তু ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন আচমকা ভয় পেয়ে ঘরে সেঁধিয়ে গেল আবার।

পরীরাণী এখন তার নিজের খুপরি ঘরে বসে। সামনে বীরুমামু। তার দুই গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো গর্তে। বীরুমামু বলছে কিছু। পরীরাণী শুনছে। ওর কানে ঢুকছে, মাথায় ঢুকছে না।

...টেলিগ্রামও কাল পেয়েছে, কিন্তু আজ পাঁচ দিন হল দাদা মারা গেছে। অন্য দিনের মতই বেরিয়েছিল দাদা, রাতে ফেরেনি। সকালে হৈ-হৈ ব্যাপার। সামনের ওই এবড়ো-খেবড়ো ছোট ত্রি-কোণ পার্কটার মধ্যে দাদাকে কারা খুন করে রেখে গেছে। ভোর রাতের দিকে হবে ব্যাপারটা, কারণ রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছিল। পার্কের মধ্যে একটা কোণের দিকে তাকে টেনে এনে তারপর মারা হয়েছে।

কতক্ষণ একভাবে বসেছিল জানে না। ভিতরটা...ভিতরটা নয়, সমস্ত অস্তিত্বই শূন্য

হয়ে গেছে পরীরাণীর। উঠল, জানালা দিয়ে তিন রাস্তার মুখে ছাল-ওঠা পার্কটার দিকে তাকালো।...আশ্চর্য, কোণের একদিকের দু'তিন হাত জায়গা জুড়ে কচি সবুজ ঘাসের মতো দেখা যাচ্ছে। ওই পার্কে তো কোনদিন ঘাসের বংশও দেখা যায়নি! পিছন থেকে আঙুল দিয়ে বীরুমামু ওই গাসের জায়গাটাই দেখিয়ে দিল, দাদাকে ওইখানে মারা হয়েছে।

...ছুটোছুটির সময় ওই মাটিতে আছাড় খেয়ে ছোট ছেলেমেয়েগুলোর গা-হাত-পা ছড়ে যায়। পরীরাণী কত সময় ভাবত একটু তোয়াজ করলেই ওখানে সুন্দর কচি কচি ঘাস হতে পারে।...দাদা কি নিজের রক্ত দিয়ে একটু তোয়াজ করে গেল?

ভালো করে দেখার জন্য খুপরি ঘর ছেড়ে রাস্তার দিকের বারান্দায় এলো। ভিতরটা আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা ওর। তবু কি দেখে দু'চোখ থমকালো একটু। সামনের রাস্তার মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বসন্ত সরখেল। এই দিকে, ওর দিকেই চেয়ে আছে।

পরীরাণী ঘুরে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। পিছনে বীরুমামু দাঁড়িয়ে এখনো। নিজের দু'চোখ হিংস্র হয়ে উঠেছে মুহূর্তের জন্য পরীরাণী জানে না। বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওর কাজ?

ঠিক না বুঝে বীরুমামু এগিয়ে এসে রাস্তার দিকে তাকালো। বসন্ত সরখেলকে দেখল। তারপরেই বুঝল। জোরেই মাথা ঝাঁকালো।—না, না, কি-যে বলিস! সামনে ঝুঁকে গলা খাটো করে বলল, কার কাজ বুঝছিস না, সুধীর সান্যালের ভাড়াটে লোকের কাজ...বসন্ত বরং আগে থাকতে তোর দাদাকে সাবধান করে দিয়েছিল, আর ইদানীং আগলে আগলে রাখছিল। তাছাড়া পরিতোষ যে রাতে খুন হয়, ও তখন হাজতে। ওর ধারণা, সুধীর সান্যালই মিথ্যে অজুহাতে ওকে পুলিসের হাতে দিয়ে হাড়ভাঙা পিটুনি খাইয়েছে। পরিতোষের খুনের খবর শুনে ও-ই পুলিসের কাছে সুধীন সান্যালের নাম করে আবার পিটুনি খেয়েছে।...আর ও রাগ করছিল বলেই তো শেষে তোকে টেলিগ্রামটা করলাম।

মাথার ভিতরটা আবার আগের মতই শূন্য পরীরাণীব।

দুপুরে বীরুমামুই ওকে টেনে এনে খেতে বসিয়েছে। সেই থেকে আর মা বা বাবার মুখ দেখেনি। বিকেলেও না, রাতেও না।

পরের দিনটাও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নিজের খুপরি ঘরে বসেই কাটল। এক বীরুমামুই যা বারকয়েক ঘরে এসেছে। কেন এসেছে কি বলেছে পরীরাণী জানে না। খুপরি ঘরের জানালা দিয়ে ওই পার্কটার দিকে অনেকবার চোখ গেছে। ওই রাস্তায় বসন্ত সরখেলকে সকালেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে, একবার বীরুমামুকে আর একবার ছাদের পল্টু ঘোষালকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। কিন্তু পরীরাণী তেমনি ঠাণ্ডা, অস্তিত্বশূন্য। দুনিয়ার সব ব্যাপারেই ওর মাথা ঘামানোর দরকার ফুরিয়েছে।

বিকেলে এই প্রথম ওর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মা গলা দিয়ে আগুন ঢালল একপ্রস্থ। —ওঃ, দাদার শোকে দু'দিন ধরে পাথর হয়ে আছে একেবারে! দেড় মাস একজনের সঙ্গে কাটিয়ে শেষে লাথি ঝাঁটা খেয়ে ফিরে এসে এখন দাদার শোকে ডুবে গেল, কেমন? যে চুলোয় ছিল সেখানে যেতে বল, এখানে জায়গা হবে না। শোক করতে হয় এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে করুক!

—আঃ, দিদি, কি যা-তা বলছ! বীরুমামুর গলা।

—কি? তোর বুঝি দরদ উথলে উঠেছে। আমার কথার অবাধ্য হলে তোকে সুদ্ধু দেব দূর করে তাড়িয়ে, বুঝলি? দরদ দেখাতে এসেছে!

না, এই শোনার পরেও পরীরাণীর স্নায়ু একটুও তপ্ত হয়ে উঠছে না। একটু অবাক লাগছে শুধু।...দাদা নেই বলে ওকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলার সাহস। কিন্তু পর মুহূর্তেই সাহসের কারণটা কানে এলো।

বীরুমামু ওর ঘরে ঢুকে চাপা গলায় গজ-গজ করে উঠল, বাড়ির মালিক হয়ে এখন হাতে মাথা কাটছেন উনি, শুনলি তো—

পরক্ষণে কি মনে পড়ল তার।—ও, তুই তো জানিসই না।...পরিতোষ খুন হবার পরেই জামাইবাবু ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। আর দিদি তো তাকে আগের থেকেই বোঝাচ্ছিল তুই আর ফিরবিই না। তুই আসার আগের দিন বাড়িটা দিদির নামে দানপত্র করা হয়ে গেছে...ছাদের পল্টু ঘোষাল আর ডাক্তার ব্রজ ধর সেই উইলের সাক্ষী। প্রায় ফিসফিস করেই বীরুমামু বলল, আসলে দিদির ভয়েই জামাইবাবু এই কাজ করেছে, বুঝলি? প্রাণের ভয়ে—

পরীবাণী শুনল। তারপবেও তেমনি ভাবলেশশূন্য।

বীরুমামু সান্ত্বনার সুরে বলল, দুটো দিন সহ্য করে থাক...শেখরবাবু ফিরছে কবে?

পরীরাণী যেন নির্লিপ্ত কলের পুতুল একখানা। জবাব দিল, তার যখন খুশি হবে।

বীরুমামু বলল, তুই তাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে লিখে দে না?

...আমি তাকে লেখার কে?

বীরুমামু হকচকিয়ে গিয়ে চেয়ে রইল ওব দিকে।

পরীরাণী কান পেতে ডাক শুনছে।...

মা ডাকছে ওকে, দাদা ডাকছে। ওর আশ্রয়ের ভাবনা কি? ঠাণ্ডা নিশ্চিত আশ্রয়। যাবেই তো বাপু, এত ডাকাডাকির কি আছে?

সবে সন্ধ্যা তখন। পরীরাণী পায়ে পায়ে ছাদে উঠে গেল। গেল না, কেউ যেন ঠেলে নিয়ে গেল ওকে। ছাদে আর একজনের বাস মনেও নেই। সোজা কার্নিশের কাছে চলে গেল। নিচের রাস্তার দিকে তাকালো।...মা ডাকছে কোথা থেকে, এইখান থেকে? কার্নিশে অনেকটা ঝুঁকে নিচের দিকে তাকালো।

চমকেই উঠল। কাঁধে কার হাত। পল্টু ঘোষাল। সে ঘাবড়ে গেছে। ওর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁধ ছেড়ে দিল।...কেন? ভয় পাবার মতো মুখ হয়েছিল?

চাপা উত্তেজনায় পল্টু ঘোষাল জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি করছ?

জবাব না দিয়ে পরীরাণী আবার নিচে চলে এলো। ইচ্ছে করলে অনায়াসে হাসতেও পারে বোধহয়। পল্টু ঘোষালের কি মূর্তিই দেখল।

ডাকছেই ডাকছেই। মা ডাকছে, দাদা ডাকছে। রাত বাড়ছে। বীরুমামু চঞ্চল পায়ে ঘরের সামনে পায়চারি করছে। পরীরাণীর বড় ঘুম পাচ্ছে। কোন্ রাস্তা ধরে মায়ের কাছে আর দাদার কাছে যাবে কাল ভাববে। একটা রাস্তা ধরলেই হল। আগের বারে ছেলেমানুষ ছিল বলেই রাস্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে।

সকাল হতে পরীরাণীর মন মেজাজ আরো ঠাণ্ডা, আরো সুস্থির। রাতে বেশ ঘুম

হয়েছে। কিন্তু কিছুই চিন্তা করতে ভালো লাগছে না। কেবল সেই নিজের মায়ের আর দাদার মিষ্টি ডাক শুনতে ভালো লাগছে।

বেলা বাড়ছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বীরুমামু যেন নিরীক্ষণ করে দেখে গেল ওকে। কিন্তু কোন কিছু নিয়েই পরীরাণীর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না। জানালা দিয়ে পার্কটার দিকে তাকালো। রাস্তায় বসন্ত সরখেল দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে পল্টু ঘোষাল কথা কইছে।...ওর গানের পালা সাঙ্গ হয়ে গেল নাকি! শেষ কি গানটা শুনেছিল মনে করতে চেষ্টা করল। মনে পড়ছে না। খানিক বাদে আবার সেদিকে তাকিয়ে বীরুমামুকেও কথা বলতে দেখল বসন্ত সরখেলের সঙ্গে। কি-যে ওদের সমস্যা কে জানে, পরীরাণীর এ-জীবনে আর কোন সমস্যা নেই।

দুপুর। সেই একদিনের মতই নিরিবিলি দুপুর। এবারে নিঝুম, বাড়ি আরো নিঝুম। সময় হয়েছে। পরীরাণী সোজা নিচে নেমে এলো। তারপর রাস্তায়। খানিকটা এগোলে রাস্তাটা দু'দিকে বাঁক নিয়েছে। একটা ডাইনে অন্যটা বাঁয়ে। ওর আশ্রয়ে পৌঁছনোর পথটা বাঁদিকে বেঁকেছে। সেদিকেই চলল।...চমৎকার পথ, কেউ ওকে চিনতেও পারবে না হয়তো। সাত আট মিনিট হেঁটে গেলে ছোট ব্রিজের ওপর দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। ওদিক দিয়ে নয়, মাঠের ভিতর দিয়ে গজ বিশেক চড়াই ভাঙলেও সেই রেললাইন। দুপুরে এখান দিয়ে বেশ কয়েকটা মালগাড়ি যায়, শুধু এঞ্জিনও যায়। পরীরাণীর সব মনে আছে, খুপরি ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কতদিন দেখেছে ঠিক নেই।

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে আর কোনদিকে চোখ নেই। একটাই লক্ষ্য, মাঠ পেরিয়ে চড়াই ভেঙে উপরে উঠলেই লক্ষ্যে পৌঁছুবে। এসে গেল প্রায়। তর-তর করে কত চড়াই ভাঙছে। অদূরে ঝক-ঝক শব্দ, শুধু এঞ্জিনই আসছে বোধহয় একটা। তাই যথেষ্ট। খুব সময়ে এসেছে ও। পঞ্চাশ গজও দূরে নয় এঞ্জিনটা। পরীরাণী নিরীহ মেয়ের মতো লাইনের গজ তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে। মা আর দাদা বেশ জোরেই ডাকছে।

—পরী-ই!

দাদা আর মায়ের ডাক—ডাক শোনার তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। বিষম চমকে পরীরাণী ঘুরে তাকালো। কে একজন ছুটে আসছে। পরমুহূর্তে পাগলের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে এঞ্জিনটার দিকে ছুটল পরীরাণী। এঞ্জিনটা এখনো গজ পঁচিশেক দূরে, ঢিমে তালে আসছে।

পারা গেল না। পিছন থেকে বসন্ত সরখেল ওকে জাপটে ধরে হ্যাঁচকা টানে লাইনের কাছ থেকে খানিকটা সরিয়ে নিল। তারপর ধ্বস্তাধস্তি। সমস্ত শক্তি দিয়ে পরীরাণী ওকে ছিটকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে পরীরাণীর মুখের ওপর প্রচণ্ড আঘাত করল বসন্ত সরখেল। চোখের সামনে রাজ্যের অন্ধকার—বসন্ত সরখেল আবার ওকে জাপটে ধরে টাল সামলাতে না পেরে ওকে সুদ্ধ ঢালের দিকে গড়িয়ে পড়ল।

পরীরাণীর জ্ঞান আছে অথচ কি যেন একটা গোলমেলে কাণ্ড হচ্ছে। কেউ যেন ওকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওকে...না ওর শরীরটাকে? ও কি মা আর দাদার কাছে পৌঁছয়নি?

টেনেটুনে শরীরটাকে একটা রিকশায় তুলল, পাশে বসে কেউ শক্ত করে ধরে রাখল।...এ কে? মা আর দাদা কোথায়? বিড়বিড় কথা কানে আসছে ওই পল্টু ঘোষাল আর বীরু সন্দেহটা মাথায় ঢুকিয়ে না দিলে কি হত...কি হত এখন!

...কি হত? এখনই বা কি হয়েছে? চোখ টান করে পরীরাণী পাশের দিকে দেখতে চেষ্টা করল। দেখতে পেল না, সব ঝাপসা।

চোখ মেলে আবার তাকালো যখন, বিছানায় শুয়ে আছে। একটা লোক ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, আর মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। পরীরাণীর বিমূঢ় চাউনি, লোকটার দু-চোখে জল চিকচিক করছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই চিনেছে।

—মা-গো!

তার কথা কানে ঢুকছে।—তুই আমাকে এ-ভাবে ফাঁকি দিবি? তোর দাদাটা পালিয়েছে, তুইও পালাবি? পনের বছর বয়স থেকে তোর জন্যে বসে আছি আর আমাকে তুই এ-ভাবে কলা দেখাবি? ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মা-কালীকে সাক্ষী রেখে তোকে সিঁদুর পরিয়েছিলাম সে-কথা তুই ভুলেছিস বলে আমিও ভুলব—সেই পাত্র পেয়েছিস আমাকে? জীবনে আর তোকে চোখের আড়াল করব?

আড়াল করেনি। লোক পাঠিয়ে ডাক্তার আনিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে পর-পর তিনদিন ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। তারপর পরীরাণীর মাথাটা সক্রিয় হয়েছে আস্তে আস্তে। তারপরও পনের দিন কেটে গেল। পরীরাণী স্তব্ধ, নির্বাক। একটি কথাও বলেনি।

লোকটা ওকে বিশ্বাস করেনি। দশ-মিনিটের জন্যও কাছ ছাড়া হয়নি। অন্য লোক দিয়ে হাটবাজার করিয়েছে। সামনে বসে নিজে হাতে রেঁধেছে, খাবার সাজিয়ে টেনে এনেছে। নিতান্ত দরকার হলে দশ-বিশ মিনিটের জন্য ওকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে গেছে।

...আর দিবারাত্রি অনর্গল বুঝিয়ে চলেছে ওকে, সময় সময় কাকুতি-মিনতি করছে। পরীরাণীর স্তব্ধতার বর্ম ভাঙতে না পেরে এক-একবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারপরেই দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করেছে আবার।

—কি হয়েছে? কিছুই হয়নি। ওই শেখর ভাদুড়ী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোর সঙ্গে? সে-ই তো ঠকেছে রে বোকা! কাল রাতে ঘুমের মধ্যে নিজেকে তুই পাপী বলছিলি? ও-সব পাপ-পুণ্যের আমি থোড়াই কেয়ার করি। তুই আমার, ঘুরে-ফিরে তুই আমার কাছেই এসেছিস, ব্যস। তাছাড়া, আসল পাপ তো মনে, শরীরটার মধ্যে তো কত বিষ আর কত ঘেন্নার জিনিস আসে আবার চলে যায়—সেটা কি পাপ নাকি! তুই তো আমার মতো মুখখু না, তোকে বোঝাতে হবে!...মনের দিক থেকে তোর মতো ভালো মেয়ে আর আছে! সেই প্রথমবার ওইটুকুর জন্যেই তুই আত্মহত্যা করতে গেছলি শোনার পর থেকে আমার ভেতরটা সুদ্ধু বদলে গেল! তুই কত ভালো মেয়ে তুই নিজেই জানিস না। সাগ্রহে সামনে ঝুঁকেছে, তোকে আবার ফিরে পেয়ে আমি যে এত মন্দ, আমার পর্যন্ত ভালো হতে সাধ যায়, বুঝলি? তুই আমাকে ছেড়ে যাবি না কথা দিলেই আমি চেষ্টা করব ভালো হতে—কথা দিবি? দিবি?

কান্নার মতো কিছু যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছে পরীরাণীর। কিন্তু ও কি এ-জীবনে আর কাঁদতেও পারবে?

একইভাবে আরো পনেরটা দিন কেটে গেল। কিন্তু ঠিক একভাবে নয় বোধ হয়। এই লোককে পরীরাণী এখন নিজের অগোচরে একটু একটু লক্ষ্য না করে পারছে না।

...রাতে ওর ঘরের সামনে দরজা আগলে শুয়ে থাকে। তার আগে মুখের দিকে চেয়ে ভালো করে বুঝে নিতে চেষ্টা করে মতলব কিছু আছে কিনা। এতদিনের মধ্যে ওকে স্পর্শ করা দূরে থাক, এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ানোর লোভও দেখেনি। উল্টে ত্রাস যেন। প্রায়ই বলে, আর তোকে আমি কোনদিন অপমান করব না, কোনদিন না—তুই আমাকে বিশ্বাস করবি কবে?

...সকালে বা বিকেলে দলের লোক ডাকতে এলে বিরক্ত হয়। রুক্ষমুখে বিদায় করে দেয় তাদের। রাগে গরগর করতে করতে চলে যায় ওরা। পাঁচকথার জবাবে পরীরাণী ইদানীং একটা দুটো কথা বললেও খুশিতে আটখানা হয়ে ওঠে। নতুন করে আবার ওকে বোঝাতে বসে সেই পুরনো কথা বলে।

আরো ব্যতিক্রম, গোড়ার দিকে পরীরাণী সর্বদাই নিষ্কৃতির উপায় চিন্তা করত, এখন আর চেষ্টা করলেও ওই চিন্তায় তন্ময় হতে পারে না।...গতকাল সকালে বড় আশা নিয়ে লোকটা পরীরাণীকে বলেছিল, এক মাস ধরে তো আমি রাঁধলাম, আজ তুই রাঁধ না। আশ্চর্য, কান্না শুকোয়নি এখনো, ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। পরীরাণী রেঁধেছে। ওর রান্না খেয়ে এত তৃপ্তি এত আনন্দ এ-যাবত আর কোনো মুখে দেখেনি।

কিন্তু তারপরেই আবার যেন নতুন করে অন্ধকাবে ডুবেছে পরীরাণী।

...সেদিন বিকেলে একদল লোক এলো। এই লোককে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

একটু বাদেই ওদের চাপা তর্জন আর চাপা শাসানী শোনা গেল। পরীবাণীর বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল হঠাৎ। পায়ে পায়ে জানালার এধারে এসে না দাঁড়িয়ে পারল না। অপরিচিত গলার হিস হিস কথা কানে এলো, কে একটা মেয়ের পাল্লায় পড়ে মজেছে ভেবে অনেক লোকসান সহ্য করেছে তারা, আর করবে না। আজ রাতের এতবড় দাঁওটা যদি ফসকায় তাহলে বিপদ হবে—আজ রাতে তাকে বেরুতে হবে।

বসন্ত সরখেলেরও তেমনি মেজাজ, কিন্তু গলার স্বর চাপা।—খবরদার বলছি, ওই মেয়ের সম্পর্কে একটি কথাও বলবি না, ওর পা দুখানা পেলে সারা জন্ম পূজো করতিস।

—ঠিক আছে, তুই পূজো কর। আজ রাতে বেরুবি কিনা বল, মোটা টাকার মামলা, টাকা না কামিয়ে ঘরে বসে শুধু গঙ্গাজল দিয়ে পূজো করবি?

—ফের!

—তুই যাবি কি যাবি না বল!

—যাব না, যা পারিস করগে যা।

—দেখে নেব, বলে দিলাম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে নিস!

ঘরে চলে এলো। ক্রুদ্ধ মূর্তি। রাগটা হঠাৎ যেন পরীরাণীর ওপরে গিয়েই পড়ল। গলা চড়িয়েই বলে উঠল, ওখানে দাঁড়িয়ে কি শুনছিস? ওরা আমাকে শাসিয়ে গেল, সুযোগ পেলে খুন করবে—করে করবে, তোর তাতে কি? একজনকে ভালবেসে তোর দাদা মরেছে, তোর জন্যে আমি মরব—বুঝলি? তুই তাই চাস? আমি সুযোগ না দিলে ওরা আমাকে ছুঁতেও পারবে না—সুযোগ দেব ওদের? লোকটার চোখ আবার চিকচিক করতে দেখছে। প্রথম দিন জ্ঞান হতে যেমন দেখেছিল।

নিজের অগোচরেই কয়েক পা সামনে এগিয়ে এসেছে পরীরাণী। আবার থমকে

দাঁড়িয়েছে। আবার দেখছে। কান্নার মতই কিছু যেন বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।—তুমি আমাকে নেবে কেন?

অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার মতই বসন্ত সরখেল লাফিয়ে উঠল একেবারে। কাছে এসে এই প্রথম কাঁধে হাত রাখল ওর।—নেব কেন মানে! তুই আমার, আমি নেব না তো কে নেবে! মা-কালীকে সাক্ষী রেখে সিঁদুর পরিয়েছিলাম না—সিঁদুর কি অত সস্তা জিনিস নাকি? আনন্দের আবেগে ওর দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিল।—তোকে আমি কতদিন বলছি না, পাপের বাসা মনের মধ্যে, শরীরটা কিছু না—কিচ্ছু না—তোর তুলনায় আমি ঢের—ঢের মন্দ—এত মন্দ যে সময় সময় ঘেন্না ধরে আজকাল—তবু তো আমি ভাবি তুই পাশে থাকলে আমি ঠিক ভালো হয়ে যাব—ঠিক ঠিক ঠিক—আর তুই কিনা নিজেকে মন্দ ভাবিস!

উৎকট আনন্দে কি যে করবে ভেবে না পেয়ে ওকে টেনে এনে চৌকিতে বসালো। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ধুপ করে পাশে বসল। ওর দুই বাহু তখনো হাতে ধরা। বলে উঠল, ওরা ভেবেছে খারাপ রাস্তায় না গিয়ে আমি আর পয়সা রোজগার করতে পারব না, রোজগারের মতলবও আমি ভেবে রেখেছি, বুঝলি? তুই তো সেলাই জানিস, সেলাই ভালবাসিস, সেলাইয়ে দু-দুটো পাশও দিয়েছিস—তোর দাদার কাছে সব শুনেছি। তোকে আমি একটা সেলাইয়ের দোকান করে দেব, মেয়েদের এ-রকম দু-একটা দোকান আমার দেখাও আছে—আমি তোর কাজে লাগলে কাজ করব, নয়তো আবার ড্রাইভারি করব, তোর দোকান বড় হলে তখন আমাকে তোর কাজে লাগবেই—আর দোকান তো বড় হবেই, দেখতে দেখতে বড় হবে, তুই যেখানে লক্ষ্মী সেখানে লক্ষ্মী না এসে পারে! তোর সঙ্গে তখন আরো কত মেয়ে কাজ করবে। অমন করে দেখছিস কি?—ও, ভেবেছিস খারাপ ভাবের রোজগারের টাকা দিয়ে দোকান করব? কেন, আমার ভালো টাকা নেই! দাদাদের কাছে বাড়ি বেচা টাকার বেশির ভাগই ব্যাঙ্কে মজুত আছে, বুঝলি? কথার মাঝে হঠাৎ ভেবাচাকা খেয়ে গেল বসন্ত সরখেল। আচমকা তার কোলে মুখ গুঁজে আর দু-হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে পরীরাণী কেঁদে উঠল, ফুলে ফুলে কাঁদতেই থাকল।

বসন্ত বিমূঢ় আরো কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে গায়ে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলে উঠল, এই দেখ, কি বোকা মেয়েরে বাবা! এই পরী—কাঁদিস কেন? কান্নার মতো কি বললাম আবার!

বলছে বটে, কিন্তু অননুভূত আনন্দটা যেন তারও দু'চোখ বেয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

✦

ছ'বছরের মধ্যে এই রাস্তার ধারে মেয়েদের একটা ছোট্ট সেলাইয়ের ঘর একটু একটু করে ফেঁপে উঠতে দেখেছে দু'পাশের লোক। এক-ঘরের জায়গায় এখন পাশাপাশি তিন ঘর হয়েছে। মেয়েদের হাল ফ্যাশানের টেলারিং শপ। মেয়ে খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। ছ-সাতটি ভদ্রঘরের মেয়ে কাজ করছে—দোকানে হাসিখুশি মালিকটিও সর্বদাই তাদের সঙ্গে কর্মব্যস্ত।

মালিকের নামও আশপাশের সকলেই জানে। নাম পরীরাণী—পরীরাণী সরখেল।

লোকে বলে বুদ্ধি করে খাসা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে বটে একখানা। আর বলে, চৌকস বউটা খেটেখুটে দিব্বি রোজগার করছে, আর স্বামীটা মনের আনন্দে খেয়ে দেয়ে মুটোচ্ছে, আর মাঝে মধ্যে দোকানে ঢুঁ দিয়ে ফোঁপরদালালী করে সময় কাটাচ্ছে। এ-সংবাদ বসন্ত সরখেলই পরীরাণীকে দিয়েছে।

পরীরাণী ভ্রুকুটি করে জবাব দেয়, ঠিকই বলে।

চার বছরের একটা দুষ্টু মেয়েকে দোকানে হামেশাই টুলের ওপর বসে থাকতে দেখে সকলে। মেয়েটা দুষ্টুমি করে, কাজে ব্যাঘাত ঘটায়, আবার মায়ের ধমক খেয়ে খানিকক্ষণের জন্য চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু বাপের সাড়া পেলেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে কোলে ওঠে। এই মেয়েটাকেও ভালবাসে দোকানের মেয়েরা, মালিকের মেয়ে বলে একটু বেশিই ভালবাসে। কেউ কেউ আবার বলে, একেবারে বাপের মুখখানা বসানো—মায়ের মতো হলে আরো ভালো হত। কানে গেলে পরীরাণী কাজেব দিকে আরো বেশি মন দেবার ছল করে। মেয়ে বাপের মতো হয়েছে শুনলে ওর কান যে কত জুড়োয় ওরা জানবে কি করে?

মাঝে মাঝে এক ব্যাপার নিয়ে এখনো প্রায়ই ঘরের ওই লোককে ধমকে উঠতে হয়। বসন্ত সরখেল যখন-তখন আগের মতই ডেকে বসে, এই পরী শোন—

শোনার আগেই ধমকে ওঠে পরীরাণী।—ফের? শাসন না করলে দোকানেও এই রকম ডেকে বসে।

তক্ষুনি হুঁশ ফেরে। লোকটা সামলে নিতে চেষ্টা করে, এই ইয়ে, শোনো—

নিজেই হেসে ফেলে তারপর। বলে, আমার যে ছাই মনেই থাকে না—কি লোক ছিলাম জানিস তো—এই যাঃ!

পরীরাণীও হেসে ফেলে। সেই হাসির মধ্যেও লোকটাকে চেয়ে দেখে এক-এক সময়। পরীরাণী জানে। জানার আর শেষ নেই বুঝি।

...কাজের মধ্যেও হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে কেমন। একটা স্মৃতির গ্লানি আজও বেদনা ছড়াতে চায়। কাজ ফেলে তক্ষুনি ঘরে চলে আসে। এই জানা লোকের মুখখানা দেখলে তবে শান্তি।

...ওর অনেক জানার গ্লানির মধ্যে সারি সারি কত মুখ। পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে আছে একেবারে।...সেই পঙ্কিলতা দু'হাতে ঠেলে এই একখানা মুখই শুধু মণির মতো জ্বল জ্বল করছে। সেই আলোর তাপ পেতে আর স্পর্শ পেতে ছুটে আসে।

...সেই আলোয় পরীরাণীর সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়।

অন্য নাম জীবন

গিরীন্দ্র সিংহ

প্রিয়বরেষু

শেষ বারের মতো এক বিকট আর্ত চিৎকারে তামাম দুনিয়ার মানুষের কানের পরদা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে চেষ্টা করল ও...

কিন্তু লোকগুলো সব কানা না কালা? দেখতে পাচ্ছে না? শুনতে পাচ্ছে না?

দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না। নইলে এমন হবে কেন? শেষের এই আর্তনাদও কোন্ অতল থেকে ঠেলে উঠে বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিয়ে গলা পর্যন্ত এসে শব্দশূন্য হয়ে গেল। অসহ্য যাতনায় ও ছটফট করতে লাগল। কে যেন একটা সাঁড়াশি দিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরে আছে। বোবা আর্তনাদ দু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে।

এরই মধ্যে কি আশ্চর্য, সব শেষ হতে বসেছে বলেই কি কবেকার কোন এক হারানো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে ওর? বুকের ছাতি যখন ফেটে যাচ্ছে, এক তরল গ্রাসে সর্বদিকের সবকিছু যখন ডুবে যাচ্ছে, মাঠ-ঘাট-জল-মানুষ গোরু-ছাগল-গাছপালা সব—সব—আর, সেই সঙ্গে লোপা নামে একটা মেয়েও—যে মেয়েটাকে অনেকে মন্দ বলে আবার মনে মনে অনেকে ভালও বাসে—সেই দস্যি মেয়েটাও যখন তলিয়ে যাচ্ছে আর একটু একটু করে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর ত্রাস-ঠিকরানো চোখে দুনিয়ার সব কালো ধোঁয়া নেমে আসছে—তখনো ও কবেকার ওই ছবিটা হঠাৎ একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে?

...দেখতে পাচ্ছে, চারদিকেব খটখটে শুকনো দিনের আলোয় বাইরের দাওয়ায় বসে ছ' বছরের একটা মেয়ে দুলে দুলে গলা ছেড়ে পড়ছে, জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না, জলের আর এক নাম জীবন—

—মরণ! মরণ! ওই ছাই-ভস্ম যে লিখেছে তার মরণ! নাকি চোখের মাথা তুই-ই খেয়ে বসেছিস লো চোখ-খাকি। বলি জলের নাম ওই কপাল-কুষ্ঠিতে জীবন লেখা আছে না মরণ লেখা আছে? গলা ফাটিয়ে কি পড়ছিস লা তুই পোড়ারমুখি?

গলানো আগুনের মতো ঝলকে ঝলকে ওই বিকৃত কটূক্তি কানের পরদায় এসে বিঁধল ওর। কিন্তু বাঁচার অন্তিম তাড়নায় আবার মাথা তোলার আগেই দাওয়ার ওই ছোট মেয়ের ছবিটা মুছে যাচ্ছে, সব...সব তলিয়ে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে—কেবল শেষ আশ্বাসের মতো কোন এক বুড়ির হিসহিস কটু শাসানি তখনো কানে লেগে আছে...

ঠাক-মা গো!

একবার মনে হল বুক-ফাটা ওই শেষ আর্তনাদ আর শেষ আশাটুকুও ডুবে গেল, তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল। কিন্তু তারপর কি-যে হল, ক'টা মুহূর্ত ধরে কি-যে হতে থাকল, ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। দম-বন্ধ বুক ফাটা যাতনাটা হঠাৎ কি রকম শূন্য শূন্য হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে রাজ্যের কালো ধোঁয়া ফিকে হয়ে আসছে।

...মাটি? পায়ের নীচে উঁচু-মতো কি!

মাটির এমন স্পর্শ, এমন স্বাদ! মাটি এত মিষ্টি!

...মাটিই বটে, কিন্তু ঠিক সমান মাটি নয়। উঁচু একটা টিলা। মাটি অথচ মাটির থেকে আলাদা। বেশ উঁচু আর খুব চেনা। ও আরো স্পষ্ট আরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন সব-কিছু। এখনো সঙ্কট কাটে নি, ত্রাস কাটে নি, কাঁপুনি থামে নি। থেকে থেকে পায়ের নিচে মাটি ঠেকছে বটে, কিন্তু এখনো ওই টিলার মাথায় উঠে দাঁড়াতে পারে

নি। ওটার বুকের কাছে আছে। আর একটু উঠতে পারলে, আর একটু উঠে যে ছেলেটা ওকে তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে, তার হাতখানা আঁকড়ে ধরতে পারলে তবে জীবন, তবে মুক্তি।

...নাগাল পাবে কিনা কে জানে, ধরতে পারবে কিনা কে জানে। প্রাণ-পণে সে চেষ্টাই করছে।

কিন্তু এরই মধ্যে চারদিকের সব-কিছু অদ্ভুত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। সব-কিছু বলতে শুধু জলই দেখছে আর কিছু নয়। সমস্ত দুনিয়াটা বুঝি ওই জলের তলায় নিথর হয়ে আছে। বাদে শুধু ওই টিলার চুড়োটা, আর তার মাথায় ওই ছেলেটা। এ-ছাড়া যে-দিকে তাকায় শুধু জল আর জল আর জল। আরো অবাক ব্যাপার, এই রাশি-রাশি জলের এতটুকু শব্দ নেই টান নেই স্রোত নেই এখন। আকাশে-বাতাসে এতক্ষণের জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন ঠাণ্ডা স্তব্ধ। সমস্ত পৃথিবীটাকে পেটে পুরে এই দিগন্তছোঁয়া জলের স্তূপ কি এক জাদু-মন্ত্রে হঠাৎ যেন মৌনী, সমাধিস্থ হয়ে গেছে। এমন কি টিলার গায়ে এক-একবার পা ঠেকিয়ে জল ভেঙে ভেঙে প্রাণপণে ও যে ওই ঝুঁকে-পড়া ছেলেটার হাত ধরে বাঁচতে চেষ্টা করছে তার মধ্যেও খানিক আগের আলোড়ন নেই, তাতেও এই নিষ্কম্প জলের এতটুকু তরঙ্গ নেই।

এগিয়ে আসছে। বাচবে মনে হয়। হাতখানা ধরতে পারবে মনে হয়। আর সেই ফাঁকে ও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অবাক। খুব চেনা মুখ খুব জানা মুখ। এই সে-দিনও হাফ-প্যান্ট পরে ছোটাছুটি দাপাদাপি করেছে। বছর দুই হল পুরো ট্রাউজার বা ধুতি পরে সভ্য-ভব্য হয়েছে, স্মার্ট হয়েছে। গম্ভীর-গম্ভীর লম্বাটে মুখ দেখে কতদিন যে ওর জিভ ভেঙচাতে ইচ্ছে করেছে ঠিক নেই। সামনা-সামনি চোখাচোখি হয়ে গেলে ও-ই বরং ভ্রুকুটি করে পাশ কাটিয়ে নিজের ইজ্জত বাড়িয়েছে। রাতারাতি ভদ্রলোক বনলেও ও তাকে কেয়ার করে না এটুকুই স্পষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ও অবাক সেজন্যে নয়। এই তরঙ্গশূন্য নিথর জল-সমুদ্র থেকে তাকে তোলার জন্যে ওই ছেলেই হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে আছে বলেও নয়। তার পরনের ট্রাউজার, গায়ের ধপধপে সাদা শার্ট এমন কি পায়ের চকচকে জুতোও খটখটে শুকনো। কোথাও এতটুকু জলের ছোঁয়া লাগে নি। যেন ফুল-বাবুটি সেজে জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই চাঁদমারির ওপর উঠে এসেছে, তারপর ওকে তোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

...আরো অনেকখানি এগিয়ে এসেছে ও। এইবার হাত বাড়ালেই ওই হাতের নাগাল পাবে বোধহয়।

কিন্তু হঠাৎ এ-কি হল! চারদিক শূন্য, কেউ কোথাও নেই। ও কি আবার তলিয়ে যাচ্ছে ? টিলার ঢালু মাটিতে দু'পা ঠেকিয়ে সজোরে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করল।...একবার দু'বার। কিন্তু পা দুটো মাটির বদলে নরম কিছুতে ঘষটে যাচ্ছে যেন।

. আর সেই মুহূর্তে অতিপরিচিত গলার সূর্যস্তব পাঠ কানে আসছে কোথা থেকে। কি কাণ্ড! এ-যে বাবার গলা, বাবা ছাড়া এই বৈদিক স্তব-পাঠ কার হতে পারে ?

...ওঁ শননঃ মিত্র শংবরুণঃ

শননঃ ভবন তোয়রিয়মা...

রোজ শোনে, বলতে গেলে জন্ম থেকে শুনে আসছে। কিন্তু আজ কোথা থেকে শুনছে? বাবা কোথায়? ও নিজে কোথায়? ও নিজে কোথায়?

ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। জলে নয়, গলার অনেকটা নিচে অবধি ঘামে ভিজে গেছে। ঘরে বাইরে জলের চিহ্ন-মাত্র নেই। সব শুকনো খটখটে। পাখি-ডাকা ভোরের শুচি-আলোয় ঘর ভরে গেছে। বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে বাবা রোজকার মতোই সূর্যস্তব পাঠ করছে, 'তুমি মিত্র তুমি বরুণ তুমি অন্তর্যামী...।' বিমূঢ় দু'চোখ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে এলো আবার। সামনের দেয়ালে অনেককালের পুরনো একটা লম্বা আয়না টাঙানো। সেদিকে চোখ পড়তে দেখে চাদর-কোঁচকানো বিছানায় একটা মেয়ে বসে আছে যার নাম লোপা।

...ও নিজেই।

তার পরেই সচকিত। পরা-শাড়িটা টেনেটুনে দিয়ে কোমরে আঁট করে বেঁধে নিল। স্বপ্নের মধ্যে হাত-পা ছোঁড়ার ধকলে বিচ্ছিরি রকম সরে গেছল। আর একটু বাদে সরি পিসী ঘরে ঢুকে ওকে সেই অবস্থায় দেখলে বকুনির চোটে অস্থির করে ছাড়ত।

থেকে থেকে লোপা কতবার যে হেসে উঠেছে ঠিক নেই। স্বপ্নের কথা মনে হলেই হাসি পাচ্ছে। আবার সেই সঙ্গে শঙ্কাও একটু। ভোরের স্বপ্ন কোনোদিন আবার সত্যি হয়ে যাবে না তো। নিজেই আবার সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে। এ-রকম স্বপ্ন কেন দেখেছে তাও জানে।

গত সাত আট দিনের মধ্যে সবে কাল ভালো করে সূর্যের মুখ দেখেছে তারা। আর আজ দেখছে। তার আগে আকাশ প্রায় সারাক্ষণই মেঘলা ছিল। আর ওই ক'দিন ধরেই দিবা-রাত্র টিপটিপ বৃষ্টি। বার কয়েক বেশ জোরেও পড়েছে। বাবার মুখে শুনেছিল মহানন্দ না কোথায় জল বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে পাহাড়ে ধস নামার খবরও কানে এসেছে। এ-সব খবর এই গোটা এলাকার মধ্যে বাবাই সব থেকে আগে পায়, আর তার মুখ থেকে সকলের কানে ছড়ায়। আড়ালে বাবাকে অনেকে নদী-বিশারদ বা জল-বিশারদ বলে ঠাট্টা করে। শুনে লোপার এক এক সময় রাগ হয়, আবার হাসিও পায়। হাসি পাবে না তো কি, এ-সব নিয়ে ফাঁক পেলেই বাবা যে লেকচার শুরু করে দেয়। লোপার মনে মনে ধারণা, এই যে দু'দিন ধরে আশপাশ পরিষ্কার তার ফলে একমাত্র ওর বাবারই উত্তেজনার খোরাক কমে গেছে। গত কদিনের আকাশের আবহাওয়া আর বাবার ওই গোছের উত্তেজনার দরুনই যে এমন উদ্ভট একটা স্বপ্ন দেখে উঠল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—কই রে লোপা এলি।

সরি পিসীর দ্বিতীয় দফা হাঁক শুনে হাতের চিরুনি রেখে লোপা তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে এলো। শুকনো চুলের বোঝায় চিরুনি চালাতে চালাতে স্বপ্নের কথাই ভাবছিল আর মিটি মিটি হাসছিল।...শেষে কিনা তার হাত ধরতে এলো ওই ছেলেটা! দুনিয়ায় আর লোক পাওয়া গেল না?

মাঝের উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরের মাটির দাওয়ায় এসে বাবার পাশে বসল। ডালা হাতে বাবা পাটালি দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে, আর লোপার ডালার মাছি তাড়াচ্ছে। সরি পিসী রান্নাঘরে বসে চা বানাচ্ছে।

একটু বাদে বাবার পেয়ালা বাবার সামনে রাখল, আর লোপারটা ঠক করে ওর সামনে। মুড়ি চিবুতে চিবুতে লোপা আড় চোখে দুটো পেয়ালারই চায়ের রং দেখে নিল। বাবারটার থেকে ওর পেয়ালার চায়ের রং বেশি সাদা হবেই জানা কথা। পিসী বেশি দুধ মেশাবেই। প্রায় এক বছর হল লোপা প্রকাশ্যেই চা খেতে পাচ্ছে। কিন্তু সরি পিসীর এখনো অসহিষ্ণুতা গেল না।

নেশা বলতে বাবার চায়ের নেশা। চা পেলে বাবা বোধহয় ভাত খাওয়াও ছেড়ে দিতে পারে। এক পেয়ালা চা এনে কেউ সামনে ধরলে বাবার এক-মুখ হাসি দেখতে পাবে। কিন্তু সরি পিসীর আবার দু' চোখের বিষ ওই চা। সকালে বিকেলে বড় জোর দেড়-পেয়ালা দেড়-পেয়ালা তিন পেয়ালা দেবে—তার বেশি নয়। লোপা খুব ভালো করেই জানে বাইরের দোকানে আর বাজারের দোকানে বাবা কম করে আরো ছ' পেয়ালা চা খায় রোজ। জানলেও সে গোপন খবর লোপা পিসীর কাছে ফাঁস করে না। অনেক ছোট হলেও পিসীকে বাবা রীতিমতো ভয় করে।

সরি পিসীর ধারণা চা জিনিসটা পেটের যম। বেশি খেলে লিভার না কি একেবারে গেল। তাই বছর দুই আগে পর্যন্ত লোপাকে এই বস্তুটা ছুঁতে দেয় নি। সেই কারণেই বোধহয় লোপার আবার এবই প্রতি বেশি লোভ। পিসীকে গোপন করে একটু দেবার জন্য ইশারায় প্রায়ই বাবার কাছে করুণ আবেদন পেশ করত। বাবাও তেমনি ইশারায় পিসীকে দেখিয়ে নিজের অসহায় অবস্থা বুঝিয়ে দিত।

তারপর একদিন সে-কি কাণ্ড। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাবা দাওয়া ছেড়ে ঘরে চলে গেল। কিছু একটা দরকারী ব্যাপার মনে পড়েছে যেন। তারপর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইশারায় ওকে ডাকল। কাছে যেতে বাবা তাড়াতাড়ি খানিকটা চা ঢেলে ফিসফিস করে বলল, চট করে খেয়ে নে!

লোপা তার হাত থেকে ডিশ নিয়ে চোঁ-চোঁ চুমুক। তারপর ঘুরে দাঁড়াতে . জনের মাথায়ই বজ্রাঘাত। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে সরি পিসী লোপার ফেলে-আসা মুড়ির ডালার কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারখানা দেখছে।

সমস্তক্ষণ সেদিন বাপ-মেয়ে ভয়ে ভয়ে কাটালো। কিন্তু পিসী সেদিন কিচ্ছু বলল না। পরদিন সকালে মুড়ির ডালা নিয়ে দাওয়ায় বসতে পিসী ঠক-ঠক করে দু'জনের সামনে দু' পেয়ালা চা রাখল। লোপার পেয়ালার চা অবশ্য এর থেকেও বেশি সাদা তখন। চায়ে দুধ না দিয়ে দুধে চা ফেলা হয়েছে বলা যেতে পারে। তবু রাগে ফাটছে পিসী, বলে উঠল, হাঁ করে দেখছিস কি, গেল—গিলে দ্যাখ্ কি অমৃত, আর চুরি করে খেতে হবে না।...আশ্চর্য, যেমন মেয়ে তেমনি বাপ, সোহাগ করে লুকিয়ে খাওয়ানো চাই!

সেই থেকে লোপার এমনি সাদাটে চা বরাদ্দ। কিন্তু শোধ নেয় পিসী যেদিন সকালে মন্দির-টন্দিরে যায়, অথবা বিকেলে কোনো কাজে বেরোয়। লোপাই তখন বাবাকে চা করে খাওয়ায়, আর নিজের চায়ে দুধ প্রায় মেশায়ই না।

সরি পিসীর নাম সরোজিনী। বয়সে কপিল চক্রবর্তী অর্থাৎ লোপার বাবার থেকে কম করে বারো-তেরো বছরের ছোট হবে। আরো ছোট দেখায়। তার দাপটে আর শাসনে বাপ-মেয়ে অস্থির। সে-যে বাবার বোন নয়, এমন কি কোনো আত্মীয়ও নয় তাদের,

লোপা সেটা অনেক পরে জেনেছে। আগে বছরের মধ্যে অনেক দিন বাবাকে কলকাতায় থাকতে হত। সেখানে অ্যাসেম্ব্লি না কি বলে, সেটা খোলা থাকলে প্রায়ই তাকে কলকাতা ছুটতে হত। বাবা তখন দস্তুরমতো গণ্যমান্য লোক ছিল এখানকার। আজকের মতো বাবাকে নিয়ে কেউ তখন এ-রকম ঠাট্টা-ঠিসারা করত না। মুশকিল দাঁড়াল ঠাকুমা মরে যেতে। লোপাকে একলা বাড়িতে রেখে বাবা কলকাতায় থাকে কি করে? আগে সরি পিসী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বাড়িতে থাকত, সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে চলে যেত। নিজের ঘর বলতে সাত-আটখানা বাড়ি ছাড়িয়ে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট আঙিনার মধ্যে দু'খানা টালির ঘর। ওটাই তার স্বামীর ভিটে। লোকে এখনো বলে নন্দ কুশারির জ্ঞান-পীঠ। কেন বলে লোপা গোপালকাকার ওই পাজী ছেলে বিলের মুখ থেকে তাও জেনেছে। যাই হোক, বাবাকে কলকাতা ছুটতে হলে ওকে আগলাবার জন্য সরি পিসীকে তখন রাতেও এ বাড়িতে এসে থাকতে হত।

লোপা তখনই শুধু টের পেত সরি পিসীর ভেতরটা কত নরম। সমস্ত রাত ওকে বুকে আগলে নিয়ে ঘুমুতো। ঠাকুমার গল্প করতে গিয়ে একদিন নিজের কথা বলে ফেলেছিল। সরি পিসী বাবার বোন নয় লোপা সেই প্রথম জানল। আর এখন বুঝতে পারে ঠাকুমা চলে যাবার পরেও সরি পিসী কেন রাতে এখানে এসে ওকে নিয়ে থাকতে পারে না। কিন্তু আত্মীয় বলতে যদি আত্মার সঙ্গে যোগ বোঝায় তো সরি পিসী পরম আত্মীয় তাদের।

—বলি মাথায় কি ঢুকেছে আজকে তোর, একা একা হাসছিস সেই থেকে। চা যে ওদিকে জুড়িয়ে জল হয়ে গেল—

সরি পিসীর ঝঙ্কার শুনে লোপা প্রথমে সচকিত পরে অপ্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট বুদ্ধিও চাপল মাথায়। আড় চোখে দেখে নিল বাবার মুখ খবরের কাগজের আড়ালে ঢাকা।

—আমি জলে ডুবে গেছলাম।

সরি পিসী হাঁ। বাবার মুখ থেকে খবরের কাগজ নেমে এসেছে। তাঁর দু' চোখে সত্যিকারের শঙ্কা।—জলে ডুবে গেছলি মানে?

লোপা মজা পেয়ে গেল।—জলে মানে বন্যায়। আজই ভোর রাতে...

সরি পিসী রেগেই গেল।—দিন দিন ধিঙ্গি হচ্ছিস আর ফাজলামো বাড়ছে, একেবারে জিভের লাগাম ছেড়ে ইয়ারকি করতে বসেছিস কেমন?

অতখানি বলার পরেও বাবা বা পিসী কিছু বুঝবে না লোপা ভাবে নি। পিসীর বকুনিটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ঠেকল কানে আর বাবার মুখে এখনো ভয়ের ছাপ। তাই তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চেষ্টা করল।—সত্যি বলছি পিসী কি বিতিকিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম, চারদিক বন্যায় ডুবে গেছে, কি জল কি জল, আর আমি তাতে ভাসছি—

সরি পিসীর রাগ দেখে লোপা বিমূঢ়।—থাম্ বলছি। তুই থামবি কি না? স্বপ্নের কথা কে তোকে ঘটা করে বলতে বলেছে—খুব আনন্দ না?

বাবা এখনো ওর দিকেই চেয়ে আছে, কেমন যেন দেখাচ্ছে তাকে। গলার স্বরও কেমন-কেমন। বিড়বিড় করে বলল, ভোর রাতে তুই এই স্বপ্ন দেখে উঠলি?

পিসীর বকুনির চোটে যতটা না হোক, বাবার এই মুখ দেখে লোপা সত্যিই বিপাকে পড়ে গেল যেন। তাড়াতাড়ি ভরসার কথাটাই বেড়িয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। বলল,

তারপর বেঁচে যাওয়ার স্বপ্নও দেখলাম, চাঁদমারির ওপর দাঁড়িয়ে ওই ইয়ে, ঘোষাল-বাড়ির ছেলেটা আমাকে হাত ধরে টেনে তুলছে—

বাবার মুখ থেকে বিষাদের কালো ছায়াটা মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকল একটু।—হাত ধরে কে তুলেছে দেখলি? শশধর ঘোষালের ছেলে? ওই রাজা?

লোপার সমস্ত মুখে হঠাৎ লালের ছোঁয়া লাগল একটু। ওদিকে পিসী যেভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে তাতেও অস্বস্তি। কিছুদিন আগেও লোপা অনেক কিছুই বুঝত না। চোদ্দ ছাড়িয়ে পনেরয় পা ফেলেছে এখন। পিসীকে লুকিয়ে বড়দের উপন্যাস পড়া শুরু করেছে। তাছাড়া ওর নিজের শরীরটার ভিতরেও কি রকম একটা ভাঙা-গড়ার কাজ চলেছে। সেই সঙ্গে মনের তলার অনেক দুর্বোধ্য রহস্যের পরদা যেন আপনা থেকে সরে-সরে যাচ্ছে। তাই খুব স্পষ্ট করে না হলেও অনেক কিছুই বুঝতে পারে এখন।

ডালা থেকে এক খাবলা মুড়ি নিয়ে দু' গাল ভরাট করে ফেলল। তারপর যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত মুখে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই।

বাবার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল যেন।—কি দেখলি, হাত ধরে তোকে তুলে ফেলেছে না তুলছে!

জবাব দেবার ফুরসত মিলল না। তার আগেই পিসীর ক্রুদ্ধ ঝঙ্কার।—থাক, আর স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, দিন-রাত মাথায় কেবল ওই ঘুরছে, স্বপ্ন না দেখাই আশ্চর্য! সাতটা বেজে গেল, বাজার-টাজার করবার দরকার আছে, না বসে বসে ওই স্বপ্ন চিবুলেই চলবে?

রেগে গেলে পিসী বাবার সঙ্গে অমনি ভাব বাচ্যে কথা বলে আর ভয়ানক রাগ হলে বাবাকে তুমি-টুমিও বলে বসে। এটা ভয়ানক না হোক, খুব কমও মনে হল না লোপার।

উঠে দেয়ালে হুক থেকে বাজারের থলে টেনে নিয়ে বাবা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে বাঁচল। সেই ফাঁকেও লোপা দেখে নিল, পিসীর ধমক খেয়ে বাবা অপ্রস্তুত বটে, কিন্তু মুখখানা হাসি-হাসি।

এবারে ও আর পিসী মুখোমুখি। তার গলার স্বর আরো এক পরদা চড়ে গেল। —বলি স্বপ্ন দেখেছিস দেখেছিস, তা নিয়ে অত রস করার দরকার কি?

লোপা অবাক। রস করার মানেটা ইদানীং মোটামুটি অনুমান করতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার প্রয়োগটা আদৌ বোধগম্য হল না। পিসীকে বাবা যত ভয় করে ও ততো নয়। বলে উঠল, বা রে, আমি আবার কি করলাম!

—থাম বলছি! কি করলাম, দিন-দিন ধিঙ্গি হচ্ছে, ওদিকে বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে। ফের এইসব শুনি তো ভালো হবে না বলে দিলাম তোকে।

তপ্ত মুখে রান্নাঘরে চলে গেল। লোপা তার পরেও বিমূঢ় খানিক। কি শুনলে ভালো হবে না, সেটা অস্পষ্টই থেকে গেল।...বন্যার স্বপ্ন দেখেছে শুনলে না ওই একটা ছেলের হাত ধরে ওকে তোলার কথা শুনলে? ওই পরেরটাই বোধহয়। পিসীর রাগারাগি সত্ত্বেও ভেতরটা কেমন মিষ্টি-মিষ্টি লাগছে যেন...সেটা পাটালি দিয়ে মুড়ি চিবুচ্ছে বলে নয়।

কিছুদিন আগেও ওই ঘোষালবাড়ির ওপর বেশ টান ছিল পিসীর। ফাঁক পেলে মাঝে মধ্যে ও-বাড়িতে যেত। অনেকটা দূরে অবশ্য, তবু হেঁটেই চলে যেত। এক-একদিন ওকেও সঙ্গে নিত। বসে রাজার মায়ের সঙ্গে দিব্বি গল্প-সল্প করত। কিন্তু একদিন ওখান থেকে ঘুরে এসেই অন্য রকম মুখ। সোজা বাবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবাকে কি-সব বলল লোপা জানে না। বেরিয়ে এলো যখন তখনো মুখ তেতে আছে। অকারণে সেদিন ওকেও বার কয়েক ধমক-ধামক করল। সেই থেকে ও-বাড়ির বা ও-বাড়ির কারো নাম শুনলেই পিসীর এই মেজাজ।

জানলার ধারে মাদুর পেতে বইখাতা ছড়িয়ে পড়তে বসেছে। এক-গাদা পড়া আজ। তৈরি না হলে চিত্তির। টিচারগুলোর বিশেষ করে অঙ্ক আর ভূগোল টিচারের মুখ মনে পড়লে লোপার রাগ হয়ে যায়। পড়া তৈরি না করে গেলে এক-ঘর মেয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বকুনির চোটে অস্থির করে মারে। যেন ওঁদেরই কোন যজ্ঞ পণ্ড। মেয়েগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পড়া ঠেসে দিতে পারলেই যেন চতুর্বর্গ লাভ ওদের। সবার ওপরে টেককা দেয় ওই মিস ছিবড়ে। মহিলার নাম চারুবালা রায়—লেখে সি বি রে। সেটাকে ছিবড়ে বানিয়েছে উঁচু ক্লাসের মেয়েরা। লোপার এবার ক্লাস টেন, নিজেকে প্রায় চুড়ো-ছোঁয়া উঁচু ক্লাসের মেয়ে ভাবে এখন। ওই মহিলা ওদের অঙ্কের টিচার, কোনো কোনো ক্লাসে বিজ্ঞানও পড়ায়। তার ভিতর-বার ওই বিষয়বস্তু দুটোর মতোই শুকনো, নীরস। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী, কিন্তু সর্বদা এমন করে থাকে মুখখানা যে একটুও সুশ্রী মনে হয় না। অতএব মিস সি বি রে বেশ সঙ্গত কারণেই মিস ছিবড়ে হয়ে পড়ছে। কিন্তু ওই একজনকে নিয়ে লোপারই বিড়ম্বনা যেন সব থেকে বেশি। মহিলা ওই ঘোষালবাড়ির গিন্নির বোন হয় সম্পর্কে, শশধর ঘোষালের দূর সম্পর্কের শালী। আ-হা, ভদ্রলোকের মুখখানা মনে এলেই লোপার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়। গোড়ায় গোড়ায় তো চোখে জলই এসে যেত। ওদের স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার ছিল। হেডমাস্টারই হবার কথা, তার থেকে বিদ্বান লোক স্কুলে একজনও ছিল না। কিন্তু মেয়ে স্কুলের প্রধান একজন করে মহিলাই হয়ে আসছে। তাছাড়া ভদ্রলোকের সে-দিকে কোনো চেষ্টা বা উদ্যোগ ছিল না। হার্টের ব্যামো ছিল তার। করোনারি না কি বলে, তাইতে একেবারে বিনা নোটিসে হুট করে মরে গেল। বাবার বয়সী, বাবার খুব বন্ধুও। লোপা স্কুল থেকে এসে খবরটা দিতে বাবা হাঁ একেবারে। ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, কোন্ শশধর ঘোষাল?

মারা যাবার মাত্র মাস কয়েক আগে ভদ্রলোক মিস ছিবড়েকে এই স্কুলে এনে ঢুকিয়েছিল। মহিলা এম-এ পাস, বি-এতেও ভালো অনার্স ছিল, তাই অসুবিধে হয় নি। তাছাড়া অন্য স্কুলে চাকরির অভিজ্ঞতাও ছিল। লোপার মতে ভদ্রলোক ওই একটাই ভালো কাজ করে নি। মিস ছিবড়ে ওরই যেন হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে সেই থেকে। আজকাল আরো বেশি। ক্লাসের এক দঙ্গল মেয়ের মধ্যে ওকেই এত বেশি চিনে বা জেনে ফেলল কি করে সেটাই আশ্চর্য। ইদানীং একটা কারণ অবশ্য লোপার মনের তলায় উঁকি ঝুঁকি দেয়, কিন্তু লোপা সঙ্গে সঙ্গে সেটা বাতিল করে ফেলে, নইলে লজ্জায় নিজের মুখই লাল হয়। মিস ছিবড়ে রোজ ওর পড়া ধরবেই, আর না পারলে এমন সব কথা বলবে যে

পিত্তি জ্বলে যাওয়ার দাখিল। বলা বাহুল্য পড়া বেশির ভাগ দিনই পারে না। ভালো করে তৈরি করে গেলেও ভুল হয়ে যায়। কেন যে মরতে অঙ্ক নিতে গেছল।...সেও ওই ঠাকরোনেরই কাজ, ওই মিস ছিবড়ের। ক্লাস নাইনে উঠে অঙ্ক বাতিল করেছে শুনে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর এক রকম জোর করেই অঙ্ক নিইয়ে ছাড়ল। দরদ দেখিয়ে তখন বলা হয়েছিল, উনি আছেন, কিছু ভয় নেই।

কেমন যে আছেন লোপা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ওই এক অঙ্কের ভূতই হায়ার সেকেণ্ডারীতে ওর ঘাড় মটকাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও পড়া তৈরি করা হয়ে উঠল না। মন লাগছে না। জানলা দিয়ে দূরের দিকে চোখ চালিয়ে দিল। এই লোভেই জানলার পাশটিতে মাদুর পেতে বসে ও। ভারী ভালো লাগে। নদী রঙিলা অবশ্য এখান থেকে খুব কাছে নয়। তারও অনেকটা এ-ধারে শক্ত মাটির দেয়াল। সেদিকে তাকালে দূরে চোখ চলে না, দেয়ালে আটকে যায়। দেয়ালটা গোল-মতো হয়ে ঘুরে যেখানটায় শেষ হয়ে গেছে, সেখান থেকে সামনের দিকে তাকালে ফিতের মতো চকচকে একটা রূপোলি রেখা দেখা যায়। ওটাই নদী রঙিলা। ওটাকে নদী বলতে লোপার হাসি পায়। ভালো করে পায়ের পাতা ডোবে না। বর্ষায় বড় জোর হাঁটু জল হয়। ওরই ভয়ে অর্থাৎ বাড়তি জলের বাঁক ঘুরিয়ে দেবার জন্য ওই মাটির দেয়াল। বাড়তি জল অবশ্য দুই একবার দেখেছে, কিন্তু সেটা এমন কিছু ভয়াবহ মনে হয় নি লোপার। উল্টে দু' চোখ যেন জুড়িয়ে গেছে। এই তো সেবারে মাটির দেয়ালের গলা অবধি জল উঠে গেছল। তাই দেখে বাবার সে-কি উত্তেজনা আর ছোটাছুটি। যেন জল একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু লোপার কি ভালোই না লেগেছিল ওই জল দেখতে। তার মনে হত ঠিক যেমনটি হলে নদীর রূপ খোলে তাই হয়েছে। ওটার যেন অনেক দিনের তৃষ্ণা মিটেছে। সেই জলের দৃশ্য মনে আসতে রাতের স্বপ্নের ব্যাপারটা আবার মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই হেসে উঠল। তারপর কেমন বিমনা হয়ে গেল যেন।

জলের সঙ্গে বিশেষ করে রঙিলার সঙ্গে ওদের কিছু একটা অঘটনের যোগ আছে ও ইদানীং সেটা আঁচ করতে পারে। কিন্তু সঠিক করে কেউ কিছু বলে না ওকে। লোপার ধু-ধু মনে পড়ে তার একটা দিদি ছিল। নিজের দিদি। অনেক বড় তার থেকে, ঠাকুমার মুখে শুনেছিল এগারো বছরের বড়। মুখ মনে নেই, তবু ওর ধারণা বেশ সুন্দর ছিল দিদি দেখতে। ওর সঙ্গে খেলা করত, ওকে আদর করত। তার পর কবে যেন একদিন আর তাকে দেখল না। সেই সঙ্গে মা-কেও না। একেবারে ঠিক একই সঙ্গে কিনা বলতে পারে না। মায়ের মুখখানা লোপার স্পষ্টই মনে আছে। তার কারণ ঘরে বাবার সঙ্গে মায়ের একখানা ছবি আছে। মা যে খুব সুন্দর ছিল দেখতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অত যে পুরনো ছবি, তাতেও বাবার পাশে মায়ের মুখখানা যেন তাজা জুঁই ফুলের মতো দেখায়।

[illegible] কথা বিশেষ বলত না, কিন্তু মায়ের গল্প প্রায়ই করত। ঠাকুমা তো [illegible] মনে আছে সব। কতরকম গল্পই [illegible]... বাবার নাকি প্রথম

জীবনে সন্ন্যাসী হবার ঝোঁক চেপেছিল। এক-রকম জোর করেই মা-কে এনে ঠাকুমা সেই ঝোঁক ঝেঁটিয়ে তাড়িয়েছিল। কিন্তু ওই হতভাগী অর্থাৎ দিদি আসার দু বছরের মধ্যে বাবা নাকি আবার যে-কে সেই। ঠাকুমার মুখে লোপা দিদির নাম কখনো শোনে নি। হতভাগী, পোড়াকপালি, এই সব শুনেছে। যাক, বাবার তখন সংসারে মতি নেই, রোজগার-পাতির দিকে মন নেই। কোন্ এক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে একটানা তিন বছর বাড়ি থেকে উধাও। আর একবার কাশীতে গিয়ে আর ফেরার নাম নেই। সেখানে একজন অচেনা লোকের ভাঁওতা আর হুমকিতে ভড়কে গিয়ে ফিরেছিল। সে বলেছিল, বউ আর মেয়ে নিয়ে তোমার মা কাশীতে রওনা হল বলে। তার আগে ভালো চাও তো শিগ্‌গীর ঘরে ফেরো। এই করে একটানা প্রায় ন-দশ বছর ধরে বাবা নাকি ঠাকুমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে। ঠাকুমা তখন সাধু-সন্ন্যেসীর নাম শুনলেই জ্বলে উঠত। আরো জ্বালা, মায়ের তখন ফিটের ব্যামো ধরেছিল। যখন-তখন দাঁতে দাঁত লেগে পড়ে থাকত।...এক সাধুই নাকি আবার সব-দিক রক্ষা করল, ঠাকুমার ছেলেকে ঘরমুখো করে দিল। সেই সাধুকে মনে পড়লেই ঠাকুমা দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকাতো।

বাবার সেই ঘরে ফেরার গল্প লোপা হাঁ করে গিলত। খুব মজা লাগত শুনতে। সেই সাধু নাকি গেরুয়া পরত না, ধপ-ধপে সাদা থান পরত। তাঁর দাড়ি গোঁপ জটাজুটের বালাই ছিল না, ধূপ-ধুনো জ্বেলে চিমটে নিয়েও বসে থাকত না। দেখলে মস্ত পণ্ডিত মানুষ মনে হত। কাছেই পার্বতীপুর না কোথায় এসে মাস কয়েক ছিল সাধুজী। কোথা থেকে এসে ছিল কেউ জানে না, আর মাস কয়েক বাদে কোথায় আবার ডুব দিল তাও না। মাঝের কটা মাসে এমন নাম ছড়ালো তার যে অনেক দূর দূর থেকে ট্রেনে চেপে লোক আসত দর্শনের আশায়। আর বাবা তো দিবা-রাত্র তার কাছে পড়ে থাকত। ঘরে বসে ঠাকুমা তখন এই সাধুকেও গাল-মন্দ করত।

কিন্তু ভগবান সহায় বলেই সেই সময় মজার ব্যাপার ঘটল একটা। ওই সাধুরই কি একটা কাজে দু' তিন দিনের জন্য বাবাকে দার্জিলিং-এ ছুটতে হল। কিছু টাকা যোগাড়ের আশায় বাবা পথে নেমে পড়ে বাড়িতে এলো। কিন্তু মায়ের গয়না ছাড়া ঘরে আর তখন টাকা কোথায়? বাবাকে দেখেই মা ফিট। তবু বাবা নির্বিকার। বাক্স খুলে মায়ের একখানা গয়না বার করে নিয়ে চলে গেল। ঠাকুমাকে বলে গেল, দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় আবার নেমে মাকে দেখে যাবে।

বাবা চলে যাবার তিন-ঘণ্টার মধ্যে ঠাকুমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সটান স্টেশনে। আর ট্রেন থেকে নেমে সোজা সেই সাধুর কাছে। কিন্তু তাকে দেখেই ঠাকুমার সমস্ত রাগ জল হয়ে যাবার উপক্রম। এমন ঠাণ্ডা হাসিমুখ নাকি আর দেখে নি। তবু নিজের উদ্দেশ্য ভোলে নি ঠাকুমা। নিরিবিলিতে সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র এতকালের অভিযোগ উজাড় করে ঢেলেছে। কত লোকে কত কি প্রার্থনা করেছে, ঠাকুমা শুধু নিজের ছেলেকে ভিক্ষে চেয়ে এসেছে।

এর কিছুদিন বাদে মুখ চুন করে বাবা ঘরে এসে হাজির। ওই মূর্তি দেখেই ঠাকুমা বুঝেছে সাধু তার ভিক্ষে মঞ্জুর করেছে। কিন্তু ভিক্ষের কথা আর বাবা জানবে কি করে? মুখ কাচুমাচু করে ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছে, মা, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

ঠাকুমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। বলেছে, তুই আমার কে যে তোর ওপর রাগ করব?

তারপরেই তাজ্জব ব্যাপার। বাবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে একেবারে ঠাকুমার দুপা জড়িয়ে ধরেছে। বলেছে, সাধুজী অন্তর্যামী তিনি তোমার কষ্ট বুঝেছেন, আমি পাপী আমি বুঝি না। এবারকার মতো ক্ষমা করো মা, আর আমি কক্ষনো তোমার মনে দুঃখ দেব না।

কিন্তু এতকাল ভুগে ঠাকুমা অত সহজে নরম হবার পাত্রী নয়। তাছাড়া আবার যে মতি-গতি বদলাবে না তার বিশ্বাস কি। জবাব দিয়েছে তার হাড়-মাস কালি হয়ে গেছে, আর তার এ সংসারে থাকার ইচ্ছে নেই—অবিলম্বে তাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ছেলে আরো কাঁদে, পা আর ছাড়ে না। ছাড়বে কি করে, সাধুজী যে তাকে বলে দিয়েছে মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস না ঘোচাতে পারলে তার এ জন্মের সব মিথ্যে।

অনেকক্ষণ বাদে ঠাকুমা খানিকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। এক শর্তে থাকতে রাজি হয়েছে। এক বছরের মধ্যে নাতির মুখ দেখবে, তা যদি না দেখে তো যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

ঠাকুমা কতদিন তার গালে ঠোনা মেরে বলেছে, সেই নাতির বদলে একেবারে বাপের মুখ নিয়ে কোথা থেকে তুই এসে হাজির হলি—যেমন রূপ তেমন গুণ!

এই রূপ-গুণের জন্য ঠাকুমার সত্যি কোনো খেদ ছিল বলে লোপার মনে হয় না। উল্টে সরি পিসীর কাছে বলতে শুনেছে, বাপ-মুখো মেয়ে, ওরই সব থেকে ভালো হবে দেখে নিস।

লোপা ভালো মন্দ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কখনো। আর, মা বা দিদির মতো হোক, আয়নায় নিজের চেহারা নিজে ও খুব একটা খারাপ দেখে না। ঠাকুমার মুখে ওই গল্প যখন শুনত, তখন অনেক কিছুই বুঝত না। ঠাকুমার কল্যাণে এই জগতে আসতে পেরেছে, তাই ঠাকুমার ওপর বাবার থেকেও বেশি টান ছিল। এ জগতে ও না এলে কি-রকম হত তাও অনেক সময় ভাবতে চেষ্টা করেছে। বিচ্ছিরি লেগেছে ভাবতে। এই তিন বছরের মধ্যে ও আবার অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। যা বোঝে না তারও অস্পষ্ট আভাস পায়। এখন বাবার প্রসঙ্গে ঠাকুমার ওই গল্প মনে পড়লে কৃতজ্ঞতার বদলে গালে লালের ছোপ লাগে।

দুই

বই-খাতার বড়সড় থলেটা কাঁধে ঝুলিয়ে লোপা বেলা দশটার একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল। স্কুল এগারোটায়। প্রায় মাইল তিনেক পথ। একটানা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটতে হবে। এদিক থেকে আর যারা যায় তাদের মাস-বরাদ্দ সাইকেল রিকশ আছে। তিন-চারটে করে মেয়ে মিলে এক-একটা রিকশয় ওঠে। ধাড়ী মেয়েগুলো পর্যন্ত এ-ওর কোলে চেপে দিব্বি হাসতে হাসতে চলে যায়। লোপার বিচ্ছিরি লাগে। বাবার টাকা থাকলেও ও এ-ভাবে স্কুলে যেতে পারত না।

টাকা নেই বলে মনে কোনো খেদও নেই। বেশ খুশি মেজাজেই হেঁটে চলে যায়। গরমকালে একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতকালে আবার তেমনি ভালো লাগে। তবে সত্যিকারের অসুবিধে হয় বর্ষার সময়, সরি পিসী একটা ছাতা কিনে দিয়েছে, সেটা ওর চক্ষুশূল। তার থেকে ভিজতে মজা। কিন্তু গত বছর থেকে সেই মজাতেও ভাঁটা পড়ছে। এতদিন ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে বইখাতা বাঁচিয়ে জলের মধ্যে লাফাঝাঁপি করতে করতে বাড়ি ফেরা গেছে। কিন্তু গত বছর থেকে সরি পিসী ওকে ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ি ধরিয়েছে। সরি পিসী ধিঙ্গি মেয়ের ফ্রক-পরা দেখতে পারে না। চৌদ্দ গড়াতে না গড়াতে পিসীর চোখে হুট করে ও ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে গেল কি করে বুঝতে পারে না। এমনিতেই শাড়ি সামলানো দায়, তাব ওপর জল এলো তো জলেই পড়ল একেবারে। শাড়ি নিয়ে নাজেহাল এখন। ওর দুর্দশা দেখে রাস্তার বুড়ো লোকগুলো পর্যন্ত হেসে ওঠে। আর স্কুলের, উঁচু ক্লাসের অসভ্য ছেলেগুলোর তো কথাই নেই। মেয়েদের স্কুল থেকে ছেলেদের স্কুল দুটো দূরে নয়। একই পথে আনা-গোনা। এমনিতেই ওরা পিছু নেয়, দূর থেকে হাসাহাসি করে টীকা-টিপ্পনী কাটে। তার ওপর জলের মধ্যে শাড়ি নিয়ে সেই নাজেহাল অবস্থা দেখলে তো কথাই নেই। ওদের ড্যাবডেবে চোখগুলো তখন গেলে দিতে ইচ্ছে করে লোপার। চোখ দিয়ে যেন ভোজ গেলে সব। তাছাড়া লোপা নিজেও তখন একটা নতুন গোছের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। ফ্রক পবে ভেজার সময ঠিক এ-রকমটা হত না। শাড়ি আর জামা কিরকম যেন বিচ্ছিরিভাবে গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। লোপার নিজের তখন লজ্জা-লজ্জা করে।

ব্যাগ-কাঁধে হেলে দুলে রঙিলার ধার ধরে চলল। পাকা সড়কের থেকে এ-দিকটাই পছন্দ। ফলে একটু বেশি হাঁটতে হয়। তিন ভাগের এক ভাগ রাস্তা এমনি নিরিবিলিতে পাব হবার পর বাঁক নিলে আবার শহরের পাকা রাস্তা।

চাঁদোয়ার মতো মাটির দেয়ালটা পেরিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। চোখে আর ঠোঁটের কোণে দুষ্টু দুষ্টু হাসি। ওই দূরের উঁচু জায়গাটায় বটুকদা আজও ছিপ ফেলে বসে আছে। ওদিকের মাটি খানিকটা ঢালু তাই জলও একটু বেশি। বেশি বলতে বড় জোর হাঁটুর ওপর। ঢালু বলে খানিকটা জায়গা জুড়ে বড়-সড় ডোবার মতো হয়ে আছে। ওটুকু পেরুলে আগের যে-কে সেই, অর্থাৎ তকতকে বালির ওপর পায়ের পাতা ডোবা জলের তিরতিরে ধারা। আজ ক'দিন ধরেই লোপা দেখছে মাছ ধরার জন্য বটুকদা ওই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে লোপা বটুকদার এই এক নেশা দেখে আসছে। ছিপ জলে ফেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমনি মূর্তির মতো বসে থাকার নেশা। আজ পর্যন্ত কটা মাছ তুলেছে লোকটা লোপার সেই সন্দেহ। কিন্তু এতকাল তার ওই গুমটি ঘরের আশপাশেই এক-একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসত। তার গুমটি-ঘর ওই মাটির দেয়াল ছাড়িয়ে আরো আধ-মাইলটাক দূরে। ওদিকটায় বরং জল কিছু বেশি। ডুব-জলও হতে পারে কোথাও কোথাও।

কিন্তু ওদিক ছেড়ে বটুকদার হঠাৎ এদিকে মাছ ধরার খেয়াল হল কেন, লোপা ভেবে পায় না। ওখানে মাছ আছে কি নেই তাকালেই তো বোঝা যায়। ওইটুকু তকতকে

জলের নিচের সব কিছুই পরিষ্কার দেখা যায়। গত পরশুও স্কুলে যাবার পথে লোপা তার পিছনে প্রায় দশ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, শামুকও চোখে পড়ে নি তার।

অন্য লোকে ওই বটুকদাকে ভয় করে, কিন্তু লোপা পাগল গোছের একজন ভাবে তাকে। পাগল ভিন্ন আর কেউ বছরের পর বছর একেবারে একলা ওই গুমটি-ঘরে কাটিয়ে দিতে পারে? চারদিক ফাঁকা, কাছাকাছির মধ্যে জন-মানব নেই। ও-রকম একলা থাকতে থাকতেই এমন গোমড়ামুখো হয়ে গেছে বোধ হয়। ওখানে ওভাবে থাকতে হলে লোপা তিন দিনেই পাগল হয়ে যেত।

অবশ্য ওই গুমটি-ঘরে থাকাটাই কাজ তার। ওখানে বসে জল দেখাই চাকরি। জলে দাগ-কাটা কাঠি পুঁতে সেদিকে চেয়ে তপস্বীর মতো বসে থাকা। জল ওঠা-নামার মাপ দেখা। তাও শীতের সময় নদী যখন মরে যায় তখন শুধু ওই গজ কাঠিই পোঁতা থাকে, জল মাপার মানুষ তখন জায়গা বেছে বেছে মাছ ধরতে চলে যায়।

নাম ধরে কেউ ডাকে না। সকলে ওকে বলে গেজ্ রিডার। ওই গুমটি-ঘর তার আপিস, ওটাই তার সংসার। ঘরে একটা ন্যাড়া টেবিল, একটা কাঠের চেয়ার, কোণের দিকে একটা ক্যাম্প-খাটে বারোমাস জীর্ণ শয্যা পাতা। ঘরের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণীয় জিনিস টেবিলের ওপরের সরকারী টেলিফোনটা। লোপা শুনেছে বিষম সঙ্কটে পড়েও কেউ এসে যদি ওই টেলিফোন ব্যবহার করতে চায়, লোকটা মুখের ওপর সাফ বলে দেয়, হবে না।

একমাত্র লোপা ছাড়া বটুক তালুকদারকে কেউ কখনো হাসতে দেখেছে কিনা সন্দেহ। তার ধারে কাছে আসেই না কেউ দেখবে কি করে। পেল্লায় লম্বা-চওড়া মানুষ একটা, দরজার কবাটের মতো বুকের ছাতি, গালে খোঁচা-খোঁচা মোটা দাড়ি, মাথায় একগাদা ঝাঁকড়া চুল। দশ-পনের দিনেও একবার কামায় কিনা বা আড়াই মাসেও একবার চুল ছাঁটে কিনা সন্দেহ। অথচ গায়ের রং কালো হলেও দাড়ি কেটে চুল ছেঁটে পয়-পরিষ্কার হয় যখন, লোকটাকে লোপার অন্তত একটুও কুৎসিত মনে হয় না। একদিন ও বলেই ফেলেছিল, বটুকদা তুমি রোজ কামাও না কেন, অমন বিচ্ছিরিভাবে থাকো কেন?

বটুকদা ড্যাব-ড্যাব করে খানিক চেয়েছিল ওর দিকে। তখন যেন লোপার কেমন একটু ভয়-ভয় করেছিল। তারপর বটুকদা আচমকা খেঁকিয়ে উঠেছিল, আমি দাড়ি কামাই বা না কামাই, আর যেমন খুশি থাকি তোর তাতে কি?

লোপা ছুট সেখান থেকে, এক ছুটে একেবারে বাড়ির কাছাকাছি।

লোকটার ওই রকমই উগ্র মেজাজ সর্বক্ষণ। তবু নিষেধ সত্ত্বেও লোপা লুকিয়ে চুরিয়ে মাঝে মধ্যে তার কাছে না এসে পারে না। নিষেধ বাবার, আর তার চারগুণ কড়া নিষেধ সরি পিসীর। কখনো দেখা হয়েছে বা কথা হয়েছে জানতে পেলে বকুনির চোটে ভূত ছাড়াতে বসে যায় সরি পিসী। আর বাবারও তখন কি রকম যেন গম্ভীর গম্ভীর মুখ হয়। নিষেধের কারণ কি সঠিক করে কেউ বলে নি তাকে। কিন্তু লোপা খানিকটা অনুমান করতে পারে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর আর বয়েসটা পনেরয় গড়াবার পর ওর অনুমান-শক্তিটা যেন আপনা থেকেই অনেকখানি প্রখর হয়ে গেছে। সে-খবর বাবা বা সরি পিসী রাখে না, আগের মতোই ছোট ভাবে ওকে।

পাড়ার বয়স্ক মেয়েদের বাতাসে-ছোঁড়া কিছু কিছু কথা ওর কানেও ভেসে আসে। সেই সব জুড়ে জুড়ে ও এখন দু'য়ে দু'য়ে চার বানাতে পারে। এই করেই মনের মধ্যে বেশ একটা মজার ধারণা পুষছে এখন। ওর বিশ্বাস, ওর সেই এক সুন্দরী দিদির সঙ্গে বটুকদার ভাব-সাব ছিল। এই ধারণাটা পাকা করে নেবার আগে মনে মনে লোপা একটু হিসেব-পত্রও করে নিয়েছে।...বছর বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস হবে বটুকদার এখন। আর সেই দিদি বেঁচে থাকলে এখন বয়েস হত ছাব্বিশ। দিদি যখন মারা যায় লোপার বয়েস তখন সাত। দিদি ওর থেকে এগারো বছরের বড় ছিল।...তাহলে মারা যাবার আগে দিদির বয়েস ছিল আঠেরো। আর বটুকদার চব্বিশ-পঁচিশ।

...বাড়িতে ক্বচিৎ কখনো বটুকদার কথা উঠলে রাগের চোটে সরি পিসী অনেকগুলো বিশেষণ জুড়ে দেয়। গুণ্ডা বদমাস চোয়াড় চাষা—এই সব। রাগে তখন সরি পিসীর দু'চোখ জ্বলতে থাকে। এই থেকেও লোপা দু'য়ে দু'য়ে চার জুড়বার রসদ পায়। বয়েসকালে বটুকদা যে খুব একটু দুর্দান্ত বে-পরোয়া লোক ছিল, লোপা সেটা অনেকবার অনেক পড়শীর মুখে শুনেছে। দল বেঁধে রক্তারক্তি মারামারি করত, কারো ওপর বিরক্ত হলে দিনে দুপুরে বাড়ির দরজা-কবাট ভেঙে শাসিয়ে যেত, বিপদ হবে, সাবধান। সাবধান না হলে বিপদ হতও। কিন্তু তা বলে সরি পিসীর অত রাগ কেন? বটুকদার থেকে কম করে সাত-আট বছরেব বড়, সে-তো আর তার পিছনে লাগতে যায় নি।

অত রাগ তাহলে এক দিদির ব্যাপার নিয়ে ছাড়া আর কি হাতে পারে? এ যাবৎ আভাসে ইঙ্গিতে আর পড়শীদের ঠারে-ঠোরের কথাবার্তায় লোপা যেটুকু বুঝেছে তাতে তার অনুমান, দিদির সঙ্গে ওই বটুকদার কিছু একটা ব্যাপার ছিল।...যে-রকম বে-পরোয়া মানুষ, বটুকদা নিশ্চয় দিদিকে বিয়েই করতে চেয়েছিল। সেই জন্যেই বোধহয় বাবা মা ঠাকুমা আর সরি পিসীর রাগ বটুকদার ওপর। সেই রাগ এখনও পুষছে বাবা আর পিসী। বাবাকে নিয়ে লোপা মাথা ঘামায় না। এমনিতে ভীতু মানুষ, কারো সঙ্গে বিশেষ করে বটুকদার সঙ্গে লাগতে যাবে অত সাহস নেই। সরি পিসী তাতিয়ে দেয় বলেই মাঝে মাঝে রেগে ওঠে।

...লোকটার প্রতি দিদির সুনজর ছিল কিনা লোপা তা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছে। ওর ধারণা তলায় তলায় টান একটু ছিলই। নইলে এক তরফা আর ব্যাপার গড়ায় কি করে? বটুকদা তো তখন আর এ-রকম এক-মাথা চুল আর এক-গাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে বসে থাকত না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই থাকত নিশ্চয়। অনুমানের পরিধি আরো বিস্তার করতে চেষ্টা করেছে লোপা। মনে হয়, দিদি হুট করে মরে যেতেই লোকটা অমন বদলেছে। তার দুরন্তপনা গেছে, বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচেছে, আর ওই-রকম নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। ওর বদ্ধ বিশ্বাস, দিদিকে ওই লোক আজও ভুলতে পারে নি। পারে নি বলেই দুনিয়ার সক্কলকে ছেড়ে শুধু লোপার ওপরেই একটু যা টান আছে। টানটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। ও বে-খাপ্পা কিছু করে বসলে, বা বলে বসলে আগে তো তেড়ে মারতেই আসত। অতটা না করুক, এখনো ওই দাড়ি ভরতি মুখ নিয়ে যে-ভাবে তাকায় আর সময় সময় এমন ধমকে ওঠে যে অন্য মেয়ে হলে আর এ-মুখো হতে ভয় পেত। তবু দিদির জন্যেই তলায় তলায় একটু টান যে আছে ওর ওপর লোপার তাতে কণামাত্র সন্দেহ নেই। ও টক-ঝাল লজেন্স খেতে ভালোবাসে, বটুকদার গুমটি-

ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে সে-জিনিসটা মজুতই থাকে। তাছাড়া সময়কালের কাঁচা-মিঠে আম জাম জামরুল ডাঁশা পেয়ারা—এ-সবও থাকে। কার জন্যে থাকে বটুকদা সেটা মুখ-ফুটে না বললেও ও বেশ বুঝতে পারে। টানের নজির আরো আছে। বছর পাঁচেক আগের কথা, লোপা কতটুকুই বা মেয়ে তখন। রোদে তেতে পুড়ে অত দূরের স্কুলে হেঁটে যেতে হয় বলে বটুকদা একদিন রেগেই গেছল। ওকে ডেকে বলেছিল, তোর বাবাকে বলিস মাস-ভাড়ার একটা সাইকেল রিকশ যেন ঠিক করে দেয়, নইলে বিদুষী হবার আগে মরে পেত্নী হয়ে যাবি। বলিস টাকা না থাকে তো আমি দেব। তারপরেই আবার কি ভেবে বলেছে, আচ্ছা থাক, আমার কথা বলিস না।

যত ছোটই হোক, কোনো কথাই না বলার মতো বুদ্ধি লোপার তখনো ছিল। বটুকদার সঙ্গে ওর ভাব আছে জানাজানি হয়ে গেলে সরি পিসী বঁটি নিয়ে তেড়ে আসবে। এর পর বটুকদা যখন আবার জিজ্ঞেস করেছে, বাবাকে রিকশর কথা বলেছিলে, ও অম্লান-বদনে মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ বলা হয়েছে। তারপর আমতা-আমতা করে জানিয়েছে, বাবা বলল, হেঁটেই বেশ যেতে পারবি, তাতে শরীর ভালো হবে।

এই গোছের কথা একদিন সরি পিসী সত্যিই বলেছিল। সেটাই বাবার নামে চালিয়ে দিয়ে বাঁচোয়া। তাই শুনে বটুকদা বিড়বিড় করে কি-যেন একটা গালাগাল দিয়ে উঠেছিল, লোপা বুঝতেই পারে নি।

কিন্তু বটুকদার সঙ্গে ওর খাতিরটা মাস সাত-আষ্টেক আগে জানাজানি হয়েই গেল। হল বটুকদার জন্যেই। অমন বিদঘুটে স্বভাবের মানুষ লোপা আর জম্মে দেখে নি। হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে ফিরেই ধুম জ্বর ওর। তারপর কটা দিন যে ঘোরের মধ্যে কেটে গেল লোপা জানে না। জ্ঞান হবার পরেও জ্বর সিকেয় চড়েই থাকল। পাড়ার কবরেজমশাই দু' বেলা এসে ওকে দেখে যেত। দেখার টাকা নিত না, শুধু ওষুধের দাম নিত। সে-ওষুধ গিলতে লোপার প্রাণান্ত।

হঠাৎ বাইরে থেকে বাবার গলা কানে এলো। সরি পিসী না কাকে বলছে, ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার হলে তো গেছি—

শোনামাত্র লোপার হৃৎকম্প। কিছুদিন আগেই ওদের ক্লাসের এক মেয়ের বাবা ওই অসুখে মরে গেছে। ওই অসুখ হলে সচরাচর যে বাঁচে না তাও জানে। জ্বরের ঘোর আর মাথার সেই যন্ত্রণার মধ্যেও কেঁদে কেঁদে লোপা ঠাকুরের কাছে কত যে প্রার্থনা করেছিল ঠিক নেই। পরদিন সকালেই তাজ্জব ব্যাপার! শহর থেকে এক বড় ডাক্তার সঙ্গে করে বটুকদা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে হাজির। লোপার ত্রাস, বাবা আর সরি পিসী হতভম্ভ।

অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার দেখল তাকে। ইংরেজিতে একটু কড়া-গলায় বাবাকে কি যেন বলল। কাগজ চেয়ে নিয়ে ওষুধ লিখল, আর কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল। পিছনে পিছনে বটুকদাও। আধ-ঘণ্টা বাদে বটুকদা একা ফিরল, হাতে এক গাদা ওষুধ-পত্র, আর ফল।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাবা বা সরি পিসী একটিও কথা বলে নি। আর যন্ত্রণার থেকেও আসলে ভয়ে লোপা চোখ বুজে পড়েছিল। একটা ওষুধ দেখিয়ে বটুকদা বাবাকে বলল, এটা এক্ষুনি খাইয়ে দিন।

বাবা তক্ষনি তাই করল। বটুকদা আবার বলল, এই পুরিয়াটা আধ-ঘণ্টা বাদে দেবেন, আর এগুলো—

ব্যস্ত মুখ করে বাবা বলে উঠল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি সব বুঝে নিয়েছি আর প্রেসকৃপশনেও লেখা আছে, আমি ঠিকমতো সব দেব'খন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও—

বটুকদা কি-রকম চোখ করে যেন চেয়ে রইল বাবার দিকে। তারপর বলল, আমি চলে গেলে সব ফেলে দেবেন?

—সে কি কথা! তুমি এত কষ্ট করে নিয়ে এলে...কত টাকা না জানি লেগেছে, তাছাড়া অত বড় ডাক্তারের ভিজিট...ফেলে দেব কেন!

বটুকদা ঘাড় ফিরিয়ে সরি পিসীকে দেখল একবার। তারপর বাবাকে বলল, কাল কেমন থাকে ডাক্তারকে জানাবেন—

বাবা কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়তে বটুকদা চলে গেল।

এর দিন-সাতেকের মধ্যে লোপা উঠে চলা-ফেরা করতে পারল। কিন্তু আশ্চর্য, ওই ক'দিনের মধ্যে বাবা বা সরি পিসী বটুকদার সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে নি তাকে। ফলে লোপা নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে বোকামি করেছে। সরি পিসী হঠাৎ একদিন জাঁতা-কলে ইঁদুর আটকানোর মতো করে চেপে ধরল ওকে।

—তোর অসুখ করেছিল ও-পাজিটা জানল কি করে? ও বড় ডাক্তার নিয়ে এলো কেন!

সরি পিসীর ড্যাবডেবে দু' চোখ যেন আঠার মতো তার মুখের ওপর আটকে থাকল। গলার স্বরে চাপা ঝাঁঝ।—তোর অসুখ ও কি করে জানল?

ভাবার অবকাশ মিলল না লোপার। মাথায় যা এলো তাই বলে দিল। বলল, ক'দিন স্কুলে যেতে আসতে দেখে নি, তাই বোধহয়—

—রোজ স্কুলে যেতে আসতে দেখা হয় তোর সঙ্গে? তোকে ডাকে? কথা বলে?

জবাবে লোপা বেশ বিশ্বাসযোগ্যভাবে মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ ও-সব কিছু করে না। একেবারে ডাহা মিথ্যে নয় অবশ্য। কারণ বটুকদা তখন এদিকে মাছ ধরতে আসত না। ও গুমটির ও-দিকে গেলে তবে দেখা হত। সেটা ঘন ঘন হলে একেবারে নৈমিত্তিক নয়। আর বটুকদা নিজে থেকে কখনো ওকে ডাকে না। ও-ই যায়। আর কথা বলা? গোমড়ামুখো বটুকদা ক'টা কথা বলে হাতে গোনা যায়। যতক্ষণ থাকে বক-বক সারাক্ষণ বরং ও-ই করে।

পিসী আর জেরা করল না বটে, কিন্তু চোখ-মুখ থমথমে।

এর দিন কুড়ি-পঁচিশ বাদে এক শনিবারের বিকেলে বাবা হঠাৎ একদিন ডাকল ওকে, আমার সঙ্গে আয় তো—

লোপা অবাক একটু। বাবা এ-ভাবে বড় ডাকে না। সর্বদা নিজের মনে থাকে, আর শোনার লোক পেলেই অনর্গল কত রকমের সম্ভব-অসম্ভব কথা বলে ঠিক নেই। হাতে তেমন সময় না থাকলে চেনা লোকও যে তাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে, লোপা সেটা বেশ বুঝতে পারে। এ-জন্যে ওর রাগও হয় দুঃখও হয়। যাই হোক, গল্প করার জন্য বাবা ওকে সঙ্গে ডাকছে একবারও মনে হল না।

বিকেলের দিকে চুপি চুপি সেদিন একবার গুমটির দিকে যাবে ঠিক করেছিল। অনেক দিন হয়ে গেল, এখন আর ওর ওপর কারো কড়া চোখ নেই বলেই ধারণা। বাবা ডাকতে সে-চিন্তা বাতিল করে দিল। কাল রোববার, ফাঁক পেলে কাল যাবে...।

বেরুবার মুখেই বাধা। সরি পিসী দাওয়ার তার থেকে শুকনো কাপড় তুলছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করল, তুই আবার কোথায় চললি?

—বাবা ডাকল যে।

সরি পিসীর বিরক্তি-ভরা দু' চোখ বাবার মুখখানা চড়াও করল।—ওকে আবার সঙ্গে নেবার কি দরকার?

কারো জোরে কথা শুনলেই অমন কাচুমাচু মুখ দেখে বাবার ওপরেই রাগ হয় লোপার। আর সরি পিসী যেন ধমকধামকের ওপরেই রেখেছে বাবাকে।

মিনমিন করে বাবা জবাব দিল, খোলা হাওয়ায় একটু বেড়িয়ে আসবে...আমি তো সঙ্গে আছি...

সরি পিসী আর আপত্তি করল না বটে, কিন্তু পছন্দ যে হল না সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। বাইরে এসে বাবা যেন হাঁপ ফেলে বাঁচল। লোপার দ্বিগুণ কৌতূহল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সঙ্গ ধরে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ বলো না বাবা?

পিসীর হাত থেকে ছাড়া পেয়েও সে-রকম খুশি মুখ দেখল না বাবার। কেমন যেন বিমর্ষ মনে হল। বিড়বিড় করে জবাব দিল, চল না...

অগত্যা মুখ বুজেই চলল। আর যত এগোচ্ছে ততো বিস্ময়। তারা নদীর দিকে চলেছে। শুধু নদীর দিকে নয়, চাঁদোয়ার মতো মাটির দেয়াল ছাড়িয়ে ওই গুমটি-ঘরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনই বলে দিল, কোথায় চলেছে। বটুকদার কাছেই নিশ্চয়। নইলে সরি পিসী ওই কথা বলত না, বা তার অমন হাঁড়ি-মুখ হত না। কিন্তু কেন! কেন...

কি এক অজানা আশঙ্কায় বুক দুরু-দুরু।...সরি পিসীর পাল্লায় পড়ে বাবা কি বটুকদাকে জেরা করতে চলল?

গুমটি-ঘরের দরজার কাছে এসে বাবা থামল। লোপাও। ও-দিক ফিরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বটুকদা শুকনো নদী দেখছে। বাবা বলল, তুই একটু ইদিকওদিক বেড়া, বেশি দূরে যাস নি যেন, আমি এক্ষুনি আসছি—

বাবার স্বভাব জানে, তবু ভয় যায় না লোপার।—তুমি ঝগড়া-ঝাঁটি কোরো না যেন বাবা!

এতক্ষণে বাবাই যেন উল্টে অবাক একটু। তারপর বলল, দূর পাগলি, ঝগড়া করব কেন!

ভিতরে ঢুকে গেল। লোপার বেড়ানো মাথায় উঠল। দু'-এক পা এ-ধারে সরে এলো। নইলে বটুকদা ফিরলেই ওকে দেখতে পাবে। তারপর সন্তর্পণে গলা বাড়ালো। শুধু বাবাকেই দেখা গেল। বুক-পকেটে হাত দিয়ে বাবা কি বার করছে, আর কি বলছে।

...লোপাকে সবাই ছোট ভাবে এখনো। কিন্তু সত্যিই সেই ছোটটি এখন আর নয় ও। অনেক কিছুই বুঝতে পারে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর উঁকি দেবার দরকার নেই, কি ব্যাপার ও ঠিক বুঝে নিয়েছে। বাবা টাকা দিতে এসেছে। ওর অসুখটার জন্যে ডাক্তারে আর ওষুধ-পত্রে বটুকদার অনেক টাকা খরচা হয়েছে। সেই টাকা। ভিতরে ভিতরে খুশিই

হল একটু। বাবা ভালো কাজই করছে। মিনিট আট-দশ বাদে বাবা বেরিয়ে এলো। তার পিছনে বটুকদা। সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেল। আর ওর দিকে চেয়ে রইল।

—চল্।

আবার পাশাপাশি ফিরে চলেছে। খানিকটা আসার পর লোপা একবার ঘাড় না ফিরিয়ে পারল না। বটুকদা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি চেয়ে আছে। খুশি মুখেই লোপার একবার জিভ ভেঙচে দিতে ইচ্ছে করছিল। বাবার জন্য পারা গেল না।

চাঁদোয়া দেয়ালের এ-ধারে বাঁক নিয়ে লোপা বাবার দিকে তাকালো। মুখখানা আবার তেমনি বিরস আর শুকনো লাগছে। হঠাৎ ওর-ও মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। মাসের মধ্যে অনেক দিন যে খানিকটা টানা-টানির মধ্যে চলে তা ও ভালোই জানে।

—আচ্ছা বাবা, আমার অসুখের জন্য তোমার অনেকগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল, না?

সচকিত হয়ে বাবা তাকালো ওর দিকে—কেন রে? তারপর নিজেই আবার বলল, আর হলেই বা, তার বদলে তুই যে চট করে ভালো হয়ে উঠলি সেটা কম কথা নাকি!

বাবা এ-রকম বলবে জানা কথাই। টাকার কথা ভেবেই মুখ শুকনো ধরে নিল। কেন যে ছাই ও-রকম একটা অসুখ হয়ে বসল। তক্ষুনি আবার মনে হল, বটুকদা তো টাকাগুলো না নিলেই পারত। না-হয় হয়েই ছিল কিছু টাকা খরচ, একলা মানুষ, কে আব আছে তার। তাছাড়া নিজেই তো বড় ডাক্তার এনে হাজির, কেউ তো আর সেধে আনতে বলে নি তাকে।

কি যেন খটকা লাগল আবার। জিজ্ঞেস করল, বটুকদা টাকা নিল?

বাবার দু'চোখ ওর মুখের ওপর থমকালো আবার।—তোকে কে বলল।...বাইরে থেকে চুপি দিয়ে দেখলি বুঝি? জবাব না পেয়ে আবার বলল, নিতে চায় নি, তোর পিসীর কথা বলে জোর করে পকেটে গুঁজে দিয়ে এলাম।

শুনে বটুকদার ওপর মনটা আবার প্রসন্ন হল একটু। দুই-এক পা এগিয়ে বাবা মন্তব্য করল, সময়ে বড় ডাক্তার এনে ও খুব ভালো কাজ করেছে, নইলে অসুখটা কোন দিকে গড়াতো কে জানে। আমিও আজ হুট করে কিছু টাকা পেয়ে গেলাম আর ওকে দিয়ে ফেললাম—ভালো হল না?

লোপা মাথা নেড়ে সায় দিল। সেই সঙ্গে মনে হল বাবার শুকনো মুখ তাহলে টাকার জন্যে নয়। ভয়ে ভয়ে তার মুখখানা দেখে নিল একবার, তারপর মনে যা এসেছে বলেই ফেলল।—আচ্ছা বাবা, বটুকদা বেশ ভালো লোক, তাই না?

মাথা নাড়তে গিয়েও বাবাকে যেন চমকে উঠতে দেখল লোপা। কথা শুনে আরো অবাক।

—না না, একটুও ভালো লোক না ও, খুব খারাপ লোক। তুই যেন কখনো মিশিস-টিশিস না ওর সঙ্গে, তোর পিসী শুনলে ভয়ানক রাগ করবে!

পিসীর রাগের খুব একটা পরোয়া করে না লোপা। অন্তত বাবার মতো অতোটা করে না। কিন্তু সদ্য বর্তমানে তার কৌতূহলটাই বড়। বাবা ঠিক এ-রকম করে কখনোই কাউকে খারাপ বলে না। বাবার মুখে শুধু প্রশংসা ছাড়া কারো নিন্দা বড় একটা শোনে না। জিজ্ঞেস করল, খারাপ কেন বাবা? বটুকদা কি করেছে?

—আমি জানি না।...তোর মা খারাপ বলত, তোর ঠাকুমাও বলত, আর তোর পিসী এখনো বলে।

বাবাকে লোপা আর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু নিজের মনে অনেক ভেবেছে। ...দিদিকে বিয়ে করতে চেয়ে বটুকদা এমন কি অন্যায় কাজ করেছে? দিদিকে মনে নেই, তাই দিদির জন্যে শোকও নেই। কিন্তু ওই দিদির জন্য লোকটা এ-রকম হয়ে গেছে মনে হতে উল্টে বরং তার জন্যেই দুঃখ হয়। মা বলুক, ঠাকুমা বলুক, আর পিসীই বলুক, বটুকদাকে ও খারাপ লোক ভাবতে পারে নি।...এই যে এতবড় অসুখটা হয়ে গেল ওর, বটুকদা না থাকলে কি বাঁচত এ যাত্রা? কি ভয় না ধরেছিল লোপার, আগের দিন কেঁদে কেঁদে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করল, আর পরদিনই একেবারে ডাক্তার সঙ্গে করে বটুকদা এসে হাজির। লোপার বিশ্বাস ভগবানই পাঠিয়েছে তাকে। বটুকদা খারাপ লোক হলে এটা সম্ভব হয় কি করে?

পরের ছটা মাসে অবশ্য লোপা আর অত ঘন ঘন গুমটির দিকে যায় নি। খুব নিরাপদ বুঝলে, অর্থাৎ সরি পিসী বেশ সময় নিয়ে কোথাও গেলে-টেলে তবে চুপি চুপি গুমটির দিকে পা বাড়িয়েছে। আজ ক'দিন হল বটুকদাকে এখানে এসে ছিপ ফেলে বসতে দেখছে।

লোপার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। ছিপ ফেলে একেবারে পাথরের মৌনীবাবার মতো বসে আছে। গা-হাত-পা একটুও নড়ছে না। গতকাল পথে আরো দুই একটা মেয়ে জুটে গেছে বলে ভরসা করে লোপা ও-দিকে পা বাড়াতে পারে নি। আজ একা বলেই দুষ্টুমি চাপল মাথায়।

চট করে চারদিক দেখে নিল একবার। দেখেফেলার মত ধারে-কাছে কেউ নেই। মাটি থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। বালিতে পায়ের শব্দ হবে না জেনেও সন্তর্পণে এগিয়ে চলল।

যা চেয়েছিল তাই হল। বটুকদা ভালো মতোই চমকে উঠল। পিছন থেকে পাথরটা পড়বি তো পড় একেবারে ফাতনার মাথার ওপর।

অত চমকে উঠতে দেখে লোপা খিলখিল করে হেসে উঠল। তার পরেই ত্রাস। বটুকদা সরোষে ঘুরে তাকালো প্রথম, তারপর ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে খপ করে ওর শাড়ির তলাটা মুঠো করে ধরে ফেলে হিড়হিড় করে কাছে টেনে নিয়ে এলো। জোর করলে হয় শাড়ি ছিঁড়বে নয় তো খুলে যাবে।

—ও বটুকদা, আমি স্কুলে যাচ্ছি, নোঙরা হাতে শাড়িটা তুমি কি করে ফেললে!

এ-ভাবে চেঁচিয়ে উঠতে ঈষৎ অপ্রতিভ বটুক তালুকদারের হাতের মুঠো ঢিলে হয়ে গেল। সেই ফাঁকে লোপা পাঁচ হাত দূরে। রাগত মুখে মাথা নুইয়ে শাড়িটা দেখে নিল। দাগ-টাগ পড়ে নি, একটু কুঁচকে গেছে শুধু।

—তুমি একটা অসভ্য!

—তুই এ-ভাবে ঢিল ছুঁড়লি কেন?

ভ্রূকুটিটা যে সত্যিকারের রাগ নয়, লোপা বুঝতে পারে।—বেশ করেছি। নদীতে যত খুশি ঢিল ছুঁড়ব, নদী তোমার?

—নদী যারই হোক, বড়শি আমার, তুই ওটার ওপর ঢিল ছুঁড়বি কেন?

দেখা হলেই লোপা এমনি ছদ্ম কলহের ছুতো খোঁজে। জবাব দিল, তুমিই এখানে এসে ছিপ ফেলে তীর্থের কাকটির মতো বসে থাকো কেন, ওখানে একটাও মাছ আছে?

—মাছ নেই তুই দেখেছিস?

—হ্যাঁ, পরশু দেখেছি।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরতি মুখে হাসির আভাস দেখা দিল। চেয়ে আছে।—আচ্ছা, এদিকে আয়।

—না। ফের তুমি দুষ্টুমি করবে।

—কিছু করব না, আয়। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বড় একটা ঠোঙা বার করল।—ক'দিনে তোর অনেক লজেন্স জমে গেছে, চাটনি লজেন্সও আছে, নিয়ে যা।

অগত্যা এগিয়ে এলো। ঠোঙা নিল। ভিতরের বস্তু দেখে নিয়ে বলল, এত দিয়ে কি করব?

—অন্য মেয়েদেরও দিস, এবং অতগুলো খাস না যেন, পেট খারাপ হবে। ...আজকাল তুই গুমটির দিকে যাস না কেন?

সদুত্তর দিয়ে ওঠা গেল না। বলল, কি করে যাই, যেমন পড়ার চাপ তেমনি কাজের, সরি পিসী আজকাল একা আর পেরে ওঠে না। ডাহা মিথ্যে কথাটা পাছে মুখের দিকে চেয়েই বুঝে ফেলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কথা ঘোরালো। দু' চোখ কপালে তুলে বলে উঠল, ও বটুকদা আজ ভোর-রাতে কি যাচ্ছেতাই স্বপ্ন দেখে উঠলাম সে যদি জানতে! দেখলাম বন্যায় চারদিক একেবারে ডুবে গেছে আর তার মধ্যে আমি একলা ভাসছি —এক-একবার দম একেবারে বন্ধই হয়ে যাচ্ছে—সে কি যন্ত্রণা!

মুহূর্তের মধ্যে কারো মুখ এমন বদলে যেতে লোপা আর দেখে নি বোধহয়। ওর সেই দম-বন্ধ যন্ত্রণাই যেন বটুকদার মধ্যে শুরু হয়ে গেল। কালো-কালো দাড়ি-ভরা সমস্ত মুখ আর চোখ দুটো আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যেতে লাগল তারপর। লোপা ঘাবড়েই গেল। স্বপ্নের কথা শোনার পর বাবার মুখও অন্য-রকম হতে দেখেছিল। কিন্তু সে-ও এ-রকম নয়।

—কি হল?

সঙ্গে সঙ্গে ছিপটা তুলে আচমকা ওর মাথার ওপর উঁচিয়ে ধরল বটুকদা। নিমেষে বীভৎস উগ্র মূর্তি। এক্ষুনি বসিয়ে দেবে বুঝি এক ঘা। লোপা সভয়ে তিন পা পিছিয়ে এলো।

—যা! যা এখান থেকে! ও-দিকে স্কুলের সময় হয়ে গেল আর তুই এখানে ইয়ারকি দিতে এসেছিস?

লোপা হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপরেই কয়েক পা দৌড়ে চলে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। রাগের চোটে হাতের লজেন্সের ঠোঙাটা সজোরে তার দিকে ছুঁড়ে মারল। তারপর আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে বালি ভেঙে হনহন করে চলল।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে চলতে লাগল। বটুকদার এই মূর্তি আর কখনো দেখে নি। বেশি জ্বালাতন করলে অনেক সময় ধমক-ধামক করেছে বটে, কিন্তু সেটা এমন বিচ্ছিরি কর্কশ মনে হয় নি কখনো। সরে না এলে ছিপের এক-ঘা মুখের ওপর বসিয়েই দিত

বোধ হয়। না, আর ও তার ধারে-কাছে যাবে না, কক্ষনো না, কোনদিন না। ডাকলেও না। বাবা আর সরি পিসী ঠিকই বলে বটুকদা একটুও ভালো লোক না, রেগে গেলেও ভালো লোকের চোখমুখ কক্ষনো অমন বিচ্ছিরি হয় না। বটুকদা খুব খারাপ লোক।

কিন্তু যত পথ ভাঙছে রাগের বদলে বিস্ময় বাড়ছে ওর।...স্বপ্নের কথা আর বন্যায় ভাসার কথা বলামাত্র বটুকদার চোখ মুখ ও-রকম হয়ে গেল কেন? আর তারপর অমন রেগেই বা গেল কেন? স্বপ্ন দেখার ওপর কার হাত আছে—ও কি ইচ্ছে করে স্বপ্ন দেখেছে নাকি! যত ভাবছে ততো অদ্ভুত লাগছে ওর। রাগ গিয়ে উদগ্র কৌতূহল বড় হয়ে উঠছে। এখন থেকে-থেকে মনে হচ্ছে, ও বন্যার স্বপ্ন দেখেছে বলেই বটুকটা অমন মারমুখী হয়ে ওঠে নি। সত্যিকারের বন্যায় তারও নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু অঘটন ঘটে গেছে। পাছে স্বপ্ন আবার সত্যি হয়, আর লোপারও সত্যিই বিপদ ঘটে সেই জন্যেই হঠাৎ অমন পাগলের মতো হয়ে গেছল। এ-ছাড়া আর কি হতে পারে?

গায়ের ওপর লজেন্সের ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে বলেই এখন আবার খারাপ লাগছে লোপার। কিন্তু বন্যায় বটুকদার এমন কি গেল যার জন্যে এ-রকম পাগলের মতো কাণ্ড করতে পারে? তার বাবা-মা ভাই বোন কেউ নেই—তারা কি সব বন্যায় গেছে নাকি তাহলে? শিউরে উঠতে গিয়ে চকিতে আরো চমক-লাগানো কিছু মনে পড়ল। ওরও দিদি নেই, এদিকে বন্যার কথা উঠলেই বাবারও চোখ-মুখ অন্য রকম হয়ে যায়। একটু বেশি ঝড় জল হলেই বন্যার ছায়া দেখে, বন্যা-বন্যা করে মাথা ঘামায়, লোককে বিরক্ত করে। সেই মুহূর্তে স্বপ্নের আর একটা দৃশ্য মনে পড়ল। ছোট বয়সে দাওয়ায় বসে দুলে দুলে পড়াটা, জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না, জলের আর এক নাম জীবন—তাই শুনে ঠাকুমা ক্ষেপে উঠেছিল, মরণ-মরণ বলে চেঁচিয়ে উঠে যেন মারতে এসেছিল ওকে। এতকাল বাদে স্বপ্নে আবার সেই দৃশ্যই ফিরে দেখেছে। ওটা মন-গড়া স্বপ্ন আদৌ নয়। ও-রকম ঘটেছিল। ঠাকুমা ওই-রকম বলেছিল। লোপার স্পষ্ট মনে আছে।

...দিদিকে বন্যায় টেনে নিয়ে গেছে এ-রকম একটা ধারণা আজকাল ওর মনের তলায় উঁকি-ঝুঁকি দেয় প্রায়ই। কিন্তু সে-চিন্তার চিত্রটা এত মর্মান্তিক যে মনে এলেও মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বাবা বা সরি পিসী শুধু দুঃখু পাবে বলে অথবা একটা মর্মান্তিক দৃশ্য মনের তলায় ঠাঁই নেয় বলে লোপা তাদের কখনো জিজ্ঞেস করে না ওর দিদি কি হয়ে অকালে চলে গেল। অনেক কিছু বিশেষ করে শোকের ছবি কল্পনায় দেখার চেষ্টাটা যেন একটা রোগের মতো পেয়ে বসে ওকে। তার থেকে না জানাই ভালো, না শোনাই ভালো।

কিন্তু আজ আর ওই চিন্তাটা ঠেলে সরানো গেল না। বরং দশগুণ বেশি ছেঁকে ধরল।...দিদির ওই গোছের কিছু অঘটন ঘটেছে বলেই স্বপ্নের কথা শোনামাত্র অমন অস্বাভাবিকভাবে ক্ষেপে ওঠে নি তো বটুকদা? সেই শোকে, আর পাছে স্বপ্নের কথা আবার ওর বেলাতেও সত্যি হয়ে যায়, সেই ভয়ে?

স্কুল ফেলে ফিরে আবার ওই নদীর ধারে ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে লোপার। গিয়ে বটুকদার মুখখানা ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করছে।

...দিদির কথা এমনিতে বিশেষ মনেও পড়ে না ওর। কিন্তু ইদানীং অনেক কিছু বুঝতে শেখার পর বটুকদাকে দেখলেই মনে পড়ে। শুধু তার মুখ থেকেই দিদির কথা

শুনতে ইচ্ছে করে। আধা ভয়ে আর আধা সঙ্কোচে জিজ্ঞেস করে উঠতে পারে না। কিন্তু আজ শুধু বটুকদার কাছে ছুটে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না, ফিরে গিয়ে অনেক কিছু জানতেও ইচ্ছে করছে।

বেশ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন আবার শক্ত মাটিতে ফিরল লোপা। অদূরে তার যম দাঁড়িয়ে। ওর দিকেই চেয়ে আছে, ওকেই দেখছে। অঙ্কের টিচার সি বি রে—মিস ছিবড়ে। ক্লাসে ঢোকার পথে ওকে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেছে।

লোপা কখন স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে, কখন বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে গেছে, খেয়াল নেই। সভয়ে চারদিকে তাকালো একবার। এক ও ছাড়া আর একটি মেয়েও বাইরে নেই। অর্থাৎ ঘণ্টা বেজেছে আর মেয়েরা যে-যার ক্লাসে ঢুকেছে।

লোপা পড়ি-মরি করে ছুটল।

তিন

কিভাবে যে লোপার দিন শুরু হয়েছে আজ ভগবান জানে।

মিস ছিবড়ে রোল-কল করছে। প্রথম ঘণ্টায় তারই ক্লাস, আজ আবার শেষের ঘণ্টায়ও। প্রথম ঘণ্টায় অঙ্কের জেনারেল ক্লাস, শেষের ঘণ্টায় অপশনাল।

দোরগোড়ায় এসে শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট একবার ঘষে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভিতরে আসব...?

—নো!

শুকনো সরু চেহারা বটে মিস ছিবড়ের, কিন্তু গলার আওয়াজখানা তেমন সরু নয়। ধমকে ওঠে যখন সেটা কানের পরদায় ঠাস করে লাগে।

ওদিকে রোল-কল্ চলতে লাগল। লোপার রোল-নম্বর আসতে সে মৃদু গলায় দোর-গোড়া থেকেই সাড়া দিল, প্রেজেণ্ট ম্যাডাম...

—ডোণ্ট শাউট ফ্রম্ দেয়ার, কীপ্ সাইলেণ্ট।

অন্য মেয়েরা আড়ে আড়ে দেখছে ওকে, ওর দুরবস্থাটা উপভোগ করছে। কেউ কেউ আবার হাত নেড়ে দুর্বোধ্য কিছু ইশারা করছে। হাত জুড়ে ক্ষমা চাইবার ইশারা বোধহয়। মিস ছিবড়ের ক্লাসে কেউ পাঁচ সেকেণ্ড দেরিতে এলেও রেহাই নেই। ভয় ধরলেও ভিতরে ভিতরে রাগও হচ্ছে লোপার, ইচ্ছে করছে হনহন করে হেঁটে আবার বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু অত সাহস নেই।

নাম ডাকা শেষ করে রেজিস্ট্রি খাতাটা ঠাস করে টেবিলের ওপর ফেলে দরজার দিকে চোখ ফেরালো।

—বাগান দেখা হয়েছে?

লোপা নীরব। অন্য মেয়েদের মুখে চাপা কৌতুক।

—ভিতরে আসতে চাও কেন, এখন বসে কবিতা লিখতে হবে?

ক্লাস-সুদ্ধ মেয়ের চাপা হাসির গুঞ্জন।

—সাইলেণ্ট! হুমকিটা ক্লাসের উদ্দেশ্যে।—কাম্ ইন! আঙুল দিয়ে একেবারে প্রথম বেঞ্চির প্রথম সীট দেখিয়ে হুকুম করল টেক ইওর সীট হিয়ার!

ফলে প্রত্যেক বেঞ্চির একটা করে মেয়ে কলের মতো উঠে গিয়ে পরের বেঞ্চিতে বসল। লোপা প্রথম আসনে। সূচনা দেখে শুধু সে কেন, ক্লাসের প্রত্যেক মেয়েই বুঝছে আজ আর নিষ্কৃতি নেই লোপার। ওকে নিয়ে পড়তে পারলে মিস ছিবড়ে আর কাউকে চায় না, তাও সকলে জানে। অতএব পড়া বা টাস্ক যাদের হয় নি তারা কিছুটা নিশ্চিন্ত।

বসে এক মিনিটও দম ফেলার ফুরসত মিলল না। একখানা তীর ছোঁড়ার মতো করে মিস ছিবড়ে প্রশ্ন ছুঁড়ল, হোম-টাস্ক হয়েছে?

লোপা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আবার। মুখখানা যতখানি সম্ভব করুণ করে মাথা নাড়ল। হয় নি।

না হলে মাথা নাড়াটাও যেন বেয়াদপি। ঠিক তার অনুকরণেই মিস ছিবড়ে ঘটা করে মাথা নাড়ল একবার। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, হয় নি তো স্কুলে আসা হয়েছে কেন? ফুলবাগানের শোভা দেখতে? কেন হয় নি?

—পারি নি।

—ও! পারো নি? চেষ্টা করে একেবারে হয়রান হয়ে গেছ তবু পারো নি, কেমন? পরিশ্রম লাঘব করার জন্যে তাই ঘণ্টা বেজে যাবার পরেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলের বাহার দেখছিলে?

লোপা নির্বাক। অন্য মেয়েদের কৌতূহল মিটল এতক্ষণে। ব্যাপারখানা বুঝেছে তারা।

—বোর্ডে এসো!

হুমকি শুনে বেঞ্চি ছেড়ে আসামীর মতোই এগিয়ে যেতে হল। এবার মৃত্যুদণ্ড আসন্ন জানা কথাই। হাত বাড়িয়ে দণ্ডদাত্রীর হাত থেকে চক নিল। তারপর বোর্ড ঘেঁষে দাঁড়াল।

—পড়া কি দেওয়া হয়েছিল মনে আছে না তাও ভুল হয়ে গেছে?

সঙ্গে সঙ্গে দুবার দু-রকম করে মাথা নাড়ল লোপা। অর্থাৎ মনে আছে এবং ভুল হয় নি।

—স্টেট অ্যাণ্ড একসপ্লেন!

চেষ্টা-চরিত্র করে আর মাথা খুঁড়ে সংজ্ঞা যদি বা লেখা গেল জ্যামিতির ছবি আঁকতে গিয়ে সব গুলিয়ে ভণ্ডুল। দু'বার করে আঁকতে চেষ্টা করল। ফলে যেটা দাঁড়ালো সেটা যেন সাদা আঁচড়ের দাঁত বার করে ওকেই ব্যঙ্গ করতে লাগল।

রাগে মুখ লাল করে মিস ছিবড়ে চেঁচিয়ে উঠল, দেখো মেয়েরা, তোমাদের লোপা চক্রবর্তী শুধু ফুল দেখে না, কেমন ছবিও আঁকে ভালো করে দেখে নাও!

মেয়েরা বেশ জোরেই হেসে উঠল এবার। ক্রুদ্ধ মহিলার গনগনে দু'চোখ লোপার দিকে ঘুরল!—থাক, আর এগিয়ে কাজ নেই, সকলে সামনে এগোয় তুমি পিছনের দিকে ফেরো, এর আগের থিওরেম কেমন হজম করেছ দেখিয়ে দাও।

এবারে লোপা সাগ্রহেই দেখাতে গেল। এটা পারবে আশা। কিন্তু শুরু করতে না করতে এই মাথায় এটাও খিচুড়ি পাকিয়ে গেল কেমন। একটার সঙ্গে আর একটা মিশিয়ে ফেলল, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের অনেক মেয়েই হেসে উঠল।

—চমৎকার! চোখ দিয়ে আর মুখ দিয়ে আর এক পশলা আগুন ঠিকরে পড়ল মিস ছিবড়ের।—এবারে দয়া করে আরো একটু পিছও, তার আগেরটা চেষ্টা করো।

লোপা এবারে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়েই রইল।

—কি? তাও হবে না? বেশ, বেশ—আমার ভেতরটা একেবারে জুড়িয়ে যাচ্ছে, অনেক পরিশ্রম হয়েছে, এবারে একটু বিশ্রাম করো গে যাও। উঁহু আর ওখানে নয়, ওইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করো—

আঙুল দিয়ে একেবারে শেষের বেঞ্চির শেষ খালি সীটটা দেখিয়ে দিল।

প্রথম বেঞ্চি থেকে বই-খাতা তুলে নিয়ে লোপা শেষের বেঞ্চিতে গেল। হুকুম-মতো দাঁড়িয়ে রইল। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করতে ওই একজনই পারে। এর পরেও মহিলা রেহাই দিল না তাকে। বলে উঠল, সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে দয়া করে বইখানা খোলো, খুলে গোড়া থেকে সবটা তৈরি করো—শেষের ঘণ্টায় আমি আবার আসছি, তার মধ্যে যদি দেখি সব তৈরি হয় নি তাহলে ব্যাপারখানা খুব ভালো হবে না।

রাগের চোটে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে লোপা তেমনি ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

টিফিনের সময় অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ওকে পরামর্শ দিল, শরীর খারাপ বলে হেডমিসট্রেসের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি পালা, নইলে শেষের ঘণ্টায় এসে মিস ছিবড়ে তোকে আস্ত রাখবে না।

লোপারও গোঁ চেপে গেল কেমন। বন্ধুদের কথায় কান না দিয়ে অপরের ক্লাসেও সারাক্ষণ জ্যামিতির পড়াই তৈরি করল বসে বসে। কিন্তু শেষের ঘণ্টায় ওই মহিলা আবার পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের সমস্ত পড়া যেন ধোঁয়া হয়ে উড়ে যেতে লাগল।

অপশনাল অঙ্কের ক্লাসে গুটি দশেক মাত্র মেয়ে। তিন দিক থেকে টিচারকে ঘিরে বসে সকলে। লোপার ইচ্ছা করছিল দূরে গিয়ে বসতে। কিন্তু উপায় নেই।

এ ঘণ্টায়ও ঘরে পা দিয়েই ভদ্রমহিলা ওকে নিয়ে পড়ল। বোর্ডে অপশনাল সাবজেক্ট-এর অঙ্ক কষতে বলল একটা।

লোপা জায়গা ছেড়ে নড়ল না। শুকনো মুখে জবাব দিল ওগুলো হয়নি, সকালে যা করতে বলে গেছলেন সেগুলো করেছি।

—ও, তা বিকেলেরগুলো কবে করবে, সামনের বছর?

লোপা নিরুত্তর। সি বি রে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বোর্ডে যাও, চেষ্টা করো!

তারপর সমস্ত ঘণ্টা ধরে সকালের সেই একই গঞ্জনা শুরু হল আবার। একটার পর একটা অঙ্ক কষতে দিয়ে মিস ছিবড়ে তাকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে চলল আবার। আর সেই সঙ্গে চোখাচোখা বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুলল একেবারে। তাতেও রাগ গেল না। ঘণ্টা বাজতে অন্য মেয়েদের বলল, তোমরা যাও, ওর সব অঙ্ক কষা হলে তবে ছুটি পাবে...ক্লাস বসার পরেও ওর ফুল-বাগান দেখার শখ আমি ভালো করে মিটিয়ে দিচ্ছি।

অন্য মেয়েরা চলে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে লোপা খাতা খুলে বসল। ফিরতে দেরি হলে বাবা আর সরি পিসী ভাববে। তার থেকেও বেশি রাগের কারণ, এ-সময়টায় ওর রীতিমতো খিদে পেয়ে যায়। এত পথ হেঁটে বাড়ি পৌঁছয় যখন খিদের চোটে মাথাটা ঘুরতেই থাকে। কোন রকমে মুখ হাত ধুয়ে খেতে বসে যায়।

...আজ বাড়ি গিয়েই বাবাকে বলবে ও অঙ্ক ছেড়ে দেবে। তাতে একটা বছর যদি নষ্টও হয়, হোক। বলবেই। এবারে ও অঙ্ক ছাড়বেই।

মিস সি বি রে বা চারুবালা রায় নিজের উঁচু আসন ছেড়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে খাতার অঙ্কের দিকে তাকালো। তারপর এক হাঁতে তার মাথাটা ধরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, মাথায় সাদা জিনিস বলে কিছু আছে? ওটা কি লেখা হয়েছে?

বই মেলাতে গিয়ে লোপা দেখল অঙ্কটাই ভুল টুকেছে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দিয়ে আবার লিখতে বসল।

চারুবালা রায় নিজের উঁচু আসনে ফিরে গেল। লোপা পিছন থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা। চেয়ারের মাথায় তার সৌখিন ঝোলাটা ঝুলছে। শেষের পিরিয়ডে ওটা সঙ্গে করেই ক্লাসে আসে। ক্লাস শেষ হলে ওটা কাঁধে ঝুলিয়ে সোজা চলে যায়। টিচার্স রুমে গিয়ে আড্ডা দিতে বসে না। যা চরিত্র, গল্প-গুজব ভালো লাগবে কেন?

...লোপা আজ যাওয়াচ্ছে বাড়ি তাকেও। রাত পর্যন্ত বসলেও এখন আর একটাও অঙ্ক হবে না ওর দ্বারা। কতক্ষণ বসে থাকতে পারে থাকুক।

তৃতীয় ধাপে এসেই অঙ্ক ভুল হয়ে গেল। লোপা মুখ তুলে তাকালো একবার। কিন্তু চোখাচোখি হতেই কেমন যেন লাগল ওর। মহিলার মুখ তেমনি গম্ভরী বটে, কিন্তু ওর দিকে চেয়ে শুধু চোখ দুটো যেন মজা দেখছে কিছু। ফের খাতার ওপর মাথা নোয়াতেই সচকিত।

—এদিকে আয়।

এই ডাক শুনে লোপা অবাক। কোনো মেয়েকে 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' করে বলে না সি বি রে। খাতা হাতে করে লোপা উঠে গেল।

হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে গম্ভীর মুখে দেখল একটু। তারপর বলল, তোর মুণ্ডু হয়েছে।

তেমনি রাগ করেই বলল বটে, কিন্তু লোপার কানে যেন অতটা ঝাঁঝের মতো লাগল না। খসখস করে অঙ্কটা কষে দিয়ে খাতাটা ওর চোখের সামনে ধরল।—মগজে ঢুকছে?

লোপা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে সায় দিল।

—মাথায় সারাক্ষণ শয়তানী গিসগিস করলে অঙ্ক হবে কি করে? সি বি রে-কে মিস. ছিবড়ে বানিয়েছে কে? তুই?

ধরণী দ্বিধা হও! আচমকা আক্রান্ত হয়ে লোপার দু' চোখ কপালে ওঠার দাখিল। প্রাণের দায়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বীকার করার চেষ্টা। সি বি রে ধমকে উঠল, না কি, আমি খবর রাখি না কিছু—কেমন?

লোপা অসহায়। কোনো মেয়েই ওকে এভাবে ফাঁসিয়ে থাকবে।

চারুবালা রে আবার বলে উঠল, আমি নিজে শুধু ছিবড়ে নই, লেখাপড়া না করলে অন্যকেও কেমন ছিবড়ে বানিয়ে ছাড়ি দেখলি তো?

চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা গেলাস বার করল। —এটা ধুয়ে এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

কয়েক মিনিটের জন্য চোখের আড়াল হতে পেরেও লোপা বাঁচল যেন। ভেতরটা তার ধড়ফড় করছে কেমন। কিন্তু জল আনতে গিয়ে কত আর দেরি করতে পারে।

ফিরে এসে গেলাসটা সামনের উঁচু টেবিলের ওপর রাখল। সেখানে টিফিনের ছোট বাক্সটা রেখে মিস রে চুপচাপ বসে আছে। লোপা ভাবল, পড়ানোর এমন চাড় যে সমস্ত দিনের মধ্যে টিফিন খাবারও সময় মেলে নি। লোপা তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় এসে অঙ্কের খাতার ওপর ঝুঁকল। টিচারের খাবার সময় পাছে সেদিকে তাকিয়ে ফেলে সেই অস্বস্তি।

কিন্তু একটু বাদেই বিস্ময়ে আর সঙ্কোচে লোপা যেন হাবুডুবু খেয়ে উঠল একপ্রস্থ। টিফিনের বাক্স আর জলের গেলাস হাতে উঠে এসে মিস রে ও দুটো তার সামনের উঁচু ডেসকটার ওপর রাখল। তারপর নিজে হাতে ওর সামনে থেকে অঙ্কের খাতা সরিয়ে দিয়ে বলল, খা।

লোপার দিশেহারা অবস্থা। খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে দেখে খান-পাঁচেক লুচি একটু তরকারী আর তার পাশে একটা মিষ্টি।—বা রে, আপনার টিফিন—আমি—আমি কেন—

অবাধ্যতার জন্য ভ্রূকুটি করতে গিয়েও করল না মিস রে। বলল, আমাদের আজ হিরণদি খাইয়েছে, এটুকু তোর বরাতেই ছিল। খিদের চোটে নিজের মুখখানা কেমন ছিবড়ে হয়েছে আয়না বার করে দেখাব? খেয়ে নে শিগগীর, আজ অঙ্ক না হলে ছাড়ছি না!

...মিস রে'র মুখখানা সেই রকমই টান-ধরা গম্ভীর বটে, কিন্তু দু'চোখে যেন চাপা স্নেহ মেশানো কৌতুক ঝরছে। লোপা চেয়েই আছে তার দিকে। এ-যাবত যে-মেয়ে শক্ত মুখ করে অনেক শাস্তি আর অনেক গঞ্জনা সহ্য করেছে, আজ কি-এক স্পর্শে সেই মেয়ের দু'চোখ যেন চিকচিক করছে।

খাওয়া হতে টিফিনের বাক্স আর গেলাসটা তুলে নিয়ে ঝোলাতে ফেলে এলো।

—সরে বোস্।

লোপা শশব্যস্তে সরে বসল। ওর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে মিস রে অঙ্কের খাতাটা টেনে নিল।—এ-রকম পড়াশুনা করলে তুই পাস করবি কি করে, একেবারে তো গোল্লা পাবি!

পনের মিনিটের মধ্যে একে একে অঙ্কগুলো ওকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিজেই কষে দিল। আর আশ্চর্য, এই প্রথম লোপার মনে হল, ওগুলো তেমন ভয়াল বা দুরূহ কিছু নয়। এবারে চেষ্টা করলে ও নিজেও পারবে।

চারুবালা রে হাতঘড়ি দেখল। ঘণ্টাখানেক হল ছুটি হয়েছে। বলল, থাকিস তো সেই রাজ্যের পারে, যাওয়া-আসা করিস কি করে?

—হেঁটেই...

—আচ্ছা, চল।

স্কুল থেকে বেরিয়ে হনহন করে আগে আগে চলল। ও পিছনে। লোপা সবিস্ময়ে দেখল, হাত তুলে একটা রিকশ থামালো মিস রে। তার বাড়ি এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের হাঁটা-পথ। চার-ঘরের একটা বাড়ি ভাড়া করে চারজন টিচার মিলে থাকে।

রিকশ ভাড়া করা হল লোপার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত। আশ্চর্য, কোথায় ও থাকে তা পর্যন্ত জানে! আর ওর বাবার নাম। কোন্ রাস্তায় কোন বাড়ি যেতে হবে বলতেই রিকশঅলা চিনল। বারো আনা ভাড়া।

নিজে আগে উঠল। তারপর ওকে ডাকল, ওঠ্।

মিস রে'র দোহারা চেহারা হলেও গায়ে গা ঠেকছেই। এই স্পর্শটুকুও কেমন অদ্ভুত লাগছে লোপার। দু'-চার মিনিটের মধ্যেই তার নামার সময় হল। রিকশ থেকে নেমে মিস রে বারো আনা পয়সা ওর হাতে গুঁজে দিল।—ঠিকমতো যেতে পারবি তো?

মুখে কথা নেই, লোপা মাথা নাড়ল। পারবে।

রিকশ চেপে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার ভাগ্য কমই হয়। কিন্তু আনন্দের থেকেও আপাতত বিস্ময় বেশি।...মিস ছিবড়ে, না, নিজের মনেও ওই চালু নাম ভাবতে সঙ্কোচ এখন—শেষের একঘণ্টার মধ্যে চারুবালা রায়ের ভিতরটা এ-রকম বদলে গেল কি করে? শেষের ঘণ্টাতেও তো মেয়েদের সামনে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে ওকে...

এই অবাক ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির আধা-আধি পথ চলে এসেছিল। তার পরেই সচকিত। সামনে, গজ তিরিশেক দূরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে। ছেলে বলতে বছর কুড়ি-একুশ হবে বয়েস। এই দিকেই চেয়ে আছে...ওর দিকে। ত্রস্তে লোপা পাশের খোলা মাঠটার দিকে তাকালো একবার। পাশেই সেই উঁচু মাটির ঢিপি...চাঁদমারি। ওই ছেলের ওটাই বেড়াবার জায়গা। বেড়াতে বেড়াতে এদিকে লোপা অনেক দিন ওকে ওই ঢিপির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। এখনো সেই দিকেই যাচ্ছিল বোধহয়, ওকে রিকশয় চেপে যেতে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে।

অন্য দিন ওই গম্ভীর-গম্ভীর মুখখানা দেখলে লোপার হাসি পেত, মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি জাগত। ড্যাবড্যাব করে সেও মুখের দিকে চেয়ে থাকত, মনে মনে জিভ ভেঙাতে ইচ্ছে করত। আগে ওই ছেলে অমন গম্ভীর ছিল না, স্কলারশিপ পেয়ে কলেজে ঢোকার পর থেকে গম্ভীর হয়েছে। নইলে মানায় না যেন। আগে সামনা-সামনি ওকে একলা পেলে রীতিমতো উত্যক্ত করত, ফষ্টিনষ্টি করত।..এই তো সেদিনের কথা, দু' বছরও হয় নি। নদীর ধারে ওকে একলা পেয়ে সঙ্গে বন্ধু দুটোকে কানে কানে কি যেন বলেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাজি বন্ধু দুটো ছুটে ওর কাছে এসে হাসতে হাসতে বলেছিল, তুমি তো আমাদের কত আপনার জন, চলে যাচ্ছ কেন, এসো না একটু গল্প করি—

...লোপা সত্যি সত্যি ওদের জিভ ভেঙচে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল। বন্ধুদের কানে কানে কি বলা হয়েছিল লোপার বুঝতে বাকি থাকে নি। নিশ্চয় বলেছিল, ওই দেখ্, আমার বউ যাচ্ছে।

আজ ওই ছেলেকে দেখে মাথায় দুষ্টুমি খেলার বদলে লোপার নিজের দুই গালে লালের ছাপ লাগল একপ্রস্থ।...ভোররাতের স্বপ্নে দেখা সেই ছেলে। চাঁদমারিতে দাঁড়িয়ে

থইথই বন্যা থেকে ওকে টেনে তোলার জন্য যে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে ছিল। ওদের সেই পুরনো মাস্টারমশাই শশধর ঘোষালের ছেলে রাজা ঘোষাল। স্বপ্নের মধ্যেও যাকে দেখেছে শুনে বাবার মুখে খুশির ছোঁয়া লেগেছিল।

একি! রিকশটা আবার এখানে থামতে গেল কেন।

না দেখার ভান করে লোপা অন্য দিকে চেয়ে বসেছিল। ত্রস্তে ঘাড় ফেরালো। রিকশটা একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। এ ছেলেই নিশ্চয় হাত তুলে রিকশ থামিয়েছে।

...রিকশয় যাচ্ছ যে, শরীর খারাপ নাকি?

আগে তুই-মুই করে কথা বলত, এখন সভ্য-ভব্য বনে যাবার ফলে লোপা 'তুমি' হয়েছে। জবাব দিতে ইচ্ছে করছিল, শরীর খারাপ হোক বা না হোক তার তাতে কি, আর রিকশ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করারই বা দরকার কি! বলা গেল না। আড় চোখে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। কলেজের ছাত্র না হয়ে মাস্টার হলে মানাতো যেন। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, শরীর খারাপ হতে যাবে কেন...

সভ্য-ভব্য মুখখানা হঠাৎ একটু উৎসুক হয়ে উঠতে দেখল লোপা। হাসি-মাখা চাউনি, রিকশঅলা শুনতে না পায় সেই জন্য আর একটু কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি নাকি কাল রাতে আমাকে স্বপ্ন দেখেছ?

গোপন কিছু ফাঁস হয়ে যাবার মতো সন্ত্রস্ত মুখ লোপার।—কক্ষনো না! মিথ্যে কথা! কে বলেছে?

—তোমার বাবা একজনকে বলেছেন, তার মুখ থেকে শুনেছি!...তুমি বন্যায় ভেসে যাচ্ছিলে, আর আমি নাকি তোমাকে টেনে তুলেছি।

—ইস, কি বীরপুরুষ একজন! লোপা রেগেই গেল।—এই রিকশ থামলে কেন, চলো না!

তাড়া খেয়ে রিকশ চলল আবার। বাবা এ-ভাবে পথে বসাবে ওকে কল্পনা করা যায় না। একটু জ্ঞান বুদ্ধি যদি থাকত। বাবার ওপর দস্তুরমতো রাগ হচ্ছে লোপার। আরো কত জনের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবে ঠিক কি!

রাগের মুখেই চলতি রিকশ থেকে একবার পিছন দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে পারল না। আবার চোখাচোখি। হ্যাংলার মতো এদিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেন মরতে ও ঘুরে তাকাতে গেছল!

এক ঝটকায় ঘুরে বসে রাগের মুখেও এবারে হেসেই ফেলল লোপা। স্কলারশিপ পেয়ে পাস করে আর কলেজে ঢুকে কত সভ্য-ভব্য আর কত গম্ভীর হয়েছে ভালই জানা আছে ওর। একটু আশকারা দিলেই বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে ঠিক পাশে উঠে বসত! ওই ছেলেরই দূর সম্পর্কের মাসির দৌলতে ও আজ রিকশয় চেপে বাড়ি চলেছে মনে হতে লোপাব আরো বেশি হাসি পেয়ে গেল। কি কাণ্ডই না হল আজ!

...মিস ছিবড়ে, ধেৎ ছাই! ওই নাম লোপা আর মনেও আনবে না—মিস চারুবালা রায় পুরনো মাস্টারমশাই শশধর ঘোষালের সম্পর্কে শালী যখন, রাজা ঘোষালের মাসি ছাড়া আর কি!

আবার কি মনে হতে লোপার মুখ দ্বিগুণ লাল।...চারুবালা রায়েরই বা আজ বিকেলে হঠাৎ এই ব্যবহার কেন ওর সঙ্গে।...জানে নাকি কিছুঁ? কি করে জানবে, মাস্টারমশাই

বেঁচে থাকতে কিছু বলে গেছে? ইদানীং এই কৌতূহল মাঝে মাঝে ওর মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয় বটে। আর লোপা এক-রকম জোর করেই সে-সম্ভাবনাটা বাতিল করে দেয়। আজ বাতিল করা গেল না। উল্টে কেবলই মনে হল, জানে বলেই ও পড়া না পারলে মিস্ রায় আরো বেশি চটে যায়, জানে বলেই ওর দিকে বাড়তি নজর তার। নইলে কতো মেয়ে তো পড়া পারে না, তাদের বেলায় অত রাগে না কেন?

বছর দুই আগের সেই ঘটনাটা মনে পড়তে লোপার সমস্ত মুখ দ্বিগুণ রাঙিয়ে উঠল।...মাস্টারমশাই, অর্থাৎ এই রাজা ঘোষালের বাবা শশধর ঘোষালের ক্লাস ছিল সেদিন। এর আগেই টিফিনের সময় আম গাছে ঢিল ছোঁড়ার অপরাধে মালী ব্যাটা লোপাকে হেডমিসট্রেসের কাছে ধরে নিয়ে গেছল। সে-মহিলা ওকে এই মারে তো সেই মারে। তার পরেই মাস্টারমশাইয়ের ক্লাস।

স্কুল-সুদ্ধ মেয়েরা সব থেকে বেশি ভয় ভক্তি আর শ্রদ্ধা এই একজনকেই করত। লোপাও তার ব্যতিক্রম নয়। এমন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য আর কারো ছিল না। এর ওপর পদ-মর্যাদাও কম নয়, অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার।

দেহ-বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছিল। আগের দিনও এই পড়িয়েছেন ভদ্রলোক। ফ্যাট অর্থাৎ চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেট নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-সম্পর্কে দুই একটা প্রশ্ন করতে লোপাই উঠে দাঁড়িয়ে চটপট উত্তর দিয়েছে। খুশি মুখে মাস্টারমশাই ফ্যাট-এর একটা উদাহরণ দিতে বলেছিল।

আর তক্ষুনি কেলেঙ্কারি। লোপার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, হেডমিসট্রেস—

তার পরেই চার আঙুল জিভে কামড়।

বলা বাহুল্য স্কুলের মধ্যে সব থেকে বেশি মেদ-বহুল আর বিপুলকায়া মহিলা উনি। নড়তে-চড়তে ঘেমে ওঠে এমনি মোটা। জবাব শুনে শশধর ঘোষাল খানিকক্ষণ হাঁ একেবারে। তারপরেই বেজায় গম্ভীর। বিপদ যা হবার হয়েই গেছে। ক্লাসসুদ্ধু মেয়ের খুক-খুক কাশির শব্দে হাসি চাপার চেষ্টা। আর লোপা তখন দুর্গানাম জপ করছে। মাস্টারমশাই যদি ওই মহিলার কাছে ধরে নিয়ে যায় বা পরেও যদি বলে দেয় তাহলে এবারে যে পিঠে ওর বেতের দাগ পড়বেই তাতে আর সন্দেহ নেই। আরো কি হবে কে জানে।

মাস্টারমশাই বইটা নাকের ডগায় তুলে ধরে পড়াতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর লোপা শুধু সেই ঘণ্টা নয় পর পর সব কটা ঘণ্টাই বিষম ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছিল। তার পরেও ভয় যায় না, আজ ফাঁড়া কাটলেও কাল কাটবে কিনা ঠিক কি।

বাড়ি ফিরেও অনেকবার ভেবেছে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বাবাকে একবার ঠেলে পাঠাবে কিনা। হেডমিসট্রেসের কাছে যেন বলে না দেয় বা কারো কাছে গল্প না করে। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত বাবার দেখাই মিলল না। বেড়াতে বেরিয়ে লোপা কতবার কালী-দুর্গা স্মরণ করেছে ঠিক নেই। মা দুগ্‌গা হে মা-কালী, এবারের মতো বিপদ কাটিয়ে দাও, আর কক্ষনো অমন দুষ্টুমি করব না, এই কান মলছি নাক মলছি—

সন্ধ্যার আগে বাড়ির দাওয়ায় পা দিয়েই নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে হা-হা-হা-হা হাসির শব্দ। ঠিক মাস্টারমশাইয়ের গলা! পা-টিপে এগিয়ে গেছল, তারপর

দরজার আড়াল থেকে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল। মাস্টারমশাই বটে, সে-ই হাসছে বটে। তার সামনে বসে বাবাও হাসছে অল্প-অল্প।

বাবার গলা, মেয়েটা দিনকে দিন দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে, কি যে করি—

—তোমাকে কিছু করতেও হবে না, ভাবতেও হবে না, যেমন আছে থাকতে দাও। মাস্টারমশাইয়ের খুশি-খুশি জবাব।—ভারী একখানা তাজা মেয়ে তোমার, আমি কত সময় ওর দুষ্টুমি আর লাফা-লাফি ঝাঁপা-ঝাঁপি চেয়ে চেয়ে দেখি জানো না। ভারী ভালো লাগে। শোনো, যে-কথা তোমাকে বলতে এলাম, গিন্নিকেও বলেছি, তোমাকেও বলে রাখছি, আমার ছেলেটা পড়াশুনায় খুব ভালো, আশা করছি বাপের মতো স্কুল-মাস্টারিতে ঢুকবে না।...ভালো যদি হয় তো তোমার এই মেয়েটাকে আমিই নেব, বুঝলে? তোমার তো আবার সবেতে তাড়াহুড়ো, তাই আগে থাকতে বুক্ করে রাখলাম মনে থাকে যেন, তখন যেন আবার বড়-মানষি চাল চেলো না—

বাবা কি বলেছে শোনার জন্য লোপা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। তার আগেই আধ-খানা জিভ কামড়ে ছুটে পালিয়েছে। টকটকে রাঙা মুখ। তখন ছোট হলেও এত ছোট নয় যে এটুকু বুঝতে পারবে না। রাতে বিছানায় শুয়েও এ-পাশ ও-পাশ করেছে আর হেসে হেসে উঠেছে। শেষে মনে মনে মাস্টারমশাইয়ের ওই ছেলের মুখখানা সামনে ধরে আচ্ছা করে ভেঙচি কেটে দিয়েছে।

—কি গো দিদিমণি, রিকশ থেকে নামবে নাকি আবার স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যাব?

লোপা ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল। রিকশ বাড়ির দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে বটে। আর পোড়ারমুখো রিকশঅলা ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। এক লাফে নেমে লোপা হাতের পয়সা ওর হাতে দিয়ে ভিতরে ছুট।

ওদিকে দাওয়ায় বসে সরি পিসী বেড়ার ফাঁক দিয়ে রিকশ দেখেছে। কে নামল ঠিক ঠাওর করতে পারে নি। ভিতরে পা দিতেই লোপা তার মুখোমুখি।

—রিকশয় কে এলো?

—আমি...

সরি পিসীর মুখ গম্ভীর, চাউনিটাও কেমন ধার-ধার।—তুই রিকশয় আসার পয়সা পেলি কোথায়?

লোপার একটু রহস্য করতে ইচ্ছে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখ দেখে ভরসা হল না। সত্যি কথাই বলল।—দেরি হয়ে গেছে বলে আমাদের টিচার চারুবালা রায় রিকশয় উঠিয়ে ছাড়ল।

—পয়সা কে দিল?

কথার সুরেও বেশ ঝাঁঝ।—বা রে, সে-ই তো দিল।

চারুবালা রায়কে সরি পিসীও চেনে। ঘোষাল বাড়িতে যাতায়াত ছিল যখন, তখন দেখেছে। কথাও কয়েছে। আর বাড়ি এসে বলেছে তোদের ওই মাস্টারনীর দেমাক খুব, কথা বলতে গেলে হাঁ-না করে জবাব দেয়, গলা দিয়ে শব্দ বার করতে চায় না। তার আজকের এই মমতার দিকটা সরি পিসী জানবে কি করে, এতদিনের মধ্যে লোপাই কি জানত?

তাই বোধহয় পিসীর চোখে অবিশ্বাস।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কৈফিয়ত দেবার মেজাজ নয় এখন লোপার। এতক্ষণে আবার ওর খিদে পেয়েছে। কিন্তু ঘরে পা দিতে বাবার মুখখানাও অন্য রকম ঠেকল চোখে। ভয়-ভয় ভাব, চোখ দিয়ে ওকে কিছু ইশারা করতে পারলে যেন করত। কিন্তু সরি পিসী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। পিসীটিকে এমনিতে খারাপ লাগে না লোপার, কিন্তু একটু ছুতো পেলেই ওর ভাল-মানুষ বাবাকে যখন ধমক-ধামক করে তখনই রাগ হয়ে যায়। আজ এক-পশলা হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে ওর।

মুখ হাত ধোয়া হলে পিসী সাধারণত এক-বাটি চিড়ে-গুড় নারকেল এনে সামনে ধরে। দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসতে সরি-পিসী একটা শাল-পাতার ঠোঙা হাতে এগিয়ে এলো।

—কি ওটা?

মায়ের বাড়ির প্রসাদ।

প্রসাদের ওপর সরি পিসীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু মায়ের বাড়ি যেতে হলে সাধারণত সকালে বা সন্ধ্যার পরে যায়। তাই লোপা মনে মনে অবাক একটু। হাত বাড়িয়ে প্রসাদ নিল। বেশ বড়সড় সন্দেশ একটা। এও ব্যতিক্রম মনে হল।

—তুমি কালীবাড়ি গেছলে?

চাপা গলায় পিসী ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমি যাব কেন, তোর কি দরদের লোকের অভাব আছে?

দুম-দুম পা ফেলে ভিতরে চলে গেল, পরক্ষণে চিঁড়ের বাটি হাতে বেরিয়ে এসে ঠক করে ওটা তার সামনে রাখল। ব্যাপারগতিক সুবিধের ঠেকছে না লোপার। ...কালীবাড়িতে পুজো তাহলে বাবাই দিয়েছে। কিন্তু বাবাকে তো কখনো পুজো-টুজোর ধারে কাছে ঘেঁষতে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। তবু পুজো যদি দিয়েই থাকে পিসীর এত রাগ কেন। জল চিঁড়ে গুড় নারকেল সব এক সঙ্গে মাখতে মাখতে লোপা আড়-চোখে তাকালো একবার। পিসী গালে হাত দিয়ে সামনেই উবুড় হয়ে বসে আছে, আর তীব্র এক-জোড়া চোখ ওর মুখের ওপর বিঁধিয়ে রেখেছে।

—রাত্তিরে তুই বন্যার স্বপ্ন দেখেছিলি সে খবর ওই শয়তানটা জানল কি করে?

খাওয়া মাথায় উঠল লোপার। ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। নাম না করলেও পিসি শয়তান কাকে বলছে বুঝতে একটুও সময় লাগল না।

—বটুকদা এসে বলে গেছে বুঝি?

পিসীর গলার স্বর দ্বিগুণ কঠিন।

—শুধু বলে যাবে কেন, দরদের ঠেলায় একেবারে কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে প্রসাদ এনে তোকে দিতে হুকুম করে গেছে। বলি, তোর স্বপ্নের খবর ও জানল কি করে?

লোপা ঢোক গিলে জবাব দিল, বটুকদা কদিন ধরে এদিকেই মাছ ধরতে বসছে যে...স্কুলে যাবার সময় দেখা হয়ে গেল।

—আর তুই অমনি স্বপ্নের ফিরিস্তি দিতে বসে গেলি?

—কথায় কথায় বলে ফেললাম।...তাতে হয়েছে কি?

কি হয়েছে পিসী সেটা চোখের আগুন ছড়িয়ে বোঝাতে চেষ্টা করল, তারপর এক ঝটকায় উঠে চলে গেল।

খাওয়া ভুলে লোপা তার পরেও বিমূঢ় খানিকক্ষণ। ঘাড় ফিরিয়ে বাবার ঘরের দিকে তাকালো একবার। এসেই অমন শুকনো মুখ দেখেছে কেন তাও অস্পষ্ট থাকল না আর। পিসী তাকেও এক হাত নিয়েছে। আর, রিকশর পয়সা কে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করার কারণও বুঝতে পারছে। পিসীর সন্দেহ হয়েছিল বটুকদা দিয়েছে।

...কিন্তু বটুকদার আচরণটাই অবাক ব্যাপার মনে হচ্ছে ওর। স্বপ্নের কথা শুনে মাথার ওপর যেভাবে ছিপ উঁচিয়েছিল, সরে না গেলে মেরেই বসত বোধ হয়।...এমনিতে বটুকদা এ-বাড়ির উঠোনও মাড়ায় না কখনো। কিন্তু ওর কোনো বিপদের ছায়া দেখলে ঠিক আসে। সেবারে বড় ডাক্তার সঙ্গে করে হাজির হয়েছিল। এবারে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে। অথচ লোপা ভেবেছিল গায়ের ওপর লজেন্সের ঠোঙা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসার ফলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল।

আজ কি বার? কোন তারিখ? লোপা ভাবছে, সকাল থেকে আজকের দিনটাই বড় অদ্ভুত গেল।

চার

বাজারের গায়ে চার মাথার মোড়ে রাধা কেবিনের সব থেকে পয়মন্ত খদ্দের কপিল চক্রবর্তী। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে ক্বচিৎ কখনো চা খায়, তাও শুধু চা-ই, আর কিছু না—তবু। তবু অন্য সকলের থেকে মনে মনে অন্তত তাকেই বেশি পয়মন্ত ভাবে গোপাল গণাই।

সেই কোন্ এক যুগে গোপাল গণাই সহপাঠী ছিল তার। স্কুলের নীচু ক্লাসে বছর দুই এক সঙ্গে পড়েছিল। সরস্বতী ঠাকরোনের অনুগ্রহের অভাবে গোপাল গণাই স্কুলের উঁচু ক্লাসের মুখও দেখে উঠতে পারে নি। নিচের দিকেই বার কয়েক ফেল-টেল করে আর প্রতিবারই ওর দাদার কড়া-হাতের গোটাকতক করে চড় চাপড় খেয়ে শেষে একরকম তিক্ত-বিরক্ত হয়েই ও-পাট চুকিয়ে দিয়েছে। দাদার তাঁত-বোনা আর মাকু-চালানো হাত দুটোই সবথেকে বেশি চক্ষুশূল ছিল ওর। অল্প বয়সে পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে দাদার ওই হাতের নাগাল থেকেও চটপট সরে গেছে। তারপর সেই থেকে রোজগারের ধান্দায় অনেক কাণ্ড করেছে, অনেক রকমের ব্যবসায় নাক গলিয়েছে। কখনো নিজের দোষে চোট খেয়েছে কখনো বা পুঁজির অভাবে। তেল না পোড়ালে রাধা নাচে না এটা সে হাড়ে-হাড়ে বুঝে ছিল। রাধাকে নাচানোর একটা সঙ্কল্প ছেলেবেলা থেকেই তার মনের কোণে ঠাঁই নিয়েছিল। সঙ্কল্প না বলে আক্রোশও বলা যেতে পারে। এ রাধা সে-রাধা নয়, দাদার শ্বশুরবাড়ির রক্তমাংসের ডেলা এটি। ওর হাড়-জ্বালানো শত্রুকে অর্থাৎ দাদাকে যদি ভায়রা-ভাই বানিয়ে ছেড়ে দিতে পারে তবে তার থেকে উপাদেয় প্রতিশোধ আর কি হতে পারে? ওর হাত দুখানাও যে নিতান্ত সুকোমল নয় সেটা দাদাকে না হোক তার আদরের শালীকে তো অন্তত বুঝিয়ে দিতে পারবে।

অবশ্য এই বোঝানোর অভিলাষটা তখন একেবারে গোপন। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নতুন শাড়ি-পরা খাঁদা নাক রাধার কোমল বুকে তখন ঠারে ঠোরে শর নিক্ষেপের মহড়াই বরং বেশি দিয়েছে। নির্জলা ঠারে-ঠোরেই বা কেন, শেষের ফয়সালা হয়ে যাবার ঠিক সাতটি

মাস আগে কথা বলার নাম করে ওকে তালপুকুরের ওধারে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা আমগাছের পিছনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ জাপটেমাপটে ধরে যে কাণ্ড করেছিল এই বুড়ো বয়সে মনে পড়লেও মাথাটা ঝিমঝিম করে। অবশ্য তার কদিন আগে থেকে মাথা এক রকম খারাপই হয়ে গেছল গণাইয়ের। শুধু খাঁদা নাকটুকু বাদে ওই শামলা মেয়ের সর্ব অঙ্গে তখন এমন রূপ ধরেছিল যে গোপালের মনে হত নড়লে-চড়লে উপচে উঠবে। মেয়ের নড়াচড়ার ঠমকও তখন বেড়েছিল। তা আচমকা ওই কাণ্ডর পর মেয়ে তো নীলবর্ণ প্রথমে। ওটুকুই যা সুযোগ মিলেছিল। ওরই মধ্যে চড়াৎ করে রক্ত একেবারে মাথায় উঠেছিল গোপাল গণাইয়ের। ওর বুকের সঙ্গে শক্ত আর নরম আর গরম আর একখানা বুক একেবারে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

...তারপর?

তারপর রক্ত। গোপাল গণাইয়ের দু'গাল বেয়ে রক্তের ধারা। দুটো থাবার দশ-দশটা নখ তার দু'গালে বসিয়ে দিয়ে মাংস ছিঁড়ে আনতে চেষ্টা করেছে। গোপাল গণাই চোখে অন্ধকার দেখেছে। সেই ফাঁকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওই মেয়ে ছুটে পালিয়েছে।

অতর্কিত আক্রমণটা বাঘিনীর মতো, আর পালানোটা হরিণীর মতো।

এরপর টানা তিনমাস দাদার ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল গোপাল গণাইকেও। ওর বদ্ধ ধারণা ঘটনাটা দাদার কানে উঠবেই, আর দাদা একখানা কাটারি হাতে নিয়ে খুঁজে বেড়াবে ওকে।

তিন মাসের মাথায় হঠাৎ একদিন দাদার শ্বশুর অর্থাৎ রাধার বাপের সঙ্গে দেখা। কিন্তু তার গোটা মুখে এতটুকু কোপের চিহ্নও খুঁজে পেল না। উল্টে ওকে দেখে খুশি যেন। আর ছোট মেয়েটার এখনো বিয়ে হল না বলে চিন্তিত। হবে কি করে, দু-কান ভরাট করে গোপাল গণাই শুনল, কোনো ছেলে দেখতে আসছে শুনলেই ওই দজ্জাল মেয়ে একেবারে বাড়ি ছেড়ে পালায়। মার-ধর করেও নাকি তাকে বশে আনা যাচ্ছে না।

জোয়ান বয়সের ঠিক সেই সময়টুকুতেই গোপাল গণাই ভাগ্যের মুখ দেখেছিল কিছুদিন। একজনের সঙ্গে আধা বখরায় কাপড়কাচা সাবান তৈরির ব্যবসায় নেমেছিল সে। নিজের চোখে সে সব দেখে শুনে রাধার বাবা আরো খুশি। সেই খুশিতে লোকটা ওর হয়ে দাদার অর্থাৎ বড় জামাইয়ের নিন্দা পর্যন্ত করল একটু, আর যাবার সময় একবার ওকে যাবার জন্য সাদর এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ পর্যন্ত করে গেল।

বোকা গোপাল তখনো বুঝতে পারেনি রাধার মায়ের ইশারায় ওই ঝানু বাপটি তলায়-তলায় ওরই খোঁজে ছিল। পরে রাধার মুখ থেকেই জেনেছে।

যাই হোক, বিয়েটা তারপর অনায়াসেই হয়ে গেছে। বাদ সাধতে চেষ্টা করেছিল একমাত্র দাদা। তার আপত্তি টেকে নি। বাঘিনী বন্দী এবং বশ করার আনন্দে কটা মাস কি করে কেটে গেছে টেরও পায়নি। সেই ফাঁকে তার ব্যবসার অংশীদারটি সর্বস্ব গিলে বসে আছে। সে গোপালের মুখ চিনতেও নারাজ।

গোপাল গণাইয়ের টনক যখন নড়ল তখন হাঁড়িতে জল ফোটে দোকানে চাল।

সেই থেকে কটা বছর রোজগারের চেষ্টায় কত ধান্দায় ঘুরেছে আর কত রকমের ফন্দি-ফিকির এঁটেছে ঠিক নেই। সংসারে তখন আরো গুটি তিনেক পোষ্য বেড়েছে।

আর গোপাল গণাইয়ের হতাশা বেড়েছে তিন-তিনে ন'গুণ। অনড় দৈন্য সব গেলার জন্য যেন হাঁ করে ওত পেতে বসে আছে সর্বক্ষণ।

তেল পোড়ালে রাধা নাচে গোপাল গণাই জানে তা। কিন্তু তেল পোড়াতে অক্ষম হলে ঘরের রাধা যে কি মারাত্মক নাচ নেচে থাকে সে বোধহয় তার থেকে বেশি আর কেউ জানে না। ঘুমন্ত রাধার দিকে চেয়ে চেয়ে কোনো কোনো রাতে চোখে খুন নেচেছে তার। গলা টিপে সব শেষ করে দেবার লোভে হাতের আঙুলগুলো নিশপিশ করেছে। কতদিন সঙ্কল্প করেছে, শুধু ওকে নয়, একে-একে সব কটাকে শেষ করে দিয়ে তারপর নিজে আত্মঘাতী হবে। খুন ভালো করে মাথায় চাপার আগে সভয়ে নিজেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

অবস্থা যখন এই চরমে, কপিল চক্রবর্তীর সঙ্গে আবার ফিরে যোগাযোগ গোপাল গণাইয়ের।

তার আগে তো কত জনের কাছে ধর্না দিয়েছে, চেনা-জানা কত জনের হাতে-পায়ে পর্যন্ত ধরেছে। কেউ ফিরেও তাকায় নি। সামনা-সামনি পড়লে না চেনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়েছে। আপনার জনের মতো তারাও আজ রাধা কেবিনে আসে, বসে। চা খায়। জটলা পাকায়। গোড়ায় গোড়ায় তারা আশা করত অনেক কালের চেনা-জানার খাতিরে দোকানের মালিক কখনো-সখনো অন্তত দুই এক পেয়ালা চা হয়তো অমনি খাওয়াবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি। তারা চোখকান কাটা হাড়-চামার ভাবে ওকে এখন। নিতান্ত পরিচিত কারো চায়ের দাম বাকির খাতায় জমা হতে থাকলে বাড়ি গিয়ে গোপাল গণাই হাঁকডাক করে আদায় করে এনেছে, এমন নজিরও বিরল নয়।

এ পরের কথা।

অভাব অনটনের খোঁচায় দুই চোখ যখন প্রায় অন্ধ, দিশেহারার মতো তখনি একবার কপিল চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে হানা দিয়েছিল। খুব একটা আশা নিয়েও আসে নি। মরণকালে মরিয়া হয়েই এসেছিল। আশা আরো করে নি, কারণ কপিল চক্রবর্তীর তখন যেমন নাম-ডাক তেমনি প্রতিপত্তি। রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি। একবার নয়, দুবার। দেশের হোমরাচোমরাদের সঙ্গে পর্যন্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগ। কোন এক ডাকসাইটে মানুষের সঙ্গে কপিল চক্রবর্তীর সামনা-সামনি কথা হয় আর মুখোমুখি বসে আলাপ-আলোচনা হয় নাকি। এখানকার অনেকের চোখে সেটা রূপকথার নায়কের ভাগ্যের মতো।

...গোপাল গণাই এসেছিল খুব ভোরে। অন্যথায় কপিল চক্রবর্তীর দেখা মেলা ভার তখন। দেখা যদিও বা মেলে, তাকে একলা পাওয়া মুশকিল। সর্বদাই দু'পাঁচজন ঘিরে থাকে তাকে।

উঠোনে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেছল গোপাল গণাই। দাওয়ায় পুবমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত জুড়ে চিন্ময়-চেতন মহাজ্যোতি স্তব করছিল কপিল চক্রবর্তী...তুমি মিত্র বরুণ তুমি অন্তর্যামী, তুমি এসো এসো এসো, তুমি ধ্যানে এসো, তুমি জ্ঞানে এসো, তুমি হৃদয়ে এসো...।

অপরিসীম দারিদ্র্যের পীড়নের মধ্যে পড়েও গোপাল গণাই এভাবে কাউকে স্মরণ করেছে বলে মনে পড়ে না।...স্থির একখানা কাঠের মতো দাঁড়িয়ে কপিল চক্রবর্তী। এত

ভোরে স্নান সারা। পরনে মোটা গরদ, খালি গায়ে ধবধবে পৈতেটা প্রায় জানু ছুঁয়েছে, দু'চোখ বোজা। স্তবে যার আহ্বান, তার পদার্পণ অনুভব করছে যেন। হঠাৎ বড় ভালো লেগেছিল গোপাল গণাইয়ের। সেই ভালো লাগার মধ্যে চড়া-পড়া মনের তলায় একটু আশাও উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল।

চোখ মেলে কপিল চক্রবর্তী প্রথমেই তাকে দেখেছিল। সাদরে ঘরে এনে বসিয়েছিল। চা জল-খাবার খেতে দিয়েছিল। হৃদয়ের এইটুকু তাপ পেয়ে গোপাল গণাই সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেলেছিল সেদিন।

সব শুনে কপিল চক্রবর্তী কথা দিয়েছিল ভাববে। কথা রেখেছিল। ভেবেছিল। ভেবে-চিন্তে শেষে এই দোকান করার পরামর্শ দিয়েছিল। বাজারের গায়ে চৌরাস্তার মোড়ে এই ঘরও সে-ই যোগাড় করে দিয়েছে। আর সব শেষে পাঁচশ টাকা মূলধন নিজের ঘর থেকে বার করে ওর হাতে দিয়েছে।

কিন্তু শুধু ঘর আর মূলধন পেলেই দোকান চলে না। সুনাম চাই। আকর্ষণ চাই। গোপালের অবস্থা শিকড়ে ঘুণ-ধরা মরা-গাছের মতো। তার দোকান জাঁকিয়ে তোলার কৃতিত্বও এই কপিল চক্রবর্তীর। গোড়ায় গোড়ায় তার উৎসাহ দেখে লোক ঠিক ঠাওর করতে পারত না দোকানের আসল মালিক কে।

গোপাল গণাইয়ের ইচ্ছে ছিল দোকানের নাম গোপাল কেবিন হোক। কপিল চক্রবর্তীর আপত্তির ফলে ইচ্ছেটা বরবাদ হয়ে গেছে। সে বলেছিল, নামটা বউয়ের নামে রাখো হে, কিছু হয় যদি তোমার ওই স্ত্রী-ভাগ্যেই হবে, তার ঝ্যাটা না খেলে তুমি অমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে না।...তাছাড়া বেশ মিষ্টি নামও বটে।

সেই মিষ্টি নামেরই সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়েছে। রাধা কেবিন। কপিল চক্রবর্তী তার দল-বল নিয়ে সকাল-বিকেল দোকানে হানা দিত। নরম-গরম আলোচনার আসর বসাতো। তার ফাঁক দিয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসত—খাবার-টাবারও আসত। নিজের পকেট থেকে হোক বা অন্যের পকেট ফাঁক করে হোক কড়াক্রান্তিতে দাম মিটিয়ে দিত। তার সামনে কেউ কখনো ধার রাখতে চাইলে সে-ই মাথা নেড়ে বাধা দিত, উঁহু ধারের কথা গোপালের সামনে মুখেও এনো না, ধার দিয়েছে শুনলেই রাধা কেবিনের রাধা ওকে ঝাঁটা পেটা করবে। আজ তুমি না পারো আমি দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু নো ধার। পার্টির স্থানীয় মিটিং-টিটিং বা অনুষ্ঠানে চা-জলখাবার সরবরাহের ভার তার মারফত গণাই-ই পেত। অনেক বিয়ে বাড়িতে চা যোগানোর ভারও।

ঠিক এক বছরের মাথায় ধারের পাঁচশ টাকা গোপাল গণাই তার বাড়ি গিয়ে গুণে দিয়েছে। তারপর হাতের প্যাকেটটা তার পায়ের কাছে রেখে আচমকা ঢিপ করে একটা প্রণাম করে উঠেছে।

—এ আবার কি! কপিল চক্রবর্তী অপ্রস্তুত। প্যাকেট খুলে যেমন অবাক তেমনি খুশি। দামী গরদের ধুতি একখানা আর গরদের চাদর।

দিন গেছে, মাস গেছে, একে-একে বছর ঘুরেছে অনেকগুলো। এখানকার মানুষগুলোর দ্রুত রং-বদল দেখে যাচ্ছে রাধা কেবিনের প্রবল মালিক গোপাল গণাই। অকারণ উৎসাহে উদ্দীপনায় ভরপুর সেদিনের নতুন মানুষগুলো দেখতে দেখতে পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। তাদের ভেতরে বাইরে যেন একটা ধূসর রঙের মরচে পড়ছে।

আরো চকচকে ঝকঝকে নতুনেরা তাদের জায়গা জুড়ে বসছে। দুনিয়া-কেনা বেপরোয়া হাব-ভাব চলন-বলন তাদের। কিন্তু গোপাল গণাই সকলকে এক-পর্যায়ে ফেলে দেখতে চেষ্টা করে। খদ্দের-বিশেষে যেমন চা চপ-কাটলেটের দামের তফাত নেই, অনেকটা তেমনি। বাইরেটা তার প্রায় রুক্ষ গোছের নির্বিকার। ভিতরটা সদা সজাগ।

পাকা শিকারীর মতো বাতাস টেনে-টেনে পা ফেলে চলতে শিখেছিল সে। উঠতি বয়সের নতুন খদ্দের আর চুলে পাক-ধরা পুরোনো খদ্দেরের সমস্যা নিয়ে একটু চিন্তার কারণ ঘটেছিল তার। এক নৌকায় এই বিপরীতমুখী দুটো দলকে আগলে রাখা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে কোনো দলেরই আসর জমে ওঠে না। ছেলে ছোকরাদের ভিড় দেখলে বয়স্করা দোকানে ঢুকতে দ্বিধা বোধ করে, অনেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বিরস বদনে চলে যায়। মালিকের আহ্বানে কেউ কেউ ঢুকে পড়লেও শেষে চটপট পালাবার পথ খোঁজে। অন্যদিকে আগে থাকতে বয়স্করা জায়গা জুড়ে বসে আছে দেখলে ছেলে-ছোকরারা বিরক্ত হয়ে অনেকে চলেও যায়। প্রায় সকলেই সকলের মুখ চেনে, কে কার ছেলে, কে কার বাপ জানে। অতএব অস্বস্তি।

অথচ হাটের মুখে চার মাথার ওপর এমন এক জায়গায় এই দোকান গোপাল গণাইয়ের যে মাথা খাটিয়ে একটু সুব্যবস্থা করতে পারলে ওই দু-দলের আসরই জমজমাট হয়ে উঠতে পারে। সমস্যার এখানেই শেষ নয়।...রং-বদলের আরো আধুনিক নজিরও কিছু লক্ষ্য করছে গোপাল গণাই। তাদের সময় পুরুষের রাধিকা-চিন্তা বুকের তলায় সংগোপন থাকত। এখন আর অতটা গোপনতার বালাই নেই। ছেলে-মেয়েদের সখা-সখিভাব প্রকাশ্যে আর বেশ দ্রুততালে ঘন হয়ে উঠেছে। তাই দেখে গোপাল গণাইয়ের চোখে কাঁটা বেঁধে না। উল্টে মনে হয় ওদের মুখ চেয়ে নিভৃত গুঞ্জনের একটু জায়গা করে দিতে পারলে তার ফলও মন্দ হবে না।

অতএব গোপাল গণাই মাথা খাটিয়েছে এবং সকল দিক বজায় রাখার মতো সুব্যবস্থাও করেছে। তার দেয়ালের ওপাশেই ছিল ছোট একটা লন্ড্রি। চোখের সামনে ভবিষ্যতের অন্ধকার চিত্র এঁকে আর অক্লান্ত পরামর্শ দিয়ে-দিয়ে প্রায় ছ-মাসের চেষ্টার লন্ড্রিঅলাকে তুলেছে। গোপালের কাছ থেকে টাকার টোপ গিলে ওই ঘরের মালিকও আধুনিক রজক-নন্দনের পিছনে লেগেই ছিল।

ঘর পাওয়া মাত্র মাঝের দেয়াল ফুটো করে দরজা বসানো হল। তিনদিনের মধ্যে রাধা কেবিনের ভোল বদল। আগের বড় ঘরখানা যেন আপনা থেকেই তরুণদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ওটার মধ্যেই কাঠ আর পর্দা সহযোগে দুটি পৃথক খোপের আবির্ভাব ঘটল। স-সঙ্গিনী যারা আসবে ও-দুটো তাদের জন্য। সামনের বাকী সবটুকু রমণী-বিরহিত নায়কদের দখলে। ও-পাশের নতুন পাওয়া ছোট ঘরখানা বয়স্কদের এলাকা। দু'ঘরের মাঝে শৌখিন হাফ-দরজা। দু'ঘরের হট্টগোল চেঁচামেচি কানে এলেও মুখ-দর্শনজনিত বিড়ম্বনা বা চক্ষুলজ্জার কারণ থাকল না। এই সুব্যবস্থার ফলে উভয় তরফ তুষ্ট।

দোকান খুলে সাত-সকালে প্রথমে কপিল চক্রবর্তীর মুখ দেখে গোপাল গণাই মনে মনে খুশি। দিনটা ভালো যাবে মনে হচ্ছে। এই এক লোককে দেখলে কাছাকাছি বয়সের কোনো পরিচিত মানুষ চট করে পাশ কাটাতে পারে না। তির্যক বাক্যবাণে বিদ্ধ করে

অথবা কোনো কম্পিত উত্তেজনার খোরাক যুগিয়ে মজা লোটে তারা। কপিল চক্রবর্তীর মাথাখানা যেন তামাম দুনিয়ার সমস্যায় ঠাসা একেবারে। সুযোগ-মতো একটু খুঁচিয়ে দিতে পারলেই জমজমাট ব্যাপার। আর ঠাণ্ডা মাথার মানুষটাকে সে-রকম তাতিয়ে দিতে পারলে তো কথাই নেই। দু'চোখে আগুন ঠিকরোবে, মুখে খই ফুটবে। খদ্দের সমাগম তখন বাড়তেই থাকে। আসর এক-একদিন এমন জমে ওঠে যে পাশের ঘর থেকে চেয়ার আনাতে হয়। ঘন-ঘন চায়ের হুকুম হতে থাকে। সিঙাড়ার বড় ঝুড়িটা দেখতে দেখতে খালি হয়ে যায়।

বাজারের সামান্য গোনা-গুণতি পয়সা ছাড়া কপিল চক্রবর্তীর পকেট হাঁ সর্বদা জানে। তবু এই একজনই সবার থেকে পয়মন্ত ভাবে গোপাল গণাই।

—কি-গো, এত সকালে বাজারে বেরিয়ে পড়েছ আজ?

এত সকালে এসে পড়াটা বাঞ্ছনীয় কি না কপিল চক্রবর্তী নিঃসংশয় নয়। ঘামে ভেজা মুখখানায় হাসি ছড়ালো একটু। দোকানে উঠে এসে হাতের পেটমোটা মস্ত ব্যাগটা চায়ের টেবিলে রাখল। ব্যাগটা তার অবিচ্ছেদ্য কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামিল। সর্বদা সঙ্গে থাকে, সঙ্গে ঘোরে। ওতে কি আছে কেউ আর ভাবে না এখন, কি নেই সেটা বরং গবেষণার বস্তু হতে পারে। কাগজপত্র বলতে তার অনেক প্ল্যান, অনেক প্রস্তাব অনেক প্রতিবাদ, অনেক পেপার-কাটিং। তর্ক উঠলে নজির ছাড়া কথা বলে না কপিল চক্রবর্তী। কিন্তু ওইসব বহুমূল্য কাগজপত্র ছাড়াও ইদানীং ওটা আরো বহুরকমের প্রয়োজনীয় জিনিসের আশ্রয়। কাটা ঘায়ের মলম বা আয়োডিন থেকে দড়ি ফিতে সূতো জেমক্লিপ আলপিন পেন পেনের কালি জুতোর কালি মা-কালীর ছবি গীতা চণ্ডী—কিছু আর বাদ নেই। একবার এক ভদ্রলোকের চোখে কাঁকর না কি ঢুকেছিল হঠাৎ, কপিল চক্রবর্তীর এই ব্যাগ থেকে তখন ছোট গোলাপ জলের শিশি বেরিয়েছিল একটা।

ওই ব্যাগ তার সুদিনের সাথী। সেই সুদিন এখন ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেছে। ব্যাগটারও তেমনি ছেঁড়া-খোঁড়া বিবর্ণ দশা। তবু সুদিনের স্মৃতির মতোই চক্রবর্তীর বড় মমতার জিনিস ওটা।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে কপিল চক্রবর্তী কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, হ্যাঁ, সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়লাম, বাড়িতে ভালো লাগছিল না। একটা বড ভাবনার মধ্যে পড়ে গেছি হে...

শোনা-মাত্র মুখ গম্ভীর গোপাল গণাইয়ের। কয়েক পলক চেয়ে থেকে ভাবনার কারণটা অনুমান করতে চেষ্টা করল। তারপর মুখের ওপর একটা নির্লিপ্ত আবরণ টেনে মাঝের দরজা দিয়ে এদিকে চলে এলো। ভাবনার কথা শুনে আর সেই সঙ্গে এই গোছের মুখ দেখে মেজাজ যথার্থই বিগড়েছে একটু...

...সেবারে মেয়ের অসুখের পরেও ওই রকম মুখ করে ভাবনার কথা বলেছিল। জল-মাপা ছোকরা বটুক তালুকদার নাকি হুট করে বড় ডাক্তার এনে তার মেয়ের চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছিল, গাঁটের টাকা ভেঙে ডাক্তারের ফী গুনেছে, ওষুধপত্র কিনে এনেছে। তারপর মেয়ে সেরে ওঠার পর থেকেই সরি অর্থাৎ সরোজিনী কুশারী নাকি ওই টাকা শোধ করে দেবার জন্য অস্থির করে মারছে তাকে। কপিল চক্রবর্তী ভাবছে কিছু ধানী জমি বিক্রি করে দেব। সেটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপাব একটু। নদীর দিকের নীচু

জমি, বন্যা-টন্যার ভয়ে সে-রকম দাম উঠছে না। এখন গোপাল যদি কিছু টাকা দেয়, জমি বিক্রি হলেই সে সুদসুদ্ধ শোধ করে দেবে।

এমনিতেই গোমড়া মুখ গোপাল গণাইয়ের, তার ওপর গোটাকতক কঠিন রেখা পড়েছিল। তার ধারণা, ছন্নছাড়া লোকটা নিজের দোষে সুদিন খুইয়েছে। কিন্তু রাগ সে জন্যও নয়। রোগের হেতু, দুনিয়ায় সম্ভবত এই একটি মাত্র মানুষের বিশীর্ণ প্রার্থী রূপটা দেখতে চায় না সে। দেখলে বুকের ঠিক মধ্যখানে কি-যেন খচ খচ করে বেঁধে। চোখ বুজলে কপিল চক্রবর্তীর যে মূর্তি সে দেখতে পায় তার কাছে এই প্রার্থীর রূপ যেন কুৎসিত রকমের বে-মানান। একটু চেষ্টা করলেই সে দেখতে পায় ব্রাহ্মমুহূর্তে পুব-মুখো দাঁড়ানো চিম্ময়-চেতন মহাজ্যোতির শরণাগত একখানা মুখ। তার আকুতি আজও কানে লেগে আছে—তুমি ধ্যানে এসো, তুমি বরুণ, তুমি জ্ঞানে এসো, তুমি হৃদয়ে এসো।

মুখ বিকৃত করে গোপাল গণাই জবাব দিয়েছিল, যে দিনকাল পড়েছে টাকা কোথায় পাব, দোকানটার জন্যেই তো আরো কত টাকা দরকার...

কপিল চক্রবর্তীর বিমর্ষ মুখ। এখানে নিরাশ হবে ভাবে নি। আড় চোখে খানিক তাকে লক্ষ্য করে গোপাল গণাই বলেছিল, তবে আজকালের মধ্যেই তোমার কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে...রাধা কেবিনের রাধা কি-সব মানত-টানত করে রেখেছিল, দোকান দাড়ালে তোমার শ্রীচরণ উদ্দেশ করে কি করবে-টরবে বলেছিল। তা সুদিনের মুখ দেখে মাগী সব ভুলে বসেছিল, সেদিন মনে করিয়ে দিতে টনক নড়েছে। দেখো...

পরদিনই নিজে এসে গোপাল গণাই তার রাধার মানত রক্ষা করে গেছল। ও-রকম প্রাপ্তিযোগ কপিল চক্রবর্তী কল্পনাও করে নি। যা পেয়েছিল তাতে বটুকের টাকা দিয়েও হাতে কিছু ছিল আর দুটো মুটের মাথায় যা এসেছিল তাতে বেশ কয়েক দিনের চাল ডাল তেল ঘি নুনের খরচাও বেঁচে গেছল।

আজ আবার ভাবনার কথা শুনে আর এই মুখ দেখে ভেতরটা সেবারের মতোই অপ্রসন্ন গোপাল গণাইয়ের।

নিজের হাতে এক পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এলো সে। পেয়ালাটা চক্রবর্তীর সামনে রেখে তেমনি নিস্পৃহ-মুখে পাশের চেয়ারটা টেনে বসল। একলা এলে বিনে পয়সায় এক পেয়ালা চা বরাদ্দ কপিল চক্রবর্তীর। গোড়ায় গোড়ায় সে আপত্তি করত, এখন আশাই করে। তারপর লোক এসে গেলে আর তর্ক জমে উঠলে একে একে কত পেয়ালা তল হয়ে যায় হিসেব থাকে না। এক-একজন আসে নিজের চা অর্ডার দেবার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করে, এক পেয়ালা হবে নাকি হে চক্রবর্তী?

উত্তেজনায় ভরাট গলার স্বরও তৎক্ষণাৎ শমে নামিয়ে সে মাথা নাড়ে।—হোক...

বক্র কটাক্ষে চা-পানে নিবিষ্ট মুখখানা বার কয়েক দেখে নিল গোপাল গণাই। কিছু বলছে না বলেও চাপা বিরক্তি। শেষে নিজেই নির্লিপ্ত প্রশ্ন ছুঁড়ল, নতুন আবার কি ভাবনার মধ্যে পড়লে?

শেষ চুমুকে পেয়ালা খালি করে দিয়ে কপিল চক্রবর্তী নড়ে-চড়ে বসল একটু। ঠোঁটের ফাঁকে কাঁচুমাচু হাসির আভাস—না, ইয়ে...বলছিলাম একেবারে ভোর-রাতে মেয়েটা কি এক বিতিকিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে উঠল...চারদিক বন্যায় ডুবে গেছে, তার মধ্যে ও ভাসছে।

অপ্রত্যাশিত স্বপ্নের কথা শুনে গোপাল গণাইয়ের দু' চোখ গোল হয়ে উঠতে লাগল। আরো সঙ্কটের কথা শুনতে হবে কিনা সেই প্রতীক্ষা।

কিন্তু ঠোঁটের বিড়ম্বিত হাসি উল্টে যেন আরো একটু প্রশস্ত হল কপিল চক্রবর্তীর। বলল, শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিপদ কিছু হয় নি, ও দেখল, একটা ছেলে মানে—শশধর ঘোষালের ছেলে ওই রাজা ঘোষাল অথৈ জল থেকে টেনে তুলছে ওকে...

গোপাল গণাইয়ের মুখে কথা সরতে সময় লাগল একটু। চুপচাপ খানিক চেয়েই রইল। তারপর বলল, দিন-রাত বন্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, তোমার মেয়ে বন্যার স্বপ্ন দেখবে না তো কে দেখবে।...তা সত্যিই ভাবনায় পড়েছ, না শশধর ঘোষালের ছেলে রাজা ঘোষাল মেয়েকে টেনে তুলেছে শুনে একটু আনন্দও হচ্ছে?

ছোট ছেলের মনের কথা ধরা পড়লে যেমন হয় তেমনি বিড়ম্বিত মুখ কপিল চক্রবর্তীর।—কি যে বলো, মেয়ে বন্যায় ভাসছে শুনলে কার আবার আনন্দ হয়।...পূর্ণিমার ভোর রাতের স্বপ্ন, তাই চিন্তা। পাঁজিতে দেখলাম অনেক সময় ফলেও যায়—পাঁজি সঙ্গে আছে, দেখবে?

পাজির উদ্দেশে পেট-মোটা বিবর্ণ ব্যাগটায় টান পড়তেই গোপাল গণাই বাধা দিল। --থাক। দুনিয়ার ওপর বীতশ্রদ্ধ মুখ যেন তার। একটু চুপ করে থেকে মন্তব্যের সুরে বলল, স্বপ্নের সবটাই যদি ফলে যায় তাহলে আর দুশ্চিন্তার কি আছে।...তবে রাজা ঘোষালের বদলে শেষে ওই গেজ-রীডার বটুক তালুকদার না তুলতে আসে সেদিকে একটু খেয়াল রেখো।

মুহূর্তে সচকিত কপিল চক্রবর্তী।-খোঁচা খোঁচা দাড়ি-ভরা তামাটে মুখে লালের আভা ছড়াতে লাগল। তারপর চাউনিটাও খরখরে হয়ে উঠতে লাগল। ঘরে মুখ বুজে সরি অর্থাৎ সরোজিনীর গঞ্জনা সইতে হয় তাই বাইরের এই ইঙ্গিত আরো অসহ্য!—তার মানে?

আজকাল আর কারো ঝাঁঝের ধার ধারে না গোপাল গণাই। জবাব দিল, পাঁচ রকম কথা কানে আসে...এই সেদিনও ভুবন হালদার ওই ছোঁড়াটার সম্পর্কে কি সব বলছিল।

—ভুবন হালদার কি-সব বলছিল আর তোমরা তাই মজা করে শুনছিলে, কেমন? ভুবন হালদার কি লোক তোমরা জানো না—তাকে তোমরা চেনো না? ওইটুকু ফুলের মতো মেয়ে একটা, তোমাদের লজ্জাও করে না!

রাধা কেবিনের বয়স্ক আড্ডাধারীদের মধ্যে সব থেকে কৃতী পুরুষ ভুবন হালদার। কাঁচা পয়সা ছড়ানো ছিটানোর ব্যাপারে লোকটা মুক্তহস্ত। কিন্তু যারা খবর রাখে তারা ভালো করেই জানে বিনা স্বার্থে ওই লোক পাশ ফিরে ঘুরেও বসে না। কণ্ট্রাকটারির প্রথম যুগে একটা ঝরঝরে সাইকেলে চেপে দিনে কম করে ষাট-সত্তর মাইল টহল দিয়ে বেড়াত। এখন ঝকঝকে গাড়ি হয়েছে। তার এই সুদিনের মূলেও কপিল চক্রবর্তী। সেও তো তখন কেউকেটা মানুষই একজন। নানা ফন্দি-ফিকিরে লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছে, কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে তার হয়ে ভুবন হালদার জোরালো ইলেকশন ক্যাম্পেন করেছে আর দাদা বলতে মূর্ছা গেছে। ভাগ্যের ভিত মোটামুটি পাকা-পোক্ত হয়ে উঠতে হালদারের কিছু কিছু চাপা গুণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এখন তো কাউকে পরোয়াই করে না। সে রঙিন জলের গুণগ্রাহী, সপ্তাহে কম করে তিন চারদিন বাড়িতেই

মদের আসর বসে। অনেক গণ্যমান্য জনের আনাগোনা সেখানে। বয়েস এখন বাহান্নর ও-ধারে। কিন্তু একটি চুলেও পাক ধরে নি। নিজেই বলে, রসিকজনের সঙ্গে সাদার আপোস নেই। বিয়ে করেনি। আর করবে বলে ভাবেও না কেউ। রমণীকুলের প্রতি নিরাসক্ত নয় তা বলে। বরং পরিচিতজনের চাপা গুঞ্জনে উল্টে আসক্তির খবরটাই সুরভিত এখন। সদ্য বর্তমানে তারই কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার সঙ্গে রাগানুরাগের পর্বটি নাকি বেশ জমে উঠেছে। মাঝ-বয়সী সেই সুদর্শনার সঙ্গে প্রীতির যোগটা বাসি ব্যাপার, ইদানীং ওই মহিলার রোষ-প্রসঙ্গ হালের খবর। বেশ কিছু টাকা ঢেলে ভুবন হালদার নাকি এখন ওই মেয়ে স্কুলের সেক্রেটারী হয়ে বসার তালে আছে। কারণ, সেখানকার কয়েকটি অল্প-বয়সী টিচারকে তার মনে ধরেছে। সেক্রেটারী হয়ে বসতে পারলে কিছু দখল অথবা সুযোগ-সুবিধা মিলতে পারে। দুর্জনের এই কানাকানি প্রাক্তন অনুরাগিণীর কানেও উঠেছে। তাই মহিলা রুষ্ট।

মানুষটা রসের স্তাবক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে। এতটুকু ফাঁক পেলেই লাগাম-ছাড়া বাক্যবাণে সেই রসের আধিক্য ঘটিয়ে থাকে। বিশেষ করে রমণী-ঘটিত কোনো সম্ভাব্য রসের সন্ধান পেলে তো কথাই নেই। সেই রসের হাঁড়ি সে এমনি হাটের মধ্যেই ভেঙে বসবে। নিজের কলঙ্কের দরুন কোন রকম বিদ্বেষ বা জাতক্রোধে যে এ-রকম করে তা নয়। পুরুষমানুষের এই গোছের কলঙ্ক ববং পুরুষকার বলে ভাবে সে। নিরামিষ নির্জীব পুরুষ তার চক্ষুশূল। সর্বদাই নিজের দল-পুষ্টির আনন্দে হাটে হাঁড়ি ভাঙার ঝোঁক তার।

এ-হেন লোক মেযের সম্পর্কে কটাক্ষ কটূক্তি করেছে শুনলে কপিল চক্রবর্তীর তেতে ওঠাই স্বাভাবিক।

গোপাল গণাই আরও গম্ভীর।—অত চেঁচাচ্ছ কেন? শুনতে লজ্জা করে বলেই তো তোমাকে বলা।

—কেন, আমাকে বলবে কেন? কেন তোমরা ওকে অত আশকারা দেবে? ওর ওই মুখ আমি একদিন থেঁতলে দেব বলে দিলাম—পাজী হতচ্ছাড়া বেইমান!

রাগ হচ্ছে বটে আবার ভিতরে ভিতরে কৌতূহলেরও আচড় পড়ছে গোপাল গণাইয়ের। কারণে-অকারণে ইদানীং এই লোক চট করে উত্তেজিত হয় বটে, তবু এই গোছের রাগ শিগগীর দেখে নি। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখেই বলল, বাজে বোকো না, সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই, তুমি তার টিকির নাগালও পাবে না।...তা তুমি কি আশা করো, ঘোষালের ছেলে তোমার মেয়েকে অথৈ জল থেকে টেনে তুললেই ওর ওই মা-টি আদর করে তাঁকে একেবারে ঘরে এনে তুলবে? ছেলে একটা পরীক্ষায় জলপানি পেয়েছে, সামনের বি-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই দ্বিগুণ দিগ্‌গজ হয়ে উঠবে সেই আনন্দে তার মাটিতে পা পড়ে না—এখন থেকেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যের স্বপ্ন দেখছে, তুমি তার খাঁই মেটাতে পারবে? সম্বলেব মধ্যে তো কুমীরের ছানার মতো সকলকে তুমি ওই একফালি ধানী জমি দেখিয়ে বেড়াও।

ঘোষালের ওই বিধবা বউয়ের ব্যবহার বা হাব-ভাব সদয় নয় তাদের প্রতি কপিল চক্রবর্তী তা জানে। গোপালই বলেছে, আর সরোজিনীও সেই রকম আভাসই দিয়েছে। অবস্থা বদলালেও গোপালের বউ রাধা এখনো মুড়ি বিক্রি করা ছাড়ে নি। পনের দিন

অন্তত ঘোষাল বাড়িতে সে মুড়ি বেচতে যায়। ঘোষালের বউ যেভাবে ছোট মুড়ির টিনটা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে ঠেসে ভরে নেয়, সেই ফিরিস্তি দিয়ে গোপাল একদিন বন্ধুর উদ্দেশে রসিকতা করে বলেছিল, ছেলের বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষকে ধরে মহিলা কি-রকম ঝাঁকানিটা দেবে তা নাকি ওই থেকেই বুঝে নিয়েছে। আর একদিন ছেলের প্রশংসায় নাকি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল ঘোষাল-গিন্নি, গোপালের বউ তখন আলতো টোপ ফেলে বসেছিল একটা। বলেছিল, সোনার টুকরো ছেলে মা তোমার, তা বি-এ পাসটা হয়ে গেলেই বিয়ে দিয়ে দাও, দেখে আমাদের চোখ জুড়োক...ছেলের যুগ্যি মেয়ে তো ঠিক হয়েই আছে। শোনা-মাত্র ঘোষাল-গিন্নির মুখ রাগে রক্তবর্ণ নাকি, যাচ্ছেতাই গালাগাল করে তাড়িয়েছে গোপালের বউকে, আর সাবধান করেছে ফের অমন কথা মুখে আনলে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না তাকে।

শুধু এই নয়, ভবিষ্যতের একটু আশা নিয়েই সরি মাঝে-সাঝে ঘোষাল-গিন্নির সঙ্গে গল্প-সল্প করতে যেত। উদ্দেশ্য বুঝে মহিলা প্রকারান্তরে তাকেও একদিন অপমান করেছে।

সব জানা সত্ত্বেও গোপালের আজকের বচন শুনে রাগে দুঃখে চক্রবর্তীর মেজাজ আরো তিরিক্ষি। বিশেষ করে কুমীরের ছানা দেখানোর মতো একফালি ধানী জমি দেখানোর বিদ্রূপ অসহ্য। চেঁচিয়ে উঠল, বেশ করি আমি কুমীরের ছানা দেখাই, তোমাদের তাতে কি? যেখানে খুশি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব তার জন্য তোমাদের দোরে-দোরে আমি ভিক্ষে করতে যাব ভেবেছ? ওই পাজী লম্পট কেন আমার মেয়ের সম্পর্কে কথা বলতে আসে?

যেন খাঁচায়-পোরা সিংহের তর্জন-গর্জন দেখছে আর শুনছে গোপাল গণাই। খানিক ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থেকে আলতো করে যোগ করল, শুধু মেয়ের সম্পর্কে কেন, তোমার সম্পর্কেও দু-পাঁচ কথা বলা শুরু করেছে হালদার।

চক্রবর্তীর লাল চোখ তার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। কি বলে ঠাওর করতে না পেরে দারিদ্র্যের ইঙ্গিতই ধরে নিল। আক্রোশে দ্বিগুণ ফেটে পড়ল।—কেন বলবে? কেন এত দুঃসাহস হবে তার? আশকারা দিয়ে তাকে মাথায় তুলে তোমরাই বা এসব শোনো কোন সাহসে?

অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা মেজাজে কথা বলেছে গোপাল গণাই। কারো মেজাজ সহ্য করা তারও ধাত নয় আজকাল। উগ্র ঝাঁঝে বলে উঠল, তার মুখ বন্ধ করবে কি করে, আর আমরা শুনলেই বা আটকাবে কি করে?

—কি? কি বললে? উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কপিল চক্রবর্তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—সকলে নীচ ইতর তোমরা—বেইমান নিমকহারাম তোমরা—বুঝলে? তোমাদের মুখ দেখাও পাপ—

এক ঝটকায় পেটমোটা ব্যাগটা টেনে নিয়ে হন হন করে নেমে চলে গেল। জীবন থাকতে আর এই পাপীদের মুখ দেখবে না সে।

গোপাল গণাই সেদিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল খানিক জিভের ডগায় একটা অশ্লীল কটূক্তি এসেই গেছল প্রায়।

ওদিকে দেয়ালের গায়ে সাইকেল ঠেস দিয়ে রাখার পরিচিত শব্দে ঘাড় ফেরালো।

মালকোঁচা-মারা ধুতির নিচে টুইলের শার্ট গোঁজা বিশ্বেশ্বর দত্ত। পিছনের ক্যারিয়ারে ডাক্তারি ব্যাগ বেঁধে এই বেশে গোটা শহর টহল দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সত্যিই তার রোগীর সংখ্যা কত ইদানীং অনেকেরই সেই সংশয়। রোগীর বাড়িতে একসময় সমাদর ছিল খুব। ফী দু টাকা থেকে চড়িয়ে চার টাকায় তোলার কথা চিন্তা করছিল তখন। সেই সময়েই চার টাকা ফী-এর একজন ডাক্তারের আবির্ভাব। এখন তো আট টাকা ষোল টাকা ফী-এর ডাক্তারও এসে জুটেছে এই শহরের মধ্যেই। এই অবস্থায় তার মতো এল-এম-এফ ডাক্তার ফী চড়ালে তাকে আর ডাকবে কে? ডাক্তারি জানুক না জানুক লোকের কাছে ওই ছাপের চটকের কদর বেশি। এখনো যেটুকু পসার সে ওই দু'টাকা ফী-এর কল্যাণে আর তার রাজা-উজীর-মারা মুখের কল্যাণে। রাজা-উজীর বলতে ওই ছাপের চটক-ওয়ালা ডাক্তার ক'জন। কবে কোন দিগগজ কালাজ্বরকে টাইফয়েড আর টাইফয়েডকে বিকোলাই বানিয়ে কোন রোগীকে যমের মুখে ঠেলে দিয়েছিল আর শেষ সময়ে কোন যোগাযোগের ফলে এই মুখখু ডাক্তার তাকে যম-দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছে—এই গোছের নিত্য-নতুন ফিরিস্তি তার মুখে লেগেই আছে। কিন্তু পসার তবু কমছে বই বাড়ছে না। সেটা এল-এম-এফ ডাক্তার বলে নয়। ভদ্রলোকের নামে কিছু কুৎসা দানা বেঁধে উঠছে। বেশি ফী-এর আশায় রোগীর রোগ জিইয়ে রাখে, বেশি পয়সা পেলে অবৈধ সংকট মোচন করে, ইত্যাদি।

চা এক পেয়ালা।

গোপাল গণাই জানান দিল, গরম সিঙাড়া ছিল—

বিশ্বেশ্বর দত্ত মাথা নাড়ল, অর্থাৎ সিঙাড়ায় রুচি নেই।

এটুকু থেকেই তার পকেটের অবস্থা আর মনের অবস্থা দুই-ই বোঝা গেল। সিঙাড়ার নামে তার জিভে জল গড়ায়।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। গোপাল গণাই চুপচাপ ডাক্তারের অখুশি মূর্তিখানা নিরীক্ষণ করল একটু।—তোমার হার্টের রোগীর খবর কি?

ক'দিন এক আধ-বুড়ো রোগীর নিয়ে গর্ব করতে শোনা গেছে তাকে। বাজারের ভিতরকার দোকানের এক কাপড়অলা। সকলেই চেনে তাকে। কিছুদিন আগে দোকানেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। লোকজন ছুটোছুটি করে এই রাধা কেবিন থেকেই ডাক্তারকে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে বিশ্বেশ্বর দত্ত ওই রোগী আঁকড়ে আছে। দুদিন আগেও ডাক্তার এখানে বসে গল্প করে গেছে, কোন অঙ্গে যে রোগ নেই লোকটার—বুক থেকে শুরু করে কিডনি পর্যন্ত সব ড্যামেজ। তবু চারদিক আট-ঘাট বেঁধে চিকিৎসার ফলে এ-যাত্রা যমকে কলা দেখাতে পারবে আশা করা যায়।

মুখ বিকৃত করে ডাক্তার জবাব দিল, কাল রাতে টেঁশে গেছে।...ব্লাডপ্রেসার দু'শ সত্তরে চড়ে ছিল তার মধ্যে রাগারাগি চিৎকার চেঁচামেচি, আমি কি করব!

অর্থাৎ লোকটা সম্পূর্ণ নিজের দোষে মরেছে। হঠাৎ কি মনে হতে গোপাল গণাই জিজ্ঞাসা করল, ব্লাডপ্রেসার বেশি হলে রাগারাগি বাড়ে না রাগারাগি বাড়লে ব্লাডপ্রেসার চড়ে?

—দুই-ই হতে পারে...তবে ব্লাডপ্রেসার বেশি থাকলে মেজাজ অল্পতেই বিগড়য়। ...কেন?

—আমাদের কপিল চক্রবর্তীও দেখছি দপ-দপ জ্বলে ওঠে আজকাল...এক কাজ করবে, ওর প্রেসারটা দেখবে একবার?

নির্লিপ্ত মুখ করে ডাক্তার জবাব দিল অত সময় কোথায়—

—সময় হবে, তোমার দু'টাকা ফী না হয় আমিই দেব।

তক্ষুনি ভোল আর বোল দুই-ই পাল্টালো ডাক্তারের।—তুমি সত্যিকারের দরদী মানুষ।...যাব'খন। ইয়ে, টাকা দু'টো এখনই দেবে...?

—না। আগে দেখে এসো। আমি পাঠিয়েছি বলবে না।

প্রেসার দেখতে গেলে তেড়ে মারতে আসবে কিনা ঠিক নেই, আগেই টাকা দিয়ে বসবে অত কাঁচা লোক নয় গোপাল গণাই।

বিকেল তিনটার পর আবার যখন দোকান খুলল, মন-মেজাজ তখনো খুব ঠাণ্ডা নয়। সকালের ওই ঝগড়ার পর থেকে দিনটাই ছাড়া ছাড়া ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেমন। ...বিশ্বেশ্বর ডাক্তার প্রেসার দেখতে গেলে ঠিক বুঝবে কে পাঠিয়েছে। জব্দ হয়ে আরো রেগে যাবে হয়তো। কিন্তু ওটুকুতে তুষ্টি বোধ করছে না গোপাল গণাই। তাকে নীচ বলেছে, বেইমান নিমকহারাম বলেছে, আরো একটু বেশি জব্দ করতে পারলে তবে মেজাজ ঠাণ্ডা হত।

রাস্তার দিকে চোখ পড়তে দু'চোখ সচকিত। কপিল চক্রবর্তীকে আরো জব্দ করার মতোই রসদ মিলেছে যেন কিছু। একটা মোটা বাঁধানো খাতা বগলে চেপে রাস্তার ও-ধার ঘেঁষে চলেছে যে ছেলেটা, গোপাল গণাইয়ের দু'চোখ তাকেই আঁকড়ে আছে। এদিকে না যদি তাকায় তখন ডাকবে।

ঘোষাল বাড়ির ছেলে রাজা ঘোষাল। তাকালো। হাত তুলে তক্ষুনি গোপাল গণাই ইশারায় ডাকল।

এলো। বয়সের তুলনায় হাব-ভাব একটু বেশি গম্ভীর বটে, তবু আর পাঁচটা ছেলের মতো দাম্ভিক বা অবাধ্য নয়।

ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি ছড়িয়ে গোপাল গণাই অভ্যর্থনা জানালো, এসো, অনেকদিন দেখি নি তোমাকে—

রাজা ঘোষাল জবাব দিল, ছুটি ফুরলেই ফাইন্যাল পরীক্ষা তাই...

—তুমি তো হীরের টুকরো ছেলে, তোমার আবার পরীক্ষার ভাবনা কি। কত প্রশংসা শুনি তোমার।...আমাদের কপিল চক্রবর্তীব স্বার্থ আছে, সে তো প্রশংসা করবেই, অন্য লোকেও করে। বোসো, এক-পেয়ালা চা খেয়ে যাও।

চাটুবাক্যে মন ভিজল। তবু চায়ের আমন্ত্রণ অপ্রত্যাশিত। সবিনয়ে বলল, চা থাক—

—নিজে দোকানে ডেকে এক পেয়ালা চা না খাইয়ে পারি! পয়সা লাগবে না—ওরে, ওই স্পেশ্যাল চা এক পেয়ালা নিয়ে আয়—

হাঁকটা বয়ের উদ্দেশে। নিজেই উঠে গিয়ে ডিশে করে দুটো বিস্কুট তার সামনে এনে রাখল।—খাও।

বয় চা দিয়ে গেল। চেয়ার টেনে সামনে বসতে বসতে ঠোঁটের হাসি আর একটু

বিস্তৃত করে নিল গোপাল গণাই।—তোমাকে একটা মজার কথা বলব বলে ডাকলাম। আমাদের মা-লক্ষ্মী, ইয়ে, কপিল চক্কোত্তির মেয়ে লোপা গো, আজ ভোর রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। চারদিক বন্যায় ডুবে গেছে, তার মধ্যে ওই মেয়ে ভাসছে, জীবনের আশা আর এককণাও নেই—সেই দুর্যোগে কোথা থেকে হঠাৎ তুমি এলে, হাত ধরে টেনে তুললে ওকে।

কটাক্ষে ছোকরার মুখখানা দেখে নিল একবার। চায়ের পেয়ালায় অতিরিক্ত মনোযোগ সত্ত্বেও লাল-লাল ঠেকছে। অতএব দ্বিতীয় দফা মুণ্ডু ঘোরাবার চেষ্টায় এগলো গোপাল গণাই। উৎফুল্ল মুখ করে বলল, স্বপ্নের কথা শুনে ওর বাবা তো ভেবে সারা।

পূর্ণিমার ভোর-রাতের স্বপ্ন...আমাকে এসে শুধালো, কি হবে গোপাল, একটা স্বস্ত্যয়ন-টস্তয়ন করব? আমি বললাম, কিছু করতে হবে না, যা করার ওপরঅলাই করে রেখেছে—মা-লক্ষ্মী যখন স্বয়ং নারায়ণের হাত ধরে ডাঙায় উঠতে পেরেছে তখন আবার ভাবনা কি! যত দুর্যোগই আসুক, শেষ পর্যন্ত ভালো ছাড়া মন্দ আর কি হতে পারে!

স্বয়ং নারায়ণটি এখন চায়ের শূন্য পেয়ালাটাই ঠোঁটে ঠেকিয়ে রেখেছে মনে হল। কৌতুক চেপে গোপাল গণাই এবারে গোটাকতক দার্শনিক ধাপ ডিঙোতে চেষ্টা করল। —আ-হা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীই বটে, ছোটটি তো এখনো, চঞ্চলা-লক্ষ্মীর মতো যখন হেসে খেলে বেড়ায় আমি দু'চোখ ভরে দেখি।...আর ভাবি, চোখ ছিল বটে তোমার বাবার, দ্রষ্টা ঋষিই বলব তাকে, নইলে আরো কটা বছর আগে মা-টিকে নিজের ঘরে এনে তোলার সঙ্কল্প মাথায় এলো কেমন করে—চক্কোত্তির কাছ থেকে একেবারে পাকা কথা আদায় করে তবে নিশ্চিন্ত। তখন তো যে শুনেছে সে হেসেছে, আর এখন? এখন তো ওই মেয়েকে দেখে ছেলের বাপেরা সব হিংসে করে!

মুণ্ডু ঘোরানো সারা প্রায়। ছোকরা আর মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাতেও পারছে না। কিন্তু গোপাল গণাইয়ের শেষ মোক্ষম অস্ত্র নিক্ষেপ বাকি এখনো। আর একটু সামনে ঝুঁকে গলা আরো একটু খাটো করে বলল, কিন্তু ইয়ে, একটা সমস্যাও দাঁড়িয়েছে বুঝলে...মেয়ের ওই বাপ তো সদাশিব ভোলানাথ একখানা, তাকে বলে লাভ নেই বলেই তোমাকে বলা...মা-টি তো এখন বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে দেখেইছ, না-না লজ্জা কি, তুমি দেখবে না তো কে দেখবে—কিন্তু কু-চোখে দেখার লোকেরও তো অভাব নেই, দানবের উৎপাতে স্বয়ং মা-লক্ষ্মীকেই সাগরে সেঁধোতে হয়েছিল জানই তো, এ-তো রক্ত-মাংসের মেয়ে।...এই সে-দিন এক-ঘর লোকের সামনে ওই হাড়পাজী হালদার টিপ্পনী কেটে বসল, চক্রবর্তীর মেয়ের অসুখে গেজ-রীডার বটুক তালুকদার বড় ডাক্তার নিয়ে আসে, গাঁটের পয়সা খরচ করে ওষুধপত্র কিনে আনে—ব্যাপারখানা কি। আমি অবশ্য তক্ষুনি শুনিয়ে দিয়েছি, সক্কলেরই তো আর কালো টাকা ঘরে মজুত থাকে না, দরকার পড়েছে নিয়েছে আবার কপিল চক্রবর্তী তার কড়া-ক্রান্তি শোধও করে দিয়েছে! যাক, আসল কথা লোকে কাদা ছিটোতে পেলেই হল, তাই বলছিলাম তুমি বাবা একটু-আধটু নজর রেখো...দায় তো সব শেষ পর্যন্ত তোমারই—

দায় কাঁধে নিয়েই যেন ছেলেটা দোকান থেকে নেমে চলে যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে ভ্রূকুটি সত্ত্বেও গোপাল গণাইয়ের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস লেগে আছে। লেখাপড়া জানা আজকালকার এই ছোঁড়াগুলোর একটুও হিম্মত আছে ভাবে না সে। আধহাত ফাঁক

রেখে বড় জোর নদীর ধারে নয়তো রেস্তোরাঁর কেবিনে পর্দার আড়ালে বসে ফিস-ফিস গুজ-গুজ করবে। তালপুকুরের ও-ধারে ঝাঁকড়া আম গাছের পিছনে দিনে দুপুরে রাধাকে টেনে আনার সেই হিম্মতের কথা মনে পড়তে নিজের উদ্দেশেই একটা হালকা কটূক্তি করে উঠল সে। আপন মনেই হাসছে মিটিমিটি। এ ছোকরা অতটা পারবে না জানা কথা, তবু এরপর চক্রবর্তীর ওই মেয়েটাকে যখন দেখবে, আগের থেকে ভিন্ন চোখেই দেখবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ এই আধ ঘণ্টায় ছোঁড়াটাকে যতখানি এগিয়ে দেওয়া গেল, সাত-জন্ম চেষ্টা করলেও কপিল চক্রবর্তীর দ্বারা তা সম্ভব হত না...তাকে কিনা বেইমান বলা আর নিমকহারাম বলা।

এতক্ষণে পরিতুষ্ট মুখ গোপাল গণাইয়ের। যেন মনের মতো পাল্টা প্রতিশোধই নিতে পেরেছে কিছু।

পাঁচ

গত দু'মাস আড়াই মাস ধরে লোপা যেন আলো-বাতাস শূন্য একটা খাঁচার মধ্যে আটকে আছে। উঠোনের বাইরে পা ফেলতে দেখলেই সরি পিসীর চোখে কাঁটা বেঁধে। আর সমস্ত মুখে কালো একখানা মেঘ তো জমাট বেঁধেই আছে।

—এ সময় আবার কোথায় চললি?

ওকে বেরুতে দেখলে দিন রাতের কোন সময়ই সুসময় নয় সরি পিসীর বিবেচনায়।

লোপার কখনো হাসি পায়, কখনো বা সত্যি-সত্যি রাগ হয়ে যায়। রাগ হলে পাল্টা ঝামটা দিয়ে যা মুখে আসে বলে বসে। এই সেদিনও মুখের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, কোথায় যাচ্ছি জানো না, বর খুঁজতে যাচ্ছি, বর খুঁজতে—হল? রাজ্যের ছেলেরা সব লাইন দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ না? যাকে বেছে নেব সে-ই টুক করে গিলে ফেলবে—ব্যস নিশ্চিন্ত।

চোখ মুখ লাল করে নিশ্চিত হওয়া বা করার পর উঠোনটাও পেরুনো হয়ে উঠল না আর। হঠাৎ উপচে-ওঠা হাসির দমকে রাগের বাঁধ চৌচির। হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়ল।

শুধু সরি পিসী নয়, বাবার মেজাজও যেন ঠিক আগের মতো নেই। বাইরে থেকে প্রায়ই রাগে গরগর করতে করতে ফেরে। একলা ঘরে অনেক সময় বিড়বিড় করতে দেখে তাকে। লোপা জানে ফাঁক পেলেই লোকে পিছনে লাগে তার। সেই কারণে বাবার পরিচিত কোনো লোককেই ও ভালো চোখে দেখে না। একমাত্র গোপালকাকাকে ছাড়া। ওই গোপালকাকাকেই মাস কয়েক আগে লোপা বলেছিল, লোকে পিছনে লেগে বাবার মাথা গরম করে দেয়, তুমি তাদের আচ্ছা করে ধমকে দিতে পারো না? বেশির ভাগ সময় বাবা তো তোমার কাছেই থাকে—

লোপা জানে গোপালকাকা ওকে খুব ভালবাসে। তার থেকেও বেশি ভালবাসে রাধা কাকিমা। এলে মুড়ির মোয়া চিঁড়ের মোয়া বা নারকেলের নাড়ু, কিছু না কিছু খেতে দেবেই। ওই লোভেই আগে প্রায়ই আসত। এক-একদিন কাকিমা আবার বাবার জন্যে

ওইসব আঁচলে বেঁধে দিত। কিন্তু এই মাস দুই আড়াই হল অর্থাৎ ওর হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পর থেকে খাওয়ার লোভটা একেবারে যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। অবশ্য শুধু সেইজন্যেই যে গোপালকাকার বাড়ি আসা কমিয়েছে তা নয়। আসা কমিয়েছে ওই হতভাগা বিলেটার জন্য।

গোপালকাকার মেজ ছেলের নাম বিলাসচন্দ্র গণাই। সকলে বিলে বিলে ডাকে। বয়সে লোপার থেকে জোর দুই-এক বছরের বড়। কিন্তু এরই মধ্যে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়ে লায়েক হয়ে উঠেছে। রাস্তায় ঘাটে লোপা অনেকদিন ওকে বিড়ি খেতে দেখেছে। এ ছাড়াও আজকাল আরো গুণ বেড়েছে গুণধরের। ওকে দেখলে আর একলা পেলে চোখ-মুখ তেরছা করে হাসে, দুই একটা গা-জ্বালানো রসিকতা করতে চেষ্টা করে। লোপার বিচ্ছিরি লাগে, রাগও হয়। এক-একদিন ভাবে গোপালকাকাকে বলে দেবে। কিন্তু বললে ঠেঙিয়ে আধ-মরা করে ছাড়বে গোপালকাকা। সেই ভয়ে বলে না। অগত্যা নিজেই আসা কমিয়েছে।

বাবাকে তাতিয়ে তুলে লোকের মজা দেখা প্রসঙ্গে উল্টে গোপালকাকার ওপরেই দোষারোপ করে বসতে ভদ্রলোক বেজার মুখ করে বসে ছিল খানিক। লোপা তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে লোককে ধমক-ধামক করতে গেলে দোকানেরও ক্ষতি বলেই বাধা দিয়ে উঠতে পারে না। নইলে বাবা তার সব থেকে প্রিয়জন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খানিক চুপ করে থেকে গোপালকাকা বলেছিল তোর বাবা কি কারো কথা শোনার মানুষ।...তোর পিসীকে বল ব্রাহ্মী শাক শুষনি শাক এনে খাওয়াতে, আর একটু করে মকরধ্বজ, ওতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

শুনে লোপার হাসিই পেয়ে গেছল। ওই এক পিসীর সামনে বাবা ঠাণ্ডা সুবোধ ছেলেটি একেবারে। সাত ঝামটায় মুখে রা নেই। তাই শাক আর মকরধ্বজ খাইয়ে বাবার মাথা ঠাণ্ডা করবার কথা বললে পিসী কানও দেবে না।

আর বাবার অসীম ধৈর্য ছিল ওর বেলায়। তার ওপর লোপা যা জোর খাটাতো তেমন আর কারো ওপর না। এখনো খাটায়। কিন্তু বাবার সেই খুশিমাখা ধৈর্য যেন কমে আসছে। ওকে বাড়ি থেকে কোথাও বেরুতে দেখলে বাবারও এখন দুই ভুরুর মাঝে ভাজ পড়ে। কখনো চুপ করে চেয়ে থাকে, কখনো জিজ্ঞেস করে, কোথায় চললি?

কিন্তু তা বলে লোপাও আজকাল আর আগের মতো হুটহুট করে বেরোয় না। নিজের শরীরটার মধ্যেই একটা অদ্ভুত রকমের ভাঙা-গড়া চলেছে টের পায়। বাড়িতে তো বেশির ভাগ সময় ছেঁড়া পুরনো শাড়ি পরে কাটাতে হয়। বাইরে বেরুনোর শাড়ি কটারও অবস্থা খুব ভালো নয়। জামার দশাও সেই রকম। ওই দশ-হাত শাড়ি আর আগের ওই আঁট জামায় শরীরের সবটা যেন এখন আর ঠিকমতো ধরে না। ও-ভাবে বেরুতে নিজেরই অস্বস্তি কেমন। আর বেরুলে ছেলেগুলোও যেন হাড়গিলের মতো চেয়ে থাকে আজকাল, ফাঁক পেলে টীকা-টিপ্পনী কাটে। হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পর এই দু-আড়াই মাস লোপা এক রকম ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল। কিন্তু এমনি হাঁপ ধরে গেছে যে আর যেন পারে না। ক্লান্তি ক্লান্তি রাজ্যের ক্লান্তি। এই ক্লান্তির বোঝা ঠেলে আগের মতো আবার সহজ আলো-বাতাসের মধ্যে মন ছোটে। কিন্তু ওর যেন ছোটার উপায় নেই। তার মধ্যে বাবার মাথাটা গোলমেলে রাস্তায় চলেছে কিনা সেই সংশয়ও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বাইরে একটা সাইকেল রিকশ থামার বেল বেজে উঠতে লোপা দাওয়া থেকে উঁকি দিল। পরের মুহূর্তে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দু'চোখ। অপ্রত্যাশিত একজন।

—ও মা!

আধ-ছেঁড়া শাড়ির আঁচলটা টেনে জড়াতে জড়াতে এক লাফে দাওয়ায় নেমে দরজার দিকে ছুট। বাঁশের গেটটা শশব্যস্তে সে-ই টেনে খুলল। গেটের ওধারে মিস সি বি রে, অর্থাৎ চারুবালা রায় দাঁড়িয়ে। মুখ টিপে হাসছে।

—চারুমাসি আপনি!

না, ভুল করেও মিস সি বি রেকে লোপা আর ছিবড়ে বলে না। সামনা-সামনি অন্য মেয়েদের মতো চারুদি বলাও ছাড়তে হয়েছে। নিজের ঘরে বসেই একদিন চোখ রাঙিয়েছিল ওকে, দিদি কি রে! খবরদার, তুই মাসি ডাকবি আমাকে। সেদিন সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে লজ্জায় লোপার মুখ লাল হয়ে ওঠে এখনো। তারপর থেকে সামনা-সামনি মাসি বা দিদি কিছুই বলত না। বিস্ময়ের ঠেলায় এই প্রথম মুখ দিয়ে মাসি বেরিয়ে গেল।

হাসিমুখে উঠোনে পা দিয়ে মহিলা বলল, তোর তো আর দেখা নেই, তাই নিজেই চলে এলাম—

তাকে নিয়ে কি করবে কোথায় বসাবে ঠিক পেয়ে উঠল না। ঘরের আগোছালো বিছানাটা তাড়াতাড়ি টান-টোন করে দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল। চারুবালা রায় সকৌতুকে তার ব্যস্ততা দেখছে।

—বসুন।

—এত আদর করে আমাকে বসালে কি হবে, আমি তোকে আচ্ছা করে বকব বলে এসেছি।

ঈষৎ শঙ্কাভরে তার দিকে চেয়ে লোপা এই সদিচ্ছার কারণ বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওই মুখে কোপের চিহ্নমাত্র নেই। উল্টে খুশির ছটা দেখছে।

দরজার দিকে চোখ পড়তে চারুবালা রে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। লোপার সরি পিসী এসে দাঁড়িয়েছে।

—আসুন। ভালো খবর আছে, সন্দেশের লোভে বাড়ি বয়ে জানাতে এলাম। মেয়ে পাস করেছে, তবে মাত্র সাতটা নম্বরের জন্য সেকেণ্ড ডিভিশন হয়ে গেল।

লোপার ধুকপুকুনি কাটল বটে, কিন্তু ভয়-ভয় চোখে তাকালো শিক্ষয়িত্রীর দিকে। বকুনিই প্রাপ্য তার। ওদিকে সু-সংবাদ শুনে সরি পিসী কতটা প্রীত বোঝা গেল না। চাক্ষুষ আলাপ না থাকলেও ওই মেয়ের জন্যে তাকে ভালো করেই জানে এখন। স্কুলের ওই একজনের সম্পর্কে ও পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। কিন্তু মহিলা ওই ঘোষাল গিন্নির দূর সম্পর্কের বোন, এটুকুই যেন দুরপনেয় অপ্রীতিকর ব্যাপার।

—বসুন। আসছি...

চারুবালা তাড়াতাড়ি বলল, তা বলে এখনি আপনি সন্দেশ আনতে যাবেন না যেন, আর একদিন হবে। আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই। তোর বাবা কোথায়?

—বাড়ি নেই। সঙ্কোচ কাটিয়ে লোপা পিসীকে তাড়া দিল, ঘরে যা আছে তুমি এনে দাও পিসীমা।

সরি পিসী চলে গেল। হাসি-হাসি মুখখানায় ছদ্ম কোপের প্রলেপ বুলিয়ে চারুবালা তার দিকে ঘুরে বসল।—তুই খাওয়ালেই আমি রাগ ভুলে যাব, কেমন? তোর মাথায় কি আছে শুনি—কম্পালসারি অঙ্কে বিয়াল্লিশ আর অপশনালে আটতিরিশ! দু'মাস ধরে খেটে এই?

লোপার মুখ তুলে তাকানো দায়। এমন অনুযোগ দুনিয়ায় এই একজনই করতে পারে। এই একজনের তুষ্টি আর মুখ-রক্ষা করার তাগিদে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করার সাধ ছিল তার। কি এক অলক্ষ্য ব্যাপারে ছাত্রী-শিক্ষিকা দু'জনারই যেন প্রথম দফা হার হয়ে গেল।

তির্যক চোখে চারুবালা ওকে নিরীক্ষণ করল একটু।...এদিকে আয়।

পায়ে পায়ে লোপা সামনে আসতে হাত বাড়িয়ে একেবারে কাছে টেনে এনে পাশে বসালো তাকে। তারপর এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেই ছদ্ম-ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল খানিক। পরনের আধ-ময়লা শাড়িটায় দুটো তালি-চোখে পড়ল, গায়ের ব্লাউজটারও কাঁধের কাছে ছেঁড়া। কিন্তু এই দেখেও দু'চোখ একটু পীড়িত হল না মহিলার। তরতাজা মেয়েটার এই বেশ-বাস ছদ্মবেশ যেন।

হঠাৎ একটা কাণ্ডই করে বসল চারুবালা। ঝুঁকে ওর এক-গালে টুক করে একটা চুমু খেয়ে বসল।

লোপা সচকিত। দু'গালে লালের ছোপ।

মহিলা জোরেই হেসে উঠল। মুখখানা ওইরকম করে ছিলি কেন? সেকেণ্ড ডিভিশনে পাস করেছিস, বেশ করেছিস—

লোপা হাসতে চেষ্টা করল একটু কিন্তু আনন্দের থেকেও বিস্ময় চর্তুগুণ। দিনকে দিন অদ্ভুতই লাগছে চারুমাসিকে।

এক হাতে খাবারের রেকাবি অন্য হাতে জলের গেলাস নিয়ে সরি পিসী ঘরে ঢুকল। কাছে আসতে চারুবালা দেখে নিল কি আনা হয়েছে। ঘরের তৈরি নাড়ু আর নারকেলের তক্তি দু'খানা। হাত বাড়িয়ে খুশিমুখে রেকাবিটা নিয়ে বলল, ওর কোনো দোষ নেই, আমার জন্যেই সেকেণ্ড ডিভিশন হয়ে গেল, জোর করে অঙ্কটা না নেওয়ালেই হত...আর্টস সাবজেক্টগুলোতে বেশ ভালো নম্বর পেয়েছে। লোপাব দিকে ফিরল, যাক আর তো অঙ্কের বালাই নেই, বি-এতে ভালো রেজাল্ট করা চাই মনে থাকে যেন।

লোপা মাথা নেড়ে সায় দিতে যাচ্ছিল তার আগেই বাধা পড়ল। সরি পিসী ফস করে বলে বসল, যা হয়েছে খুব হয়েছে, পড়া-টড়া এখানেই শেষ।

ঘরের খুশির বাতাসের হঠাৎ যেন বিপরীত টান ধরল একটা। স্কুলের সেই রুক্ষ-কঠিন শিক্ষিকার মুখ চারুবালার।—এইটুকু মেয়ে পড়া এখানেই শেষ মানে?

এ পর্যন্ত টানতেই ওর বাপেব প্রাণান্ত অবস্থা, আর হবে কি করে।...তাছাড়া সতের পেরুতে চলল, এইটুকু মেয়ে ভেবে গরীব মানুষের চোখ বুঝে বসে থাকা চলে না।

সরি পিসী অনেয্য কিছু বলে নি। সংসারের অবস্থা লোপাও জানে। পড়াশুনা আর হবে কি হবে না এ সংশয় তারও আছে। তবু পিসীর ওপর ভয়ানক রাগ হতে লাগল তার। কথাগুলো যেন গায়ে পড়ে শোনাবার মতো করে বলল।

পিসীর দিকেই চেয়ে আছে চারুবালা রে। লোপার মনে হল চাউনিটা সদয় নয় একটুও। ক্লাসের কোনো অবাধ্য মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার মতো। জলের গেলাস লোপার হাতে দিয়ে সরি পিসী ঘর ছেড়ে চলে গেল। চারুবালার দু'চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল, তারপর ঘরের চারদিকে ঘুরল একপ্রস্থ। তারপর লোপার মুখের ওপর এসে স্থির হল। আবারও মনে হল এই দৈন্যদশার মধ্যে এই তরতাজা মেয়েটা যেন বে-মানান।

রেকাবি থেকে একটা নারকোলের তক্তি ওর মুখে গুঁজে দিয়ে বলল খা। চুপচাপ নিজেও খেল একটু আর বেশির ভাগ ওকেই খাওয়াতে লাগল। ইচ্ছে থাকলেও লোপা মুখ ফুটে বাধা দিতে পারল না। এই গাম্ভীর্যকে ওরা বরাবরই সমীহ করে এসেছে।

জলের গেলাস আর রেকাবি মাটিতে নামিয়ে রেখে চারুবালা হঠাৎ চাপা ঝাঁঝে বলে উঠল, পড়াশুনা এইখানে শেষ হলে আর আমি তোর মুখ দেখব না মনে থাকে যেন। যে করে হোক কলেজে ভর্তি হওয়া চাই—বুঝলি?

লোপা ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। চারুমাসি অন্যমনস্কের মতো কি একটু ভেবে নিল। তারপর আবার একপ্রস্থ ভালো করে দেখে নিল ওকে।—আমিও ভেবে দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়।...এক কাজ করিস তো, দিন তিন-চার বাদে তোর বাবাকে একবাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস তো। আর...তুইই বা আসিস না কেন, ঘরে বসে খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটানো হচ্ছে।

শেষের দিকে গলার স্বর আবার হালকার দিক ঘেঁষছে। লোপা লজ্জা পেল। স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাবার পর থেকে ফাইন্যাল পরীক্ষাব দু'মাস আড়াই মাস পর্যন্ত বিকেলে তার ঘরে অঙ্ক করতে গিয়ে লোপা এক-একদিন যে মূর্তি আর যে কাণ্ড দেখেছে মাসির ক্লাসের কোনো মেয়ে তা কল্পনাও করতে পারবে না। কথায় কথায় ধমক-ধামক আবার কথায় কথায় হাসির ছোঁয়া-লাগা টীকা-টিপ্পনী। নিজের ঘরে সি বি রে'র যেন দশটি বছর বয়েস কম।

শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে লোপা সানুনয়ে বাধা দিল, এখনই উঠলেন কেন, আর একটু বসুন না—

—আজ্ঞে না। বিকেলে ওই ছোঁড়ার আসার কথা আছে, এতক্ষণে বোধহয় এসে বসে আছে।

আবার এক ঝলক রক্ত মুখের দিকে উঠে আসার বিড়ম্বনা। কার আসার কথা বা কে বসে থাকতে পারে নাম না করলেও লোপার বুঝে নিতে এক মুহূর্তও লাগে নি।

এই বিড়ম্বনাটুকুই দেখার লোভ ছিল চারুবালার, তাই দৃষ্টি এড়ালো না। বলল, চলি। যে করে হোক কলেজে পড়তে হবে মনে থাকে যেন।

আর পিসীকে বলিস, তোর জন্য ভেবে অত মাথা গরম করতে হবে না, তোর ভালো ছাড়া খারাপ হবে না।

এবারেও বাকস্ফুরণ হল না লোপার। আর কিছু ভেবে না পেয়ে তাড়াতাড়ি তার পায়ে টিপ করে প্রণাম করে উঠল একটা। তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসিমুখে প্রস্থান করল মহিলা।

ফেরার রাস্তা ধরে কয়েক পা এগোতে সাইকেল রিকশ মিলল। সেটা থামিয়ে উঠে বসল চারুবালা রায়। মুখে হাসি-খুশির চিহ্নমাত্র নেই আর। উল্টে কি এক চাপা আক্রোশে দু'চোখ সামনের দিকে স্থির।

...না, বিকেলে ওই ছোঁড়ার অর্থাৎ রাজার তার ওখানে আসার কথা নেই। আজই সকালে হঠাৎ রাস্তায় দেখা ওর সঙ্গে। ক'দিনের ছুটিতে এসেছে। মা বাড়িতে একা থাকে বলে ফাঁক পেলেই এসে মা-কে দেখে যায়। মায়ের বাধ্য ছেলে। বাধ্য না ছাই, আসলে মা-কে ডরায়। সকালে দেখা হতে সামান্য দু-চারটে কথা হয়েছে। বিকেলে আসবে বলে নি, সে-ও বলে নি তাকে আসতে। কিন্তু চারুবালা জানে বিকেলে ও-ছেলে তার ওখানে আসবেই।

...ওর মা-কে না জানিয়ে লুকিয়ে আসবে।

চকচকে দু'চোখে একটা ক্রূর অভিলাষ চিকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। একটা মৃত্যুর দাগ চারুবালা রায় এত সহজে ভুলবে না। এত সহজে ভুলতে চায় না।

চারুমাসির মতো এমন মানুষ আর দুনিয়ায় আছে কোথাও? লোপা জানে না। তার কল্পনার জগতে অন্তত নেই আর। যত দেখছে তাকে ততো অবাক লাগছে আর ততো ভালো লাগছে। মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য এসে ওর একঘেয়ে ক্লান্তি মুছে ফেলে যেন বেশ বড়-সড় একখানা খুশির ঝাঁকানি দিয়ে গেল। সেই খুশি এখনো উপচে উঠছে।

চারুমাসি চলে যেতে লোপার প্রথমেই পিসীকে এক-হাত নেবার বাসনা। সবেতে তার অমন ফড়ফড়িয়ে কথা বলা কেন? কিন্তু দাওয়ার দিকে দু-পা এগিয়েও ঘরে ফিরে এলো আবার। কিছু বলতে গেলে পিসীও ছেড়ে কথা কইবে না। আর সে সব কথা শুনলে লোপার উল্টে আরো বেশি রাগ হয়ে যাবে। মাঝখান থেকে এই খুশির আমেজটুকুই মাটি।

দেয়ালে টাঙানো পুরনো ঘষা আয়নাটায় চোখ যেতে থমকে দাঁড়াল। নিজের এই মূর্তির ওপরেই হঠাৎ বেজায় রাগ হয়ে গেল তার। চোখ-মুখ কুঁচকে নিজেকেই আচ্ছা করে জিভ ভেংচে দিল সে। তাতেও রাগ গেল না। আয়নায় চোখ রেখে বেশ জোরেই কান দুটো মুলে দিল। কেন, আর সাতটা নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাসটা করতে কি হয়েছিল? পরীক্ষা দিতে বসে তো কত কি জানা জিনিস ঘুলিয়ে গেল। চারুমাসির এত পরিশ্রম সব পণ্ডশ্রম।

সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে পড়তে দ্বিগুণ অসহিষ্ণু।...আর এক ছেলে ফার্স্ট ডিভিশন ছেড়ে একবারে জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে গেছে। দু' বছর আগে বি-এ পরীক্ষার রেজাল্টও সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সিকেয় ঝোলানো হয়ে গেছে। আর ও কিনা ফার্স্ট ডিভিশনেও পাসটা করে উঠতে পারল না।?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় দফা ভেংচি কাটল লোপা। এটা ওই অহঙ্কারে ডগমগ কৃতী ছেলের উদ্দেশে।...বাবু তারপর বাইরের কলেজে বন-জঙ্গলের বিষয়ে পড়াশুনা করে দিগগজ হতে গেছেন। অত বিদ্যে নিয়ে আর লোকালয়ে আসার দরকার কি, বনে-জঙ্গলে থেকে গেলেই হয়। আজ মাসির সঙ্গে দেখা হলে মাসি কি আর সেকেণ্ড ডিভিশনের খবরটা তাকে না শুনিয়ে ছাড়বে।

রাগের মুখেই ঠোঁটের ডগায় হাসি ভাঙল আবার। হাসতে হাসতে খাটে এসে শুয়ে পড়ল। শোনাকগে, বয়ে গেল। আর কেউ রেজাল্ট নিয়ে কিছু বলতে এলে সে-ও ছেড়ে কথা কইবে না, যা মুখে আসে তাই বলে দেবে। সেই আর কেউ এর উদ্দেশে চোখ পাকালো লোপা।...বলবে, অত ভালো রেজাল্ট করলে দেমাকে রামগরুড়ের ছানার মতো

গোমড়া মুখ হয়ে যায়, মেয়েদের তাই অত ভালো রেজাল্ট করা ভালো না।

এবারে দ্বিগুণ হাসি।

...হ্যাঁ, গাল-মন্দ এক ওই চারুমাসিই করতে পারে বটে। কম করা করেছে ওর জন্যে! টেস্টে তো অঙ্কের দু' পেপারেই ফেল মেরে বসেছিল। ফাইন্যালে চারুমাসি অঙ্কের ভার নিতে তবে হেডমিসট্রেস এলাউ করল। নইলে তো হয়েছিল চিত্তির! সপ্তাহে তিন দিন বিকেলে তার ওখানে গিয়ে অঙ্কে হাত পাকানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। চারুমাসি খুব যত্ন করে শেখাতো, তারই যেন দায় কিছু। আর রোজই শাসাতো ফার্স্ট ডিভিশনে পাস না করলে তোর আমি মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব।

লোপার প্রায়ই মনে হত এ তাগিদটা যেন ঠিক ওর পরীক্ষার সুফলের জন্যেই নয়। একদিনের কথা লোপা ভুলবে না। অ্যালজাবরার একটা অঙ্ক তিন বার করে বুঝিয়ে ওকে কষতে দিয়েছে। তিনবারই ভুল। রাগের চোটে চারুমাসি ওর মাথাটা ধরে বার-কয়েক বেশ জোরেই ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, এই মাথাটায় আছে কি? তোর জন্যে আমি এত খেটে মরছি কেন?

ঠিক সেই সময় ঘরে যে ঢুকল, সম্ভব হলে লোপা তাকে ঘর থেকে বার করে দিত। ওই রাজা-বাবু। মাসি তখন তাকে চতুর্থ দফা বোঝানো শুরু করেছে। চুপচাপ পিছনে দাঁড়িয়ে ওই ছেলে দেখতে লাগল আর শুনতে লাগল। শেষ হতে বলল, তুমি একটু শক্ত রাস্তায় শেখাচ্ছ মাসি, এই গোছের অঙ্ক আরো সোজাভাবে করা যেতে পারে।

শোনা-মাত্র চারুমাসির মুখে প্রথম বিরক্তির ছায়া, তারপর কৌতুকের। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তুই শেখা দেখি সহজ করে, বোস—

নির্লজ্জের মতো পাশের গা ঘেঁষা চেয়ারে বসে পড়ে খাতা টেনে নিল। তারপর দু-মিনিটের মধ্যে আর এক রকম করে অঙ্কটা বুঝিয়ে কষে দিল।—হয়েছে?

বিকেলের দিকে লোপা খুব সাধারণ একটু সাজ-গোজ করল। ফর্সা একটা শাড়ি পরল আর পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে চকচকে একটা জামা। জামাটা মাস ছয়েক আগে রাধা কাকীমা দিয়েছিল ওকে। প্রায় নতুনই আছে, কদিন আর পরেছে। ওটা পরতে গিয়ে প্রথমে অপ্রস্তুত. পরে বিরক্ত। কিন্তু এই বিরক্তিও খাঁটি নয় খুব, কারণ আয়নার দিকে চোখ পড়তে পরক্ষণে আবার হেসেই উঠল। কি আশ্চর্য. ভালো জামাটা এরই মধ্যে এত ছোট হয়ে গেল! কোনরকমে পরা গেছে, হাতটা তো বেশী নাড়লে ছিঁড়েই যাবে বোধহয়।

জামাটা বেশি টাইট হয়ে গেছে বলে শাড়ির আঁচল আর একটু ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে হল। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে নিল, মুখে সামান্য পাউডারও।

কোথায় যাবে জানে না। বেরুবে একটু এই পর্যন্ত। ঘরে বসে থাকতে আজ অন্তত একটুও ভালো লাগছে না। বেশ-বদল বা সামান্য প্রসাধন সে-জন্যে নয়, এটুকু ভিতরের খুশির কারণে।

দাওয়ায় নামতেই সরি পিসী চড়াও হল তার ওপর। আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, চললি কোথায়?

তখন থেকে লোপার ভিতরে ভিতরে রাগ একটু ছিলই পিসীর ওপর। জবাব দিয়ে বসল, শ্বশুরবাড়ি, কেন?

বলে ফেলে লোপা নিজেই অপ্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল আর কিছু না বলে

বেরিয়ে গেলে এই উক্তির ফল ভোগ করতে হবে বাবাকে। রাগ যারই ওপর হোক পিসী তার ঝাল ঝাড়বে বাবার ওপর।

অতএব পিসীর বড় বড় দুটো গোল চোখে চোখ মিলিয়ে লোপা জোরেই হেসে উঠল একপ্রস্থ। তারপর কৃত্রিম ঝাঁঝে ফিরে প্রশ্ন করল, তোমাদের কি ইচ্ছে দিনরাত ঘরে বসে থাকব?

—সে কথা তোকে বলা হয় নি, কোথায় যাচ্ছিস জিজ্ঞেস করতেও দোষ!

—যাচ্ছি একটু হাওয়া খেতে, চারুমাসি বলে গেল, দিনরাত ঘরে বসে পিসীর আদর খেয়ে খেয়ে আমি মুটিয়ে যাচ্ছি। ঠিকই বলেছে, নতুন ভালো জামাটার কি অবস্থা হয়েছে দেখবে? এই দেখো।—

একটানে শাড়ির জড়ানো আঁচলটা খুলে ফেলল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে পিসীর দুই চোখে হুল বিঁধল যেন।—ছি ছি। বলি লাজ-লজ্জার মাথা কি একেবারে খেয়ে বসেছিস? দিনে দুপুরে উঠোনে দাড়িয়ে—

বাকিটুকু আর শেষ করে উঠতে পারল না। লোপা হাসছে।—বা রে। তোমার কাছে আবার লজ্জা কি! তাছাড়া আমার তবু গায়ে একটা জামা আছে, তোমার তো তাও নেই।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে সবি পিসী থতমত খেল একপ্রস্থ। নিজের অগোচরে আদুড় গায়ের ওপর কালো পেড়ে শাড়ির আঁচল টেনেটুনে দিতে দিতে বলে উঠল, আমি বুড়ি মাগী, আমার আর তোর এক হল!

লোপার মাথায় দুষ্টু সরস্বতী চাপল যেন হঠাৎ।—আ-হা কি সুন্দর ভাষা, কান জুড়িয়ে যায়! তার পরেই ঘটা করে চোখ পাকিয়ে তাকালো তার দিকে।—তুমি কক্ষনো বুড়ী নও, আমি নিজের চোখে দেখেছি আধ-বুড়ো লোকগুলো ফাক পেলে হাঁ করে দেখে তোমাকে।

—মরণ মরণ। তোর জিভ আমি কোন দিন টেনে ছিঁড়ব—

বলতে বলতে দ্রুত রান্না ঘরে ঢুকে গেল। পালিয়েই গেল যেন।

হাসির দমকে লোপার সেখানেই বসে পড়ার দাখিল। আচ্ছা জব্দ করা গেছে আজ। তবে একটা কথা ও মিথ্যে বলে নি। সর্বদা পিসী নিজেকে যত বুড়ী-বুড়ী করে ততোটা মোটেই নয়। শরীরের দিব্বি আঁট বাঁধুনি এখনো। তাছাড়া বয়সেও তো বাবার থেকে ঢের ছোট।

হাসি সামলে বেরিয়ে এলো। সমস্ত মুখে খুশির দাগ একটু লেগেই থাকল।

রাস্তাটা বেশ খানিকটা সোজা গিয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা নদীর দিকে, একটা শহরের দিকে। লোপা সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। যাবে কোন দিকে?

চারুমাসির কাছ থেকে একজনের এতক্ষণে বোধহয় ওর পরীক্ষার খবর শোনা হয়ে গেছে। ও যেন দেখতে পাচ্ছে সেকেণ্ড ডিভিশনে পাসের সব দোষ চারুমাসি নিজের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছে। বলছে, তার দোষেই মেয়েটার রেজাল্ট অত খারাপ হয়ে গেল, সে জোর করে অঙ্ক নেওয়ালে বলে। অন্য বিষয় নিয়ে ওই খাটুনি খাটলে দস্তুরমতো ভালো রেজাল্ট হত।

ওর জন্য চারুমাসির কেন এত দরদ লোপার বুঝতে আর একটুও বাকি নেই। তার মতলব লোপা খুব ভালোই জানে। স্বর্গত মাস্টারমশাই তার ইচ্ছেটা বাবা বাদে এই

একজনের কাছেও যে ফাঁস করে গেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লোপা সেজন্য অখুশি নয় একটুও। কিন্তু এই কাল্পনিক দৃশ্যটা দেখা মাত্র রাগ হয়ে গেল তার। যেন সত্যিই এই ঘটেছে। শহরের দিকেই এগোতে ইচ্ছে করছে তার। অনেকটা দূর গিয়ে শেষে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে সেই উঁচু টিবি, অর্থাৎ চাঁদমারির দিকে। মাসির কাছ থেকে রেজাল্ট শুনে নিয়ে বাবু এতক্ষণে ওটার ওপর গিয়ে উঠেছে নিশ্চয়। উঁচু-মাথা, সেই দেমাকে উঁচুতে উঠে দাঁড়াতেই ভালো লাগে। জঙ্গল দিগ্‌গজ হয়ে ওঠার পর থেকে ওই উঁচু-মাথা যেন আরো বেশি উঁচিয়ে উঠছে।

কল্পনায় এবং ভ্রূকুটি সহযোগে টিলার ওপর দাঁড়ানো ওই উঁচু মাথাটাও যেন দেখে নিচ্ছে ও। সেদিকে যেতে ইচ্ছে করছে। গেলে ঠাস-ঠোস কিছু কথা শোনানোর সুযোগ লোপা নিজেই করে নিতে পারবে। এই মুহূর্তে শুধু এটুকুই যেন কাম্য।

নিজের অজ্ঞাতে শহরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। বিষম চমকে উঠল হঠাৎ। একেবারে গা ঘেঁষে খ্যাঁচ করে গাড়ি দাঁড়াল একটা। মোটর।

—কি গো মা, যাবে নাকি এদিকে?

ভুবন হালদার। ভুবনকাকা। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। আত্মস্থ হয়ে লোপা তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, যাবে না।

খুশি মুখে ভুবন হালদার বলল, বেশ ভালো পাস করেছ শুনলাম? বেশ বেশ —বাবা কোথায় বাড়িতে?

লোপা আবারও মাথা নাড়তে ভুবন হালদার বলল, তাকে ধরতে হবে, খাওয়া ফাঁকি দিলে চলবে না।

হাসি মুখ করে লোপা বলল, আপনি তো আজকাল আর আমাদের বাড়ি আসেনই না।

—আসব কি! ভুবনকাকার গলা দিয়ে আলগা ভয় ঝরল যেন তক্ষুনি, একটা বে-ফাঁস কথা বললেই যে তোমার বাবা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে আজকাল! তারপর হেসেই বলল, আচ্ছা আসব'খন একদিন, মা ভালো পাস করেছে যখন একটা প্রাইজ নিয়েই আসব—কি চাই তোমার বলো।

বিড়ম্বিত মুখে লোপা মাথা নেড়েই বাধা দিতে চেষ্টা করল যেন। কিছুই চায় না।

—কেন? সে কি হয়, কাকার কাছে আবার লজ্জা কি! আচ্ছা দেখা যাক—

এক পশলা ধোঁয়া ছড়িয়ে গাড়িটা চলে গেল। লোপা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তার পাসের খবরটা এরই মধ্যে ভুবনকাকার কানে গেল কি করে ভেবে পেল না। আগে ওরও বেশ ভালো লাগত ভুবনকাকাকে। হাসিখুশি মানুষ। স্কুলের মেয়েদের এখনো ভালো লাগে ভদ্রলোকের। কোনো উপলক্ষে দল বেঁধে তার কাছে চাঁদা চাইতে গেলে প্রথমে আঁতকে ওঠে, তারপর শুকনো মুখ করে চার আনা আট আনা বার করে কিন্তু দেবে শেষ পর্যন্ত সক্কলের থেকে বেশি।

কিন্তু ইদানীং লোপার আর অত ভালো লাগে না লোকটাকে। তার কারণ, বাইরের লোক সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ অনেকটা সে বাবার চোখ দিয়ে করে থাকে। বাড়িতে কেউ এলে আর ভুবনকাকার সম্পর্কে কথা উঠলে বাবা একেবারে যাচ্ছেতাই করে

গালাগালি দেয়। তাছাড়া আরো যে দু-চার কথা কানে আসে তার অর্থ না বোঝার ভান করলেও লোপা আজকাল আর না বোঝে কি?

পায়ে পায়ে উল্টো রাস্তা ধরে অর্থাৎ নদীর বাঁক-ঘেরা চাঁদোয়া দেয়ালের দিকে চলল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটা উসখুস করে উঠল কেমন। বটুকদার সঙ্গে কতদিন যে দেখা হয় নি ঠিক নেই। পরীক্ষার আগে দুমাস আর তারপরে এই আড়াই মাস কম করে সাড়ে চার মাস হবে। সেকেণ্ড ডিভিশন পাস জেনেও ভুবনকাকা তো প্রাইজ দিতে চাইলে, বটুকদা কি বলবে?

খারাপ বলবে না নিশ্চয়। খারাপ ওই এক গোমড়া-মুখো রাজাবাবু ছাড়া আর কেউই বলবে না। যাই হোক বটুকদাকে খবরটা জানানোর লোভ ঠেকানো গেল না।

গুমটিঘরের কাছাকাছি এসেও বাইরে দেখা গেল না তাকে। ঘরের দরজা খোলা, ঘরেই আছে বোধহয়। কিন্তু আগের মতো লোপা আর হুট করে ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে না। তবু কি এক অজ্ঞাত সঙ্কোচ ঠেলেই এগোতে লাগল।...ভিতরে ঢুকতে হবে না, বাইরে থেকে ওর গলার আওয়াজ পেলেই বটুকদা বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু বাইরে থেকে উঁকি দিয়েই অপ্রস্তুত একটু। শয্যায় চাদরে ঢাকা দুটো পা দেখা যাচ্ছে। শরীরও চাদরে ঢাকা মনে হয়। দরজার সামনে এসে দাঁড়ানো দু'চোখে যেন ধাক্কাই খেল একপ্রস্ত। বুক পর্যন্ত চাদরে ঢেকে বটুকদা শুয়ে আছে। দু'গাল বোঝাই খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, জটপাকানো একমাথা চুল, দুচোখ গর্তের মধ্যে, রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ। দেখলেই বোঝা যায় ভালোমতো অসুখে পড়েছে।

লোপা তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে দাঁড়াল। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এলো।—এ কি! কবে অসুখ করল? কি অসুখ?

বটুক তালুকদারের ঘোলাটে দু'চোখ ওর মুখের ওপর আটকে রইল খানিক।—হঠাৎ কি মনে করে...পরীক্ষা পাসের সুখবর জানাতে?

লোপা অবাক। তার পাসের খবরটা এরই মধ্যে শহরময় রটে গেল নাকি! এখন পর্যন্ত তো পাকা রেজাল্ট বেরোয় নি। তাছাড়া বিছানায় শুয়ে বটুকদা এ-খবর জানল কি করে। কিন্তু বটুকদার গলার স্বরে যেমন ঝাঁঝ, চাউনিতেও।

—এ কি বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে। কি হয়েছে বলো না?

সরোষে চাদরটা ঠেলে সরিয়ে এক ঝটকায় উঠে বসল।—আমার যা খুশি হোক, তোর তাতে কি? তোকে কে আসতে বলেছে—কে দরদ দেখাতে বলেছে?

একটু চেঁচিয়ে ওঠার ফলেই বেজায় হাঁপাতে লাগল। ঘাবড়ে গিয়ে লোপা আরো দুই-এক পা এগিয়ে এলো। কি বলবে বা কি করবে ঠাওর করে উঠতে পারল না। উঠে বসার পর আরো মনে হল অতবড় শরীরটা যেন দুমড়ে গেছে।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল আবার। নিস্তেজ খানিকক্ষণ।—বোস।

লোপা তক্ষুনি কাঠের চেয়ারটা একটু কাছে টেনে এনে বসল। টেবিলে আধ-খাওয়া ওষুধের শিশি চোখে পড়ল একটা, আর পুরিয়ার বাক্স একটা। মানুষটার দিকে চোখ ফেরাতেই বুকের ভিতরে যেন মোচড় পড়ল। ওষুধপত্র পথ্য ছেড়ে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবারও কেউ নেই। অথচ একবার ওর বড় অসুখের সময় এই বটুকদা নিজে ডাক্তার নিয়ে এসেছিল, নিজে ছোটাছুটি করে ওষুধ আর ফলটল এনে দিয়েছিল।...রাগ

তো হতেই পারে। এই অবস্থা দেখে আজ আবার হঠাৎ সেই ভুলে-যাওয়া দিদির কথা মনে আসছে কেন কে জানে।

নরম গলায় বলল, তোমার এত অসুখ কি করে জানব। কি হয়েছে?

মুখ ঈষৎ বিকৃত করে জবাব দিল, কে জানে, ওই চামার ডাক্তার আজ বলে এই কাল বলে ওই—খানিক আগে ভুবন হালদারকে বলে দিয়েছি বিশ্বেশ্বর দত্তকে যেন জিজ্ঞেস করে একসঙ্গে কত টাকা পেলে সে আর রোগ জিইয়ে না রেখে ঠিক-ঠিক ওষুধ দেবে। একমাস ধরে ঘুরে-ফিরে জ্বর লেগেই আছে—

...পরীক্ষা পাসের খবরটা তাহলে ভুবনকাকাই বলে গেছে। তবু ভিতরে ভিতরে বিস্ময় একটু। ভুবনকাকার সঙ্গে বটুকদার খাতির আছে জানত না। আর থাকলেও হঠাৎ ওর কথা উঠতে গেল কেন। জিজ্ঞেস করল, ভুবনকাকা তোমার খোঁজ-খবর নিতে আসেন বুঝি?

বটুকদার গলার স্বরে এখনো বিরক্তি।—আসে নিজের স্বার্থে, তাই দরদ দেখায়।

বটুকদার কাছে ভুবনকাকার কি স্বার্থ থাকতে পারে লোপা ভেবে পেল না। টেলিফোনের জন্য নয় নিশ্চয়, টেলিফোন ভুবনকাকারও আছে।

একটু কাত হয়ে বটুকদা এবারে সোজাসুজি তাকালো ওর দিকে। চাউনিটা এখন যেন সদয় একটু। একটু উৎসুকও।—এবারে তাহলে কলেজে ভর্তি হবি?

অসুস্থ মানুষটাকে সদালাপে তুষ্ট করার বাসনা লোপার। বলল, পড়া আর হবে কিনা কে জানে, অত খরচ টানবে কে?

শোনামাত্র বটুকের মুখখানা অন্যরকম আবার। শ্লেষের সুরে বলে উঠল, তা বললে হবে কেন, যে বিদ্বান লোকের দিকে হাত বাড়িয়ে বসে আছে সব—বিদুষী বউ ছাড়া তার চলবে? ভর্তি হয়ে পড়, ভর্তি হয়ে পড়, তোর খরচ টানার অনেক লোক আছে। হুঃ। যত সব...

লোপা হাঁ একেবারে। কথাগুলো খচখচ করে কানে বিঁধল। বটুকদার এই চাউনিও ভালো লাগছে না। বিস্ময় কাটিতে রাগে লোপার মুখ লাল হঠাৎ।—কি আবোল-তাবোল বকছ? আমি কাউকে কেয়ার করি না, কারো দয়াও চাই না।

শুনে ওই চাওনি আর দাড়ি-ভরা মুখ নরম হতে লাগল আবার। চেয়ে আছে। গলা খাটো করে বলল আস্তে আস্তে, তুই যেন তোর দিদির মতো হয়ে যাচ্ছিস...ঘরে ঢুকতে হঠাৎ চমকেই উঠেছিলাম।

লোপার অনেক দিনের একটা চাপা কৌতূহল ভিতরে দাপাদাপি করতে থাকল। না দিদির প্রসঙ্গ বটুকদা আর কখনো মুখে আনে নি। আরো কিছু শোনার আশায় লোপা উদগ্রীব। কিছু বলছে না দেখে ও-ই ইন্ধন যোগালো।...দিদি তো আমার থেকে অনেক সুন্দর ছিল শুনেছি। ঠাকুমা বলত দিদির তুলনায় আমি একটা পেত্নী।

লোপা নিজেই হেসে উঠল। কিন্তু বটুকদা হাসছে না। চেয়ে আছে। গর্তে-ঢোকা দু'চোখ ঠেলে ওপর দিকে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু দিদির কথা আর বললই না বটুকদা, এমন কি পেত্নী শুনেও আপত্তি করল না। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, তুই এতদিন আসিস নি কেন?

—পরীক্ষা-টরীক্ষা গেল তো।

—পরীক্ষা তো আড়াই মাস আগে শেষ হয়েছে, তারপর আসিস নি কেন?

লোপা আমতা-আমতা করে জবাব দিল, আগের মতো যখন-তখন বেরুই কি করে, বড় হয়ে গেছি না—

বলে বিপাকে পড়ল লোপা। কতটা বড় হয়েছে তাই যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। শুকনো ফ্যাকাশে মুখে খুশির আভাস একটু। শেষে মন্তব্য করল, এই চার মাসে অনেকটাই বড় হয়ে গেছিস দেখছি।...তা বলে এখানে আসতে কি?

হঠাৎ কেন-যেন অস্বস্তি বোধ করছে লোপা। কিন্তু বটুকদার সঙ্গে বরাবরই খোলাখুলি গল্প চলে তার। হেসেই জবাব দিল, শুধু এখানে কেন, বেরুতে দেখলেই পিসীর আপত্তি, আজকাল বাবারও। পিসীর তো কথাই নেই, ঘর থেকে বেরুলেই চোখে যেন কাঁটা বেঁধে—সর্বদা আতঙ্ক এই বুঝি কেউ কিছু রটালে—

আশ্চর্য! মুহূর্তের মধ্যে বটুকদার সমস্ত মুখ চোখ ঘোরালো-ধারালো হয়ে গেল। রাগের চোটে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলোও যেন ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে।—ও! তোর বেলায় আতঙ্ক আর নিজের বেলায়? এখানে কে কাকে ছেড়ে কথা কয়? কে কার মুখ চাপা দিতে পেরেছে? তোর বাবা আর তোর ওই পিসীকে নিয়েও কেউ বলতে ছাড়ে? লোকের কথায় তখন ফোস্কা পড়ে না কেন?

লোপা যেন মুহূর্তের মধ্যে কাঠের পুতুল হয়ে গেল একখানা। নিষ্প্রাণ, নিশ্চেতন। ঝাঁজের কথাগুলো মাথায় ঢুকতে সময় লাগল। হতভম্বের মতো চেয়ে আছে, বটুকদার দুটো চোখ যেন চামড়া ফুঁড়ে ওর মুখে বিঁধে আছে।

তারপর বিষম একটা ঝাঁকানি খেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে একটা চিৎকার শুনল, লোপা শোন, শোন বলছি, আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা!

লোপা একটিবার পিছন ফিরেও তাকালো না।

বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি—বটুকদা বিচ্ছিরি লোক। এত খারাপ লোক আর হয় না। আর কোনদিন আসবে না, আর কোনদিন বটুকদার মুখ দেখবে না। বাবাকে প্রায় দেবতা গোছের একজন ভাবে লোপা। রোজ সকালে তাঁর সূর্যস্তব শুনে ঘুম ভাঙে ওর। বাবার তখনকার সেই মুখখানা দেখার লোভে এক-একদিন বিছানার মায়া ছেড়ে উঠেই পড়ে।

অনেকটা আসার পর চলার গতি শিথিল হল। ক্লান্ত লাগছে। মাথার চিন্তাও সেই সঙ্গে অন্যদিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।...বাবা বা পিসী কাউকেই বটুকদা খারাপ বলে নি। লোকে তাদের নিয়েও কথা কইতে ছাড়ে না, এ-কথাই বলেছে।...কিন্তু লোকরাই বা এমন পাজী কেন? আর যারা বলে বটুকদা তাদের মুখ ভোঁতা করে দেয় না কেন?

চিন্তাটা এবার যেদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, লোপা চেষ্টা করেও সেটা ঠেলে সরাতে পারল না। বাবাকে ছেড়ে সরি পিসীর সম্পর্কে ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া চলেছে একটা। ...বাবাকে বাদ দিলে পিসীর থেকে আপনার লোক আর কে আছে?

তবু ভিতরে ভিতরে কি-যেন অস্বস্তি একটা। ভাবনা ছাড়তে পারছে না বলেই হয়তো।...সরি পিসীও এক অদ্ভুত মেয়েই বটে। তার নিজের আট-চালার ঘর দুটোকে লোকে নন্দ কুশারীর জ্ঞানপীঠ কেন বলে, লোপা জানে। ওকে বলেছিল গোপালকাকার

ছেলে বিলে, সে নাকি নিজের কানে মায়ের কাছে বাবাকে গল্প করতে শুনেছে। নন্দ কুশারী বয়সে সরি পিসীর বাপের থেকেও বড় ছিল। অল্পবয়সে পিসীর বাপ মরে গেছল, দুটো নিষ্কর্মা দাদা ছিল। বয়েস হতে সরি পিসী তাদের গলায় ঠেকেছিল। পাজী লোকেরা তাকে বিরক্ত করত, আর দাদারা তখন উল্টে অতবড় মেয়েকে ধরেই ঠেঙাত। এদিকে নন্দ কুশারীকে নিষ্ঠাবান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলে জানত সকলে। নিঃসন্তান, বিপত্নীক। নিজের ঘরের দাওয়ায় প্রায় রোজই কথকতা রামায়ণ-পাঠ ইত্যাদি হত। সন্ধ্যের পর লোকে ভিড় করে তাই শুনতে আসত। তার এক বিশেষ ভক্ত নিজের জন্য জোর করে নন্দ কুশারীকে মেয়ে দেখতে টেনে নিয়ে গেছল। পিসীকে দেখে দুজনেরই পছন্দ হয়েছিল। তারপর নন্দ কুশারী নিজেই দু-তিন দিন দেনা-পাওনার ফয়সালা করতে মেয়ের বাড়ি গেছল। আর তারপর সক্কলে হতভম্ব একদিন। চুপিসাড়ে বিয়ে করে নন্দ কুশারী নিজেই ওই মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছে!

বাপের থেকে বয়সে বড় বুড়োর কাণ্ড দেখে অনেকে রেগে গেছল, আর সেই ভক্তটি তো ক্ষেপেই গেছল। লোকজন আর লাঠি-সোঁটা নিয়ে কুশারীর ভিটেতে ঘুঘু চরাতে এসেছিল তারা। এসে দেখে রাম-দা হাতে ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে সরি পিসী। মাথায় আর কপালে মা-কালীর মতোই জ্বলজ্বলে সিঁদুর।...সেই থেকে সকলে কথকতা বা রামায়ণ পাঠ শুনতে আসা ছেড়েছে। আর ভক্তদের জন্য জ্ঞানের যে নজির খাড়া করেছে ভদ্রলোক, তারই ফলে ওই নাম। নন্দ কুশারীর জ্ঞানপীঠ।

বিলের মুখে ওই তাজ্জব কাণ্ড শুনে লোপা সেইদিনই ছুটে এসে পিসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল ব্যাপারটা সত্যি কি না। কিন্তু পিসী রেগে আগুন। ফের এসব কথা শুনলে আর আস্ত রাখবে না বলেছে আর ওই বাপ-ব্যাটাকে অর্থাৎ গোপালকাকা আর বিলেকেও মজা দেখিয়ে ছাড়বে বলে শাসিয়েছে।

কিন্তু লোপার মনের তলায় কেমন অস্বস্তিকর ছায়া পড়ছে একটা। না পিসী যে বাবার মতোই ভালো তাতে ওর একটুও সন্দেহ নেই। ঠাকুমা চোখ বোজার পর পিসী না থাকলে ওর আর বাবার কি-যে দুরবস্থা হত ঠিক নেই। লোপা তো মরেই যেত বোধহয়। ...কিন্তু এই প্রথম ও সচেতন হল, আগে অনেক অনুনয় সত্ত্বেও পিসী কেন রাতে ওদের কাছে থাকত না। এখনো নিজের ঘরেই ঘুমোয় বটে পিসী, প্রায় রাত থাকতেই চলে আসে আর যায় সেই রাতে—বাবাকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে এ সংসারের সর্ব-কর্ম চুকিয়ে। পিসীর জামা-কাপড়ও এখানেই। বটুকদার কথাই যদি সত্যি হয়, লোকের কথা যদি পিসীর কানে গিয়েই থাকে, তারপরেও পিসীর হাব-ভাব চাল-চলন এত নির্বিকার হয় কেমন করে? এছাড়া আরো অস্বস্তিকর চিন্তা মনে আসছে তার।...বাবা আজকাল কথায় কথায় দপ করে জ্বলে ওঠে, পাড়াপ্রতিবেশী কেউ মন-মত কথা না বললে চেঁচামিচি করে ওঠে। কিন্তু পিসীর বেলায় একেবারে ঠাণ্ডা কেন? পিসী অন্যায়ভাবে বকাবকি করলেও চুপ করে থাকে কেন?

না আর ভাববে না, এসব বিচ্ছিরি চিন্তা লোপা আর কখনো করবে না। মোট কথা, তার বাবার তো কথাই নেই, পিসীর মতোও আর কেউ হয় না। লোকের জিভ খসে পড়ুক, তাদের চোখে ছানি পড়ুক।...বটুকদার ওপর হঠাৎ অমন রেগে না গেলেই হত। অসুখে ধুঁকছে বেচারা, এক গেলাস জল চাইল তাও দিয়ে এলো না। বাড়ির কাছাকাছি চলে

এসেছে, সন্ধ্যাও পেরুতে চলল, আর তো ফেরা যায় না। ভেতরটা খচখচ করছে, একটু বার্লি পর্যন্ত করে দেবার লোক নেই।...কাল সকালেই না-হয় একফাঁকে বেরুতে চেষ্টা করবে।

অশান্ত মন নিয়ে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় পা দেওয়া মাত্র মাথায় যেন বজ্রপাত।

দোরগোড়ায় বাবা দাঁড়িয়ে। তার প্রতীক্ষাতেই ছিল যেন। মুখ লাল, চাউনি অস্বাভাবিক।

—কোথায় গেছলি?

লোপা সভয়ে তাকালো তার দিকে। দাওয়ার শেষ মাথায় পিসী দাঁড়িয়ে। বাবা যেন চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে।—আমি জানতে চাই কোথায় গেছিলি? আমি জানতে চাই ফের তুই ওই বদমাসটার ওখানে গেছলি কিনা?

শুকনোমুখে লোপা অস্ফুট জবাব দিল, বটুকদার খুব অসুখ—

—অসুখ তাতে তোর বাবার কি? কতবার তোকে বারণ করেছি ওখানে যাবি না —যাবি না—তবু কেন গেছলি পাজী-নচ্ছার মেয়ে কোথাকার! হাতের এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ঘরের মধ্যে এনে ফেলল।—আজ তোকে আমি খুন করে ফেলব—বল্ আর কোন দিন ওর ছায়া মাড়াবি কিনা—বল্, বল্ শিগ্‌গীর!

কপিল চক্রবর্তী কাঁপছে থরথর করে, তারই মধ্যে ওর একটা বাহু ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর গর্জন করছে। লোপা নির্বাক, বিবর্ণ। পিসী ঘরে ঢুকে টেনে নিল ওকে, সেই সঙ্গে বাবার ওপরেই ঝাঁঝিয়ে উঠল, বলি, মাথাটা কি একেবারে গেছে?

ওকে টেনে এনে চৌকিতে বসিয়ে দিল।—কেন কথা শুনিস না? কেন অশান্তি বাড়াস? তুই বেরোবার খানিক বাদেই ভুবন হালদার গাড়ি হাঁকিয়ে তোর পরীক্ষা পাসের জন্য আনন্দ করতে এসে শুনিয়ে গেল ওই শয়তানটার ওখানে গেছিস তুই—এ কি ভালো হল? অন্যের কাছে আরো কি বলে বেড়াবে ঠিক আছে কিছু!

লোপা নির্বাক তেমনি। এ জগৎটা যে কত খারাপ ওর যেন ধারণা ছিল না।...ওকে নদীর দিকে যেতে দেখেই ভুবনকাকা গাড়ি ঘুরিযে বাড়িতে এসে খবরটা দিয়ে গেছে। পিসীর কথা শেষ হতেই বাবা আবার গর্জন করে উঠল, ওই ভুবনকে আমি খুন করব —খুন করে ফাঁসি যাব!

—আঃ! পিসীর অস্ফুট বিরক্তি আর ভ্রূকুটির ঝাপ্টায় বাবা চুপ।

নিজের অগোচরে লোপার দু'চোখ পিসীর মুখের ওপর উঠে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ওর দৃষ্টিটা যেন ধাক্কা খেল একপ্রস্থ। সেই মুহূর্তে এই অপমানকর পরিস্থিতিও ভুল হয়ে গেল। চকিতের জন্য দু'চোখ বাবার দিকে ফিরল একবার, তারপর আবার পিসীর মুখের ওপর ফিরে এলো।...তারপর মুখ থেকে বুকের ওপর নেমে এলো।

যা দেখল আগেও হয়তো অনেক দেখেছে। কিন্তু লোপা আগে কখনো লক্ষ্য করে নি। লক্ষ্য করার কথা মনেও আসে নি। কিন্তু আজ হঠাৎ নিজে থেকেই চোখে পড়ল।

...বাবার তিন হাতের মধ্যে পিসী দাঁড়িয়ে। পিসীর গায়ে জামা নেই। আদুড় গায়ে সাদা শাড়িটা পেঁচিয়ে জড়ানো।

...বাবা দূরে থাক, পিসীও নিজের প্রতি সজাগ নয় একটুও।

ছয়

মাত্র একটা রাতের মধ্যে লোপার মনের বয়েস যেন দশটা বছর বেড়ে গেল। কিছু ভালো লাগছে না। সব কিছুই যেন বিষ-বিষ লাগছে ওর।

রাতে ঘুম একরকম হয়-ই নি। একেবারে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙল যখন বেশ বেলা। উঠে বাবাকে দেখল না। বাজারে চলে গেছে। মুখ-হাত ধুয়ে এসে দেখে রান্নাঘরের দাওয়ায় ওর চা আর মুড়ি রেখে পিসী কাঠের থামে ঠেশ দিয়ে বসে আছে। রোজই খুব ভোরে চান সেরে নেয় পিসী। আজও ব্যতিক্রম হয় নি। পিঠের ওপর ভেজা চুল ছড়ানো।...আর আদুড় গায়ে শাড়ি জড়ানো।

লোপার মনে পড়ল, বাবার সামনেও রোজ এই মূর্তিতেই দেখে পিসীকে। অর্থাৎ বাবার সামনেও পিসীর এই বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালাটা শুধু তুলে নিয়ে ঘরে চলে এলো। মুড়ির ডালার দিকে তাকালও না। পিসী দেখল শুধু, তারও সাধাসাধি করার মেজাজ নয়।

নিজের ওপরেই বিষম বিরক্ত লোপা। একটা পাপচিন্তা মগজে চেপে আছে ওর। চেষ্টা করেও সেটাকে তাড়াতে পারছে না। শেষে জোর করেই তাড়াল। বাবা বাবাই আর পিসী—পিসী। ওই বটুকদাই যত নষ্টের গোড়া, কি-সব কানে ঢুকিয়েছে ঠিক নেই।

বটুকদার কথা মনে হতেই ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কাল এক গেলাস জল চেয়ে পায় নি। ওঠারও সামর্থ্য আছে বলে মনে হয় না। আজ সমস্ত দিন কি খাবে লোকটা? অসুখ তো আছেই তার ওপর না খেয়েই হয়তো ওই হাল হয়েছে।

পিসী আর সেই সঙ্গে বাবার ওপরেও প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে লোপার। না সকলের থেকে বেশি রাগ হচ্ছে ভুবনকাকার ওপর। লোকটা এক নম্বরের ইতর। ইতর ইতর!

অসহিষ্ণু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পরনের শাড়িটা বদলে নিল। তারপর পিসীর নাকের ডগা দিয়েই হনহন করে উঠোন পেরিয়ে পেরিয়ে এলো। কম করে মাইলটাক হাঁটতে হবে। তাতেও বিরক্ত। ওর হাত-পা বাঁধা, তবু ব্যবস্থা তো কিছু করতে হবে —অসুস্থ লোকটা না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে নাকি!

ওকে দেখে রাধাকাকিমা অবাক একটু।—কি রে, রোদে তেতে পুড়ে এ-সময়ে যে?

—হ্যাঁ, ইয়ে, বিলে কোথায়?

বয়েসে বছর দেড়েকের বড় হলেও লোপা নাম ধরেই ডাকে ওকে। রাধাকাকিমা আরো অবাক।—সেকি ঘরে থাকার ছেলে, হঠাৎ ওকে কেন, খবর সব ভালো তো?

লোপা মাথা নাড়ল। ভালো। বলল, একটু দরকার ছিল—

—আয়, ভিতরে বোস এসে, ঘেমে লাল হয়ে গেছিস। তারপর শুনি কি দরকার—

লোপা তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোমার চিন্তারও কিছু নেই শুনেও কাজ নেই, আমি এক্ষুনি যাব—

আর কথা বলতে না দিয়ে তর তর করে বেরিয়ে এলো। তারপরেই রাজ্যের বিরক্তি। কয়েক পা এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। কি করা যায় ভাবছে।

বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। দূরে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে ছেলেটা এগিয়ে আসছে,

সে বিলেই। বিলে না হয়ে যায় না। ওই তো দেখে দাঁত বার করে হাসছে, আর আরো জোর পা ফেলে এগিয়ে আসছে। লোপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুব যেন স্বস্তি বোধ করছে না।

কাছে এসেই দু'চোখ কপালে তুলে বিলে বলল, তুই এখানে। বাজারের রাস্তায় ওদিকে কি কাণ্ড হচ্ছে।

—কাণ্ড পরে শুনব, আমি তোর খোঁজেই এসেছিলাম, মানে খুব দরকারে।

তার খোঁজে এসেছে শুনে বিলে নিজেও রাস্তার কাণ্ডর কথা ভুলে গেল। এও তাজ্জব ব্যাপারই বলতে হবে, কারণ ইদানীং এই মেয়ে ওকে দেখলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে।

—কি দরকার?

—তুই কাউকে বলবি না?

বিলে মাথা নাড়ল। বলবে না।

—ইয়ে, শোন...বটুকদার ভয়ানক অসুখ, বিছানার থেকে উঠতে পর্যন্ত পারে না, কে জল দেয়, কে খেতে দেয়, কে-ই বা ওষুধপত্র এনে দেয়। তুই এক কাজ করবি? সকালে একবারটি করে যা যা দরকার একটু ব্যবস্থা করে দিয়ে আসবি? আমি তোকে পাঠিয়েছি কক্ষনো বলবি না যেন—

আবেদন শুনে বিলাসচন্দ্র অবাক প্রথমে, তারপর ঠোঁটের ডগায় তির্যক হাসি। —বটুকদার ওপর তোর এত টান কেন?

পাজীটা এ-গোছের কিছু জিজ্ঞাসা করবে লোপা সেজন্যে আগেই প্রস্তুত ছিল। তাই রাগের বদলে মুখে আন্তরিক দুশ্চিন্তার ছায়া টেনে এনে জবাব দিল, ক'বছর আগে আমার সেই যে সাঙ্ঘাতিক অসুখটা হয়েছিল তখন তো বটুকদাই বড় ডাক্তার এনে আর ওষুধপত্র এনে দিয়ে আমাকে বাঁচালে, নইলে এতদিনে তো মরে ভূত হয়ে যাবার কথা! আমার তো তবু বাবা আছে পিসী আছে, বটুকদার তো কেউ নেই—

বিলাসচন্দ্র খানিক ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।—ক'দিন যেতে হবে?

—যে কদিন না অসুখটা একটু কমে।

—গেলে তুই আমাকে কি দিবি?

—আমি আবার কি দেব...আমার কি আছে?

বিলের চোখেমুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।—আমাকে দেখলে আর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবি না...কথা বলবি, গল্প করবি?

লোপার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সোজা ওর দু'চোখের ওপর থেমে রইল একটু। একটা রাতের মধ্যে সত্যিই যেন বয়েস অনেক বেড়ে গেছে ওর। বিলেকে ছেলেমানুষই মনে হচ্ছে। —আমার সঙ্গে কথা কইতে গল্প করতে তোর ভালো লাগে?

হাসিমুখে বিলে অনেকখানি মাথা কাত করে জবাব দিল, সত্যি কোনো খারাপভাবে বলছি না, তোকে দেখলেই আমার ভালো লাগে, তুই মুখ ঘুরিয়ে চলে যাস বলেই আমার রাগ হয়, তখন তোকে জ্বালাতন করতে ইচ্ছে করে।

শুনে লোপা না হেসে পারল না। বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

এই খুশির মুখেই হঠাৎ কি মনে পড়তে বিলের দু'চোখ কপালে।—এই যা, ভুলেই

গেছি! বাজারের রাস্তায় তোর বাবাকে নিয়ে কি কাণ্ড হচ্ছে, এক দঙ্গল ছেলে তাকে ঘিরে মজা করছে আর উসকে দিচ্ছে, আর কপিল জ্যাঠা পাগলের মতো কি-সব শোনাচ্ছে তাদের, মুখ একেবারে রক্তবর্ণ। বাবা দোকানে নেই, ভুবনকাকা আমাকে ঠেলে পাঠালো, তোর বাবাকে ধরে নিয়ে আয়, নইলে লোকটা এক্ষুনি ঠাস করে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবে।...সত্যি কপিল জ্যাঠা চিৎকার করে বক্তৃতা করছে আর কাঁপছে থরথর করে!

নানা বয়সের কম করে পঞ্চাশ-ষাট জনের একটা ছেলের দঙ্গল আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল। সঙ্গে হাততালি। ওদের পিছনে আরো অনেকে জড় হয়ে মজা দেখছে, মজার কথা শুনছে। একটা উঁচু কাঠের বাক্সর ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতার উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে কপিল চক্রবর্তী। মাথার ওপরে সূর্য জ্বলছে।

হাততালি ছাপিয়ে তার গলা চড়ল আবার—তোমরা সব এত ভালো ছেলে আমি আগে জানতুম না। সোনার টুকরো ছেলে তোমরা। আগে জানলে তোমাদের দিয়েই সব পাপ উপড়ে ফেলতাম। এখন পাপের শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। দেশের নেতাকে আমি কবেই সে কথা বলেছিলাম—আমার এই ব্যাগে তার প্রমাণও আছে—সে একটা মানুষের মতো মানুষ ছিল, আমার কথা ঠিক শুনত—কিন্তু অন্য লোকে বাদ সাধলে, উল্টো বোঝালে। এখন ঠেলা বোঝ সব—গোটা দেশটা পাপে গিসগিস করছে এখন—কল্কিকে আর ঠেকাবে কে? কল্কি আসছে, আগুন হয়ে ঝড় হয়ে বন্যা হয়ে। পাপীরা সব জ্বলে পুড়ে ডুবে মরবে—কেউ তাদের রক্ষা করতে পারবে না! কিন্তু তোমাদের কিছু হবে না, তোমরা নিষ্পাপ, সোনার টুকরো ছেলে সব—আর আমরাও নিষ্পাপ, আমার কিছু হবে না, আমার মেয়ের কিছু হবে না, সরির কিছু হবে না—

আর একদফা হাততালি আর হুল্লোড় জমে ওঠার আগেই সচকিত সকলে।

একে ঠেলে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে লোপা প্রায় ছুটেই বাবার কাছে গিয়ে হাত ধরে প্যাকিং বাক্স থেকে টেনে নামাল তাকে। মেয়ের মুখও বাপের মতোই টকটকে লাল। বাবা হাসতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে বলল, তুই আবার কখন এলি, শুনছিলি বুঝি...

ছেলেগুলোর মুখে কথা নেই হঠাৎ। নিজেদের আগোচরেই রাস্তা করে দিল তারা। বাবার হাত ধরে লোপা একরকম টেনেই বাইরে নিয়ে এলো। ঠিক তক্ষুনি মুখোমুখি পড়ে গেল যে-ছেলে সে রাজা ঘোষাল। ভিড়ের মধ্যে ঢোকার সময়েই লোপা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল তাকে। এখন ওকে দেখেই এগিয়ে এসেছে তাতে কোনো ভুল নেই।

আচমকা এক পশলা চোখের আগুন ছড়িয়ে লোপা বুঝি মুখখানা পুড়িয়েই দিতে চেষ্টা করল তার। তারপর তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, লজ্জা করে না? লজ্জা করে না? লজ্জা করে না?

তারপরেই এক ঝটকায় বাবাকে টেনে নিয়ে সামনের একটা রিকশয় উঠে বসল।

শুধু রাজা ঘোষাল নয়, পিছনের ছোকরার দঙ্গলও বিমূঢ়।

রিকশ চলেছে। বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে কপিল চক্রবর্তী আর সোজা হয়ে

বসতে না পেরে মাথাটা মেয়ের কাঁধে এলিয়ে দিয়েছে। এক হাতে লোপা তার গলা-কাঁধ বেষ্টন করে আগলে রেখে স্থির হয়ে বসে আছে। একটা শিশুকে রক্ষা করার মতো আকুতি। একই সঙ্গে রাগে দুঃখে ক্ষোভে দু'চোখ চিকচিক করছে তার।

ঘণ্টা দেড়েক না যেতে গোপালকাকা একেবারে ডাক্তার সঙ্গে করে হাজির। বিলের কাছে ঘটনাটা শুনে থাকবে। বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলে এসে দেখে গেছে কপিল জ্যাঠা ঘুমুচ্ছে। এ-ঘুম কারোই স্বাভাবিক মনে হয় নি খুব।

বিশ্বেশ্বর দত্তকে নয়, অন্য চার টাকার ডাক্তার এনেছে গোপাল গণাই। বিশ্বেশ্বর ডাক্তারকে দেখলে বন্ধু আবার ক্ষেপে যেতে পারে সে-ভয় ছিল। চক্রবর্তী পাপীর লিস্ট-এ বিশ্বেশ্বর ডাক্তারেরও নাম আছে জানে।

ব্লাড-প্রেসার দেখা হল, দু'শ পঁচাত্তর আর একশ দশ। লোপা হিসেব জানে না, কিন্তু ডাক্তাবের কথা শুনে মনে হল খুব বেশি। তাছাড়া বাবার ফর্সা শরীরে যেন একটা লালের ছোপ পড়েছে। তক্ষুনি আর একজনের কথা মনে পড়তে ভিতরে একটা কাঁপুনি ধরেছে।

...মাস্টারমশাই শশধর ঘোষাল। তারও খুব বেশি ব্লাড-প্রেসার ছিল, আগের দিনের ভালো মানুষটা পরদিন আর নেই।

সময়ে ওষুধ পড়ার দরুনই হয়তো বিকেলের মধ্যেই বাবাকে বেশ ভালো মনে হল ওর। দুশ্চিন্তার একটা পাথর নেমে গেল যেন।

...অথচ লোপার এখনো কিছুই ভালো লাগছে না। ভিতরটা বিষাদে ছেয়ে আছে। পিসী বাবার কাছে আছে, লোপা বাইরের দাওয়ায় বসে আছে। কিছুই ভাবছে না অথচ মনের তলায় একটা ভাবনা যেন থিতিয়ে আছে।

বেড়া ঠেলে বিলে এগিয়ে এলো। ওকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেল একটু। ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কেমন?

লোপা মৃদু জবাব দিল, ভালো।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিলে হাসল এবার।

—তুই আমাকে একটা আস্ত পাগলের কাছে পাঠিয়েছিলি। কি মতলবে গেছি শুনেই বটুকদা তেড়ে মারতে এলো একেবারে, তারপর দূর-দূর করে তাড়াতে চাইল। তোর তাগিদে গেছি ঠিক বুঝেছে, তাইতেই আরো বেশি রাগ। তখন আমিও বলেছি, লোপাকে কথা দিয়েছি যখন, আবারও আসব—প্রাণে মেরে ফেললেও আসব!

অর্থাৎ লোপাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যখন, ও জীবনের পরোয়া করে না। কিন্তু এমন কথা শোনার পরেও লোপাকে তেমন উৎসুক হয়ে উঠতে দেখা গেল না। অগত্যা বটুকদার সম্পর্কে আরো দু'চার কথা বলে বিলে প্রস্থান করল।

এর খানিক বাদে উঠোনে আবার যার পদার্পণ ঘটল, লোপা তাকে অন্তত আদৌ আশা করে নি। দেখা মাত্র, ভিতরটা সচকিত হয়ে উঠল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে বাইরেটা যেন আরো ঠাণ্ডা।

রাজা—রাজা ঘোষাল। ওকে ওইরকম বসা দেখে উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো একটু। তারপর বিনা আহ্বানেই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো।

...বিলাসের মুখে শুনলাম, উনি তো ভালোই আছেন একটু?

লোপা জবাব দিল না, উঠে দাঁড়াল না, ভিতরে ডাকল না। নিষ্পলক চেয়ে রইল শুধু।

...একবার দেখে আসব?

লোপা এবারও নিরুত্তর। সকালের মতো না হোক, এখনো কেন যেন রাগই হচ্ছে ওর।

অসুবিধে হলে থাক। আমি এমনিই একবার খবর নিতে এসেছিলাম। আচ্ছা...

ফিরে চলল। লোপার খরখরে দু'চোখ ওর পিঠের ওপর বিঁধে আছে। ইচ্ছে করছে জামার মুঠো ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ফেরায়, তারপর কয়েকটা ধাক্কায় বাবার ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢোকায়। বাবাকে দেখার ইচ্ছে থাকলে সোজা গিয়ে দেখে এলেই হত! তার জন্যে ওর অনুমতি দরকার?

চোখের আড়াল হতে রাগ বাড়তেই থাকল আরো।

পরের দিনের মধ্যে বাবা মোটামুটি সুস্থ। গোপালকাকা নিয়মিত এসেছে। আধহাত ঘোমটা টেনে একদিন রাধাকাকিমাও এসেছিল। পাড়া-প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে গেছে। আর সকলের অলক্ষ্যে বিলে প্রায়ই এসেছে। বটুকদার জ্বর ছেড়েছে। ভাত পথ্য করেছে। আর লোপার বাবার হঠাৎ অসুখের কথা শুনে আগের মতো রাগ করে ওকে তাড়িয়ে দেয় নি।

এদিকে বাবা ভালো হয়ে রোজই সকালে চা-টা খেয়ে বাজার যেতে চায়। তারপর পিসীর ধমক খেয়ে ঘরে গিয়ে মুখখানা বেজার করে বসে থাকে।

মোট কথা কারো স্বাস্থ্য নিয়েই লোপার আর উদ্বেগের কারণ নেই। তবু ভেতরটা যেন সারাক্ষণ অসহিষ্ণু হয়েই আছে। পিসীর ভালো কথাতেও রেগে যায়। এই পনের দিনের মধ্যে একজন আর একবার আসবে আশা করেছিল কিনা মনে হতে সদম্ভে নিজের উদ্দেশেই চোখ পাকিয়েছে। কক্ষনো না। স্বার্থপরদের সক্কলকেই ওর চেনা হয়ে গেছে। দরদ না হাতী!

পনের দিনের মাথায় লোপা অপ্রত্যাশিত চিঠি পেল একটা। পোস্ট-কার্ডে দু'চার লাইনের চিঠি। লিখেছে চারুমাসি—চারুবালা রায়। আগামীকার স্কুল ছুটি তাদের, যদি সম্ভব হয়, আর লোপার বাবা যদি ভালো থাকে তাহলে ও যেন দুপুরের দিকে একবার আসে! দরকারী কথা আছে।

পত্রখানা প্রথমে রাগের ইন্ধন যোগালো একদফা। ও যাবে না। দরকারী কথা আছে না ছাই, আসলে এটা একটা কারসাজি।...ওই ছেলেও তখন নিশ্চয় ওখানে থাকবে, আর এ কথা সে-কথার পর চারুমাসি ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে। আর ছেলে সেই ফাঁকে তখন একটু আপোসের চেষ্টা করবে!

কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই উসখুসুনি শুরু। সেই সঙ্গে দুপুরের প্রতীক্ষা। চারুমাসি ডাকলে আর না গিয়ে পারে কি করে।

সন্তর্পণে দরজাটা একটু ঠেলে ফাঁক করে লোপা ভিতরে উঁকি দিল। বিছানায় শুয়ে চারুমাসি ঘরের ছাদ দেখছে। ঘরে আপাতত আর কেউ নেই।

...আসব?

—আয় আয়। শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে চারুবালা শয্যায় উঠে বসল। —তোর কথাই ভাবছিলাম, বোস্ এখানে।

বিছানায় তার পাশে বসতে বলল। এই শিথিল বেশ-বাসে চারুমাসির মুখখানা বেশ মিষ্টি-মিষ্টি লাগল লোপার। একটু হয়তো ঘুমিয়ে নিয়েছে, তার আমেজটুকু এখনো লেগে আছে। এক বোঝা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। চারুমাসি যে একটু মোটার দিকে ঘেঁষছে তাতে আজ অন্তত লোপার একটুও সন্দেহ নেই। আর তাইতেই যেন আরো ভালো লাগছে।

—ক'দিন তো বেশ ধকল গেল তোদের ওপর দিয়ে। বাবা কেমন এখন?

—ভালো।

—ব্লাড-প্রেসার?

—এখন কমই।

চারুমাসির চোখে ঈষৎ কৌতুকের আভাস দেখল লোপা।—আর তোর?

লোপা সঠিক বুঝে উঠল না। চারুমাসির চাউনিতে কৌতুকের আভাস আরো স্পষ্ট।—বলি তোর প্রেসারটা বেশি কি কম মাপা হয়েছে? একবার দেখে নেওয়া ভালো...

মুহূর্তের মধ্যেই লোপার সমস্ত মুখ রাঙিয়ে উঠল। সেই সঙ্গে হাসি চাপার বিড়ম্বনা।

ছদ্মকোপে চারুবালা তক্ষুনি চোখ পাকালো।—আবার হাসি! বাজারের একপাল লোকের সামনে তুই আমার বোন-পোকে যা খুশি তাই বলিস এত সাহস তোর?

লোপা যেন ভাবতেও পারে না এ স্কুলের সেই রুক্ষ খিটখিটে টিচার মিস সি বি রে—আর মাসিই যদি বলে প্রায় সমবয়সী মাসি যেন। কি-যে ভালো লাগল হঠাৎ ও বলতে পারবে না, অথচ লজ্জায় আর মুখও তুলতে পারছে না।

শরম-রাঙা মুখখানা দেখে চারুবালা এবার হাসছে মিটিমিটি। শেষে বলল, শোন, এদিকে ফের—ছেলেটাকে তুই মিছিমিছি দুঃখ দিয়েছিস সেদিন, যাবার আগেও মন খারাপ করে বলে গেল, মাসি তুমিই বলে দিও সবাইকে অত ছোট ভাবা ঠিক নয়, আর, দোষ থাক বা না থাক বাড়ি গেলে লোকে আর একটু ভালো ব্যবহার আশা করে।

...ও হরি, বাবু তাহলে এখানে নেই-ই মোটে! কিন্তু মাসি হোক আর যা-ই হোক, তার কাছে ইনিয়ে-বিনিয়ে এ সব বলা কেন?

—তা তুইকি লাঠি-টাঠি নিয়ে তাড়া করেছিলি নাকি?

লোপা নিরুত্তর। অস্বস্তিতে মুখ রাঙা তখনো। তারপরেই সচকিত।

মাসির মুখ সত্যিই গম্ভীর এবার। বলল, সেদিন বাজারের ওই লোকের ভিড় থেকে রাজাই শুধু তোর বাবাকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছিল। বেরিয়ে আসা দূরে থাক, উত্তেজনার মাথায় অত লোকের সামনে ওর মায়ের সম্পর্কে যে অপমানকর কথা বলেছেন, এতদিনে ওর মায়ের কানেও সে-সব গেছে বোধহয়।

লোপা এবারে ভয়ে ভয়েই তাকালো তার দিকে। বাবা কি বলে থাকতে পারে ওর কোনো ধারণা নেই।

মাসি জানালো, পাপ-পুণ্যের কথা হচ্ছিল তখন, আর ছেলের দল তখন তাঁকে

অনেকখানি উসকে দিয়েছে, রাজা ওঁর হাত ধরে টানাটানি করতে উনি বলে উঠলেন, তুমি ভালো ছেলে, সোনার ছেলে—কিন্তু তোমার মা? অমন জলজ্যান্ত লোকটা মরে গেল—সেই.পাপের বোঝা এড়াবেন কি করে? আমাকে টানাটানি না করে তাঁর কাছে যাও, সময় থাকতে এখনো পাপ দূর করতে বলো—প্রায়শ্চিত্ত করতে বলো।

লোপার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে যেন। স্তব্ধ নির্বোধ বিস্ময়ে চেয়েই আছে। এই কাণ্ড হয়ে গেছে ওর কল্পনার বাইরে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চারুবালা মন্তব্য করল, মোট কথা ব্যাপারটা সেদিন ভালো হয় নি...যাকগে, এ নিয়ে আর তোর ভেবে কাজ নেই...এমন্ন কিছু মিথ্যেও বলেন নি তোর বাবা।

শেষের কথা কটা কানে আসতে লোপা অবাক একটু। কিন্তু চারুমাসির বিমনা দৃষ্টিটা হঠাৎ উৎসুক আবার।—আচ্ছা...অনেকদিন আগের কোনো বড় বন্যায় তোদের সংসারে বড় রকমের কিছু ক্ষতি হয়ে গেছে?

এ-প্রশ্নের কোনো তাৎপর্য বোঝা না গেলেও লোপা ভিতরে-ভিতরে আরো অবাক। জবাব দিল, আমার মা আর দিদি বন্যাতেই গেছে বোধহয়...কিন্তু এ-সম্পর্কে বাবা বা পিসী কিছু বলে না।

—পিসী...তোর নিজের পিসী?

প্রশ্নটা খট করে কানে লাগল। লোপা মাথা নাড়ল শুধু। নিজের পিসী নয়।

চারুবালার চকিত দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নড়া-চড়া করল একটু। তারপর এতক্ষণের সমস্ত প্রসঙ্গ একসঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেবার মতো করে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল।

—ও-সব কথা যেতে দে, তোর পড়াশুনার কি হল? কলেজে তো ভর্তি শুরু হয়ে গেছে।

লোপা চুপ। পড়াশুনা আর হবার আশা দেখছেই না। ইদানীং সর্বদা এই চিন্তাটাই বুকে বিঁধে আছে ওর।

—কি, এখনো ঠিক হয় নি, না পড়াশুনা হবেই না আর?

—জানি না।

—আর জেনেও কাজ নেই তোমার, ফর্ম-টর্ম এনে সুড়সুড় করে গিয়ে ভর্তি হয়ে যাও। এবার থেকে স্কুলের ডোনারের চাঁদা থেকে কলেজে পড়ার জন্য তিনটে করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে—দু'টো এই স্কুল থেকে যারা ভালো রেজাল্ট করবে তাদের জন্য, আর একটা খরচা দিয়ে পড়ার সঙ্গতি নেই অথচ যোগ্যতা আছে—তার জন্য। এতে স্কুলের সুনাম বাড়বে, উঁচু ক্লাসের মেয়ে বেশির ভাগ এই স্কুলে এসে ভিড় করবে, কিন্তু আসলে তোর মুখ চেয়ে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে এই ব্যবস্থা করেছি আমি।

পরিতুষ্ট মুখ চারুমাসির। বড় বড় চোখ করে লোপা চেয়ে রইল তার দিকে। কি বলবে বা কি করবে ভেবে পেল না। আচমকা ঝুপ করে তার পায়ে প্রণাম করে উঠল একটা।

—ও-কি ও-কি! ছদ্ম-কোপ ফলাতে চেষ্টা করেও শেষে হেসেই ফেলল। লোপা স্কুলের গণ্ডী টপকেছে বলে হোক বা যে জন্যেই হোক, মুখের লাগাম গেছে চারুমাসির। হাসিমুখেই চোখ পাকিয়ে যা বলল তারপর, লোপার দু'কান লাল আবার। বলল, যা করেছি

সত্যিই তোর দরদে করেছি ভাবছিস বুঝি? করেছি আমাদের ছেলের দরদে। আরো বেশি হাসছে চারুমাসি—রাজার মায়ের ভয়ানক সাধ তার বিদ্বান ছেলের জন্য খুব বিদুষী বউ আনবে একখানা, আর সেই সঙ্গে তার ধারণা তুই একটা গেছো মেয়ে, তোর দ্বারা কিচ্ছু পড়াশুনা হবে না।—প্রণামই করিস আর যা-ই করিস, তার এই সাধ যদি মেটাতে না পারিস, আর তোর মুখ দেখব না বলে দিলাম।

চারুমাসি হাতে রিকশ ভাড়া গুঁজে দিয়েছিল। লোপা নেয় নি। পয়সা বিছানার ওপর ফেলে রেখে এসেছে। বলেছে সন্ধ্যার এখনো ঢের দেরি, হেঁটে যাবে। হাঁটতে ইচ্ছে করছে।

মিথ্যে বলে নি। ওর যেন অনেকখানি নিরিবিলি অবকাশ দরকার। ভিতরের যে অনুভূতিগুলো আকুলি-বিকুলি করছে সে-গুলোর মুক্তি দরকার। তাই রাস্তাটা চট করে ফুরিয়ে যাক চায় না।

সব মিলিয়ে ওর ভালো লাগছে অথচ তার নিচে কি একটা অগোচরের শঙ্কা থিতিয়ে আছে।...ওই ছেলে সেদিন আর দশটা বখাটে ছেলের মতো বাবার পাগলামির মজা দেখতে দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে বরং বার করে আনতে চেষ্টা করেছিল শোনার পর থেকে সঙ্কোচে মিইয়ে যাচ্ছে ও।...একগাদা লোকের সামনে বাবা তার মা-কে অপমান করেছে, বাবার মাথার অবস্থা বুঝে তাও সহ্য করে দাঁড়িয়েছিল। আর তখনি অপমানের চূড়ান্ত করেছে লোপা নিজে এসে। তা সত্ত্বেও বাড়ি বয়ে অসুখের খবর নিতে আসতে লোপার ওই ব্যবহার।

সঙ্কোচে ধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তারও ফাঁক দিয়ে কি একটু তৃপ্তি, কি একটু আনন্দ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বুঝি।

যে মুখখানা ওর চোখের সামনে ভাসছে, ক্ষমায় বিবেচনায় দাক্ষিণ্যে সেটি পুরুষেরই মুখ বটে। আজ অন্তত লোপা তা অস্বীকার করতে পারে না।

...কিন্তু চারুমাসির ব্যাপারখানা কি? তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই লোপার। পড়াশুনা নিয়ে এতটা মাথা ও নিজেও ঘামিয়েছে কিনা সন্দেহ। যা করেছে তাদের ছেলের দরদে করেছে বলা সত্ত্বেও মহিলার ওর ওপর টান নেই, কোনো বোকাও সেটা বিশ্বাস করবে না। তবু তার অত হাসিখুশি, ছদ্ম-কোপে চোখ পাকিয়ে কথাবার্তাগুলো খুব স্বাভাবিক মনে হয় না কেন? স্কুলে একটানা অনেক বছর তাঁর রুক্ষ কঠিন মূর্তি দেখে অভ্যস্ত বলে?

...আজ হঠাৎ চারুমাসি ওর ঘরের খবর জিজ্ঞাসা করল কেন? বন্যায় ওদের সংসারে কোনো অঘটন ঘটেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করল কেন? পিসী নিজের পিসী কিনা তাও খোঁজ নিয়েছে। লোপা এ সবের কিছু মাথা-মুণ্ডু বুঝে উঠল না। কিন্তু ভাবতে গিয়ে চোখের সমুখ থেকে হঠাৎ সম্পূর্ণ আর এক দিকের একটা পরদা সরে যেতে লাগল। ...যে জন্যেই খোঁজ-খবর নিক, চারুমাসির একটাই উদ্দেশ্য ভবিষ্যতের আত্মীয়তায় যাতে ব্যাঘাত না ঘটে। তার মনে ব্যাঘাতের আশঙ্কা আছে, তা না হলে এ-সব প্রশ্ন করত না।...রাজা ঘোষালের বাড়িতে সব জল্পনা-কল্পনা এক-কথায় নাকচ করে দেবার মতো এক সবল মহিলা আছে সে-খবর লোপাও খুব ভালো করেই রাখে। রাজা ঘোষালের

মা। এই মা-টিকে চারুমাসি যে আদৌ সুচক্ষে দেখে না, যেভাবেই হোক লোপা আজ অন্তত স্পষ্ট বুঝেছে। ওই মা যা চায় না, চারুমাসি বোন-পো'কে আর ওকে দু'জনকেই কাছে টানছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, লোপার ধারণা, শুধু এই জন্যেই চারুমাসি ওর কাছে যেমন বোন-পোর হয়ে অনেক বলে, ওই ছেলের কাছেও তেমনি ওর হয়ে অনেক কিছু বলে।...এই করেই দু'দিক থেকে দু'জনকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছে।

...কিন্তু চারুমাসি এই কাণ্ড করছে কেন!

রাস্তার এক ধার ধরে হাঁটছিল, হঠাৎ হাসির শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি। কিন্তু সেটা চাপা দিয়ে হাসতেই চেষ্টা করল একটু।

ও-ধারে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে বিলে গণাই। এগিয়ে এলো।—অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিস যে...বটুকদা সেরে উঠতে আমার দরকার ফুরিয়েছে বলে?

লোপা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আমি দেখিই নি।

—তা-তো দেখবিই না। বিলের ভাবভঙ্গি আরো তির্যক্।—মাথায় এখন কত চিন্তা তোর, দু'দিন বাদে কলেজে পড়বি, তারপর ঘোষাল বাড়ির বউ হবি—বলি তখন দেখলেও চিনতে পারবি তো?

লোপা ধমকে উঠল, তুই ভারী অসভ্য হয়ে যাচ্ছিস—সত্যি বলছি তোকে আমি দেখি নি।

এবারে বিলাস নরম হল একটু। দিন-মানে একটা মানুষকে দেখতেই পাস নি কি করে জানব, ভাবলাম আগের মতো হয়ে গেলি।...যাক, বটুকদা কিন্তু তোর ওপর খুব রেগে গেছে, জ্যাঠা ভালো আছে তবু একবার গেলি না—

কেন-যেন লোপার মেজাজ সত্যিই বিগড়ালো।—কেন, অত রাগবার কি আছে তার? আমি যাবই বা কেন? আবার দেখা হলে বলে দিস আমার এখন কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে না।

সাত

বুকের ভিতরটা প্রায়ই আজকাল অত দুড়দুড় করে কেন, অত কাঁপে কেন লোপা ঠিক বুঝে ওঠে না। পর পর দু' বছর উত্তর বাংলার এই আকাশে বার কয়েক দুর্যোগ ঘনিয়েছে। ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় বন্যা হয়েছে, পাহাড় ধসেছে। এখানেও সাজ সাজ রব উঠেছে, শীর্ণ রঙিলা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তার ধার থেকে অনেকে সরে এসেছে। বাবার উত্তেজনার ফলেই শুধু ভয়ে-ভয়ে নদীর দিকে চোখ রেখেছে লোপা। আসলে প্রতি বর্ষায় রূপ খোলে রঙিলার। লোপার তখনি সব-থেকে ভালো লাগে। এ দু-বছরের দুর্যোগে ওই রূপ আরো একটু উচ্ছল আরো একটু প্রগলভ হয়েছে শুধু। লোপার মনে হয়েছে রঙিলা আরো একটু বেশি রঙ্গ-রসে মেতেছে। এই রঙিলা সত্যিই কাউকে গ্রাস করতে পারে এ তার একটুও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। উল্টে মনে হয় লোকে ভয় পায় বলেই যেন ওর সকৌতুক কল-কলানি খল-খলানি বেড়েছে।

আকাশটা এবারেও যেন ভ্রূকুটি করেই আছে। অতএব বাবার উত্তেজনা লেগেই আছে। মাঝে মাঝে মেঘের ফাটলে রোদ চিকিয়ে উঠলেও বাবার তাতে খুব বিশ্বাস নেই।

কিন্তু বাবার মতো লোপা তো এসব দুর্যোগ নিয়ে মাথা ঘামায় না, অথচ এবার দুর্যোগের আশঙ্কা ওর ভিতরে যেন থিতিয়েই আছে।

...সেটা বাবার জন্যেও নয়। দিনকে দিন বাবা অবুঝ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। প্রায়ই তাকে নিয়ে চিন্তার কারণ ঘটে লোপার। ছোট শিশুর মতোই ও তাকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে চেষ্টা করে। আগের মতো না হোক সরি পিসীকে বাবা এখনও ভয়ই করে। নির্ভর করে শুধু ওর ওপর, আশ্রয় খোঁজে শুধু ওর কাছে। যে-কোনো কারণে তার মানসিক অস্থিরতা বাড়লেই লোপা সেটা অনুভব করতে পারে। অথচ কারণে অকারণে বাবা ওকেই সব থেকে বেশি বকাঝকা করে।

বাবার জন্যে দুশ্চিন্তা বা অশান্তি লেগেই আছে, কিন্তু লোপার নিভৃতের অজ্ঞাত শঙ্কার হেতু এও নয়। তার প্রায়ই মনে হয় কিছু একটা ঘটবে, এমন কিছু যা কখনো ভাবে নি।

...আজ খানিক আগে হঠাৎ যা ঘটে গেল, এ কি তারই সূচনা? লোপা জানে না। বাইরেটা তার নিমেষে বিষিয়ে গেছে। আর ধুলো উড়িয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর যে বিদ্বেষ আর বিদ্রূপ-ভরা মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, সেই ক্ষত-বিক্ষত মূর্তিটা বিলাস গণাইয়ের—বিলের।

গাড়িটা ভুবন হালদারের। সে-ই চালাচ্ছিল। তার পাশে নীল গগল্স পরা আর একজনও বসেছিল। কয়েক নিমেষের মধ্যে তার সাজ-গোজও চোখে পড়েছে।

চারুমাসি।...মিস সি বি রে।

ভুবনকাকার পাশে এই ঝকমকে বেশে আর এই নির্জনে চারুমাসি।

বাড়ি থেকে কম করে পাঁচ ছ' মাইল দূরের পথ। দু'দিকে পাতলা জঙ্গল। আরো অনেকটা এগোলে ঘন জঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে বাঁধানো রাস্তাটা দূরের পাহাড়ের দিকে চলে গেছে।

এ-দিকটায় অনেকগুলো আটচালা ঘর আছে। বেশির ভাগই চাষীদের সংসার। এরই একটাতে একজন সাধুগোছের লোক থাকেন। আচার-নিষ্ঠার গেরুয়া-পরা সাধু নয়। মোটা সাদা থান আর সাদা ফতুয়া-পরা সাত্ত্বিক গোছের ভদ্রলোক। আশপাশের সকলেই তাঁকে বেণু মহারাজ বলে ডাকে। বয়েস ষাটের ওপর। তাঁর আসল নাম-ডাক ছড়িয়েছে ওষুধ বিতরণের ব্যাপারে। গাছ-গাছড়ার শিকড় আর লতা-পাতার নির্যাস দিয়ে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও নিরাময় করেন।

এঁর সন্ধান দিয়েছিল গোপাল গণাই। সুকৌশলে কপিল চক্রবর্তী আর লোপাকে সে নিজেই এখানে নিয়ে এসেছিল। তার পর থেকে মাসে একবার দু'বার লোপা নিজেই এসে বাবার ওষুধ নিয়ে যায়। এঁর চিকিৎসায় ফল কিছু হয়েছে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। রাতে বাবার ঘুমের ব্যবস্থা অন্তত ইনি করেছেন।

দেখলেই যাকে ভালো লাগে বেণু মহারাজ মানুষটি তেমনি একজন। সদা প্রসন্ন। অনেককে ধমক-ধামক করতেও দেখেছে লোপা, কিন্তু তার মধ্যেও যেন কৌতুক প্রচ্ছন্ন। লোপার ভালো লেগেছে। সে-ও যে বেশ প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে ভদ্রলোকের, তাও বুঝতে পারে। আগের দিন বেণু মহারাজ হঠাৎ ওকে বলেছিলেন, এক কাজ কর্ তো, রোজ একটু একটু শিব পূজা কর্ দেখি—

লোপা সেদিন হাঁ-না কিছুই বলে নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ লজ্জা পেয়েছিল। ওর ধারণা, শিবের মতো বর লাভ করা ছাড়া মেয়েদের শিব পূজোর আর কোনো তাৎপর্য নেই। এক মাস বাদে আজ আসা মাত্র বেণু মহারাজ শুধিয়েছেন, শিব পূজা করছিস তো?

বিব্রত মুখে লোপা মাথা নেড়েছে, করছে না।

—কেন? আমি যে সেদিন বলে দিলাম শিব পূজা করতে! করবি, এতে তোর আর তোর বাবার দুজনেরই ভালো হবে। করবি তো?

...আমি শিব পূজার কি জানি?

তিনি অবাক।—জানবি আবার কি। তোর পিসীর ঠাকুরঘর আছে তো, সেখানে শিবের ছবি রাখবি একখানা, ফুল আর বিল্বপত্র নিয়ে রোজ সেখানে বসবি একবার করে, আর রেকাবিতে ঠাকুরকে কিছু খেতে দিবি—তারপর যা তোর মন চায় তাই বলবি ঠাকুরকে, ব্যস হয়ে গেল।

বাবার ওষুধ নিয়ে রিকশয় আসতে আসতে শিব পূজার কথাই ভাবছিল লোপা। এ-ভাবে বলছে যখন করতেই হবে পুজো, কিন্তু হঠাৎ ওর এই মতি দেখে পিসী না জানি কি ভাববে।

সামনে গাড়ি। রিকশ বাঁ দিকে ঘেঁষল। লোপার দু'চোখ বিস্ফারিত তার পরেই।

...গাড়ি চালাচ্ছে ভুবন-কা', তার পাশে বসে নীল গগলস পরা চারুমাসি।...তারাও দেখেছে বই কি ওকে, অন্ধ না হলেও ঠিক দেখেছে।

গাড়িটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে বিলের সেদিনের সেই মুখ।

আশ্চর্য!

গত দু'বছর আগের মতো অত না হলেও চারুমাসির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে। লোপার এখন উনিশ গড়িয়ে কুড়ি চলেছে, কিন্তু মাসি এখনো তেমনি ছেলেমানুষই ভাবে ওকে, চোখ রাঙায়, বকাঝকা করে। কিছুদিন আগে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, বাংলায় মোটামুটি ভালো অনার্সই পেয়েছো, কিন্তু যতটা ভালো আশা করা গেছল ততটা হয় নি। বোনপোর সামনেই মাসি সেদিন বেশ করে বকল ওকে, পার্ট-টুতে ভালো না করলে মুশকিল হবে বলে শাসালো। আর তারপরেই বোনপোকে নিয়ে পড়ল।—তুই মুখখানা অমন গোমড়া করে বসে আছিস কেন? বাংলায় তোর যা বিদ্যে হয়েছে এখন পরীক্ষা দিলে আর দেখতে হত না, সেদিন যে স্লিপখানা পাঠিয়েছিস তাতে তিনটে বানান ভুল!

লোপার হাসি পেয়ে গেছল, কিন্তু ওই মুখ যেমন থাকে তেমনি গম্ভীর। বড় চাকরি পাওয়ার ফলে আজকাল যেন আরো গম্ভীর হয়েছে। জঙ্গলের বিদ্যায় সকলকে পিছনে ফেলে মাসকতক হল এখানে রেঞ্জ অফিসার হয়ে বসেছে। মাসের মধ্যে বারো-চোদ্দ দিন টুর, আর এখানে থাকলে সরকারী জিপে টহল দিয়ে বেড়ানো—কি এমন বড় চাকরি লোপা বুঝে ওঠে না।

ফাঁক বুঝে উঠে আসার মতলবে ছিল, কিন্তু চারুমাসির জন্যে পারা গেল না। অতএব রাস্তায় নেমে এলো যখন, ওই গম্ভীর মূর্তি পাশেই থাকল। একটু বাদে সে বলল, বাড়িতে প্রায়ই অশান্তি চলছে...তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শের দরকার ছিল।

লোপা দাঁড়িয়ে গেল। মুখখানা যেন একটু শুকনোই মনে হল তার। জিজ্ঞাসা করল, পরামর্শের জন্য কোথায় যেতে হবে?

...তুমি বলো।

হাত বাড়িয়ে লোপা দূরের উঁচু টিবিটা দেখিয়ে দিল।—ওই চাঁদমারির মাথায়?

ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস দেখা গেল এতক্ষণে। রাজা ঘোষাল মাথা নাড়ল। অর্থাৎ ও গেলে তার আপত্তি নেই।

এবারে লোপা গম্ভীর।—পরামর্শ করতে হলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

—কত দিন?

—বেশি না, এক বছর। আমার পার্ট-টু পরীক্ষা হয়ে গেলে।

ঠোঁটের হাসি আরো একটু স্পষ্ট হতে দেখা গেল।—তোমার পরীক্ষার জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই।

ও মা! লোপার চোখে মুখে বিস্ময়ের বিন্যাস।—মাসি যে বলে ওটাই একমাত্র পাসপোর্ট!

ঝপ করে একটা রিকশ থামিয়ে লোপা উঠে বসেই তাড়া দিয়েছিল, চালাও। তারপর একটু বাদে হাসি মুখেই পিছনে ঘুরে তাকিয়েছিল। ওই গাম্ভীর্য ও ইচ্ছে করলেই রসাতলে পাঠাতে পারে যেন।

ভেতরটা সেদিন লোপার পরিতুষ্ট ছিল বেশ। কিন্তু বাড়িতে ঢোকার আগেই সব যেন বিষিয়ে গেল। গেট থেকে বিশ তিরিশ গজ দূরে বিলে দাঁড়িয়ে। ওরই অপেক্ষায় ছিল বোঝা গেল। রিকশ থেকে নামতেই হাত তুলে ডাকল।

ইচ্ছে না থাকলেও লোপা পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। ইদানীং ওর ব্যবহার বিরক্তিকর ঠেকছে আবার। কাছে আসতে বলল, আমি তোর জন্যেই অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি—

আগের মতো ওর এই তুই-তুকারি করে বলাটাও ভালো লাগে না লোপার। জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল।

—রিকশ করে ফিরছিস, তোদের সেই চারুবালার কাছ থেকে বুঝি?

যে-রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে নামটা করল, লোপার পিত্তি জ্বলে যাবার দাখিল।

—হ্যাঁ। কি কথা আছে?

—চল, বলছি।

নদীর দিকে এগিয়ে চলল ও।

নিরুপায় লোপাও খানিকটা পথ এলো, তারপর দাঁড়িয়ে গেল।—আর যাব না, এখানে বলবে তো বলো।

বিলেও থামল। তারপর সরে এসে ওর ফেরার রাস্তা আগলে দাঁড়ালো।—কেন যাবি না?

—আমার খুশি। কি বলবে?

ঝাঁঝ সত্ত্বেও বিলে বেপরোয়া। চাউনিটা শুধু রুষ্ট নয়, লুব্ধও যেন। দু'চোখ লোপার মুখ ছেড়ে বুকের দিকেও নেমে এলো একবার।—তুই কাটতি দিয়ে চলেছিস আমাদের, আমরা বুঝি না, কেমন?

এ-কথা আগেও অনেকবার বলেছে। লোপারও মেজাজ ভালো করেই বিগড়লো। তবু স্থির গম্ভীর।—কাদের কাটতি দিচ্ছি, তোমাকে আর কাকে?

—আর বটুকদাকে। আমাকে ভগবান মেরে রেখেছে, বামুনের ছেলে হলে এতদিনে তোকে আমি দেখে নিতাম। তোর ডবল বয়স বটুকদার, তাকে এ-ভাবে অবহেলা করিস তোর লজ্জা করে না?

লোপা এখানে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছে।—বড় বাড় বেড়েছে, তোমার বটুকদার সঙ্গে খুব খাতির এখন, কেমন?

—আলবাৎ! তুই নেমকহারাম বলেই তার সঙ্গে তোর এই ব্যবহার। তোর জন্যেই তাকে চিনেছি আর যত দেখছি ততো অবাক লাগছে। দেমাকের চোটে তুই ভাবিস তোর জন্য বটুকদা অমন হা-হুতাশ করে? কাঁচকলা। তোর কে একটা দিদি ছিল তার জন্যে, তার কথা উঠলে বটুকদা রাগে কাঁপে আবার কেঁদেও ফেলে—তোকে অত দেখতে চায় তোর দিদির জন্যে—বুঝলি? আজ আমি কথা দিয়েছি তোকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব।

বিলের মুখে দিদির প্রসঙ্গ শুনে লোপা বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সামলে নিয়ে বলল, যেতে হয় আমি একাই যেতে পারব, আজ আমার সময় নেই, সরো—

বিলে ঝাঁঝিয়ে উঠল, তুই এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবি কি না?

ও বামুনের ছেলে হলে কি হত একটু আগে যে ডম্ফাই করেছে তার ওপর এই। লোপার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বিলে আবার জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গে যাবি না কেন? আমি খারাপ হয়ে গেছি?

—হ্যাঁ, খুব খারাপ হয়ে গেছ, কু-সঙ্গে মিশে মিশে খুব খারাপ হয়ে গেছ।

সঙ্গে সঙ্গে উদগত ব্যঙ্গ-ছটায় বিলের সমস্ত চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।—

—কি বললি? আমি কু-সঙ্গে মিশছি? আর নিজে তুই খুব সৎসঙ্গ করে বেড়াচ্ছিস? ওই যে মাস্টারনী তু করে ডাকলেই ছুটে যাস, তার চরিত্রখানা কেমন? ভুবন হালদার তার বারোটা বাজিয়ে দেয় নি? তুই তার সঙ্গে মিশিস কোন্ লজ্জায়?

মুহূর্তের মধ্যে শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথায় উঠে গেল লোপার।—খবরদার!

ওই মূর্তি দেখে বিলে নিমেষের জন্য থমকালো। মোক্ষম জায়গায় ঘা দিতে পেরেছে মনে হতে মুখ আরো বিকৃত করে হেসে উঠল।—তোর চোখ রাঙানির আমি থোড়াই পরোয়া করি। তুই ইচ্ছে করে চোখে ঠুলি বেঁধে বেড়ালে কি হবে—ওই চারুবালা মাস্টারনী আর ভুবন হালদারের কেচ্ছা সকলেই জানে।

এর পরেও বটুকদার কাছে নিয়ে যাবার জন্য বিলে ওর হাত ধরে টেনেছে। না পেরে বিকৃত রাগে চারুমাসির সম্পর্কে আরো কুৎসিত কথা বলেছে। না, লোপা আর বরদাস্ত করতে পারে নি। দুনিয়ায় এই একটি মাত্র মহিলাকে ও বুকের তলায় দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছে, বরদাস্ত করবে কি করে? বিলের মুখ বরাবরকার মতো থেঁতো করে দেবার জ্বলন্ত আক্রোশে সেই সন্ধ্যায় লোপা গোপালকাকার কাছে এসেছে। ওর আর ওর শিক্ষয়িত্রীর অপমানের কথা বলতে গিয়ে রাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলেছিল ও।

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে গোপালকাকা শুধু বলেছিল, আচ্ছা তুই বাড়ি যা।

পরদিন কলেজ যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়েই বিষম চমকে উঠেছিল লোপা আর তারপর অস্ফুট শব্দ করে আঁতকেও উঠেছিল।

ওই গাছটার আড়াল থেকে আচমকা ওর মুখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বিলে। খালি গা, সমস্ত মুখ ক্ষত-বিক্ষত। কপালের একটা দিক ফুলে ঢাউস হয়ে আছে, অন্য দিকে চোখের কোণ ধরে দগদগে ক্ষতচিহ্ন। কপালময় কালচে শুকনো রক্ত। দুটো কাঁধে আর পিঠের দিকে দাগড়া দাগড়া কালশিরে।

লোপা নিস্পন্দ।

বিলের দু'চোখ ওর মুখের ওপর আটকে আছে। জ্বলছে।—কি দেখছিস? বাবা ঠিক-ঠিক শাসন করেছে? খুশি হয়েছিস?...তোকে খুশি করার জন্যে কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত নিজের শুশ্রূষা করি নি। আরো খুশির খবর চাস? বাবা আমাকে বরাবরকার মতো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।...খুব খুশি তো?

হিসহিস কথাগুলো কানে যেন গলানো আগুন ঢালছিল। দু'চোখে ওর সমস্ত মুখখানা দগ্ধাতে দগ্ধাতে বিলে বিড়বিড় করে বলেছিল, এখন খুব আনন্দ কর্ গে যা—কিন্তু আবার তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে—হবে হবে হবে—

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি চলে গেল।

লোপা নিস্পন্দ কাঠ।

কিন্তু আজ?

নিরিবিলি এই জঙ্গলের পথে মোটরে ভুবন হালদারের পাশে আজ এ কাকে দেখল লোপা? এ কি দেখল?—বিলের বিদ্রূপ ভরা ক্ষত-মুখটা ওর চোখের সামনে থেকে সরছে না কেন?—এর পর জীবনে আর গোপালকাকা আর রাধকাকিমাকে ও মুখ দেখাবে কি করে?

—চারুমাসির সম্পর্কে বিলের সেই কুৎসিত কথাগুলো শোনার পব লোপার চোখ-কান আপনা থেকেই একটু সজাগ হয়ে উঠেছিল। চোখে কিছু না দেখুক দুই-এক কথা কানে এসেছিল। কিন্তু লোপার তখনো স্থির বিশ্বাস ভুবন হালদার গত বছর থেকে স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছে বলেই চারুমাসির সঙ্গে তার যোগাযোগ। স্কুলের সব থেকে করিৎকর্মা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এ যোগাযোগ স্বাভাবিক। ভুবন হালদারের চরিত্র জানে বলেই লোকে এটা-ওটা বলার সুযোগ পাচ্ছে—চারুমাসিকে জানলে তারা গর্তে লুকোতো।

...আজ ওর সব ধারণা সব বিশ্বাস সব শ্রদ্ধা ধূলিসাৎ।

কিন্তু ধূলিসাৎ হবার মতো আরো কিছু বাকি ছিল। আচমকা যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো আকাশের ক'দিনের ওই জমাট বাঁধা কালো মেঘগুলোর সঙ্গে তার মিল।

দিন ছয়েক পরের কথা। এর মধ্যে স্কুলের দারোয়ান মারফত চিঠি পাঠিয়ে চারুমাসি ওকে দেখা করতে বলেছিল। লোপা যায় নি।

ভিতরের ঘরে একটা বই খুলে বসেছিল। বসাই সার, ক'দিনের মধ্যে একটা ঘণ্টাও সুস্থির হয়ে পড়াশুনা করতে পারে নি।

বাইরে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে লোপা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একেবারে বাবার মুখোমুখি। সর্ব শরীরে প্রায় সেবারের মতোই লালচে আভা। তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে গোপালকাকা আর বিশ্বেশ্বর ডাক্তার। পিছনে আরো জনা দুই পরিচিত মুখ। মেয়েকে দেখেই কপিল চক্রবর্তী ক্ষিপ্ত আক্রোশে ওদের হাত ছাড়িয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল।—এই যে হারামজাদী, কালামুখী, আজ তোকে আমি খুন করে ফেলব, কেটে টুকরো টুকরো করে আজ তোকে আমি নদীর জলে ভাসিয়ে

দেব—ছাড়ো, ছাড়ো বলছি আমাকে তোমরা, ভালো চাও তো আমাকে একটা দা এনে দাও—এক্ষুনি ওকে শেষ করব—এক্ষুনি!

ওদিকের দাওয়ায় সরি পিসী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে, এদিকে লোপা।

ঘরে এনে একরকম জোর করেই কপিল চক্রবর্তীকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। জল-বাতাস করা হতে লাগল। লোপা তাড়াতাড়ি বেণু মহারাজের ওষুধ এনে গোপালকাকার হাতে দিল—কি হয়েছে কিছুই জানে না, তবু নিজে কাছে এগোতে সাহস করল না।

একটু বাদেই বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু গোপালকাকা ছাড়া আর সকলে চলে যেতে ঘটনা শুনে লোপা স্তম্ভিত।...চায়ের আড্ডায় ভুবন হালদার কি একটা হালকা টিপ্পনী কাটতে বাবা রেগে আগুন। তেড়ে মারতেই গেছল তাকে, বাধা পেয়ে যাচ্ছে তাই গালাগাল করছিল। তাই শুনে একঘর লোকের সামনে ভুবন হালদার বলেছে, তুমি তো আমাকে গালাগাল করবেই—আজ দু'বছর ধরে তোমার মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ টানছি, ওই ঘোষালের বাড়িতে তোমার মেয়ে যাতে ঢুকতে পারে সে চেষ্টাও আমাকেই করতে হবে—আমাকে তুমি গালাগাল না করলে আর কে করবে?

বাবা তক্ষুনি উঠে বাড়ির দিকে ছুটেছে, মেয়েকে কেটে টুকরো টুকরো করার আগে জলস্পর্শ করবে না।

রাত্রি তখন অনেক।

লোপা শিয়রের কাছে বসে আছে মূর্তির মতো, কপিল চক্রবর্তী মুখ তুলে তাকিয়ে অবাক প্রথমে।—কি রে তুই এ-ভাবে বসে আছিস?

—লোপা জবাব দিল না।

সকালের ঘটনা তক্ষুনি মনে পড়ল কপিল চক্রবর্তীর। মেয়ের দিকে চেয়ে দু'চোখে জলের আভাস চিকিয়ে উঠতে লাগল।—তুই আমার ওপর রাগ করেছিস?—তুই রাগ করলে আমার যে সর্বনাশ হয়ে যাবে রে, আমার আর কে আছে?

সচকিত হয়ে লোপা তাড়াতাড়ি জোরে জোরে মাথা নাড়ল। রাগ করে নি।

কপিল চক্রবর্তী আবার বলল, ভুবনের কথা শুনে হঠাৎ মাথার মধ্যে কি যেন হয়ে গেল আমার, ওকে যে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

—তোমাকে সহ্য করতে হবে না।

—কিন্তু ও যে বড় গলা করে বলল, রাজা ঘোষালের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে হলেও ওকেই মুরুব্বি ধরতে হবে!

—তাই যদি হয় তাহলে বিয়ে হবে না। তুমি ও নিয়ে ভেবো না।

মাঝে দুটো দিন গেছে, তার পরদিন রবিবার। বিকেলে বাইরে থেকে ফিরে ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই চারুবালা রায় থমকে দাঁড়াল। তার বন্ধ ঘরের সামনের রেলিংয়ে ঠেশ দিয়ে লোপা দাঁড়িয়ে।

কি একটা অস্বস্তি দূর করার চেষ্টায় চারুবালা জোরেই হেসে উঠল।—কি আশ্চর্য, তুই। আমি আরো ছেলেটা অপেক্ষা করছে ভেবে তাড়াতাড়ি চলে এলাম, নইলে আরো তো দেরি হতে পারত—তুই আসবি কি করে জানব!

ওদিকে ঘুরে দরজার তালা খুলছে। লোপা দেখছে। পরনে গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের শাড়ি, গায়ে ধপধপে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, পায়ে কালোর ওপর সোনালী বুটির স্যাণ্ডেল। কোথায় গেছল বা কোথা থেকে এলো আজ লোপা সেটা নির্ভুল অনুমান করতে পারে। চারুমাসি আরো কিছুটা মুটিয়েছে, ঝুঁকে তালা খোলার সময় কোমর আর বুকের দু'দিকের ভাঁজ চোখে পড়ার মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—আয়, বোস। ঘরের জানালা দুটো খুলে দিয়ে চারুবালা তার মুখোমুখি বসল। —তোর মুখখানা অত পাকা-পাকা গম্ভীর কেন?...সকালে রাজা খবর পাঠালো বিকেলে যেন থাকি, এর মধ্যে তুইও এসে হাজির, কিছু একটা মতলব আছে নাকি তোদের?

—না, আমি এক্ষুনি যাব।

গলার স্বর শুনে হোক বা মুখ দেখে হোক চারুবালা আবারও সচকিত একটু। পরক্ষণে ভ্রূকুটি করে উঠল।—দেব এক থাপ্পড়! সেদিন চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালাম এলি না কেন?

—কেন ডেকেছিলেন?

চারুবালা হেসে উঠল। এবারের হাসিটা সহজই ঠেকল। পরক্ষণে চোখ পাকিয়ে বলল, ভদ্রলোকের গাড়িতে সেদিন আমাকে দেখে তুই অমন হাঁ হয়ে গেছলি কেন? ...মাস্টারীতে জীবন শেষ করে দেবাব মতোই বয়েস গড়িয়ে গেছে ভাবিস নাকি আমার। ...ভদ্রলোক তোর মেসো-শ্বশুর হলে তখন কি করবি?

সমবয়সীর মতো আচরণ চারুবালার।...এক কালে এই টিচারের ভয়েই কাঁপত লোপা।

—আমি আপনার সম্পর্কে কিছু ভাবি নি। আমি একটা খবর জানতে এসেছি। ...দু'বছর ধরে আমার কলেজে পড়ার খরচ কে চালাচ্ছেন?

—ও, এই। এখনো হালকা মেজাজ চারুবালার।—তোর বাবার সঙ্গে সেদিনের ব্যাপারটা শুনলাম—দু'জনেরই মাথা খারাপ।

—মাথা শুধু আমার বাবার খারাপ। ওই স্টাইপেণ্ড ভুবন হালদার দিচ্ছেন, আপনি সেটা আমাকে জানাবারও দরকার মনে করেন নি কেন?

চারুবালার মুখের হাসি দ্রুত মিলিয়ে যেতে লাগল। তেমনি দ্রুত কঠিন রেখা পড়তে লাগল। উঠে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে—টনটনে আত্মসম্মান জ্ঞান হয়েছে, কেমন? কে তোমাকে দয়া করবে না করবে আগে সেই ফিরিস্তি দিতে হবে? ফের আমার সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলতে এলে—

না, আর আসব না। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে লোপাও উঠে দাঁড়াল।

...চারুবালা থমকে চেয়ে রইল একটু। তোর মতলবখানা কি, দু'বছর পার করে এখন তুই পড়া ছাড়বি নাকি?

জবাব না দিয়ে লোপা দরজার দিকে এগলো।

—শোন!

লোপা ঘুরে দাঁড়ালো। চারুবালার গলার স্বরে উদ্বেগ গোপন থাকল না।—এই একটা বছর যদি আমি তোর পড়ার খরচটা দিই?

লোপা চেয়ে রইল একটু, তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, এতদিন যিনি

দিচ্ছিলেন আপনাকে এখন আমি তাঁর থেকেও বেশি ঘৃণা করি।
চলে গেল। স্তব্ধ রোষে চারুবালা নির্বাক।
রাস্তায় পিছন ফিরে না তাকিয়েও লোপা অনুভব করলো দ্রুত পা চালিয়ে পিছনে কেউ এগিয়ে আসছে। রাজা ঘোষাল। ওদিকের মেঠো রাস্তা ধরে মাসির বাড়ির দিকে চলেছিল। তাকে দেখেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে লোপা হন-হন করে চলে যাচ্ছিল।
—লোপা! একটু দাঁড়াও!
দাঁড়ালো। কিন্তু ফিরে তাকালো না।
—কি কাণ্ড, এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন? এদিকে কোথায় এসেছিলে, মাসির কাছে?
জবাব না দিয়ে এবারে লোপা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো শুধু। রাজা ঘোষাল হঠাৎ বিমূঢ় যেন। লালচে মুখ। চোখে জল।
...কি হয়েছে?
তপ্ত মৃদু গলায় লোপা জবাব দিল, কিছু না। আমার পড়াশুনা এখানেই শেষ হয়ে গেল...তোমাদের বাড়িতে ঢোকার বাধাটা তাতে আরো পাকা-পোক্ত হল বোধহয়?
এই মূর্তি দেখে আর এই কথা শুনে রাজা ঘোষাল ঘাবড়েই গেল।—না, ইয়ে কি ব্যাপার...আমাকে বলবে না?
—যেখানে যাচ্ছ গেলেই জানতে পারবে।
আর দাঁড়ালো না, তেমনি দ্রুত এগিয়ে চলল।
পরদিন।
দুপুর গড়াবার আগে সরি পিসী গম্ভীর মুখে জানান দিয়ে গেল, বাইরে কে ডাকছে দেখ—
লোপা সচকিত। তক্ষুনি বুঝেছে কে ডাকতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই সমস্ত দুপুর ভিতরটা উন্মুখ হয়ে ছিল।
আস্তে আস্তে উঠে এলো। উঠোনের ও-ধারে বাঁশের গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। বেড়ার ও-ধারে তার জিপ দাঁড়িয়ে আছে।...ভিতরে ডেকে এনে সরি পিসীর বসতে বলা উচিত ছিল। কিন্তু এ উচিত কাজ পিসী করবে না জানা কথা।
দাওয়া থেকে নেমে লোপা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো।
বরাবরকার মতোই গম্ভীর রাজা ঘোষাল।—তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।
লোপা নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকালো।
রাজা ঘোষাল বুঝে নিল কথা এখানে দাঁড়িয়েই বলতে হবে।—কালকের কথা শুনলাম।...মাসির ওপর কাল তুমি খুব অন্যায় করে এসেছ। আমি জানি তিনি আমার থেকেও তোমাকে বেশি ভালবাসেন।
কানের দু'পাশ গরম ঠেকছে লোপার। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, সেই অন্যায়ের শাসনের উদ্দেশেই আসা হয়েছে কি না। চুপচাপ চেয়েই রইল।
—একটা বছর মাত্র বাকি, পড়াশুনা ছাড়া কোনো কাজের কথা নয়...খরচ যা লাগবে যদি আমি দিই? শুধু তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না অবশ্য...
লোপার ঝকঝকে দু'চোখ স্থির তার মুখের ওপর।...একজন জানবে।

—তোমার বাবা?

—তোমার মা। তাঁর হুকুম পেলে আমার আপত্তি হবে না।

লোপা ঘরের দিকে ফিরল। নিষ্পত্তির শেষ ঘোষণাটাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে যেন। খানিক বাদে জিপ চলে যাওয়ার শব্দ কানে এলো।

আট

লোপার মনে মনে বিশ্বাস, মুখোমুখি ফয়সালার এই ইন্ধন বাবাকে সরি পিসী যুগিয়েছে। আগে জানলে বাবাকে অন্তত লোপা কখনো ও-বাড়ি যেতে দিত না।

ও আজকাল কলেজ যাচ্ছে না বাবা লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ নিয়ে একটি কথাও জিগেস করে নি। তারপর কার সঙ্গে কি সলাপরামর্শ করেছে লোপা জানে না। ফলাফলটুকুই শুধু কানে এলো।

গোপালকাকাকে নিয়ে গতকাল বাবা সরাসরি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ঘোষাল বাড়িতে। ছেলে বাড়ি ছিল না, ছেলের মা ছিল। বাবা তার কাছেই গেছল। গিয়ে তেমনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করেছে। বলেছে তার শরীরের অবস্থা ভালো নয়, অতএব বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে ভালো হয়।

রাজা ঘোষালের মা ক্ষণপ্রভা ঘোষাল বলেছে, অপেক্ষা করতে হবে।

অপেক্ষার কথা শুনে বাবা আশান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, কত দিন?

ক্ষণপ্রভা ঘোষাল জবাব দিয়েছে, কতদিন তার জানা নেই, তার জীবিতকালে এ বিয়ে হবার আশা নেই।

বাবা তক্ষুনি উঠে এসেছে। অনুনয়ে যদি মন ভেজে সেই আশায় গোপালকাকা বসে ছিল। রাগে আর আক্রোশে মহিলা তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছে। বলেছে, সহায়সম্বলহীন একটা পাগলের মেয়ে গছানোর জন্যে সে এ-বাড়িতে এসেছে কোন সাহসে? বলেছে সকলে মিলে তার ছেলেটাকে এ-ভাবে বিগড়ে দিতে চেষ্টা করলে সে কাউকে ছাড়বে না, সকলকে দেখে নেবে। আর বলেছে এই সেয়ানা পাগলেরও ঘরের দুর্নাম তার কানে আসতে বাকি নেই।

লোপার তক্ষুনি মনে হয়েছে শেষের এই কুৎসিত ইঙ্গিত তার দেবতুল্য বাবা আর সরি পিসীকে নিয়ে। বাবা চলে আসার পরের খবর লোপা শুনেছে রাধাকাকীমার মুখ থেকে। বিলে নিখোঁজ হবার পর লোপা জীবনে আর ওমুখো হতে পারবে ভাবে নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে রাধাকাকীমাই ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে। তার মুখে রাগ বা ক্ষোভের চিহ্নমাত্র দেখে নি লোপা। উল্টে একটা বিশ্বাস দেখেছে। রাধাকাকীমা বেশ জোরের সঙ্গে বলেছিল, ছেলের এ-রকম শাসন দরকার ছিল, এতে শেষ-পর্যন্ত ওর ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। তার মুখেই শুনেছে বিলে এখন বটুকদার ঘরে তার সঙ্গেই থাকে।

সঙ্কোচ কাটার পরেও বেণু মহারাজের কুটিরে রাস্তায় গাড়িতে ভুবন হালদারের পাশে চারুমাসিকে দেখার ফলে লোপা আর এ-বাড়িমুখো হতে পারবে না ভেবেছিল। চারুমাসি সম্পর্কে কুৎসিত কথা শুনেই লোপার মাথায় আগুন জ্বলেছিল, আর সেই রাগেই ও গোপালকাকার কাছে নালিশ করেছিল।

ঘোষাল বাড়ি থেকে বাবা অপমানিত হয়ে আসার পর লোপা একবার গোপালকাকার বাড়ি না এসে পারল না। ওকে না জানিয়ে আধ-পাগল বাবাকে নিয়ে কেন হুট করে এ-ভাবে এগনো হল, মনে মনে সেই রাগও ছিল। সুযোগ পেলে রাধাকাকীমাকেই দু'কথা শুনিয়ে আসবে এবং সে-কথা গোপালকাকার কানেও যাবে।

কিন্তু ঘোষালগিন্নির উদ্দেশে কটুকাটব্যের ফাঁকে উল্টে রাধাকাকীমা যা শোনালেন, লোপা স্তব্ধ নির্বাক।

আকাশ কালি-বর্ণ কদিন ধরে। ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি নামছে। লোপার ভেতরটাও ওই আকাশের থেকে কম থমথমে নয়। নিজের চেষ্টায় পড়া চালানোর গোঁ চেপেছে মাথায়। পঁচিশ-তিরিশ টাকার একটা টিউশানি জোটাতে পারলেও সমস্যার সমাধান হতে পারে। কলেজের মাইনে আর পরীক্ষার ফী'য়ের ব্যবস্থা ওই থেকেই হয়ে যেতে পারে।

এই চেষ্টাতেই ঘোরাঘুরি করেছে। দুই-এক জায়গায় আশাও পেয়েছে। সামনে পুজো আসছে। সে-পর্যন্ত চালিয়ে দিতে পারলে ছুটির মধ্যে আরো ভালো করে চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু মাইনে না দিতে পারলে পুজোর আগেই কলেজ থেকে নাম কাটা যাবে।

আকাশের অবস্থা দেখেও লোপা আজও এই চেষ্টাতেই বেরিয়েছিল। বেরুবার সময় গম্ভীর মুখে পিসী একবার ওর দিকে তাকিয়েছে আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়েছে। মুখে একটি কথাও বলে নি। আজ ক'দিন ধরে পিসী এমনি গম্ভীর। ও কখন বেরোয় কখন ফেরে সেদিকে শ্যেন দৃষ্টি কিন্তু বাক্যালাপ নেই একটিও।

ফেরার পথে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ঝমঝম বৃষ্টি। লোপা দৌড়ে সামনের বড় একটা গাছতলায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার আগেই আধা-আধি ভিজে সারা। তাছাড়া এই তোড়ের বৃষ্টি গাছে আর কতটুকু আটকাবে?

অস্বস্তির একশেষ। এ-দিক ও-দিকের গাছতলায় যারা দাঁড়িয়ে আছে, বা ছাতা মাথায় যারা চলে যাচ্ছে, তাদের জোড়া জোড়া চোখগুলো যেন সব ওর গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। ভিজে শাড়ি ভিজে জামা বিচ্ছিরিভাবে গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে।

হঠাৎ বিষম ঝাঁকুনি একটা। ছাতা মাথায় উল্টো দিক থেকে এদিকেই আসছে একজন। বেশ দূরে হলেও লোপা চিনেছে তাকে। সেও দেখেছে ওকে।

গেজ রীডার বটুক তালুকদার।

তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে আড়াআড়ি মাঠ ভেঙে লোপা হনহন করে বাড়ির দিকে চলল। কিন্তু জলে এগনো দায়। ঝুঁকে তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেল জোড়া হাতে তুলে নিল। সেই ফাঁকেই দেখে দূরে ছাতা মাথায় বটুকদা দাঁড়িয়ে গেছে। এদিকেই চেয়ে আছে।

যে মূর্তিতে দাওয়ায় এসে উপস্থিত, নিজের দিকে নিজেরই তাকানো দায়। দরজার সামনে বাবা দাঁড়িয়ে। ওর জন্যেই চিন্তা করছিল হয়তো। দেখামাত্র দু'চোখ কপালে। —এ কি! অ্যাঁ? এই জলে কুকুর বেড়াল পর্যন্ত বেরোয় না আর তুই বেরিয়েছিস! ভালো হাতে একটা অসুখ বাধিয়ে একেবারে শেষ করবি আমাকে!

বাবার সমুখ থেকে লোপা সরতে পারলে বাঁচে। জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে চলে এলো। সেই ফাঁকে দেখল রান্নাঘরের দোর-গোড়া থেকে পিসীরও রক্ত-চক্ষু ওর সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে।

এত ভিজে লোপার শীত ধরে গেছে। শুকনো গামছা দিয়ে তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে ফেলল। জামা-কাপড়ের জলে ঘরের মেঝেও আর শুকনো নেই। এরপর ওটাও মুছতে হবে। সায়া ব্লাউজ বদলে আলনার শাড়িটা টেনে নিতেই ভেজানো দরজা ঠেলে সরি পিসী ঘরে ঢুকল। ওদিক থেকে বাবার গজগজানি কানে আসছে তখনো—মেয়ে হুটহুট করে কোথায় যায় কি করে ভেবে পায় না—এতই যদি সব স্বাধীন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার থাকা না থাকা সমান, এ-ভাবে চললে যে-দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে একদিন, ইত্যাদি।

লোপা ও-দিক ফিরে শাড়িটা পরে নিল। ওর হঠাৎ কেমন মনে হল বাবার এই অনুশাসনের অনেকটাই পিসীকে ঠাণ্ডা রাখার উদ্দেশে। ইতিমধ্যে পিসী নিশ্চয় অনেক কথাই শুনিয়েছে বাবাকে। ফলে এত ভেজা সত্ত্বেও পিসী এই থমথমে মুখে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লোপার মাথা গরম। যে-যার সঙ্কীর্ণ ভাবনা নিয়ে আছে, ওর মনের অবস্থা বুঝবে কি করে। শাড়িটা ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো।

—কোথায় গেছলি? আজ সরি পিসী কৈফিয়ত নিতেই এসেছে।

রীতিমতো চেষ্টা করেই নিজেকে সংযত করল লোপা।—কাজ ছিল।

—কাজ ছিল? এত কাজ ছিল যে সমস্ত আকাশ কালি করে আছে দেখেও বেরুতে হল তোকে?

—হ্যাঁ।

—দেখ লোপা, মুখ বুজে আমি কেবল তোব রকম-সকম দেখে যাচ্ছি। বড় বেশি বাড় বেড়েছে তোর। ধিঙ্গি মেয়ে, রাস্তার লোককে এ-ভাবে সব্ব অঙ্গ দেখিয়ে ঘরে ফিরতে তোর লজ্জা করল না? বলি কানের মাথা কি খেয়েছিস, এ-বাড়ির কথা নিয়ে এমনিতেই ঢি-ঢি চারদিকে, যে যেমন খুশি রটিয়ে বেড়াচ্ছে, তোর কি আক্কেল বলে কিছু নেই?

—খুব আছে। ধৈর্যের বাঁধ লোপারও ভেঙেছে। আজই হঠাৎ এই দুর্যোগে বটুকদার সঙ্গে দেখা না হলে এতটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটত কিনা বলা যায় না। লোকের রটনা সম্পর্কে একদিন ওই বটুকদা যে-কথা বলেছিল, কানের ভিতরটা জ্বলে যাবার দাখিল হয়েছিল ওর।...আর সেদিন রাধাকাকীমার মুখে শোনা এ-বাড়ির দুর্নাম প্রসঙ্গে রাজা ঘোষালের মায়ের ইঙ্গিতও ভোলবার নয়। লোপার ধারালো কঠিন দৃষ্টিটা সরি পিসীর মুখের উপর থেকে নিচের দিকে নামল একটু। তারপর আবার মুখের ওপর উঠে এলো।—এ-বাড়ির সম্পর্কে লোকে কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। বাবার সামনেও তুমি এ-ভাবে ঘোরাফেরা করো কেন—গায়ের জামা নেই তোমার?

একটা মোক্ষম আঘাতে সরি পিসী বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই সচকিত সন্ত্রস্ত। চোখের পলকে ঘাড় নীচু করে নিজের দিকেই তাকালো, তারপর দিশেহারার মতো এক-রকম ছুটেই পালালো ঘর থেকে।

রাতের আগে লোপা আর ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। দোর গোড়ায় বাবাব গলা কানে আসতে চমক ভাঙল যেন।—খিদে পেয়ে গেছে, আমাকে আজ তোরা খেতে-টেতে দিবি না কেউ, তোর পিসীই বা গেল কোথায়?

লোপা উঠে দরজার কাছে এগিয়ে এলো। রান্নাঘরে কুপি জ্বলছে কিন্তু দরজা দুটো

ভেজানো। পায়ে পায়ে সেদিকে গেল। দরজা খুলে দেখল বাবার আর ওর খাবারটা সাজানোই আছে। সরি পিসী রাতের রান্না সেরে নিঃশব্দে চলে গেছে।

বুকের ভিতরটা আরো বেশি খচখচ করতে লাগল লোপার। সেই থেকেই অনুতাপ হচ্ছিল ওর।...রাতটা উপোসে কাটবে পিসীর।

খেতে খেতে বাবাও অবাক একটু।—তোর পিসী কি এই বৃষ্টি মাথায় করেই চলে গেল নাকি?

লোপা জবাব দিল না।

খাওয়া থামিয়ে কপিল চক্রবর্তী মেয়েকে দেখল একটু। স্বল্প আলোয় কি দেখল সে-ই জানে। পিসী নেই বলেই হয়তো মন খুলে কথা বলতে চাইল।—কি রে, তোর মুখ এত শুকনো কেন...ঠিক মতো খাস-টাস তো?

লোপা সামান্য মাথা নাড়ল।

—তবে কি? পিসী খুব বকা-ঝকা করে বুঝি?

লোপা আবারও মাথা নাড়ল। করে না।

এবারে ঈষৎ অসহিষ্ণু কপিল চক্রবর্তী।—তাহলে তোর মুখ এত শুকনো কেন? আমি তো আছি, তোর ভাবনা কি? এই করে তোর শরীর খারাপ হলে আমি যাব কোথায় বল তো? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে—

এই শেষের কথাটা বাবা আজকাল প্রায়ই বলে। আর বাবার জন্যে লোপার তখন কত যে মায়া হয় সে-ই জানে। জবাব দিল, শরীর খারাপ হবে না, তুমি কিছু ভেব না।

ভালো করে সকাল না হতেই পিসী এসে হাজির হয় রোজ। পরদিন রোদ উঠে গেল তখনো তার দেখা নেই। অনুশোচনা সত্ত্বেও লোপার ক্রমশ রাগ হতে লাগল। ওকে চা করতে দেখে বাবা বলল, জলে ভিজে তোর পিসীর নিশ্চয় অসুখ করেছে, বাজারটা সেরে এসে একবার খবর নিতে হয়।

লোপা নির্বাক। বাবা চলে যেতে চুপচাপ ভাবল একটু। চান করতে হবে। তারপর ঠাকুরঘরে যেতে হবে। তারপর রান্না চড়াতে হবে।

পিঠের ওপর ভিজে চুলের বোঝা ছড়িয়ে চন্দন ঘষছিল।

সামনের রেকাবীতে ফুলবিল্বপত্র। বেণু মহারাজার কথামতো কিছুদিন হল শিবপূজা শুরু করেছিল। ওই পাথরের শিবলিঙ্গও সরি পিসীই এনে দিয়েছিল ওকে।

অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ মনে হল পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখে সরি পিসী। পরনে স্নান-সারা ধোয়া কাপড় আর গায়ে মোটা জামা। থমথমে মুখ। দুচোখ দিয়ে যেন ভস্ম করবে ওকে।

গলা দিয়েও যেন চাপা আগুন ঝরল পিসীর। বলল, তুই নিজে এখন এ-বেশে আছিস কেন? গায়ে জামা পরিস নি কেন? তোর লজ্জা করে না?

লোপা হতভম্ব হঠাৎ।—এখানে কে আছে?

প্রচণ্ড রাগে আঙুল তুলে শিবলিঙ্গ দেখিয়ে দিল, ওই যে যার সামনে বসে আছিস সে নেই? সে দেখছে না? তোর বাবা দেখতে জানলে সে দেখতে জানে না?

লোপা হাঁ করে চেয়ে আছে। কিন্তু চোখের কোণদুটো সিরসির সিরসির করছে।

হঠাৎ উঠে চন্দনঘষা দুই হাতেই গলা জড়িয়ে ধরল সরি পিসীর। বলে উঠল, পিসী আমাকে তুমি মারো মারো—আমি খুব খারাপ, খুব খারাপ!

সরি পিসীর চোখের তাপ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, সেখানে জল চিকচিক করছে। নিজের অগোচরেই ওর গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

—ছাড়, রান্নার কি হবে দেখি।

নয়

ঘরের মধ্যে লোপাই হতচকিত সব থেকে বেশি। নিজের কান দুটোকেই বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। না-কি দিনকে দিন বাবাব মাথার অবস্থা যে-রকম হয়ে উঠেছে, কি শুনতে কি শুনে নিজের মনে যা আছে পিসীকে তাই বলছে! এ-রকম তাজ্জব সংবাদ লোপা বিশ্বাস করবে কি করে?

বাজারের থলে দাওয়ার ওপর ফেলে উত্তেজিত গলায় সরি পিসীকে বাবা বলছে, লোপার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, রাজার মা রাজি হয়েছে—গোপাল বলল, যত তাড়াতাড়ি পারো লাগিয়ে দাও! এখন আমি কি-যে করি, জমি-জমা বিক্রি করতে হবে, কেনাকাটা করতে হবে, কত ব্যাপার আছে—গোপাল বললেই আমি হুট করে বিয়ে দিই কি করে!

ঘরের মধ্যে লোপার নিঃশ্বাস রুদ্ধ। ওদিকে পিসীও বোধ হয় বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করল, সে জানল কি করে?

—কে জানল, গোপাল? ওই রাজাই তো তাকে বলেছে! আমার কাছেও শিগগীরই আসবে শুনলাম। এ-দিকে আকাশে যে দুর্যোগ লেগে আছে এ-সময় জমি-জমা চট করে কেউ কিনতেও চাইবে না...গোপাল অবশ্য বলেছে এত ভাবনা-চিন্তা না ক'রে লাগিয়ে দাও—

অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য যেন একটা, সরি পিসী সাগ্রহে বলে উঠল, ঠিকই বলেছে, জমি না-হয় পরেই বিক্রি হবে, যা লাগে এখন সেই চালিয়ে দিক—

—দেবে না?...মেয়েটাকে ও খুব ভালবাসে, এ ব্যাপারে চাইলে ঠিক দেবে, তাই না? বাবার প্রত্যাশা-ভরা প্রশ্ন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দেবে, না-দিলে ও-কথা বলত না। না হয় আমিই গিয়ে ধরব তাকে...তাছাড়া গয়না-পত্র তো আমার কিছু আছেই, সে-সব ভেঙে গড়িয়ে দিলেই হবে। ...কিন্তু খবরটা ঠিক তো?

—ঠিক, খুব ঠিক। বলতে বলতে বাবা ঘরে এলো। লোপার মনে হল আনন্দ উদ্বেগ দুশ্চিন্তা সব যেন একসঙ্গে বাসা বেঁধেছে ওই মুখে।...সেই সঙ্গে হয়তো কাতরতাও একটু। ওকে দেখে হাসতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে বলল, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল...রাজার মা রাজি, ব্যস, আমি নিশ্চিন্ত।

ওই নিশ্চিন্ত মুখ দেখে লোপার হঠাৎ কান্না পাওয়ার দাখিল। তাড়াতাড়ি ও নিজেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিস্ময়ের অন্ত নেই ওর। যদিও মনে মনে স্থির বিশ্বাস, একদিন বিয়ে ওর ওখানেই হবে। তবু মাত্র ক'টা দিন আগে যে-মহিলা সরোষে ঘোষণা করেছে তার জীবিতকালে

এ বিয়ে হবে না—এই নিয়ে বাবাকে অপমান করেছে—এরই মধ্যে তার মনের পরিবর্তন হয়ে গেল!

...ওই ছেলে তার মা-কে জোর করে রাজি করিয়েছে? কিন্তু ভেতর থেকে তাতেও সায় মিলছে না। সে-ও সম্ভব ভাবতে পারছে না। ফলে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি থিতিয়ে উঠছে। কেবলই মনে হচ্ছে কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটে থাকবে, নয় তো ঘটবে।

দুপুরে লোপা ইদানীং বাবাকে বেরুতে দিচ্ছিল না। বেণু মহারাজের ওষুধ খাইয়ে জোর করে শুতে পাঠাতো। আজ তাকে ধরে রাখা গেল না। তার এখন কত কাজ, কত দায়িত্ব। গোপালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, জমি-জমা কিছু বিক্রি করা যায় কিনা সে-চেষ্টা করতে হবে। সাধ করে কে আর ঋণী থাকতে চায়। বেলা চারটে নাগাদ সরি পিসীও মায়ের বাড়ি পুজো দিতে বেরুলো, মা এত সহজে মুখ তুলে তাকাবেন সে-কি ভাবতে পেরেছিল!

লোপার কিছুই ভালো লাগছিল না। এরই মধ্যে এতটা তৎপরতা মনঃপূত নয়। বাইরে একটা জিপ থামার শব্দ কানে আসতে সচকিত। এক-পা দু-পা করে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো।

ওকে দেখে রাজা ঘোষাল হাসতে চেষ্টা করে এগিয়ে এলো।—তোমার বাবা আছেন তো?

চোখে চোখ রেখে লোপা মাথা নাড়ল। নেই।

...তাহলে কে আছেন, পিসী?

লোপা তেমনি চেয়ে থেকে আবার মাথা নাড়ল। কেউ নেই শুনে আজ অন্তত খুশি হবার কথা, কিন্তু তার বদলে ঈষৎ বিব্রত মুখ দেখছে যেন লোপা।

...ও। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত। ইয়ে...শুনেছ তো?

জবাব না দিয়ে লোপা এবার ডাকল তাকে, ভিতরে এসো।

ও-ই আগে বাবার ঘরে ঢুকল। অগত্যা পিছনে রাজা ঘোষাল।

—বোসো।

বাবার শয্যা-বিছানো চৌকিতে বসল। হাত তিনেক তফাতে লোপা দাঁড়িয়ে।

—মা হঠাৎ রাজি হলেন?

জিজ্ঞাসা করা মাত্র লোপার মনে হল এই জেরাই যেন এড়াতে চেয়েছিল। তবু হাসি মুখেই রাজা ঘোষাল জবাব দিল, হ্যাঁ, কাল রাতে আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেখানে খুশি বিয়ে করতে পারি।

লোপার দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। অপেক্ষা করল একটু।—তুমি তাঁকে কিছু বলেছিলে?

—না।...তবে এখানে ছাড়া আর কোথাও বিয়ে করব না সেটা তিনি জানেন।

লোপা নিষ্পলক চেয়ে আছে তেমনি।—কেন করবে না, মায়ের এতটা অবাধ্য হবে কেন...তোমার বাবার কথা রাখার জন্য?

এই প্রশ্ন শুনে রাজা ঘোষাল যেন ভিতরে ভিতরে খুশি একটু। ওর মুখের ওপর দু'চোখ একবার বুলিয়ে নিয়ে হালকা সুরেই জবাবটা দিল।

—না। আরো অনেক বছর আগে থেকেই মনে মনে তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছি

বলে।...একমাত্র তোমাকে ছাড়া কাউকে আমার ভাল লাগবে না বলে। ঘর থেকে যদি না পালাও তাহলে আরো বলতে পারি কেন।

লোপাও এই প্রথম হেসেই ফেলল একটু।—থাক।...মা রাজি হলেন কেন, তোমার মন বুঝে?

রাজা ঘোষাল যদি একটু মিথ্যে বলতে পারত, মুখে না বলে একটু যদি মাথা নেড়েও সায় দিতে পারত...ভবিষ্যতের চিত্রটা অন্যরকম হত বোধ হয়। কিন্তু তার বদলে আবার বিব্রত মুখ তার।

বলল, না, ঠিক অতটা সহজ মানুষ নন তিনি...কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক।

সঙ্গে সঙ্গে লোপার মনের তলায় একটু আগের সংশয় ধারালো হয়ে উঠল। মুখের হাসির আভাসটুকু মুছে যেতে লাগল।—এত আপত্তির পরে হঠাৎ তিনি রাজি হলেন কেন আমার জানা দরকার...

ওই মুখে যা কখনো দেখে নি তাই যেন দেখল লোপা। চাপা বিরক্তি, চাপা উত্তেজনার আভাস। বলে উঠল, কেন দরকার? শুনে মাঝখান থেকে দুঃখ পাবে শুধু —বিয়েটা হচ্ছিল না বলে আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম, মা রাজি হয়ে গেছেন, ব্যস, তার বেশি আর আমাদেব জানার দরকার কি?

লোপার দু'চোখ তার মুখের ওপর আরো স্থির। একই কথার পুনরুক্তি করল। —দরকার আছে। এত আপত্তির পরে মা হঠাৎ রাজি হলেন কেন?

—ভয়ে। জবাবটা যেন ঝপ করেই দিয়ে বসল রাজা ঘোষাল।

না, লোপা ঠিক এই জবাব আশা করে নি। চেয়ে আছে, দেখছে।

—কার ভয়ে?

—ভুবন হালদারের আর চারুমাসির।

এরপর কি শুনবে লোপা? কোন রহস্যের জট খুলবে? ও কি এখানেই চুপ করে যাবে? তাও পারা গেল না।—ভয় কেন?

—দুর্নামের। এ প্রসঙ্গ থামাতে শেষ চেষ্টা করল রাজা ঘোষাল।—বিয়ের পর সবই জানতে পারবে, এখন থাক না...

কিন্তু শেষের কথা লোপা শুনতেও পেল না যেন।—কিসের দুর্নাম?

হাল ছেড়ে রাজা ঘোষাল জবাব দিল, আমাদের সংসারের।...মা ভয়ঙ্কর রাগী মানুষ, রাগ হলে এখনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বাবাকে খুব গঞ্জনা দিতেন। বাবা চারুমাসিকে খুব স্নেহ করতেন বলে সেই গঞ্জনা বেড়েই চলেছিল। মাসির কাছ থেকে ফেরার পর মা একদিন খুব বাড়াবাড়ি করতে বাবা সেই রাতেই আত্মহত্যা করে বসলেন।

লোপা স্তব্ধ, নির্বাক খানিকক্ষণ। বিবর্ণ মুখ।—তুমি জানতে?

—না। অনেক পরে চারুমাসির কাছে শুনেছি।...মায়ের সঙ্গে বাবার সেই থেকে রাগারাগি চলছিল টের পাচ্ছিলাম। বেশি রাতে মায়ের চিৎকারে ঘুম ভাঙতে ছুটে গিয়ে দেখি বাবার শেষ অবস্থা। ডাক্তারের বদলে মা আমাকে ছুটে গিয়ে ভুবনকাকাকে ডেকে আনতে বলল—বাড়ির কাছেই বাড়ি। তখন ভুবন হালদারের সঙ্গে আমাদের খুব খাতিরও ছিল। তাকে ডেকে এনে দেখি সব শেষ। ভুবন হালদার বেরিয়ে গিয়ে তবু বিশ্বেশ্বর ডাক্তারকে ডেকে আনল। সে ডেথ-সার্টিফিকেট দিল, বেশি ব্লাড-প্রেসারের দরুন মৃত্যু।

সকলে তাই জানল, আমিও।...আমার অনেক দিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, ওই রাতের রাগারাগির ফলেই অঘটন ঘটেছে, ব্লাড-প্রেসার বেড়েছে, রাগ করে মা-কে বলেও ছিলাম সে-কথা।

লোপা স্তম্ভিত, স্তব্ধ তেমনি।

একটু থেমে রাজা ঘোষাল এবার নিজে থেকেই বলল, তার পরই চারুমাসির সঙ্গে একটু খাতির হতে দেখেছে ভুবন হালদারের। তারপর থেকে মাসির প্রতিজ্ঞা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেই...বাবার ইচ্ছের কথা মাসিও জানত। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলেও এই নিয়ে সেই থেকে মায়ের সঙ্গে মাসির রেষারেষি।

এতটা বলার দরকার ছিল না। লোপা বুঝতে পারছে এখন।—কিন্তু এতদিন বাদে তাঁর দুর্নামের ভয় কেন?

—ভুবন হালদার এসে মা-কে বলে গেছে এ-বিয়ে না হলে বাবার মৃত্যুর আসল কারণটা লোকে জানবে। বিশ্বেশ্বর ডাক্তারের যে মুখ একবার টাকা খাইয়ে বন্ধ করানো হয়েছে, টাকা খাইয়ে আবার সেই মুখ খোলানোও যাবে। তার আর কিছু না হোক, এ-বাড়িতে মেয়ে যাতে কেউ দিতে না আসে সেই ব্যবস্থা করা যাবে।...মা হঠাৎ রাজি হতে আমি মাসির কাছে গেছলাম, সেখানে শুনলাম।

সমস্ত মুখ থমথমে গম্ভীর লোপার।—মা কেন রাজি হয়েছেন সব জেনেও তাহলে এ-সুযোগ নিতে আপত্তি নেই তোমার?

—সুযোগ বলছ কেন, মায়ের আপত্তির সত্যি তো কোনো মানে হয় না।

—মানে যে হয় না তুমি কোনদিন তাঁকে সে কথা বলতে পারো নি।...এরপর আমাকে তিনি কি চোখে দেখবেন তাও তুমি চিন্তা করো নি।

—সে জন্যে ভেবে কি হবে, বেশি অসুবিধে হয় তোমাকে নিয়ে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যাব। মোট কথা, আমার মুখ চেয়ে ভাবো একটু, যা কবার আমার মুখ চেয়ে কবো, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

লোপা চুপচাপ রইল খানিক, তারপর বলল, হ্যাঁ যা করার তোমার কথা ভেবে আর তোমার মুখ চেয়েই করব।

গত কটা দিনের মতো পরদিন দুপুরেও আকাশ মেঘলা। এক-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে আর থামছে।

দরজা খুলেই ক্ষণপ্রভা ঘোষাল অবাক প্রথমে। দেখা-মাত্র চিনতে পারে নি। সেই কবে ফ্রক-পরা দেখেছিল। কিন্তু চিনতে সময়ও লাগল না। ঘরের মধ্যে দু'পা পিছিয়ে গেল মহিলা। বাইরের কেউ দেখুক ইচ্ছে নয়। সমস্ত মুখে কঠিন রেখা পড়েছে একের পর এক। এত দুঃসাহসও কল্পনা করতে পারছে না।

শান্ত মুখে কাছে এসে লোপা নত হয়ে পায়ের ধুলো নিল।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে ক্ষণপ্রভা ঘোষাল জিজ্ঞাসা করল, তুমি যে...?

হ্যাঁ, আপনাকে দুটো কথা না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। শুনলাম আমাকে আপনি ঘরে নিতে রাজি হয়েছেন...কেন রাজি হয়েছেন তাও জেনেছি। আপনাকে ভয় যাঁরা দেখাচ্ছেন, তাঁদের আপনি দয়া করে বলে দেবেন, যার জন্যে তাঁরা এতটা করেছেন

সে গরীবের মেয়ে হলেও তারও একটু আত্মসম্মানবোধ আছে। বলবেন, কারো ভয়ের সুযোগ নিয়ে এ-বাড়িতে ঢুকতে তার আপত্তি আছে। আমার বিশ্বাস, আমি একথা বলেছি শুনলে আর তাঁরা আপনাকে বিরক্ত করবেন না।

ক্ষণপ্রভা ঘোষাল শুনলেন। নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে দেখলেন আরো খানিক।—তা হলে এ বিয়ে হবে না বলছ?

—এ-ভাবে হবে না।...ছোটবেলা থেকে আমার মা নেই, আপনি মেয়ে বলে যেদিন ডাকবেন সেদিনই আমি ছুটে আসব। ভিতর থেকে কিছু চোখের দিকে ঠেলে উঠছে মনে হতেই লোপা ঈষৎ বেগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ক্ষণপ্রভা ঘোষাল হঠাৎ বিমূঢ় একটু।

বৃষ্টি, বৃষ্টি বৃষ্টি।

বৃষ্টির বিরাম নেই আর। সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। নানা জায়গা থেকে দুর্যোগের খবরও আসছে। রঙিলা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মাটির চাদোয়া দেওয়ালের ওপর ক্রমাগত ছোবল বসাচ্ছে।

কপিল চক্রবর্তীর মাথাখানা এই দেখে যেন আরো বিগড়ে গেছে। কেবলই একটা বড় কিছু অঘটনের আঁচ পাচ্ছে সে। আর লোককে সেই কথা বলছে। এই অঘটনের কথা ভেবেই কবে মুখ্যমন্ত্রী আর অন্য মন্ত্রীদেরও কি বলেছিল আর কি প্ল্যান দিয়েছিল —সেই কথা মুখে লেগেই আছে। এই উত্তেজনার মধ্যেই মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা। এ-রকম হতে থাকলে কি দিয়ে কি করবে সে! সেদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে লোপা ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেছিল। তারপর দেখে বাবা ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে।

সেই সকালেই লোপা বাবাকে ধমকেছে, বিয়ের জন্য তোমাকে এখন কিছু ভাবতে হবে না, কিছু করতেও হবে না, বিয়ের দেরি আছে।

—দেরি আছে মানে! রাজার মা তো রাজি হয়েছে!

—না, তাঁর আরো অনেক কিছু ভেবে দেখার আছে। মোট-কথা এ নিয়ে তোমার এখন কিছু চিন্তা করার দরকার নেই।

শুনে দুর্বোধ্য বিস্ময়ে মেয়ের দিকে চেয়ে থেকে পরে কপিল চক্রবর্তী হেসেছে। শোনো কথা, আমার মেয়ের বিয়ে, আমি ভাবব না ও ভাববে!

এর দিন তিনেক বাদে বাইরে না হোক ওই পরিবারের মধ্যে এক কল্পনাতীত দুর্যোগই নেমে এলো বুঝি। হঠাৎ বাবার উত্তেজিত গলা শুনে লোপা ঠাকুরঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো।

বাবার ঘরের দোর-গোড়ায় সরি পিসী দাঁড়িয়ে। পাংশু মুখ। ঘরে বাবার সামনে গোপালকাকা বসে। তারও বিমর্ষ মুখ। ওকে দেখেই বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠল, শুনলি লোপা? ওদের সব ভাঁওতা বাজী, বুঝলি? আসলে ওরা এখানে বিয়ে দেবেই না! নইলে একটা উড়ো চিঠিতে কি হয়—ও-রকম শত্রুতা তো যে কেউ করতে পারে।

লোপা নিস্পন্দ হঠাৎ।

পরে যা শুনল তার সার মর্ম এ-বাড়ির নামে কুৎসা রটিয়ে আর ঘোষাল-বাড়ি

সম্পর্কেও কটাক্ষ করে কে একটা উড়ো চিঠি ছেড়েছে। সেটা হাতে পেয়ে ক্ষেপে গিয়ে রাজা ঘোষালের মা গোপালকাকাকে বাড়িতে ডেকে এনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে বিয়ে হবে না। তার সামনেই ছেলেকে শাসিয়েছে, এর পরেও সে যদি এখানে বিয়ে করবে ভেবে থাকে, তাহলে তার মা আত্মহত্যা করার পরে যেন করে।

চাঁদোয়া বাঁকের ও-ধারে একটা জিপ দাঁড়ানোর কথা। দাঁড়িয়ে আছে। লোপার সেখানে যাবার কথা।...আপসি থেকে লোক মারফত চিরকুট পাঠিয়েছিল, অবশ্য যেন আসে, সে অপেক্ষা করবে।

বৃষ্টি পড়ছে না। কিন্তু আকাশ কালো হয়ে থমকে আছে।

লোপা কাছে আসতে রাজা ঘোষাল চালকের আসন থেকে নেমে এলো।

—শুনেছ?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে রাজা ঘোষাল বলল, তুমি সেদিন মায়ের কাছে যাবার পর থেকে মা অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল।

—চিঠিতে কি লিখেছে?

—তোমার এক দিদির সঙ্গে ওই গেজ-রিডারের কি নাকি সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটেছিল।...তারপর তোমার বাবা আর পিসীকে নিয়েও লোকের সন্দেহের কথা—সবশেষে কোন গোপনতা ফাঁস হবার ভয়ে মা রাজি হয়েছিল সেই কথাও। শেষে শুভার্থীর মতো পরামর্শ দিয়েছে, এ বিয়েতে যেন মা আর না এগোয়।

দিদি আর গেজ-রিডারের কথা শুনেই লোপার মুখ আরো থমথমে। সেই সঙ্গে চাপা উত্তেজনাও।—চিঠিটা আমাকে একবার দিতে পারো?

কে এই শত্রুতা করল তুমি বুঝতে পারছ নাকি?

সামান্য মাথা নেড়ে অস্ফুট স্বরে লোপা বলল, বটুকদা নিজেই...চিঠিটা আনতে পারবে?

—চিঠি আমার সঙ্গেই আছে। জামার পকেট থেকে খামটা বার করে ওর হাতে দিল।

মুখে রক্ত জমাট বাঁধছে লোপার। খাম থেকে চিঠি বার করে খুলল সেটা।

—এ কি! অস্ফুট আর্তনাদ পরক্ষণে। হাত আর চোখে যেন সাপের ছোপল খেয়েছে। চিঠি আর খাম দুই-ই মাটিতে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখ সাদা একেবারে।

রাজা ঘোষাল ঘাবড়েই গেল। কি হল, অন্য কারো লেখা নাকি?

...বাবার। নিজের অগোচরেই কথাটা বেরিয়ে এলো। তার পরেই দু হাতে মুখ ঢেকে লোপা বাড়ির দিকে ছুটল।

বাড়ি ফিরেও লোপা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাবার ঘরে যেতে পারে নি। সমস্ত মুখ বিবর্ণ, বুকের ভিতর থরথর কাঁপুনি। বাবা থেকে থেকে হাঁক দিয়ে ডাকছে ওকে।

শেষে যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত করে লোপা পায়ে পায়ে বাবার ঘরে এলো।

— এই যে, এতক্ষণ ছিলি কোথায়...ও-কি! এ-রকম মুখ কেন তোর? কান্নাকাটি করেছিস বুঝি?

লোপা লক্ষ্য করল বাবার মুখখানাই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে। আস্তে আস্তে কাছে এসে মাথা নাড়ল, কাঁদে নি।

—কেন কাঁদবি! আমি আছি না, আমি কি মরে গেছি নাকি? বিয়ে যদি না-ই হয় আমরা মা-ছেলেতে থাকতে পারব না। খুব—খুব পারব, কি বলিস?

প্রাণপণে লোপা একটু হাসতেও চেষ্টা করল। আবারও মাথা নাড়ল। পারবে।

খুশি। কিন্তু এই খুশির মিয়াদ বড় অল্প। কি মনে পড়তে আবার যেন যাতনাবিদ্ধ। —ইয়ে শোন, ওই-রকম চিঠি পাঠিয়ে বিয়ে ভাঙান দেওয়া খুব খারাপ, একশবার খারাপ। আমার মেয়েকে কি আমি চিনি না। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম আমাব দিক থেকে ভালোই হয়েছে—তুই চলে গেলে আমি থাকব কি করে, বাঁচব কি করে? খারাপের মধ্যেও এ-ই ভালো...তোর পিসী এই চিঠিটা পেয়ে একেবারে বিগড়ে গেল। ভালো দিকটা দেখতে জানে না—চিঠি দিয়ে যে শত্রুতা করেছে ও তাকে কেবল শাপ-মন্যিই করছে...কিন্তু তুইও তাই করছিস না তো?

লোপাব দু'চোখ ফেটে জল আসছে। কিন্তু আসতে দিচ্ছে না, ওই কান্না আবার ভিতরেই ঠেলে পাঠাচ্ছে। জোরেই বলে উঠল, না বাবা, কি-চ্ছু করছি না, যা হয়েছে খুব ভালো হয়েছে, আমি বরাবর তোমার কাছে থাকতে পারব—পিসী কি-চ্ছু বোঝে না, আমি বারণ করে দেব আর যেন ও-বকম না করে।

...ওর দিকে চেয়ে বাবা হাসছে এবারে। নিঃশব্দ হাসি। সেই হাসি সমস্ত মুখে আর চোখে ছড়াচ্ছে যেন। আর তাই দেখেও লোপার বুকের ভেতরটা যেন ত্রাসে শুকিয়ে যাচ্ছে।

দশ

...মুখ্যুর দল, এখন আমার পিছনে কেন সব? আগে যে এত বললাম, বলে বলে গলা ফাটালাম, তখন ওই দুটো করে কান কোথায় বাঁধা রেখেছিলে বাছাবা? আমাকে চিনতে পেরেছ তোমরা? আমি মনু—শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের আমি মনু, মৎস্য-শিশুরূপী ভগবানকে আমি রক্ষা করেছিলাম, লালন করেছিলাম—প্রথমে তাকে মাটির পাত্রে রেখেছিলাম, বড় হতে পুকুরে দিয়েছিলাম, বিশাল বড় হতে সাগরে ছেড়ে দিলাম। যাবার সময় সে বলে গেছল মহাপ্লাবনে মেদিনী ডুবে যাবে, সৃষ্টি রসাতলে যাবে, এখন থেকেই নৌকো তৈরি করো, সঙ্কটের সময় ওই নৌকোয় আশ্রয় নেবে আর আমাকে স্মরণ করবে—আমি এসে তোমাকে রক্ষা করব।

কিন্তু এই শেষ সময়ে আমি তোমাদের জন্য কি করব। আমার ছোট নৌকো, মেয়ে আছে, সরি আছে—আর লোক ধরবে কি করে? কুলোবে কি করে?

এই দুর্যোগেও মজার খোরাক যোগাচ্ছে কপিল চক্রবর্তী। জলে ভিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে। কাছে দূরে ছাতা মাথায় দিয়ে শুনছে অনেকে, অনেকে রাস্তার দু'দিকের আলসের নিচে দাঁড়িয়ে। শুনছে আর হাসছে।

পাশেই একটা জীপ এসে দাঁড়াল। দু'জন লোক একরকম টেনেই জীপে তুলল তাকে। তাদের একজন রাজা ঘোষাল। ওকে চেনা মাত্র গর্জন করে উঠল কপিল চক্রবর্তী। —তুমি! না, না, ওই নৌকোয় তোমার জায়গা হবে না, হবে না হবে না!

বাড়ি। গা-মাথা মুছে দিয়ে ভিজে কাপড় বদলে লোপা আর সরি পিসী তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। এই নিয়ে তিন দিন এই ব্যাপার হল। তিন দিনই ওই একজন কোথা থেকে তাকে তুলে এনে বাড়িতে রেখে যাচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে হি-হি করে হাসছে কপিল চক্রবর্তী। বলছে রঙিলা কত রঙ্গ করবে এবার ওরা কেউ জানে না। কি-চ্ছু জানে না। আমার কথা বিশ্বাসও করে না। মরবে, মরবে সব। আরে এ-বারেও যে দেবী দুর্গা ঘোটকে আসছেন যাবেনও ঘোটকে। সেবারের কথা মনে নেই, সেই অনেক বছর আগের কথা? মা দশভুজা ঘোটকে এসেছিলেন ঘোটকে গেছলেন? গোটা দেশটাই তারপর জলের তলায়—মনে নেই রে সরি?

এ-সব প্রলাপ শুনলেও লোপার ইদানীং বুক কাঁপে কেন? অঘটনের ছায়া পড়ে কেন? উচ্ছল রঙিলার দিকে তাকাতে ভয়-ভয় করে কেন?

অবিরাম দুর্যোগ চলছে ক'দিন ধরে। লোপা বাবাকে সকালের কাগজখানাও পড়তে দেয় না। লুকিয়ে রাখে। কাগজ খুললেই দিকে দিকে শুধু বন্যার খবর আর ঝড়ের খবর আর ধসের খবর।

এগারো

বন্যা বন্যা বন্যা। সর্বগ্রাসী বন্যা। সে এসেছে আচমকা, অতর্কিতে। এসেছে রাতের গভীর অন্ধকারে। দিনমানে রঙিলার ভয়াল ভ্রূকুটি দেখেও কেউ বিশ্বাস করে নি এমন বিশ্বাসঘাতিনীর মতো সুপ্ত শহরটাকে এ-ভাবে গ্রাস করতে আসবে। কেউ বোঝে নি সমস্ত অস্তিত্ব ডুবিয়ে দেবার উল্লাসে এ-ভাবে মেতে উঠবে।

না না না, লোপা বিশ্বাস করছে না, বিশ্বাস করবে না। স্বপ্ন—এ স্বপ্ন ছাড়া আর কি? সেই একবার যেমন স্বপ্ন দেখেছিল এও ঠিক সেইরকমই একটা দুঃস্বপ্ন। সে-তবু ছিল ভোররাতের দুঃস্বপ্ন—এ-তো একেবারে মাঝরাতের। রাত কত এখন? কিন্তু বার বার পা ঘষটেও ও বিছানাটা পাচ্ছে না কেন?...ও কিসের গর্জন, এত গর্জন কিসের? বার বার ওর দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন—ও-তো জানে স্বপ্ন এটা, তবু এ-রকম হচ্ছে কেন? সত্যি সত্যি এত জল খাচ্ছে কেন? স্রোতের মুখে কুটোর মতো ও-কি সত্যিই ভেসে চলেছে নাকি।

না, পায়ের নিচে তো মাটি নেই। কেবল জল আর জল। চারদিক রাতের অন্ধকারে মোড়া, কেবল সাঁ-সাঁ সাঁ-সাঁ শব্দ। আর কেবল জল আর জল। এ কেমনধারা স্বপ্ন। চাঁদমারিটাই বা কোথায়? সেখানে যে লোকের দাঁড়িয়ে থাকার কথা সে-ই বা কোথায়?

না...এক-একবার ডুবছে বটে, কিন্তু আসলে একটা আশ্রয় করে ও ভেসেই চলেছে তীরবেগে। আর কে একজন শক্তহাতে ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরে আছে।...বাবার কথা-মতো সত্যিই কি তাহলে মহাপ্লাবন এলো? আর বাবার হাত ধরে ও মনুর নৌকোয়ে ভেসে চলেছে?

—বাবা!

কি কাণ্ড! সকালে ঘুম ভেঙেও কি লোপা স্বপ্নই দেখছে? ও দেখছে একটা ছই-

অলা নৌকোর বাইরের পাটাতনে শুয়ে আছে ও। নৌকোটা গাছের উঁচু ডালে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গাছটার বেশির ভাগ জলের নিচে ডুবে আছে। মাথার ওপর মেঘলা কালিবর্ণ আকাশ। ওর চারদিক জলের নিচে।...ওই গাছে প্রকাণ্ড একটা কালকেউটে ঝুলছে। কিন্তু লোপা একটুও ভয় পাচ্ছে না। স্বপ্ন বুঝলে আবার ভয়টা কিসের?

কিন্তু চোখের সামনে ও আবার কারা? একজন বটুকদা আর একজন গোপালকাকার ছেলে সেই পাজি বিলে!

বটুকদা সামনে ঝুঁকল! মিষ্টি করে বলল, কেমন আছিস? বেলা দুপুর এখন, আর কত ঘুমবি?

লোপা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু। কিছু বুঝছে না, কিছু মাথায় ঢুকছে না। দু'দুটো লোকের চোখের সামনে ওর আদুড় গায়ে শুধু একটা আধভেজা শাড়ি জড়ানো তাও খেয়াল নেই। কি হয়েছে বা কোথায় আছে মনে করতে চেষ্টা করতেই মাথার মধ্যে কেমন যেন ওলট-পালট আর অসহ্য যন্ত্রণা।

...আবার ঘুম পাচ্ছে লোপার। ঘুমিয়েই পড়ল।

ফের চোখ মেলে তাকালো যখন চারদিক অন্ধকার। জলের কল-কল ছল-ছল শব্দ।...একটু একটু মনে করতে পারছে। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জন আর প্রচণ্ড শব্দ। চোখ তাকিয়ে দেখে ঘরের মধ্যে সে-কি প্রচণ্ড তোড়ে জল ঢুকছে। লোপা হতভম্বের মতো বসে থাকতে থাকতেই চৌকি ডুবে গেল। ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে কোমরজল বুকজল গলাজল ডুবজল। না, বেরুবার কোনো রাস্তা পাচ্ছিল না। কেবল জল খাচ্ছিল আর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একবার শুধু মনে হয়েছিল কে যেন তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল। আর কিছু মনে নেই।

আবারও দু'চোখ লেগে এসেছিল কিনা জানে না।...এ-কি! এ-কি! ওকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে কে? গাছ থেকে ওই সাপটা নেমে এলো। প্রাণপণে তাকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে তুলে দুচোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করল। সাপ নয়, সাপের মতোই দুটো ধকধকে চোখ।—একটা মানুষ। গ্রাস করতে আসছে ওকে। বাধা দেবার চেষ্টা করা মাত্র দু হাতের চাপে ওর হাড়-পাঁজরসুদ্ধ গুঁড়িয়ে দিতে চাইল, দাতে আর ঠোঁট আর গালের মাংস ছিঁড়ে ফেলতে চাইল, এক হ্যাঁচকা টানে বুকের কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলল।

—বটুকদা!

হি-হি শব্দে হেসে উঠল বটুক তালুকদার। অস্ফুট শব্দে বলল, এই যে আমি! চুপ একেবারে, চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনবে না।

—ও বটুকদা, ছাড়ো ছাড়ো। দয়া করো বটুকদা, ছাড়ো আমাকে।

—কি? ছাড়ব তোকে? দয়া করব? তোকে ছাড়ার জন্যে নিজের প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে তোকে রক্ষা করতে গেছলাম? দয়া করব তোকে! তোর দিদি আমাকে দয়া করেছিল? তার জন্য আমি পাগল হয়ে গেছলাম, তার বদলে সে-শুধু ঘৃণা করা ছাড়া একটুও দয়া করেছিল? হাসছে, আরো বেশি করে ওকে গ্রাসের দখলে আনতে চেষ্টা করে হিসহিস শব্দে বলছে, সেবারেও এমনি বন্যায় দিদিকে আর তোকে নিয়ে তোর বাবা-মা-ঠাকুমা বাড়ি ছেড়ে কলেজ-বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল।...*সেখান থেকে তোর*

দিদিকে আমি চুরি করেছিলাম, বুঝলি? চুরি—। নাকে ওষুধের রুমাল চাপা দিয়ে একেবারে চুরি। সকলেই বুঝেছিল, তোর দিদির সঙ্গে আমিও উধাও—বুঝবে না কেন? আবার হি-হি হাসি।—তাকে নিয়েও এমনি বন্যার জলে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু অত করেও কি পেলাম আমি? শরীর খারাপ বলে আর হাতে-পায়ে ধরে মাত্র একটা রাতের সময় চেয়েছিল আমরা কাছ থেকে। তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল—এই বন্যার জলেই আত্মহত্যা করেছিল—তোর বাবা-মা ওর মরা দেহটা পেয়েছিল।—আবার তোকে ছাড়ব আমি, তোকে বিশ্বাস করব? সেই ফ্রক-পরা বয়েস থেকে তোর মধ্যে তোর দিদিকে দেখছি আমি আর দিন গুনছি—ফের বোকা বানাবি তুই আমাকে!

যন্ত্রণায় শেষবারের মতোই একটা আর্ত চীৎকার করে উঠল লোপা।

সঙ্গে সঙ্গে বিষম একটা কিছু ঘটল যেন। মাথার ওপরে একটা প্রচণ্ড আঘাতে ওর বুকের ওপর থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেল লোকটা—অস্ফুট একটা আর্তনাদ শুধু শোনা গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল লোপা। দু'চোখে দিশেহারা ত্রাস। অন্ধকারে বৈঠা হাতে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ও কে? এবারে কি ওকে আক্রমণ করবে?

অন্ধকারে চোখের পলকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোপা।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল বিলে গণাই।—লোপা! আমি তোর ক্ষতি করব না, যা হোক একটা কিছু ধরে ফেল লোপা!

বন্যা থিতিয়েছে।

কিন্তু কতগুলো মানুষের বুকের তলায় আর এক বন্যা উথলে উঠেছে। ওই বন্যা ওই সব কটা মানুষকে ঘোষালবাড়িতে টেনে এনেছে।

সামনের বড় ঘরটাতে লোপার মাথাখানা কোলে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে রাজা ঘোষালের মা ক্ষণপ্রভা ঘোষাল।

—ঘরের মধ্যে আরো অনেকে আছে। বাইরে একজন।

—চারুবালা রায় এসেছে। চোখের জলে সব ঝাপসা দেখছে বার বার। ও-ধারে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ভুবন হালদার। তার পাশে বিশ্বেশ্বর ডাক্তার। এদিকে মেঝেতে বসে মুখে কাপড় গুঁজে কান্না সামলাচ্ছে গোপাল গণাইয়ের বউ রাধা। তার পাশে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত নিজের মাথায় হাত বুলোচ্ছে গোপাল গণাই।

পিছনের দিকের একটা জানালার গরাদ ধরে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে আছে বিলে গণাই। ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে তাঁর, কিন্তু কাঁদতে পারছে না। শোধ নেবে বলেছিল। কি শোধ নিল লোপা কি আর কোনদিন জানবে না, বুঝবে না? জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও-যে নিজের প্রাণ দিয়েও ওকে আগলে রাখতে চেষ্টা করেছিল।

এ-দিকের দরজার কাছে নিশ্চল নিষ্পলক দাঁড়িয়ে রাজা ঘোষাল। আর তার পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সরোজিনী—সরি পিসী।

· ক্ষণপ্রভা ঘোষালের কোলে লোপার মাথাখানা আবার যেন একটু নড়ল মনে হল সকলের। যে-যেখানে ছিল সেখান থেকেই উদগ্রীব হয়ে ঝুঁকল একটু। হ্যাঁ নড়ছে। ঠোঁট দুটোও নড়ছে একটু।

ঝুঁকে ওর মুখের কাছে মুখ এনে এবারে প্রায় চিৎকারই করে উঠল ক্ষণপ্রভা ঘোষাল।—তুই যে বলিছিলি মেয়ে বলে ডাকলে তুই আসবি—এত করে ডাকছি তুই শুনছিস না কেন? শুনছিস না কেন?

এবারে আরো উদগ্রীব সকলে। দুই ঠোঁট আরো বেশি নড়ছে! না ভুল দেখছে না কেউ। নড়ছে আর মেয়েটা হাসছেও অল্প-অল্প আর বলছে কিছু। কান পাতলে শোনা যেতে পারে। শোনা যাচ্ছে। খুব অস্পষ্ট। বলছে, না-গো ঠাকুমা মরণ আবার কি—মরণ আর কেউ বলবে না—জীবন, অন্য নাম জীবন বলবে—।

সকলে এগিয়ে এসেছে। বিলে গণাই রাজা ঘোষাল ভুবন হালদার বিশ্বেশ্বর ডাক্তার সরি পিসী চারুবালা রায় গোপাল গণাই রাধা গণাই। সামনে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করছে। সকলকে ঠেলে সরিয়ে বিশ্বেশ্বর ডাক্তার আবার চেষ্টা শুরু করেছে। আশায় আশায় এতগুলো মানুষ থর-থর করে কাঁপছে।

আশার আলো সব থেকে বেশি জ্বলজ্বল করছে ক্ষণপ্রভা ঘোষালের মুখে।

ঘরের বাইরের সরু বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা তখনো পায়চারি করছে কেবল একজন। কপিল চক্রবর্তী।

...কবে জানি কোন এক মুখ্যমন্ত্রীকে আর কোন্ কোন মন্ত্রীকে বন্যার সম্পর্কে কি-কি বলেছিল আর কি সব প্ল্যান দিয়েছিল—কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, কাকে বলেছিল কাদের বলেছিল কি বলেছিল আর কি প্ল্যান দিয়েছিল—কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

সেই থেকে মাথা খুড়েও কিছুই আর মনে করতে পারছে না কপিল চক্রবর্তী।

এক রমণীর যুদ্ধ

সুরজিৎ ঘোষ
প্রীতিভাজনেষু

খুব দূরপাল্লার যাত্রা নয়। কলকাতা থেকে বারাণসী। ঘড়ি-ধরা সময় মনে নেই, সকাল সাড়ে ন'টা দশটায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে রাত সাড়ে সাতটা আটটায় বেনারস পৌঁছে দেবে। তবে সেখানে এখন খুব কড়া শীত খবর পেয়েছি, তাই আমাদের মতো প্রবীণদের কাছে সাড়ে সাতটা আটটা একেবারে কিশোরী রাত্রিও নয়। বিশেষ করে ন'-দশ ঘন্টার জার্নির ধকলের পর নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে। কিন্তু সে জন্যে কারো মনে উদ্বেগ নেই। বয়স্করা রিজারভেশন টিকিটের সঙ্গে উষ্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতিও আগাম পেয়ে তবে এই যাত্রার শরিক হয়েছেন।

আমাদের এয়ার কনডিশনড় চেয়ারকার কম্পার্টমেন্টের প্রায় সবটাই কবি কথাশিল্পী সমালোচক নাট্যকার মাসিক-সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার সম্পাদক আর সাহিত্য অনুরাগী সাংবাদিকে ঠাসা। এছাড়া সিংগল-ফেয়ার ডাবল-জার্নির সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু ভাবী কবি সাহিত্যিকও বারাণসীর এই সভায় যোগ দিতে চলেছেন। এটা নিখিল বঙ্গ বা নিখিল-ভারত সাহিত্য সম্মেলন নয়। সেখানকার প্রাচীনতম বাঙালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আর তাদের লাইব্রেরির সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই আমন্ত্রণ। টানা পাঁচ দিনের সমাবেশটি কোনো সাহিত্য সম্মেলনের থেকে বড় ছাড়া ছোট হবে মনে হয় না। অনুষ্ঠান সূচীতে নাচ গান বাজনা ক্যারিকেচার নাটক ইত্যাদিও আছে। কিন্তু সেখানকার কর্মকর্তাদের সাহিত্য সমাবেশটি জম-জমাট করে তোলাটাই বোধহয় প্রধান লক্ষ্য।

ট্রেনের এক কামরায় বাগবাদিনীর এত রথী-মহারথী আর সৈনিকের এমন মিলন সচরাচর ঘটে না। তাই দূরের যাত্রা না হলেও ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীন প্রবীণ এবং মধ্যবয়সী সকলের মনেই একটা ভেসে-পড়া গোছের লাগাম-ছাড়া ভাব। এয়ার কনডিশনড কামরায় ট্রেন চলার ঘড়ঘড় ঘটাং ঘটাং শব্দ নেই, তাই কেউ গলা চড়ালে সকলেই শুনতে পায়। ট্রেন চলতে শুরু করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলের শ্রদ্ধেয় প্রবীন কবি কথাশিল্পী উঠে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন, শুনহ সুধিজন! এখানে নরক গুলজার যদ্যপি হয়, সাহিত্য কচকচি কদাপি নয়!

সমবয়সী কবি এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসকার টিপ্পনী কাটলেন, তবু ভালো যদ্যপির সঙ্গে কদ্যপি মেলাওনি।

আমার সমবয়সী সদাগম্ভীর ফাজিল সাহিত্যিক তাঁর দুশ্চিন্তা প্রসারিত করলেন, ট্রেনের এই একটি কামরা অঘটন কবলিত হবার ফলে এর জঠরস্থ সব কবি-সাহিত্যিক যদি এক সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন তাহলে বাংলা সাহিত্যের বন্ধ্যা দশা কতকালে ঘুচবে?

—দীর্ঘকালের জন্য না ঘোচাই মঙ্গল, দুর্মুখ নামী সমালোচক ভদ্রলোকের কাষ্ঠ জবাব, বাংলা সাহিত্যের অবাঞ্ছিত এক্সপ্লোশনে আমরা জর্জরিত, দীর্ঘ-মিয়াদী বার্থ-কন্ট্রোল দরকার।

তাঁর প্রত্যয়ী মতবাদ তুচ্ছ করে অধ্যাপক-কবি সমস্যার বিকল্প সমাধানে পৌঁছুলেন, এ রকম প্রমাদই যদি ঘটে, পরলোকে গিয়ে সকলে মিলে আমরা একটি সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি করব, খুঁজে পেতে কবিগুরুকে এনে রাজ-সিংহাসনে বসাবো।

একজন জুনিয়র ক্রিটিকের মন্তব্য, খবর পেলে তিনি না সত্রাসে আবার এই মর্ত্যেই পালিয়ে আসেন।

দুপুরের আহার সাময়িক তন্দ্রা আর এমনি অম্ল-মধুর রসালাপের ফাঁকে দুপুরে বিকেল আর সন্ধ্যা গড়িয়েছে। ট্রেন প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট, তা-ও খুব একটা বিরক্তির কারণ হয়নি। যত উত্তরে যাচ্ছি শীতের প্রকোপ বাড়ার কথা। কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে তফাৎ অনুভব করছি না। তবু পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে সুটকেস থেকে পুলোভার বার করে গায়ে চড়িয়েছি আর কাঁধে ভাঁজ-করা শাল ফেলে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। প্রবীণরা অনেকেই তাই করেছেন। বয়সের গরম যাঁদের তাঁরা বক্র কটাক্ষ হেনেছেন। ট্রেন থেকে নেমে তাঁদের পস্তানো মুখভাব লক্ষ্য করার সুযোগ হয়নি। একে মাঘের শীত, তায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি। স্টেশনের সরগরম পরিবেশে সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়েও মনে হচ্ছে কনকনে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া চামড়ায় বিঁধছে।

ডজন দেড়েক ভলান্টিয়ারসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অভ্যর্থনায় হাজির। এই সাদর অভ্যর্থনা সকলেরই প্রত্যাশিত ছিল। এঁদের অন্যতম মাতব্বর বীরেশ্বর ঘোষাল আমার পুরনো বন্ধু এবং সহপাঠী। এখানকার কলেজের বাংলার অধ্যাপক ছিল। সম্প্রতি রিটায়ার করেছে। বারাণসীতেই স্থায়ী বসবাস। দশ বছর হল বিপত্নীক। বরাবরই রসিক মানুষ। স্ত্রী বিগত হবার পর তার রসবোধ আরো বেড়েছে। কলকাতায় গেলে আমার ওখানেই ওঠে।'গেল বছরও লাইব্রেরির বই কেনার জন্য দু'দিনের জন্য এসেছিল। তার খেদের কথা শুনে হেসেছি। বলেছিল, এ-বয়সে বউ খুইয়ে ছেলে, ছেলের বউয়ের তদারকে থাকতে হলে কি যে বিড়ম্বনা তুমি বুঝবে কি, মুখ ফসকে দু'-চারটা রসের কথা বেরুলেই ধড়ফড় করে চার দিকে তাকাতে হয়, কে শুনে ফেলল, দশ বছরের নাতনীটার সঙ্গে যেটুকু রসালাপ চলে তাই শুনেই আমার বউমায়ের কান লাল হয়। বছর ছয় আগে এই বেনারসেই নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের আসর বসেছিল। সেবারে নামী হোটেলে থাকার ব্যবস্থা নাকচ করে বীরেশ্বর ঘোষালের সাদর আতিথ্যে দিন কয়েক কাটিয়ে গেছি। হোটেলে থাকা যদি বা বরদাস্ত করতে পারি খাওয়া-দাওয়া মোটে পছন্দ হয় না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার বাদ বিচার আরো বেড়েছে। এবারেও আমার থাকার ব্যবস্থা ওর বাড়িতেই হবে ধরে নিয়েছি। শুধু আমার কেন, আরো জনাকয়েক বয়স্ক কবি-সাহিত্যিকের হোটেল পছন্দ নয়, তাঁরাও এক-একজন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে থাকবেন শুনেছি। এবারে বীরেশ্বর ঘোষালের আগ্রহাতিশয্যে আমার আসা। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিল, তোমার হোটেল পছন্দ নয় জানি, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো তোমার ব্যবস্থা সর্বোত্তম হবে।

এই প্রতিশ্রুতির ফাঁকে যে কিছু রসিকতা প্রচ্ছন্ন ছিল কল্পনাও করিনি।

সকলকে কর-জোড়ে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে বীরেশ্বর এক ফাঁকে আমার কাছে এসে গলা খাটো করে বলল, এবারের এত কবি-সাহিত্যিকের ঝাঁকের মধ্যে তুমি সব থেকে লাকি, তোমাব জন্য যে ব্যবস্থা করেছি এরপর তুমি বেনারস থেকে নড়তে চাইলে হয়...আগে এঁদের ডেসপ্যাচ করে নিই, ততক্ষণ তুমি ওই মহিলাকে ভালো করে দেখে রাখো।

চোখের ইশারায় যাঁকে দেখালো কিছু না বুঝে আমি তাঁর দিকে ফেরার ফাঁকে বীরেশ্বর হন্তদন্ত হয়ে আর একদিকে সরে গেল। গজ কুড়ি দূরে একটি মহিলা দাঁড়িয়ে।

তাঁর দৃষ্টিও আমার দিকেই। হাসি-ছোঁয়া সপ্রতিভ চাউনি। পরিচয় হয়নি বলেই হয়তো এগিয়ে আসতে দ্বিধা।

ভব্যতা বক্ষা করে এক নজরে কতটুকু বা দেখা সম্ভব। মুখ ফেরানোর পরেও মনে হল একটা সাদাটে ছটা আমার চোখে লেগে আছে। স্টেশনের হট্টগোল আর ভলান্টিয়ারদের ব্যস্ততার ফাঁকে আরো বার কয়েক লক্ষ্য করলাম। দুই একবার চোখোচোখিও হয়ে গেল।...বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে বয়েস, গায়ের রং বেশ কালো, বাঙালী ধাঁচের মুখ নয়, কিন্তু ভারী সুশ্রী, লম্বার ওপর সুঠাম স্বাস্থ্য। পরণে দুধ-সাদা শিফন শাড়ি, গায়ে ভেলভেটের মতো মসৃণ সাদা ব্লাউস, কাঁধ আর পিঠে জড়ানো সাদার ওপর কাজ-করা কাশ্মীরি শাল...খোঁপায় গোঁজা ঘোমটা। পরে লক্ষ্য করেছি পায়ের শৌখিন স্যাণ্ডেল জোড়াও সাদা। কিন্তু যে সাদাটে ছটার কথা বললাম তা ওই সাদা বেশ-বাসের নয়। হীরের। মহিলার নাকে বেশ বড় একটা হীরের ফুল। দেখামাত্র মনে হয়েছে কোনো অতি সুশ্রী রমণীর কালো মুখ আলো করার ক্ষমতা একটিমাত্র অলংকারই ধরে —সেটা তাঁর নাসিকা-বিদ্ধ প্রমাণ-আকারের একখানা হীরে।...বাঁ-হাতে সোনার চেনের রিস্ট-ওয়াচ ছাড়া আর কোনো গয়না নেই।

বীরেশ্বরের মনে কি আছে জানি না, ভিতরে ভিতরে কি রকম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

ভলান্টিয়ার আর কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে সকলে স্টেশনের বাইরে এলাম। সারি সারি ট্যাক্সি আর কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়ে। বেশির ভাগ অতিথির হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। এক-এক ট্যাক্সিতে চার-পাঁচজনকে তুলে নিয়ে ভলান্টিয়াররা প্রস্থান করল। কর্মকর্তারাও যে-যার বরাদ্দ অতিথিদের নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। শেষে বাকি আমি, অগ্রজতুল্য সেই কবি-সাহিত্যিক এবং কবি-ঐতিহাসিক উপন্যাসকার। সাত-আট গজ দূরে ওই মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রবীণ কবি-সাহিত্যিক তাঁকে বার কয়েক লক্ষ্য করে খাটো গলায় তাঁর সতীর্থকে বললেন, দেখে নাও ভালো করে, কালো তা সে যতই কালো হোক...রবিঠাকুর নাকের ওই হীরের ছটা দেখলে আরো কি লিখতেন গো?

আমার অস্বস্তি। কারণ প্রবীণ সতীর্থটি সোজা ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলাকে একপ্রস্থ দেখে নিলেন।

ছোটাছুটির ফলে এই জমাটি শীতেও বীরেশ্বর ঘোষালের হাঁপ ধরেছে। শেষ প্রস্থের অতিথি ক'জনকে চালান করে ফিরে এসে হৃষ্ট বদনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। —যাক কমপ্লিট—দাদারা চলুন, আপনারা দু'জন আমার অতিথি, আর তুমি—

ঘুরে তাকালো, অবন্তী দেবী আপনি দূরে দাঁড়িয়ে কেন, আপনার অতিথি তো মজুত, আর এঁরা দু'জন হলেন—

—আমি সকলকেই চিনি। দু' হাত বুকের কাছে যুক্ত করে স্মিত মুখে মহিলা এগিয়ে এলেন। তারপর নত হয়ে অগ্রজ দু'জনকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আমার দিকে এগোলেন। বিড়ম্বিত মুখে পিছু হটতে খুব সহজ দাবির সুরে বললেন, আপত্তি করবেন না, আমি সব দিক থেকেই আপনাদের অনেক ছোট...।

সহজ মিষ্টি কথা, গলার স্বরও তেমনি মিষ্টি। প্রণাম নিতে হল। কবি-সাহিত্যিক বলে উঠলেন, আমরা আপনাকে চিনি না অথচ আপনি আমাদের চেনেন, এটা কি রকম হল?

কালো কমনীয় মুখের সলাজ হাসিটুকুও নাকের হীরের ছটায় ঝকঝকে মনে হল। কানের দু' পাশের কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। তুলে ফেলা বা গোপন করার চেষ্টা নেই দেখে আরো ভালো লাগল। সবিনয়ে জবাব দিলেন, আমার ছবি তো কাগজে বেরোয় না আপনারা চিনবেন কি করে, আপনাদের হামেশাই বেরোয়।...তাছাড়া বীরেশ্বরবাবু আপনাদের সকলের ফোটো ক্লাবের লাইব্রেরি ঘরে সাজিয়ে রেখেছেন।

ওই দুই সাহিত্যিকেরই বয়েস সত্তর ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু মন বুড়োয়নি। একজন বললেন, তার মানেই ফটোগ্রাফির অপচয়, আপনার ক'খানা ফোটো টাঙানো আছে জানতে চাই।

মহিলা ইংগিতজ্ঞা নিশ্চয়। হেসে ফেললেন।

দ্বিতীয় জন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, আমারও সেই প্রশ্ন। বীরেশ্বরের দিকে ফিরলেন, এঁর পরিচয়?

বীরেশ্বর ঘোষাল আমারই সুবাদে কলকাতার সাহিত্যিক মহলের অন্তরঙ্গ মানুষ। পরিচয় দিলেন, ইনি শ্রীমতী অবন্তী পাণ্ডে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পেট্রন, আর লাইব্রেরির বর্তমান কর্ণধার, এঁরই দাক্ষিণ্যে এখন পশ্চিম বাংলা ছেড়ে তামাম ভারতের ছোট বড় সমস্ত বাঙালী কবি-সাহিত্যিক সেখানকার বইয়ের সেলফ-এ জাঁকিয়ে বসে আছেন...এছাড়া এঁর আসল গুণের পরিচয় আপনাবা কাল পাবেন।

ছ' বছর আগে যখন এসেছিলাম এই বিশিষ্ট পেট্রনটির অস্তিত্বও জানা ছিল না। মনে হয় বীরেশ্বরেরও ছিল না।

দুই প্রবীণতর সাহিত্যিক বয়েস এবং নামোচিত গম্ভীর। একজন বললেন, শুনে খুশি হলাম, কালকের অপেক্ষায় থাকব। ...তা আমাদের ভায়া বুঝি এঁর অতিথি?

আমার চোখ এড়িয়ে বীরেশ্বর ঘোষাল জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

দু'জনেই যে চোখে তাকালেন আমার দিকে তার সাদা অর্থ ভাগ্যখানা বটে তোমার। অন্যজন বললেন, তাহলে আমরা আর এই শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাই কেন, তোমার বাহন কোনটা?

—ওই যে। তাদের সঙ্গে একটু এগিয়ে বীরেশ্বর বলল, আপনারা গিয়ে বসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যে এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি—

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আমি মনে মনে খাবি খাচ্ছি। মহিলাকে ছেড়ে এই ফাঁকে আমিও ওঁদের পিছনে খানিকটা এগিয়ে গেছি। বীরেশ্বর ফিরতেই রাগত চাপা গলায় বললাম, এটা কি রকম রসিকতা হল?

শুনতেই পেল না যেন। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, চট করে অতিথিকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ুন অবন্তী দেবী—আমার বন্ধুর ভাগ্য দেখে ওই দুই ভদ্রলোক শীতে আরো বেশি কাঁপছেন।

সত্যিই স্টেশনের বাইরে শীতের কামড় আরো বেশি। কিন্তু মহিলাকে তেমন শীতে কাবু মনে হল না। দুই কাঁধে শাল এখনো তেমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াননি, কেবল গলায় জড়িয়েছেন। সঙ্গ নিয়ে খুশি মুখে বীরেশ্বরকে বললেন, ক'টা দিন এঁদের সামনে অনন্ত আপনার জিভকে একটু শাসনে রাখুন।

অদূরের ঝকঝকে সাদা অ্যামবাসাডারের দিকে পা বাড়িয়ে বীরেশ্বর ঘোষাল গম্ভীর

গলায় বলল, আমার জিভের এখন দুঃশাসনের মেজাজ, আপনার গাড়িতে ওঠার আগে একটা ফয়সালা হয়ে যাক, একটু আগে আমার বন্ধু এবার আপনার অতিথি শুনে বললেন, এটা কি রকম রসিকতা হল। তার জবাবে আমি যদি বলি সাহিত্যিকদের মধ্যে যে ক'জন হোটেলে থাকা পছন্দ করেন না তাঁদের নাম শুনে আপনি নিজে ওঁকে চেয়ে নিয়েছেন —সেটা কি এক বর্ণও মিথ্যে হবে?

জবাবে নাকের হীরের জেল্লার সঙ্গে আবার ঠোঁটের হাসি মিশল। মাথাও নাড়লেন একটু।—না, তা হবে না।

—শুনলে? সকালের ব্রেকফাস্ট বিকেলের সাপার দুপুরের লাঞ্চ রাতের ডিনারে কি-কি বৈচিত্র্য পেলে তোমার রসনা সিক্ত হয়, আর অন্যান্য ব্যাপারেও তোমার কি পছন্দ বা অপছন্দ—ক'দিন ধরে ইনি মনোযোগী ছাত্রীর মতো আমার কাছ থেকে সেই পাঠ নিয়েছেন, আর তোমাদের ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লেখার এই কদর দেখে আমি হিংসেয় জ্বলেছি—বুঝলে? তবু আপনাকে বলে রাখি ম্যাডাম, জলজ্যান্ত একজন খুঁতখুঁতে সাহিত্যিককে ঘরে নিয়ে তোলাটা তার বই বুকে নিয়ে পড়ে থাকার মতো জল-ভাত ব্যাপার নয়—সেধে ঘাড়ে নিয়েছেন এখন সামলানোর দায়ও আপনার।

অন্য কারো প্রসঙ্গ হলে রমণীর কালো মুখের সুচারু বিড়ম্বনাটুকু উপভোগ্য মনে হত। নিজে একটু জোর পাওয়ার মতো করে বললেন, আপনি আমাকে ঘাবড়ে দেবেন না, ওঁর যাতে অসুবিধে না হয় আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করব...কিন্তু উনি খুঁতখুঁতে মানুষ আপনি কখনো বলেননি তো, বরং বলেছেন!

এবারে আমার তরফ থেকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা। ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনি ওঁর কথায় কান দেবেন না, আমার কোন কিছুতেই অসুবিধে হয় না, আমি আপনার অসুবিধে ভেবেই সংকোচ বোধ করছিলাম—

সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মিষ্টি জবাব, আমার আবার কি অসুবিধে, আমার তো ভাগ্য!

ঘোষাল হড়বড় করে বলে উঠল, তাহলে তো হয়েই গেল, আঙুল তুলে সামনের সাদা গাড়িটা দেখিয়ে হুকুম করল, আপনি এগিয়ে গিয়ে আপনার ভাগ্যের দরজা খুলুন, আমি চট করে এঁকে একটা দরকারি কথা বলে নিই—

মহিলা খুশি মুখে একটু এগোতেই বন্ধু কাঁধে একটা খাবলা মেরে আমাকে নিজের দিকে ফেরালো। গলা খাটো করে কানে কানে বলল, সময় নেই, ওই দুই বুড়ো শীতে হি-হি করে কাঁপছেন কি রাগে আর হিংসেয় কে জানে—একটা কথা কেবল বলে রাখি, এখন যত রাগই করো, তোমার শেষ ধন্যবাদ আমারই পাওনা হবে—এখন মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না রেখে সুড়সুড় করে শ্রীমতীর সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠে বোসো—আর এত শীতে রাতে অন্তত গুরুভোজনের লোভ সামলে সুমলে চলো।

বলে হাসি চেপে হনহন করে বীরেশ্বর রাস্তার ওপারের গাড়ির দিকে চলল।

সাদা অ্যামবাসাডারের সামনে অবন্তী দেবী ছাড়া আরো দুটি মানুষ দাঁড়িয়ে। শৌখিন বেশ-বাস, দুজনেরই গলায় সোনার চেন হার, গরম জামায় হীরের বোতাম, সোনার ব্যাণ্ডের হাত-ঘড়ি। দেখলেই বোঝা যায় দুই ভাই। একজনের বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি অন্য জনের সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। চেহারা-পত্র তেমন সুন্দর নয়, কিন্তু দু'জনেই বেশ লম্বা। সুখের শরীরে কিঞ্চিৎ মেদাধিক্য ঘটার ফলে বয়েস অনুযায়ী একটু ভারিক্কি দেখায়।

অবন্তী বললেন, আসুন, আমার ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এ আমার বড় ছেলে নকুল আর এ ছোট—সহদেব। ড্রাইভারটা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় এদের ধরে নিয়ে এসেছি—ওরা অবশ্য খুশি হয়েই আপনাকে দেখতে আর নিতে এসেছে।

দু'জনেই হাত জোড় করে অনেকটা নত হয়ে আমাকে শ্রদ্ধা জানালো। অবন্তী পিছনের দরজা খুলে দিলেন, আসুন—

আমি একটু ভেবাচাকা খেয়ে উঠে পড়লাম। এঁদের মা-ছেলের সম্পর্কটা চট করে বোধগম্য হল না। না হবার কারণ মহিলার বয়েস যদি ছেচল্লিশ সাতচল্লিশও হয়, এ বয়সের দু' দুটো ছেলে তাঁর নিজের হতে পারে না।

ছোট ছেলে সহদেব গাড়ি চালাচ্ছে, বড়জন তার পাশে। গাড়ি ফাঁকা রাস্তায় পড়তে নকুল একটু ঘুরে বসে বলল, দু'দিন ধরে মায়ের মুখে আপনার কথা খুব শুনছি, মা আপনার লেখার দারুণ ভক্ত। ড্রাইভার মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে, কিন্তু আপনাকে দেখার লোভে আমরাই চলে এলাম।

অবন্তী বললেন, দেখে আর কতটুকু বুঝবে ওঁকে, পড়াশুনার সময় তো তোমাদের আর হয়ে ওঠে না।

বড়জন এই মৃদু অনুযোগ হাসি মুখেই মেনে নিয়ে হালকা খেদ প্রকাশ করল, সত্যি, এক ব্যবসা দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই হল না।

যেমন মা-ই হোক, এত বয়সের দুই ছেলে বেশ অনুগত এবং অন্তরঙ্গ এটুকু বোঝা গেল। ভালো লাগল এবং কৌতূহলও হল। জিগ্যেস করলাম, এদের কিসের ব্যবসা?

অবন্তী জবাব দিলেন, ওরা বেনারসী শাড়ির ম্যানুফ্যাকচারার আর হোলসেলার, আবার যার যার আলাদা দোকানও আছে—দু'জনেরই ব্যবসায়ে খুব নাম-ডাক।

দেখেই অবস্থাপন্ন মনে হয়েছিল, বেশ জাঁকালো ব্যাপার বোঝা গেল। কিন্তু বড় ছেলে নকুলের হাসি মুখের মন্তব্য এবং পরের বিস্তারটুকু শুনে বেশ অবাকই লাগল।

প্রথমে ভাইকে বলল, মা কেমন বললেন শুনলি? তারপর আমাদের দিকে আধাআধি ঘুরে বসে জানান দিল, মায়ের নিজেরও এই একই বিজনেস আর সেটা আমাদের থেকে বড় ছাড়া ছোট নয়—বুঝলেন?

বুঝেও চট করে আমার মুখে কথা সরল না। অবন্তী পাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাতে চাইলেন।—বড় হোক ছোট হোক সবই তো বাপু তোমাদের ঘাড়ে রেখে, যাক, কোথায় এঁর কথা শুনব, না আমরা নিজেদের কথাই বলে যাচ্ছি।

এবারে খেয়াল হল গাড়ি শহরের পথ ধরে চলছে না। রাস্তা বেশ অন্ধকার আর নির্জন। গাড়ির রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে তাকিয়েও ঠিক ঠাওর হল না। অনেক দূরে দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট। প্রশস্ত পাকা রাস্তায় গাড়ি বেগে ছুটেছে।

জিগ্গেস করলাম, আমরা কি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তা ধরে চলেছি?

সামনে থেকে সহদেব জবাব দিল, হ্যাঁ, আমবাগান ছাড়িয়ে সারনাথ আর বেনারসের মাঝামাঝি জায়গায় মায়ের বাড়ি।

ছ'বছর আগেও জানতাম, রাত-বিরেতে এ পথ খুব নিরাপদ নয়। এই বিশাল পথের এদিক-ওদিকে কিছু কিছু বস্তিঘর শুধু দেখা যেত। সাইকেল রিকশ বা টাঙ্গার সারনাথ দর্শনার্থীরা সন্ধ্যারাতের মধ্যেই শহরে ফিরে আসত। অবশ্য গেলবারেও দেখে

গেছি প্রায় সব দিকেই বারাণসীর বিস্তার দ্রুত গতি নিয়েছে। কিন্তু এ-দিকটা এখনো নির্জন দেখছি আর বাড়ি-ঘরও তেমন চোখে চোখে পড়ছে না। শীতের এই রাত সাড়ে ন'টা নিঝুম রাত্রি মনে হচ্ছে।

বাইরের দিকে চোখ রেখেই জিগেস করলাম, এ-দিকটায়ও আজকাল বসতবাড়ি উঠছে তাহলে?

সহদেবই জবাব দিল, কেমন উঠছে দেখতেই পাচ্ছেন, আরো মাইল খানেক এগোলে হাতে গোনা কয়েকটা দেখতে পাবেন, মা-ই এই ব্যাপারে পাইওনিয়ার বলতে পারেন। হেসে যোগ করল, আমাদের মায়ের ভয়ে ডাকাতও টিট।

দুশ্চিন্তা নস্যাৎ করার সুরে অবন্তী পাণ্ডে বললেন, হ্যাঃ, ডাকাতের আর পরমায়ুর শেষ নেই, জন্ম জন্ম ধরে কেবল ডাকাতিই করে যাবে। বলে ডাকাতি আর কোথায় না হয়—শহরে হয় না? ডাকাত কিছু পাবার আশা নিয়েই ডাকাতি করে, এখানে পাবেটা কি? টাকা পয়সা সোনা দানা কেউ আর আজকাল ঘরে নিয়ে বসে থাকে না, এ ডাকাতও জানে। আমার দিকে ফিরলেন, আবছা অন্ধকারে নাকের হীরে ঝকমক করে উঠল। —আসলে লোকের ভয়ই বেশি বুঝলেন, কবে কোন্ কালে এ-দিকটায় ডাকাতি হত বলে আজও তাই ধরে নিয়ে বসে আছে। হাসলেন।—এই তল্লাটে বাড়ি করব ঠিক করতে আমার দুই ছেলেরই সে কি ভীষণ আপত্তি, এখানে বাড়ি করলে ওদের মা-কে ডাকাতে একেবারে গিলে খাবে।

মহিলার বিলক্ষণ স্নায়ুর জোর আছে বোঝা গেল। মুখের দিকে চেয়ে তবু একটু সংশয়ের আঁচড় না কেটে পারলাম না। দিনের বেলা কেমন লাগবে জানি না, রাতে লোকালয়ে ছেড়ে এই নির্জনে বাস আমারও খুব মনঃপূত নয়। বললাম, ডাকাতের লোভের স্ট্যানডারড সম্পর্কে আপনার ধারণা যদি ঠিক না হয় তাহলে একটু মুশকিল...ধরুন আপনার নাকের ওই হীরে আর হাতের সোনার ঘড়ি সোনার চেনও তো খুব বড় না হোক ছোটখাটো ডাকাতের বেশ লোভের কারণ হতে পারে।

সামনের দু' ভাই-ই হেসে উঠল। বড় ভাই বলল, আমাদেরও সেই কথা।

অবন্তী পাণ্ডের নিঃশঙ্ক মেজাজী জবাব, লোভ হলেই হল, তাদের আর প্রাণে ভয়-ডর নেই, বাড়িতে দুটো দারোয়ান আছে তিনটে যোয়ান চাকর আছে—দুটো ঝি, দুটো আয়া আর মেয়েগুলো আছে, ওরা সব একসঙ্গে চেঁচালে ডাকাত পালাবে।

প্রথমে মহিলার এই দুই ছেলে দেখে একপ্রস্থ ধোঁকা খেয়েছিলাম। এখন আর এক দফা ফাঁপরে পড়লাম। আমার জন্য বীরেশ্বর ঘোষালের 'সর্বোত্তম' ব্যবস্থার তল-কূল পাচ্ছি না।

মজার কিছু মনে পড়তে সামনের সিটে নকুল প্রায় ঘুরেই বসেছে, উৎফুল্ল মুখে জিগ্যেস করল, আচ্ছা মা, হরিহর ছাদে উঠে এখনো বন্দুক দাগে তো?

পলকা অনুযোগের সুরে তার কাছাকাছি বয়সের মা'টি জবাব দিলেন, তা আর দাগবে না, যেমন আস্কারা দিয়েছ তোমরা, বারণ করলেও শোনে! আবার আমার দিকে ঘুরে একটু জোরেই হেসে উঠলেন। আবছা অন্ধকারে সুন্দর দাঁতের সারিও চিকিয়ে উঠল। আর আমার চোখের ভ্রম নিশ্চয়, একই জিনিস দেখছি, মহিলা হাসলেই তাঁর নাকের হীরের ছ'টাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। বললেন, কাণ্ড শুনুন, আপনি এ নিয়েও লিখতে পারেন

—এখানকার বাড়িতে এসে ওঠার দিন থেকেই দারোয়ান দুটো এখানেই আছে। দুটোরই কর্তব্যজ্ঞান এমন যে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। তার মধ্যে হরিহরকে সহদেব শিখিয়ে রেখেছিল, রাতে মাঝে মাঝে ছাদে উঠে বন্দুক ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করবি —তাহলে আশপাশের চোর ডাকাত জানবে এ-বাড়িতে বন্দুক আছে, সাবধান! সেই থেকে আজ তিন বছর ধরে সপ্তাহে দু'দিন করে হরিহর সন্ধ্যা পেরুলে ছাদে উঠবেই আর বন্দুক ছুঁড়বেই।

সাড়ে তিন-চার মাইল পথ নিমেষে ফুরিয়ে গেল। হেডলাইটের আলোয় দেখলাম উঁচু দেয়াল-ঘেরা বিরাট চত্বরের মধ্যে বাড়ি। সামনে মস্ত লোহার গেটের শেকলে পেল্লায় দুটো তালা ঝুলছে। হর্ন বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে মস্ত টর্চ জ্বেলে একটা লোক ছুটে এসে চাবি লাগিয়ে গেটের তালা খুলল। ব্যস্ত হাতে গেট দুটোও সটান খুলে দিল। কিন্তু গাড়ি এগোবার আগে অবন্তী বড় ছেলেকে বললেন, বাহাদুরের কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে তোমাদের দুর্গের বাইরেটা ওঁকে দেখাও—

সহদেব হাসি মুখে দরজা খুলে নেমে দারোয়ানের হাত থেকে টর্চটা নিয়ে প্রথমে গেটের মাথায় আলো ফেলল। গ্রীল বসানো মস্ত গেটের রডের মাথাগুলো তীরের ফলার মতো ছুঁচলো। টর্চের আলো দু'মানুষ সমান উঁচু দেয়ালের ওপর ফেলতে দেখা গেল, দেয়ালের মাথায় আগাগোড়া ছুঁচলো মোটামোটা লোহার রডেব টুকরো গাঁথা। নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত বটে। আক্ষেপের সুরে অবন্তী বললেন, চোর-ডাকাতের ওপর ছেলেদের দয়ামায়া নেই, টপকাতে চেষ্টা করলেই রক্তাক্ত কাণ্ড হবে।

ভিতবের রাস্তা ছোট একটু বাগান আধা-আধি বেষ্টন করে সিঁড়ির গোড়ায় এসে শেষ হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই মস্ত ঢাকা বারান্দা। দোতলায়ও সামনের দিকটা এমনি বারান্দা মনে হল। নিচের বারান্দায় এক প্রস্থ সৌখিন সোফা-সেটি সাজানো। শীতের সন্ধ্যায় বা রাতে এখানে বসলে হাড়ে বাতাস লাগবে। শহরের থেকে এখানে দেড়া শীত। সকালে আরামদায়ক হতে পারে। সামনেই মস্ত হল ঘরটা ভিতরের বৈঠকখানা। এটার সাজসজ্জা আবো আধুনিক, আরো শৌখিন। এর দু'দিকে তিন-চারখানা করে ঘর মনে হল।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভালো লাগছে। অবন্তী বললেন, আপনি বসে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করুন, তারপর আপনার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

একজন মাঝবয়সী লোক দরজার কাছে এসে সকলের উদ্দেশে আনত হল। তার পাশের যোয়ান গোছের লোকটা চাকর হবে। কর্ত্রী বয়স্ক লোকটিকে জিগ্যেস করল, মিশ্রজি তোমার তবিয়ত এখন বিলকুল ঠিক তো?

—জী মাতাজী।

—ঠিক আছে, এখন আরাম করোগে যাও, কাল থেকে তোমার কেবল আমাদের এই মেহমানের ডিউটি আমার দরকার হলে ছোট গাড়িটা ব্যবহার করব।

এবারে মেহমানের উদ্দেশে আর একবার করজোড়ে আনত হয়ে মিশ্রজী চলে গেল। কর্ত্রী দ্বিতীয় লোকটিকে হুকুম করলেন, রাম, আজ রাত থেকে তোমারও কেবল এই বাবুজীর ডিউটি, সব সময় কাছাকাছি থাকবে, কি দরকার না দরকার দেখবে, উনি আর একটু বাদে ঘরে যাচ্ছেন, সব ঠিক আছে কিনা দেখে রাখো—

লোকটা চলে যেতে বলে ফেললাম, এমন রাজসিক খাতির বা আদর-যত্ন পেতে তো আমি অভ্যস্ত নই।

—কিছু না, আজ আমার কত আনন্দ আপনি ভাবতে পারেন না, আপনি বীরেশ্বরবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু শুনে অনেকদিন ভেবেছি ওঁকে ধরে নিয়ে আপনার কলকাতার বাড়িতে গিয়ে হাজির হব কিনা—

...তাহলে মুশকিলেই পড়তাম।

থতমত খেয়ে তাকালেন। ছেলেরাও এমন উক্তি শুনে অবাক একটু।

হেসে বললাম, আমি সাদামাটা লেখক, এমন অতিথিপরায়ণতার ধারে কাছে যেতে পারতাম না।

হেসে ফেললেন। দুই ছেলেও। অবন্তী বললেন, আপনার সঙ্গে কথায় পারব কেন। পাঁচ সাত মিনিট বসুন, মেয়েগুলো হয়তো এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। একবার দেখে আসি—

দরজার দিকে এগোবার আগে নকুল বলল, রাত তো খুব বেশি হয়নি, আজ আমরাও চলি মা...কাল বিকেলে তোমাদের ওপেনিং ফাংশন, সকালে একবার আসব না হয়...

কালো মুখের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল একটু। দুই ভাইয়ের মুখের দিকেই একবার তাকালেন।—আজ এখানেই থেকে যাবে বউমাদের বলে আসতে বলেছিলাম, বলে আসা হয়নি?

এটুকুতেই ব্যস্ত হয়ে নকুল জবাব দিল, রাত বেশি হলে আর ফিরব না বলে এসেছি, সবে তো দশটা এখন, বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

—দশটা এখানে অনেক রাত, যেতে হবে না, রাস্তায় ডাকাত-টাকাত পড়তে পারে—

হাসি চেপে প্রস্থান করলেন। এখন মনে পড়ল, গাড়িতে বাড়ির বাসিন্দাদের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে ছেলেরাও থাকে মহিলা এ-কথা বলেননি। হালকা অনুযোগের সুরে সহদেব দাদাকে বলল, বাড়িতে একটা ফোন করে দিও, মায়ের হুকুমের নড়চড় হবে না জানোই তো, কেন বলতে গেলে।

হাসি মুখে নকুল আমার দিকে ফিরে বলল, মায়ের এই গোছের হুকুম আর মিষ্টি বকুনি শুনতেও আমাদের খুব ভালো লাগে...।

ভালো লাগল। হেসেই জবাব দিলাম, তোমরা মায়ের যোগ্য ছেলে এটুকু বুঝছি।

দুই ভাইয়ের মধ্যে এই বড়টিই বেশি মনখোলা মনে হল। একটু গাঢ় সুরে তক্ষুনি বলে বসল, আমরা যোগ্য ছিলাম না, এখন যতটা পারি যোগ্য হতে চেষ্টা করছি...আমাদের গুরুদেবের আশীর্বাদে মা-কে চিনেছি, নইলে কত বড় ভুল নিয়েই না বসেছিলাম। এখন মনে হয় অনেক ভাগ্যের জোরে এমন মা পেয়েছি—

—দাদা, সহদেবের বিব্রত মুখ, উনি সবে এলেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না, মাঝখান থেকে অবাক হচ্ছেন—

নকুল হাসতে লাগল, তারপর ঈষৎ উৎসুক চোখে আবার তাকালো।—আচ্ছা, আপনিও তো এই প্রথম দেখলেন, এরই মধ্যে আমাদের মা-কে আপনার ভালো লাগেনি?

বিশ্বাসযোগ্যভাবেই জবাব দিলাম, খুব।

ঘরে একটাই মস্ত ছবি টাঙানো আগেই চোখে পড়েছে। আর তক্ষুনি মনে হয়েছে ছবির ভদ্রলোক এই দুই ছেলের বাবা। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা হলেও মুখের আদল মেলে। এখন ভালো করে লক্ষ্য করতে মনে হল, ছবির চোখ বা চাউনি আদৌ মেলে না। কিরকম পাথুরে চোখ আর অনড় চাউনি।

ফোটোর দিকে মনোযোগ দেখে সহদেব জানান দিল, আমাদের বাবা, আট বছর হল মারা গেছেন।

মুখ দিয়ে প্রশ্নটা আপনি বেরিয়ে এলো, তোমাদের নিজের মা নেই?

—নিজেই মা আমাদের ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন।

নকুল হাসিমুখে জানান দিল, এই মা আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের আর সহদেবের থেকে আট বছরের বড়—বাবার একটু বেশি বয়সে আমাদের ঘরে এসেছেন।

বিস্তারের দরকার ছিল না, এটুকু সহজ অনুমানসাপেক্ষ। গাড়ির বাক্যালাপ মনে পড়তে জিগোস করলাম, বাবা বেঁচে থাকতেই তোমাদের আলাদা ব্যবসা, না আগে থেকে?

—অনেক আগে থেকে। বাব বেঁচে থাকতেই আমাদের দু' ভাইয়ের আলাদা আলাদা ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছল—অবশ্য বাবার জন্যই সেটা হয়েছিল...বাবার ব্যবসা এখন শুধু মায়ের।

হাসি মুখে সহদেবই এবার মায়ের প্রশস্তি গাইলো।—মা কিন্তু গাড়িতে তখন আপনাকে খুব সত্যি কথা বলেননি...মায়ের ব্যবসা আমরা দেখি বটে, কিন্তু উনি রোজই একবার না একবার গদিতে যান, আর অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকু দেখেন তাই যথেষ্ট। মা কত সহজে সব বুঝে নিতে পারেন ভাবতে পারবেন না, সংকটে পড়লে নিজেদের ব্যবসার জন্যও এখন আমরা মায়ের পরামর্শ নিই।

ঘরে ঢুকে হাসিমুখে অবন্তী পাণ্ডে বললেন, মায়ের পাবলিসিটি হচ্ছে বুঝি?

আমি তাঁর দিকে তাকিয়েও ঠিক খেয়াল করিনি, বেশবাস বদলে এসেছেন আর মুখখানা একটু ভেজা ভেজা এটুকুই কেবল লক্ষ্য করেছি। কিন্তু নকুল পাণ্ডে তাঁর দিকে চেয়েই আঁতকে উঠল, মা তুমি এই ঠাণ্ডায় চান করে এলে?

বিমূঢ় চোখে আমি আবার তাকালাম। হ্যাঁ, চান করা মুখই মনে হচ্ছে, পরনে চওড়া নীল পাড়ের পাতলা শাড়ি, পাতলা চাদরের ফাঁকে দেখলাম গায়েও অন্য ব্লাউস, আর এক-হাত প্রমাণ চুল পিঠে ছড়ানো। লজ্জা পেয়ে বললেন, বন্ধ বাথরুমে তপতপে গরম জলে চান করেছি তাতে আর কি হয়েছে—আমার অত ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগে না। আপনাকে দেরি করিয়ে দিলাম, উঠুন এবারে—

অভিযোগের সুরে নকুল বলল, দেখে রাখুন, যখন তখন চান করাটা মায়ের একটা ফ্যাশান।

দুই ছেলের সঙ্গে বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে ছোট একটু প্যাসেজ পেরিয়ে পুরু শৌখিন পর্দা সরিয়ে যে ঘরটায় নিয়ে গেলেন সেটাই আমার জন্য নির্দিষ্ট। বৈঠকখানার হলঘরের মতো অত না হলেও মস্ত বড় ঘরই। ঝকঝকে টাইলের মেঝে। কোণের দিকে দেয়াল-ঘেঁষা চকচকে খাটে পরিপাটি বিছানা করা, পায়ের কাছে দুটো বিলিতি কম্বল ভাঁজ করা, খাটের চার ডানায় ধপধপে সাদা নেটের মশারি গোটানো, পাশে ছোট্ট

টেবিলের ওপর বেডল্যাম্প। খাটের মাথার দিকের বসবার বড় একটা গদি-মোড়া ইজি-চেয়ার পাতা। ঘরের মাঝামাঝি একটা চকচকে টেবিলের দু'দিকে দুটো শৌখিন চেয়ার। টেবিলের ওপর হালকা কারুকার্য করা বড় ভাসে মস্ত একটা টাটকা ফুলের তোড়া। দুদিকের দেয়ালে ফ্রেমে আঁটা এক-জোড়া করে টিউব লাইটের আলোয় ঘর দিনের মত সাদা। মাথার ওপর চকচকে পাখাও ঝুলছে একটা, তবে এই শীতে ওটা বাড়তি জিনিস। সামনে অ্যাটাচড বাথ।

দুচোখ পরিতৃপ্ত এবং মন খুশি হবার মতোই ব্যবস্থা। ঘর পর্যবেক্ষণ শেষ হতে হোস্টেস আন্তরিক আগ্রহে জিগ্যেস করলেন, আর কিছু লাগলে বলবেন...অসুবিধে হবে না তো?

হেসে বললাম, একটু হবে বোধহয়, এত আরামে অভ্যস্ত নই।

হাসলেন উনিও।—একথা বলে আর এক মহিলার নিন্দা করবেন না, আপনার স্ত্রী আপনাকে কম আরামে রাখেন বলতে চান?

আঙুল তুলে অ্যাটাচড বাথ দেখিয়ে বললেন, মুখ-হাতে জল দিয়ে চেঞ্জ করে নিন, তোয়ালে টোয়ালে সব ওখানেই পাবেন. শাওয়ার আর বেসিন ট্যাপে ঠাণ্ডা গরম দু'রকম জলের ব্যবস্থাই আছে, অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, ঠাণ্ডা জল ছোঁবেনও না—

আলতো করে বড় ছেলে নকুল পাণ্ডে বলল, কেন, গরম জল যখন আছে একটু চানও তো করে নিলে পারেন...

রাগ দেখাতে গিয়েও মহিলা হেসে ফেললেন, দেখলেন? ওরা আমার সঙ্গে এই রকম করে—যান, আপনি আব দেরি করবেন না, বান্নার লোকটা আবাব নিজের কি বিদ্যে ফলাচ্ছে দেখে আসি। যেতে গিয়েও ছেলেদের দিকে চেয়ে থামলেন. তোমাদের চা পাঠিয়ে দেব?

মুখখানা নিরীহ গোছের করে সহদেব জবাব দিল, তুমি হুকুম করলে একেও সঙ্গ দিতে পারি—

—খুব যে! চকিত ভ্রূকুটি, তার পরেই প্রস্থান।

ব্যাপারটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না। ওদের দিকে তাকাতে নকুল হাসতে হাসতে বলল, ও কিছু না, আপনি সেরে আসুন, আমরা বসার ঘরে আছি—

...যত বড় লোকই হোক, মহিলাটি আর এই দুই ছেলেরও অন্তরঙ্গ হবার মতো সহজ গুণটুকু আছে তাতে সন্দেহ নেই। এটুকু সময়ের মধ্যেই আমার সংকোচ অনেকটা কেটে গেছে।

বাথরুম দেখেও খুশি। বেশ বড়সড়, ঝকঝকে। ঢোকার পর বেরুতে মিনিট পনেরো লেগে গেল। কনকনে শীত হলেও ট্রেনের লম্বা ধকলের পর সাবান আর গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে গা মুছে ফেলতে বেশ ভালো লাগল।

পাট-ভাঙা পাজামার ওপর পশমের গেঞ্জি আর গরম পাঞ্জাবি চড়িয়ে তারও ওপর শাল জড়িয়ে ঘর ছেড়ে আবার বৈঠকখানায় এলাম। হোস্টেস আর দুই ছেলের সামনে চায়ের খালি পেয়ালা। আমারও আসবে ধরে নিলাম, এ-সময়ে প্রথমে এক কাপ গরম চা মন্দ লাগবে না।

—আসুন, ইউ আর রিয়েল ফ্রেশ নাও। নকুল পাণ্ডের আপ্যায়ন এবং মন্তব্য।

আমাকে দেখেই অপ্রস্তুতের মতো অবন্তী উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, এই যাঃ একেবারে ভুলে গেছি! আমার যা মন হয়েছে না—

কেউই ভুলের হদিস পেলাম না। সহদেব জিগ্যেস করল, কি হল?

সখেদে জবাব দিলেন, ওঁর ব্যাপারে আমার আতিথ্য বাতিল করতে বীরেশ্বরবাবু তো আর কম চেষ্টা করেননি। বলেছিলেন, পাজামা-টামাতে ওঁর সুবিধে হয় না, বাড়িতে লুংগি পরা অভ্যেস, তাই শুনে আমি সুন্দর এক জোড়া লুংগি কিনে ধুইয়ে ইস্তিরি করিয়ে রেখে দিয়েছি অথচ মুখ-হাত ধুয়ে চেঞ্জ করে নিতে বলার সময়েও আর মনে পড়ল না—

দুই ছেলে হাসছে। আমি গম্ভীর।—খুব অন্যায় রকমের ভুল, রাতে শোবার আগে পাঠিয়ে দেবেন।

—তা তো দেবই। তারপরেই হাসলেন একটু, একবার নজর করে দেখে মন্তব্য করলেন, পাজামাতেই আপনাকে কিন্তু বেশ ভালো দেখাচ্ছে, লুংগিটা কিরকম যেন—

তক্ষুনি আবার বললাম, তাহলে আর পাঠাবেন না।

দুই ভাইয়ের হাসি মুখ। নকুল বলল, একটু আগেই মা বলছিলেন আপনার আসল গুণ হল সব লেখার মধ্যেই মানুষের জন্য আপনার খুব দরদ, কিন্তু আমরা দেখছি আপনি বেশ মজার মানুষ।

তার দিকে তাকালাম।—অনেকটা বেবুনের মতো বুঝি?

ওরা জোরেই হেসে উঠল।—ছি ছি, তা কেন—

অবন্তীও হাসছেন। বললেন, শুনুন, আমার রীতি হল সংকোচের ব্যাপার সরাসরি কাটিয়ে দেওয়া—আপনাকে আমার এখানে রাখার ব্যাপারে বীরেশ্বরবাবুর আরো আপত্তি ছিল কারণ, আপনার নাকি রাতে একটু আধটু ড্রিংক করার অভ্যাস আছে আর এই কড়া শীতে আপনার দরকারও নাকি—তাই ছেলেদের বলেছিলাম একটা ভালো কিছু এনে রাখতে—এনেছেও, আপনি কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না, এখানেই দিতে বলব, না আপনার ঘরে গিয়ে আরাম করে বিছানায় বসে খাবেন?

আমি ধূপ করে একটা সোফায় বসে পড়লাম। খানিক আগে ছেলেদের জন্য অবন্তীর দ— পাঠানোর প্রসঙ্গে নিরীহ মুখে সহদেব বলেছিল, তুমি হুকুম করলে এঁকেও সঙ্গ দিতে পারি। খুব যে বলে অবন্তী ভ্রুকুটি করে চলে গেছলেন। এতক্ষণে রসিকতার মর্ম বোঝা গেল। হতাশ সুরে বললাম, বীরেশ্বর হতভাগা আর কতভাবে আপনার কাছে আমাকে পথে বসিয়ে রেখেছে বলুন তো?

—তা কেন, উনি ভারি খোলা মনের মানুষ আর আপনাকে ভালওবাসেন খুব, আমি নেহাত নাছোড় বলেই আপনাকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আসছি—

চলে গেলেন। মিনিট তিন-চারের মধ্যে আমার জন্য নির্দিষ্ট সেই খাস ভৃত্য রামের আবির্ভাব। প্রথমে ট্রেতে একটা গেলাস আর এক জাগ জল রেখে গেল। তারপর একটা বিলিতি বোতলের প্যাকেট রেখে দ্রুত প্রস্থান করল।

কড়া শীতে লোভনীয় বস্তুই বটে। তবু বেশ বিব্রত বোধ করছি। বললাম, এ-জিনিস এখানে পেলে কোথায়—আর অনেক দামও তো নিশ্চয়।

সহদেব খুশি মুখে জবাব দিল, জিনিসটা পেয়ে গেলাম এতেই আনন্দ, দামের জন্য কি আছে—মায়ের তবু চিন্তা আপনার পছন্দ হবে কিনা।

সোৎসাহে উঠে প্যাকেট থেকে বোতলটা বের করে মুখ খুলে নিজের আন্দাজ মতো অর্থাৎ পরিমিত মাপে গেলাসে ঢেলে জিগ্যেস করল, ঠিক আছে?

মাথা নাড়লাম, ঠিক আছে।

গ্লাসে জল ঢালতে সহদেব বলল, মনে করে দুটো সোডাও এনে রাখলে হত, অসুবিধে হবে না তো?

হেসেই জবাব দিলাম, আমার অসুবিধের ঠেলা সামলাতে গিয়ে তোমাদেরই কম অসুবিধে হচ্ছে না, এরপর আর অসুবিধের কথা বোলো না। গেলাস তুলে নিয়ে দু'জনের দিকেই তাকালাম।—তোমাদেরও একটু-আধটু চলে তো বলো, ও-ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসলেই তোমাদের মা বুঝতে পারবেন।

নকুল জোরেই হেসে উঠল।—আমাদের চললে এই মা-কে আড়াল করার দরকার হত না।—বাবার এ-জিনিস এমন ভীষণভাবে চলত যে গুরুদেব ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কড়া শাসনে এর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

নিজের অগোচরে আমি দেয়ালের ওই মস্ত ফোটোর দিকে তাকালাম। অনড় পাথুরে চাউনি। বললাম দ্যাখো দেখি, তোমাদের মা বাধ্য হয়ে এ-সবের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মনে মনে কি না জানি ভাবছেন, আমার না হলে চলে না এমন নয়—

মজা পাওয়ার সুরে সহদেব বলল, মায়ের তাহলে আপনি কিছুই জানেন না—বিদেশে থাকতে এ-সব মা এত দেখেছেন যে এ-জিনিস তাঁর কাছে জল-ভাত ব্যাপার—মা কিছুই ভাবছেন না।

আমি উৎসুক।—বিদেশে থাকতে মানে?

—মা তো সাত বছর ফ্রান্স-এ ছিলেন, তার মধ্যে লণ্ডন সুইজারল্যাণ্ড স্পেন ওয়েস্ট জার্মানিও ঘুরেছেন।

জিগ্যেস করলাম, বিয়ের আগে না পরে?

—অনেক আগে, এ-সব তো আমরাও বাবা মারা যাবার পরে জেনেছি। মা নিজের সম্পর্কে কাউকে কখনো কিছু বলেন না, উনি এত দেশ ঘুরেছেন, তাঁর এত বিদ্যেবুদ্ধি এ কি আমরাই জানতাম—গুরুদেবের কথা শুনে পরে খুঁচিয়ে সব বার করেছি—গুরুদেব বলেন মা একাধারে শক্তি আবার লক্ষ্মী সরস্বতীও।

দুই ছেলের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে।—এদের গাড়িতে ওঠার আগে বীরেশ্বর ঘোষাল আমার মাথাটা টেনে কানে কানে বলেছিল, এখন যতোই রাগ করো তোমার শেষ ধন্যবাদ আমারই পাওনা হবে—এ-ও কেন যেন আর কথার কথা মনে হচ্ছে না।

মিনিট পনেরর মধ্যে অবন্তী এলেন, পিছনে আবার ট্রে হাতে রাম। সেটা রাখতে দেখা গেল তিনটে ডিশে বড় বড় দুটো করে কাবাব। ধোঁয়া উঠছে। মহিলার রুচিবোধের পুনরুক্তি থাক। বললেন, খানিক বাদেই ডিনারে বসবেন, তাই বেশি দিলাম না।

নকুল আর সহদেব খুশি হয়ে যে যার ডিশ তুলে নিল। নকুল বলল, দেখলেন, কোন জিনিসের সঙ্গে কি চলে মা ঠিক জানেন, এসব ওঁর নিজের হাতের তৈরি। মায়ের

হাতের রান্না খেয়ে সহদেব মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে তুমি নিশ্চয় ফ্রান্সের কোনো বড় রেস্তরাঁয় রাঁধুনিগিরি করেছ—

ঈষৎ চকিত গলায় অবন্তী বললেন, আবার এসব কথা কেন!

আমার কেমন মনে হল, এ-প্রসঙ্গ মনঃপূত নয়। সহদেব এ প্রসঙ্গের কারণ ব্যক্ত করল।—ড্রিংকের ব্যবস্থা করতে হয়েছে দেখে তোমার কথা ভেবে উনি লজ্জা পাচ্ছিলেন, তাই আমি বললাম বিদেশে থাকতে এসব মা এত দেখেছেন যে এ জিনিস তাঁর কাছে জল-ভাত ব্যাপার।

—সবেতে বিদেশের ঘাড়ে দোষ চাপাও কেন, তোমাদের বাড়িতেও এই ব্যাপার কম দেখেছি? বেশ গম্ভীর, নাকের হীরে এখন জ্বলজ্বল করছে মনে হল না।

দুই ভাইই অপ্রস্তুত একটু। সেটা নিশ্চয় ওদের মায়ের এই কথার কারণে নয়, বাবার বেশি মাত্রায় মদ চলত তা একটু আগে নিজেরাই বলেছে।

দুই

রাতে বিছানায় গা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ার কথা। ট্রেনের ক্লান্তি আর শীতের তাড়না দূর করার মতো রসদ মিলেছে, পরের ভোজন পর্বটিও চমৎকার হয়েছে। অতএব নিদ্রাদেবী তো চোখের পাতায় বসে। তবু এত সাধের ঘুম আসতে কিছু দেরি হল। মনের তলায় কৌতূহলের আঁচড় পড়েছে। পড়ছে।...কথা শুনলে ভদ্রমহিলাকে বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না, বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তেমনি অনুরাগ, কিন্তু সুশ্রী কালো মুখের আদল ঠিক বাঙালী মেয়ের মতো নয়।...সাত-সাতটা বছর, যত দূর মনে হয় যৌবনের সেরা কালটুকুই ফ্রান্সে কেটেছে—কিন্তু কেন বা কার কাছে? বাবা বা আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে হলে বিদেশের প্রসঙ্গ চটপট ধামাচাপা দিলেন কেন...আর ওই আলোচনার ফলে ছেলেদের ওপরেও একটু বিরক্তভাব দেখলাম মনে হল কেন? সাত বছর ফ্রান্সে থাকা মেয়ে বেনারসে এসে বিয়ে করলেন বয়স্ক দুই সন্তানের বাপ বিপত্নীক এক প্রৌঢ়কে, এ-ই বা কেমন কথা! বেনারসী শাড়ির বড় কারবারী হিসেবে ওই ভদ্রলোকের যত টাকাই থাক সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ আছে বলে তো মনে হয় না।...তাহলে টাকার লোভে এই বিয়ে? বড়লোকের গৃহিণী হবার লোভে?

আর একটা কথা মনে পড়ত ঘুম চটে যাবার দাখিল।...নকুল বলেছিল মায়ের মিষ্টি হুকুম আর বকুনি শুনতে তাদের ভালো লাগে। জবাবে আমি ওদেরও একটু প্রশংসা করেছিলাম, বলেছিলাম, তোমরাও মায়ের যোগ্য ছেলে। তাই শুনে একটু গাঢ় গলায় ওই ছেলে যেন নিজেদের ত্রুটি স্খালনের চেষ্টা করেছিল। তার কথাগুলো হুবহু মনে পড়ল। বলেছিল, আমরা যোগ্য ছিলাম না, এখন যতটা পারি যোগ্য হতে চেষ্টা করছি...আমাদের গুরুদেবের আশীর্বাদে মা-কে চিনেছি, এখন মনে হয় অনেক ভাগ্যের জোরে এমন মা পেয়েছি। এমন উক্তি নিছক ভাবাবেগের মাতৃস্তুতি হতে পারে না। এই উক্তি মহিলার এখানকার অর্থাৎ বারাণসীর পারিবারিক জীবনে কিছু সংঘাতের আভাস দেয়। এই দুই ছেলেও মা-কে ভুল বুঝেছিল এটুকু অন্তত স্পষ্ট।

খুব সকালেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ তাই প্রথমে ভেবেছিলাম রাত। হাত ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা। মনে হল তন্দ্রার মধ্যে কিছু বাজনা-টাজনার শব্দ কানে আসছিল। কান পাতলাম, ঠিকই শুনছি। দূরে কোথাও তবলা করতাল গোছের কিছু বাজছে। আর মিলিত গলার গানও ভেসে আসছে। আর একটু সজাগ হতে মনে হল আশপাশে বাড়ি নেই, গানবাজনা তাহলে এ-বাড়িতেই হচ্ছে। আরো একটু মনোনিবেশ করে বুঝলাম, তাই। ভোরের শীতে কম্বলের তলা থেকে বার হতে ইচ্ছে করছিল না। তবু মায়া কাটিয়ে উঠে পড়লাম। সোয়েটারের ওপর লম্বা শীতের কোর্তা চাপিযে দরজা খুলতেই গানের শব্দ আরো স্পষ্ট হল। এগিয়ে গেলাম। বৈঠকখানার ভিতর দিয়ে নিচে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। গানের শব্দ দোতলা থেকেই আসছে। অনেকগুলো মেয়ে একসঙ্গে ভোরের প্রার্থনা সংগীত গাইছে। বেশিরভাগই কচি গলা। সঙ্গে তবলা আর করতাল বাজছে।

কান পাতলে শুনতে মন্দ নয় হয়তো, কিন্তু আবার গিয়ে কম্বলের তলায় ঢোকার ইচ্ছেটাই বেশি। তাই করলাম। কিন্তু ফের শয্যা নিয়েও ঘুম আর এলো না। তাছাড়া জানালা দুটো খুলে দিয়েও ভুল করেছি। নেটের মশারির ভিতর দিয়ে বারাণসীর ভোরের আকাশেব খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

একটু বাদে একটা গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ কানে এলো। নকুল আর সহদেব চলে গেল মনে হয়। সেই রকমই কথা ছিল। খুব ভোরে উঠে চলে যাবে বলেছিল।

বাইরে চাকরবাকর বা দারোয়ানদের কথাবার্তা কানে আসছে। উঠেই পড়লাম। পুলোভারটা গায়েই ছিল। তপতপে গরম জলে বেশ করে মুখ-হাত ধুযে একেবারে শেভিং সেরে এসে লম্বা গরম কোটটা ফের গায়ে চড়ালাম। আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াতেই আমার দু চোখ স্থির একটু। ভালো লাগার কথা, ভাল লাগছেও, কিন্তু এই সকালের ঠাণ্ডায় এটুকু প্রত্যাশিত নয়।

সুন্দর একটা বেতের সাজি হাতে অবন্তী বাগানে ফুল তুলছেন। খালি পা। পরনে সাদাব ওপর সাদা ডুরের পাতলা শাড়ি। গায়ের সাদা ব্লাউজটাও গরম মনে হল না। গরম চাদরটাদরেরও বালাই নেই। খোলা আর্দ্র চুল পিঠে ছড়ানো। দেখলেই বোঝা যায় স্নান সারা। গাছ দেখছেন, ধীরেসুস্থে বেছে বেছে ফুল তুলছেন। আমি অপলক চেয়ে আছি। কালো পাথরে খোদা সচল মূর্তির মতো লাগছে। কটিতল কটিদেশ পেট বুক গলা সবই যেন স্রষ্টার হিসেবী মনোযোগে গড়া। ধীরে হাঁটা বা ঝুঁকে ফুল তোলার সময়েও ওই দেহসম্ভারে নিঃশব্দ সাড়া জাগে লক্ষ্য করছি।

বেরিয়ে এলাম। কাছাকাছি আসতেও টের পেলেন না।

—সুপ্রভাত।

চকিতে ফিরলেন। হাসলেন। দিনের আলোয় নাকেব হীরে অত ঝলসায় না, তবু আগের ভাগে চোখে পড়ে।

—সুপ্রভাত।...আপনার প্রভাত এত সকালে হয় নাকি, কখন উঠেছেন?

—অনেকক্ষণ। সিঁড়ির কাছে এসে আপনার মেয়েদের প্রভাত-বন্দনা শুনলাম।

—তাই নাকি! ওপরে উঠে এলেন না কেন? থমকালেন।—ওদের গানের চোটে আপনার ঘুম ভেঙে যায়নি তো?

—না, আমার বরাত ভালো, এখন এই দৃশ্য দেখব বলেই হয়তো ঘুমটা ভেঙে-ছিল।

না বুঝে তাকালেন, কোন দৃশ্য? তারপরেই হেসে ফেললেন, ও...ভারী তো দৃশ্য।

—আচ্ছা, আপনার শীত বলে কি সত্যি কিছু নেই নাকি? কাল রাত দশটায় চান আবার এই ভোরেও চান! ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে একটা গরম চাদরও গায়ে নেই...

হেসে বললেন, শীতের সকালে গরম জলে বেশ করে চান করতে কত আরাম আপনি জানেন না তাহলে, চানের পর আর শীতটীতও করে না।

—এ তো জানতাম না...তাহলে আমিও গিয়ে এক্ষুনি ও-পাট সেরে ফেলে আরামের ভাগীদার হই?

—না না! আপনার অভ্যেস নেই, সহ্য হবে না। তারপর হাসতে লাগলেন।—দেখুন যে-দেশে আমি সাত-সাতটা বছর কাটিয়েছি সেখানে আমি আর কিছু শিখি না শিখি শীত সহ্য করার বিদ্যেটা খুব ভালই রপ্ত করেছি।

...কাল ছেলেদের মুখে মায়ের বিদেশে থাকার প্রসঙ্গে বিরক্ত হতে দেখেছি, আজ নিজেই তুললেন।

...ফ্রান্স?

...হ্যাঁ।

...আপনার কোন বয়সে ছিলেন সেখানে?

কালো টানা চোখ মুখের ওপর থমকালো একটু।—চব্বিশ থেকে প্রায় একত্রিশ...

একটু ইতস্তত করে বললাম, কৌতূহল অশোভন হচ্ছে কিনা জানি না...ফ্রান্সে সাত বছর কি সুবাদে ছিলেন?

বিরক্তি বা দ্বিধার ছিটেফোঁটাও দেখলাম না। সোজা চোখে চোখ রেখে অল্প অল্প হাসছেন। হালকা জবাব দিলেন, অদৃষ্টে ছিল সেই সুবাদে ছিলাম।...এটুকু কৌতূহল না থাকলে আপনি আর এতবড় লেখক কেন। এবারের হাসিতে সাদা দাঁতের সারি ঝিকমিক করে উঠল, বললেন, আপনার কৌতূহলের অধিকার আমার জবাব দেবার বা না দেবার অধিকার—তা বলে আপনার কৌতূহল অশোভন ভাবতে যাব কেন, যা মনে আসে জিগ্যেস করবেন, কেবল ছেলেদের সামনে নয়, ওরা ভাবে ওদের মা মস্ত কলাবিশারদ হবার জন্যই সাত সাতটা বছর ও-দেশে কাটিয়ে এসেছে—ফাঁক পেলেই ওখানকার গল্প শোনার জন্য খোঁচায়। চলুন, অত ভোরে উঠেছেন, অনেক আগেই আপনার চা পাওয়া উচিত ছিল—

এই আলাপের বিরতি কাম্য ছিল না। আপত্তি না করে সঙ্গ নিলাম।

বাড়িতে ঢুকে রামকে চায়ের আয়োজন করতে বলে আমার দিকে ফিরলেন।—দোতলায় চলুন, আমার মেয়েদের দেখাই।

উনি সাজি হাতে আগে আগে উঠছেন, আমি পিছনে। অবাধ্য চোখ দুটোকে শাসনে বাঁধার চেষ্টা আমার, যদিও আপ্ত বাক্যের ওজর তুলে 'এ থিং অফ বিউটি'কে 'জয় ফর এভার'-এ টেনে নিয়ে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে দিতে পারি।

দোতলার তিন সিঁড়ি আগে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেয়ালে কোনো সাধকের মস্ত একটা ফোটো।...অবন্তী আগে উঠে এগিয়ে গিয়ে ফোটোর সামনে সাজিসুদ্ধ দুহাত জোড় করে

প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মাথা নুইয়ে প্রণাম করে ফিরলেন। ছবির দিকে আমার দৃষ্টি সংবদ্ধ দেখে বললেন, আমার গুরুদেব—

এই পরিবারের গুরুদেবের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে আঁচ করতে পারি। গত রাতে নকুল আর সহদেব এঁরই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিল। ভালো করে দেখলাম। দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ পুরুষ, সাদা থান ধুতি দোপাট করে লুঙ্গির মতো করে পরা, অনাবৃত শরীরের এক কাঁধে ভাজ-করা সাদা চাদর, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। বুদ্ধিদীপ্ত হাসি-ছোঁয়া আয়ত-পক্ষ্ম জীবন্ত চোখ। ঠোঁটে মুখে চাউনিতে কাঁচা মিষ্টি হাসি। এঁদের বয়স আঁচ করা শক্ত, তবু কোনো মতেই ষাটের বেশি মনে হয় না।

জিগ্যেস করলাম উনি আছেন?

সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন, আছেন বইকি, কিন্তু কোথায় তা জানি না। আজকালের মধ্যেও দেখা পেতে পারি, আবার দু'তিন বছরের মধ্যেও না পেতে পারি।

—কি নাম?

—ভক্তরা ওঁকে ব্রহ্মমহারাজ বলে ডাকেন, এই পরিবারের উনি ব্রহ্মগুরু...পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরেছেন, নকুল সহদেবের ঠাকুরদা ওঁর কৃপা পেয়েছিলেন, আমরাও পাচ্ছি।

শুনে একটু অবাক আমি, বললাম, কিন্তু এর বয়স তো বেশি মনে হয় না?

—এই ছবি দেখে বয়েস ঠাওর করতে পারবেন না, এটা ষাট বাসট্টি বছর বয়েসের ফোটো, এর পর থেকে তিনি আর কাউকে ফোটো তুলতে দেননি, এখন তাঁর বয়েস আশির ওপরে হবে, কিন্তু এখনো অনেকটা এইরকমই মজবুত আর তাজা আছেন। ...আমার জীবনে উনি মস্ত আশীর্বাদ।

গুরুদেবের প্রসঙ্গে গত রাতে নকুল সহদেবেরও খুব ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব দেখেছি। কিন্তু এই মহিলার কেবল ভক্তিশ্রদ্ধা নয়, দুই চোখে যেন সমর্পণ দেখছি।

এ-দিক ও-দিক থেকে তিন-চারটে মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বয়েস ন' দশ থেকে তের-চৌদ্দর মধ্যে। একজনের হাতে ফুলের সাজি দিয়ে বললেন, সক্কলকে ডেকে নিয়ে আমার ঘরে আয়। আমাকে ডাকলেন আসুন—

তাঁর ঘর বলতে শুধুই ঘর একটা। মস্ত বড়। শৌখিন টাইলের তকতকে মেঝে। খাট চৌকি বিছানা এমন কি কোনো আসবাবপত্র পর্যন্ত নেই। দেয়াল-তাকের থেকে একটা আসন এনে মেঝেতে পেতে দিলেন।

—বসুন।

বসতে ইচ্ছে করল না। খালি পায়ে ঘরটার এ-মাথা ও-মাথা করলাম একবার। স্যাণ্ডেল জোড়া সিঁড়ির কাছেই ছেড়ে এসেছি।

মেয়েরা সব এলো। তাদের মায়ের ইশারায় আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। আমি গুণে দেখলাম যোলটি মেয়ে। বয়েস সাত থেকে চৌদ্দ পনেরর মধ্যে। লক্ষ্য করলাম, পাঁচ ছ'টি মেয়েকে অন্তত বাঙালী মনে হল না। ছোটদের পরনে ফ্রক, বড়দের স্কার্ট-ব্লাউস, সকলেরই গায়ে একই রঙের আর একই রকমের পুরো হাতের গরম জামা। খুশি হয়ে বললাম, সকালে তোমাদের গান শুনেছি, তোমরা লেখা-পড়াও করো তো?

বড় দু তিনটি মেয়ে জবাব দিল, আমরা সবাই স্কুলে পড়ি।

—স্কুল কত দূরে, যাতায়াত করো কি করে?

এবারে বড় একজন জবাব দিল, মা আমাদের জন্য একটা বাস ঠিক করে দিয়েছেন, নিয়ে যায় আর দিয়ে যায়।

উৎসাহের সুরে মহিলা বললেন, আর কি করিস তোরা বল্—ইনি একজন মস্ত লোক, বড় হয়ে জানবি।

সেই মেয়েটিই জবাব দিল, আর আমরা গান করি, সেলাই শিখি, আঁকা শিখি—

—হয়ে গেল? তোদের ঘর ঝাঁট-পাট করে পরিষ্কার রাখা জামা-কাপড় কাচা ইস্তিরি করা—এসব কে করে?

মায়ের কথায় লজ্জা পেয়ে কয়েকজন সমস্বরে জবাব দিল, আমরাই করি। একটু আধটু রাঁধিও।

যেতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এবার হাত জোড় করে নমস্কার করে একসঙ্গে চলে গেল। সত্যিই ভারী ভালো লাগছিল। আমার মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো, আশ্রম করে ফেলেছেন দেখছি, এত মেয়ে পেলেন কোথায়?

হেসে জবাব দিলেন, আমার গুরুদেবের উপহার, একটি দুটি করে এনে হাজির করেন, বলেন, এই তোমার আরো মেয়ে, মানুষ করো...গুরুদেব আমাকে এই সাধনার দিকে ঠেলেছেন।

একটু বাদে একসঙ্গে নেমে এলাম। ভিতরে একটা অকারণ আনন্দ গোছের অনুভূতি। সাত বছর ফ্রান্সে থাকা মহিলার ফিরে এসে এত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও যদি এই রূপান্তর হয়, তাহলে ওই গুরুদেবটিকে শক্তিমান পুরুষই বলতে হবে—কিন্তু মহিলার নিজস্ব কোনো প্রবণতা না থাকলে এমনটি হওয়া সম্ভব কি?

প্রাতরাশের আয়োজনও কম কিছু নয়। ফল রুটি মাখন ডিম জেলি ছেড়ে বড় বড় দুটো মাংসের কাটলেটও আছে। আমি আঁতকে উঠলাম, সকালেই এই!

—শুরু করুন তো, যা পারেন খাবেন। নিজের জন্য এক পেয়ালা চা শুধু ঢেলে নিলেন।

—সে কি, আপনার এ-সব কিছু চলবে না?

হেসে জবাব দিলেন, সকালে আমার বার দুই চা আর একবার কফি ছাড়া আর কিছুই চলে না।

গত রাতেই লক্ষ্য করেছি, আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসলেও ওঁর আহার নিরামিষ।

চায়ের পাট শেষ হতে বললেন, আপনার জন্য একটা গাড়ি মজুত, ইচ্ছে করলে বেড়িয়ে আসতে বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেন...একটায় লাঞ্চ করবেন তো?

—যে পর্যন্ত চালালাম এখন তো মনে হচ্ছে লাঞ্চের আর দরকার হবে না...আপনি সকালে বেরুবেন না?

মাথা নাড়লেন, আমি আজ সকালে আর না, একেবারে বিকেলের ওপেনিং সেরিমনিতে যাব, আপনি রেডি হোন, আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি—

শেষ পর্যন্ত আমারও আর বেরুতে ইচ্ছে করল না। বীরেশ্বর ঘোষালকে একটু একলা পাওয়ার ইচ্ছে [illegible] আর ওখানে দুটি রসিক অগ্রজ সাহিত্যিক মোতায়েন, আমাকে

পেলেই ছেঁকে ধরবেন। তাছাড়া এই সন্ধ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অতিথি অভ্যর্থনা গান-বাজনা নাটকের ভিতর দিয়েই শেষ। কিন্তু কাল সকালের অধিবেশনে আমার কিছু গুরু-দায়িত্ব আছে। বর্তমান সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি থেকে শ্লীলতা অশ্লীলতার উপসংহারে এসে পৌঁছুতে হবে। বাংলার কড়া অধ্যাপক হিসেবে বীরেশ্বর ঘোষালের পত্রাঘাত মনে আছে, লিখেছিল, তোমাদের আজকের সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার যমজ সৃষ্টির মৌসুম চলেছে। কদাকার রসও রস বটে, কিন্তু রসের গুণগত বৈষম্য সম্পর্কে তোমার বলিষ্ঠ বক্তব্য আশা করব। ভাবলাম, আজ রাতে আর সময় পাব না, কাল সকালেও না, তাই এখনই একটু প্রস্তুতি হিসেবে কিছু পয়েন্ট নোট করে রাখা দরকার।

বিকেলেও গাড়ি নিয়ে একলাই বেরুতে হল কারণ অবন্তী জানালেন, বাসটাকে বলে রাখা হয়েছে, প্রথম দিনের উৎসবে তাঁর মেয়েরাও যাবে, আর তাঁর সঙ্গে কিছু সরঞ্জাম যাবে। একেবারে উৎসব প্রাঙ্গণে এসে নামলাম।

অগ্রজ দুই সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হতে তাঁরা এক-হাত নিলেন আমাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে একজন বললেন, সকালে তোমাকে ঘোষালের বাড়িতে আশা করেছিলাম, এলে না মানেই বেশ মৌজে ছিলে বোঝা গেল।

অন্যজনও টিপ্পনী কাটলেন।

এঁদের নির্দোষ রসনায় ইন্ধন যোগানো নিরাপদ নয়। সরে পড়লাম। বীরেশ্বর ঘোষাল ব্যস্তসমস্ত। হবারই কথা। খানিক বাদে একটু সময়ের জন্য সে-ই আমার পাত্তা নিল।
—কি ব্যাপাব, তোমার হেপাজতে তো একটা গাড়ি থাকার কথা, সকালে তোমাকে খুব আশা করেছিলাম, এলে না তো?

বললাম, কালকের দায়িত্ব পালনের জন্য একটু ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ছিলাম—

—ভাবনা-চিন্তার মধ্যে ছিলে? —চালাকি পেয়েছ? অবন্তীর আতিথ্য কেমন লাগছে আগে বলো—

—ভালোই। কিন্তু তোমার মতলবখানা কি, আমাকে ওঁর কাছে ঠেললে কেন?

—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছ নাকি! এ বয়সের একটি অভিজাত মহিলা তোমার মতো একজন সাহিত্যিককে কেন একান্তে পেতে চায় সে চিন্তা তোমার মাথায় আসেনি? ভদ্রমহিলার জীবনে একটা মস্ত অতীত আছে এ বুঝতে পারছ না? তোমার সম্পর্কে তাঁর অনেকদিন ধরে বিশেষ আগ্রহ দেখছি, ভি. পিতে তোমাব বই আনিয়ে আগে নিজে পড়ে তারপর লাইব্রেরিতে পাঠায়—সব নিজের খরচে।...আমার ধারণা, সেই অতীত তাঁর কাছে একটা বোঝার মতো হয়ে উঠেছে, এই বোঝা তিনি হালকা করতে চান তাই মনের মতো একজন দরদী লেখক খুঁজছেন, এরপর শুধু রাজসিক আতিথ্য নিয়েই তোমাকে যদি বেনারস ছাড়তে হয় তো ধরে নেব তুমি তাঁকে হতাশ করেছ—তাঁর আস্থাভাজন হতে পারোনি।

বীরেশ্বরের একটা কথা আমার মগজে আটকে গেল। যে অনুভূতিটা ধরা-ছোঁয়াব মধ্যে আসছিল কিন্তু সকালে সেই শব্দটা মাথায় আসছিল না। ভদ্রমহিলার বড় রকমের একটা অতীত আছে। হ্যাঁ, গত সন্ধ্যা থেকে আজ এই পর্যন্ত তাঁকে দেখে এই একটা কথাই তাঁর সম্পর্কে খাটে, এমন এক অতীত আছে যা তাঁকে এই বর্তমানের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, ভদ্রমহিলা চব্বিশ থেকে একত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ফ্রান্সে কাটিয়ে এই বেনারসে এসে বড় বড় দু' ছেলের বাপ মাঝবয়সী এক বেনারসীওয়ালাকে বিয়ে করে বসলেন এ-ই বা কোন্ অতীতের ব্যাপার?

বীরেশ্বর সানন্দে আমার পিঠ চাপড়ে দিল, এক রাতের মধ্যে বেশ তো এগিয়েছ হে! আমরা গত চার পাঁচ বছরের মধ্যেও এর বেশি এগোতে পারিনি। ছাই ওড়াও —মাথা খাটিয়ে ছাই উড়িয়ে যাও, অমূল্য রতন ঠিক পেয়ে যাবে। এবার যাই, তোমরা এসে আমাদের কতখানি উদ্ধার করেছ ডায়াসে উঠে একথা তোমাদেরই ফলাও করে শোনাতে হবে, এখানে বোসো, পাশে একটা জায়গা রেখো, ফাঁক পেলেই আসছি। এগিয়ে গিয়েও কি মনে পড়তে আবার ঘুরল। —ভালো কথা, আমাদের সমাচার সেনশর্মার সঙ্গে তোমার এখনো দেখা হয়নি তো? তোমার খোঁজে আজ সকালে আমার বাড়ি এসেছিলেন, সন্ধ্যায় এলে এখানে দেখা হবে বলেছি।

সাগ্রহে জিগ্যেস করলাম, তিনি এখন মৌনী না সবাক?

—সবাক। ব্যস্ত পায়ে প্রস্থান।

বেনারসে আমার অন্তরঙ্গ দীর্ঘদিনের পরিচিত এই আর একটি চরিত্র। বলা বাহুল্য সমাচার সেনশর্মা তাঁর নাম হয়। নাম ফণীন্দ্র সেনশর্মা। কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ যথা সময়ে।

কলকাতার অভ্যাগতদের প্রথম সারিতে বসানো হয়েছে।

ডায়াসের ড্রপসীন উঠল। সকলের উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সভাপতি বীরেশ্বর ঘোষাল বিপুল হাততালির মধ্যে পঞ্চাশ বছর আগের প্রতিষ্ঠাতার বড় ফোটোতে মালা পরালো। চারদিকে এবং পিছনে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল সভাঙ্গন সভ্য এবং স্থানীয় আমন্ত্রিতজনে ঠাসা। বীরেশ্বর ঘোষাল তার পরিমিত ভাষণে প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশ বছরের গৌরবের অধ্যায়ের কথা বলল, কিছু সরস স্মৃতিচারণ করল, আর শেষে অনুষ্ঠানে তাদের আন্তরিক আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা তথা বাংলার যে-সব দিকপাল কবি সাহিত্যিকরা এখানকার সংস্কৃতি সভা উজ্জ্বল করতে এসেছেন তাঁদের উদ্দেশে যে ভাব আর ভাষায় অভ্যর্থনা এবং কৃতজ্ঞতা জানালো তার সারমর্ম তাঁদের পদার্পণে সংস্কৃতি-রসিক বারাণসীবাসীরা ধন্য।

ভাষণ শেষ হতে মাইকে পরের ঘোষণা শুনেই আমি উৎসুক। অভ্যাগতদের এবারে গান গেয়ে স্বাগত জানাবেন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পেট্রন এবং লাইব্রেরি শাখার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী অবন্তী পাণ্ডে।

না, উৎসুক কেবল আমি নই, চারদিক থেকে বিপুল এবং সাড়ম্বর করতালি শুনে বোঝা গেল মহিলার অনুরাগীর সংখ্যা এখানে কম নয়।

ভিতর থেকে একটি শুধু হারমোনিয়াম এলো। আর কোনো বাজনা নয়। তারপর অবন্তী পাণ্ডে এসে করজোড়ে সভাকে প্রণতি জানালেন। মনে পড়ল, স্টেশনে বীরেশ্বর বলেছিল বটে, এঁর আসল গুণের পরিচয় কাল মিলবে। এই গুণ তাহলে গান।

কান পাতলাম। চক্ষুও সজাগ প্রসারিত। মনে হল নাকের হীরের ছটায় ডায়াসের দিনের মতো সাদাটে আলোও ম.. খাচ্ছে। আমার ধারণা, সব দর্শকেরই দৃষ্টির অনেকখানি বোধহয় ওই হীরে কেড়ে নিচ্ছে।

ছেদ পড়ল একটু, নিঃশব্দে বীরেশ্বর এসে পাশের খালি চেয়ারে বসল। অস্ফুট স্বরে বলল, শুরুর আগেই তন্ময় যে একেবারে, আমার স্তুতি কেমন লাগল?

—তোমাকে চাটুকলা বিশারদ উপাধি দেওয়া যেতে পারে।

কানের কাছে মুখ এনে বলল, শ্রীমতীর হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গীখানা দ্যাখো, দেখলে বুড়ো হাড়ে দুব্বো গজায়, এঁর গান চাখার সুযোগ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছ নাকি?

মাথা নাড়লাম।

স্বাগত গান ভালোই লাগল। উচ্ছ্বাসশূন্য সাদাসিধে বয়ান। সাদাসিধে মিষ্টি সুর। এতে শিল্পনৈপুণ্যের ছোঁয়া তমন নেইই, কেবল একটু আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। নিটোল মিষ্টি গলা অবশ্যই, কিন্তু এ-গান উচ্ছ্বসিত হবার মতো কিছু নয়।

শেষ হতেই চারদিক থেকে বায়নার রব উঠল।—ভজন! একখানা ভজন চাই! একখানা না দু'খানা!

ডায়াসের গায়িকা হাসি মুখে একটু মাথা নেড়ে খুশির অভিব্যক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর উইং-এর দিকে তাকিয়ে কাউকে কিছু ইশারা করলেন।

পাশ থেকে বীরেশ্বরের মন্তব্য, এবারে মন দিয়ে শোনো।

মঞ্চে এবারে একাধিকজনের প্রবেশ। একজনের হাতে তানপুরা, একজনের হাতে বায়া-তবলা, একজনের হাতে হাত-বাজনার মতো কিছু। অবন্তী পাণ্ডে হারমোনিয়াম সরিয়ে তানপুরা নিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর বসার ভঙ্গীও একটু বদলালো। কান গাল আর মুখের খানিকটা তানপুরায় ঠেকল।

—না-রা-য়-ণ-অ!

আচমকা এত মানুষের বুকের তলায় শিহরণ তুলে নারায়ণ শব্দটা যেন সুরের সপ্ত লহরী বিচরণ করে শমে মিশল। আর তারপর এ-কি ভজন!

নারায়ণ যিনকে হিরদয়মে
সো কুছ করম করে না করে।
নাও মিলি যিনকে জল অন্দর
বাঁহমে নীর তরে না তরে।
পরশমণি যিনকে ঘর মাহি
সো ধন সঞ্চ ধরে না ধরে।
সূবযকো পরকাশ ভ্যায়ো যব
দীপকি জ্যোত জ্যরে না জ্যরে।

নারায়ণ যার হৃদয়ে সে কিছু কর্ম করলেই বা কি না করলেই বা কি। দরিয়ায় নেমে যে নৌকো পেয়ে গেছে, নৌকো সে বাইলেই বা কি না বাইলেই বা কি। পরশমণি যার ঘরে মজুত সে ধন সঞ্চয় করলেই বা কি না করলেই বা কি। সূর্যের প্রকাশ যদি হয়েই যায় তখন দীপ জ্বললেই বা কি না জ্বললেই বা কি। এতবড় সভা স্তব্ধ, সমাহিত।

পরেও পনের বিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত সভা নিশ্চেতন। তারপরেই সমবেত বিপুল উল্লাস আর করতালি।

ঘড়ি দেখলাম। প্রায় আধ ঘন্টা গেয়েছেন ওই ভজন। কিন্তু মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিটও নয়। শ্রোতারা তাঁকে উঠতে দিল না। চারদিক থেকে চিৎকার, অনুরোধ। আর একখানা! আর একখানা!

অগত্যা আবার তানপুরায় গাল ঠেকালেন। পাশ থেকে বীরেশ্বরের বাহুর ধাক্কা খেলাম। —কি জ্ঞানে আছ না অজ্ঞানে?

—দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থা।

একটু বাদে কানে বুঝি মধুবর্ষী উদাত্ত অমৃতধারা। একে গান বলব কি স্তব বলব কি বিচিত্র স্তোত্র-চারণ বলব জানি নে। একটা নিটোল সুর উঠছে নামছে কাঁপছে সমর্পণে লুটিয়ে পড়ছে :

কর্মপাশনাশ নীলকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
শর্মদায় নর্মভস্মকণ্ঠ তে নমঃ শিবায়।
জন্মমৃত্যুঘোরদুঃখহারিণে নমঃ শিবায়।
চিন্ময়ৈকরূপদেহ ধারিণে নমঃ শিবায়।

আমার শিরায় শিরায় রক্ত কাঁপছে। সামনের ডায়াসে এই কাকে দেখছি আমি? রানী অহল্যাবাঈ? শোকে দুঃখে পাথর ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ মরজীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে নমঃ শিবায় এই প্রণাম মন্ত্র জপ করে করে ঊষর অন্তরে শিবশংকরের করুণাধারায় সন্ধান পেয়েছিলেন। এই মন্ত্র তিনি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য ছড়িয়ে রেখে গেছেন —নমঃ শিবায় নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়।

শেষ হল। শ্রোতারা আবার হাততালি দিতে ভুলে গেল। সেই ফাঁকে তানপুরা রেখে সভাকে প্রণাম জানিয়ে মহিলা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। তখন সচেতন শ্রোতাদের হাততালির ধুম।

বীরেশ্বর ঘোষাল উঠে গেল। এরপর আবৃত্তি নৃত্যানুষ্ঠান আরো কি কি। মন এত ভরে আছে যে এসব আর কিছুই ভালো লাগবে না। মনে হল এই ফাঁকে সমাচার সেনশর্মার কাছে চলে যাই। কাছেই গাড়িতে রামাপুরা পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। কিন্তু যাঁর গাড়িতে যাব তাঁকে বলে যাওয়া দরকার মনে হল।

তাঁর মেয়েরা সব ও-দিকের তৃতীয় সারিতে বসে আছে। সেখানে উনি নেই। ভিতরে পেলাম। বললাম, আজ বেনারসে আসা আমার সার্থক হল মনে হচ্ছে, আর যে দু'দিন আছি কান-মন আরো ভরে না নিয়ে যাচ্ছি না।

শুনে ভারী খুশি। বললেন, ভালো কথা তো...ওই শিব স্তোত্র আমার গুরুদেবের মুখে শুনে শেখা, আপনি তাঁর গলায় শুনলে ভুলতে পারতেন না।

—আমি অহল্যার মুখে শুনলাম, এ-ও ভুলতে পারছি না। উনি লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলেন। বললাম, আমি একটু ঘুরে আসছি, আপনি কতক্ষণ আছেন বা গাড়ির দরকার আছে কিনা জিগ্যেস করতে এলাম।

—না, আমার সঙ্গে তো বাস আছে, আপনি গাড়ি নিয়ে যান।

তিন

সমাচার সেনশর্মা বছরে দুবার আমাকে চিঠি লেখেন। একবার নববর্ষে, একবার বিজয়ায়। তাও চিঠির শেষে নিজের নাম ফণীন্দ্র সেনশর্মা লেখেন না। লেখেন, ইতি আপনাদের সমাচার সেনশর্মা।

শুনেছি এই নাম প্রথম নিঃসৃত হয়েছিল তাঁর ঠাকুমার শ্রীমুখ থেকে। ফণীন্দ্রবাবু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। বারাণসীর টোলে অধ্যাপনা করেছেন। যৌবনে এবং তার পরেও কিছুকাল বারাণসী সমাচার নামে একখানা পাক্ষিক কাগজ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। গোড়ায় এই উদ্যমের সঙ্গে আরো জনাকতকের উৎসাহ যুক্ত ছিল। কিন্তু সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়তে খুব সময় লাগেনি। ক্রমে দেখা গেল ফণীন্দ্র সেনশর্মা একাই ওই সমাচারের সম্পাদক, প্রিন্টার, প্রুফরিডার, ক্যানভাসার এবং একনিষ্ঠ পাঠকও। টোলের অধ্যাপনার সময়টুকু ছাড়া এই সমাচারই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাঁরই মতো তাঁর জনাকতক সাগরেদ ছিল। এখনো আছে। তাঁরই মতো তারাও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতো, অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে বিনা পয়সায় কাশীর সমাচার সংগ্রহ করে তাঁর হেপাজতে পৌঁছে দিত। ভাঙা বাড়ির বাইরের ঘরে এই সাগরেদদের নিয়ে ফণীন্দ্রবাবুর জমজমাট আড্ডা বসত। ভিতর থেকে তখনই প্রায়ই তাঁর ঠাকুমাব গলা শোনা যেত, ওরে ও সমাচার, তোর কি নাওয়া-খাওয়া আছে, না আমি সবকিছুতে জল ঢেলে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ চায় বেরিয়ে পড়ব?

ভদ্রলোকের সমাচার নামের উৎস এই। সমাচারের অস্তিত্ব অনেক দিনই ঘুচে গেছে। নামটা শুধু থেকে যায় নি, একান্ত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

সেই পাক্ষিক কাগজের অস্তিত্ব আর না থাকলেও তার একটা নামগত প্রভাব ভদ্রলোকের ওপর থেকেই গেছে। কাশীর সমস্ত সমাচার এখনো তাঁর কানে যত পৌঁছয় তেমন আর কারো না। তার সেই সাগরেদরা এখন কেউ প্রৌঢ় কেউ বা বৃদ্ধ, আড্ডা দিতে বসে রসিয়ে বসিয়ে এখনো তারা গোটা কাশীটিকে তার ঘরের মধ্যে এনে উপস্থিত করে।

এখানকার সুধিজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে ভালবাসে আবার তাঁকে নিয়ে মজাও পায়। পাণ্ডিত মানুষ কিন্তু পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। বুদ্ধিমান কিন্তু বুদ্ধি জাহির করেন না। মিতবাক। আজ অনেক বছর ধরে বাক-সংযমের মহড়া দিয়ে চলেছেন। মাসে পনেরো দিন মৌন থাকেন, তখন তাঁর তরফ থেকে বাক্যালাপ বা প্রশ্নোত্তর চলে শ্লেটে লিখে লিখে। তখন বড় একটা শ্লেট আর পেন্সিল সর্বদাই সঙ্গে মজুত থাকে। মৌনীকালে ভুলেও একটি কথা বলে ফেলেন না। সমাচাব ঝাড়াবাছা করে বিশ্লেষণেব অভ্যাসের দরুনই হয়তো ভদ্রলোক একটু বেশী মাত্রায় সত্যনিষ্ঠ। এমনিতে অমায়িক, কিন্তু সত্যের খাতিরে অনেক সময়ে একটু রূঢ় বা ক্রূরও হয়ে উঠতে পারেন।

গাড়ি তাঁর গলির মুখে ঢুকবে না। গলিটাও অন্ধকার। সঙ্গে একটা টর্চ থাকলে ভালো হত। নেই। অনেকবার এসেছি, তাই একতলা ভাঙা বাড়িটার হদিস পেতে অসুবিধে হল না।

—সমাচার সেনশর্মা আছেন নাকি?

দ্বিতীয়বার ডাকতে হল না। সামনের ঘরটাতেই তিনি থাকেন, আবার ওটাই তাঁর সাধনক্ষেত্র। এক ডাকেই নড়বড়ে দরজাটা খুলে গেল। —শুভায় ভবতু, আসুন আসুন!

ঘরের আলোটা পঁচিশ পাওয়ারের বেশি হবে না। তাতেও ময়লা জমেছে আর ডোমটায় ময়লা জমেছে বলে এই কিশোরী রাতেও ঘরের আলো-আঁধারি দশা। তিনি হাত ধরে আমাকে ভিতরে নিয়ে এলেন, কাঠের চেয়ারের বইয়ের স্তূপ সরিয়ে নিজের ধুতির খুঁট দিয়ে ঝেড়ে আমাকে বসতে দিলেন, আর চৌকির ওপর থেকে পুঁথিপত্র একপাশে ঠেলে সরিয়ে নিজেও মৌজ করে বসলেন।

বললাম, আপনাকে আজ ক্লাবের ওপেনিং ফাংশনে সবাই আশা করেছিল।

হাসলে ভদ্রলোকের বড় দাঁতের সারি একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়। বললেন, আপনার কথা ভেবেই যাব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু কাজে বসে গিয়ে আর হয়ে উঠল না।

—কাজে ব্যাঘাত ঘটালাম নাকি তাহলে?

—অমায়িক জবাব, কিছুমাত্র না, না যাওয়াটা স্বভাবগত ভুল। ...আসছেন জেনে আপনার খবর নিতে আমি ঘোষাল মশাইয়ের বাড়িতে গেছলাম।

—শুনেছি। ওর মুখ থেকেই আপনার এখন মৌনী কাল চলছে না শুনে আশ্বস্ত হয়েছি।

সামান্য হেসে আমাকে একটু নিরীক্ষণ করলেন। —বারাণসীধামে এসে এবারে বেশ রসেবশেই আছেন তাহলে?

—কি রকম? আমিও হাসলাম।

—এবারে আপনি অবন্তী মালহোত্রার মাননীয় অতিথি শুনলাম...তিনিই নাকি আগ্রহ করে আপনাকে তাঁর হেপাজতে নিয়ে গেছেন।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, অবন্তী মালহোত্রার অতিথি!

—সে-রকমই তো শুনলাম...নাকি ভুল শুনলাম!

—আমি তো জানি আমি অবন্তী পাণ্ডের অতিথি!

—তাই বুঝি...তাহলে আমারই কিছু ভুল-চুক হয়ে থাকবে, বয়েস তো কম হল না। একটু চা করে নিয়ে আসি?

চায়ের তৃষ্ণা নেই, তাছাড়া রাজি হলে ওঁকেই করে আনতে হবে। ব্যাচিলর মানুষ, স্বপাকহারী, এখন চাকর বাকরও আছে মনে হল না।

—আপনি বসুন, চায়ের একটুও দরকার নেই।...অবন্তী মালহোত্রা কে?

মুখে বিড়ম্বনার ছায়া টেনে বললেন, আপনার মাথায় আবার কি ঢোকালাম, মালহোত্রার পাণ্ডে হতে বাধা কি...হলেই হল। আপনি সমাদরে আছেন কিনা সেটাই কথা।

ভদ্রলোককে ভালো করে জানা না থাকলে এত কৌতূহল হত না। তূণের প্রথম শর হিসেবে মহিলার নামের সঙ্গে মালহোত্রা শব্দটি তিনি ইচ্ছে করেই যুক্ত করেছেন সন্দেহ নেই।

জোর দিয়ে বললাম, আপনি হেঁয়ালি ছাড়ুন তো, অবন্তী দেবীকে আপনি চেনেন?

এবারে একটু বেশিই হাসলেন।—এ-ই ভালো, মালহোত্রা নয়, পাণ্ডে নয়—একেবারে দেবী। পুরনো দিনের ফিল্ম আর্টিস্টরাও শুনেছি একটু নাম করলেই দেবী হয়ে যান

—এঁরও নাম-টাম হচ্ছে, দেবী হতে বাধা কি...চিনি বলতে লাইব্রেরিতে দু-চারবার দেখেছি, বীরেশ্বরবাবু একবার একটু আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। নাকের ওই হীরেটি ওকে দারুণ মানায়, তাই না?

চেয়ে আছি। মাথা নাড়লাম, তাই।

—গানও খুব চমৎকার করেন শুনেছি, আমার অবশ্য শোনা হয়নি।

—আপনি খুব মিস করেছেন, আমি আজকের ফাংশনে শুনলাম. সকলে স্পেলবাউণ্ড।

—তাই নাকি, আমার বরাতটাই এ-রকম, যাব ঠিক করেও যাওয়া হল না।

বললাম, আপনি ইচ্ছে করেই যাননি কেন সে-জেরার মধ্যে আপনাকে ফেলব না, কেবল বলুন, মহিলার সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

—কেন, আপনি ইন্টারেস্টেড?

—খুব। বীরেশ্বর ঘোষাল বলে, তাঁর একটা বড় রকমের অতীত আছে। আর ওর আরো ধারণা, সেই মহিলা আমাব প্রতিও একটু ইন্টারেস্টেড—

—তাহলে তো সোনায় সোহাগা, এর মধ্যে আমাকে আর টানাটানি কেন! তাছাড়া আমি তাঁর বিদেশের জীবনযাত্রার কিছুই জানি না।

—এ-দেশের যেটুকু জানেন তা-ই বলুন।

—কি মুশকিল, আপনি শুনতে চাইছেন অবন্তী পাণ্ডের কথা, আমি যার খবর একটু-আধটু রাখতাম তিনি অবন্তী মালহোত্রা, বিদেশ থেকে এখানে এসে মাস আট নয় ঊষা বাইজীব দলে ভিড়েছিলেন, ওই বাইজীটির সঙ্গে সূর্য পাণ্ডের দহরম-মহবম ছিল, তার কাছ থেকে অবন্তী মালহোত্রা সূর্য পাণ্ডের দখলে চলে যান—

আমি বাধা দিলাম, সূর্য পাণ্ডে কে, পরে যিনি অবন্তীর স্বামী?

—স্বামী আপনাকে কে বলল?

হোঁচট খেলাম। —সবাই তো তাই বলে...

—যাঁরা বলে তাদের কেউ বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, না রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তল্লাসী করেছে?

এই চাঁছাছোলা উক্তি ভাল লাগল না। বললাম, সূর্য পাণ্ডের, মনে হয় সূর্য পাণ্ডেরই হবে, তাঁর বড় বড় দুই ছেলের—

—নকুল পাণ্ডে আর সহদেব পাণ্ডে? ...হ্যাঁ, সূর্য পাণ্ডেরই ছেলে তারা।

—আমি নিজের চোখেই দেখেছি, অবন্তীকে তাঁরা মায়ের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

অম্লান বদনে সমাচাব সেনশর্মা বললেন, তা হবে, যে-ভাবেই হোক মহিলা ওদের গুরুদেব ব্রহ্মমহারাজের অনুকম্পা পেয়েছিলেন শুনেছি...ব্রহ্মমহারাজ সংস্কারের ঊর্দ্ধে মস্ত সাধক এ-ও বিশ্বাস করি, তিনিই কিছু করে থাকবেন—নইলে বছর সাড়ে তিন চার পর্যন্ত ওই ছেলেরাও শত্রুপক্ষ ছিল বলেই জানি।

জিগ্যেস করলাম, সূর্য পাণ্ডে কি রকম লোক ছিলেন?

—খাসা। দাপট সুরা আব নারী, কোন গুণেরই ঘাটতি ছিল না। ভয় একমাত্র বংশের গুরুদেব ওই ব্রহ্মমহারাজকেই করতেন, সে-ও সামনে এসে দাঁড়ালে...তবে লোকটা কিছু লেখাপড়া জানতেন আর ব্যবসাবুদ্ধিও প্রখর ছিল. আর গুণের মধ্যে সেকালের বড়

লোকদের মতো নাচ-গান বাজনার সমঝদার ছিলেন—পুরুষের নয়, শুধু মেয়েদের নাচ গান বাজনার...তবে শুনেছি বেনারসের এক নামকরা গাইয়েকে বহাল করে অবন্তী মালহোত্রাকে গান শিখতে সাহায্য করেছেন, মহিলা ভালো গাইবেন এতে আর অবাক হবার কি আছে?

...অনুষ্ঠান মঞ্চের ভজন আর স্তোত্র সেই মূর্তি চোখে ভাসছে। ...হ্যাঁ, মহিলার জীবনে একটা অতীত আছে, বৃহৎ রকমের কোন অতীত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অতীত যেমনই হোক, সদ্য বর্তমানে তিনি তার থেকে উত্তীর্ণ নন এ-ও ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কোনো কালে কারো হয়তো শুধুই ভোগের প্রেয়সী ছিলেন তিনি, কিন্তু এই বর্তমানে আশ্রিত ওই মেয়েগুলোর সামনে তিনি এখন শুধুই মা, এ-ছাড়া আর কি কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে? না ভাবতে পারা যায়?

ফেরার পথে নির্জন রাস্তায় পড়তে গাড়ি বেগে ছুটল। আমার ভাবনাগুলো বুঝি তারও আগে ছুটতে লাগল। এক-একটা প্রশ্ন নিঃশব্দে মগজে আঁচড় কেটে বসতে লাগল। ...অবন্তী মালহোত্রা। অথচ বাংলায় টগবগ করে কথা বলেন, আচার-আচরণও বাঙালির মতোই। কিন্তু যতই সুশ্রী হোক ওই মুখই বলে দেয় মহিলা বাংলার মেয়ে নয়। বাংলাভাষা তাঁর করায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি এমন খাঁটি বাঙালি হয়ে গেলেন কি করে? নাড়ির যোগ না থাকলে তো এমনটা হবার কথা নয়।

...সাত বছর ফ্রান্সে কাটিয়ে একেবারে পরিণত যৌবনে দেশে ফিরেছেন। ফিরেছেন এই বেনারসে।...বেনারস কি তাঁর আদি নিবাস? মনে হয় না। তাহলে কেউ না কেউ জানত, সমাচার সেনশর্মা অন্তত জানতেন। আর্ট ও কালচারের পাশ্চাত্য পীঠস্থান থেকে অবন্তী মালহোত্রা এ-দেশের কোনো শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেননি। ...সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত তাকে অবন্তী মালহোত্রাই বলতে হবে।...এ-দেশে ফিরে বেনারসে এসে তিনি যুক্ত হয়েছেন কোনো এই উষা বাইজীর সঙ্গে, যার সঙ্গে সূর্য পাণ্ডের মতো মানুষের দহরম-মহরম। ফ্রান্স-ফেরত একত্রিশ বছরের মেয়ে কোনরকম ভাগ্যদোষে এমন সংশ্রবে এসে পড়েছেন, যার থেকে আর বেরুতে পারেননি —এমন হতে পারে না। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে সাত-সাতটা বছর ফ্রান্সে তিনি কার সঙ্গে কি সংশ্রবে কাটিয়েছেন? সেখানে কলাবিদ্যা যদি কিছু রপ্ত করেও থাকেন, সেটা কোন পর্যায়ের?...ছেলেরাও বিদেশের কথা, বিদেশের গল্প শুনতে চাইলে তিনি বিরক্তির আড়ালে আত্মগোপন করেন কেন? এমনকি তাদের সামনে আমাকেও বিদেশের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করতে অনুরোধ করেছেন।...কিন্তু কেন? সেই স্মৃতি ক্লেদাক্ত না হয়ে গৌরবের হলে তো গর্ব করে বলার কথা!

...সমাচার সেনশর্মার অবন্তীর প্রতি কোনরকম ব্যক্তিগত আক্রোশ নেই। কিন্তু সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে ভদ্রলোক এখন পর্যন্ত তাকে বৈবাহিক পদবীর মর্যাদা দিতেও রাজি নন। অবন্তী মালহোত্রা কখনো অবন্তী পাণ্ডে হয়েছেন কিনা এ নিয়ে তাঁর সংশয় আছে।...বিমাতার প্রতি দুই পরিণত বয়েসের ছেলের ভক্তিশ্রদ্ধার কথা শুনে তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন, পরে কি হয়েছে তাঁর জানা নেই, মহিলা যেভাবেই হোক ব্রহ্ম মহারাজের কৃপা পেয়েছেন, ব্রহ্ম মহারাজ সংস্কার উর্দ্ধের মস্ত সাধক একজন—এ-ও তিনি অস্বীকার করেননি।

সাদা কথায়, ফ্রান্স থেকে ফিরে তিন-চার বছর পর্যন্ত অবন্তী মালহোত্রা সূর্য পাণ্ডে নামের এক মদমত্ত পুরুষের ভোগের নারী ছাড়া আর কিছু ছিলেন না।...আজ যাকে দেখছি, তাঁর সাধিকার জীবন বললেও খুব অত্যুক্তি হবে না।

যেমনটি দেখেছি বা দেখছি, তা যদি কৃত্রিম হয়, তার থেকে বেশি দুঃখের আর কি হতে পারে? না, সেরকম ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আবার এ যদি কোনো পাপের পরিণতি হয়, তাহলে আমার বিবেচনায় এমন পাপ শত পুণ্যের বাড়া। কিন্তু তাই বা এত সহজে হয় কি করে? জীবন আর যাই হোক ম্যাজিক নয়।

যা-ই হোক, আমি পাপ-পুণ্যের বিচারক নই। জীবন সন্ধান আর সেই সঙ্গে হৃদয় সন্ধান আমার কাজ। সাহিত্যের পথে নেমে এ-যাবৎ এই সন্ধানটুকুই করে এসেছি। আজ আমার সামনে আব একজন দাঁড়িয়ে। সন্ধিৎসু হবার মতো, অন্বেষণ করার মতোই একটি জীবন।

রাতে খাবার টেবিলে তাঁর দেখা পেলাম। পাব জানা কথাই; কিন্তু অনুভব করছি, সমাচার সেনশর্মা ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক একটু ক্ষতি করেছেন। আমার সহজ আচরণে সামান্য চিড় ধরিয়ে দিয়েছেন।

আজও বাতে স্নান কবেছেন বোঝা যায়। পিঠে আর্দ্র চুল ছড়ানো। শুধু গলায় একটু ছোট্ট শালের মতো জড়ানো। ওটুকুও বোধহয় গানের গলা রক্ষা করার তাগিদে।

...নকুল বলেছিল, মায়ের যখন-তখন চান করা একটা প্যাশন। হঠাৎ মনে হল, মহিলা কি সত্যি শীততাপ জয় করেছেন, না এ রোগের মতো কিছু? কোনো গ্লানির স্মৃতি ধুয়েমুছে ফেলার তাগিদে এই স্নানের বাই নয় তো?

হেসে বললেন, বাত হয়ে গেল বলে সংকোচ করবেন না, কালকের থেকেও আজ আবো বেশি ঠাণ্ডা—ইচ্ছে করলে আপনার জিনিস নিয়েই খাবার টেবিলে বসে যেতে পারেন।

বললাম, আপনাকে দেখে তো ঠাণ্ডার কোনো অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না। ...তাছাড়া আপনার ওই সামান্য খাবারের পাশে নিজের খাবারের সমারোহ দেখেই লজ্জা পাচ্ছি, এরপর ড্রিংক নিয়ে বসলে নিজেকেই নিজের পাষণ্ড বলতে ইচ্ছে করবে, অথচ লোভ যে হচ্ছে না এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমার ঘরের দিকে চলে গেলেন। কালকের বোতল সহদেব আমার ঘরেই মজুত রেখেছিল। সেটা এনে একটা গেলাসে নিজেই ঢেলে দিতে দিতে জিগ্যেস করলেন, একটু বড়ই দেব তো?

বললাম, দিন, চক্ষুলজ্জার খাতিরে দ্বিতীয়বার অন্তত চাইব না।

বোতলটা অদূরের আর একটা টেবিলে রেখে এসে বসলেন। হেসে বললেন, কারো খাতিরেই নিজেকে কষ্ট দেবেন না।

গেলাসে জল ঢেলে ছোট একটা চুমুক দিলাম। বললাম, আপনার এই আহার, ভরা শীতে এই বেশবাস, আপনার মুখে এ-কথা ঠাট্টার মতো লাগছে।

—কেন? একই সঙ্গে বিস্ময় এবং প্রতিবাদ।—আমার কোনো ব্যাপারে কারো কোনো নিষেধ বা মাথার দিব্যি আছে নাকি! আমি যা-ই করি সব নিজের ভিতরের আনন্দের থেকে করি।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি ওঁকেই দেখছি। ওঁর মধ্যে একত্রিশ বছর বয়সের কাঠামোটা বসাতে চেষ্টা করেছি। খুব অসুবিধে হচ্ছে না, খুব বেশি তফাৎ কিছু হবে মনে হচ্ছে না।...সেই যৌবনের স্ফুলিঙ্গ পুরুষের স্নায়ুতে আগুন ধরাতে না পারার মতো নয়, সেই কালো রূপের মহিমা কাউকে প্রবৃত্তির পাতালে টেনে না নিয়ে যেতে পারার মতো নয়, নাকের ওই হীরের ছটা সেই বয়সে পতঙ্গ পোড়ানোর মতো আরো দ্বিগুণ তিন গুণ ঝলসে উঠতে না পারার কথাও নয়। কঠিন সংযমে না বাঁধলে সেই যৌবনের আভাস এখনো কি সম্পূর্ণ অস্তমিত মনে হ'ত?...কানের দু'পাশে গোটাকতক করে মাত্র পাকধরা চুল। মাথায় আরো দু'-চারটে থাকলেও চোখে পড়ে না। কিন্তু মুখের দিকে তাকালেই কানের দু' পাশের ওই ক'টা চোখে পড়ে। আমার হঠাৎ কেমন মনে হল, লোকের চোখে পড়বে বলেই ও দুটো ওখানে আছে। এ-বয়সের মহিলারা বয়েসের এ-চিহ্নটুকু সাধারণত নির্মূল করতেই চান। হাতে গোনা কয়েকটা মাত্র, তুলে ফেললেই বয়সের ছায়া কিছুটা অন্তত কমে। কিন্তু ইনি যেন এই সাদা চিহ্ন সযত্নে রক্ষা করছেন। এর কারণ কি হতে পারে?...পুরুষের দৃষ্টির আঘাতে এই রমণী-দেহ কি অনেক ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে?...সাদা চিহ্ন ক'টা কি নিষেধের নিশানা, বিরতির ঘোষণা?

—বিমনা দেখছি আপনাকে, কালকের ভাষণ নিয়ে ভাবছেন নাকি?

খাওয়া প্রায় শেষ। সোজা চোখ তুলে তাকালাম।—না, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

বেশ অবাক, আবার উৎসুকও।—আমার কথা কি ভাবছিলেন?

হালকা সুরে জবাব দিলাম, এত আদর-যত্ন পাচ্ছি, বলে শেষে না ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাই।

—পড়বেন না, বলুন।

...দেখুন, সময় সময় আমার কিছু উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঢোকে, যেমন ধরুন, আপনি আমার লেখা ভালবাসেন, তাই এত সমাদরে আপনি এখানে এনে রেখেছেন...তবু থেকে থেকে মনে হয়, সাহিত্য-প্রীতি ছাড়াও এর পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। নকুল বলছিল, চান করাটা আপনার একটা প্যাশন, ফাঁক পেলেই চান করেন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই চান করা আর শীততাপ সহ্য করার অভ্যাসের পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে।...আপনার বড় বড় দু'টি ছেলে, আর এতগুলো আশ্রিত মেয়ে, এদের সামনে আপনার মায়ের মূর্তি ভালো লাগবে না এমন পাষণ্ড কেউ নেই, তবু আমার মনে হয়, এমন মাতৃত্বকে আঁকড়ে ধরার পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। ...বয়েস হলে চুলে পাক ধরা স্বাভাবিক, আপনারও কানের দু'পাশের মাত্র কয়েকটা চুল সাদা, কিন্তু আমার কেমন মনে হয় আপনার ও-ক'টাকে উপেক্ষা করার পিছনে আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। মুখের দিকে সোজাই তাকালাম আবার।

চেয়ে আছেন। আয়তপক্ষ্ম কালো চোখে কিছু যেন আকৃতির আভাস। সহজ মৃদু গলায় বললেন, কাল সকালের সেশনের পরে আপনি কিছুটা ফ্রি তো?

—কিছুটা কেন, অনেকটাই, ওসব সাহিত্যসভা-টভা আমার ভালো লাগে না, বেড়াবার লোভে আসি।

হাসলেন একটু।—এবারে আপনি আমার ভাগ্যে এসেছেন, অনেক রাত হয়েছে, গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। —একটা আরজি আছে...কাল সকালে আপনিও আসছেন তো?

—আপনি কি বলেন শোনার জন্য কত আগ্রহ নিয়ে বসে আছি, আমি তো যাবই —কেন?

—তাহলে এক কাজ করুন, কাল দুপুরে বাড়িতে আমার আপনার দু'জনেরই নো মিল করে দিন, কয়েক বছর পরে পরে এসে দেখি বেনারস বদলেছে, তবু পুরনো বেনারস ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালো লাগে—বীরেশ্বরকেও ডেকে নেব, কোথাও খেয়ে নিয়ে একটু ঘুরে বেড়াব—কি বলেন?

—খুব ভালোকথা তো।

খুশি মনে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। শেষ ধন্যবাদ বীরেশ্বর ঘোষালেরই প্রাপ্য হোক, মনের তলায় এখন কেবল এটুকুই আশা।

চার

মঞ্চে ওঠার আগে এক ফাঁকে বীরেশ্বরকে ধরে বললাম, দুপুরে আজ বাইরে লাঞ্চ, তুমি কাটান দেবার রাস্তা করে রাখো।

—সে কি! আমার যে দু'-দু'জন প্রবীণ অতিথি?

—এই দুপুরের মতো তাঁদের সৎকারের ভার তোমার ছেলে, ছেলের বউয়ের—

—তোমার এত উৎসাহ কি ব্যাপার, সঙ্গে শ্রীমতীও থাকছেন নাকি?

—থাকছেন।

হেসে উঠল।—তুমি চিরকালের নিরেট দেখছি, এর মধ্যে আবার তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকছ কেন?

বললাম, শেষ ধন্যবাদ তৃতীয় ব্যক্তির প্রাপ্য, সেই কৃতজ্ঞতা বোধে।

—অ্যাঁ? খুশির আতিশয্যে যে শব্দটা প্রয়োগ করল, আমার কান গরম।—পেনিট্রেশন কমপ্লিট?

বললাম, তোমার মুখখানা রোজ গঙ্গাজলে ধোও নয়তো আবার বিয়ে করো।

—আরে বাবা ওই হল, মহিলার অতীতের হদিস পেলে কিনা তাই জিগেস করছি।

—খুব আশা পাব, সেইজন্যই তোমাকে লাঞ্চে ডেকে আগাম ধন্যবাদের ব্যবস্থা।

বীরেশ্বর ঘোষাল হাসতে হাসতে চলে গেল। ওর ভিতরে বারাণসীর গঙ্গার জোয়ার লেগেই আছে।

শুধু একক ভাষণের ওপর নির্ভর না করে আজকের এই সাহিত্য সভাটিতে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ আনার তাগিদে আমার সঙ্গে প্রবীণতর সাহিত্যিকদের একজন আর সমবয়সী তির্যক সমালোচকটিকেও ডায়াসে তুললাম। তাঁদের সামনেও মাইক। অর্থাৎ তাঁরা কোনো কথা বললে শ্রোতাদের কানে যাবে। শ্রোতাদের জানালাম, কোনো বিষয় নিয়ে বক্তৃতার একঘেঁয়ে সুরটাই আমার ভালো লাগে না, তাই অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক আর সমালোচক বন্ধুকেও আমার সঙ্গে ডেকে নিলাম, রসের যোগান দেওয়া, বক্তব্যের

প্রতিবাদ করা বা তাৎক্ষণিক প্রশ্ন তোলার অধিকার তাঁদের থাকল, এমন কি আপনারাও আমার সঙ্গে অংশ নিলে খুশি হব।

প্রবীণ সাহিত্যিক গম্ভীর মুখে মাইক কাছে টেনে নিয়ে বললেন, অর্থাৎ উনি বাদ-প্রতিবাদ খণ্ডন করে বীর বিক্রমে তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে চান, সমালোচক ভায়ার কাছে আমার অনুরোধ, অস্ত্র হাতে দেওয়া হল বলে আসরটিকে তিনি যেন সাহিত্যের যুদ্ধক্ষেত্র করে না তোলেন।

সভার মৃদু গুঞ্জন থেকে বোঝা গেল এতবড় পরিবেশ ঘরোয়া গোছের হয়ে উঠছে। ডায়াসের জোরালো আলোয় সামনের সারির শ্রোতাদেরও মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নাকের হীরের দৌলতে সামনের সারিতে একটি কালো মুখের হদিস পেলাম, তিনি আমার দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল।

সকলকে শুনিয়ে প্রবীণ সাহিত্যিককেই জিগ্যেস করলাম, আপনি হুকুম করুন, কি নিয়ে বলব?

তাঁর জবাবও সকলরেই শ্রুতিগোচর হল। বললেন, আমাদের সাহিত্যের, বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করলেই তো ভালো হয়।

এবারেব শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আমি বললাম, ভালো তো হয়, কিন্তু আমাকে বাঁচায় কে? আমি নিতান্ত নিরীহ এক লেখক, সাহিত্যকে কোনো কামারশালায় নিয়ে গিয়ে হাতুড়িপেটা করে ভেঙেচুরে তার ভেতর দেখা আমার কাজ নয়। এই আলোচনা নিয়ে শেষে একটা বিরোধের মধ্যে ঢুকে পড়লে এখানে আধুনিক সাহিত্যিক বা আধুনিক সাহিত্যের সমাজদার যাঁরা আছেন—তাঁদের হাত থেকে অব্যাহতি পাব কি?

এ-দিক ও-দিক থেকে অনেক উৎসাহী শ্রোতা সরব হয়ে উঠলেন, পাবেন, আমরা আছি—আমরা আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কেই শুনতে চাই!

উৎসাহ থামতে বললাম, তাহলেও মুশকিলের কথা, আধুনিক সাহিত্য ঠিক যে কাকে বলে তাই আমি এখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারলাম না। প্রশ্নটা আমার কাছে যেন, একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে প্রসাধন-প্রলেপের আড়ালে ঢুকে গেলে বেশি আধুনিক হবে, না প্রায় বিবস্ত্র হলে?

শ্রোতাদের দিক থেকে হাত-তালি আর হাসির রোল পড়ে গেল। লক্ষ্য করলাম অবন্তীও নিঃশব্দে হাসছেন, আর তাঁর পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল। হাত তুলে নীরবতার আবেদন জানিয়ে বললাম, আপনারা এত মজা পেলে এমন গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গ নিয়ে আমি এগোই কি করে। শুনুন, এক স্নেহভাজন তরুণ বিদ্রোহী লেখক আলোচনা প্রসঙ্গে তিক্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন, জীবন-যন্ত্রণা না থাকলে আজকের সংসারও আলুনি, বউয়ের সঙ্গে কিলোকিলি চুলোচুলি আমাদের হবেই—আমরা আধুনিক লেখক, আমাদের লেখাতেও সে-রকম জীবন-যন্ত্রণা আর কিলোকিলি চুলোচুলি থাকবেই। তাহলে সহৃদয় শ্রোতারা আমার অবস্থাখানা বুঝুন, ইমারত গড়ার শুরুতেই ভাঙার এই লক্ষ্য যদি আধুনিক সাহিত্যের আংশিক অঙ্গও হয়—আমি তার থেকে হাজার হাত দূরে।

নিজের কাছে আমার প্রশ্ন, কেন লেখা, কেন লিখি?

রসনা সংযত করতে না পেরে তির্যক সমালোচকটি ফস করে বলে ফেললেন, টাকা রোজগারের জন্য।

হেসেই জবাব দিলাম, সে তো কর্মফল, কর্ম করলে কিছু না কিছু ফল ধরবেই —কলমের হুল গেঁথে কম হোক বেশি হোক আপনিও আপনার কর্মের ফল তুলছেন। কিন্তু আমরা এই কর্মের দিকে এগোই কোন তাগিদে? টাকাটাই লক্ষ্য হলে কলমের বদলে কোদাল ধরলেন না কেন?

হেসে হার স্বীকার করলেন, বেশ আপনি বলুন, কেন কোদালের বদলে কলম ধরেছেন।

—আমি বলব অমৃতের টানে—যে অমৃত জীবনের অজস্র অনুভূতি আর জটিলতাকে সিক্ত করে রাখে। জট পাকিয়ে নীরস নিষ্ফল একাকার হয়ে যেতে দেয় না। নিভৃতের কোনো প্রজ্ঞা অগোচরের কোনো আদর্শ রূপের কোনো তৃষ্ণা লেখককে এই অমৃত সন্ধানের পথে ঠেলে দেয়। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে আমরা এর স্বাদ জেনেছি। তাঁদের প্রেম-ভালবাসা, তাঁদের ঐতিহ্যচেতনা, মূল্যবোধ জাতির সত্তায় শিহরণ এনেছে, মানুষের হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলেছে।...আগেও যা এখনো তাই—এ অমৃত ভাগ না হলে ভোগ হয় না। সেই ভোগের দোসর পাঠক। এই ভোগের নৈবেদ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া লেখকের অলিখিত প্রতিশ্রুতি। আর, পাঠকের নিবিড় প্রত্যাশা লেখকের মূলধন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি আজকের লেখক আমরা কতটা পালন করছি? পাঠকের প্রত্যাশার কতটুকু মূল্য দিচ্ছি? অমৃতের তো দুটি মানে। মৃত্যু নেই, এবং রস। রস রূপ ধরলে তবে সৃষ্টি। আনন্দের হোক বা শোকের হোক, তৃপ্তির হোক বা যন্ত্রণার হোক আমরা রসের ঝাঁপিটি বন্ধ করে রূপ বারচ্ছেদের ছবি আঁকছি, আর অমৃতের নামে অনেক বিষও চালান দিচ্ছি —আজকের পাঠক যদি এ অভিযোগ তোলেন, আমরা কতটা জোরের সঙ্গে তা নাকচ করতে পারব?

সমর্থনসূচক হাত-তালি থামতে প্রবীণ সাহিত্যিক প্রশ্ন করলেন, আমাদের এই ব্যর্থতার কারণ কি?

—ব্যর্থতার বড় কারণ, আমাদের সাহিত্যের বাস্তব দিকটা যত অকরুণ সত্য এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, হৃদয়ের দিকটায় ততো শুকনো টান ধরে যাচ্ছে। একজন সাঁতার না-জানা লোক জলে ডুবে মরছে, আর একজন সাঁতার-জানা লোক তাকে টেনে তুলছে। ডোবাটা বাস্তব, টেনে তোলাটা হৃদয়। কিন্তু নিজের সুবিধের জন্য জলেডোবা লোকটিকে আগে যদি গলা টিপে মেরে নেওয়া হয়, তাহলে ডাঙায় যাকে টেনে তোলা হবে সে কোন বস্তু? আধুনিক সাহিত্যেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা হৃদয়ের নামে এমনি এক হৃদয়শূন্যতার খেলায় মেতে উঠেছি।...সাহিত্যের আধুনিকতার মানেটা সত্যিই কি? সুন্দরকে বিদ্রূপ করব? প্রেমকে ব্যঙ্গ করব? মহত্ত্বকে অস্বীকার করব? সে-ও তো সাহিত্যের ডাঙায় ওই শব টেনে তোলার মতোই হবে! আধুনিকতার খাতিরে সময় আর কালের প্রচ্ছদ নিশ্চয় বদলাবে, কিন্তু এর আড়ালে যাতে জীবন আছে, প্রাণময়তা আছে, তা-ই আধুনিক সাহিত্য।

শ্রোতাদের অনুমোদন সমালোচক বন্ধু বরদাস্ত করে উঠতে পারলেন না। বললেন, আপনি দাদার প্রশ্ন গাল-ভরা কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? ব্যর্থতার কারণ যে আজকের সাহিত্যিকের 'বেস্ট সেলার' হবার শস্তা ফরমুলা খোঁজা, সেক্স ভায়োলেন্স আর পারভারশনই তাঁদের আসল পুঁজি—এটা কি স্পষ্ট করে বলার কথা নয়?

শুনে নিয়ে শ্রোতাদের দিকে তাকালাম।—বন্ধুর অভিযোগের জবাবে আমার বক্তব্য, এটা কোনো সমস্যাও নয়, গুরুতর চিন্তার বিষয়ও নয়।...একটা বাস্তব ঘটনা শুনুন। পৃথিবীর তিনটি বাঘাবাঘা সাহিত্যিক—শেরউড অ্যাণ্ডারসন, আরনেস্ট হেমিংওয়ে আর সিনক্লেয়ার লুই একদিন ডিনারের আলোচনার ফাঁকে এক অবধারিত শিওর ফায়ার গোছের বেস্ট সেলারের ফরমুলার আবিষ্কার করলেন। নিজেদের অভিজ্ঞতায় তাঁরা দেখেছেন সাহিত্যে সব থেকে বেশি বিকোয় সেক্স অ্যাডভেঞ্চার আর সাকসেস অর্থাৎ সাফল্য। ঠিক হল তিনজনে মিলে এই তিনের ভিত্তিতে একখানি উপন্যাস লিখবেন। সেই উপন্যাসের সেক্সএর দিকটা লিখবেন অ্যাণ্ডারসন, হেমিংওয়ে লিখবেন অ্যাডভেঞ্চারের দিক আর সাকসেস মানে নায়কের সাফল্যের বনিয়াদ গড়বেন সিনক্লেয়ার লুই। মাস কয়েকের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনে মিলে সেই বই লেখা হল। এক নামী এজেন্টের মারফৎ সেটা গেল প্রকাশকের কাছে—এজেন্টকে তাঁরা শর্ত করিয়ে নিয়েছেন, বইটি ছদ্মনামে ছাপা হবে, লেখকের নাম কাক-পক্ষীতে জানবে না—প্রকাশকও না। এজেন্ট তো জানেন লেখক কারা, তাঁর বিশ্বাস একটা যুগান্তকারী কিছু হতে যাচ্ছে। হলও তাই। বিষম বিরক্ত হয়ে প্রকাশক তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে বললেন, আপনি বড় কাঁচা লেখক নিয়ে কারবার করেন দেখছি আজকাল। যে তিন আসল জিনিস নিয়ে এই বই, 'সেক্স-অ্যাডভেঞ্চার-সাকসেস—তার কোনোটার সম্পর্কে লেখকের মাথা মুণ্ডু জ্ঞান নেই। শ্রোতারা সমস্বরে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, জীবন আর স্বতোৎসাবিত প্রাণময়তার দিক ছেড়ে বেস্ট সেলারের ফরমুলা খুঁজতে গেলে আমাদেরও একদিন পাঠকের কাছ থেকে এই প্রত্যাখ্যান আসবে।

সমালোচক খানিক গুম হয়ে বসে রইলেন।

বললাম আধুনিক সাহিত্যের সব থেকে বিতর্কিত বিষয় সম্ভবত নগ্নতা, অশ্লীলতা। কেউ যদি প্রশ্ন করেন সাহিত্যিককে সংযমের মধ্যে রাখার জন্য কোনো-রকম কড়া শাসনের প্রয়োজন আছে কিনা, আমি একবাক্যে বলব—নেই! মাথার ওপর কেউ নীতির ছড়ি উঁচিয়ে বসে থাকলে সৃষ্টি থেমে যায়।

উগ্র সমালোচক বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠলেন, আমি এটা মোটেই মানতে রাজি নই, এ-যুগে অত্যন্ত কড়া শাসন থাকা উচিত—আপনি বলতে চান ইদানীংকালের সেক্সসর্বস্ব বই পড়ে যুব-সমাজ ভ্রষ্ট হচ্ছে না?

সভা উদগ্রীব উৎসুক। জবাব দিলাম, আমি কিছুই বলতে চাই না, এ-সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কি বলে তাই সভাকে জানাচ্ছি। ইংল্যাণ্ডের ব্যুরো অফ সোশ্যাল হাইজিনের এক আন্তর্জাতিক গবেষণায় দশ হাজার স্কুল ছেঁকে বারোশ' স্কুল গ্র্যাজুয়েট মেয়েকে ডেকে তাদের যৌন জ্ঞানের উৎস কি আর তাদের বিবেচনায় সব থেকে সেক্স-স্টীমুল্যান্টই বা কি জিগ্যেস করা হয়েছিল। বাহাত্তরটি মেয়ে জবাব দিয়েছিল বই। ভাগে ভাগে আরো অনেকে অনেক রকম উত্তর দিয়েছিল—যেমন, সিনেমা অপেরা ইত্যাদি। আর চার ভাগের তিন ভাগ মেয়ে জবাব দিয়েছিল, পুরুষ মানুষ (শ্রোতাদের মিলিত হাসি)। তারপর শুনুন, কীনসে রিপোর্ট কি বলে, গবেষণায় পর্নোগ্রাফি পড়ে পুরুষের বিকৃতি দেখা গেছে শতকরা একুশজনের, মেয়েদের শতকরা ষোলজনের। তিপ্পান্ন সালের অসলো কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট, মনের বিকার

ঘটলে তবেই অবৈধ সাহিত্য পাঠের ঝোঁক বাড়ে আর এই ঝোঁক বাড়ছে বলেই এ-ধরনের গ্রন্থের প্রকাশও বাড়ছে। হ্যাভলক এলিসের মতে, শিশুদের জন্য যেমন রূপকথা দরকার, বয়স্কদেরও তেমনি দুর্ভার গতানুগতিকতা থেকে মুক্তির জন্য অবৈধ সাহিত্য থাকা দরকার—কদর্য অপরাধ বা পশু আচরণের বিকল্পে এ অনেকটাই সেফ্‌টি ভালব্ এর কাজ করে।

সমালোচক বন্ধু মুখ লাল করে বসে রইলেন। সভা আমার অনুকূল অনুভব করতে পারি। উপসংহারের দিকে এগোলাম।—আজকের সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন। জীবনে সুন্দর আছে কুৎসিত আছে। ভালো আছে মন্দ আছে। এই জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখানোই আজকের দিনের সাহিত্য। তা বলে স্বাধীনতার নামে সাহিত্যের ব্যভিচার কাম্য নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আজকের কালকের সর্বকালের সাহিত্যিকদের থাকতেই হবে।

পিছনের সিটে আমি আর অবন্তী, সামনে ড্রাইভারের পাশে বীরেশ্বর ঘোষাল। অবন্তী তাকে পিছনে বসতে ডাকা সত্ত্বেও সে গটগট করে সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের আসন নিয়ে ঘুরে বসে চোখ পাকালো, আপনার সাহস তো কম নয়, আমি দীর্ঘকালের উপোসী ব্যাচিলব জেনেও ডাকছেন!

অবন্তী মুখে আঁচল তুলে ফিসফিস করে বললেন, এই ড্রাইভার বাংলা বোঝে না —রক্ষা।

গাড়ি এগোতে তিনি ঘোষালকে জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে ব্যথা-টেথা হয়নি তো?

ঘোষালেব প্রশ্ন, ব্যথা হবে কেন?

জবাবটা অবন্তী আমার দিকে ফিরে দিলেন, আপনার সভায় হাত তালি দেবার জন্য আপনার বন্ধু সারাক্ষণ দু'হাত তুলেই ছিলেন।

—না তো কি! ঘোষালের সগর্ব জবাব, সারাক্ষণ আসরটিকে ও কিরকম মাত করে রাখল বলুন—এত সুন্দর হবে আপনি ভাবতে পেরেছিলেন?

মৃদু হেসে অবন্তী বললেন, হ্যাঁ, ওঁর স্টেজ-ক্রাফট্ ভালো স্বীকার করতেই হবে।

—স্টেজ ক্রাফট! ঘোষাল অবাক বেশ, কেন ওঁর বক্তব্য সম্পর্কে আপনি একমত নন?

হেসেই জবাব দিলেন, বক্তব্য মানে তো বুদ্ধিতে শানানো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা...ওঁর সমস্ত বই-ই আমি পড়েছি, সেসবের থেকে ওঁকে কিছুটা চেনা যায়, কিন্তু আজ এতক্ষণের আসরের মধ্যে কেউ ওঁকে চিনেছে? শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে তো এত কথা বললেন, কিন্তু নিজে উনি কোন পর্যায়ের মানুষ নিয়ে কলম ধরতে পারেন? আজ বাড়ি ফিরে ওঁকে আমি ছাড়ব নাকি!

দিব্বি আত্মপ্রসাদ নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলাম, কিন্তু এ-কথার পর ভিতরে ভিতরে বেশ হোঁচট খেলাম। কিছু বলতে চেষ্টা করার আগে ঘোষাল তড়বড় করে উঠল, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রসঙ্গে আপনি বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে পড়বেন, আর আমি সেখানে থাকব না...কি আফসোস!

—আফসোস করার দরকার কি, আমাদের আলোচনা তো আর পর্ণোগ্রাফিক নয়, গোপনতার কিছু নেই, চলে আসুন।

—আ-হা-হা, লোভে বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে, আলোচনাটা কি তাহলে ওই মানে মুখুজ্জে সেক্স-টেক্স শব্দ দিয়ে কি যেন বলছিল—

ভয়ে ভয়ে পাশের দিকে চেয়ে সংকোচশূন্য হাসি-মুখই দেখলাম। অবন্তীর জবাবও কানে লেগে থাকার মতো। —আর বেশি নিজেকে জাহির করবেন না, আপনি একখানা মুখ-সর্বস্ব ভালো মানুষ, আজ দু'ঘণ্টা তো পাশে বসে থেকে দেখলাম—

—অ্যাঁ! বীরেশ্বরের দু'চোখ কপালে।—উইডোয়ার বাঘকে এমন অপমান! একটু আধটু অবাধ্য হলে ভালো হত বলছেন?

হাসতে লাগলেন, খুব খারাপ হত, কিন্তু যারা বাঘ তারা খারাপ ভালোর ধার ধারে না। আরো বেশি হাসতে লাগলেন। —আপনি আর যা-ই হোন, বাঘ নন, লেখক একটা কথা ঠিকই বলেছেন, আপনার জিভখানা যে অশ্লীল হয়ে ওঠে, আপনার পক্ষে সেটা সেফটি ভাল্‌বই বটে।

—ড্রাইভার গাড়ি রোখো, হাম উতর যায়গা! ছদ্ম রাগে বীরেশ্বর আস্ফালন করে উঠল।

বেনারস শহরের রাস্তায় গাড়ি এমনিতে শম্বুক গতিতে চলে। এই হাঁক ডাকে হকচকিয়ে গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে ফেলল। ব্যস্ততা গোপন করে অবন্তীকে তক্ষুনি আবার হুকুম দিতে হল, না ঠিক হ্যায়, চলো।

...মহিলা তাহলে কলকাতার স্কুল কলেজ য়ুনিভার্সিটিতেও পড়েছেন।

বেলা সবে সাড়ে বারোটা। ঘোষাল মাত্র ঘণ্টাখানেকের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে আসতে পেরেছে। বেচারার ঘাড়ে সত্যি অনেক দায়িত্ব, তার ওপর দু'দুজন বৃদ্ধ মানী অতিথির দায়িত্ব। আমার মুখ চেয়ে হলেও তার ফেরার তাড়া আছে। কাছাকাছির মধ্যে তার পছন্দের এক রেস্তোরাঁর দোতলায় এলাম।

এ-সময়ে লাঞ্চের ভিড় নেই-ই। দূরের দূরের টেবিলে কয়েক জোড়া লোক। তার মধ্যে আরো নিরিবিলি একটা কোণের দিক বেছে আমরা বসলাম। ঘোষাল অবন্তীর উদ্দেশে বলল, আপনি আমাকে যে অপমান করেছেন এখন গলা উঁচিয়ে বীরদর্পে আপনার ওপর চড়াও হলেও ও-দিকের কেউ শুনতে পাবে না।

আমি বললাম, নিজেই তাহলে স্বীকার করছ, তোমার চড়াও হবার ক্ষমতা গলাবাজী পর্যন্ত।

হতাশ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলো একটু।—আমার দেখছি বেয়াকুফ হবারই দিন আজ, বো-য়!

রাগটা যেন বয়ের ওপরেই ঝাড়বে। অবন্তী হাসতে হাসতে বললেন, আপনি শুধু মুখ-সর্বস্ব ভালো মানুষ নন, খোলা মনের তাজা মানুষ।

ঘোষাল আমার দিকে তাকালো।—এটা ইমপ্রুভমেণ্ট হল না, বাড়তি এক ঘা হল হে?

বয় মেনু কার্ড নিয়ে আসতে সে আবার গম্ভীর। তার মর্জি মতো লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে অবন্তীর দিকে ফিরল।—মুখুজ্জে বলছিল আপনি স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী, আমাদের অনুরোধে আজ কি আপনার স্বেচ্ছাচারিণী না হওয়া সম্ভব?

অবন্তী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নাড়লেন। সম্ভব নয়।

মেনু কার্ডটা ঠেলে দিয়ে ও বলল, আপনার মেনু তাহ'লে আপনিই ঠিক করুন।

মেনুর দিকে না তাকিয়ে অবন্তী বয়কে বলল, রাইস বাটার বয়েলড্ পোটাটো অ্যাণ্ড ফ্রায়েড পী-জ।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, সব তো শুকনো, গলা দিয়ে নামবে কি করে।

হেসে এক মুহূর্ত ভেবে তিনি মেনু বাড়ালেন, আচ্ছা একটু টক দইও বলে দিন তাহলে...।

বয় চলে যেতে গোমড়া মুখ করে ঘোষাল বলল, আমি স্টুপিডের মতো নিজেদের অর্ডারটা দেবার আগে ওঁর অর্ডারটা শুনে নেওয়া উচিত ছিল।

নিজের খাওয়া নিয়ে কথা বাড়াতেই যেন অবন্তীর আপত্তি। বললেন, দেখুন, আমার খাওয়া-খাওয়া করে আপনারা যদি নিজেদের খাওয়া পণ্ড করেন তাহলে কিন্তু খুব রেগে যাব। বাড়িতে আমি কত কি খাই দেখেন নি? তাছাড়া একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দটাই বা কম কি?

বীরেশ্বর ভোজন রসিক। ধীরেসুস্থে আয়েস করে খায়। তার ওপর অতিথি আর ফাংশনের দায় মাথায় নিয়ে তৃপ্তির খাওয়া যাকে বলে তা নাকি ক'দিনের মধ্যে হয়ে ওঠেনি। আমার খাওয়ার গতি স্বাভাবিক। খুব ধীরেও নয় আবার তাড়াহুড়ো করেও নয়। তবু যথাসাধ্য আস্তে আস্তে খাওয়া সত্ত্বেও অবন্তীর যখন খাওয়া হয়ে গেল বীরেশ্বরের ডিশে তখনো অনেকটা মজুত। আমিই তাঁকে নিষ্কৃতি দিলাম, বললাম, আপনি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এসে বসুন, ওঁর খাওয়া শেষ হতে হতে দুপুরের সেশন শুরু হয়ে যাবে—

অনুমোদনের আশায় অবন্তী বীরেশ্বরের দিকে তাকাতে সে-ও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

এই দুপুরের শীতটা বেশ মনোরম। সকাল থেকেই আকাশ একটু মেঘলা ছিল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম সেই মেঘ এখন বেশ ঘন। ভর দুপুরেও একটা কালচে ছায়া পড়েছে। কিন্তু এখনি বৃষ্টি আসবে বলে মনে হয় না।

মুখ হাত ধুয়ে অবন্তী ফিরে এসে বসলেন। ডিশ থেকে একটু মশলা তুলে নিয়ে চিবুতে লাগলেন। তারপর সামনের জানলা দিয়ে একবার মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে সামান্য ভ্রূকুটি করলেন। ফ্রায়েড রাইসসহ রোস্ট আয়েস করে চিবুতে চিবুতে ঘোষাল বলল, আমি আক্রমণের প্রতীক্ষায় ছিলাম, এবারে কৈফিয়ত দাখিল করুন দেবী—আপনাকে একটা খোলা মনের প্রশ্ন করছি, এখানে লোকপ্রবাদ অনেক বছর আপনি ফ্রান্স তথা প্যারিস অর্থাৎ এক কথায় যাকে আমরা সিটি অফ এনজয়মেন্ট অ্যাণ্ড আর্ট অ্যাণ্ড কালচার বলে জানি সেখানে ছিলেন, আর এখানে আপনার স্বামী সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তাঁকে আমরা মোটামুটি জানতাম—তাই আমার জিজ্ঞাস্য, আপনার এই কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্মনিগ্রহ কেন?

মশলা চিবুচ্ছেন। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি, চোখের কোণেও। নাকের হীরেতে তো বটেই।—শুনবেন?

—সেই রকমই ইচ্ছে।

—মন দিয়ে শুনুন তাহলে। একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মেঘলা আকাশের

দিকে আর একবার চেয়ে মিষ্টি করে গলা খাঁকারি দিলেন একটু। তারপর গুনগুন আর তারপর অনুচ্চ সুরে দু'কান ভরে জবাবদিহি করলেন।

কভি ব্যয়ঠে বৈঠায়ে দিল্‌কি হালত্ অ্যায়সি হোতি হ্যায়,
তড়পকর চায়ন মিলতা হ্যায়, খুসি রোনেসে হোতি হ্যায়।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুরের মৃদু জাল বিস্তার করে মিনিট তিনেক গাইলেন।

—বুঝলেন কিছু?

ঘোষাল মাথা নাড়ল, কিছু না। মানেটা কি দাঁড়াল?

মশলা চিবুচ্ছেন, অল্প অল্প হাসছেন।—দাঁড়ালো এই, অবস্থা বিশেষে মন এমনও হতে পারে যে কৃচ্ছ্রসাধন বা কষ্ট করলে মনে শান্তি আসে, আর অঝোরে কাঁদতে পারলে ভিতরটা আনন্দে ভরে ওঠে।

বীরেশ্বর অপেক্ষা করল একটু। সময়োচিত গম্ভীর। বলল, দয়া করে আরো একটু বিস্তার করুন।

হাসি মুখেই অবন্তী বাইরের মেঘলা আকাশের দিকে তাকালেন একবার, আবার একটু গলা খাঁকারি দিলেন তারপর তেমনি গুণগুণ সুরে কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দের কারণটা বিস্তার করলেন যেন।

'ইস এতিয়াৎ কি ক্যা বরখ দাও দেতা হুঁ
কে তিনকা তিন্‌কা বাঁচা মেরে আশিয়াঁকো সিবা।'

কৌতুক ছোঁয়া দু'চোখ বীরেশ্বরের মুখের ওপর। একটু টানা গলায় কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দের কারণ বিশ্লেষণ করলেন হে ঈশ্বর, তোমার নিপুণ সতর্কতার জন্য বাহবা দিতে হয়—আমার ঘর লক্ষ্য করে তুমি এমন বহ্নি বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেছ যে শুধু আমার ঘরটাই জ্বলে খাক হয়ে গেল, আশপাশে অন্য কুটোকুঠিরও এতটুকু ক্ষতি হল না।

রমণীর চোখের ওই হাসির গভীরে আমি কিছু খুঁজছি। বীরেশ্বর আড়চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে ডিশের অবশিষ্টটুকু মুখে তুলতে তুলতে খুব হালকা গলায় বলল, বেশ, কেবল আপনার ঘরটাই জ্বলে গেল আর কারো এতটুকু ক্ষতি হল না, সেজন্য তাপ-পরিতাপ দূরে থাক আপনি কষ্ট থেকে শান্তি আর কান্না থেকে আনন্দ পেলেন —কিন্তু এরপর আপনার দশাখানা কি হবে, জীবনের তো এখনো অনেক বাকি?

এবারে অস্ফুট শব্দ করে হাসলেন।—এর পরও কি দশা হবে ভেবে লাভ কি? আপনার এই মাংস চিবনোর দশাই কি চিরকাল থাকবে না সেজন্যে আপনি ভাবছেন? খুশি মুখে গুণগুণ করে আবার দু' কলি গান ছড়িয়ে দিলেন,

'আপনি খুসি না আয়ে,
না আপনি খুসি চলে,
লাই হায়াৎ আয়ে,
কাজা লে চলি চলে।'

—বুঝলেন না তো? এর মানে হল, পৃথিবীতে নিজের খুশিমতো আসিনি, খুশিমতো যাবও না। জীবন হাত ধরে নিয়ে এসেছিল তাই এসেছি। মৃত্যু হাত ধরে নিয়ে যাবে, চলে যাবো। কি দশা হবে ভেবে আমি এখনই দুর্দশায় মরি কেন!

পালিয়ে বাঁচার মুখ করে বীরেশ্বর ঘোষাল উঠে মুখ-হাত ধুতে চলে গেল। অবন্তী পাশের বড় জানালাটা দিয়ে আবার মেঘলা আকাশ দেখতে লাগলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লেগে আছে। আমি লক্ষ্য করছি আঁচ করেই এদিকে ফিরছেন না।

ঘোষালকে তার বাড়ির কাছাকাছি নামিয়ে দেবার কথা ছিল। বাড়ির দোরগোড়ায় নেমে অতিথিদের কাছে ধরা পড়তে চায় না। গাড়ি থেকে নেমে সশব্দে দরজা বন্ধ করে এদিকের জানলায় এসে মুখ বাড়ালো। বলল, ম্যাডাম পেট ভরাট করলাম কিন্তু বুকের ভিতরটা ঠিক ততখানিই খালি করে ফিরলাম। যাক, আশা করছি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গাড়ি চলল। অবন্তী হাসছেন। মন্তব্য করলেন, বড় ভালো মানুষ আপনার এই বন্ধুটি।

শুনে ভালো লাগল। সামনের রাস্তা দুদিকে বেঁকে গেছে, অবন্তী নির্দেশ দিলেন, গণেশ মহল্লা—

ড্রাইভার সেদিকে গাড়ি ঘোরালো। আমি জিগ্যেস করলাম, কোথায় চলেছি?

—আগে আমার গোডাউন বা অফিসে, ছেলেদের সেখানে থাকতে বলেছিলাম, আপনাকে ওদের খুব ভালো লেগেছে, আপনি ব্যস্ত, ওরাও সময় পায় না—

একটু পুরানো বাড়ির দোতলায় আড়ত। কর্ত্রীকে দেখে সকলেই তটস্থ এবং আনত। সমস্ত দোতলাটাই তাঁর দখলে। ছোট বড় অনেকগুলো ঘর! কোনো ঘরে বেনারসী শাড়ির রং পালিশ হচ্ছে, কোনো ঘরে সাদা জমিনের ওপর ছাঁচ ফেলে ডিজাইনের নক্সা করা হচ্ছে। একটা ঘরে দেখলাম মেঝেতে চাটাইয়ের উপর স্তূপীকৃত বেনারসী শাড়ি। তিন চারজন বসে সেগুলো বাছাই করে দাগ দিয়ে রাখছে। রাস্তার দিক ঘেঁষে বেশ সাজানো গোছানো ছোট অফিস ঘর। নকুল আর সহদেব আমাকে দেখে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। সহদেব জিগ্যেস করল, আজ ওঁর ফাংশন কেমন হল মা?

—আজ ওঁরই জয়-জয়কার, তোমরা আড়াই তিন ঘন্টায় ক'খানা শাড়ি বিক্রি করলে আর কি-ই বা লাভ করলে—মিস ক'রে তার থেকে ঢের বেশি লোকসান করলে। আমার দিকে ফিরলেন, আপনি বসে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি আসছি—

উনি চলে যেতে নকুল একটু মিষ্টিমুখ করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ওদের খুশি করার জন্য এক পেয়ালা কফি শুধু খেতে রাজি হলাম।

ওদের ব্যবসার কথাই তুললাম। মাথার কাছে দেয়ালে তাদের ঠাকুরদার মস্ত অয়েল পেন্টিং ছবি টাঙানো। তাঁর মুখের আদল কিছুটা নাতিদের মতো, ওদের বাপের মতো নয়। প্রশান্ত মুখ, চাউনি কোমল, কপালে লম্বা গঙ্গা-মাটির তিলক। দেখলেই মনে হয় ধর্মভীরু মানুষ। শুনলাম তাঁর কাল থেকেই এই ব্যবসার সূত্রপাত। ঠাকুরদার জীবনে গুরুদেব আসার পর থেকেই তাঁর ব্যবসা অবিশ্বাস্যরকম জাঁকিয়ে উঠেছিল।

ঈষৎ আগ্রহ নিয়ে বললাম, তোমাদের মায়ের মুখে গুরুদেবের কথা কিছু কিছু শুনেছি, এই গুরুদেবকে তোমাদের ঠাকুরদা কোথায় পেয়েছিলেন?

লক্ষ্য করলাম গুরুদেব প্রসঙ্গে দুই ভাইয়ের মুখই উদ্ভাসিত। নকুল বলল, আমাদের ঠাকুমা মাঝবয়সে মারা গেছলেন। মন খারাপ নিয়ে ঠাকুরদা হরিদ্বারে বেড়াতে গেছলেন। ...আমাদের বাবা একটু অন্য রকমের আর ভিন্ন মেজাজের মানুষ ছিলেন, তাঁর জন্যেও

ঠাকুরদার খুব দুশ্চিন্তা। হৃষিকেশে এক সাধুকে ভারী মনে ধরেছিল ঠাকুরদার, দীক্ষা নেবার জন্য তাঁকে ধরে পড়েছিলেন। তিনি রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দীক্ষা নেবার দিন বললেন, আমি না, তোমার গুরু তোমার জন্য উত্তর কাশীতে অপেক্ষা করছেন, সেখানে চলে যাও। আমার মুখের দিকে চেয়ে নকুল থমকালো একটু, আর না এগিয়ে হেসে বলল, এ যুগে এ-সব শুনে আপনার বোধহয় হাসি পাচ্ছে...

এই প্রসঙ্গ উঠতে আমি মনে মনে চাইছিলাম অবন্তী যেন একটু দেরি করে ফেরেন। লাঞ্চে বসে গুণগুণ সুরের ওই উর্দু শায়েরী কটা শোনার পর থেকে আমার কৌতূহল অন্যরকম। তাছাড়া, যে কারণেই হোক, আমার মনে হয়েছে এই গুরুদেব সম্পর্কে আমার জানা দরকার। তাই তাগিদের সুরে বললাম, আমি এ-যুগের মানুষ নই, আর ওই জগতের মানুষদের সম্পর্কে আমার নিজেরও কিছু কৌতূহল আছে—

নকুল সোৎসাহে বলে গেল, ঠাকুরদা উত্তরকাশীতে গিয়ে ব্রহ্মমহারাজের দেখা পেলেন।...বয়সে ঠাকুরদার থেকে বছর কয়েক ছোটই হবেন। কিন্তু তাঁকে দেখেই ঠাকুরদার ভিতরে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। গুরুদেব হাসি মুখে তাঁকে গ্রহণ করলেন, দীক্ষা দিলেন। আর বললেন, তোমার যা-কিছু আছে আর যা কিছু হবে, তুমি নিজেকে তার মালিক ভেব না, তহসিলদার ভেবো, তোমার কিছুই নয়—তুমি কেবল রক্ষক। আর স্পষ্ট বলে গিয়েছিলেন ছেলেকে নিয়ে যন্ত্রণা পেতে হবে, আর সব দিক ঠিক আছে।

আমি উৎকর্ণ। জিগ্যেস করলাম, তোমরা দু'ভাই গুরুদেবকে কতটা কিভাবে পেয়েছ?

এবারে সহদেব জবাব দিল, আমাদের যা-কিছু সব তাঁর দয়ায়। নইলে পথেও ভেসে যেতে পারতাম। ঠাকুরদার যাবার সময় হয়েছে এ কেবল গুরুদেবই বুঝেছিলেন, উইল করে বাবার নামে ব্যবসার আট আনা আর আমাদের নামে চারআনা করে লিখে দিতে বলেছিলেন। বাবার এটা একটুও পছন্দ ছিল না, তিনি রেগেই গেছলেন, কিন্তু একমাত্র গুরুদেবকেই তিনি ভয় করতেন, কিছু বলার সাহস ছিল না। আমরা সাবালক হতেই গুরুদেব বাবাকে হুকুম করলেন, উইল অনুযায়ী ভাগ বুঝিয়ে দিয়ে ওদের আলাদা করে দাও, ওরা যে-যার নিজের ব্যবসা করবে। খুব আপত্তি সত্ত্বেও বাবাকে মাথা পেতে তাই করতে হয়েছে, আর তাঁর হুকুমে ব্যবসা দাঁড় করানোর ব্যাপারে সাহায্যও করতে হয়েছে।...গুরুদেবের কৃপা দেখুন, এর দুই-এক বছরের মধ্যেই বাবার ব্যবসা যায়-যায়...অবশ্য বাবার দোষেই। তখন গুরুদেব আবার আমাদের হুকুম করলেন, যেভাবেই হোক বাবার ব্যবসা টেনে তোলো—ওটা দেবোত্তর, নষ্ট হলে অনেক ক্ষতি।...এখন গুরুদেবের এ কথার অর্থ আমরা বুঝতে পাবি। গুরুদেব যখন যা বলেছেন তা-ই হয়েছে, হাত ঠিকুজি কিছুই না দেখে আঠারো-উনিশ বছর বয়সে সহদেবের সম্পর্কে বাবাকে বলেছিলেন ওর বুকের দোষ হবে, সাবধান। বাবা গা করলেন না, সহদেবের যক্ষ্মা হয়ে বসল। শেষে গুরুদেবকে ধরে পড়তে উনি বললেন, চিকিৎসা করাও আর ওকে রাণীক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ছ' মাস রাখো, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। কত ব্যাপার বলব আপনাকে, আমার প্রথম সন্তান হবার সময় স্ত্রীর ভয়ংকর শরীর খারাপ, আশ্চর্য দেখুন গুরুদেব কখন কোথায় থাকেন আমরা জানতেও পারি না, কিন্তু সত্যিকারের সংকটের

সময় তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হন। বললেন, বউমা ভালো হয়ে যাবেন, কিন্তু সন্তানের মায়া রেখো না, এ-ছেলে প্রারব্ধ কাটিয়ে যেতে এসেছে, থাকবে না। স্ত্রীকে কিছুই বলি নি, কিন্তু হলও তাই, তিন দিনের দিন ছেলে মারা গেল, স্ত্রী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল।

সহদেব এইদিন বাধা না দিয়ে দাদাকে বরং উৎসাহ দিল, বাবার কথাও বলো ওঁকে।

নকুল ভাইয়ের সায় পেয়ে বলে গেল, একমাত্র বাবাকেই গুরুদেব খুব একটা পছন্দ করতেন না, বাবারও তাঁর প্রতি খুব একটা ভক্তিটক্তি ছিল না, কিন্তু গুরুদেবকে যমের মতো ভয় করতেন। একবার অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বাবাকে বলেছিলেন, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।...তা শেষের দেড় দু' বছর বাবা কি কষ্টই না পেয়ে গেলেন।

এবার আমি সাগ্রহে জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম ওদেব এই মায়ের সম্পর্কে গুরুদেব কি বলেছিলেন, কিন্তু সে ফুরসত আর পেলাম না। অবন্তী ফিরে এসে ছেলেদের সম্পর্কে অনুযোগ করলেন, ওরা আমার সইয়েব জন্য একগাদা কাগজপত্র জমিয়ে রেখেছিল, দেবি হয়ে গেল—আসুন।

উঠতে হল। অবন্তীর খালি হাতের দিকে চেয়ে স্বস্তি বোধ করলাম। এখানে আসার সময়ে আর আসাব পরেও যে কথা মনে এসেছিল ভাগ্যিস আগ বাড়িয়ে কিছু বলিনি। নকুল আমন্ত্রণ জানালো, মন্দিরের রাস্তায় একবার মায়েব আর আমাদের দোকান দেখতে আসুন—

আমাব হয়ে অবন্তীই জবাব দিলেন, কাল বাদে পরশু উনি ফেরার ট্রেনে চাপছেন, আব সময় পাবেন আশা কোরো না।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে চোখ দুটো ভালো রকম একপ্রস্থ হোঁচট খেল। বসার পিছনের জায়গায় সুন্দর কাগজে মোড়া দুটো কাপড়েব বাক্স। আমি আঁতকে উঠলাম, এ কি?

—এ আপনার কিছু নয়, উঠুন।

—তাহলে আমি ধরে নিলাম যাবাব সময় আপনি আমাব কাঁধে কিছু চাপাচ্ছেন না?

হাসলেন, তা চাপাব, এতে আপনার স্ত্রীর জন্য একটু প্রণামী আব মেয়ের জন্য একটু আশীর্বাদ আছে—আপনি কি এ নিয়ে এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক জুড়বেন নাকি। উঠুন—

অনুনয়ের সুরে বললাম, দেখুন আমার স্ত্রী বেনারসী মোটে পরেন না—

—আমি কিন্তু এবারে রেগে যাচ্ছি, গাড়িতে বসে তারপর কথা বলুন।

ও-দিক ঘুরে উনি আগে উঠলেন। অগত্যা আমিও উঠে বসলাম। হাল ছেড়ে বললাম, আমারই ভুল হয়েছে, এখানে আসাব আগেই আপনাকে নিষেধ করে রাখার কথা আমার মনে এসেছিল, সংকোচে পারি নি।

হাসতে লাগলেন।

এখানে বলে রাখি, যাদের জন্য এ উপহার বাড়ি এসে তাদের ঘোষণা শুনেছি, কম হলেও হাজার টাকা করে দাম হবে এক-একটার। মেয়ের জন্য ছিল শাড়ি আর স্ত্রীর জন্য বেনারসী শাল।

মানুষ সাইকেল রিকশ আর যত্র-তত্র ষাঁড় ঠেলে গাড়িও প্রায় পায়ে-হাঁটা গতিতে চলেছে। বললাম, এ-সব জায়গায় এলে তবে কাশীতে এলাম মনে হয়।

এমন ভিড়ের রাস্তা অবন্তীর আদৌ পছন্দ নয়। বললেন, আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসে। আপনার বুঝি কাশী খুব প্রিয় জায়গা...অনেকবার এসেছেন?

—ছেলেবেলা থেকে ধরলে কতবার তার হিসেব নেই। ছেলেবেলার সেই চোখ বা মন কিছুই আর নেই। বইয়ে পড়তাম বেদের কাল থেকে সবচেয়ে বড় মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী। মহাভারত রামায়ণ সংহিতা উপনিষদ বেদান্ত-ব্রাহ্মণেও কাশীর মাহাত্ম্য আছে, ভাবতাম কাশী তাহলে কত পুরনো! তখন চোখ বুজে কাশীর কথা ভাবলেই রোমাঞ্চ হত।...বরণা আর অসির সঙ্গমস্থল, তাই বারাণসী...সপ্ততীর্থ আর একান্ন পীঠের অন্যতম, এই শহর ষোড়শ মহাজনপদের বিশেষ একটি গৌরবের শহর। চোখ বুজলে দেখতে পেতাম, উত্তরবাহিনী গঙ্গার বাঁ-কূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারাণসী—আর চোখ বুজে কল্পনা করতাম কাশীর আশিটি ঘাটে ঘাটে কোন এক কালের ঋষি আর ঋষি-বালকেরা চান করছে, কখনো দেখতাম গঙ্গার জলে ভেসে চলেছেন ত্রৈলঙ্গস্বামী...কি যে আবেগপ্রবণ ছিলাম যদি জানতেন।

অবন্তী আমার দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসছেন।—ওই আশিটা ঘাটে নিজেও চান করেছেন নাকি?

—নাঃ, অনেকবারই চান করেছি, তবে কেবল একটিমাত্র ঘাটে—দশাশ্বমেধ ঘাটে।

অবন্তী সহাস্যে জানান দিলেন, আমি তাহলে আপনার থেকে পাঁচ গুণ এগিয়ে আছি, দীক্ষা নেবার আগে গুরুদেবের আদেশে পঞ্চতীর্থে চান করতে হয়েছিল।

মণিকর্ণিকা দশাশ্বমেধ অসি বরণাসঙ্গম আর পঞ্চগঙ্গা—এই পাঁচ ঘাট কাশীর পঞ্চতীর্থ। বললাম, কাশীতে পনেরোশ' মন্দির আছে জানেন তো, আমি একজনকে জানতাম যিনি বছরে দুবার অন্তত ওই পনেরোশ' মন্দিরেরই দেবদেবী দর্শন করতেন, কাউকে বঞ্চিত করতেন না—আপনার ক'টি দর্শন হয়েছে?

হেসে জবাব দিলাম, পনেরো বছরে মাত্র একটি...যেখানে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন।

অর্থাৎ কেবল বিশ্বেশ্বর দর্শন করেছেন। কৌতুকের অর্থ, যিনি আশুতোষ—তিনিই বিশ্বেশ্বর। ফিরে ঠাট্টা করলাম, কিন্তু অন্য দেবদেবীরা এমন পক্ষপাতিত্ব সহ্য করলে হয়—

—অন্য দেব-দেবীর মধ্যে আমার ভয় কেবল একটি দেবতাকে, তাঁর কথা মনে হলেই আতঙ্ক।

স্মরণেও শ্যাম-মুখশ্রীতে ভয়ের ভাব আনলেন একটু।

বললাম, কে সে দেবতা—আপনার ওপর চড়াও-টড়াও হয়েছিলেন নাকি?

হাসছেন। জবাব দিলেন, অপেক্ষায় আছেন, মরলে পরে হবেন।

আমি বললাম, কাশীতে মরলে তো অক্ষয় স্বর্গবাস শুনি?

—তাহলে কাশীর আপনি কিছুই জানেন না, কাশীতে নরক নেই বলেই লোকে বলে কাশীতে মরলে স্বর্গবাস। বাইরে থেকে হাজারো পাপ করে কাশীতে মরলেও তার রেহাই আছে, কারণ কাশী যমের এক্তিয়ার নয়, এখানে নরকও নেই। কিন্তু কাশীতে বসে পাপ করে মরলে এখানকার বিচারক কালভৈরব—যমের দশগুণ কঠিন। দয়ামায়াশূন্য রুদ্র-বিচার তাঁর।

ভীতির ছায়া টেনে আনলাম, বলেন কি! আমি তো এখানে এসেই মস্ত পাপ করতে শুরু করেছি!

—কি পাপ?

—একটি পরস্ত্রীর কথা ভেবেছি, ভাবছি।

হেসে ফেললেন।—এমন পরস্ত্রীর কথা ভাবলে তার উদ্ধার আর আপনার পুণ্যি।

—আপনিই বা এমন কি পাপ করেছেন যে এত ভয়!

চটপট জবাব দিলেন, আর বলবেন না, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে পাপ। জানেন, গুরুদেবকেই একদিন এই কালভৈরবের কথা জিগ্যেস করে বসেছিলাম। শুনে প্রথমে হাসলেন খুব। তারপরেই তেমনি গম্ভীর। বললেন, খুব সাবধান, বড় ভয়ংকর দেবতা, ফাঁক পেলেই তাঁর মন্দির প্রদক্ষিণ করবে এমন কি ঘুমের সময়েও। আমি বললাম, তাহলে সেই মন্দিরেই তো পড়ে থাকতে হয়! তক্ষুনি ফতোয়া দিলেন, তাই থাকবে মন্দির তো তোমার বুকের তলায়, আর সেখানেই তাঁর বাস—দূরে তো নয়!

দু'কান ভরে যাবার মতো। বললাম, পড়ে থাকুন তাহলে।

—দূর। হয় নাকি? ছেলেদের চিন্তা, ব্যবসার চিন্তা, মেয়েগুলোর চিন্তা, আরো হাজারো চিন্তা—এমনিতে কত রাত ঘুম হয় না, বই পড়ে রাত কাটিয়ে দিই, কিন্তু তার মধ্যে যদিই বা গুরুদেবের কথামতো চোখ বুজে সেই মন্দিরের দিকে যেতে চেষ্টা করি, মন লাগাতে না লাগাতে চোখ তাকিয়ে দেখি সকাল, তখন কোথা থেকে ঘুম এসে যেন জাদুকাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে যায়।

ভিড়ের রাস্তা পেরিয়ে আমরা ইউনিভার্সিটির দিকে এসেছি। বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। তবু একটু হাঁটার ইচ্ছেয় আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলাম। কথা বলতে বলতে ইউনিভার্সিটির প্রাঙ্গণ ধরে কিছুটা এগিয়ে এসেছি। আকাশের দিকে চেয়ে অবন্তী সচকিত, ও-মা, আকাশ যে কালি, বৃষ্টি এলো বলে।

ফিরে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। কিন্তু বাতাস দিয়েছে, আর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

গাড়িতে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবন্তী বললেন, আমরা কোন রাজ্যে ছিলাম এতক্ষণ, আকাশের দিকে মোটে চেয়েই দেখিনি, ইউ. পি'র এই শীতের বৃষ্টিটা বড় বিচ্ছিরি।

তুমুল বৃষ্টিই শুরু হয়ে গেল। বাধ্য হয়েই গাড়ির গতি কমাতে হয়েছে। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা পার।

—আপনি গরম জলে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন, আমার নামতে কিন্তু একটু দেরি হবে।...খাবার কি পাঠাব?

বললাম নির্দয় হবেন না, জঠরে এখনো ফ্রায়েড রাইশ আর চিকেন রোস্ট মজুত মনে হচ্ছে, রাত্তিরে যদি কিছু খাই তো নিরামিষ হলে ভাল হয়।

—তাহলে এক কাজ করি, রাতে খিচুড়ি আর ভাজাভুজির ব্যবস্থা করি।

—ওয়াণ্ডারফুল।

জামা-কাপড় বদল করে যে বেশ-ভূষা চড়ালাম, আয়নার সামনে দাঁড়াতে নিজের

স্বাস্থ্যখানা দেড়া মনে হল। বাথরুমে এসে গরম জলে আর সাবানে হাত দুটো শুধু ধুয়ে নিলাম। যাকে বলে হাড় কাঁপানো শীত। বিছানায় এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে কম করে মিনিট পনেরো বসে রইলাম। শান্তি।

কম্বল ফেলে নেমে এলাম। টেবিলে জাগে জল আর গেলাস থাকেই। দ্বিধা কাটিয়ে দেয়াল আলমারি খুলে বোতলটা বার করলাম। আমার জন্যই যখন, এর থেকে উপযুক্ত সময় আর কি হতে পারে। আধাআধির বেশি আছে এখনো। কাল রাত পর্যন্ত ভালই চলে যাবে।

ধীরেসুস্থে প্রথম দফা গেলাস খালি হবার আগে অবন্তী ঘরে ঢুকলেন। হেসে বললেন বাঃ, শুরু করে দিয়ে ভালই করেছেন, যে ঠাণ্ডা—

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলাম। সাধারণ শাড়ি আর ব্লাউসের ওপর শালটা আজ অবশ্য গায়ে জড়ানো। তবু স্নান করে এসেছেন, বোঝা যায়। হেসে বললাম, ও-কথা বলে ঠাণ্ডাকে আর লজ্জা দেবেন না—

একটু হেসে ও প্রসঙ্গ বাতিল।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন। বললেন, আমার থেকে-থেকে আপনার ফাংশানের কথাগুলো মনে পড়ছে...আর কিছু প্রশ্নও মনে আসছে।

মনে পড়ল রেস্তোরাঁয় যাবার পথে গাড়িতে ঘোষালকে বলেছিলেন, ওঁর স্টেজক্রাফট ভালো স্বীকার করতেই হবে! বুদ্ধিতে শানানো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, ওঁর বইয়ের থেকে ওঁকে কিছুটা চেনা যায়, কিন্তু আজ এতক্ষণের মধ্যে কেউ ওকে চিনেছে—এত কথার মধ্যে নিজেকে উনি কোথাও ধরা দিয়েছেন? শেষের উক্তি, আজ বাড়ি ফিরে ওঁকে আমি ছাড়ব নাকি!

হেসেই বললাম, আজ আমার বক্তব্যের মধ্যে আপনার কাছে অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে বুঝতে পারছি—কিন্তু সেগুলো কি?

—ত্রুটি একটুও ধরা পড়েনি, বরং কান পেতে শোনার মতো সব বলেছেন। কিন্তু নিজে আপনি এই শ্লীলতা অশ্লীলতার ফারাক কতটা কমিয়ে আনতে রাজি? কতটুকু স্বাধীনতা আপনি নিজে নিতে বা কোনো লেখককে দিতে রাজি?

মন বলছে, শুধু সাহিত্যের এই প্রসঙ্গটুকুই মহিলার লক্ষ্য নয়, এই আলোচনার সেতু ধরে তিনি অন্য কোনো লক্ষ্যে পাড়ি দিতে পারেন। ইন্ধন যোগাতে পারলে এই রাতটাই স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে।

হালকা সুরেই জবাব দিলাম, দেখুন এই শব্দ দুটোর সম্পর্কে মানুষের ধারণাই তো যুগে যুগে বদলে যাচ্ছে, কোথায় আপনি সীমারেখা টানবেন?

—কি রকম একটু বুঝিয়ে বলুন।

—যেমন ধরুন, ভিক্টোরিয় যুগে ঘরের টেবিল চেয়ারের পায়া অনাবৃত দেখলেও ভয়ংকর রকমের শালীনতার প্রশ্ন উঠত না।...উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ফ্যাশনের হাওয়ায় মেয়েদের ব্যায়াম করাটা চূড়ান্ত ভাললাগার ব্যাপার ছিল—মেয়েদের শোনা যায় ব্যাপক ডিসপেপসিয়ার যুগ গেছে সেটা।

অল্প হেসে অবন্তী সাগ্রহে সামনে ঝুঁকলেন।

বললাম, ওই শতকে যুক্তরাষ্ট্রের একখানা বিখ্যাত ম্যাগাজিনের নাম ছিল ‘গডেজ

লেডিজ বুক'। মেয়েদের নামকরা ম্যাগাজিন, ঘরে ঘরে তার সমাদর ছিল। তাতে ঘরের বই সাজানো সম্পর্কে উপদেশের একটু নমুনা শুনুন।

—কোনো বিচক্ষণ গৃহিণী তাঁর সেলফে লেখক আর লেখিকাদের বই কখনো পাশাপাশি বা কাছাকাছি রাখবেন না—যথেষ্ট ফারাক রেখে সাজাবেন। তবে যদি লেখক আর লেখিকা স্বামী-স্ত্রী হন, তাহলে তাঁদের বই কাছাকাছি বা পাশাপাশি রাখা যেতে পারে।

অবন্তী হেসে ফেললেন।—আপনি অনেক খবর রাখেন আর বলেনও বেশ।

খালি গ্লাস দ্বিতীয় দফা ভরাট করে নিয়ে প্রসঙ্গের উপসংহারে পৌঁছুলাম।—রীতিমতো রক্ষণশীল মনোভাবের লেখিকা ছিলেন জর্জ ইলিয়ট। তিনি 'অ্যাডাম বিড' নামে একটি বই লিখেছিলেন, যা নিয়ে নামকরা কাগজে পর্যন্ত হৈ-চৈ পড়ে গেল। স্যাটারডে রিভিউর মতো কাগজেও তার তীক্ষ্ণ সমালোচনা বেরুলো "গ্রন্থটিতে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন তারিখ এবং তার আগের পর্যায়গুলোর বিবরণ দেখে ভয় হয়, সাহিত্য অন্তঃসত্ত্বা হচ্ছে চলেছে। প্রাচীন বিলক্ষণ লেখকেরা শিশুর আবির্ভাব ঘটাতে হলে সরাসরি তাকে এনে ফেলতেন।" তারপর দেখুন ওই 'অ্যাডাম বিড'ই লেখিকাকে যশ আর খ্যাতির মুকুট পরালো। যুগ বদলের সঙ্গে আজ দেখুন লেডি চ্যাটারলিজ লাভারও শুধু মুক্তির ছাড়পত্র পেল না, দুর্লভ সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতি পেল।

গেলাসের গুণে মেজাজ বেশ ঝরঝরে এখন, নিজের কথাগুলো নিজের কানেই ভালো লাগছিল। কিন্তু অবন্তীর ঠাণ্ডা অথচ মোলায়েম কথায় একটু সচকিত হয়ে উঠলাম। বললেন, আপনি এখন সাহিত্য নিয়ে বিতর্কের সভায় বসে নেই আর আমারও অত বিদ্যে-বুদ্ধি নেই। আমার খুব সাদাসিধে প্রশ্ন। সভায় আপনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, জীবনে সুন্দর আছে কুৎসিত আছে, ভালো আছে মন্দ আছে—এই জীবনকে সম্পূর্ণ করে দেখানোটাই আজকের দিনের সাহিত্যিকের কাজ। আমার জিজ্ঞাস্য, জীবনের কোন্ পর্যন্ত কুৎসিত আর মন্দ আপনার মতো সাহিত্যিক দেখতে পারেন আর দেখাতে পারেন?

বললাম প্রশ্নটা আর একটু প্রাঞ্জল করুন।

অপলক চেয়ে রইলেন একটু।—আপনি উদার হয়ে সাহিত্যে যৌন সংবেদনার সৌন্দর্য প্রকাশের সুপারিশ করেছিলেন...কিন্তু জীবন যদি ভুলে হোক বা ভাগ্য বিড়ম্বনায় হোক, ব্যভিচারের বীভৎস প্রকাশ হয়? আপনি বলেছিলেন সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ লেখকের থাকতেই হবে—কিন্তু ওই রকম জীবনের প্রতি কি লেখকের কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না?

মনে হল আমার জবাবের ওপর ওঁর অনেক আশা নিরাশা নির্ভর করছে। খুব সদয় সুরেই বললাম অবন্তী, আলোচনার এই একাডেমিক দিকটা একপাশে সরিয়ে রেখে আপনার মনে যা আছে তাই সোজাসুজি বলুন না। মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি এ বিশ্বাস যদি আপনার থাকে, আপনার জীবনের ক্ষতটাই আমাকে সোজাসুজি দেখতে দিন।...গত রাতের কথাগুলো আপনার মনে আছে? প্রকারান্তরে আপনি নিজেই তো স্বীকার করেছেন, আপনাকে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো লেখকের নিছক ভাবনা বিলাস নয়।

চেয়ে আছেন। কালো মুখশ্রী কমনীয় হয়ে উঠতে লাগল। চোখেমুখে ঠোঁটে হাসির আভাস।—মরতে মরতেও দেমাক যায় না যে, কি করব? ঈষৎ আগ্রহভরে সামনে

ঝুঁকলেন একটু।—আচ্ছা, কনফেশন ব্যাপারখানা কি বলুন তো? কিছু স্বীকার করার সত্যিকারের তাগিদ, না ভাবপ্রবণতা না আর কিছু?

হেসে জবাব দিলাম, নিজের কোনো অন্যায় বা মন্দ কবুল করা মানেই তার জীবনে ভালোর শুরু।

—থাক, আর ভালোয় কাজ নেই। সত্যি এ-যে কি একটা ঝোঁক! আমি বিশ্বাস করি আমাদের গুরুদেব সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা, তবু আমার সব শোনার জন্য গেলবারে তাঁকেই আমি ধরে পড়েছিলাম—তিনি হেসে বললেন আমাকে বলার দরকার নেই—বলার মতো লোক পেলে ব'লো, কিন্তু বে-দরদীর কানে কিছু দিও না। তা বলে কারো আলগা দরদও আমি চাই না, মানুষের প্রতি আপনার এত শ্রদ্ধা বলেই লেখক হিসেবে আপনার মধ্যে আপোস নেই—আপনি যেন দয়া করে আমাকে দয়া করবেন না।

পাঁচ

যাবার দিন এসে গেল। অবন্তীকে বলেছিলাম, যাবার আগে নকুল আর সহদেবের সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত। অবন্তী যা-ই বুঝে থাক, মুখ ফুটে জিগ্যেস করেনি, কেন। চুপচাপ দুই ছেলেকে খবর দিয়েছে। ট্রেনের সময় ধরে ওরা গাড়ি নিয়ে এসেছে। ওরাই আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

দোতলার সিঁড়ির বারান্দায় এলাম। ব্রহ্মমহারাজের ফোটোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি, তিনি আমার দিকে। ওই চাউনির স্নিগ্ধ স্পর্শটুকু অনুভব করতে চেষ্টা করছি। মনে হল, বস্তুসর্বস্ব হৃদয়শূন্য এই কালেও এমন মানুষেরা আছেন বলেই কলির ভারসাম্য বজায় আছে।

অবন্তীর মেয়েরা সার বেঁধে এসে প্রণাম করে গেল। শেষে নিঃশব্দে অবন্তীও।

ফেরার সময়ও সহদেবই গাড়ি চালাচ্ছে। একটু ঘেঁষাঘেষি হয়ে তিনজনেই সামনে বসেছি। আমার যেটুকু শোনার ছিল তা পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু সরল উৎসাহে ওরা সেটুকুকে পঁচিশ মিনিট অর্থাৎ প্রায় স্টেশন পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। এ-ও অনেকটা কনফেশনের তাগিদের মতোই।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে হাঁপাতে হাঁপাতে বীরেশ্বর ঘোষাল এলো। বেচারার আজও অবকাশ নেই। ওর দায়িত্ব কাল শেষ হবে। আমন্ত্রিতরা সব একজোটে কাল ফিরবেন। প্রয়োজনে আমার আজ ফেরাটা আগেই ঠিক ছিল।

নকুল সহদেবের কান এড়াবার জন্য পাশে বসে আমার মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, শেষ শোনা হল না, তোমার এক্সপ্লোরেশন কমপ্লিট তো?

হেসে জবাব দিলাম, একেবারে কমপ্লিট, তবে তাতে আমার আর কি কেরামতি, এক্সপ্লোরড্ হবেন বলেই তো মহিলা নিজে কোদাল শাবল হাতে তুলে দিয়েছেন।

ওরা নেমে গেল। ট্রেন ছাড়ল।...এবারে আমি কাশীতে এসেছিলাম বটে। কাশী ছেড়ে চললাম।

খুব ধীর গতিতে স্টেশন প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে গাড়ির গতি বাড়তে থাকল।

এয়ার কনডিশনড চেয়ার-কারের একটি চেয়ারও খালি নেই। কিন্তু এত লোকের

মধ্যে এবারে আমি নিঃসঙ্গ। এবং নিশ্চিন্তও। যে-জীবন চিত্র একে একে আমার চোখের সামনে সার বেঁধে আসছে, এরপর লেখকের হাতে পড়ে তাতে কিছু অনুপ্রাস ব্যঞ্জনা আর শিল্প-কল্পনা যুক্ত হতে পারে। কিন্তু এ-ব্যাপারেও যতটুকু সম্ভব সংযত হবার প্রয়োজন অনুভব করছি।...কারণ, অবন্তীর অনুরোধ কানে লেগে আছে—'আপনি যেন দয়া করে আমাকে দয়া করবেন না।'

অবন্তী মালহোত্রার জন্ম কলকাতায়। লেখা-পড়া গান বাজনা নাচ সবই কলকাতায়। তার বাবা কলকাতার এক মস্ত মাড়োয়ারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে কাজ করতেন। নিজের গুণে কর্তাব্যক্তিদের চোখে পড়েছেন। তারপর বছর বছর পদস্থ হয়েছেন। সেই অনুযায়ী ঠাট বজায় রাখার খরচও বেড়েছে। মোটামুটি বড় চাকরি হলেও মাসের রোজগার সীমিত। কিন্তু স্ত্রীটি সর্বদা স্বামীর উপার্জনের সীমানার মধ্যে থাকতে পারতেন না। তাঁর গানের দৌলতে বাসের এলাকায় মহিলা মহলের তিনি প্রিয়জন। এই মহলেও অবাঙালী থেকে বাঙালীই বেশি। কিন্তু তাঁর গানের বিদ্যা অর্থকরী নয়। বাড়িতে গানের আসর বসত, ছোটখাটো নাটকের অনুষ্ঠানও হত। এই সংস্কৃতি প্রীতির দরুণ ঘরে কিছু আসত না, উল্টে ঘরের টাকা থোকে থোকে বেরুতো।

অবন্তীর বাবা লোক ভালো, কিন্তু রগচটা আর বদরাগী। স্ত্রীর গান-বাজনার ঝোঁক তার অপছন্দ ছিল না। বরং পছন্দই করতেন। তিনি রূপসী কিছু নন, কিন্তু তাঁকে ঘরেই এনেছিলেন গান শুনে। বড়ঘরের মার্জিত রুচির মেয়ে। বাপ তাঁর খুব ঘটা করেই বিয়ে দিয়েছিলেন। যৌতুকের সঙ্গে দামী হারমোনিয়াম তবলা তানপুরাও ঘরে এসেছিল।

অবন্তীর বাবা মানুষটি অনুদার নন, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির হিসেবী মানুষ। আর ভিতরে ভিতরে রক্ষণশীলও। খরচের দিকটা তাঁর ভাবতে হয়, কারণ তিন-তিনটে মেয়ে। ছেলে নেই। তাঁদের সমাজে এক একটি মেয়ে পার করতে অনেক খরচ। একটা বাঁচোয়া, বড় দুই মেয়ে বেশ সুশ্রী আর মোটামুটি ফর্সা। কিন্তু ছোট মেয়ে অবন্তীর মুখখানা বড় দুজনের তুলনায় বেশি সুন্দর, অথচ বেজায় কালো। এ-দেশে কালোর কদর নেই। তিন মেয়ে নিয়েই বাপের চিন্তা ছিল, তার মধ্যে অবন্তীর জন্য চিন্তা বেশি ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে ভদ্রলোকের কেবল এই মেয়েদের নিয়েই মাঝে মাঝে খটাখটি লাগত। মেয়েদের গুণের দিকটা বড় করে তোলার চেষ্টায় মহিলা খরচের দিকটা ভাবতেন না, বাধা পেলে বলতেন, মেয়েদের ভালো করে লেখা-পড়া গান-বাজনা শিখিয়ে যোগ্য করে তোলো, ভালো বিয়ে আপনি হবে, দিন-কাল বদলাচ্ছে।

ভদ্রলোক তেতে উঠতেন, —অর্থাৎ লেখা-পড়া গান-বাজনা শিখে যে যার পছন্দ মতো প্রেম করে বিয়ে করবে, আর আমাদের তেমন খরচের দায় থাকবে না—কেমন?

—অতটা বলছি না, কিন্তু ওদের বিয়ের ব্যাপারে আমাদের হাত তো না-ও থাকতে পারে...।

—আলবত থাকবে, না থাকলে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না!

আড়াল থেকে অবন্তী বাবা মায়ের এই বিতণ্ডা শুনত আর খুব মজা পেত। আর তাকে নিয়ে বাবার যে সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তা-ও জানত। আর মনে মনে ভাবত, সে এমন একখানা বিয়ে করবে বড় হয়ে, যাতে বাবার একেবারে তাক লেগে যায়।

না, খরচের মধ্যে বাবাকে ও কখনো ফেলবে না। মনে মনে বাবার থেকে অবন্তী মায়ের বিবেচনার বেশি দাম দেয়। কালো মেয়ের মুখখানা কি করে আলো করে দেওয়া যায় বাবার থেকে মায়ের সে জ্ঞান ঢের বেশি। বাচ্চা বয়সে দিদিদের মতন তারও নাক ফুটো করা হয়েছিল। দিদিদের নাকে ছোট মটরদানার মতো একটা করে সোনার নাকছাবি। আর অবন্তীর নাকে ছিল পলকা সুতোর মতো ছোট্ট একটা সোনার রিং। চৌদ্দ বছর বয়সে মা ওকে এক ছুটির দিনের দুপুরে গয়নার দোকানে নিয়ে গেল। একটু বড় আকারের একটা সাদা পোখরাজ বাছাই করে সোনার রিং খুলে সেটা ওর নাকে বসিয়ে দেখল। তারপর আর না খুলে সেটা কিনে নিয়েই বাড়ি ফিরল।

বাবা রাগ করল। দাম তো কম নয়। কিন্তু মা নির্বিকার। বলল, রাগ না করে অত দাম দিয়ে কেন সাদা পোখরাজ দিলাম মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করো।

বাবা তখনকার মতো গোঁ-গোঁ করল বটে, কিন্তু তার রাগ পড়তে সময়ও লাগল না। অবন্তী তো আর বোকা মেয়ে নয়, অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছে ওই নাকের গয়না হবার পর বাবা মাঝে-মাঝেই আড়ে আড়ে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

সব থেকে বেশি অবাক হয়েছিল অবন্তী নিজেই। গায়ের রং নিয়ে যে যাই বলুক অবন্তী নিজেকে কখনো কুৎসিত ভাবত না। আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে দেখত। দিদিদের রং ফর্সা বটে, কিন্তু তাদের তুলনায় নিজের চোখে নিজেকে বরং বেশি সুন্দর লাগত। দিদিদের কি তার মতো পেটানো স্বাস্থ্য? একজনের সতেরো আর একজনের উনিশ না পেরুতে মোটার দিক ঘেঁষছে। আর মাথায় তো এখনই ও বড়দির থেকেও লম্বা। গায়ের রং কালো বলে কি পাড়ার আর স্কুল এলাকার ছোঁড়াগুলো কম তাকায় না কম জ্বালাতে চেষ্টা করে? কিন্তু নাকের এই গয়নাটি পাওয়ার পর অবন্তীর ভিতরে একটা চাপা উল্লাস। ঘরের দরজা বন্ধ করে আয়নার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। নাকের ওই একফোঁটা সাদা জিনিসটার জলুসে তার সমস্ত মুখের শ্রী-ই যেন ফিরে গেছে। মায়ের বুদ্ধি আর বিবেচনা বটে! স্কুলেও এই জিনিসটা নতুন মর্যাদা দিয়েছে তাকে। মেয়েরা কতজনে বলেছে, কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে এখন ভাই। আন্টিরাও অনেকে আড় চোখে ওর এই নতুন গয়না লক্ষ্য করেছে। কিন্তু অবন্তী জানে সত্যিকারের যাচাই হয় ছেলেদের চক্ষু দিয়ে। আগেই যে-ছেলেগুলো হাভাতের মতো চেয়ে চেয়ে দেখত, ফাঁক পেলে গা-ঘষে চলে যেত, এখন যেন তাদের হায়নার চোখ। পারলে পাথরসুদ্ধু নাকটাই কামড়ে তুলে নেয়।

সব থেকে মজার যাচাই হয়েছে একতলার ওই বরুণ নচ্ছারটার চোখ দিয়ে। এটা কোম্পানির ভাড়া করা দোতলা বাড়ি। এক-এক তলায় বড় বড় চারটে করে ঘর। দোতলার ফ্ল্যাটে অবন্তীরা থাকে। নিচের তলাটা বাবার অফিসেরই বন্ধু অর্জুন মেহ্‌রার। বরুণ তাঁর ছোট ছেলে। অবন্তীর থেকে বছর পাঁচেক বড়, হায়ার সেকেণ্ডারিতে পড়ে। পাশ করেই নাকি দাদার কাছে ওয়েস্ট জার্মানিতে চলে যাবে!

অর্জুন মেহ্‌রার দুই ছেলে দুই মেয়ে। সকলের বড় ওই দাদা আর সকলের ছোট বরুণ। কিন্তু কথাবার্তা চাল-চলনে এমন লায়েক যেন দুনিয়ায় ওর থেকে বড় কেউ নেই।

দক্ষিণ কলকাতার এটা বাঙালী এলাকা। শতেকে আশীটি বাঙালী পরিবারের বাস। কিছু মাড়োয়ারি আর মাদ্রাজীও আছে। অবন্তীর বন্ধু বা বান্ধবীরা সকলেই বাঙালী। কিন্তু

সকলের থেকে ওর ওপর মাতব্বরি আর সর্দারি যার সে ওই নচ্ছার পাজি বরুণ মেহ্‌রা। উনিশ বছর বয়স না তো যেন উনত্রিশ। গায়ের রং ফর্সা, সে-যেন ওরই কেরামতি। যত্নের চোটে সেই রং ভ্যাদভেদে সাদা করে তুলছে। আর অবন্তী তেমনি কালো এ-যেন ও-ছেলের কাছে খুব একটা মজার ব্যাপার। যখন তখন জোর করে ওকে কাছে টেনে নেয়, বুড়ো আঙুলে করে ওর বাহু গাল ঘসে ঘসে দেখে আঙুলে কালো রং ওঠে কিনা। হেসে-হেসে বলে, এমন একখানা পাকা রং কোত্থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে এলে?

নাকে ওই সাদা পোখরাজ ওঠার পর তারই অন্য রকম চাউনি। জিগ্যেস করল, ওটা কি পাথর?

—পোখরাজ।

—পক্ষীরাজ? তাই হবে, ওটা পরে মনে হয় তুমি উড়ছ। কাছে টেনে পাথরটা খুঁটে খুঁটে দেখল। পাজির পা-ঝাড়া একখানা, পাথরটা যেন এভাবে কাছে টেনে না এনে দেখা যায় না। ফর্সা মুখে হাসি চুয়ে পড়ছে। —সত্যি, বেড়ে দেখাচ্ছে তোমাকে মাইরি!

রাগের বদলে অবন্তীর সেদিন বেজায় আনন্দ হয়েছিল। নচ্ছার পাজি হলেও অবন্তী তাকে তার ওয়েস্ট জার্মানিতে থাকা দাদার সমজদার ভাই-ই ভাবত। তার প্রশংসার সব থেকে বেশি দাম দিত। দেবে না কেন, পাড়ার সকলেই ওকে একখানা উঁচু দরের ছেলে ভাবে।

দিদিরা অবন্তীকে হিংসে করত ওর প্রতি মায়ের একটু পক্ষপাতিত্ব দেখে। গায়ের রং কালো, তার জন্য ওর যেন বাবা মা দু'জনের কাছ থেকেই একটু বাড়তি নজর প্রাপ্য। এই বাড়তি নজরটা বড় বোনেরা ছোটর আদর ভাবত না। তিন বোনই ভাল মাস্টারের কাছে গান শেখে, এর ওপর মা নিজেও যত্ন করে ছোটকে দেখে, তালিম দেয়, সুন্দর সুন্দর ভজন শেখায়। বড় দু'জনের যে আগ্রহ কম সেটা তারা স্বীকার করবে না, কেবল মায়ের দোষ ধরবে।...বাবা নাচ পছন্দ করত না বলে বড় দুই বোনের নাচ শেখা হয়নি। কিন্তু অবন্তী যখন নিজের কৃতিত্বে স্কুল থেকে গান আর নাচ দুইয়েরই প্রাইজ নিয়ে এলো, বাবার কোনো কথায় কান না দিয়ে মা ওর জন্য নাম-করা একজন মহিলা নাচের মাস্টার রেখে দিল।

অবন্তী সতেরোয় পা দেবার আট-ন'মাস আগে-পরে দুই দিদিকে নিয়ে ওদের সংসারে বেশ দু'দুটো বড় রকমের কাণ্ড ঘটে গেল। প্রথমে বড়দি ধরা পড়ল। সে একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। আর সেই প্রেম তড়িঘড়ি এগিয়েছেও। বড়দি তখন এম-এ পড়ে। ধরা পড়তে অতবড় মেয়েকে বাবা পাবলে ধরে মারে। বড়দি আলটিমেটাম দিয়েছে ওই ছেলেকেই বিয়ে করবে! বাবার স্পষ্ট কথা, আমার বংশে এরকম বেলেল্লাপনা কখনো হয়নি, হবে না। তোমার বিয়ে আমি ঠিক করব, অবাধ্য হলে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক না থাকার দিকেই গড়াতো যদি না এর মধ্যে মা দিদির দিকে ঝুঁকত আর মামাবাড়ির লোকেরাও এসে বাবাকে বোঝাতো। স্বজাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে, ছেলের বাপ বড় ব্যবসায়ী, তাদের বড় অবস্থা —বিয়ে দিতে বাধাটা কোথায়?

...শেষ পর্যন্ত বাবাই দাঁড়িয়ে থেকে বড়দির বিয়ে দিল। কিন্তু খুব খুশি মনে নয়। ওই ছেলে বাবার অন্তরঙ্গ জামাই হয়ে উঠতে অবশ্য তিন চার মাসের বেশি সময় লাগে

নি। অবন্তী তখন নিজের মনে হেসেছে। বড়দির বড় ঘরের জলুস দেখে বাবারও চোখ ঠিকরেছে।

ছ মাস যেতে আবার নাড়াচাড়া পড়ল ছোড়দিকে নিয়ে। আর তখনই বোঝা গেল, বড়দির বিয়ের ব্যাপারে ছোড়দির কেন অত উৎসাহ আর বাবার ওপর অত রাগ দেখা গেছল। আসলে খুড়তুতো জ্যাঠতুতো দুই ভাই দুই দিদির সঙ্গে প্রেম করছিল। এদেরও ব্যবসা, বড় অবস্থা। প্রস্তাবটা বড়দির মারফৎ এলো, সেই কারণে মায়েরও খুব আগ্রহ। বড় জামাই তো ততদিনে জামাইয়ের মতো জামাই। তার ওপর ছোড়দিও স্পষ্ট ঘোষণা করল, ওখানে ছাড়া অন্যত্র আর কোথাও বিয়ে করবে না। এবারে অবশ্য বাবার হম্বিতম্বি আর হুংকার শোনা গেল না, কিন্তু গুম হয়ে রইলো। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে আবার এই বিয়েও দিল।

অবন্তী এবারও মনে মনে হেসেছিল। না, দু'বোনের একটা বরকেও ওর পছন্দ নয়। অবন্তী তাদের ঠোঁট উল্টে বাতিল করে দিত। টাকা গাড়ি বাড়ি ছাড়া আর কি আছে? ওর বিয়েটা বাবা মায়ের তাক লাগার মতোই হবে এ বিশ্বাস কেবল অবন্তীর নিজেরই ছিল। কেউ জানে না, খুব পরিচিত একজনকে ঘিরে ওরও একটা জগৎ গড়ে উঠেছে। পাজির পা-ঝাড়া হলেও যাকে বলে ঝকঝকে ছেলে। পাজি বলেই অবন্তীর কাছে তার কদর বেশি।...দু'দিন বাদে দাদার কাছে ওয়েস্ট জার্মানিতে যাচ্ছে। এখানকার কলেজের পড়া ছেড়েই চলল সে। সেখানে থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ গড়বে নাকি। তারপর দেশে ফিরে অবন্তীকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। এ-সব কথা-বার্তা ওদের মধ্যে পাকা।

...সেই ছেলে নিচের তলার বরুণ মেহরা। বাইশ বছরও বয়েস নয়, সে এখন দোতলায় এই কালো মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বলে, তোমার মতো সুন্দর কেউ নয়, তুমি কালো না হয়ে ফর্সা হলে এত সুন্দর লাগত না। অবন্তী অবিশ্বাস করবে কেন? ওর বয়স এখন সতেরো পেরিয়েছে—নিজের কি চোখ নেই? আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে না?

চলে যাবে, তাই ফাঁক পেলেই অবন্তীকে ধরে একটা চুমু খেতে চায়। শুধু চায়? এ-জন্য হাত জোড়ও করেছে। কিন্তু অবন্তী ভিতরে নরম হলেও বাইরে দস্তুরমতো শক্ত। এখন পর্যন্ত অ্যালাউ করেনি। মতলব বুঝতে পারলে ছিটকে সরে গেছে।

কিন্তু ও দূরে চলে যাবে অবন্তীর কি কম মন খারাপ? কত্ত দূরে চলে যাবে, কবে আবার দেখা হবে। তবে মন খারাপের ভাবটা অবন্তী ঝেড়ে ফেলতেই চেষ্টা করে। পুরুষ মানুষ বড় হবার জন্য দূরে যাবে না তো কি? বাইরের দুনিয়াটা দেখার সাধ অবন্তীর কি কম নাকি। বড় জগতে যাবার মেজাজ দেখেই তো বরুণকে আরো বেশি পছন্দ।

...ভাবছে যাবার আগে একটা চুমু ওকে খেতে দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতে গেলেও যে দু'কান গরম হয়ে ওঠে। কোথায় এটা সম্ভব হতে পারে? ওই ছেলে দুই একবার এই চেষ্টা করেছে ওকে নিজের ঘরে পেয়ে। কিন্তু দু'দিন বাদে চলে যাবে বলে এখন তো ওই ছেলে ওদের বাড়ির লোকের চোখের মণিটি। নিজে যেমন তোড়জোড়ে ব্যস্ত, বাড়ির লোকও তাকে সর্বদাই ঘিরে আছে। নিচে আর ওর ঘরেও সুবিধে হবে না। সন্ধ্যার পর কোনো এক ফাঁকে ছাদে ডেকে নিয়ে যেতে পারে, বাবা রাত সাতটা

সাড়ে সাতটার আগে বাড়ি ফেরে না। মা এটা-সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবু দু'জনকে ছাদ থেকে নামতে দেখে ফেললে কার না সন্দেহ হবে? আর, কেউ দেখে না ফেললেই বা কি। ব্যাপারটা ভাবতে গেলেই অবন্তীর মাথা ঝিমঝিম আর বুক দুরুদুরু।

বেশ একটা সমস্যার মধ্যেই পড়েছে অবন্তী। দুপুরে নিজের ঘরে শুয়ে একটা সমাধানের পথই খুঁজছিল। যাবার আগে ওই ছেলেকে একটু খুশি করার তাগিদটা বড় অদ্ভুত।

খুট করে কানে একটু আওয়াজ আসতে অবন্তী চমকে এ-পাশ ফিরল, তারপর ধড়মড় করে উঠে বসল। বরুণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে। ঘুরে দাঁড়ালো। হাসছে মিটিমিটি। চোখে শয়তানি। দু'হাত জোড় করে সে নীরবে মিনতি জানালো, অর্থাৎ দয়া করে চুপ একেবারে। তারপরে কাছে এসে বলল, পরশু চলে যাচ্ছি কিন্তু তুমি বড় নিষ্ঠুর...

অবন্তী নেমে এসে রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুমি একটা ডাকাত, শিগগির চলে যাও!

কানেই গেল না। বলল, আমি দেখে এসেছি তোমার মা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তোমার কি-চ্ছু ভয় নেই, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে যাব।

চোখের পলকে দু'হাতে ওকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে-ধরে চুমু খেল—একটা চুমুই যেন আর শেষ হয় না। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই তারপর ফিসফিস করে বলল, এবারে তুমি—

প্রাণের দায়ে অবন্তী মুহূর্তের মধ্যে সেরে ফেলে অব্যাহতি পেতে চাইলো। কিন্তু অন্যাজনে তা হতে দিলে তো। এমন চেপে ধরে আছে যে মুখ তুলতেই দিচ্ছে না। তারপর মুহূর্তের মধ্যে যে কাণ্ড করল অবন্তীর হার্ট ফেল করা বিচিত্র ছিল না। বোকা বলেই ও খাটের পাশে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্রয়টুকু দিয়েছিল। চোখে লাল নীল সবুজ দেখছে। তারপব অন্ধকার। তাবপর দিশেহারার মতো দেখে ওকে শয্যায় ফেলে দস্যু একেবারে ওর বুকের ওপর। চুমোয় চুমোয় ওর দম বন্ধ হবার দাখিল। সেই সঙ্গে আসুরিক তৎপর হাতে ওর শরীবটাকেও ইচ্ছেমতো দখলে আনার চেষ্টা।

—এই! মায়ের গলা! অবন্তী অস্ফুট সুরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

চমকে ছেড়ে দিতেই অবন্তী টুক করে খাটের ওপাশ দিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বোকা বনেছে বুঝতে পেবে বরুণ উঠে বসল। ফর্সা মুখ টকটকে লাল। রেগেই গেছে। সদর্পে বলল, আসুক তোমার মা, আমি নড়ছি না।

—পালাও, সত্যি মায়ের ওঠার সময় হয়েছে!

—তাহলে কাল আবার আসব বলো—কালই তো শেষ দিন। বাগ নয়, গলার স্বরে এবারে মিনতি।

—না না!

—তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে তুমি আমার পড়ার ঘরে আসবে, আমি আগে থাকতে ঠিক অন্যাদের হটিয়ে দেব—তুমি কথা না দিলে আমি যাচ্ছি না।

অবন্তীর সর্বাঙ্গ কি-রকম তপতপে স্পর্শ একটা। মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল, ওই ঘরে খাট-টাট কিছু নেই, তবু জিগ্যেস করল, এ-রকম বজ্জাতি করবে না তো?

—আচ্ছা ঠিক আছে, একটুও দুষ্টুমি করব না, শুধু ছোট্ট করে একটা বিদায়ী চুমু

খাব। পার্টিং কিস্ না পেলে আমার যাত্রা শুভ হবে?

পরদিন বাবা অফিসে বেরুনোর পর থেকেই অবন্তীর মাথায় দুশ্চিন্তার বোঝা। বার বার ঠিক করছে, যাবে না, রওনা হবার সময় গিয়ে দাঁড়াবে শুধু। কিন্তু মনে ভয়ও কম নয়, ওই ছেলের ইচ্ছেটুকু পূরণ না করলে যাত্রা যদি সত্যিই অশুভ হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়ছে। ভয় আবার যাবার লোভও।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ পা-টিপে নেমে এলো। কিন্তু একতলার কোথাও তার দেখা পেল না, নিজের ঘরে বা বারান্দায় কোথাও না। পা-টিপেই ফিরে আসছিল কিন্তু বরুণের এক দিদির হাতে ধরা পড়ে নাকাল হবার দাখিল। দিদিরা দু'জনেই শ্বশুর বাড়ি থাকে, ছোট ভাই চলে যাবে বলে এসেছে। মেয়েটাকে হকচকিয়ে যেতে দেখে জিগ্যেস করল, কি রে?

—ইয়ে, ব-ব্-বরুণ কাল চলে যাবে বলে এসেছিলাম।

—তা অমন চুপি চুপি যাচ্ছিস কেন? এক দিদির সন্দিগ্ধ প্রশ্ন।—বরুণ তো এয়ার অফিসে কি-সব খবর-টবর নিতে গেছে, ফিরতে বিকেল হবে বলে গেছে।

অবন্তী ওপরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, আবার ভিতরে ভিতরে রাগও হতে থাকল।

রাতে বরুণ নিজেই এলো দেখা করতে। বাবা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মা ওকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বে না। অবন্তীর ঘরেই ওকে বসতে বলল। আর মেয়েকেই বলল, নিয়ে গিয়ে বসাতে। এ-বেলায় একেবারে সুবোধ ছেলে, আগে আগে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল, তার পিছনে অবন্তী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা চুমু খেয়ে নিল। বড় জোর দুই কি তিন সেকেণ্ড।

দুঃসাহস দেখে অবন্তী তাজ্জব। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। বরুণ হাসতে হাসতে একটা চেয়ার টেনে বসল, দুপুরে নিচে গেছলে নাকি?

—জানি না যাও! অবন্তী চাপা রাগে ঝাঁঝিয়ে উঠল, মা বা আর কেউ দেখে ফেললে কি হতো?

—অমন কাঁচা কাজ আমি করি না, তোমার পিছনে কেউ আসছিল না আগেই দেখে নিয়েছিলাম, দুপুরে কথার খেলাপ করেছিলাম, সেটা কাটিয়ে দিলাম...সত্যি সকাল থেকে এমন যাচ্ছে না—ভুলেই গেছলাম।

দু'চার কথার পরেই খুশি মুখে বরুণ প্রস্তাব করল, ওয়েস্ট জার্মানি গিয়ে সে অবন্তীকে মাসে একখানা করে চিঠি লিখবে, আর অবন্তীকেও তাকে মাসে একখানা করে চিঠি লিখতে হবে। তা না হলে ও খুব রেগে যাবে।

অবন্তীর চক্ষু স্থির, তুমি এখানে চিঠি লিখলে বাবা মা টের পেয়ে যাবে!

—কি ভীতু মেয়ে না তুমি! ঠিক আছে, তুমি তোমার বন্ধু জয়া ঘোষকে বলে রেখো, তার ঠিকানায় চিঠি লিখব, ওপরের খামে তার নাম থাকবে, ভিতরের খামে তোমার নাম, আর তুমি সরাসরি আমাকে লিখবে।

পাশের বাড়ির জয়া ঘোষ অবন্তীর প্রাণের বন্ধু, কিন্তু ডাঁটিয়াল মেয়ে। ইংলণ্ডে আমেরিকায় তার পেন-ফ্রেণ্ড আছে, তার চিঠি এলে কেউ খোলে না।

অবন্তী মনে মনে বুদ্ধির তারিফ করল। চট করে এত সব তার মনে আসে না।

দুপুরের ভুলে যাওয়া আর হাট করে খোলা ঘরে এসে পলকে ওই কাণ্ড করার মধ্যে ওর চোখে পুরুষের জোবালো দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে।

পরের মাসেও নয়, জয়া ঘোষের মারফত বরুণের চিঠি এলো মাস আড়াই বাদে। লিখেছে এর মধ্যে বেশ কয়েকটা দেশ ঘুরেছে। সে-দেশের মেয়েদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সব মেয়েই কি সুন্দর আর কত ফ্রি। কিন্তু অবন্তীর মতো সুন্দর মুখ সে নাকি এখানে এসে একটিও দেখল না। আর তার মতো মেয়ের কাছ থেকে জোর করে চুমু আদায় করার আনন্দও এখানে নেই। হ্যাংলা মেয়েগুলো নিজে থেকে মুখ বাড়িয়েই থাকে। লম্বা চিঠিতে অনেক উচ্ছ্বাস আর প্রতিশ্রুতি। সে অনেক বড় হবে, দেদার টাকা রোজগার করবে, তারপর দেশে এসে অবন্তীকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে ভোগের সমুদ্রে ডুববে। অবন্তী যেন সেই মতো নিজেকে তৈরি করে। নাচে গানে অদ্বিতীয়া হয়ে ওঠে।

তারপর আবার তিন মাস যায় ছ'মাস যায় বছর ঘুরে আসে। প্রথম চিঠির জবাব দেবার পর অবন্তী আরো দু'খানা চিঠি লিখেছিল। একখানারও জবাব নেই।

একে একে তিনটে বছর কেটে গেল। অবন্তী মালহোত্রা রবীন্দ্র ভারতী থেকে মিউজিক নিয়ে সসম্মানে বি, এ পাশ করল। একই বিষয় নিয়ে এম-এ'তে ভর্তি হয়েছে। নাচ আর গান ধ্যান-জ্ঞান। কোনো ফাংশনে গিয়ে নাচটা বাবা এখন আর পছন্দ করেন না। কিন্তু গানে আপত্তি নেই। অথচ গানের থেকে অবন্তীর নাচ কম পছন্দ নয়।

এক মহিলার হা-হুতাশ থেকে বরুণ মেহরার খবর অবন্তীর একেবারে অজানা নয়। তিনি বরুণের মা। অবন্তীর গান তাঁর খুব ভালো লাগে। একতলায় এখন তো শুধু ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর বাস। ভজন বা কীর্তন শোনার ইচ্ছে হলে বরুণের মা দোতলায় উঠে আসেন, বাতের যন্ত্রণা বাড়লে অবন্তীকে ডেকে পাঠান। না, ছোট ছেলে এখন ঠিক কোথায় ওঁরাও জানেন না। খুব সম্ভব ফ্রান্সে। শেষ চিঠিতে বড় ছেলে তাই লিখেছিল। ছোট ভাইয়ের ওপর সে তিক্তবিরক্ত। ওখানে গিয়ে দেড় দুই বছর পড়াশুনা করেছিল। তারপর দাদার কাছ থেকে সরে গেছে। দাদা লিখেছে, রাতারাতি বড়লোক হবার নেশায় পেয়েছে ওকে, কোথায় আছে কি করছে কিছুই জানায় না। ফ্রান্সে আছে তা-ও দাদা তার এক বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছে।

...এ-দিকে বাড়িতে সকলে বেঁচে আছে কি নেই, এ খবরও ছেলে রাখে না।

এরপরে ঠিকানা পেয়ে ওর মা তিন চারখানা চিঠি লিখে একখানার জবাব পেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আরো বছর খানেক বাদে ওই ছেলে বাড়িতে বেশ একটা চমক দিয়েছে। বাড়িতে মায়ের নামে হঠাৎ টাকা পাঠিয়েছে ফ্রান্স থেকে। কম টাকা নয়। এ-দেশের অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় পঁচিশ হাজারের মতো হবে। লিখেছে, মা, এ-দেশের একদল মানুষ বেজায় কুঁড়ে, আবার তার মধ্যে অন্য দলের কিছু মানুষ দু'দিকে দুটো ডানা লাগিয়ে টাকার পিছনে ওড়ে। তোমার ছেলে এই দ্বিতীয় দলে নাম লিখিয়েছে। মোটে বিশ্রাম নেই, কেবল কাজ আর কাজ। দাদা আমার ওপর রেগে আছে, তোমরাও এই অযোগ্য ছেলের আশা ছেড়ে দিয়েছ জানি। কিন্তু এটুকু শুধু বলতে পারি আমি বসে নেই। যতদিন কোনো খবর পাবে না ততদিনই ভালো আছি জেনো। দাদার কাছে গেছলাম, শিগগিরই সে ওয়েস্ট জার্মানি ছেড়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। সব শেষে

লিখেছে, ওপর তলার মালহোত্রাদের খবর কি? অবন্তীর কি বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেছে? ওকে বোলো আমি কাউকেই ভুলিনি।

তারপর আবার দেড় দু'বছরের মধ্যে কোনো খবরই নেই। অবন্তী মালহোত্রা মিউজিকে এম-এ পাশ করেছে। এরও প্রায় সাত আট মাস আগে তার জীবনে আর একটি পুরুষ এসেছে। জোরালো পুরুষ নয়। কিন্তু তার নীরব, প্রায় ভীরু আবেদনের একটা জোর আছে। নামের চটক আছে। সমর সিংহ। বাঙালী। সগোত্রে স্বজাতের থেকে অবন্তীর বাঙালী প্রীতি বরাবরই বেশি। তা বলে কোনো বাঙালীকেই জীবনের দোসর করবে এমন চিন্তা মনের তলায় ছিল না। না থাকার প্রধান কারণ বাবা। এ-দিক থেকে বাবা কট্টর রক্ষণশীল। না থাকার দ্বিতীয় কারণ, বরুণ মেহেরাকেই তো সে তার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পুরুষ ধরে নিয়েছিল। তাই বাঙালীর দিকে চোখ বা মন দেবার কোনো কারণই ছিল না। কিন্তু পরে দেখল চোখের বার তো মনের বার। এ-দেশ ছাড়ার পর বরুণ একটা মাত্র চিঠি লিখেছিল। কিন্তু ওই চিঠির জবাব ছাড়াও পর পর আরো দু'খানা চিঠি লিখেও কোনো উত্তর না পেয়ে অবন্তী মনে মনে হতবাক। তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত ভাবতে বা বিশ্বাস করতে পারে নি বরুণ তাকে ভুলে গেছে বা ভুলে যেতে পারে। একে একে এতগুলো বছর কাটতে মোহ ভেঙেছে।

সমর সিংহকে অবন্তী আগে থাকতেই চিনত। পাড়ার ছোট এক মিউজিক স্কুলের মালিক। নিজের উদ্যমে এই স্কুল খুলেছে। সেখানে মেয়েদের নাচ গান দুই-ই শেখানো হয়। কিছু ছেলেও আছে, শুধু গান সেখে। সমর সিংহও রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্র কিন্তু অবন্তীর থেকে সাত আট বছরের সিনিয়র। বছর ঊনত্রিশ ত্রিশ হবে বয়েস। বিনয়ী এবং ভদ্র। দেখতেও সুশ্রী। অবন্তী যখন মিউজিক নিয়ে বি-এ পড়ে তখন গানের থেকেও তার নাচের কদর বেশি। কাছাকাছির মধ্যে ফাংশন হলে নাচের আমন্ত্রণ বেশি পায়। অবশ্যই অ্যামেচার আর্টিস্ট হিসেবে। কিন্তু যে কোনো আসরে নাচের থেকে গানের অ্যামেচার আর্টিস্টদের চারগুণ ভিড়। অবন্তী এজন্য মনে মনে ক্ষুণ্ন হয়। যারা গানে চান্স পায় তাদের বেশির ভাগের থেকেই ও ভালো গায়। হলে কি হবে, যার যেমন খুঁটির জোর। অবন্তীর হয়ে সুপারিশ করার আর কে আছে। যে ওস্তাদের কাছে বাড়িতে খেয়াল আর ভজন শেখে, এসব জলো ফাংশন তাঁর দুচক্ষের বিষ। তাঁর কেবল এক উপদেশ, সঙ্গীত সাধনার জিনিস, ফাংশনে গাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ো না।

এ-দিকের এলাকায় কোনো ফাংশন হলে সমর সিংহের প্রোগ্রাম তো থাকতই। পাড়ার ছেলেদের কাছে সমর সিংহ মস্ত গায়ক। তার গান অবন্তী অনেক শুনেছে। মাঝে মাঝে রেডিও প্রোগ্রাম থাকে। গলা ভালো আর মিষ্টি। কিন্তু কবিতার মতো আধুনিক গানই বেশি গায়। কখনো সখনো দুই একটা রাগপ্রধান শোনে। কিন্তু সেটা তেমন উঁচুদরের মনে হয় না।

রবীন্দ্র ভারতীতে সমর সিংহর কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, তাই যাতায়াতও আছে। সেখানে মাঝে মাঝে তার চোখের দেখা মেলে। আর, যে কারণেই হোক ভদ্রলোক তাকে লক্ষ্য করে সেটা অনুভব করতে পারে।

...তখন একুশ বছর হবে অবন্তীর বয়েস। সমর সিংহ একদিন সোজা ওদের বাড়িতে উপস্থিত। অবন্তীর সেটা এম, এ-র মাঝামাঝি সময়। অবন্তী ভিতরে ভিতরে খুব অবাক।

বাড়িতে ছেলেদের আনাগোনা বাবা এখনো তেমন পছন্দ করেন না। সেই সকালে তিনি অফিসে। অবন্তী তাকে খাতির করে বসালো। সমর সিংহ সবিনয়ে বলল, আশা করছি আমি একেবারে অচেনা লোক নই?

খুব একটা ভক্ত না হলেও অবন্তী হেসে মাথা নাড়ল। সপ্রতিভ মুখে বলে গেল, না, আমি আপনাকে খুব চিনি। রেডিওতে আর ফাংশনে আপনার গান অনেক শুনেছি, আর এও জানি, আপনি আমাদের য়ুনিভার্সিটির পুরনো ছাত্র।

—সাত বছরের পুরনো, নাম ধরে আর তুমি করে বললে আপত্তি হবে কি?

—মোটেই না। কিন্তু মনে মনে অবাক একটু, এই লোক ওর কাছে কি উদ্দেশে?

উদ্দেশ্য শুনল।—কয়েকটা ফাংশনে আমি তোমার নাচ দেখেছি। খুব ভালো লেগেছে। আমার একটা ছোট নাচ-গানের স্কুল আছে—

কথার মাঝেই অবন্তী বলল, জানি—

—তুমি একটু সাহায্য করতে পার কিনা এই আশা নিয়ে এসেছি, আমার বেশি দেবার ক্ষমতা নেই, মেয়েদের শনি-রবিবারে যদি নাচ শেখাতে...

হাসি মুখে অবন্তী তক্ষুনি বলল, য়ুনিভার্সিটিতে আমি গানের ছাত্রী, নাচের না।

—জানি গানের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর অভাব নেই, নাচের জন্য একজন আছেন, আরো একজন দরকার।

অবন্তী বলল, বেশ নাচ শেখাব, কিন্তু গান শেখানোর সুযোগও আমাকে একটু দিতে হবে—কোনোটার জন্যেই আপনাকে টাকা দিতে হবে না।

সমর সিংহ মাথা নাড়ল, একেবারে কিছু না নিলে তো অসুবিধে, দেবার ক্ষমতা খুবই কম বললাম তো, আমার দিক থেকে দরদটুকুই আসল দাবি. তবু...

—ঠিক আছে, আপনার যা সুবিধে তাই দেবেন তাহলে।

বাবার অমতেই কাজটা নিল অবন্তী। আর খোদ মালিকের খাতিব কদর পেতে থাকল। সমর সিংহকে নিয়ে গান-বাজনার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীব সংখ্যা মাত্র পাঁচ, তার মধ্যে একজন সেতার শেখায় বাকি চারজন গান। আর নাচেব শিক্ষয়িত্রী অবন্তী ছাড়া আর একজন। আর দু'জন তবলচি। মোট সাতজন নিয়ে স্কুল। শনি-রবিবার ছাত্রীসংখ্যা দু'শিফটে আশি পঁচাশি জন।

...কিন্তু কিছুদিন না যেতে অবন্তীর মনে হল তাকে পেয়ে সমর সিংহ যত খুশি আর উৎসাহিত, অন্য শিক্ষয়িত্রীরা যেন ততো নয়। মালিক আর দুই তবলচি ছাড়া বাকি সকলেই মহিলা। তাদের আচরণ অভব্য না হলেও অন্তরঙ্গ আদৌ নয়।

কথায় কথায় হাসি মুখেই সমর সিংহকে একদিন বলল, আপনার স্কুলের অন্য শিক্ষয়িত্রীদের আমাকে বোধহয় তেমন পছন্দ নয়। ...আপনি লক্ষ্য করেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা গম্ভীর। জবাব না দিয়ে ফিরে প্রশ্ন করল। কার কার পছন্দ নয় নাম বলো?

—না না, অবন্তী ফাঁপরেই পড়ল, এভাবে বলাটাই আমার খুব ভুল হয়েছে। আর আপনিও ভুল বুঝেছেন। হয়তো-আমি অবাঙালি বলেই কেউ আমার সঙ্গে সেধে মেলামেশা করতে চায় না। আপনি যেন এ নিয়ে কাউকে একটি কথাও বলবেন না।

—বললে তোমার ভয়টা কি?

এই মেজাজ ভালো লাগল না অবন্তীর। হেসেই জবাব দিল, বললে আপনার স্কুলে আর আমাকে দেখবেন না।

সমর সিংহ থমকে চেয়ে রইলো একটু। বলল, তোমাকে অপছন্দ করার কারণ হিংসে। সেদিন তোমার গানের ট্রায়েল নিতে অনেকেরই মুখ শুকিয়েছে। তাদের স্বার্থে ঘা পড়ল ভাবছে। সুমিত্রা চক্রবর্তীর একটা গানের ক্লাস তোমাকে দিয়েছি বলে সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে, এবারে তার চাকরি যাবার সময় ঘনাচ্ছে...বোঝো, এদের কি রকম মন।

শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে সুমিত্রা চক্রবর্তীই বয়স্কা, বছর ছত্তিরিশ বয়েস।

মাস গেলে সমর সিংহ খামে পুরে অবন্তীর হাতে দেড়শ' টাকা দিয়েছে। বলেছে, খুব লজ্জার, এটা মাইনে ভেব না—স্কুল বড় হলে আমি কারো সাহায্য ভুলব না।

অবন্তীর হাঁসফাঁস দশা। আন্তরিক সুরেই বলেছে, আমার কাছে এ তো অনেক টাকা!

এই মাসেই ডাকে সে একটা চিঠি পেল। নিচে নাম স্বাক্ষর দেখল, তপতী মজুমদার। বক্তব্যের সার, আপনার নাচের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ আর আমার সেই পদ থেকে বরখাস্ত একই সঙ্গে হয়েছে। হয়তো খবরটা আপনার এখনো অজানা। আমার দুর্ভাগ্যের কারণ আমি আজও জানি না, তবে অনুমান করতে পারি। ওই স্কুলের শুরু থেকে আমি ছিলাম। আমি কোনরকম অভাব-অনটনের দরুন আপনাকে এ-চিঠি লিখছি না, ওখান থেকে আরো ভালো চাকরি আমার ইতিমধ্যে জুটেছে। কেবল শিল্পী-মালিকের অপমানটুকু বরদাস্ত হচ্ছে না। প্রার্থনা, ভবিষ্যতে আপনাকেও যেন এমন অপমানের স্বাদ পেতে না হয়।

চিঠিটা পেয়ে অবন্তী মালহোত্রা গুম হয়ে বসে রইলো খানিক। খুব ভদ্র চিঠি, ভদ্র অভিযোগ। কিন্তু কোথায় যেন একটু নোংরা ইঙ্গিত আছে।

অবন্তী বোকা একটুও নয়। তিন মাস না যেতে এই মানুষ তার অনেকটাই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। স্কুলে ঘুরেফিরে তার নাচের ক্লাস গানের ক্লাস নেওয়া দেখতে আসে। স্কুলের মালিক হিসেবে এটা তার কর্তব্যের অঙ্গ কিন্তু সবটাই নীরস কর্তব্যের তাগিদ মনে হয় না অবন্তীর। উৎসাহ বা উদ্দীপনার এমন একটু রং আছে যা অনুভবে ধরা পড়ে। ওই লোকের কাছে সে কিছুটা কৃতজ্ঞ তো বটেই। এরই মধ্যে কাছে-দূরের দু'-একটা বড় আসরে তার গানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও তাতে সুনাম ভিন্ন আর কিছু প্রাপ্তিযোগ ছিল না। তাছাড়া তার আগ্রহেই রেডিওতে অডিশন টেস্ট হয়ে গেছে। আশা করা যায় প্রোগ্রামও পাবে। তবে অবন্তীর মনে একটু বিস্ময়, ওই লোকের কাছে এখনো গানের থেকে ওর নাচের কদর বেশি।

বিকেলের দিকে মাঝে মাঝেই তাদের বাড়িতে আসে। বাবা অফিসে থাকে, কিন্তু মা ঠিকই লক্ষ্য করে। লোকটির সম্পর্কে নানা কথা জিগ্যেস করে। অকারণ ভয়ের ছায়া না পড়লে আর মা কিসের জন্য এত খুঁটিয়ে খবর নেবে? মোট কথা এই লোকের ঘনঘন বাড়িতে আসার ফলে মা সন্দিগ্ধ। সমর সিংহ সেদিন আসতে চা দেবার কথা বলেই অবন্তী সরাসরি তাকে জিগ্যেস করল, আমার আগে তপতী মজুমদার নামে কোনো মেয়ে আপনার স্কুলে নাচের শিক্ষয়িত্রী ছিল?

সচকিত একটু।—ছিল। কেন বলো তো?

জবাবে অবন্তী চিঠিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

পড়ে থমথমে মুখ। —এ-চিঠির তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ খুব?

—না, খুব খারাপ লেগেছে, আমার ঠিকানাই বা উনি পেলেন কোথায়?

—তেতো মুখ করে জবাব দিল, স্কুলেরই কেউ দিয়েছে, সকলেই তো খুব মিত্র আমার।

—কিন্তু তাঁর অভিযোগটা কি...আমার নিয়োগ আর তাঁর বরখাস্ত একই সঙ্গে হয়েছে —এর মানে কি?

—মানে খুব সহজ, তোমার কাছ থেকে কথা পেয়ে তাঁকে আমি নোটিশ দিয়েছি —শনি রবি আর ছুটির দিনের ভরসায় আমাদের স্কুল, এর মধ্যে যদি তাঁর অন্যত্র নাচের প্রোগ্রাম লেগেই থাকে, আমার পোষায় কি করে?

স্কুল যে এই লোকের প্রাণ এটা অবন্তী অনুভব করতে পারে। গানের কোনো শিক্ষয়িত্রী কামাই করলে নিজে তার ক্লাস নেয়, কিন্তু দরকার হলে নিজে তো আর নাচ শেখাতে পারে না।...এই মানুষ ক্রমে আরো অন্তরঙ্গ, আরো নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রায়ই বলে, স্কুলের জন্য কারো প্রাণ নেই, দরদ নেই, কারো মনে স্কুলটা বড় করার স্বপ্ন নেই, এটা যেন একটা ডিঙি নৌকো, সকলকে এখান থেকে ছুটে গিয়ে বড় নৌকোয় পা ফেলার অপেক্ষায় আছে। আমি কিচ্ছু কেয়ার করি না, কেবল তুমি ধৈর্য ধরে আমার সঙ্গে থাকো, এটাকে নিজের প্রতিষ্ঠান ভাবো—এ অনেক, অনেক বড় হবে—হবেই।

অবন্তীর ভালো লাগত। বিশ্বাসও করত।

পাশ করে বেরুনোর একটা বছরের মধ্যে বিশ্বাস আর ভালো লাগা দ্রুত তালেই বেড়েছে। সেটা পরস্পরের হাত ধরে চলার দিকে খুব স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়েছে। না, স্কুলই তখন এই লোকের ধ্যান-জ্ঞান-নেশা নয়। অবন্তী তার জীবনে এলে তবেই সব সফল।

অবন্তী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসেই এসেছিল। এম-এ পরীক্ষার পরে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছল। পরে জানাজানি। বিয়ের সময় অবন্তীর দিক থেকে একজনই মাত্র সাক্ষী। তার প্রিয় বান্ধবী জয়া ঘোষ, যে এখন জয়া মিত্তির। মস্ত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। স্কুলে পড়তে তার মা চোখ বুজেছিল। বি-এ পাশ করার পরেই এক ব্যারিস্টার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছল। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে তার বাবা মারা যেতে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে নিজের বাড়ির দখল নিয়েছে। তার স্বামীর বাস আর দপ্তর এ-বাড়িতেই।

অবন্তীর বিয়ের তিন দিনের মধুযামিনী যাপন জয়া মিত্তিরের বাড়িতেই হয়েছে। অবন্তীর বাড়িতে জেনেছে, ও তিন দিনের জন্য দীঘা বেড়াতে গেছে।

খুব সাদামাটা দু' ঘরের একটা বাড়ি ভাড়া পেতে সমর সিংহর দিন পনেরো সময় লেগেছে। চার ভাইয়ের যৌথ পরিবারে তার পক্ষেও অবন্তীকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। মালহোত্রা কতটা বাঙালিনী আর কতটা নয় সেটা তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অবন্তীর মনে এজন্য এতটুকু অভিযোগ ছিল না।

অবন্তীর বাবা জানার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিমূর্তি। তিনি তক্ষুনি ঘোষণা করেছেন মেয়ের সঙ্গে আর তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকল না। অবন্তী জানত এরকম হবে। কেবল একটু আশা ছিল সময়ে সব সয়ে যাবে। কিন্তু তার চিন্তায় একটু ভুল ছিল। অন্য দুই জামাই

ধনী। টাকার জাদু সম্পর্কে অবন্তীর খুব ধারণা ছিল না।

অবন্তীর এই বিয়ে আট মাসের মাথায় বরবাদ। সংসার করা যাকে বলে—এই আট মাসের মধ্যে তিন মাসও তা করেনি।...সমর সিংহ তার গান নিয়ে এত ব্যস্ত যে কিছুদিন না যেতে বেশি রাতের আগে ঘরে ফেরে না। আবার মাসে চার-পাঁচদিনও বাইরের ফাংশনে যায়। এই ব্যস্ততা বা বাইরে যাওয়াটা যে সত্যি নয়, অবন্তী তা-ও জেনেছে। কোনো কোনো রাতে মদ খেয়ে ফেরে। তখন কথা বলতে গেলে স্বামী মুখের ওপর বলে দেয়, তার জীবনটা যে এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবেনি।

অবন্তী ঠাণ্ডা মুখে একদিনই কেবল মুখের ওপর বলেছিল, তোমার মানসিক ব্যাধিটাই কাঁধে চেপে আছে বলে আমার বিশ্বাস, ভালো একজন ডাক্তার দেখাও না কেন?

মানুষটা ইংগীত না বোঝার মতো নয়। সবল রমণীর শয্যাসঙ্গী হবার মতো পুরুষ সে নয়। সে-দিনই যাকে বলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। সভ্যভব্য বিনয়ের মুখোস খুলে একটা হিংস্র জানোয়ার বেরিয়ে এসেছিল। হিংস্র কিন্তু পুরুষাকারশূন্য। অকথ্য নোংরা গালাগালই তার সেরা অস্ত্র।

দু'তরফের কোনো দিক থেকেই বাধা না থাকায় বিয়ে সহজেই ভেঙেছে। দু' মাসের বাড়ি ভাড়ার দায় পর্যন্ত অবন্তীর ঘাড়ে চাপিয়ে সমর সিংহ তার কোনো গৃহাশ্রয়ে নিখোঁজ হয়েছে। খুব অবাক হয়নি। কারক স্কুলে এর আগেই অবন্তী এই লোকের সম্পর্কে অনেক খবর পেয়েছে।

পেয়েছে গানের সিনিয়র শিক্ষয়িত্রী সুমিত্রা চক্রবর্তীর মুখ থেকে। অবন্তী স্কুলে যাওয়া একেবারে বন্ধ করতে মহিলা বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তাব সহানুভূতিটুকু অকৃত্রিমই মনে হয়েছে অবন্তীর। বলেছে, অবিশ্বাসের ভয়ে তারা তাকে সতর্ক করতে পারেনি। তাদেরও অভাবের সংসার, তাই ভয়।...অবন্তীর আগের নাচের শিক্ষয়িত্রী তপতী মজুমদারের চাকরি গেছে, কারণ সে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। বিয়ে না করলে অবন্তীকে পাওয়া সম্ভব নয় বুঝেই অতটা উদার হতে চেয়েছিল। এর আগে তিন-চারটি সুশ্রী মেয়ে নিজে থেকেই চাকরি ছেড়ে গেছে। এদের মধ্যে একজনের তরফ থেকে কড়া উকিলের নোটিস পর্যন্ত এসেছিল, শেষে কি করে মিটেছে সমর সিংহ-ই জানে।

বিয়ের সময়ে সমর সিংহ খুব আগ্রহ করে নতুন খাট, ড্রেসিং টেবিল আর একটা ছোট আলমারি কিনে দিয়েছিল। সেসব বিক্রি করে অবন্তী দু' মাসের ভাড়া মেটালো। সমর সিংহর মৃত মায়ের একছড়া হার, দুটো বালা অবন্তীর ভাগে জুটেছিল। আঙটি, চারগাছা করে সরু সোনার চুড়ি আর দুটো দুল সমর সিংহ বিয়েতে উপহার দিয়েছিল।

সেসব একটা পুঁটলি করে নিয়ে সকালে অবন্তী স্কুলে এসে হাজির। তার এখানে আসাটা সকলের কাছেই অপ্রত্যাশিত, কিন্তু সমর সিংহর মুখ দেখে মনে হয়েছে, পালাবার গর্ত পেলে সে তাতে সেঁধিয়ে গিয়ে বাঁচত।

অবন্তী বসল না। পুঁটলিটা তার সামনে রেখে বলল, তোমার আর তোমার মায়ের গয়না।...আসবাবপত্র সব বেচে দু' মাসের বাড়ি ভাড়া দিয়েছি। আরো শ' আড়াই টাকা আমার কাছে আছে..স্কুল থেকে আমার আট মাসের মাইনে পাওনা আছে, তার বদলে এ-ক'টা টাকা নিজের কাছে রাখলাম।...আর একটা কথা তোমাকে বলি, ভবিষ্যতে আরো

ডুবতে না চাইলে ভালো একজন ডাক্তার দেখিও, আমার ধারণা তোমার কিছুই হয়নি।

চলে এলো। সঙ্গে একটা সুটকেস।...এতবড় কলকাতার শহরে তার যাবার মতো জায়গা নেই। বাপের বাড়ি না, দিদিদের বাড়িও না। তারা অনেক আগে থেকেই বিরূপ। আশ্রয় পাবার মতো জায়গা একটাই। বন্ধু জয়ার কাছে।

জয়া মিত্তির ওকে দেখে হাঁ। —সুটকেস হাতে তুই, কি ব্যাপার?

দিব্বি রসিকতার সুরেই অবন্তী বলতে পেরেছে, আনন্দ করে দুটো দিন তোর কাছে থাকতে এলাম, কিন্তু তুই যেমন হাঁ হয়ে গেলি, ফিরে যাব কিনা ভাবছি।

জয়া ওকে জড়িয়ে ধরল।—বলিস কি রে, এত ভাগ্য আমার! আয়, আয়—এলি তো যুগলে এলি না কেন?

অবন্তী তার সঙ্গ নিয়ে আলতো করে বলল, যুগলের গাঁট ছিঁড়ে গেছে।

জয়া ঘুরে দাঁড়ালো। দু'চোখ বিস্ফারিত। না, অবন্তীর মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। —তার মানে?

—এখানে দাঁড়িয়েই মানেটা হবে?

—আয়, আয়। ব্যস্ত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে গেল।

নিজের শোবার ঘরে এসেই এক হাতে জড়িয়ে ধরে বসল।—কি হয়েছে বল, তোর মুখ দেখে তো ভয়ংকর কিছু হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

—না, ভয়ংকর আর কি, ডিভোর্স তো আকছারই হচ্ছে, এ একটু বেশি তাড়াতাড়ি হল।

—ডিভোর্স! বলিস কি? হয়েই গেছে?

—গেছে।

—কেন, কেন? এরই মধ্যে এমন কি হল যে, একেবারে ডিভোর্স?

—আগে আমাকে একটু চা আর কিছু খেতে দে, কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া হয়নি।

জয়া অপ্রতিভের মতো উঠে দাঁড়ালো।—আমি একটা যাচ্ছেতাই—

ছুটে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে চাকরের হাতে একরাশ জলখাবার দিয়ে নিজেও সঙ্গে এলো। —খা, চা আসছে।...এবারে খেতে খেতে বল, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, তুই ছাড়লি, না ও ছাড়ল?

—ও-ই ছাড়ল বলতে পারিস, আমি কেবল ব্যাপারটা সহজ করে দিলাম।

—কেন, কেন ছাড়ল?

অবন্তী আঙুল তুলে ওদের পালঙ্কের শয্যাটা দেখিযে দিল।—ওটার ভয়ে।

জয়া বিমূঢ় খানিক। চট করে মাথাতেই ঢুকল না। বোঝার পর বলে উঠল, বলিস কি। ইয়ে নাকি লোকটা?

অবন্তীর ঠাণ্ডা মুখ, ঠাণ্ডা জবাব।—মনে হয় না, তবে স্বভাবের দোষে আর ভয়ে অনেকটা তাই।

—তাহলে ডাক্তার দেখালি না কেন, তড়িঘড়ি সব চুকিয়ে দিলি কেন?

—সে-ই চুকিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল! ...স্বভাবের দোষটা তো নতুন নয়, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখবে কি করে। যাক, তুই বাপু আর যা-ই করিস, সহানুভূতি দেখাস না।

জয়া মিত্তির অনেকক্ষণ তাকে চেয়ে দেখল। এখনো মনে হল এই মেয়ে ওর থেকে ঢের বেশি শক্ত। জিগ্যেস করল, এখন তাহলে কি করবি তুই, বাপের বাড়িও তো যাবি না?

—তুই তাহলে ঘাবড়ে গেছিস, ভেবেছিলাম তোর কাছে দিনকয়েক থাকা যাবে, তারপর ভাবব...।

জয়া দু' হাতে আবার জাপটে ধরল তাকে। —তোর কথা ভেবে আমারই মাথা খারাপ হবার দাখিল, যতদিন খুশি নিজের ঘরবাড়ি ভেবে এখানে থাকবি—

অবন্তী হাসল। —তা কি ভাবা যায় রে..তার থেকে তুই আমার একটা চাকরির যোগাড় দ্যাখ, তোর তো অনেক কানেকশান—একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। তারপর আর থাকার ভাবনা কি, মেয়েদের কত হস্টেল আছে।

জয়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল।—আমার বুদ্ধি দ্যাখ, তোর মতো মেয়ের আবার চাকরির ভাবনা! একটা মস্ত মেয়ে স্কুলের নাম করে বলল, আমি তো সেখানকার ম্যানেজিং কমিটির একজন জাঁদরেল মেম্বর!

হ্যাঁ, চাকরি অবন্তীর খুব সহজেই হয়ে গেল। আপাতত ছোট মেয়েদের নাচ আর গান শেখানো কাজ। জয়া আশ্বাস দিল, তোর যা গুণ, পরে তুই সর্বেসর্বা হয়ে যাবি দেখিস।

এখনই মাইনে মাসে পাঁচশ'। এর মধ্যে জয়াই আবার তাকে দুটো ভালো গানের টিউশানি জুটিয়ে দিল। দুই বড় লোকের দুই মেয়েকে সপ্তাহে দু'দিন করে সন্ধ্যায় গান শেখানো। দেড়-দেড় তিনশ' টাকা মাইনে। মাসে আটশ' টাকা অবন্তীর কাছে অভাবিত অঙ্কের টাকা বইকি।

মাসখানেক বাদে অবন্তীই বলল, তুই আমার পূর্বজন্মের বোনের থেকেও বোধহয় বেশি ছিলি ভাই, কিন্তু আর ভালো দেখায় না, আমি মোটামুটি একটা ভালো হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি।

জয়া চেয়ে রইলো খানিক, তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, তুই আমার পূর্বজন্মের সতীন ছিলি! জড়িয়ে ধরল।—একটা কথা বলব, রাগ করবি না?

—রাগ করার মতো কথা তুই তো কখনো বলিসনি...।

—হস্টেলে যাবি যা, আর বাধা দেব না, তোর মধ্যে কেমন ধার-ধার অথচ গম্ভীর-গম্ভীর ব্যাপার আছে যা পুরুষ মানুষের চোখ টানে—আমার ব্যারিস্টার সাহেবও দেখি দিনে তিনবার করে তোর কথা না তুলে পারে না, সমর সিংহর মধ্যে না আছে সমর না সিংহ—তাই ছাড়া পেয়ে গেলি—কে কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক নেই বাপু, সাবধানে থাকিস।

অবন্তী মালহোত্রা, এখন ফিরে আবার সে মালহোত্রা, হাসল খুব, বলল, তোর বরকে নিয়ে অন্তত তুই খুব নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস।

ছয়

একটা বছর মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটে গেল। অবন্তী মালহোত্রার বয়েস এখন চব্বিশ। স্কুলের আর টিউশানির বাইরে একমাত্র মায়ের সঙ্গে যা একটু যোগাযোগ আছে। কিন্তু

সে-ও বাবার অগোচরে। বাবা এখনো ছোট মেয়ের মুখ দেখতে রাজি নন। অবন্তী শুনেছে, বাবার গত এক বছর এক্সটেনশনে চলছিল, এবারে রিটায়ারমেন্ট। ব্যারাকপুরের দিকে ছোট একটা জমি কেনা হয়েছে, দুই জামাইয়ের তত্ত্বাবধানে সেখানে বাড়ি উঠেছে। রিটায়ারমেন্টের পরেই মা-কে নিয়ে বাবা সেখানে থাকবেন। তারপরে মায়ের সঙ্গেও হয়তো আর যোগাযোগ থাকবে না। দিদিদের সঙ্গে অবন্তীর একেবারে যোগাযোগ নেই। বাবার থেকেও বোনেরা ওর ওপর আরো বেশি বিরূপ। অবন্তীর মায়ের কাছেও যেতে ইচ্ছে করে না খুব। ওকে দেখলেই মা বড় কাঁদে, বলে, কি হবে রে তোর! তবু যেতে হয়। না গেলে মা আরো বেশি উতলা হয়ে স্কুলে ফোন করে।

স্কুলে অবন্তীর নির্বিঘ্নেই দিন কাটে। অন্য শিক্ষয়িত্রীরা ওকে একটু অহংকারী ভাবে। তাদের ধারণা, গভর্নিং কমিটির মান্যগণ্য মেম্বার জয়া মিত্রর ক্যানডিডেট বলেই সকলের সঙ্গে মন খুলে মেশে না। অবন্তীর নির্ভেজাল কালো গায়ের রং নিয়েও তারা আড়ালে কথা বলে, এত কালোর ওপর এমন মুখশ্রী হয় কি করে সে-ও যেন একটু বিস্ময়ের ব্যাপার।...টিউশনির দুই ছাত্রীর বাড়িতে অবন্তীর নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে চলার দায় বাড়ছে। এক ছাত্রীর মামা আর এক ছাত্রীর কাকার আগ্রহ একটু একটু করে বাড়ছে। মামাটি যখন তখন এসে আগে দুই একটি গান শোনানোর বায়না ধরে। অবন্তী ইদানীং কোথাও নাচের ফাংশান করে না, কেবল স্কুলে মেয়েদের নাচ শেখায়। দ্বিতীয় ছাত্রীর কাকার বিশেষ ইচ্ছে ভাইঝি বাড়িতে গানের সঙ্গে নাচও আরো ভালো করে শিখুক। অবন্তীর নাচের খবর ভদ্রলোক ভাইঝিটির কাছেই শুনে থাকবে। এই কাকাটি বিবাহিত আর দুই বাচ্চার বাপ।

সেদিন সন্ধ্যার পর হস্টেলে ফিরতে ফিরতে অবন্তী ভাবছিল কাকার ভাইঝি-অলা বাড়ির টিউশনিটা ছেড়ে দেবে কিনা। কারণ কাকাটি সেদিন ভাইঝিকে নাচ শেখানোর জন্য একটু বেশিই পীড়াপীড়ি করেছে। আরো একশ' টাকা বেশি দেবার লোভও দেখিয়েছে।

হস্টেলে ঢুকেই দারোয়ানের মুখে শুনল, ভিজিটিং রুমে এক সাহেব অপেক্ষা করছেন।

অবন্তী অবাক। কে হতে পারে। জয়ার বর নয়তো? এতদিনের মধ্যে দুই-একবার জয়ার সঙ্গে সে-ও এসেছে। অবন্তীর যা বরাত, জয়া শত্রু হলে তো ভরাডুবি।

...না, অন্য কেউ। জানলার দিকে মুখ করে সিগারেট টানছে। মুখের যেটুকু দেখা গেল, তাতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িই শুধু চোখে পড়ল অবন্তীর।

লোকটি ঘুরে দাঁড়াতেই অবন্তী হাঁ।...খুব চেনাই তো কিন্তু...অমন সুন্দর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির জন্যই ধোঁকা লাগছে একটু।

—বরুণ! কি কাণ্ড...তুমি!

আধ-খাওয়া সিগারেটের টুকরোটা বরুণ মেহরা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল। মেয়ে হস্টেলের ভিজিটিং রুমের টেবিলে অ্যাশপট নেই। এক হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। হাসছে। আর নির্নিমেষে দেখছে। হ্যাঁ, সেই বরুণই বটে। বলল, এত দূরে সরেছি যে চট করে চিনতেও পারলে না?

রং কালো না হলে অবন্তীর মুখে রক্তকণার ওঠা-নামা চোখে পড়ত বোধহয়। আত্মস্থ

হতে আরো একটু সময় লাগল। বলল, বোসো, চিনতে পারা একটু কঠিন কিনা সেটা সাত বছর বাদে এসে হঠাৎ বুঝবে কি করে?

বরুণ মেহ্‌রা সুচারু ব্যস্ততায় বসার জন্য আগে অবন্তীর চেয়ারটা সামনে টেনে আনল। এটা বোধহয় বাইরের ভব্যতা। তারপর নিজের চেয়ার কাছে টেনে বসে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করল, কঠিন কেন, খুব বদলেছি?

—এখন খুব লাগছে না, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দেখে একটু ধাঁধাঁয় পড়েছিলাম। তুমি কবে এলে?

—মাত্র আড়াই দিন। এর মধ্যে চল্লিশটা ঘণ্টা তোমার খোঁজে কেটেছে বলতে পারো।

—বড় ভাগ্য। আমার হদিশ কোথায় পেলে—বাড়িতে?

—বাড়ির কেউ তোমার হদিশ রাখেই না। মা বলল, তুমি একটি বাঙালীকে বিয়ে করেছ, কোথায় আছ জানে না। তোমার বাবাকে জিগ্যেস করতে যে জবাব পেলাম আমার চোখই ছানাবড়া—বললেন, এ-নামে কাউকে চেনেন না, কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা সে-খবরও রাখেন না। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইতে বলে দিলেন শরীর খারাপ, অর্থাৎ ঘুরিয়ে আমাকে বিদায় হতে বললেন। আজ সকালে হঠাৎ জয়া ঘোষের কথা মনে পড়ে গেল। তার বাড়ি এসে শুনলাম সে জয়া মিত্র হয়েছে। কার্ড পাঠাতেই ডেকে পাঠালো। তারপর তোমার সমাচার শুনলাম আর ঠিকানা পেলাম।

অবন্তী মুখের দিকে চেয়ে আছে, হাসছেও একটু একটু।—সমাচার শুনলে?

—শুনলাম। শুনে আনন্দে মনে মনে নাচলাম।

—নাচলে! ও-দেশ থেকে নাচও রপ্ত করেছ বুঝি?

হেসে উঠল, ওটা তো নাচেরই দেশ, তবে আমার নাচটা অন্য রকম, বুকের তলাব নাচ।

অবন্তী দেখছে। আগের থেকেও সুন্দরই হয়েছে বটে। আর আগের থেকেও বাকপটু হয়েছে হয়তো। বুকের তলার নাচ শুনেও নাড়া-চাড়া খেল না। তরল সুরেই জিগ্যেস করল, অমন নাচ কোথায় রপ্ত করলে, ছিলে কোথায়?

—ফ্রান্সে। ছিলাম আর আছিও। তবে বুকের তলার নাচটা এ-দেশ থেকেই রপ্ত করে গেছলাম।

কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু অবন্তী কি আর কথায় ভুলবে? ওই সপ্রতিভ সুন্দর মুখ দেখে ভুলবে? জিগ্যেস করল, এখানে মায়ের কাছে আছ?

—ছিলাম। কাল সকাল থেকে গ্র্যাণ্ডে একটা সুইট ভাড়া করেছি, ছেলেমেয়ে নিয়ে দুই দিদিই এখন এখানে—আমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল, আর বাবা-মা টাকা পেয়ে এত খুশি যে হোটেলে থাকার কথা বলতেই ব্যস্ত হয়ে সায় দিল, বলল, যেখানে তুই ভালো থাকবি আরামে থাকবি সেখানেই থাক্ বাবা—আমরা চোখের দেখা দেখতে পেলেই হল।

অবন্তী জিগ্যেস করল, এখানে আর তাহলে বেশি দিন থাকছ না?

বরুণ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল, কয়েক পলক অবন্তীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিল, তিন মাসের ভিসা।...একটি কার্যোদ্ধারের আশায় এসেছি, সেটা হলেই চলে যাব।

—এমন কি কার্যোদ্ধার?...বলতে বাধা আছে?

—বাধা! তোমাকে বলতে বাধা? যাক, আমার সঙ্গে তোমার এখন বেরুতে বাধা আছে?

অবন্তী অপলক চেয়ে রইল একটু। জিগ্যেস করল না কোথায়। নরম অথচ স্পষ্ট করেই জবাব দিল, আছে।

আহত মুখ। —কি বাধা?

—সমস্ত দিন পরিশ্রম গেছে, খুব ক্লান্ত।

বরুণ মেহ্‌রা অবাক যেন।—সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তি মুছে দেবার জন্যই তো সামনে রাত!

মৃদু হেসে অবন্তী বলল, এটা ইণ্ডিয়া, ফ্রান্স নয়।

বরুণ থমকালো একটু। পলকে সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। হেসে সায় দিল, তা বটে...শুনলাম তুমি স্কুলে মেয়েদের নাচ গান শেখাও?

—ঠিকই শুনেছ, এ ছাড়া দু'দুটো টিউশনি করি।

—নাচ গানের?

—শুধু গানের।

—আঃ, আজ মনে হচ্ছে কতকাল তোমার গান শুনি না...নাচও সেই ছেলেবেলায় ফাংশনে দেখেছিলাম। আবার চোখ বুলিয়ে নিল, সমজদারের মতো বলল, নাচ রেখেছ বলেই তোমার শরীর এখনো দারুণ ফিট।

অবন্তীর অস্বস্তি হচ্ছে। কারণ তাব মনে হচ্ছে মস্ত টাকার মানুষ হয়ে এই ছেলে সাত বছর বাদে দেশে ফিরে তার সঙ্গে সরলতার অভিনয় করছে!

—কি দেখছ? বরুণের অন্তরঙ্গ প্রশ্ন।

—তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করছি।

হেসে উঠল, বোঝানোর সুযোগ পাচ্ছি কোথায়!...কাল সকাল থেকে তোমাকে ফ্রি পাব নিশ্চয়?

—কি করে পাবে, স্কুল আছে..!

—ও...! থমকালো একটু।—আর বিকেল সন্ধ্যায় টিউশনি আছে?

অবন্তী থামল।—সপ্তাহে দু' দিন দু' দিন করে টিউশনি, কাল টিউশনি নেই।

উঠে দাঁড়ালো।—ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমার কিছু কৈফিয়ত দাখিল করার আছে, সাতটা বছর তোমার কাছে ভয়ানক লম্বা সময়, এত লম্বা যে আমার খেয়ালশূন্য লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবখানাও তুমি ভুলতে বসেছ—ওয়েল আই অ্যাম এ বর্ন ফাইটার অ্যাণ্ড রেডি টু ফেস্‌ এনি স্টর্ম্‌—কাল কখন আসব, বিকেল পাঁচটা?

দ্বিধার সুরে অবন্তী জিগ্যেস করল, কোথায় যেতে হবে?

হাসছে। আগের মতোই দুষ্টু মিষ্টি হাসি। জবাব দিল, দেখার পর থেকে তুমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করালে বলতাম, টু মেক দ্য হেল আ হেভেন...কৈফিয়ত দাখিল করে খালাস না পাওয়া পর্যন্ত সবিনয়ে বলছি, আমার হোটেলের সুইটে, নির্ভয়ে এসো, আমি এখনো ভদ্রলোকই আছি—দয়া করে এখানে তোমার ডিনার অফ করে রেডি থেকো।

ঘুম ভেঙে অবন্তী ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল। অন্ধকার ফুঁড়ে শয্যার এদিক

ওদিক তাকালো। না, শূন্য শয্যা। কিন্তু তাজা স্পর্শটুকু যেন আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। সেই সাত বছর আগের দুরন্ত বেপরোয়া স্পর্শ।...বরুণ মেহ্‌রার বাইরে যাবার দু'দিন আগের দুপুরে প্রথম দুর্বার আবেগের স্পর্শ। সাত-সাতটা বছর নয়, যেন এই মুহূর্তের ঘটনা।

...আশ্চর্য, এর থেকে অনেক পরিণত বয়সে অবন্তীর জীবনে আর যৌবনে পুরুষ এসেছে। অক্ষমতার ক্ষোভে সে এই নারীদেহে যন্ত্রণার স্পর্শ কায়েম করতে চেয়েছে। কিন্তু সেই স্পর্শের স্মৃতি মনের কোনো কোণে নেই। অথচ সাত বছর আগের সেই দুপুরটা হঠাৎ রাতের স্বপ্নে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

অবন্তী অন্ধকারেই হাত-ঘড়ি দেখল। রাতে ঘড়ি হাতে শোয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। রাত এখন সাড়ে তিনটে। আর ঘুম এলো না। আসবেও না।

ঘুরে ফিরে সমস্ত দিনই মনে হল তার সামনে আবার একটা পরীক্ষা উপস্থিত। অবন্তী ভাবতে চেষ্টা করছে এই লোককে নিয়ে তার আর কোনো কৌতূহল নেই। বেশ শক্ত মন নিয়েই এর মুখোমুখি হওয়া দরকার। অথচ আজ মনে নিশ্চিন্ত ভাবটুকুই আনতে পারছে না।

পাঁচটা বাজার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। অবন্তী দোতলার জানলায় দাঁড়িয়েছিল। বরুণ মেহরা নেমে ওপরের দিকে তাকাতে চোখাচোখি। অবন্তী একটা হাত তুলল, অর্থাৎ আসছি।

শীতের ছোট বেলা। এরই মধ্যে বাইরের আলোয় বেশ টান ধরেছে। বরুণ মেহরা সপ্রতিভ হাসি মুখে বাহু ধরে অবন্তীকে আগে তুলল তারপর নিজে উঠে বসল। বলল, কতকাল দেশ ছাড়া, এক্ষুনি হোটেলে ফিরে কি হবে—একটু ঘুরে ফিরে যাই?

—বেশ তো। অবন্তী খুব সহজেই থাকবে, তাই নিঃসংকোচ।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে হুকুম করল, প্রথমে লেকে চক্কর দিয়ে তারপর গঙ্গার ধারের দিকে যেতে। অবন্তীর ভিতরে ভিতরে আবাব নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা। বরুণ তার দিকে ঘুরে বসল।—তুমি কিন্তু আগের তুলনায় একটু গম্ভীর হয়ে গেছ।

—আগে বাচাল ছিলাম?

—বাঃ, গম্ভীরের উল্টো কি বাচাল হল? আগে তুমি আরো হাসি খুশি ছিলে।

—আগের বয়েসটা অনেক দিন পার হয়ে এসেছি।

হেসে উঠল, আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট, আমার ঊনত্রিশ, তোমার তাহলে কত?

—মনের বয়েস ঊনপঞ্চাশ হতে পারে।

আবার হাসি।—আর শরীরের উনিশ?

—এটা কি ফ্ল্যাটারি ফ্রেঞ্চ স্টাইল?

বরুণ হেসে বলল, ফ্রেঞ্চ স্টাইলে ঘেন্না ধরে গেছে, অবন্তী স্টাইল ও-দেশে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। এ ক'বছরে আগের থেকে কিন্তু তোমাকে আমি অনেক বেশি সুন্দর দেখছি...যাকে বলে ম্যাচিওরড বিউটি।

—এ ক'বছরে তোমার চোখও কিছু খারাপ হয়ে থাকতে পারে।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাফেরার পর বরুণ মেহ্‌রা তাকে নিয়ে চৌরঙ্গীর নামী হোটেলে

এলো। রিসেপশান থেকে চাবি নিয়ে এবারে ওর বাহু ধরেই লিফট্-এ উঠল। তারপরেও হাত নামল না। এক হাতে চাবি লাগিয়ে ভিতরে ঢুকল।

...না এ-রকম সুইটে অবন্তী কখনো আসে নি, নরম পুরু কার্পেটে পা ডুবে যাচ্ছে। পিছনের দরজা আপনি একটু শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল, এবারে কাঁধ ছেড়ে বরুণ সুইচ টিপে শেড দেওয়া দুটো নিয়ন আলো জ্বেলে দিল। মস্ত-মস্ত জানালা দুটোর পর্দা টেনে সরিয়ে দিল। তারপর সোজা কাছে এসে অবন্তীর দুই বাহু ধরে তাকে তক-তকে নরম শয্যায় বসিয়ে নিজে তার পায়ের কাছে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দু' হাতে কোমর বেষ্টন করে সোজা মুখের দিকে তাকালো। —আমাকে ক্ষমা না করে তুমি পারবে?

দরকারের মুহূর্তে অবন্তী কি মনের জোর খুইয়ে বসছে? মোটেই না। ঠাণ্ডা অথচ সহজ গলায় জিগ্যেস করল, কিসের ক্ষমা...কেনই বা ক্ষমা?

—দ্যাখো, সাত বছর খুব লম্বা সময় বুঝতে পারছি, কিন্তু সাতটা বছর আমার কাছে সাত মাসের মতো কেটে গেছে। চিঠি লেখাটেখা আমার অত ধাতে নেই, এক-এক রাতে ভাবতাম চিঠি লিখব, সকালে উঠে ভুলে যেতাম। ...অবন্তী, প্লীজ্ বিশ্বাস করো ও-দেশে সাতটা বছর অপেক্ষা করা কিছুই নয়, আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম কোনো এক ফাঁকে এসে তোমাকে নিয়ে যাব...এর মধ্যে মায়ের একখানা চিঠিতে জানলাম, তোমার মা-বাবা তোমার বিয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমার খুব রাগ হয়ে গেছল। মা-কে টাকা পাঠিয়ে রাগ আব ঠাট্টা মনে চেপে লিখেছিলাম, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা, আর লিখেছিলাম তোমাকে বলতে যে আমি কাউকেই ভুলিনি। ভেবেছিলাম এটুকু থেকেই তুমি যা বোঝার বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে। কিন্তু এসে বুঝছি, তোমাকে চিঠি না লেখাটাই আমার মস্ত ভুল হয়েছে।

অবন্তী চেয়ে আছে। চোখে পলক পড়ছে না। এমন কোনো যন্ত্র তো নেই যা দিয়ে মানুষের ভিতর দেখা যায়।

একটু আবেগের সুরেই বরুণ মেহরা বলে গেল, এবারে আসব ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে সে কি তাড়া যদি বুঝতে! এখানে এসে তুমি নেই শুনে হতভম্ব। তারপর জয়ার মুখে সব খবর শুনে আরো হাঁ। তোমার ডিভোর্সও হয়ে গেছে শুনে তবু একটু নিশ্চিন্ত, তা না হলে তোমার ওই স্বামীকে খুন করে আমাকে হয়তো জেলে পচতে হত। কোথায় আমি তোমার ওপর রাগ করব, না এখনো তোমাব আমাব ওপর বাগ। ঠিক আছে, আমার দোষ হয়েছে—ক্ষমা কবে দাও, মাঝের সাতটা বছর ভুলে যাও!

অবন্তী কতটা ফাঁপরে পড়েছে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তেমনি ঠাণ্ডা অথচ সহজ গলায় বলল, প্রথম আর ওই একখানা চিঠিতে তুমি লিখেছিলে, আধ-ঘণ্টা আলাপের পরেই ও-দেশের মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া সহজ (চুমু খাওয়া সহজ এ-কথাটা মুখে এলো না), আর তুমি সাতটা বছর মরুভূমিতে কাটিয়ে এলে বলতে চাও?

—দূর দূর, ওটা প্রথম আবেগের কথা—ওরা খেলার পুতুল, আমোদ-আহ্লাদ সর্বস্ব, এ-দেশের মেয়ের পায়ের নখের যোগ্যও কেউ নয়—বুঝলে?

বোঝার চেষ্টায় অবন্তীর দু' চোখ অপলক এখনো। স্পষ্ট অথচ মৃদু স্বরে বলল, যা বলছ তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কত কঠিন এটুকু তুমি বুঝতে পারছ?

বরুণ মেহ্‌রা বিমূঢ় মুখে চেয়ে রইলো খানিক। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, কি-চ্ছু বুঝতে চাই না—বিশ্বাস তোমাকে করতে হবে। পরের মুহূর্তে মনে পড়ল কিছু। চকিতে উঠে দেয়াল-ঘেঁষা ডেস্কের ওপর থেকে ছোট পাউচ-ব্যাগটা নিয়ে এলো। অসহিষ্ণু আর দ্রুত হাতে তার ভিতরে কি খুঁজল। পেল। ছোট্ট ফোটো একটা।

—দ্যাখো, এই মেয়েটিকে চিনতে পারো?

দেখে অবন্তী সত্যি হতবাক। তারই সতেরো বছর বয়সের বেণী দোলানো ফোটো। কিন্তু এ কি করে সম্ভব, ওর রঙিন ফোটো কে কবে তুলল!

বরুণ এতক্ষণে হাসছে।—তোমার ঘরের টেবিল থেকে ফোটোস্ট্যাণ্ডসুদ্ধ তোমার ফোটো নিপাত্তা হয়ে গেছল মনে আছে?...ওটা আমি নিয়েছিলাম। ফ্রান্সে গিয়ে ওটার থেকে কালারড্ নেগেটিভ করিয়েছি। তারপর কত বার যে ওই নেগেটিভ থেকে এ-রকম ফোটো করিয়েছি ঠিক নেই—কি করব, চুম্ খেতে খেতে এক একটা ফোটো নষ্ট হতে কতদিন আর লাগে?

অবন্তী নির্বাক চেয়ে আছে। সম্বিত ফিরল যখন নিজেকে উদ্ধারের আশা নেই বা সে রকম চেষ্টাও নেই। পুরুষের দুই বাহুবন্ধনে বন্দী, একই সঙ্গে তার আপন রমণী জয়ের দুর্বার আকৃতি।

অবন্তী এবারে অবন্তী মেহ্‌রা। আবার জীবন।

মানুষটা তৎপর তাতে কোনো সন্দেহ নেই। টাকার জোরে হোক বা যে করেই হোক, রেজিস্ট্রি বিয়ের পর দেড় মাসের মধ্যে অবন্তীরও পাসপোর্ট ভিসা বার করে তাকে নিয়ে আকাশে উড়ল। দুটি প্রাণ বাধাবন্ধশূন্য মুক্ত বিহঙ্গ।

অবন্তী মালহোত্রা যখন আট মাসের জন্য শ্রীমতী সিংহ হয়েছিল, তার জীবনে বা যৌবনে সিংহ ছেড়ে নিরীহ গোছের কোনো পুরুষের আবির্ভাবও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। এবারের মিসেস মেহ্‌রা হবার পর একটি প্রতাপী পুরুষের আবির্ভাব অন্তত ঘটেছে। অবন্তীর যেটুকু বুদ্ধি বা বিবেচনা, তা দিয়ে একবারও মনে হয়নি এই পুরুষের জীবনে সে-ই প্রথম রমণী। বরং তার নিভৃতের রীতিতে ভোগের সুর বেশ উঁচু তারে বাঁধা মনে হয়। কিন্তু অবন্তী কিছুই গায়ে মাখেনি, বা তা নিয়ে নিজের স্নায়ু বিড়ম্বিত করেনি।

ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল, কালো বউ নিয়ে তো যাচ্ছ খুব, এরপর ও দেশের লোক নাক সিঁটকোলে তোমারই না মেজাজ বিগড়য়।

জবাবে যা বলেছিল কান পেতে শোনার মতোই। শুনে বরুণ প্রথমে দস্তুর মতো অবাক। তারপর হেসে হেসে ওই শোনার মতো কথাগুলো।—শাদা চামড়ার নেকড়েগুলোর থেকে তোমাকে কি করে আগলে রাখব আমার তো সেই চিন্তা। ফ্রান্সের মানুষগুলো দুই ব্যাপারে নিজেদের পৃথিবীর সেরা সমজদার ভাবে। এক, সাহিত্য শিল্প-কলা আর রসবোধের, দুই মেয়েদের রূপের। কিন্তু সাদা চামড়ার রূপসী মেয়ে দেখে দেখে তাদের চোখ পচে গেছে, কালো মেয়ে সুঠাম সুন্দরী হলে তারা পাগল—সাদা চামড়ার দেশে কালো সুন্দরী মেয়ের কদর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই।

মিথ্যে যে বলেনি এটা অবন্তী লণ্ডনে এসেই বিলক্ষণ টের পেয়েছে। কয়েকটা

জায়গায় বেড়িয়ে তারপর তাঁদের ফ্রান্স মানে প্যারিসে আসার কথা। লণ্ডনে বরুণের এক বিশেষ বন্ধু থাকে, সে ভারতীয়, নাম জগদীশ কাপুর—কিন্তু ফ্রান্সে বা লণ্ডনে সে জর্জ কাপুর নামে পরিচিত। তার সহকর্মীর নাম পিয়ের ট্রুফোঁ, সে ফরাসী। সে-ও বরুণের বন্ধু। শহর থেকে অনেক দূরে মস্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে জর্জ আর পিয়ের এক সঙ্গেই থাকে। সস্ত্রীক বরুণ মেহ্‌রা কয়েক দিনের জন্য লণ্ডনে তাদের অতিথি। গাড়ি নিয়ে তারা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দেবার পরেই অবন্তীর একটা হাত পিয়ের ট্রুফোঁর দখলে। বছর বত্রিশ তেত্রিশ হবে বয়েস। অবন্তীর হাতে বার তিনেক চুমো খেলো। আর ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলতে লাগল, লাঁভলি...এঁক্সখুঁইজিট...

ধমকের সুরে বরুণ বলে উঠল, চোখ দিয়ে আর কত চাটবে, ছাড়ো এখন, বেচারী ঘাবড়ে যাচ্ছে—

হাত ছেড়ে পিয়ের শশব্যস্ত।—খুব দুঃখিত, ভাঙা ইংরেজিতে তার বক্তব্য, যাবার সময় মেহ্‌রা বলে গেছল সে তার ব্ল্যাক-জেম আনতে যাচ্ছে, তা বলে তুমি এত সুন্দর ভাবতে পারি নি।

গাড়িতে উঠে সে আবার জর্জকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ইণ্ডিয়ার মেয়েরা বেশির ভাগ এ-রকম সুন্দরী?

জর্জই গাড়ি চালাচ্ছে। হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, তুমি এক্ষুনি ইণ্ডিয়ায় ছোটো।

নিঃসংকোচে অবন্তীর বাহু ধরে জর্জ তাকে সামনে অর্থাৎ নিজের পাশে বসিয়েছে। পিছনে পিয়ের আর বরুণ। সকলেরই ফুর্তির মেজাজ। ঘাড় ফিরিয়ে অবন্তীকে একবার দেখে নিয়ে সাবধান করার সুরে বলল, পিয়েরকে দেখেই বুঝে নাও ম্যাডাম মেহ্‌রা তোমাকে কোন দেশে নিয়ে চলেছে, ও তো বেশির ভাগ সময় অফিসের কাজে আর বিজনেসে ব্যস্ত থাকবে—তোমাকে কে রক্ষা করবে ঈশ্বর জানে—

জর্জের কথা-বার্তা ইংরেজিতে। বাংলা জানে না এটুকু বোঝা যায়। কি বলল পিয়েরের বুঝতে অসুবিধে হল না। বেশ মোলায়েম বিনয়ে পিছন থেকে ফোড়ন কাটল, মাদামকে রক্ষা করার জন্য মেহ্‌রা তা বলে তোমার কাছেও রেখে যাবে না।

...চার দিন ছিল লণ্ডনে। অবন্তীকে দেখানো শোনানোর বেশির ভাগ সঙ্গী পিয়ের ট্রুফো। চোখের তৃষ্ণা যতই মেটাক, আচরণে ভদ্র। কিন্তু জর্জটাকে একটা পাজির পা-ঝাড়া বলতে হবে। মুখ সর্বস্বই নয় কেবল, অন্য দু'জনের সামনেই দিব্বি জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে। কিন্তু লণ্ডন ছাড়ার আগের রাতে যাকে বলে শয়তানিই করল। ওদের খাতিরেই বাড়িতে পার্টি। বাইরের আমন্ত্রিত দেখা গেল কেবল জনাকতক পুরুষ—চারজন ইংরেজ, দু'জন চাইনিজ আর একজন ফরাসী। অনেক রাত পর্যন্ত দেদার মদ গিলল সকলে। অবন্তীর খুব ভালো লাগছিল না, মাঝে মাঝে আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, আবার খানিক বাদে ফেরে। এতই মশগুল সব, কেউ খুব লক্ষ্যও করছে না। কিন্তু অবন্তীর এ ধারণা ভুল। জর্জ খুব ভালো করেই লক্ষ্য করছিল। একবার বেরিয়ে এসে পেছনে পায়ের শব্দ শুনে দেখে জর্জ। তারপরেই অবন্তী দিশাহারা। কাছে এলো। দু'হাতে বুকে জাপটে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। তারপর পাশের একটা ঘরে নিয়ে যাবার জন্য দস্তুর মতো টানাটানি।

কোন রকমে ছাড়িয়ে ফিরে এলো। ওরা বিদায় হবার আগে আর ঘর ছেড়ে নড়লই না। ওই রাতে বরুণকেই বা কি বলবে, আকণ্ঠ মদ গিলে প্রায় বেহুঁশ। পরদিন সকলের

সামনেই জর্জ ঘটা করে অবন্তীর কাছে মাপ চাইলো, মাত্রা একটু বেশি চড়ে গেছল ম্যাডাম, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।

বরুণ কি ব্যাপার জানতে চাইতে হ্যা-হ্যা করে হেসে সে-ই জানান দিল, রঙের ঘোরে ভেতরটা আনচান করে উঠেছিল বন্ধু, তোমার বউকে ধরে একটু টানা হেঁচড়া করেছিলাম, সী স্ল্যাপড রাইট অন মাই চিক—

বরুণ একটু যেন আঁতকে উঠে অবন্তীর দিকে তাকালো। কিন্তু কি জন্য অতটা সচকিত অবন্তী তখন বোঝেনি। টেনে-টেনে পিয়ের মন্তব্য করল, রাইটলি সারভড্—।

একটু বাদে ওকে নিরিবিলিতে পেয়েই বরুণ জিগ্যেস করল, সত্যি তুমি ওকে চড় মেরেছ্ নাকি?

অবন্তী উষ্ণ জবাব দিল, মারি নি, মারা উচিত ছিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে বরুণ হাসতে লাগল, বলল, আরে দূর! ও-সব ছোট-খাটো ব্যাপারে এখানে কেউ কিছু মনে করে না।

—কোনটা ছোটখাটো ব্যাপার? বুকে জাপটে ধবে চুমু খাওয়াটা, না পাশের ঘরে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করাটা?

অবন্তী খুশি হতে পারে নি। বরুণের এত মদ গেলাও পছন্দ হয়নি।

সুইজারল্যাণ্ড ওয়েস্ট জার্মানি হয়ে তারা প্যারিসে এসেছে। এ-দিকের সর্বত্রই অবন্তী রূপ বিচারের তফাৎটা অনুভব করেছে। পুরুষেরা ওকে দেখে চোখের তৃষ্ণা মেটাতে চেষ্টা করেছে। অনেকে যেচে আলাপ করতে চেয়েছে। বরুণ মেহরা হেসে হেসে মন্তব্য করেছে, এখানে রূপের কদরই আসল, রঙের নয়—কালো রূপসী দেখলে এখানকার মানুষ পাগল কিনা বুঝছ?

খুশি হয়ে অবন্তীও ভ্রূকুটি করেছে, খুব বেশি বোঝার ভয় নেই তো?

প্যারিসে এসে অবন্তী কিছুটা ধাঁধার মধ্যে পড়ল, কিছুটা বা ধোঁকা খেল। অভিজাত এলাকায় মস্ত মস্ত বাড়ি, হোটেল রেস্তরাঁয় রাতে আলোর বন্যা রঙের বন্যা। যত বড় বাড়ি বা হোটেলেই হোক, ছাদগুলো সব দু' দিকে তাঁবুর মতো নেমে এসেছে। শুধু ফরাসী দেশে নয়, অন্যত্রও এরকম দেখেছে। শুনেছে বরফ পড়ে বলেই এ-ধরনের ছাদ। দিনের বেলায়ও মানুষগুলো বিলাসী আয়েসী। দু'দিকে রাস্তা, মাঝে সারি সারি খোলা রেস্তঁরা। লোকে আড্ডা দিচ্ছে, খাচ্ছে।

অবন্তী ধোঁকায় পড়েছে কারণ বরুণেব টাকার জোর আছে দেখতেই পাচ্ছে...অথচ এভাবে থাকে কেন! ব্যাগে সর্বদা গোছা-গোছা নোট, ওকে নিয়ে নামী-দামী রেস্তঁরায় খায়, অপেরায় যায়। কিন্তু থাকে খুব একটা মধ্যবিত্ত এলাকার দু'খানা খুপরি ঘরের অ্যাপার্টমেন্টে। এক-একটা গাড়ি দেখলে চোখ ঠিকরে যায়, কিন্তু এই লোকের নিজের গাড়িটা পুরানো ঝরঝরে। ড্রাইভার অবশ্য এখানে কারোই থাকে না, তারও নেই। অফিসের লোক বলে যাদের সঙ্গে অবন্তীর আলাপ হল, তারাও খুব সাধারণ চাকুরে মনে হল। এ-দিকে এই মানুষের খরচের হাত দেখে অবাক হতে হয়। অবন্তী আসা উপলক্ষে কেবল অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে সন্ধ্যা থেকে আর ছুটির দিনে দু'বেলাই কিছুদিন তো ছোট-বড় নানা মহলে পাটির ওপর দিয়েই কাটল। আর মুঠো মুঠো টাকা খরচ কেবল বরুণ মেহরাই করে। আরো আশ্চর্য, এ সব পাটির কেউই অফিসের লোক নয়। সবারই শোনে

'বিজনেস'। অথচ বরুণ নিজে করে চাকরি। বিজনেসের বন্ধুদের হাব-ভাব চাউনি খুব একটা ভালো লাগে না অবন্তীর। লোভের চাউনি তো এখানে পা দিয়ে পর্যন্ত দেখছে। ঠিক সে-রকমও নয়। ভদ্র, অমায়িক, কিন্তু অন্যের বউ হলেও ও যেন তাদের হাতের মুঠোয়, এমনি হাব-ভাব।

এর মধ্যে একটি লোককে অনেকবার অনেক পার্টিতে দেখল অবন্তী। কেবল পার্টিতেই নয়, ভাড়াটে ক্যাবে চড়ে মাঝে মাঝে অ্যাপার্টমেন্টেও হানা দেয়। বরুণের সঙ্গে তার বেজায় ভাব। তাকে দেখলেই খুশি আর শশব্যস্ত। হয়তো অফিসে বেরুনোর আগেই এসে হাজির হল, বরুণের সেদিন অফিস কামাই—তার সঙ্গে মনের আনন্দে ক্যাবে গিয়ে উঠে বসল, অবন্তীকে বলে গেল, ফিরতে দেরী হলে ভেবো না, রজার একটা ভালো খবর এনেছে—

লোকটার নাম রজার বারডোঁ (বারডোট—ট-এর উচ্চারণ নেই)। দশাশই চেহারা। যেমন দের্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে। এমন লোকের একটাই পেশা হওয়া উচিত। কুস্তি। মস্ত মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ের রং লালচে। মাথায় ছোট চুল। পার্টিতে প্রথম দিনের আলাপেই এই লোকটা অবন্তীর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। খাওয়া দেখলে মনে হবে খাওয়াই তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। মানুষের 'হাতির খাওয়া' কথাটা অবন্তীর কেবল শোনাই ছিল। এখানে স্বচক্ষে দেখল। খাওয়ার সঙ্গে সমান তালে মদ চলে। এত মদও কেউ খেতে পারে ধারণা ছিল না। কিন্তু এ-দুটোই কেবল অস্বস্তির কারণ নয়। প্রথম আলাপের পর হাতও বাড়ায়নি, বিশাল দেহের মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত একবার আনত হয়েছে শুধু। তারপর একটু দূরে গিয়ে বসেছে। কথা বলার চেষ্টা করেনি, কিন্তু অবন্তীর যতবার তার দিকে চোখ গেছে, দেখছে লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে। খাবার চিবুচ্ছে মদ গিলছে কিন্তু চোখ দুটো ওর দিক থেকে সরছে না, নড়ছে না। অবন্তীর সমস্ত গা শিরশির করে উঠেছে কেমন। কলকাতার হস্টেলের দেয়ালে একটা গোদা টিকিটিকিকে প্রায়ই লক্ষ্য করত। দেওয়ালের এক-একটা পোকামাকড়ের দিকে চেয়ে নিশ্চল পড়ে থাকত আর ঠিক এমনি করেই চেয়ে থাকত। শিকার ধরার জন্য কোন রকম তাড়াহুড়ো করত না। যখন ধরত অব্যর্থভাবেই ধরত। এই দশাশই লোকটাকেও সেই টিকটিকিটার মতো নির্মম ঠাণ্ডা শিকারী মনে হয়েছিল অবন্তীর।

বার কয়েক লোকটাকে দেখার পর বরুণকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই লোকের এত কদর কেন, দেখলে তো ভয় করে।

—কে? ও রজার? আরে ও একটা দারুণ গুণী লোক, সবাই ওকে খাতির করে—ওকে দিয়ে লিয়াজোঁর কাজ যা হয় তেমন কম লোককে দিয়েই হয়।

বরুণের অনেক ব্যাপারেই অবন্তীর খটকা লাগে। সোজাসুজি জিগ্যেস করেছে, আচ্ছা তুমি এত টাকা ওড়াও ছড়াও—কিন্তু এমন পাড়ায় এ-রকম অ্যাপার্টমেন্টে থাকো কেন, তোমার গাড়িরই বা এই দশা কেন?

বরুণ মেহরা হেসে জবাব দিয়েছে, চাকরি অনুযায়ী ঠাট বজায় রেখে চলতে হয়, নবাবী চালে থাকতে দেখলেই ইনকামট্যাক্স আর কাস্টমস-এর টিকটিকি পেছনে লাগবে।

—কেন লাগবে, তুমি কোথায় কি চাকরি করো?

—কেন, এমব্যাসিতে সাধারণ কেরানীগিরি।

—তাহলে তুমি এত টাকা পাও কোথায়?

বুক ফুলিয়ে জবাব দিল, বিজনেস ইনকাম।

—কি বিজনেস?

—মিড্‌লম্যান বলতে পারো।

—কিন্তু এতে রাখা-ঢাকার ব্যাপার কি আছে, ইনকাম ট্যাক্স বা কাস্টমস-এর লোক পিছনে লাগবে কেন—রোজগার করলে ইনকামট্যাক্স দেবে—চুরির ব্যবসায় তো লোক এদের ভয় করে।

বরুণ গম্ভীর। আবার একটু যেন বিরক্তও। ভুরু কুঁচকে জবাব দিয়েছে, দ্যাখো অবন্তী, এসব নিয়ে মাথা ঘামালে তুমি অথৈ জলে পড়ে যাবে। যেখানে যত বেশি দুর্নীতি সেখানে ততো বেশি নীতির আড়ম্বর। যেমন ধরো, মদ খাওয়া খারাপ সবাই জানে, কিন্তু দেশ থেকে কি মদের দোকান উঠে যাচ্ছে?

অবন্তী আর কিছুই বলে নি। কিন্তু মন বেশ খারাপ হয়ে গেছে। ও ঝগড়া না করতে পারে, বোকা নয়।...যে ব্যবসাই করুক সেটা সাদা রাস্তার ব্যবসা নয় এটুকু বুঝেছে। কিন্তু এরকম ব্যবসাদারই নাকি এখানে ঝুড়ি ঝুড়ি।

আর একটি লোকের সঙ্গে অবন্তীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বরুণ মেহ্‌রা। নাম সঠিক কি সে নিজেও জানে না, কিন্তু সকলের মুখেই তার একটাই নাম শোনা যায়। ইয়ানিক। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স। ক্লাউনের মতো ঢিলেঢালা বেশবাস। মিষ্টি দোহারা চেহারা। সুন্দর হাসে। অবন্তীর এ-দেশের নাচ শেখার আগ্রহ। তাই বরুণ একে ধরে এনেছিল। বরুণের দুই একটা পার্টিতেও অবন্তী একে দেখেছিল। প্রথম দর্শনেই লোকটা যেন অবন্তীর প্রেমে পড়ে গেছল। ঠিক হাঙর কুমিরের প্রেম নয়, একটু সাদা সিধে ভাব আছে। কথাবার্তায় সরল মনে হয়। নাচ শেখাবার প্রস্তাব পেয়ে দারুণ খুশি। বলেছে, চিপ রেস্তরাঁর এন্টারটেনমেন্টের নাচ থেকে রাজ-রাজড়ার ঘরের মেয়েদের নাচও আমি শেখাতে পারি। তবে আমার পরামর্শ চাও তো অপেরার নাচ শেখো, বড় বড় জায়গা থেকে তোমাকে লুফে নেবে।

কোথাও থেকে কেউ লুফে নিক এমন আগ্রহ নেই, কৌতূহল বশে অবন্তী জিগ্যেস করেছিল, সেটা কি রকম নাচ?

—ধাপে ধাপে অনেক রকমের আছে। অম্লানবদনে বলে বসল, আচ্ছা, আগে তোমার জামা কাপড় সব খুলে ফেলো, কি রকম নাচে তুমি সব থেকে বেশি অ্যাট্রাকশন ড্র করতে পারবে আমি দেখলেই বুঝতে পারব।

অবন্তীর দু' কান ঝাঁ ঝাঁ। অথচ লোকটা শয়তানি করে সব জামা কাপড় খুলে ফেলতে বলছে না। ঘরে কেবল বরুণ মেহ্‌রা। সে মজা পেয়ে হাসছে খুব। অবন্তী প্রায় ধমকের সুরে বলল, তুমি বড় ঘরের নাচই শেখাও আমাকে, অন্য কোনো নাচ শিখতে হবে না!

ইয়ানিক রাগের কারণ বুঝল না। বেজার মুখ করে বলল, সে-তো কেবল একটু সখের নাচ শেখা হবে, তোমার এমন ডার্ক বিউটি, এমন ফিগার—

—তাহলে আমার নাচ শিখে কাজ নেই, তুমি যাও।

ইয়ানিক অবন্তীর রাগ দেখেও মুগ্ধ। সে সখের নাচ শেখাতেই রাজি। কিন্তু তা শিখতে

গিয়েও অবন্তীর এক-এক সময় দু' কান গরম। তার ছাত্রী যে মেয়ে একটা এ-যেন ভুলেই যায়। লোকটাকে জোর করে তফাতে ঠেলে সরাতে হয়। এরপর একদিন লোকটা কিছুটা উদার মুখ করেই অমায়িক প্রস্তাব দিল, তুমি কেন যে খুব সহজ হতে পারছ না...তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, যদি চাও তুমি আমাকে এমনিতেই পেতে পারো। তার জন্য তোমার থেকে আমি টাকা নেব না।...তাহলে তোমার আড়ষ্ট ভাব কেটে যাবে।

অবন্তী হাঁ হয়ে চেয়ে ছিল খানিক। তারপর হনহন করে চলে এসেছে। বরুণকে বলেছে, লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াও শিগগীর—ও আমাকে এই-এই বলেছে।

রাগ দূরের কথা, বরুণ মেহ্‌রা হেসে বাঁচে না। অবন্তীকে কাছে টেনে গলা খাটো করে বলেছে, তুমি একটা নির্দোষ লোকের ওপর রাগ করছ, তোমাকে পছন্দ হয়েছে বলেই তার দিক থেকে সে উদাব প্রস্তাব দিয়েছে, লোকটা নাচও শেখায় বটে কিন্তু আসলে ও পুরুষ দেহ-ব্যবসায়ী, এখানকার মেয়েদের কাছে ওর কদর আছে, উপার্জন ভালো করে।

বিস্ময় কাটতে অবন্তী রেগে আগুন।—এই লোককে তুমি আমার কাছে এনেছ নাচ শেখার জন্য—আর এসব লোকদেব সঙ্গে তোমার মেলামেশা?

বরুণের হাসির মধ্যে কদর্য কিছু নেই। সরল তরল হাসি। বলেছে, আরো কিছুকাল যাক, এ-সব ব্যাপার তুমিও চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে পারবে।

একে একে চাব বছব কেটেছে। এর মধ্যে অবন্তী মেহরা অনেক কিছুই চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে পেরেছে, অনেক কিছু বা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। এখন সে মোটামুটি জানে কোথা থেকে বরুণের এত রোজগার আর কেনই বা তার এত খরচের ঝোঁক! টাকা কেন জমাতে পারে না, কেন ব্যাঙ্কেও বাখতে পারে না। লোকটার স্বভাবও অবশ্য এব জন্য অনেকটাই দায়ী, তার হাতে টাকা এলেই সে-টাকার পাখা গজায়। এ ক'বছরে অবন্তী কত অজানা অচেনা মুখ দেখল তার ঠিক নেই। তবে পুরুষ দেহ-ব্যবসায়ী ইয়ানিক আর হাতি-মার্কা খাইয়ে রজার বারডোর তার ঘরের মানুষেব সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। অবন্তীর মনে হয় ওই দুটো লোক যেন পুরনো ঘায়ের মতো বরুণের সঙ্গে লেগে আছে। তবু ইয়ানিককে অবন্তী বরদাস্ত করে, কিন্তু রজার বারডোকে দেখলে আজও তার বুকের তলায় গুরগুর করে। অথচ লোকটার দিক থেকে কোনো পরিবর্তন নেই, গায়ে পরে অন্তরঙ্গ হবাব চেষ্টা তো নেই-ই। কেবল মদ গেলে আর আয়েস করে খায়, খায় আর মদ গেলে আর অবন্তীকে চেয়ে চেয়ে দেখে। তখন কলকাতার হস্টেলের সেই টিকটিকির কথা মনে পড়েই।

এমন দুটো মানুষের সঙ্গে বরুণের হৃদ্যতা কেন অবন্তী এখন ভালোই জানে। কোন ব্যবসার ভালো লিয়াজোঁ এরা তাও অজানা নয়। গোড়ায় গোড়ায় খুব দুশ্চিন্তা হত, ভয় করত। এখন সবই চোখ বুজে উড়িয়ে দিতে হয়। বুকের তলায় ভয়ের বাসা নিয়ে ক'দিন চলতে পারে? উড়িয়েই দিতে হয়।

...সব পশ্চিম দেশগুলোতেই নেশার ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকাচ্ছে, গোপন গর্তের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে যেখানে দরকার সেখানে অনায়াসে পৌঁছে যাচ্ছে। চৌদ্দ-পনেরো

বছরের স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত এই নেশার বলি। পথের অতি সাধারণ রেস্তরাঁগুলোও এরই জোরে জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে—কিন্তু বাইরে কোনো ঠাট নেই জাঁক নেই। কে কাকে ধরে? ব্যাঙের ছাতার মতো ড্রাগ-রিং গজিয়েছে, গজাচ্ছে। কেবল ফ্রান্স নয়, সমস্ত সভ্য জগতের সামনে এটাই গুরুতর সমস্যা। কোকেন পিসিপি হেরোইন হাসিস এল এস ডি—এসব কত রকমের 'কোড' নামে কিভাবে চালান হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া সহজ নয়। তুমি আর তোমার পাশের লোকটিই যে একই ড্রাগ-রিঙের বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে বসে, সে তুমি জানো না তোমার পাশের লোক জানে? তুমি ধরা পড়লে তুমি মরবে। সে ধরা পড়লে সে মরবে, তোমার জন্য সে মরবে না বা তার জন্য তুমি মরবে না —ভয়টা কি? কেউ বিপাকে পড়লে তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। লিয়াজোঁ বা সংযোগের কাজ যারা করছে তারা চুনো পুঁটি। রিং-এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কেন পরোক্ষ যোগও নেই কারো। হোটেল রেস্তরাঁ এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরও চাহিদার খবর রাখা পর্যন্তই এই মাঝের লোকদের কাজ। কি বা কোন জিনিসের চাহিদা, কোড্-নাম থেকে তারাই কি তা সব সময় বুঝতে পারে? বা পারলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায়? খবর পাচার করার মধ্যেও কত রকমের ছলাকলা কারসাজি।

তবু পুলিশ বা কাষ্টমস-এর জালে কি কেউ পড়ে না? অনেক সময়েই পড়ে।

যাক, অবন্তী মেহ্‌রা এত সব খুঁটিনাটি কিছুই জানে না। কিন্তু এটুকু ভালো করে আঁচ করতে পারে বরুণের মিডলম্যানের বিজনেসটা জটিলতামুক্ত বা নিরাপদ আদৌ নয়। রজার বারডোঁকে দেখলে আরো মনে হয় না। বরুণ এমনিতে দিলদরিয়া, কিন্তু তার ব্যবসার কথা তুললে খুব বিরক্ত হয়।

...বরুণ মেহরার সব থেকে সুবিধে সে এমব্যাসির চাকুরে। এই সুবিধেটা অবন্তী ভালো করেই বুঝেছে। অতি নিরীহগোছের সাদামাটা চাকুরে সে। রাজনৈতিক জটিলতা ভিন্ন আর কোনো জটিলতার বাতাস এদিকে কমই ছড়ায়। এমব্যাসির চাকরি এমব্যাসির মানুষ—ব্যাস ধোয়া তুলসী পাতার জল। এক রাজনীতি ভিন্ন এমব্যাসির লোক সমস্ত চক্র-জালের বাইরে।

...কিন্তু চার বছর যেতে অবন্তী বিপদের গন্ধ পেল। চুপচাপ লক্ষ্য তো করেই যাচ্ছে, মানুষটার কেমন যেন দিশেহারা ভাব। কলিং বেল বাজলেই সচকিত হয়ে ওঠে। কিছুদিন ধরে অফিসেও যাচ্ছে না দেখছে। অসময়ে রজার বারডোঁ আর ইয়ানিক ঘনঘন আসছে। দুজনে একসঙ্গে নয় অবশ্য। কিন্তু সমস্যা এক রকমেরই মনে হয়। তাদের কেউ এলে বাড়িতে বসে কথা হয় না, বেরিয়ে যায়, এক দেড় দু'ঘণ্টা বাদে ফেরে...রজার এলে ফিরতে আরো দেরি হয়। ভাবলেশশূন্য এই লোকটাকে দেখলে অবন্তীর এখন আরো বেশি ত্রাস! বরুণের সামনেই অপলক চেয়ে থাকে, তাকে পরোয়া করে না।

বড় রকমের দুর্যোগ কিছু মাথায় ভেঙেছে বোঝা গেল। একদিন ব্যস্ত হয়ে অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরেই বলল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও, আমরা বেরিয়ে পড়ব কিছুদিনের জন্য, এয়ার প্যাসেজ বুক করেই এসেছি—

অবন্তী চেষ্টা করে কোনো কিছুতে খুব অবাক না হতে। এই লোকের এখন তাতেও বিরক্তি। দেখল একটু, জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

—আপাতত আমস্টারডম, কয়েকজন বন্ধু অনেকবার যেতে লিখেছে, হয়ে ওঠেনি।

অবন্তী তারপরেও সোজাসুজি চেয়ে রইলো।—আমার শরীর খারাপ জেনেও এমন তড়িঘড়ি বেরুতে চাইছ, কি ব্যাপার?

অবন্তী অন্তঃসত্ত্বা। চার মাস চলছে। কোন রকম উপসর্গ নেই অবশ্য। বরুণ ঝাঁঝিয়ে উঠল, পৃথিবীর কোথায় না ভালো নার্সিংহোম আর ভালো ডাক্তার আছে, অত ভয় পাবার কি আছে?

অবন্তী আর কিছু বলল না। যাবার আগে ইয়ানিক এলো। বরুণ বাড়ি ঘরের চাবি তার হাতে দিয়ে দিল। বাইরে থেকে যেমনই হোক, ভিতরে শৌখিন দামী জিনিস কম নেই। অবন্তীর কেমন ধারণা হল, এখানে আর তারা ফিরছে না, জিনিসপত্র হয়তো বেচে দেওয়া হয়েছে। ইয়ানিকের কথায় আরো খটকা লাগল। ইতস্তত করে বরুণকে বলল, রজার তো জানে তুমি একলাই যাচ্ছ, তোমার বউ এখানে থেকে যাচ্ছে। কিন্তু এই লোকের মুখে অসহিষ্ণু ক্রোধ দেখে থেমে গেল। অবন্তীর দিকে ফিরে ইয়ানিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলল, গুড লাক ম্যাডাম, ফুটফুটে একটা বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসো।

অবন্তীর কাছে এটুকু পরিষ্কার, শিগগীর অন্তত তারা ফিরছে না। নইলে এ-রকম শুভেচ্ছা জানাতো না। বাচ্চা আসতে এখনো ঢের দেরি।

প্লেনে কারো বাংলা বোঝার ভয় নেই। তবু এ-দিক ও-দিক একবার দেখে নিয়ে অবন্তী খুব ঠাণ্ডা সুরে জিগ্যেস করল, ভালো রকম গণ্ডগোলে পড়েছ তাহলে?

বরুণ মেহরা আর ঢাকতে চেষ্টা করল না।—হুঁ...কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নইলে এমব্যাসির লোককে কারো সন্দেহ হবার কথা নয়।

—ইয়ানিক বা রজার?

—ইয়ানিক তো নিজের পেশা ছেড়ে আমার দৌলতেই ভালো রকম করে খাচ্ছিল, এখনো আশা করছে দুর্যোগ কেটে যাবে। রজার হতে পারত কারণ গোড়া থেকেই তোমার দিকে ওর চোখ...কিন্তু আমি ধরা পড়লে ওর বিপদ আমার থেকে বরং বেশি, ধরা পড়ছিই বুঝলে ও আমাকে খুন করেও নিজে বাঁচতে চাইতো।

—এমব্যাসির চাকরি গেছে?

—না, উড়ো চিঠি পেয়ে ওরা জাল ফেলার আগে আমি রিজাইন করে সরে এসেছি। তারা জানে আমি ইণ্ডিয়ায় ফিরব।...কিন্তু আশ্চর্য, উড়ো চিঠিতে এত সব পাকা খবর কে দিল!

অবন্তীকে স্থাণুর মতো বসে থাকতে দেখে ঈষৎ তিক্ত গলায় বরুণ বলল, তোমার জন্যও কেউ শয়তানি করে থাকতে পারে—আজ পর্যন্ত কতজন তোমাকে পাবার জন্য টোপ ফেলেছে খবর রাখো?

অবন্তী ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো।—টোপ না গিলে নিজেকে বাঁচালে এত উদার তুমি? না কি এ-রকম বিপদ হতে পারে বোঝোনি বলে টোপ গেলো নি?

বরুণ মেহরার রাগে মুখ লাল। কিন্তু চোখে চোখ পড়তে মিইয়ে গেল। একটা হাতে চাপ দিয়ে বলল, তুমি আমাকে এ রকম ভুল বুঝো না, একটু ধৈর্য ধরো আর বিশ্বাস রাখো, আমি এ-ভাবে মুছে যাবার জন্য দুনিয়ায় আসিনি—দেখতে পাবে।

চার পাঁচ মাস ধরেই দেখতে পেল। আমস্টারডম হল্যাণ্ডের পর ডেনমার্ক ঘুরে শেষে ওয়েস্ট জার্মানিতে। সব জায়গাতেই চেনা-জানা লোক কিছু আছে। অবন্তীর ধারণা,

ধারণা কেন, বিশ্বাস এরাও নেশাখোরের দল। এই লোকদের আচার আচরণে কি মিল দেখে জানে না। কিন্তু আতিথ্য নেবার না হোক দেবারও সীমা আছে। সঞ্চিত টাকা বরুণ সহজে এখন খরচ করতে চায় না। অনায়াসে হাত পাতে, ধার চায়। হঠাৎ অসুবিধে পড়ার কথা বললে কেউ অবিশ্বাস করে না। কিন্তু আতিথ্য নেবার বা ধার পাবার লোক ফুরালে আবার অন্যত্র পাড়ি দেয়। যেখানেই যায়, তার প্রথম কাজ প্যারিসে ইয়ানিককে চিঠি লেখা। অবন্তীর ধারণা সেখান থেকে গ্রীন সিগন্যাল পাবার আশায় আছে।

ওয়েস্ট জার্মানিতে এসেই অবন্তী হাসপাতালে ভর্তি হল। শরীর একটু আগেই বিকল হয়েছে। তাকে হাসপাতালে দিয়েই বরুণ মেহ্‌রা তিন-চারদিনের জন্য কোথায় আবার ঘুরে আসতে গেল। জিগ্যেস করলে সত্যি জবাব পাবে না ধরেঁ নিয়ে অবন্তী কিছু জিজ্ঞেস করে না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। মৃত। মৃতও ঠিক নয়, অবন্তী শুনেছে জন্মাবার ঘণ্টাখানেক বাদে অর্ধ-মৃত থেকে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছেছে। বরুণ মেহবার ধারণাও নেই গত ক'মাস ধরে অবন্তী নিঃশব্দে কত ধকল সহ্য করেছে, দেহটা কত সময় বিদ্রোহ করেছে। মৃত শিশু সামনেই শয়ান। তার আট আঙুল শরীরের নরম হাতের কব্জিতে একটা টিকেট বাঁধা। টিকেট বাঁধা কারণ যে এসেছে সে বেঁচে নেই। আশ্চর্য রকমের নিস্পন্দ, ঠাণ্ডা, অবাক চোখে দেখার মতো। অবন্তী মন দিয়ে দেখছে, কারণ সে কিছু ভাববে না, ভাবতে চায় না।...জানালা দিয়ে কাছে দূরের কয়েকটা বাড়িও এই সদ্যজাত মৃতের মতো নিশ্চল, নিস্পন্দ। অবন্তী দেখছে কারণ সে কিছু ভাববে না।

ছাড়া পেতে দিন-কতক সময় লাগল। আগের ব্যবস্থা মতো অবন্তীর ছোটখাটো একটা অপারেশন হয়েছে। আর যাতে সন্তান না হয় সেই অপারেশন। আর সন্তান হবে না। বরুণকে কিছু বলেনি, ডাক্তারকে বলে নিজেই ব্যবস্থা করেছে।...এই ছেলে বাঁচবে না অবন্তী জানত না..জানলে কি করত? না ভাববে না।

বরুণ মেহরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগেই ফিরে এসেছে। খুব বিমর্ষ। খুব বিষণ্ণ। অবন্তী কিছু জিগ্যেস করেনি। ওকে নিয়ে একটা খুব শস্তার আস্তানায় উঠেছে। ওয়েস্ট জার্মানিতে গরিব অনেক, এ-রকম আস্তানাও অনেক! বরুণ নিজে থেকেই জানিয়েছে, খুব গোপনে সে প্যাবিসে গেছল। কিন্তু প্যারিস তার কাছে এখন আরো বিপজ্জনক। ইয়ানিক যতটা পারে সাহায্য করেছে। বাড়িব জিনিসপত্র বিক্রির গচ্ছিত টাকা ছাড়াও আরো কিছু পাওনা টাকা দিয়েছে। আর রজার নাকি তাকে দেখেই ক্ষেপে গেছল, বরুণ ধরা পড়লেই তার বিপদ।

আরো পাঁচ ছয় মাস বাদে অবন্তীর শরীর স্বাস্থ্য আবার ঠিক আগের মতোই। আশ্চর্য, শরীরটা তার কি ধাতুতে গড়া? বরুণ তো এতদিনে আধখানা হয়ে গেছে।

...পুঁজির টাকা খরচ করার ব্যাপারে সাবধান, তবু খরচ তো হচ্ছেই। অবশ্য ধারও সমানেই চলেছে, এমন অনায়াসে হাত পাতে লোকটা যেন ধার পাবার অধিকার আছে।

...হঠাৎ সে বেজায় হাসি খুশি একদিন। আবার যেন পুরনো উৎসাহ পুরনো উদ্যম ফিরে পেয়েছে। কারণ? কারণ লণ্ডন থেকে জগদীশ কাপুর অর্থাৎ জর্জ তার চিঠির জবাব দিয়েছে। সে নাকি এই চিঠিরই অপেক্ষায় ছিল। জর্জ লিখেছে এখানে চলে এসো, একটা ভালো কাজের ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক হয়েছে। আপাতত একলাই এসো, তোমার

বউকে এখন এনো না, তার এখন প্যারিসেই থাকা দরকার। আমার যেটুকু খবর, তোমার দুর্যোগ শিগগীরই কেটে যাবে, আর বহাল তবিয়তে তুমি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবে। নানা কারণে তোমার বউয়ের এখন প্যারিসেই থাকা দরকার। ইত্যাদি—।

...টাইপ করা চিঠি। তলায় কলমে আঁচড়ে লেখা ইয়োরস 'জি'। খামটা বেশ পুরনো মনে হল অবন্তীর। সে নির্বাক নিস্পন্দ ঠাণ্ডা। আশ্চর্য, অবন্তীর এমন ভিতর দেখা চোখ কবে থেকে হল? হতে পারে জর্জই লিখেছে, লিখলেও শেখানো চিঠি। আর নয়তো নিজেই টাইপ করে নিচে 'জি' বসিয়ে দিয়েছে। মোট কথা লোকটা পালাচ্ছে। নিজের কাছ থেকেও পালাচ্ছে, ওর কাছ থেকেও পালাচ্ছে। উৎসাহ আর খুশির এমন বীভৎস কৃত্রিমতা অবন্তী আর কি দেখেছে?

চোখে চোখ রেখে খুব ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করেছে প্যারিসে আমি কোথায় থাকব —কি করে চলবে?

—তোমার কিছু চিন্তা নেই, সেখানে এখনো আমার পনেরো বিশ হাজার ফ্রা লোকের কাছে পাওনা আছে, ইয়ানিক আর রজার সে টাকা আদায় করে তোমাকে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। জর্জের চিঠি পাব ধরে নিয়েই ওদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছি—রওনা হবার আগে ইয়ানিককে আমি টেলিগ্রাম করে দেব, সে এয়ারপোর্ট থেকে তোমাকে নিয়ে যাবে। তাছাড়া কিছু টাকাও তোমার সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি, ইয়ানিকের ঠিকানাটাও নোট করে নিও।

অবন্তী আর কিছুই বলেনি। কি বলবে? বলবে, তুমি আমাকে ছেড়ে পালাচ্ছ? বলে কি লাভ হবে?

...দু'চোখ মেলে আরো কিছু দেখার ছিল অবন্তীর। অবাক হবার ছিল। অবন্তী ঠাণ্ডা সহিষ্ণুতার ঠাট বজায় রাখতে পেরেছিল বইকি। স্টেশনে বরুণকে বিদায় দিতে গেছল। ট্রেনে কোথায় হয়ে লণ্ডনে যাবে। ট্রেন ছাড়ার আগে লোকটার চোখে জল দেখেছিল অবন্তী। ওকে বার বার করে বলছিল, লণ্ডনেই যদি থেকে যাই তোমাকে শিগগীরই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব—নয়তো আবার প্যারিসেই ফিরে আসব। তোমাকে নিয়ে ফ্রান্সের অন্য কোথাও থাকব।

এয়ারপোর্টে ইয়ানিক বা রজার বারডো কেউ আসেনি। কেউ আসবে না অবন্তী ধরেই নিয়েছিল। ইয়ানিকের ঠিকানা তাকে দেবার কারণ যাতে প্যারিসে এসে ও নিজেই তার খোঁজ পেতে পারে।

না, অবন্তী সে চেষ্টা করেনি। এতদিনে বরুণ জানে তার মতো মেয়ের এ-জায়গায় বেঘোরে মারা পড়ার কথা নয়।

কিন্তু সে ভাবে বাঁচার ইচ্ছেও নেই অবন্তীর। দরকার মতো ঘুমিয়ে পড়ার রসদ তার ব্যাগেই আছে। পুরো একটা ফাইল। ঘুমিয়ে পড়বে বলেই ওটা সংগ্রহ করে রাখা। যে ঘুম আর ভাঙবে না সেই ঘুম। সদ্যজাত সেই একটু মানুষের আকারের মাংসখণ্ডের মতো নির্বাক নিশ্চল পড়ে থাকবে।...কিন্তু আবার ভেবেছে এ-ভাবে চলে যাবার জন্যই কি সে পৃথিবীতে এসেছে। জীবনে কিছু ভুল হয়তো করেছে, অপরাধ কি করেছে? আর ভুলটাও মানুষকে বিশ্বাস করার ভুল।

কিন্তু পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই ভয়ানক ক্লান্ত। সুটকেস দুটো একটা স্টোর-শপে জমা

রেখে টিকিট নিয়েছে। সকালের দিকে কোনো শস্তার রেস্তরাঁয় বসে যতক্ষণ পারে কাটায়। কখনো অনির্দিষ্টের মতো ঘোরে। সন্ধ্যার পর থেকে খুব একটা ভাবতে হয় না। কোনো রেস্তরাঁয় গিয়ে জায়গা বেছে বসলেই হল। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করার পরেই কেউ না কেউ আসে। সে একলা কেন জিগ্যেস করে। প্রিয়জন আপাতত বাইরে শুনে সবিনয়ে জিগ্যেস করে সঙ্গ দিতে পারে কিনা। অবন্তী হাসে। খানাপিনা চলে। তার পরে আরো অন্তরঙ্গ হতে চাইলে অবন্তীর কিছু একটা অজুহাত দেখাতে হয়।

কোনো কোনো পরিচিত বা অল্প-স্বল্প চেনা-জানা লোকের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে অবন্তী দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবে ঢুকবে কিনা। ভাবে আশ্রয় আর কিছু খাবার চাইবে কিনা। কিন্তু বরুণের সঙ্গে থেকে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর এ-রকম চেষ্টা করেনি।

...প্যারিস যেমন ছিল তেমনি আছে। আজ যেমন কালও তেমনি। অবন্তী শুধু কাল যা ছিল আজ তা নয়। যেদিকে তাকাও, মানুষজন ঘর-বাড়ি। তার মধ্যে সে নিঃসঙ্গ একা। হতাশার বাষ্পের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। প্যারিস নাকি আলোর শহর, প্রেমানুরাগের শহর, প্রেমিক দম্পতীর স্বপ্নের শহর।...বরুণ মেহ্‌রার সঙ্গে যে সব রাস্তায় পুরনো গাড়িতে চড়ে বেড়াতো সে-সব জায়গায় পায়ে হেঁটে ঘোরে। এমন নিঃসঙ্গ হাঁটার অর্থ অনেকে বোঝে।...এই দেহ, ব্ল্যাক জেম অনেক অনেক চোখ টানে। অনেকে এগিয়ে আসে।

...রাতে, বেশি রাতেও নিজের মনে হেঁটে যাও, কোন দিকে না তাকালে অসুবিধে নেই। তাকালে আবছা বাড়িগুলোকে এক-একটা স্থির দানবের মত মনে হবে। তোমার টাকা আছে? কিছু বড়লোক বন্ধু আছে? এগুলো তখন দানব নয়—বাড়িই। সিঁড়ি ধরে ওঠো, বেল বাজাও। দরজা খুলে যাবে, মিষ্টি হেসে কেউ এগিয়ে আসবে। কিন্তু তোমার সম্বল আছে কি নেই তারা খুব জানে, দেখলেই বুঝতে পারে। তুমি মেয়েছেলে বলেই সম্মান দেখিয়ে একটু সরে দাঁড়াবে তারপর সবিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করবে, আগের পরিচয় স্মরণ করতে চেষ্টা করেও পারবে না।

...এখানে নয়, আশ্রয় যদি পেতে চাও, শস্তার হোটেল রেস্তরাঁয় যাও, নিজে হাসো আর ফুর্তি করো, আর ফুর্তির রসদ যোগাও, ফ্রান্স সত্যিই প্রেমিক-প্রেমিকার শহর। সেই প্রেমের মেয়াদ যদি দু-দশ ঘণ্টা ধরে নাও, তোমার মতো মেয়ের ভাবনা কি? মিসট্রেস হবে? অভিজাতদের মিসট্রেস হওয়া এখানে তো অগৌরবের কিছু নয়।

চিন্তার শেষ। ভাবনার শেষ। এক বিকালে অবন্তী ইয়ানিকের কাছে গিয়ে হাজির। [illegible] দেখে সে লাফিয়ে উঠল। একটু হয়তো বা আঁতকেও উঠল। ...তুমি মাদাম! কবে [illegible]? মেহ্‌রা কোথায়?

অবন্তীর মাথা ঘুরছে। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি। বসল।—তুমি কিছু জানো না?

সে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বলল, তুমি এখানে আসছ লিখেছিল, তোমার কিছু একটা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধও করেছিল...কিন্তু সে কি তোমাকে ছেড়ে পালিয়েছে?

অবন্তী চুপচাপ চেয়ে আছে।

—বুঝলাম। ইয়ানিকের চোখে মুখে দরদের ছোঁয়া, গলার স্বরও মোলায়েম নরম। —দেখো মাদাম, আমি যতটা পারি তোমাকে সাহায্য করব, তার আগে তুমি মন স্থির

করো কি চাও, কিন্তু খুব উঁচু মহলে ভিড়তে চাইলে কিছু সময় লাগবে...তবে তার আগে তোমার থাকার মত একটা নিরাপদ জায়গা চাই—তুমি এখানে আসছ জেনেই একজন অন্তত বেড়ালের ইঁদুর-খোঁজা চোখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকেও খুব বিশ্বাস করে না, ভাবে কোথাও তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি। কবে এসেছ, কোথায় আছ এখন?

অবন্তী তক্ষুনি বুঝল কে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রজার বারডোঁ ছাড়া আর কে হতে পারে?—মাসখানেক হল...থাকার কিছু ঠিক নেই। চাউনি তির্যক একটু, তুমি আমাকে কোথায় রাখতে চাও?

ইয়ানিক হাসতে লাগল।—দ্যাখো মাদাম, মেয়েদের জন্য আমার এ দেহটা এতদিন ধরে এত খেটেছে যে তোমার ওপর আমার কোনো লোভ নেই...কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, একজন আর্টিস্টের ভালো লাগার মতো। তোমার উপযুক্ত বাগানে তোমাকে হাঁটতে দেখলেই আমি খুশি হব।

অবন্তী অপেক্ষা করছে। কথাগুলো কানে একটা আওয়াজের মতো লাগছে। না বোঝার মতো কথা নয়, কিন্তু কিছু না খাওয়া পর্যন্ত কিছুই মাথায় ঢুকছে না...কিছু খায়ইনি বা কেন! ভ্যানিটি ব্যাগে তো খাবার টাকা নেই এমন নয়!

ইয়ানিক নিজের আবেগে বকেই চলেছে।

হঠাৎ কিছু কানে আসতে চমকে উঠল লোকটা। দু'কান খাড়া করে কিছু বুঝতে চেষ্টা করল তারপরেই আড়ষ্ট। মচমচ জুতোর শব্দ তুলে যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে অবন্তীও কাঠ একেবারে।

রজার বারডোঁ।

লাল লোমশ দু'হাত কোমরে তুলে অপলক চোখে অবন্তীর আপাদমস্তক দেখল।

—কবে এসেছ?

অবন্তী নিরুত্তর। সে-ও চেয়েই আছে।

ইয়ানিক চিঁ চিঁ করে জবাব দিল, মাসখানেক হল...

সঙ্গে সঙ্গে থাবার মতো দু'হাত বাড়িয়ে ওর গলাটা ধরে বসা থেকে একেবারে তুলে ফেলল রজার বারডোঁ।—একমাস ধরে তুই আমার চোখে ধুলো দিয়ে আসছিস?

ইয়ানিকের দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম। অবন্তীর এই মাথায়ও রক্ত উঠল কি করে জানে না। উঠে দাঁড়িয়ে রজারের গলা-ধরা হাতে গায়ের জোরে একটা চাপড় বসিয়ে দিল।—ছাড়ো বলছি—ওর সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা হল!

ছেড়ে দিল। আবার দেখতে লাগল। পুরু ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস। আরাম করে বসল। বিশাল বুক ঠেলে ফোঁস করে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ঠেলে বেরুলো। --আরো দু'মাস আগে তোমাকে আমার কাছে এখানে পাঠিয়ে মেহরাকে ওয়েস্ট জার্মান থেকে সরে পড়তে লিখেছিলাম! আমার খবর আছে সে সেখানে নেই, কোথায় আছে? এখানেই যদি এসে থাকে তাকে আর জ্যান্ত ফিরতে হবে না।

ইয়ানিক কাঠ-শুকনো গলায় জানান দিল, মেহরা ফ্রান্সে আসেনি, সে এখন লণ্ডনে।

...ঢাউস টিকটিকির অপলক দু'চোখ খুব ধীরে সুস্থে অবন্তীর সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করল একবার। তারপর হঠাৎ একটু অন্যরকমের মনোযোগ।—তোমার শরীর টলছে কেন —হাংরি?

অবন্তী অনেকটা নিজের অগোচরেই মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, ক্ষুধার্ত।

—কাম অন্। উঠে হাত ধরে টানল, ইয়ানিককে বলল, তুমিও এসো।

বাধা দেবার শেষ চেষ্টা অবন্তীর।—ধন্যবাদ, তোমার সঙ্গে কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই, তুমি যেতে পারো।

জবাবে বাহু ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। ধরা না থাকলে অবন্তী মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ত। টানা যান্ত্রিক গলায় ইয়ানিক বলল, বস্-এর অবাধ্য হয়ো না মাদাম, চলো—

না অবন্তীর আর বাধা দেবার শক্তি নেই।

প্রায় দশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যে রেস্তরাঁর সামনে ক্যাব থামল সেটাকে দরিদ্র এলাকাই বলা যেতে পারে। রজার নেমে হাত ধরে অবন্তীকে নামালো।

সন্ধ্যা রাতেই এখানে ভিড় মন্দ নয়। রজার তার বাহু খামচে ধরে এগিয়ে চলল। অর্ধনগ্ন দুটো মেয়ে নাচছে।

বারঢোঁকে দেখে স্টুয়ার্ড নয়, কর্তাব্যক্তির মতোই একজন লোক এগিয়ে এলো। তার ফিটফাট বেশবাস। সে তুলনায় রজার বা ইয়ানিকের যা চেহারা আর বেশবাস, এই দলকে দেখে কারো খুব একটা ব্যস্ত হবার কথা নয়। কিন্তু যে এলো সে-ই যেন এখানকার মুরুব্বি। রজাবের পছন্দের জায়গাও লোকটা জানে। সাদরে এনে বসার ব্যবস্থা করল। ইশারায় তাদের বসতে বলে রজার লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল।

ফাঁক পেয়ে ইয়ানিক একটু ঝুঁকে অবন্তীকে বলল, আপাতত তোমার আমার সব প্ল্যানই বরবাদ, তুমি ধৈর্য খুইয়ে বোসো না মাদাম, খুব অনুগত ধৈর্য ছাড়া এই লোকের চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না।

অদূরে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়ে যে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে রজার সে একটু পরেই ঘাড় ঘুরিয়ে বেশ করে একবার অবন্তীকে দেখে নিল। তারপর আবার রজারের দিকে ফিরে সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে আরো একটা লোককে ডাকল। রজার ফিরে আসছে।

খেতে খেতে অবন্তীর মনে হচ্ছিল অনেক দিনের মধ্যে এত ভালো খায়নি। অথচ এমন আহামরি খাবার নয় কিছু। খাওয়ার কথাটা সকাল থেকে মনেই পড়েনি কেন আশ্চর্য। আজ আর রজারের হাত্তির খাওয়া দেখে অবন্তীর গা ঘিনঘিন করছে না। কেবল এটুকু লক্ষ্য করেছে, লোকটা শুধু খাবারই খাচ্ছে, মদ না। অথচ তারই পয়সায় ইয়ানিকের বেশ মদ চলছে। চার পাঁচটা শেষ করেছে। তার কথায় অবন্তীও একটা নিয়েছে। শুধু খাদ্যে এত অবসাদ যাবার নয় বলেই আপত্তি করেনি। দেহটা অনেকদিন ধরে একটা যন্ত্রের মতো চলছিল। এখন আস্তে আস্তে চেতনার জগতে ফিরেছে।

রেস্তরাঁর বেশ কাছেই একটা বাড়ি। সেকেলে পুরোনো বাড়ি। দেখলে মনে হবে হা-ঘরে লোকদেরই বাস এখানে। কিন্তু যে অ্যাপার্টমেণ্টে রজার তাদের নিয়ে ঢুকল সেটা বেশ বড়সড় আর পরিচ্ছন্ন। অল্প আসবাবপত্র সাজানো গোছানো। দেয়ালের ধারে প্রশস্ত শয্যা, গোটা দুই কুশন চেয়ার। কাঁধে সামান্য চাপ দিয়ে রজার অবন্তীকে একটা কুশনে বসিয়ে দিল।

ইয়ানিক আর রজার এক-হাত ফারাকে মুখোমুখি। একজন বিরাট জানোয়ারের মতো পুরুষ, আর একজন মেয়েদের পুরুষ। রজারের পুরু ঠোঁটে টিপটিপ হাসি, চোখদুটো হুলো বেড়ালের মতো ঝকঝক করছে।

—আমি খুব সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, কেমন?

ইয়ানিক সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ল। তাই।

—গিয়ে না পড়লে তুমি কি করতে?

—মাদামকে দেখে তখন পর্যন্ত আমি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতে পারিনি —কি করতাম ভাবিনি, তবে খুব দুর্মতি না হলে তোমার কাছেই নিয়ে আসতাম বোধহয়।

ঠোঁটের হাসি আর একটু স্পষ্ট হল।—কারো কাছ থেকে টাকার টোপ গিলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আশা করি?

ইয়ানিক মজার কথা শুনেছে যেন।—আমার প্রাণের মায়া আছে।

—তোমাকে কিছুদিন এখন আমার দরকার হবে, কাল আজকের এই সময়েই রেস্তরাঁয় এসো—এখন সবে পড়ো।

ইয়ানিক দরজার দিকে এগোতেই অবন্তী ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।—ও যাচ্ছে কোথায়, আমিও যে যাব!

রজার সোজা ওকে আগলে দাঁড়াল। ঝাঁঝালো গলায় অবন্তী বলল, সরো!

জবাবে দু'হাতের থাবা তার দুই কাঁধে উঠে এলো। অবন্তী নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে পিছু হঠছে, তাকে তেমনি ধরে রেখেই রজারও এগোচ্ছে। তারপরেই দিশেহারা, গলা দিয়ে অস্ফুট একটু আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। ওই দুই হাতের ধাক্কায় দেহটা পরের মুহূর্তে বুঝি চুরমার হয়ে যাবে, ভয়ে অবন্তী দু' চোখ বুজে ফেলল।

না—সে শয্যায় আছড়ে পড়েছে। খুব নরম গদীর শয্যা। অবন্তী চোখ মেলে তাকালো। ইয়ানিক চলে গেছে। রজার বন্ধ দরজার ছিটকিনি তুলে দিচ্ছে।

দেয়ালের গায়ের ঢাউস টিকটিকি নয়, শয্যার দিকে মানুষের আকারের একটা দানব এগিয়ে আসছে।

দিন মাস বছরের খুব হিসেব নেই অবন্তীর। তার এই জীবনের সঙ্গে কেবল রাতের যোগ। দিনে ঘুম। রেস্তরাঁয় রাতের রানী সে। সেই রেস্তরাঁরই। সেখানে মাঝরাত পর্যন্ত দফায় দফায় নাচতে হয়। সমঝদারের দল বেশি জুটলে সে-রকম বিশ্রামও মেলে না। দেহসৌষ্ঠবের লীলা দেখিয়ে মানুষকে কাচপোকার মতো আটকে রাখতে হয়। নগ্ন নাচ অবশ্য নয় তবে খুব একটা তফাতও নেই। অবন্তীর ধারণা সে ভালো টাকাই রোজগার করে। কিন্তু যা পায় সেটা রজারের হাতে চলে যায়। রজার কি ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সাজসজ্জা আরাম বিলাসের জন্য কম খরচ করে? মোটেই না। অবন্তীর ধারণা বেশিই খরচ করে। কিন্তু এমন প্রেয়সীর হাতে কাঁচা টাকা তুলে দেবার মতো বোকা সে নয়।

এক দেড় মাসের মধ্যে ইয়ানিক তাকে ভালোই নাচ শিখিয়েছে। এই দায়িত্ব নেবার জন্যই তাকে আসতে বলা হয়েছিল। দায়িত্ব সে ভালোই পালন করেছে। ওই রেস্তরাঁর ওপর রজারের এত প্রতিপত্তির রহস্য অবন্তীর আজও অজানা। আজও বলতে প্রায় দু'বছর তো হতে চলল। ইয়ানিক ফাঁক পেলে আফশোসের কথা শোনায়। কত বিরাট

বিরাট মানুষের আদরের মিসট্রেস হতে পারতে তুমি, আর কি বরাতই না করে এসেছ —কবে যে তোমার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে।

অবন্তী এখন একটু-আধটু রসিকতাও করতে পারে।—কেন, রজারও তা বিরাট মানুষই।

রেস্তরাঁ জমিয়ে রাখা অবন্তীর কাজ। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত মনোরঞ্জনে কঠিন অলিখিত নিষেধ। লুব্ধ হয়ে কতজনে এগিয়ে এসেছে, এই লৌহ প্রমোদ বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তলায় তলায় অবন্তীও কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু স্পষ্ট বুঝেছে তাতে প্রাণটি যাবে। যাবেই। রজারের হয়ে অনেক চক্ষু তার প্রহরায় মোতায়েন। যারা এগিয়ে আসার চেষ্টা করেছে তাদের পিছু হটাতে সময় লাগেনি। ইস্পানিকের কথা সত্যি কিনা জানে না, তাদের কারো কারোকে নাকি দেড় দু'মাস করে হাসপাতালেও থাকতে হয়েছে। খুব বেশি এগিয়েছিল একজন। তারও পয়সার জোর ছিল। খুব সংগোপনে দিন গোনার সময় এগিয়ে আসছিল অবন্তীর। তারপর হঠাৎই দেখা গেল সেই লোক একেবারে নিখোঁজ। ওই লোকের কোনো অস্তিত্বই যেন কারো জানা নেই বা ছিল না। অবন্তী এটুকু বুঝেছে রজার বারডোঁর এমন কিছু পরিচয় আছে যা জীবন-প্রিয় লোকের কাছে ত্রাসের মতো। অবন্তীর এই দেহের ওপর কেবল একজনের অধিকার। রজার বারডোঁর। সে খুব ভোরে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যার পর বা একটু রাতের দিকে রেস্তরাঁয় ফেরে। ধীরে সুস্থে মদ গেলে আর রাক্ষসের মতো খায়। তারপর অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে ঘুম। অবন্তী ফেরে গভীর রাতে বা শেষ রাতে। রজারের নাকের ডাকে তখনো ঘর গমগম করতে থাকে। অবন্তীর এখন আর তাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। রেস্তরাঁর লোক ক্যাব থেকে নামিয়ে দিলে একরকম ঘুমোতে ঘুমোতেই ঘরে এসে ধুপ করে বিছানায় পড়ে। তার খানিক বাদেই হয়তো রজার উঠে নিজের কাজে চলে যায়। অবন্তী টেরও পায় না। কিন্তু রাতে রেস্তরাঁয় এসে রজার যেদিন মদ গেলে না, শুধু খাবার খায়, অবন্তী বুঝতে পারে তার নাচের মেয়াদ সেই রাতে আর বেশি নয়—তাকেও সঙ্গে যেতে হবে, শয্যার দোসর হতে হবে। এমনি করেই দু'দুটো বছর কাটতে চলল।

...একদিন একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে গেল। কি কারণে খুব ভোরে অবন্তীর ঘুম ভেঙে গেল জানে না। খুটখাট শব্দ কানে আসছে। আধ-চোখ বুজেই দেখল রজার কিছু নিয়ে ব্যস্ত। পাশের দেয়ালে স্টিল ফ্রেমের একটা ফোটো টাঙানো থাকে। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সেটা উল্টে একটা স্ক্রু বা প্যাঁচ ঘুরিয়ে রজার ফ্রেমের একটা দিক খুলে কি বার করল। স্টিল সেফটা একটা স্টিল স্ল্যাবের ওপর বসানো। তলার ওটা নিরেট স্টিল বলেই জানত অবন্তী। হাতে কিছু নিয়ে ওটার পিছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রজার। পিছনে ঝালরের মতো ঢাকনা সরিয়ে চাবি লাগিয়ে কিছু খুলল মনে হল। আধা-চোখ বোজা অবস্থাতেই অবন্তী অবাক। সেফের মুখ তো সামনে, তলার স্টিল স্ল্যাবের পিছনে নিচের দিকে খোলার কি আছে? এক মিনিটও নয়, ঠক্ করে কিছু বন্ধ করা আর চাবি দেওয়ার শব্দ। ফিরে আবার টেবিলে এসে ফোটো ফ্রেমের পিছনে হাতের জিনিসটা রেখে রজার ফ্রেমটা আটকে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিল।

অবন্তীর মনে হল, তার বুকের তলায় হাতুড়ি পেটার মতো টিপটপ শব্দ হচ্ছে, সেই শব্দও লোকটার কানে যেতে পারে। মড়ার মতো আড়ষ্ট হয়ে না থেকে গভীর

ঘুমের শ্বাস-প্রশ্বাসটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চাইলো। রজার ফিরেও তাকালো না, একটু বাদে বেরিয়ে গেল। তার ঝরঝরে গাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

অবন্তী উঠে বসল। গরম হাউস-কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারও দরকার ছিল না, কাঁপুনির চোটে ঘামছে মনে হল।

কাঁপা হাতে ফোটো ফ্রেমটা দেয়াল থেকে খুলে আনল। পিছনে ছোট্ট রিং। ঘোরাতেই ফ্রেমের একটা দিক আলগা হয়ে গেল। উল্টে ধরতেই টেবিলে ঠক্ করে একটা চাবি পড়ল...স্ল্যাবের পিছন দিকের ঝালরটা তুলল। না, ওটা নিরেট স্টিল নয়। চাবিটা লাগল। তালা খুলতেই গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

স্তূপে স্তূপে টাকা। তাড়া-তাড়া নোট। ফ্রাঁ নয়, সব ডলারের পাঁজা।

না, এরপর রজার ঘরে থাকলে অবন্তী দু'মাসের মধ্যে দেয়ালের ওই স্টিল ফ্রেমের দিকে বা সেফটার দিকে তাকায়নি পর্যন্ত। মনে হত তাকালেই ধরা পড়ে যাবে। তার অনুপস্থিতিতে অবন্তী এরপর মনে মনে অনেক প্ল্যান করেছে। কিন্তু সাহস করে কোনোটার দিকেই এগোতে পারেনি।

সেদিন সকালে ইয়ানিক এসে গম্ভীর মুখে খবর দিয়ে গেল, প্রস্তুত থাকো, বডি আইডেন্টিফাই করার জন্য পুলিশ যে-কোনো মুহূর্তে তোমাকে নিয়ে যাবে।

অবন্তী হাঁ।—কার বডি আয়ডেন্টিফাই করার জন্য?

—রজার বারডোঁর, আজ ভোর রাতে তার লাশ পাওয়া গেছে, বুলেটে বুক ঝাঁঝরা —পুলিশের ধারণা শত্রুপক্ষের কোনো ড্রাগরিঙের কাজ। আমি যাই, পুলিশ আমাকে এখানে দেখলে হাজার জেরায় পড়ব।

অবন্তীর কি অবাক হবার সময় আছে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার সময় আছে?

ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

সেফের নিচের স্টিল স্ল্যাবের ডালা খুলে হাঁ। ছোট্ট একটা নোটের পাঁজা শুধু পড়ে আছে। বাকি সব হাওয়া।

ভিতরটা প্রথমে হতাশায় ভেঙে পড়ার মতো হল। তারপরেই সচকিত। পাতলা নোটের তাড়াটা নিয়ে দেখল। তিন হাজার দু'শ' ডলারের তাড়া একটা। ওটা লুকোবার জন্য কিছুরই দরকার নেই। বত্রিশখানা একশ' ডলারের নোট। বুকের জামা টেনে ভিতরে ফেলে দিল।

...রেস্তরাঁর নাচিয়ে মেয়েদের লাভার তো থাকেই আর অবন্তী তো ওই রেস্তরাঁর প্রায় দু' বছরের পাকাপোক্ত নাচিয়ে মেয়ে। তাকে নিয়ে পুলিশের কোনোরকম টানা-হেঁচড়াই পড়ল না। রজারের ঘর সার্চ করে পুলিশ কি পেল, অবন্তী তা-ও জানে না। রজারের মৃত্যুর রাত থেকে অবন্তী এই ক'টা দিন ওই রেস্তরাঁরই দোতলার একটা ঘরে আছে। সে যাতে অন্য রেস্তরাঁয় চলে না যায় সেই জন্য ম্যানেজার মোটা টাকার টোপ ফেলে রেখেছে।

অবন্তী বিশ পঁচিশ দিন সময় নিয়ে খুব নিঃশব্দে ফ্রান্স ছাড়ার ব্যবস্থা করল। রাতে নাচে, দিনে বেরোয়। কি করছে কে খবর রাখে। এমনকি ইয়ানিককে কিছু বলেনি। সে মাদামের মতো মিসট্রেসের জন্য জাঁদরেল লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এয়ারপোর্টে ডলার ভাঙাতে অসুবিধে নেই। দু' হাজার ডলার তার বুকে। বাকি বারোশ' থেকে সাতশ' ডলার দিয়ে সস্তার রুটে দিল্লি পর্যন্ত এয়ার প্যাসেজ বুক করেছে। তিনশ' ডলারের টুকিটাকি দরকারি জিনিস কিনেছে। বিশ ডলার দিয়ে একটা বড়সড় নাকের পাথরও কিনেছে। এত সাদা জেল্লা দেখলে মনে হবে অনেক দাম। এতদিনের পুরোনো পোখরাজের থেকেও জেল্লা বেশি। হাতে সম্বল দু' হাজার দু'শ' ডলার।

...দিল্লি ফিরে তারপর কোথায় যাবে, কি করবে? না, এখন না, পরে ভাববে। প্লেন ছাড়ার পরেও একই চিন্তা। কিন্তু না, দিল্লি পৌঁছে তারপর চিন্তা। দিল্লি পৌঁছুলো। একটা সস্তার হোটেলে উঠল। কিন্তু সস্তা হলেও তার মূল পুঁজির তুলনায় কি-বা। ব্যাঙ্ক থেকে দু'হাজার দু'শ ডলার ভাঙিয়ে নিয়েছে। অত হিসেব মাথায় খেলে না, মোট বাইশ হাজার কত টাকা পেয়েছে। খুচরো হাজারখানেক টাকার কিছু বেশি সুটকেসে, বাকি একুশ হাজার টাকা তার বুকে। সুটকেসে রাখার সাহস নেই। ভাগ্যটা যেন খুলেও খুলল না। আরো পঞ্চাশ-ষাট হাজার ডলার বা ছ-সাত লাখ টাকা সঙ্গে থাকতে পারত।

তৃতীয় দিনেই কলকাতার টিকিট কাটল। কোথায় যাবে জানে না। কি করবে জানে না...বন্ধু জয়া মিত্তিরকে বা কোনো চেনা লোককে মুখ দেখানোর ইচ্ছেও নেই। অন্য কোনো ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলে উঠবে। তারপর গানের টিউশনি পেতে চেষ্টা করবে? বা গানের চাকরি? সাত বছর এদেশের গান গায়নি। তবু দিল্লীর হোটেলের একলা ঘরে গানের মহড়া দিয়েছে। আশ্চর্য, গলায় এখনো দিশি সুর আছে, গানও আছে। অনেক ভুল পড়ে গেছে এই যা। কিছু দিনের অভ্যাসের ব্যাপার শুধু। কিন্তু গানের টিউশনি বা গানের চাকরিতে মন ওঠেনি।...কোনরকম সংকোচের বালাই-ই আর নেই। দিল্লীতেও আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছে। আমন্ত্রণের কমতি কোথাও নেই। আর ওর মতো এত রকমের অভিজ্ঞতাই বা ক'জনের। বড় করে আসর সাজিয়ে বসতে পারলে অনেক বড় বড় মানুষ মাথা বিকোতে আসবে।

ট্রেন বেনারস স্টেশনে থেমেছে। সকাল ন'টা। আধঘন্টার স্টপ। মিনিট কুড়ি কেটে গেছে। অলস চোখে স্টেশনের ছবি দেখছিল। হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় যেন হাতুড়ির ঘা বসালো। কলকাতায় কেন? বেনারসে নয় কেন? লক্ষ্ণৌতে নয় কেন? এসব জায়গাই তো কত নামকরা বাইজির পীঠস্থান। হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে লাভ কি?

একটা বিষম তাড়া খেয়েই অবন্তী বেনারসে নেমে পড়ল।

পনেরো বছরের আগের বারাণসী ধামের সঙ্গে আজকের বারাণসীর খুব তফাৎ নেই। পনেরো বছর আগে অবন্তী যে বারাণসীতে পা ফেলেছে, পঞ্চাশ বছর আগে হলেও সে কি দেখত বা কিরকম দেখত কোনো ধারণা নেই। বারাণসী ধাম সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে কল্পনাই সার। এটুকুর ওপর নির্ভর করেই হঠাৎ সে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। তার বন্ধু জয়ার ঠাকুমা-ঠাকুরদা প্রায় প্রতি বছর কাশীতে পুণ্যি করতে আসত। সে সময় জয়াদের বাড়ি গেলে অবন্তীও প্রসাদ পেত। আবার পুণ্যধামের তলায় তলায় বেশ পাপের স্রোতও বয় এমন সহজাত ধারণাও তার মনের তলায় ছিলই। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ার বাই তো ছেলেবেলা থেকে। বি-এ এম-এ পড়ার সময় পর্যন্ত ছিল। কিশোরী বা যুবতী বিধবা মেয়ে কাশীবাসিনী হয়ে বিশ্বনাথের চরণাশ্রিত হবার জন্য এসে লোক-

বাসনার মধ্যমণি হয়ে বসেছে—বাংলা সাহিত্যে এমন গল্প উপন্যাসেরও অভাব ছিল না। কলকাতার সংগীতরসিক বনেদী বড়লোকের বাড়িতে লক্ষ্ণৌ বারানসীর নামী-নামী বাঈজীদের চটকদার অনুষ্ঠানের গল্প নিজের ছেলেবেলাতেও শুনেছে। এরা যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা পেত।

...কিন্তু মুহূর্তের ঝোঁকে নেমে তো পড়ল। এখন এই বারাণসীর খোঁজে সে কোনদিকে পা বাড়াবে, কার কাছে খবর নেবে?

আগের দিনের বারাণসী নেই, আবার আগের দিনের কিছুই মুছেও যায়নি। আগে ধরমশালার লোক যাত্রীর খোঁজে আসত, এখন নতুন নতুন হোটেলের দালালরা আসে। আগে যেমন শাঁসালো তীর্থযাত্রী ধরার জন্য পাণ্ডারা বা তাদের চেলারা আসত, এখনো তার ব্যতিক্রম নেই। আগে ট্রেন থামতে না থামতে আগন্তুকের মালপত্র কুলিদের দখলে চলে যেত, পরে মজুরি নিয়ে বচসা শুরু হয়ে যেত, এখন সে-উপদ্রব আরো বেড়েছে বই কমেনি।

কিন্তু ট্রেন থামার কুড়ি মিনিট পরে নামামাত্র অবন্তী এদেব আর প্ল্যাটফরমের আরো অনেকের একটু স্বতন্ত্র রকমেব দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। চাকা-লাগানো আর লাগামের মতো ফিতে আটা ঢাউস বিদেশী সুটকেস দুটো নিজেই অনায়াসে টেনে নামিয়েছে, তারপর গড়গড় করে সে-দুটো অনায়াসে টেনে একটু ফাঁকায় দাঁড়িয়েছে।

হাত খালি কুলিরাও ছুটে আসেনি, দূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখেছে। অত বড় বিদেশী সুটকেসে চাকা লাগানো দেখেই খটকা লেগেছে এ-রকম মহিলা কুলি নিতে অভ্যস্ত কিনা। কোনো পাণ্ডা বা তাদের চেলারাও কেউ ছুটে আসেনি। পরনে কাগজি-হরিৎ (লেমন ইয়েলো) সিন্থেটিক শাড়ি, পায়ে ফিতে ছাড়া শূয়ের মতো বিদেশী জুতো, চোখে মস্ত ফিকে গগলস, নাকের পাথরে কালো রূপে সাদার জেল্লা...এমন একজন আব যা-ই হোক, কাশীতে পুণ্যির তাগিদে আসেনি। আধুনিক হোটেলের দু-একজন অবাঙালি এজেন্ট অবশ্য ছুটে এলো। হালেব ব্যবসায়ীর সেরা হোটেলের লোক বলে নিজেদের পরিচয় দিল। গরমের সময়, বারাণসী সিজন নয় বলেই কোনো হোটেলে জায়গার অভাব হবে না অবন্তী বুঝেছে। হালের সেরা হোটেল শুনেই একটি কথাও না বলে এগিয়ে চলল। বাইরে এসে একজন আধবয়সী বাঙালি রিকশঅলাকে বাছাই করল। চলতে চলতে তার কাছ থেকেই জেনে নিল শহরের মধ্যে বেশ পুরনো অথচ নাম করা হোটেল কোনটা। লোকটা দুটো হোটেলের নাম করতে অবন্তী জানতে চাইলো কোন হোটেলের ম্যানেজার বাঙালি, তার মধ্যে একটি হোটেল বাপ আর ছেলে চালায়।

অবন্তী রিকশঅলাকে সেই হোটেলেই নিয়ে যেতে বলল।

দোতলায় ছোটর ওপর মোটামুটি ভালো ঘরই পেল একটা। অ্যাটাচড্ বাথ। রুম চার্জ দিনে তিরিশ টাকা। খাওয়া খরচ আলাদা। অবন্তী মনে মনে হিসেব করেছে। আরো কোন না কুড়ি টাকা দিনে লাগবে। তাহলে দিনে পঞ্চাশ টাকা, মানে মাসে দেড় হাজার টাকা। বছরে আঠারো হাজার টাকা। খুচরো বাদ দিলে মোট পুঁজি একুশ হাজার টাকা। মরুকগে, অবন্তীর কোনো প্ল্যানই দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না।

রেজিস্ট্রি খাতায় নাম সই করল, অবন্তী মালহোত্রা।

এ নিয়ে তৃতীয়বার মালহোত্রায় ফিরে এলো সে।

প্রৌঢ় ম্যানেজার ঈষৎ বিস্ময়ে বললেন, কথা শুনে আপনাকে আমি বাঙালি ভেবেছিলাম।

অবন্তী হাসল। —আমি নিজেকে খাঁটি বাঙালি মনে করি।...ঠিকানার ঘরে কি লিখব, আমার তো কোনো ঠিকানা নেই?

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—ফ্রান্স থেকে দিল্লি হয়ে এখানে...টুরিস্ট লিখে দেব?

—দিন। আপনি কতদিন থাকবেন এখানে?

—অনেকদিনও থেকে যেতে পারি, একটু উদ্দেশ্য নিয়েই বেনারসে আসা, ফল পাব বলে মনে হলে আপাতত আছি। হাসল একটু, আশা করি সম্ভব হলে আমাকে একটু সাহায্য করবেন, পরে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব।

ফ্রান্সের আগন্তুক শুনেই ম্যানেজারের বিবেচনায় অবন্তী বিশেষ একজন হয়ে উঠল। আরো দশজনকে বলার মতো পাবলিসিটির ব্যাপার।

বিকেলের দিকে অবন্তী লোক মারফত নয়, নিজে এসে অনুরোধ করল, আপনি সময় পেলে দয়া করে আমার ঘরে একটু আসবেন...আমার সঙ্গেই চা খাবেন।

ম্যানেজারটি অতি ভদ্র, এ ধরনের আপ্যায়নেও অভ্যস্ত নন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনি অতিথি, আমিই চায়ের ব্যবস্থা করছি, আপনি যান, আমি এক্ষুনি আসছি।

ম্যানেজারের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় হৃদ্যতা। নিজের আগ্রহে ফ্রান্সের হোটেল-রেস্তরাঁর গল্প শুনলেন। এর পরের দু'চার কথা থেকে তাঁর মনে হল সম্ভ্রান্ত মহিলাটির এখানকার শিল্প সংস্কৃতির প্রতিই বেশি আগ্রহ। অবন্তী জানালো, এখানকার নামকরা ঘরানার গায়িকাদের সম্পর্কে সে কিছু জানতে চায়। তাঁদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়ের সুযোগ কিভাবে হতে পারে?

ভদ্রলোককে মাথা চুলকে ভাবতে হল। অকপটে স্বীকার করলেন, এ সব খবর তিনি ভালো রাখলেন না...তাহলে শিবু দাসকে খবর দিতে হয়, সে রোজ সন্ধ্যায় এখানে খবরের কাগজ পড়তে আসে।

খবরের কাগজ পড়ার জন্য রোজ হোটেলে আসে শুনে বোঝা গেল অবস্থাপন্ন কেউ নয়। তবু সংযত আগ্রহে অবন্তী তার পরিচয় শুনল। শিবু দাস বলতে শিবলাল দাস। দেশ কটক, ছেলেবেলা থেকে এখানে আছে। বছর তেতাল্লিশ বয়েস, ভালো তবলা বাজায়, অনেক নাম করা গাইয়ে সঙ্গে ছিল কিন্তু নিজের স্বভাবের দোষে কারো সঙ্গে খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। এখন কাশী-বাসীদের মধ্যে সব থেকে নাম করা সংগীত সাধক দয়াল যোশীর আখড়ায় তবলা বাজায়—তেমন ভালো রোজগার নেই।

দয়াল যোশীর নামটা শুনেই অবন্তী উৎসুক একটু। কলকাতার মিউজিক কনফারেন্স-এ দু'বার দয়াল যোশীর গান শুনেছে। সাধকই বটেন। মানুষটি তখনই প্রায় বৃদ্ধ। কিন্তু সভা মাতানো গলা।

সেই সন্ধ্যায় নয়, পরদিন সকালের দিকে ম্যানেজারের ছেলে শিবলাল দাসকে অবন্তীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ফ্রান্স ফেরৎ সঙ্গীত-রসিকতার আমন্ত্রণ পেয়ে একটু সাজসজ্জা করেই এসেছে। ফর্সা পা-জামার ওপর রঙ-চটা পুরনো মটকার পাঞ্জাবি চড়িয়েছে। এই গরমেও গলায় জরিপাড় পাতলা চাদর ঝুলিয়েছে। ঢ্যাঙা রোগা মানুষ,

চোয়ালের হাড় উঁচু বলে চোখ গর্তে মনে হয়। শরীর অনুযায়ী মাথা ছোট। শিল্প জগতের মানুষ ভাবা শক্ত।

শিবু দাসও যেন অপ্রত্যাশিত একজনকেই দেখল। পরিচ্ছন্ন আটপৌরে বেশ-বাসে এমন একটি শ্যামবর্ণা রূপসীকে দেখবে ভাবেনি। তার হাসিমুখের সহজ অভ্যর্থনাটুকুও ভালো না লাগার কারণ নেই। দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, আসুন শিবলালবাবু, কাল ম্যানেজারবাবুর মুখে আপনার তবলার প্রশংসা শুনে আমি পরিচয় করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম...বসুন।

খুশি হলেও শিবু দাসের অবাক মুখ একটু। দুটো বেতের চেয়ারের একটাতে বসল। আমতা আমতা করে বিস্ময়টুকু প্রকাশ করল। —ইয়ে ম্যানেজারবাবু তো তবলার কিছু বোঝে না...

—না বুঝলেও গান বাজনার কথা উঠতে আপনার প্রশংসা তো করলেন।

আপ্যায়নে শিবু দাস আরো খুশি। চা এলো, সঙ্গে কাটলেট সিঙাড়া কেক। নিজের ব্রেকফাস্ট আগেই সারা জানিয়ে অবন্তী এক কাপ চা শুধু নিল।

তারপর তার সঙ্গীত জগতের প্রসঙ্গ বিস্তারের পাশ কাটিয়ে জ্ঞাতব্যটুকু আহরণ করতে সময় লাগল না। যেমন বারাণসী ঘরানার নামটুকুই আছে, নামী নামী শিল্পীরা এখানে ঘর বিশেষ করেন না। ওস্তাদ মহারাজ আর গুণী বাঈরা বেশিরভাগ বাইরেই থাকেন। অনেকের নাম করল। সব থেকে নামীদের মধ্যে একমাত্র দয়াল যোশী মহারাজ এখানে আছেন। তাঁর আখড়া বলতে ছোটখাটো গানের প্রতিষ্ঠানই, মহারাজের সাগরেদরা গুরুর নামে এটি করেছে। কিন্তু যোশী মহারাজের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই, খুব একরোখা মেজাজী আর খেয়ালী মানুষ যোশী মহারাজ, শুদ্ধ রাগ রাগিণীতে এত শস্তা ভেজাল ঢুকছে বলে ভয়ংকর রাগ। অভাবে পড়লেও আখড়ার একটি পয়সা ছোঁন না। পঁচাত্তর বছর বয়স এখন, বেনারস ছেড়ে কোনো কনফারেন্সই যান না, বিশেষ করে দু'বছর আগে স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে রোজগারের কোন চেষ্টাই নেই। এখনো কত বড় বড় লোকের ছেলেমেয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে আসে কিন্তু কেউ বেশি দিন টিকতে পারে না, মেজাজ বিগড়ালো তো ঘাড় ধাক্কা।

অবন্তী সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?

—ইয়ে আমি তাঁর কাছে প্রায় কেউ না...তবে আপনি ফ্রান্স থেকে আসছেন বলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি...কিন্তু কি বলব বলুন তো?

অবন্তী ভাবল একটু। —বলবেন সতের বছর ফ্রান্সে থেকে আমি সেখানকার কিছু শিল্পী দেখেছি। (সুসময়কালে এটা খুব মিথ্যে নয়) নিজের দেশের সঙ্গীত গুরুদের আরো কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে।

এমন উদ্ভট খেয়ালও কারো থাকে, শিবুদাসের সেই বিস্ময়।

গায়িকাদের প্রসঙ্গ তুলতে সে জানালো, এক সময়ে বেশ নাম ছিল এমন একজন আছেন। ঊষা বাঈ। তবে তাঁকে ঠিক অন্যদের মতো সঙ্গীতসাধিকা বলা যায় না। নাচ গান দুইয়েরই বায়না নিয়ে বনেদী বড়লোকদের জলসাটলসায় যেতেন। ও ধরনের অভিজাত মহলে তাঁর খুব কদর ছিল, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, নিজে

আর নাচতে পারেন না—তবে গানের গলা এখনও তাজা। এখানকার পুরনো রইস সমজদারদের কেউ কেউ এখনো তাঁর গান শুনতে আসেন, আবার অন্য লোভেও, মানে...যাক্‌গে—

অবন্তী সোজা তাকালো। —লজ্জা করবেন না আমার সকলের সম্পর্কেই জানার আগ্রহ।

—ক্যা-কেন বলুন তো, আপনি কি এ-জগতের মানুষদের নিয়ে কিছু লিখবেন টিখবেন নাকি?

—কি করব আমি নিজেই জানি না। তারপর নিরীহ গোছের প্রশ্ন, এখানকার পুরোনো রইস সমজদার মানে কি—তাঁরা কারা?

শিবু দাস এবারে অনেকটা নিঃসংকোচ। —রইস সমজদার মানে পয়সাওলা সমজদার—যেমন ধরুন, সূর্য পাণ্ডে, তিনি হলেন এখানকার নাম-ডাকের বেনারসী শাড়ি মার্চেন্টদের একজন, ঊষা বাঈকে তিনি সব থেকে বেশি ব্যাক করতেন, এখনো করেন—

অবন্তীর কালো মুখে খুব সহজ হাসি। —দেখুন, আমি অনেককাল বিদেশে থাকা মেয়ে—ও-সব দেশে অনেক কাণ্ডমাণ্ড দেখেছি...ঊষা বাঈয়ের বয়েস হয়েছে তবু গান ছাড়া অন্য লোভ কি?

শিবু দাস হ্যা-হ্যা করে হাসল একটু। —আপনি এত সহজ করে বলেন যে আর লজ্জা থাকে না। —কথা হল, ঊষা বাঈও বাছাই করা মেয়ে নিয়ে তাদের তালিম দেন, নাচ গান সহবত শেখান, তারা সঙ্গীতসাধিকা নয়, আসলে তারা অভিজাত শ্রেণীর বাঈজি হয়ে ওঠে। ঊষা বাঈ নিজেও বাঈজি ছিলেন। এই সব সুশ্রী মেয়েদের আকর্ষণ তো আছে, তাই বয়েস হলেও বাঈয়ের ওখানে রইস মক্কেলের আনাগোনা আছেই।—বেনারসী শাড়ির মার্চেন্ট লোকটা ভয়ংকর কাঠখোট্টা হলেও শুনেছি গান বাজনার নাকি সত্যিই সমজদার।

—ঊষা বাঈকে একবার দেখা যায়?

—দেখা? প্রায় রোজই খুব ভোরে তিনি কিছু মেয়ে নিয়ে অহল্যাবাঈ ঘাটে স্নান করতে আসেন—

—তা না, দেখা মানে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার কথা বলছি।

—আপনি এমন একজন বিশিষ্ট মহিলা, তাঁর তো খুশি হয়ে আলাপ করা উচিত—

—বেশ, আপনি দয়া করে আগে তাহলে যোশী মহারাজের সঙ্গেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করুন।

ব্যবস্থা দু'দিনের মধ্যেই হল। শিবু দাস আনন্দে আটখানা হয়ে খবরটা দিল। সাত বছর ফ্রান্সে থাকা ভারতীয় মেয়ে দেখা করতে চায় শুনে মহারাজ নাকি অবাক প্রথম। আগামীকাল সকাল সাড়ে-সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

—আপনাকে যখন ধরেছি সহজে ছাড় নেই, আপনি সকাল পাঁচটার মধ্যে আসুন, যেতে কতক্ষণ লাগবে?

—গণেশ মহল্লায় থাকেন, টাঙ্গায় মিনিট কুড়ি লাগবে, কিন্তু সে-সময় উনি তো রেয়াজ করেন। সাড়ে সাতটায় সময় দিয়েছেন।

—তবু আপনি ওই সময়েই আসুন।

অবন্তী এর মধ্যে পাতলা সাদা জমিনের দু'খানা চওড়াপেড়ে শাড়ি আর দুটো ফিকে রঙের ব্লাউস কিনেছে। এক জোড়া চপ্পলও। সাদাসিধে বেশে হোটেলের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো যখন বারাণসীর প্রথম ভোরের রাস্তা একেবারে নির্জন, ফাঁকা। মিনিট দুইয়ের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে শিবু দাস উপস্থিত। দু'জনে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল, এত ভোরে টাঙ্গা চোখে পড়ল না। এখানকার আসল বাহন সাইকেল-রিকশ।

হাত তুলে অবন্তী একটা রিকশ থামিয়ে উঠে বসল। শিবু দাসকে ডাকল, আসুন. সকাল বেলা সদর রাস্তা ধরে যাচ্ছি, লজ্জার কি আছে।

রিকশয় চাপাচাপি একটু হবেই। অবন্তীর মনে হল লোকটা ঘামতে শুরু করেছে।

গেটের সামনে রিকশ থামল। দুদিকে ছোট্ট বাগানের মতো, সামনে খুব পুরনো দালান। ভিতরে এগোতেই গম-গমে সুর-সাধনার গলা কানে এলো। খুব নিঃশব্দে এসে তারা দাওয়ায় উঠল। সামনের ঘরে চাদর বিছানো চৌকি পাতা। চুপচাপ বসল। একটি লোক, চাকরই হবে, এত ভোরে লোক দেখে অবাক-মুখে এগিয়ে আসতে অবন্তীই মুখে একটা আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করল। শিবু দাস উঠে তার কানে কানে বলল, রেয়াজ শেষ হবার আগে মহারাজকে খবর দিতে হবে না।

এ-ঘরেও শোনার তন্ময়তা নেমে এলো। অবন্তী একাগ্র মনোযোগে শুনছে।

কোথা দিয়ে সাতটা বেজে গেল টেরও পেল না। তার তন্ময়তা শিবু দাসেরও বিস্ময়ের কারণ। ঠিক সাতটাতেই বাড়িটা যেন নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে সেই লোকটি এসে তাদের ভিতরে যেতে ইশারা করল।

পুরু পুরনো গালচের ওপর মস্ত তানপুরা শোয়ানো। পাশে দয়াল যোশী সোজা হয়ে বসে। সাদা রেশমের মতো চুল দাড়ি গোঁপ। পিছনে অবন্তী, সামনে শিবু দাস।

—কেয়া, তেরা দিমাগ গড়বড় হো গয়া, সুবে পাঁচ বাজে আয়ে হো?

দু'হাত জোড় করে কাঁপা গলায় শিবু দাস বাংলাতেই কৈফিয়ৎ দিল, আপনার রেয়াজ শোনার জন্য ইনিই চলে এলেন মহারাজ—

মহারাজও এই জবাব আশা করেননি। ভুরুর চুলও সাদা। ঈষৎ ঝুঁকে তাকালেন। ফ্রান্স ফেরত এমন বেশের আর এমন রূপের জেনানাকে আশা করেননি, যে আবার রেয়াজ শোনার জন্য দু' ঘন্টা আগে এসে বসে থাকতে পারে। তেমনি চেয়ে থেকে দু'বার মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ ভিতরে আসতে ইশারা করলেন।

পায়ের স্যাণ্ডাল বাইরের ঘরেই খুলে এসেছিল। পায়ে পায়ে ভিতরে এলো। অবন্তী প্রণামের জন্য একেবারে কাছে এগিয়ে আসার দরুণ ঈষৎ ব্যস্ত হবার ফলে নিজের অগোচরে তাঁর সাদাটে পা দু'খানা সামনে। হাঁটু মুড়ে বসে অবন্তী সেই পায়ের ওপর মাথা রাখতে মহারাজ আরো বিব্রত, কিন্তু মাথা তুলতে অবাক একেবারে।

তাঁর পায়ের ওপর ভাঁজ-করা কয়েকখানা একশ টাকার নোট। গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, এ কিস লিয়ে—কেয়া মতলব?

একটু আগে শিবু দাসকে বাংলা বলতে শুনে অবন্তী খুব নরম গলায় বাংলাতেই জবাব দিল। কিন্তু প্রথমেই যে সম্বোধন করল সাধক-গায়ক অবাক। হাত জোড় করে বলল, বাপুজী, আমার অপরাধ নেবেন না, আসার আগে আমার হঠাৎ কেমন মনে হল,

আপনি এ প্রণামীটুকু গ্রহণ করলে আমার জীবন সার্থক হবে—কলকাতার কনফারেন্সএ দু'বার আপনার গান শোনার ভাগ্য হয়েছে, আপনি এখানে আছেন শুনেই আমি দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, তক্ষুনি মনে হয়েছে দেখা পেলে আপনাকে আমি বাপুজী বলে ডাকব—বাপুজী কি মেয়ের প্রণামী ঠেলে ফেলে দেবেন?

দয়াল যোশী মহারাজ ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ভাঁজ করা নোট ক'টার দিকে তাকালেন একবার। ভারী গলায় প্রশ্ন, এখানে কোতো টাকা আছে?

কথার সুরে অবাঙালীর টান, কিন্তু ভাঙা বা অস্পষ্ট নয়।

দ্বিধাজড়িত গলায় অবন্তী জবাব দিল, খুব সামান্য বাপুজী—

—কোতো? ভারী গলা ঈষৎ অসহিষ্ণু।

—পাঁচশ এক—

অবন্তীর মুখের ওপর থেকে বৃদ্ধের আয়ত দুই চোখ আস্তে ঘুরে দেয়ালের একদিকে স্থির হল। অন্য দু'জনও দেখল সেখানে আদি সঙ্গীত গুরু মহাদেবের সঙ্গীত-রত দুর্লভ ছবি একখানা। যোশী মহারাজ সেদিকে অপলক চেয়ে আছেন। কি এক আশ্চর্য গম্ভীর আবেগে স্তব্ধ যেন।

প্রায় মিনিটখানেক বাদে আত্মস্থ হয়ে অবন্তীর দিকে ফিরলেন। —দাস তো বোলছিল তুমি সাত বরষ ফ্রান্সে ছিলে, সেখানে শিল্পীদের স্টাডি করেছ, ভারতের শিল্পীদেরও স্টাডি করে কিছু লিখবে?

—উনি ভুল বুঝেছেন, সাত বছর বাদে আমি ফ্রান্স থেকেই ফিরছি বটে, কিন্তু আমি কলকাতার মেয়ে, কলকাতা থেকেই মিউজিক নিয়ে এম-এ পাশ করেছিলাম—গান ভালবাসি, এখানে আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি।

আবার গম্ভীর একটু। —কিন্তু আমি তো কাউকে তালিম দিই না।

অবন্তী হাসল। —এটুকু শুধুই মেয়ের প্রণামী বাপুজী...বেনারসে আমি সাত দিন থাকব কি সাত মাস নিজেই জানি না, সে ক'দিন আপনার কাছে একটু আধটু আসার অনুমতি দেবেন...যখন চলে যাব ভাবব, এখানে এসে মনে রাখার মতো একজন বাপু পেয়ে গেলাম।

মুখ শুধু নয়, বৃদ্ধের ভারী গলাও কোমল। —কি নাম তোমার মায়ি?

—অবন্তী মালহোত্রা।

দেয়ালের সেই ফোটোর দিকে তাকালেন আবার। তারপর পাশেই ঝুঁকে বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বার করলেন। —তুমি হিন্দী পড়তে পারো মায়ী?

অবন্তী একটু বিব্রত মুখে মাথা নাড়ল। পারে না।

—এই চিঠি আমার স্ত্রীর খুব পেয়ারের পরিচারিকার। এক বয়সী, ত্রিশ বরষ স্ত্রীর সেবা করেছিল। স্ত্রীর ইনতেকাল হোতে সে-ও অসুস্থ হয়ে দেশে চলে গেছল। ...দেশ থেকে কাল তার এই চিঠি এসেছে। লিখেছে বুকের কি অসুখ হয়েছে, চিকিৎসার জন্য পানশ টাকা খুব দোরকার। আমার হাত এখোন খালি, খুব জরুরী না হোলে টাকার জন্য লিখত না...ভাবছিলাম আখড়ার পাঠ্‌ঠেগুলোর কাছে হাত পাততে হবে—আর আজ সোকালে বিশ্বনাথজিউর খেল দেখলাম...।

ভাঁজ করা টাকা ক'টা নিয়ে কপালে ঠেকালেন। —মেয়ের প্রণামী বাপুজী নিল মায়ি।

অবন্তীর গায়ে কাঁটা-কাঁটা দিয়ে উঠল।

—তোমার বিয়ে হয়েছে মায়ি?

ক্ষুদ্র জবাব দিল, হয়েছিল।

থমকালেন।...ফ্রান্সে স্বামীর সঙ্গে ছিলে?

অবন্তী সামান্য মাথা নেড়ে জবাব দিল, বছর পাঁচেক।

—তারপর?

—টেকে নি।

মুখখানা বিরস দেখালো। অল্প অল্প মাথা নাড়লেন। —শিউজি কেন যে এমন ভুল করান...। যাক, সময় তো যায় নি, স্বজাতে পসন্দ মতো আবার বিয়ে কয়ো—তোমার ভালো হবে।

ভুল বুঝেছেন জেনেও অবন্তী আর কিছু বলল না।

তিনি যখন খুশি আসতে বলে দিয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে অবন্তী একলা চার দিনই খুব ভোরে গেছে। কান পেতে রেয়াজ শুনেছে। তার মধ্যে দু'দিন মহারাজের সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছে। এ-জন্যে পরে অনুযোগ শুনতে হয়েছে।

এদিকে নিজের সাধনার তৃষ্ণা বেড়েছে। দয়াল যোশীর চেলাদের আখড়া তাঁর বাড়ি থেকে দূরে। বেলায় ফাঁকা থাকে। শিবু দাসকে ধরে সে সময় দু' আড়াই ঘণ্টা করে রেয়াজের ব্যবস্থা করেছে। শিবু দাস ভারী খুশি। সে সঙ্গে থাকে। দরকার মতো তবলা সঙ্গত করে। অবন্তী বলেছে, যা পারে তাকে দেবে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে যোশী মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। এত নিষ্ঠা দেখে তিনি অনেক দিন তানপুরা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, একটু কিছু সুর টানো, গলা দেখি তোমার—

দু' সপ্তাহ অবন্তী সাহস করে নি। তৃতীয় সপ্তাহে তানপুরা নিল। কয়েকটা সুরের রাগের কিছু কিছু শোনালো। খুব মন দিয়ে শুনে মহারাজ মন্তব্য করলেন, বহুত মিঠটি দর্দভরি আওয়াজ, গলার জোয়ারিও আচ্ছা—কিন্তু তালিম দরকার।...কতদিন আছ তুমি, তাহলে যতটুকু পারি করে দিতাম।

অবন্তী হেসে জবাব দিয়েছে, জানি না। তবে আপনার জন্যেই বেনারস ভালো লাগছে।...কিন্তু একটা কথা, ছেলে না থাকলে মেয়েই ছেলে, কিছুকাল থেকেই যদি যাই, আপনার সব প্রয়োজনে আমাকে ছেলের মতো পাশে থাকতে দিতে হবে—কেবল গান শেখার সময় আমি বাপুজীর মেয়ে।

বাপুজী দয়াল যোশীর মুখে হা-হা হাসি। ইঙ্গিত বুঝেছেন।

এই সময়ের মধ্যেই অবন্তী আর একটি কাজ করে বসে আছে যা শিবু দাসও জানে না। দয়াল যোশী মহারাজের সঙ্গে এমন বিচিত্র যোগাযোগের দু'দিনের মধ্যেই শিবু দাস অবন্তীকে জিগ্যেস করেছিল এবারে উষা বাঈয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করবে কিনা। অবন্তী শুধু বলেছিল, যাক কিছু দিন।

শিবু দাস তখন ভেবেছিল অতবড় সাধকের মন জয় করার পর উষা বাঈয়ের

এই মহিলার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অবন্তী খুব ভোরে উঠে সাইকেল রিকশা নিয়ে অহল্যাবাঈ ঘাটে গেছে। প্রথম দিন দেখা পায়নি। দ্বিতীয় দিন প্রায় রাত থাকতে এসেছে। মেয়েদের ঘাট থেকে স্নান সেরে আব্রুর ওধার থেকে ভিজে কাপড় বদলে একজন বয়স্কার সঙ্গে চার পাঁচটি মেয়ে উঠে আসছে। তাঁদের স্নানের সময় অবন্তী ঘাটেরই এক নিম্নশ্রেণী প্রৌঢ়াকে জিগ্যেস করেছিল, উনি ঊষাবাঈ কিনা। বিধবা প্রৌঢ়া চাপা বিরক্তিতে বলে উঠেছিল, আর কে—অযাত্রা!

অবন্তী সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়েছিল। উঠে আসতে আসতে দলটি অবন্তীকে দেখল। অবন্তী ঊষা বাঈয়ের দিকেই চেয়ে আছে। বছর পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে বয়েস, তনুশ্রী একটু মোটার দিক ঘেঁষেছে। বয়েসকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায়। মিলের মধ্যে তার নাকেও বড়সড় একটা দামী পাথর—কিন্তু সেটা টকটকে লাল। বোধহয় চুনী। উনিও তার দিকেই চেয়ে উঠে আসছিলেন। তাঁর এ-পাশের ও-পাশের মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করতে করতে আসছে।

কিন্তু শেষ ধাপে উঠে সকলেই একটু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঊষা বাঈও। কালো রূপসী মেয়ে পায়ে পায়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। এলো। হাত দুটি যুক্ত করে শ্রদ্ধা সহকারে মাথা অনেকটা নুইয়ে প্রণাম জানালো।

মুখ তুলতে বিস্ময় কাটিয়ে ঊষা বাঈ জিগ্যেস করলেন, আপ কওন বহিনজী—?

এ ক'দিনে অবন্তী মোটামুটি লক্ষ্য করেছে, মুখে অবাঙালীরা সকলে বাংলা ভালো বলতে না পারলেও মোটামুটি বোঝে সকলেই।

একটু হেসে সবিনয়ে জবাব দিল, বোন বললেন যখন একটি বোনই ধরে নিন। আবার নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় গিয়ে রিকশায় উঠল। যেন দেবী দর্শনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, দর্শন সেরে ফিরে চলল।

ঊষা বাঈ সহ সকলেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে রইলো।

সাইকেল রিকশ হোটেলে ফিরে চলল।

এই নাটকীয় ব্যাপারটি সে করেছিল দয়াল যোশী মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগের এক সপ্তাহের মধ্যে। এরও প্রায় মাসখানেক বাদে শিবু দাসকে বলল, এবারে আপনি ঊষা বাঈয়ের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দিন।

মেজাজী আর খেয়ালী যোশী মহারাজকে এ-ভাবে বশ করতে পারার ফলে শিবু দাস এখন তাকে একজন মহীয়সী মহিলা ভাবে।

—কবে?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঊষা বাই বাপুজী মহারাজকে চেনেন নিশ্চয়?

—তাঁকে আর সঙ্গীত জগতে না চেনে কে?

—আর বাপুজী মহারাজ ঊষা বাঈকে চেনেন?

—ছোঃ। ওঁর মতো মানুষ এদের নামও শুনেছেন কিনা সন্দেহ।

—ঠিক আছে, আমার প্রসঙ্গে বলার সময় ঊষা বাঈকে এ-ও জানিয়ে দেবেন, ফ্রান্স থেকে এসে আমি দয়াল যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছি, আর কথায় কথায় আরো জানাতে পারেন, শুধু ফ্রান্স নয়, ইংল্যাণ্ড সুইজারল্যাণ্ড হল্যাণ্ড ডেনমার্ক ওয়েস্ট জার্মানির শিল্পীদের সঙ্গেও আমি যোগাযোগ করেছি।

সেই বিকেলেই শিবু দাস অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হোটেলে ফিরল। অবন্তী প্রশংসা করল, আপনি খুব কাজের মানুষ—

—আমার কোনো কেরামতি নেই। আপনার পরিচয় শুনেই মহিলা হাঁ।

বিকেলে শিবু দাসই গাইড। অবন্তীর হাতে ক্টা বাদামী রঙের সুন্দর বিদেশী ভি আই পি ব্যাগ। কি ভেবে পার্সে আরো একশ এক টাকা পুরে নিল।

টাঙ্গায় প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগল। অহল্যাবাঈ ঘাট ছাড়িয়ে বেশ একটু দূরেই বাড়ি। এ-দিকে জনবসতি অপেক্ষাকৃত কম। বেশ বড়সড় একটা পুরানো দোতলা বাড়ির সামনে টাঙ্গা দাঁড়ালো। গলা চেপে শিবু দাস জানান দিল, লোকে বলে এই বাড়িও বেনারসী সিল্ক মারচেন্ট সূর্য পাণ্ডের দান।

অবন্তী ভিতরে ঢুকতেই এক তলার কিছু তরুণী আর কিশোরী মেয়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। এমন একজন আসছে কেউ ভাবেনি। এদের কেউ কেউ যে এই কালো রূপসীকে পঁচিশ ছাব্বিশ দিন আগে ভোরের স্নানের সময় অহল্যাবাঈ ঘাটে দেখেছে! তার আচরণও বিচিত্র মনে হয়েছিল—।

তাদের দু'জন ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যথাস্থানে খবর দিতে গেল।

অবন্তীকে দোতলা থেকে দেখে ঊষা বাঈয়ের মুখেরও একই অবস্থা। বাঈজির ঘরে আপ্যায়নের ত্রুটি হলে কলঙ্ক। সিঁড়ির মেয়েদের পাশ কাটিয়ে নিজেই দ্রুত নেমে এলেন। একসঙ্গে অবন্তীর দুই হাত ধরে বলে উঠলেন, তুমি বহিনজি?

অবন্তী চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল, ছোট বোনকে আমরা বহিনজী বলি না দিদি, শুধু বহিন। ঘুরে তাকালো। —আচ্ছা দাসবাবু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি একলা হোটেলে চলে যেতে পারব।

শিবু দাস ব্যস্তসমস্ত নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। ঊষা বাঈ হাত ধরে অবন্তীকে সাদরে দোতলায় এনে সামনের বড় হল ঘরে বসালেন। ঘরের কোণে কোণে নানারকম বাজনার সরঞ্জাম। ঝকঝকে মেঝের একদিকে বিশাল গদির ওপর ধপধপে ফরাস পাতা। তার ওপর অনেকগুলো মখমলের তাকিয়া। মাথার ওপর বেশ কয়েকটা ছোট বড় ঝাড় বাতি। কোণে কোণে কিছু গদি আঁটা চেয়ারও আছে। দুটি মেয়ে দুটো চেয়ার নিয়ে এলো। অন্যরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

ঊষা বাঈ হাত ধরে বসাতে যেতে অবন্তী বলল, দাঁড়ান আগে ছোট বোনের কর্তব্য সারি—

হাতের পার্সটা খুলে আলাদা ভাঁজ করা একশ এক টাকা নিয়ে দুহাত জুড়ে মাথা নীচু করে প্রণাম জানালো, তারপর ঊষা বাঈয়ের একটা হাত টেনে নিয়ে টাকাটা গুঁজে দিল।

ঊষা বাঈ অবাক। —এ কেন?

—গুরুজনের কাছে এলে প্রণামী দিতে হয়, তাছাড়া আপনার সময়ও নষ্ট করছি...

—না, না, ব্যস্ত হয়ে টাকা ফেরত দিতে চেষ্টা করলেন, তুমি এসেছ আমার গরিবখানা ধন্য হয়েছে—

অবন্তী বলল, টাকা ফেরত দিতে চাইলে বুঝব আপনার বোন পছন্দ হয়নি—

খুশি মুখেই টাকাটা আঁচলে বাঁধলেন। চেয়ারে বসে অবন্তী মেয়েদের দিকে তাকালো।

দু হাত তুলে একসঙ্গে সকলকে কাছে ডাকল। —তোমরা দিদিজির কাছে নাচ গান শেখো?

তারা মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

অন্তরঙ্গ হাসি মুখে অবন্তী বলল, আমি কিন্তু তোমাদের নাচ গানও একটু একটু জানি আবার বিদেশী মজাদার নাচ গানও কিছু জানি—আচ্ছা তোমাদের কেমন লাগে দ্যাখো।

উঠে ভি আই পি ব্যাগটা খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করল। ব্যাগটা ফরাসের গদিতে ফেলে আর বসল না। মেয়েরা উন্মুখ। পনেরো মিনিট না যেতে এমন অন্তরঙ্গ হতে কাউকে দেখে না।

ফ্রান্সে থাকতে নিজের বুদ্ধিতেই অবন্তী দর্শককে বেশি আনন্দ দেবার একটা ফিকির বার করেছিল। ওদের চটকদার গানগুলোর পাশে বাংলা অনুবাদ করে রাখত। নাচতে আর গাইতে নেমে অনেক সময়েই আগে বাংলা বয়ানে ওদের সুরে গানটা শেষ করত, তাদের ভালো লাগত কিন্তু না বুঝে হাঁ করে থাকত। সেই গানই ফের আবার যখন ফরাসী বয়ানে গাইতো, দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হত।

তেমনি একটা গান বার করে এখানে অবন্তী প্রথমে ফরাসী ভাষায় অল্প অল্প নাচের ঢঙে গাইতে শুরু করে দিল। গান এগোতে সাদা-মাটা শাড়ি-পরা মেয়ের নাচের ঢং আরো একটু একটু স্বতঃস্ফূর্ত হতে লাগল। দেহ-সম্পদের কিছুটা তাইতেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। স্থির যৌবনে বেশ একটু দোলানো ঢেউ উঠে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। গান শেষ হতে মেয়েরা না বুঝেও মুগ্ধ। শেষ হতেই একই সুরে বাংলা তর্জমা গান শুরু করতে মেয়েরাও নিজেদের অগোচরে একটু একটু দুলতে লাগল—আর তাতেই আনন্দ পেয়ে অবন্তীর তালে তালে হাত-তালি আর নাচের উচ্ছ্বলতা আরো একটু বেড়ে গেল। গাইছে আবার হাসছেও খুব, ছোট মেয়েদের মজার খোরাক জোগাচ্ছে যেন। ঊষা বাঈয়ের অভিজ্ঞ দু'চোখ অনেক কিছু যাচাই করে নিচ্ছে। এই কালো রূপসীর যতটুকু প্রকাশ তার থেকে ঢের বেশি সম্পদ গোপন।

শেষ হতে অবন্তী ধুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে কোমর থেকে রুমাল টেনে হাসি মুখ মুছতে লাগল। মেয়েরা এমনকি ঊষা বাঈও হাত তালি দিয়ে তারিফ করল। তারপর কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ফ্রান্সের অনেক লোকের সামনে এ-রকম নাচ গান করেছ?

তেমনি নিচু গলায় ঠোঁট টিপে হেসে অবন্তী জবাব দিল, এ তো ভদ্র, এর থেকে ঢের কুৎসিত নাচ গান করতে হয়েছে। বলছি, আগে এদের যেতে বলুন।

চোখের ইশারায় তারা চলে যেতে অবন্তী আবার উঠে বিদেশী ভি আই পি ব্যাগটা তুলে নিয়ে এলো। —কি কুৎসিত টেস্ট ও-দেশগুলোর, আপনার ঘেন্না ধরে যাবে। অ্যালবাম বার করে খুলে সামনে ধরল।

অ্যালবামে শুধুই অবন্তীর নাচ আর গানের ছবি। নগ্ন নয় বটে, কিন্তু রক্ত গরম হয়ে ওঠার মতোই নানা ছাঁদের বেশ-বাস। হাতে হাত-মাইক। সামনে দর্শকদের উল্লাস।

একাগ্র চোখে ঊষা বাঈ সব ক'টা রঙিন ছবি দেখে নিলেন। চোখে মুখে বিস্ময় ধরে না।

—ও-সব দেশে তুমি এই নাচ গান করতে কেন?

অবন্তী হাসতে লাগল। জবাব দিল না। অ্যালবাম ব্যাগে পুরে ওটা গদির ওপর ছুঁড়ে ফেলল। —আগে বলুন দিদিজি ছোট বোনকে পছন্দ হল কি না?

হঠাৎ মুখে ম্লান ছায়া পড়তে দেখল অবন্তী। চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে উষা বাঈ বললেন, আমার একটি ছোট বোন ছিল, দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তোমার থেকে বড় অবশ্য, আমার থেকে দশ এগারো বছরের ছোট ছিল, বেঁচে থাকলে এখন চৌতিরিশ পঁয়তিরিশ হত, আটাশ বছর বয়সে বারাণসীর গঙ্গায় ডুবে মরে গেল। সেও আমাকে দিদিজি বলে ডাকত।

এ-রকম শুনে অবন্তীর সত্যি একটু দুঃখ হল। বলল, কি আফসোসের কথা...।

--যাক তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, তুমি কত দেশ ঘুরেছ, কত গুণ, কিন্তু এখানে এসে আমাকে দেখার কি আছে?

অবন্তী চেয়ে রইলো। ঠোঁটে হাসির আভাস। --আপনার কথা শুনেই এসেছি, আপনার গুণ আর সম্মান আমার কাছে কম নয়...বোনকে পছন্দ হলে আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার শিক্ষা আশা করতে পাবি না? অবশ্য তার বদলে আমার যতটুকু সাধ্য আমিও করব।

এ-বকম প্রস্তাব অকল্পিত। উষা বাঈ হাঁ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপব বললেন, কিন্তু তুমি তো শুনেছি যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছ?

—ঠিক শুনেছেন। সেটা আমার সাধনার দিক, আর এ-দিকটা আমাব কিছুটা সখের আর অনেকটাই পেশার দিক হতে পারে।

উষা বাঈয়ের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবাব উপক্রম, আমাদের এ পেশায় আসতে তোমাব দ্বিধা নেই?

অবন্তী অবাক যেন একটু, দ্বিধা কিসের, নাচ গান বাজনা তো আমাব প্রাণ, আগের দিনের নামী বাঈদের তো কম আভিজাত্য ছিল না, তাঁদের আসরে কত সমজদার আসত, আবাব তাঁরাও কত বড় বড় জায়গা থেকে সাদর আমন্ত্রণ পেতেন। এ-ধরনের আসরে শুদ্ধ খেয়ালেব সমজদার আজকাল হয়তো কিছু কমে গেছে, কিন্তু আমি আপনার মেয়েদের ঠুংরি ভজন-টজন শেখাতে পারি আর আপনি চাইলে নিজেও গাইতে পাবি—

উষা বাঈয়ের বোয়াল মাছের মতোই টোপ গিলতে ইচ্ছে করছে। দেশ-বিদেশে ঘোরা এমন এক বিদুষী মেয়েকে নিজের হেপাজতে পেলে তাঁর এই মাঝ-বয়সের কালটা আরো নির্বিঘ্নে ভবিষ্যতের দিকে গড়াতে পারে।...গঙ্গার ঘাটে এই মেয়ের সহজ অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণে তিনি অবাক হয়েছিলেন। আর এই একদিনেই মেয়েটাকে তাঁর বেশ ভালো লাগছে। তবু তিনি চতুর যেমন সাবধানীও তেমনি। যদিও যোশী মহারাজের কাছে তালিম নিচ্ছে এটুকুই এ-মেয়ের সততা আর নিষ্ঠার সব থেকে বড় সার্টিফিকেট।

জিগ্যেস করলেন, আমার মেয়েদের তুমি ওই বিদেশী নাচ গান শেখাতে রাজি আছ?

হেসে জবাব দিল, আমি ও-দেশে নাচ গানের নরক দেখেছি, অতদূর পর্যন্ত আপনি ওদের টেনে নিয়ে যাবেন কেন...এদেশে যেটুকু রয়-সয় সে-পর্যন্ত শেখাতে পারি।

উষা বাঈ ওদের নিয়ে আর কথা বাড়ালেন না। ভবিষ্যৎ তো তাঁর হাতে। জিগ্যেস

করলেন, আর তোমার আসরেও একটু বৈচিত্র্যের জন্য বিদেশী নাচ গান করতে তোমার আপত্তি নেই?

অবন্তী হেসে ফেলল, আমার বেলাতেও তাই, আপনি হুকুম করলে বিশিষ্ট সভায় কুৎসিত দিকটা বাদ দিয়ে যতটুকু সম্ভব করব না কেন? আরো হেসে উঠল, সুন্দর দাঁত আর নাকের পাথর ঝলসে উঠল। বলল, তবে আমি নতুন এখানে, কারো অসংযত লোভের উৎপাত থেকে আমাকে রক্ষা করার ষোল আনা দায়িত্ব আপনার।

উষা বাঈ থমকালেন। তারপরেই হাসলেন। —এ দু'বোনের ঘরোয়া আলোচনা ভাবো, ধরো...সেরকম কেউ যদি লোভের টোপ ফেলে এগিয়ে আসতে চায়...তোমাকে মনে ধরে?

—আপনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন, দরকার হলে আমার সাহায্য নেবেন। বলতে বলতে খিলখিল হাসি। —আর যদি আমারও তাকে মনে ধরে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

উষা বাঈ বলে উঠলেন, সে রকম হলে আমার তো দু'দিকই গেল, তোমাকেও খোয়ালাম আর—

—শুনুন, কালো মুখের হাসিটুকু উবে গেল, চোখে চোখ, স্থির গম্ভীর। —নিজের সখে আর ইচ্ছেয় আপনার কাছে এসেছি, ভালো না লাগলে আপনি আমাকে একদিনও ধরে রাখতে পারবেন না। কিন্তু আপনি আমাকে বোন বলেছেন, আপনাকে আমি দিদিজি বলেছি, তবু যদি আপনার মনে হয় কোনদিন আমি আপনার সঙ্গে বেইমানি করতে পারি, তাহলে আমাদের এই একদিনের সম্পর্কটুকুই থাকুক, আপনি আমাকে ছেঁটে দিন—

উষা বাঈ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ঠিক আছে ঠিক আছে বোন, আর আমি এমন কথা মুখেও আনব না। সত্যি তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে—তোমার আসরে যে টাকা আসবে তার অর্ধেক তোমার, অর্ধেক আমার—রাজি?

—খুব। হাসল, আপনি তো ইচ্ছে করলে আমাকে অন্য দিক থেকেও একটু সাহায্য করতে পারেন—আপনার এখানে অনেক বড় বড় বিজনেসম্যানও আসেন নিশ্চয়, একটা ভালো চাকরিও তো আমাকে জুটিয়ে দিতে পারেন।

উষা বাঈয়ের মাথায় ঢুকল না। —কি চাকরি?

—আর কিছু না হোক প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ ভালোই পারব।

—ও...তুমি তো এম-এ পাশ শুনেছি। এসব ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই, সব বড় বিজনেস-ম্যানদের প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকে?

—বিদেশে তো থাকেই, এ-দেশেও থাকে।

—তাঁদের কি করতে হয়?

অবন্তী হাসল, ভালো প্রাইভেট সেক্রেটারি হতে হলে এমপ্লয়ারের মন বুঝে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয়।

উষা বাঈয়ের চকিতে কিছু মাথায় এলো বোধহয়। ঈষৎ উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি দিয়ে নিয়ে গিয়ে কেউ যদি তোমাকে আটকে ফেলে, ইয়ে, বুঝতেই পারছ আমি কী বলছি?

এবারে একটু শব্দ করেই হেসে ফেলল অবন্তী। —খুব বুঝতে পারছি, কিন্তু এ

তো আর মগের মুলুক নয় যে আমি না চাইলেও জোর করে আটকাবে। তবে অনেক মেয়ে প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে ঢুকে নিজের স্বার্থেই মালিকের হৃদয়েশ্বরী হয়ে বসে... সে-রকম হলেও আপনার লাভ বই লোকসানের কি আছে?

সাত

হোটেল ছেড়ে অবন্তী পরদিন সকাল দশটার মধ্যেই ঊষা বাঈয়ের কাছে চলে এসেছে। হোটেলের ম্যানেজার বুঝেছেন অন্য বোর্ডারের মতোই মেয়াদ ফুরোতে হোটেল ছেড়ে চলল। গত সন্ধ্যায়ও শিবু দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, সে-ও জানে না পরদিন এসে আর তাকে এখানে দেখবে না।

দোতলায় একটা পছন্দ মতোই নিরিবিলি ঘর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন ঊষা বাঈ। ঘরের সরঞ্জামের মধ্যে একটা ছোট খাট, একটা ছোট লেখার টেবিল আর একটা মাত্র চেয়ার। নিজস্ব নিরিবিলি সাধনার জন্য অবন্তী পছন্দসই একটা তানপুরা কেবল বেছে নিয়েছে।

ঊষা বাঈয়ের কাছে একদিকে ছোট বোন, অন্যদিকে পরম সমাদরের অতিথির মতোই অভ্যর্থনা তার। দিন তিনেকের মধ্যেই তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, গণ্যমান্য অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অবন্তীরই একটা বিশেষ আসরের ব্যবস্থা কবে করা হবে। ...আর সাধারণ গান বাজনার পর সেই আসরে বিদেশী নাচ গান একটু তাকে করতেই হবে। অবন্তী জানিয়েছে তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। একটু প্র্যাকটিস করতে হবে। আলাদা রকমের ড্রেস দরকার, কারণ ও-দেশের ওই সব কুৎসিত ড্রেস সে ফেলে এসেছে। সে-রকম না হলেও অন্যরকম ড্রেস কিছু বানাতে হবে। আর দুই একটা বাজনাও দরকার।

ঊষা বাঈ সেইদিনই তার পরিচিত দরজিকে তলব করেছেন। দরজা বন্ধ করে অবন্তী কি-রকম ড্রেসের ব্যবস্থা করেছে তিনি জানেন না। কেবল অনুরোধ করেছিলেন, একেবারে নিরামিষ ড্রেস বানিও না তা বলে ইয়ে, বুঝতেই তো পারছ—

অবন্তী হেসেছে।

তিন দিনের মধ্যেই সে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। বলেছে, আমাকে তোমার সেই হারানো বোনই ভাবতে চেষ্টা করো দিদিজি, ভাবো গঙ্গা মা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

পনেরো দিন পরের এক সন্ধ্যায় অবন্তী মালহোত্রার আসর। এর মধ্যে খুব নিঃশব্দে বিরাট প্রচারের কাজ করে রেখেছেন ঊষা বাঈ। অন্য বাঈজিদের কাছে যে-সব পয়সাঅলা রসিকদের আনা-গোনা তাদের খবরও তিনি রাখেন। যোগাযোগের জন্য নিজের দু'টি পুরনো চৌকস দালাল আছে তাঁর। সেই সব ধনী রসিকরা জেনেছে অর্ধেক পৃথিবী মাত-করা এক শিল্পী এসে যোগ দিয়েছে ঊষা বাঈয়ের সঙ্গে। তারই প্রথম আসরে সকলের নিমন্ত্রণ।

অতবড় হল-এ অন্তত পঞ্চাশ জন অতিথি এসেছে। ঊষা বাঈ হাত ধরে অবন্তীকে আসরে নিয়ে এলেন। প্রথমে সকলের চোখ যেন একটু ধাক্কা খেল। গায়ের কালো রংটাই আগে চোখে পড়েছে। কাছে এসে সকলের উদ্দেশে আনত প্রণাম জানিয়ে অবন্তী সোজা

হবার পর আবার ধোঁকা খেয়েছে। অত কালো সত্ত্বেও একটু বিচিত্র রকমের যেন। পরনে অফ-হোয়াইট দামী শাড়ি, গায়ে ম্যাচ করা ব্লাউস। ডান হাতে সোনার চেনের ঘড়ি ছাড়া হাতে আর কোনো গয়না নেই। সব গয়নার অভাব যেন নাকের জ্বলজ্বলে সাদা পাথরটা পুষিয়ে দিয়েছে। দু'কানে সাদা পাথরের ফুল। যৌবনসম্ভার পলকে চোখ পড়ে।

শেখানো মতো তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েই ঊষা বাঈ সরে গেছেন। পরেরটুকু দেখে আর শুনে তারও চোখ বড়বড়। অবন্তী একটা ছোট্ট হাত-মাইকের ব্যবস্থা রাখতে বলেছিল কেন জানে না। ইলেকট্রিশিয়ান আনিয়ে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

আনত অভিনন্দন জানিয়ে অবন্তী মাইকটা হাতে নিল। তারপর পরিষ্কার ইংরেজিতে গড়গড় করে বলে গেল, মোস্ট ওয়েলকাম অ্যাণ্ড গুড্ ইভনিং জেন্টলমেন! আমি অবন্তী মালহোত্রা। আমার ধারণা মাননীয় অতিথিদের অনেকে বাঙালী এবং অনেকে অবাঙালী। আমি নিজেও অবাঙালী কিন্তু চিন্তায় ধ্যানে জ্ঞানে শিক্ষায় আমি সম্পূর্ণ বাঙালী। এখানে সকলের বোঝার মতো আমার হিন্দী ভাষার দৌড় কেবল গান পর্যন্ত, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে সকলের বোঝার জন্য আমি ইংরেজির আশ্রয় নিয়েছি। ...কিন্তু যদি এমন হয়, মাননীয় অতিথিরা সবাই বাংলা বোঝেন তাহলে সানন্দে নিজের ভাষার মাধ্যমে নিজেকে আমি উপস্থিত করতে পারি—

যে চমকটুকু দিতে চেয়েছিল তা সার্থক। রসের আসরে এসে অভ্যাগতরা কালো রূপসীর মুখে (রূপসী স্বীকার করতে কারো দ্বিধা নেই) অনায়াস ইংরেজি সম্ভাষণ শুনে হকচকিয়ে গেছল। যারা এসেছে তাদের মধ্যে বাঙালী অবশ্যই আছে, হিন্দুস্থানী বা ইউ পি'র লোক তো আছেই। বেশির ভাগের পক্ষেই ইংরেজির থেকে বাংলা বুঝতেই সুবিধে সেটা অবন্তীও জানত। আসর থেকে মিলিত গলায় বাংলায় বলার অনুরোধ এলো— জানালো সকলেই এখানে বাংলা বোঝে।

—ধন্যবাদ। স্মিত মুখে অবন্তী মুখের কাছে আবার ছোট মাইক ধরল। —আমার শ্রদ্ধেয়া ঊষা দিদিজি গোড়াতেই আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে রেখেছেন আজকের এই অনুষ্ঠান নাকি বিশেষ করে আমারই। এ-রকম সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনাদের মতো মাননীয় সঙ্গীত রসজ্ঞদের সদয় উপস্থিতির ফলে আমি উৎসাহিত এবং সম্মানিত।

ঊষা বাঈ এবার এগিয়ে এসে তার হাত ধরে অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলেন। তাঁর ভাষায় অতিথিরা সাধারণ কেউ নয়, সকলের পরিচয়ই বিশেষণে উজ্জ্বল। রাজা আর নবাব খেতাবের লোক আছে, দু-তিনজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীও আছে, তবে ব্যবসায়ের মানুষই বেশি। এখানকার বড় ব্যবসা বলতে রেশমী বেনারসী শাড়ি, কিংখাবের কাজ, সোনারূপার তার ও বিদরির কাজ, অলঙ্কৃত পিতলের সামগ্রী, গালার কাজকরা কাঠের খেলনা—এ-সব বাণিজ্যের শিল্প-পতিরা সাধারণ অবস্থার মানুষ কেউই নয়। এরা যথার্থই সঙ্গীতরসিক কি রমণী সম্ভোগ-রসিক সেটা স্বতন্ত্র কথা। এদের মধ্যে একটা নাম এবং সেই নামের মুখের দিকে কেবল অবন্তীর চোখ আটকালো। নামটা শিবু দাসের মুখে ইঙ্গিত-বহ রকমের শোনা।

ঊষা বাঈ একটু বাড়তি সম্ভ্রমের সুরে পরিচয় দিলেন, ইনি বেনারসী সিল্ক মার্চেন্ট মিস্টার সূর্য পাণ্ডে...এ লাইনের ফেমাস বিজনেস ম্যাগনেট।

অবন্তীর আয়ত কালো চোখ ওই মুখের ওপর স্থির কয়েক নিমেষ। ...স্বাস্থ্যবান পুরুষ, বছর আটচল্লিশ বয়স, পরনে জরিপাড় ধুতি আর সিল্কের হাফ-শার্ট, গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার ঘড়ি, দু'হাতের আঙুলে তিনটে আঙটি—কিন্তু তা সত্ত্বেও শৌখিন বা অমায়িক কেতাদুরস্ত আদৌ মনে হয় না। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। নাক মুখ চোখ কিছুই সুন্দর নয়। দেখলেই মনে হয় ভদ্রলোক রসকষ-শূন্য শক্ত ধাতুর মানুষ। অবন্তী বুকের কাছে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানাতে উনি সৌজন্যের খাতিরে মাথাটা খানিক নোয়ালেন।

—আর ইনি মিস্টার বীরেন্দর চৌবে, মিস্টার পাণ্ডের ছেলেবেলার বন্ধু এবং পারসোনাল সেক্রেটারি। বন্ধু পরিচয় দিলেও বয়সে তাঁর থেকে বছর তিনেকের ছোট হবে। এই লোকটা সূর্য পাণ্ডের তুলনায় সুপুরুষ হলেও প্রথম দর্শনে অবন্তীর ভালো লাগল না। রমণী-তনু চোখে যাচাই করে নেবার জন্য ওকে যেন সামনে আনা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই তার চাউনি অবন্তীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠা নামা করে নিল।

এরপর গানের আসর। এমন আসরকে আনন্দ দেবার জন্য উচ্চাঙ্গ সাধনার দরকার হয় না এ-রকম আশ্বাস ঊষা বাঈয়ের কাছ থেকে অবন্তী পেয়েছিল। ওর খেয়াল গান শুনেই বলেছিলেন, এত উঁচু দরের গানের সমজদার এ-ধরনের আসরে তুমি পাবে না কিন্তু।

অতএব অবন্তী নিশ্চিন্ত।

তানপুরা নিয়ে বসে প্রথমেই দ্রুততালে ভজন গাইলো একটা। যাতে ভক্তিরসের থেকে গলার কাজই বেশি প্রাধান্য পেল। শ্রোতারা বাহবা দিল। তারপর দুটো গজল গাইল, শ্রোতারা তাতেও বাহবা দিল বটে কিন্তু এ আসর কারো কাছেই বাঈজীর আসরের মতো লাগছে না। তানপুরা গালে ঠেকিয়ে গাইছে, এক-একবার শুধু তবলচির জবাব-প্রতিজবাবে স্মিত মুখে কৌতুকের মহড়া দিচ্ছে। পরের ঠুংরি দুটো অবশ্য আরো একটু জমল। দেহের পরিমিত দোলানি ঝাঁকুনি, হাসিমুখে মাথা নেড়ে তাল ঠুকে তবলচিকে উৎসাহ দেওয়া, কপট রাগের ভাবভঙ্গীর মধ্যে যেটুকু যৌবন-সুষমা উঁকিঝুঁকি দিল তাতেই বহুজোড়া চোখ লুব্ধ হয়ে উঠল।

শেষ হতে এবার গুঞ্জন উঠল, বিদেশী নাচ-গান কই?

তানপুরা রেখে অবন্তী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁটে হাসি। শ্যাম রূপশ্রী শান্ত, অপ্রগলভ। হাত জোড় করে বলল, আপনাদের দয়া করে পাঁচ সাত মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

পিছনের দরজা দিয়ে ধীর পায়ে ভিতরে চলে গেল। সকলেই লক্ষ্য করল তানপুরা তবলা হারমোনিয়াম সব সরিয়ে ফেলা হল।

কিন্তু মিনিট আট দশের মধ্যে যে ফিরে এলো তাকে দেখামাত্র আসরের প্রতিটি মানুষ হতবাক।

এসে দাঁড়ানো মাত্র চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম। পরনে নানা জেল্লার চুমকি বসানো স্লিট-স্কার্ট, স্বল্প বক্ষচ্ছাদন। ঐশ্বর্যের অনেকটাই আভাস মেলে কিন্তু প্রত্যক্ষ নয়। স্লিট-স্কার্ট বলতে কোমরের একটু নিচু থেকে হাঁটুর খানিকটা নিচে পর্যন্ত দু'পাশে স্কার্টের দু'দিক কাটা। নড়লে চড়লে সেই দু'দিক থেকে চকচকে সোনা-রং পুরু সিল্কের প্যান্টিস।

হাঁটুর একটু নিচ থেকে চকচকে স্কিন-কালার নাইলনের মোজা, গায়ের রংয়ের সঙ্গে এমনি মিশ খেয়ে আছে যে চেকনাই না থাকলে মোজা বোঝাই যেত না, পায়ে হাই হিল জুতো।

আসরের প্রতিটি মানুষ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসেছে।

মাইক মুখের সামনে ধরে অবন্তী বলল, এটা ফরাসী ভাষার একটা কৌতুক গান। প্রেমিক যুদ্ধে গেছে, প্রেমিকার উৎকণ্ঠা আর বিরহযন্ত্রণা। আপনারা মূল ভাষায় আগে গানটা শুনুন, প্রেমিকার যন্ত্রণার চিত্রটা পরে বাংলায় আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরব।

মাইক হাতে নিয়েই গান শুরু করল। গানের সঙ্গে পিছনে দুটো লোকের হাত-বাজনা বাজতে থাকল। নিটোল গলা উঠছে নামছে। দেহ দুলছে ঘুরছে ফিরছে, সামনে আসছে পিছনে সরছে। হিল-জুতোর ঠক-ঠক শব্দ উঠছে। যৌবনের ঢেউ উঠছে নামছে, প্লিট স্কার্টের ভিতর দিয়ে নিম্নাঙ্গের নিটোল সৌন্দর্যের আভাস মিলছে। খুশি অনুরাগ বিরহ পরিতাপ কখনো বা ক্রোধের অভিব্যক্তি। সেই মতো গলা উঠছে নামছে। চোখের কানের এমন বিচিত্র ভোজ সকলের কাছেই অভিনব।

মিনিট কুড়ি বাদে শেষ হল।

অবন্তীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আলতো করে রুমাল চেপে ঘাম মুছে হাসি মুখে হাতের মাইক মুখে তুলল। —এবারে আপনারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারখানা কি।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচ শুরু হল। সুঠাম দেহসম্ভার লীলায়িত হতে থাকল। এবারে সেই একই গানের বাংলা তর্জমা। সার কথা, প্রিয়তম, সকলে বলছে দেশের কাজে তোমার ডাক পড়েছে, এ আমার সব থেকে গৌরবের দিন। যুদ্ধে যদি তোমার মৃত্যুও হয়, তাহলেও তুমি অমর হবে, আমার প্রেম অমর হবে। হ্যাঁ, সত্যিই আজ আমার গৌরবের দিন, তুমি বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো—কিন্তু দোহাই প্রিয়তম, তুমি আহত হয়ে ফিরে এসো না যেন, মৃত্যু সহ্য করতে পারব কিন্তু এমন সুন্দর দেহের আহত রূপ আমার চোখে সহ্য হবে না।...প্রিয়তম চলে গেল, আমি এখন কি করি? জগতের সেরা খাবারগুলো যে আমার গলা দিয়ে নামতে চায় না, সেরা মদে চুর হয়ে সমস্ত রাত বন্ধুদের সঙ্গে নেচে দিনে বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও যে আমার বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে! তুমি স্বার্থপর, তোমার যুদ্ধের যন্ত্রণা কি আমার কষ্টের থেকে বেশি? দেশের যুদ্ধের থেকে প্রেমযুদ্ধ কি কম কিছু? তোমার অভাবে কত পুরুষ এখন আমাকে প্রেমযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে, তুমি আহত হলে তার ওষুধ আছে—আমার ওষুধ কি? এখন আমার ভয় ধরেছে, যেভাবে তুমি আমার হৃদয় জুড়ে আছ—এরপর যুদ্ধে যদি মরেই যাও, এক-পক্ষ কালের মধ্যেও আমি কি কোনো নতুন প্রেমিককে তোমার জায়গায় বসাতে পারব? তুমি নিষ্ঠুর, যুদ্ধ নিষ্ঠুর—একমাত্র প্রেমযুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো যুদ্ধ থাকা উচিত নয়।

শেষ হতে না হতে উল্লাসে আর করতালি ধ্বনিতে সভা ফেটে পড়ল। 'আবার আবার' রব উঠল।

মাইক হাতে সকলের উদ্দেশে হাসি মুখে অভিবাদন জানিয়ে অবন্তী বলল, আমি ক্লান্ত। এ অনুষ্ঠানের পর আর অনুষ্ঠান হয় না। আপনাদের ধন্যবাদ।

ভিতরে চলে গেল। সভার এক-মাত্র চোখ-ধাঁধানো আলোটা যেন সরে গেল।

প্রাথমিক পরিচয়ের এ-ধরনের অনুষ্ঠানে মর্যাদার নজরানা পড়েই থাকে। এই গোছের মিলিত আমন্ত্রণ একবারই হয়। এরপর আগাম বায়না অনুযায়ী দু'পাঁচজন সঙ্গী বা মোসায়েব নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। রসিকজনেরা সেটা কেউ কারও গোচরে করে না। দালাল বা মোসায়েবরা দিনের বেলা প্রস্তাব নিয়ে আসে।

প্রথম রাতের মর্যাদার নজরানা গুনতে গুনতে ঊষা বাঈ আনন্দে দিশেহারা হয়। দু'শ টাকার কম কেউ দেয়নি। আড়াইশ' তিনশও দিয়েছে। একজন দিয়েছে পাঁচশ।

তিনি বেনারসী সিল্ক মার্চেন্ট সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তী জানেও না কত টাকা পড়েছে। মেয়েদের সব নিচে পাঠিয়ে ঊষা বাঈ তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন সে খেয়েদেয়ে শুনে পড়েছে।

পরদিন হাসি মুখে টাকার গোছা নিয়ে তার কাছে এসেছেন।—কাল তুমি মাত করে দিয়েছো বোন, কত টাকা এখানে আন্দাজ করতে পারো?

অবন্তী হেসে জবাব দিল, আমার ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

—বারো হাজার! এর অর্ধেক ছ'হাজার তোমার প্রাপ্য।

—উঁহু, আমাকে পাঁচ হাজার দেবে, এসটাবলিশমেন্ট আর এনটারটেনমেন্ট চার্জ হিসেবে সব-সময়ই তোমার পাওনা কিছু বেশি হবে।

ঊষা বাঈ ভারী খুশি।—তোমার দরাজ মন বটে...এবার লোক আসা শুরু হল বলে —আবার কবে প্রোগ্রাম নেব?

—সপ্তাহে একদিনের বেশি নয়। কদর বাড়াতে চাও তো আরও কম নিও।

খুব পছন্দ হল না, কিন্তু ঊষা বাঈ পীড়াপীড়ি করলেন না, ভাবলেন, মেয়ে আগে ধাতস্থ হোক।

তিন দিন বাদে একটা প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত তিনি। ঈষৎ গম্ভীর। জানালেন, সিল্ক মার্চেন্ট সূর্য পাণ্ডের বন্ধু বীরেন্দ্র চৌবে এসেছে—পাণ্ডের বাগান বাড়িতে এক রাত ফাংশন করার জন্য তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে।

—আমাকে মানে তোমাকে বা ইউনিটকে নয়?

—না...কেবল তোমার জন্যই বলছে। টাকা ভালই দেবে...

—বাতিল করে দাও। অবন্তীর সাফ জবাব।

—তাহলে তুমি এসে বলে যাও।

—আমার হয়ে আমি কথা বলার কে?

একটু আমতা আমতা করে ঊষা বাঈ বললেন, দেখো এ-ব্যাপারটা একটু ভিন্ন রকমের—পরে তোমাকে বলব, আমি বাতিল করলে বিশ্বাস করবে না।...লোকটাকে সূর্য পাণ্ডের বন্ধু বললাম বটে, আসলে তার মোসায়েব আর পেয়ারের ক্রীতদাস, যেমন ধূর্ত তেমনি পাজি, তুমি এসো।—

অবন্তী এলো। বীরেন্দ্র চৌবে সবিনয়ে আর্জি পেশ করল।

ততোধিক বিনয়ে অবন্তী জবাব দিল, মিস্টার পাণ্ডে একটু ভুল করেছেন, এ-রকম প্রোগ্রাম আমি নিই না, আমার গান তাঁর ভাল লাগলে দয়া করে তাঁকে দিদিজীর এখানেই আসতে হবে। আচ্ছা, নমস্কার।

চলে এলো। নেকড়ের চোখ নেকড়ের অভিলাষ অবন্তী অনেক দেখেছে। আর একটা দেখল।

সপ্তাহে একদিন করে খুব ভোরে অবন্তী যোশী মহারাজের ডেরায় হাজিরা দেওয়া বন্ধ করেনি। কিন্তু এখন যা পাচ্ছে তার থেকে তাঁকে কিছু দিতে মন সরে না। আগে ঝোঁকের মাথায় যে পাঁচশ এক টাকা দিয়েছিল সে-ও সৎ উপার্জনের টাকা কিছু নয়। তবু সে টাকার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ কিছু যোগ ছিল না। কিন্তু এখন যে টাকা পাচ্ছে তা গান নয়, শিল্পের দক্ষিণা নয়, তা যেন নিছক দেহের দৃষ্টিভোজ বিলিয়ে উপার্জন করছে। অবন্তী তবু আব্দারের সুরে বলে, বাপুজী, আপনি কথা দিয়েছেন, দরকারে আমাকে ছেলের কাজ করতে দেবেন, কিন্তু আপনি কিছুই বলছেন না।

যোশী মহারাজ হেসে সারা।—কথা আবার কবে দিলাম। তারপর স্নেহার্দ্র গলায় বলেছেন, বেটি, আমি এক বেলা সেদ্ধভাত খাই, আর এক বেলা দুধ-রুটি, আমার যেটুকু দরকার, ওই আখড়ার বাড়ি ভাড়া আর রেকর্ড বিক্রির থেকেই এসে যায়, তবু দরকার হলে তোকে বলব না তো কাকে বলব...কিন্তু তুই মাত্র সপ্তাহে একদিন এলে কতটুকু শিখবি, বেশি আসিস না কেন?

—খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে বাপুজী, ঈশ্বর দিন দিলে বেশি আসব।

সপ্তাহে একদিন করে অবন্তীর প্রোগ্রাম থাকেই। ঊষা বাঈয়ের খেদ, তিন দিন হলেও মক্কেলের অভাব হয় না। পরের তিন মাসের মধ্যে তিন বার সূর্য পাণ্ডে তার মোসায়েবকে নিয়ে এসেছেন। তিন বারের মধ্যে দু'বার অবন্তী বিদেশী নাচ-গানের আবেদন সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। —তবিয়ত ঠিক নেই। তবিয়তের বেঠিক কারও চোখে পড়েনি। মেজাজ নেই এটুকু বোঝা গেছে। মাঝে যেবারে সেই সাজ পোশাকে আসরে এসেছে, সূর্য পাণ্ডের শিরার রক্তে কতটা আগুন ধরল ঊষা বাঈ আঁচ করতে পেরেছেন।

অবন্তীও মানুষটাকে ঠিকই লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কোনো অনুরোধই তিনি নিজে করেন না। সেটা আসে বীরেন্দ্র চৌবের মারফৎ। কিন্তু নাকচ করলে এই মানুষের মুখে কঠিন রেখা পড়তে থাকে, চাউনি নিশ্চল হয়, বড় বড় নিঃশ্বাসে বুকটা এক এক সময় হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে। অবন্তী ঊষা বাঈয়ের মুখে শুনেছে, সূর্য পাণ্ডের হার্টের ব্যামো আছে, কার্ডিয়াক ট্রাবল না কি বলে, আর ব্লাডপ্রেসারও চড়া। বাড়িতে সর্বদাই একটা করে অক্সিজেন সিলিণ্ডার মজুত থাকে, শ্বাস কষ্ট বাড়লে বাড়তি অক্সিজেন দরকার হয়। রাগলে ব্লাডপ্রেসার চড়ে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। আর মদ বেশি খেলে তো বাড়েই। কিন্তু দুইয়ের কোনটার ওপর এই লোকের সংযম নেই। মদ খাবেই আর পানের থেকে চুন খসলে রেগেও যাবে।

অবন্তী মালহোত্রা জানে সে এই লোকের রাগের কারণ হয়ে উঠছে। গত তিন মাসের মধ্যে তাঁর পেয়ারের চেলাটি কম করে আট দশবার কিছু না কিছু প্রস্তাব নিয়ে ঊষা বাঈয়ের কাছে এসেছে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে সদলে বাগান বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সবই নাকচ করার ফলে ব্লাডপ্রেসার কতটা চড়ে থাকতে পারে, আর বুকের ওঠা-নামার গতি কি হতে পারে ঊষা বাঈ সানন্দে সেই অনুমানের কথা ওকে

শুনিয়েছেন। আর হেসে হেসে বলেছেন, দেখব, এই বাদশাহী মেজাজের রইস আদমীকে কতদিন তুমি ঠেকিয়ে রাখতে পারো।

নিরীহ মুখে অবন্তী জিগ্যেস করেছে, ঠেকিয়ে রাখি তুমি চাও না চাও না?

ঊষা বাঈয়ের বয়স্ক চোখে ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে গেছে। তারপর হেসে জবাব দিয়েছেন, তোমাকে তাঁর মুঠোয় এনে দিয়ে আমি এক্ষুনি পাঁচ সাত হাজার টাকা রোজগার করতে পারি জানো?

ওই লোকের প্রতি ঊষা বাঈয়ের সঠিক মনোভাব অবন্তী এখনো আন্দাজ করতে পারেনি। দু'জনের বয়সের ফারাক দু'বছরের বেশি নয়। ঊষা বাঈয়ের মুখেই শুনেছিল ওই লোকের বয়েস আটচল্লিশ, তাঁর বড় বড় দুটো ছেলে আছে। ছেচল্লিশ বছরের ঊষা বাঈ তাঁর যৌবনের দোসর হিসেবে এখন বাতিল বলেই কি এই মনোভাব? এ কি ঈর্ষা? কিন্তু ঊষা বাঈকে এমন নিরেটও মনে হয় না অবন্তীর, তাঁর বাস্তব বুদ্ধি বরং প্রখরই দেখে আসছে।

পরের মাসে একদিন সূর্য পাণ্ডের চেলা বীরেন্দ্র চৌবে চলে যেতে ঊষা বাঈ হাসতে হাসতে অবন্তীর ঘরে এলেন।—কি গো, তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি তো মঞ্জুর, এখন কি করবে?

বুঝেও অবন্তী জিজ্ঞেস করল, কোথায়? কোন অফিস?

—সেটাও বলে দিতে হবে? কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি অফিসে হয় না বাড়িতে হয়?

মৃদু হেসে অবন্তী জবাব দিল, দু' জায়গাতেই হতে পারে।...তুমি বলে রেখেছিলে বুঝি?

আমি কেন, তুমিই তো আমাকে বলে রেখেছিলে। বেচারার ব্লাডপ্রেসার আর কার্ডিয়াক ট্রাবল বেড়েই যাচ্ছে দেখে আমি কেবল জানিয়েছিলাম প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি তোমার পছন্দ। আজ বীবেন্দ্র শেয়ালটা এসে বলে গেল, এই কাজের ব্যাপারে তার কর্তা তোমাকে কাল সকাল ন'টায় তাঁর বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন।...তা বোনটি, প্রাইভেট সেক্রেটারির চাকরি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, না রাতেও?

অবন্তী হেসেই জবাব দিল, কাজের চাপ বাড়লে রাত পর্যন্তও গড়ায়।

—তাহলে আমি তো না হয়ে গেলাম!

অবন্তীর দু'চোখ তার মুখের ওপর স্থির একটু।—এবারে ছোট বোনের কথার একটা সহজ সত্যি জবাব দেবে দিদিজী?

থমকালেন একটু।—কি কথা?

—সূর্য পাণ্ডেকে তুমি ভালবাসো?

চোখে সেই রকম ক্রোধ ঝিলিক দিয়ে গেল।—আমি কেবল তার টাকা ভালবাসি, তাকে নিঃস্ব করতে পারলে করি—কিন্তু তার ছায়াকে পর্যন্ত ঘৃণা করি—থুঃ থুঃ থুঃ!

অবন্তী হতবাক।

—ও আমার এত আদরের ছোট বোনটাকে খেয়েছে—আমার বয়েস কালের মেয়ে থাকলে তাকেও খেত—বুঝলে? তুমি যদি ওর বুকের সব রক্ত টেনে বার করে নিতে

পারো আমি তোমার কেনা বাঁদী হয়ে থাকতে রাজি আছি—বুঝলে কেমন ভালবাসি ওকে আমি?

অবন্তী এঁর মুখেই শুনেছিল এই বোন গঙ্গায় ডুবে মরেছে। আজ এই কথা। খানিক চুপ করে থেকে বলল, আমাকে বলবে কী হয়েছিল?

শুনল...। ছাব্বিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে বোন ঊষা বাঈয়ের কাছে এসেছিল। তার রূপ যেমন ছিল, তেমনি চমৎকার গানও গাইতো। গানের সুনামও হচ্ছিল। জলসায় ফাংশনে ডাক পড়ত। দু'বছর ধরে এখানে সূর্য পাণ্ডের খাতির কদর দেখেছে। তাই সে এলে বোনও খাতির যত্ন করত তাকে, গাইতে বললে গান শোনাতো। এই অকরুণ মানুষ সত্যিই গানের সমজদার। উচ্চাঙ্গ সংগীত ভাল বোঝে। বয়স কালে তাঁর সাহায্যেই ঊষা বাই এই পেশায় জাঁকিয়ে বসতে পেরেছিলেন, বোন তাও জানে। সূর্য পাণ্ডে বোনকেও জোর করেই গান শোনার দাম দিত, দু'জনকেই বেনারসী শাড়ি আর নানা রকম উপহার দিত। ঊষা বাঈ তার আগে থেকেই প্রমাদ গুনেছে, বোনকে সাবধানও করেছে। বোনও বুঝতে পারত সে লোভের জালে পড়ছে, তাই দিদি কিছু বললে সে ঝগড়া করত, রাগ করে চলে যেতে চাইত। পর পর ক'দিন হয়ত সূর্য পাণ্ডের সামনে আসতও না। কিন্তু কিছু দিন না যেতে আবার যে-কে সেই। ঊষা বাঈ মনে মনে হাল ছেড়েছিল। বোন যদি তারই জীবিকা ধরে সে কি করতে পারে। ঊষা বাঈয়ের বদ্ধ বিশ্বাস সূর্য পাণ্ডে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

...একবার তিন দিনের একটা ভালো বায়না পেয়ে ঊষা বাঈ কানপুর গেছল। ফিরে এসে দেখে বোনটা কেমন যেন গুম হয়ে আছে। তখন অন্য মেয়েরা ছিল না, একটা মাঝবয়সী আয়া কেবল ছিল। তার কাছে শুনে ব্যাপার বুঝতে বাকি থাকল না।...পরপর দু'রাত সূর্য পাণ্ডে আর তার চেলা বীরেন্দ্র চৌবে এসেছিল। মাঝ রাত পর্যন্ত থেকে গেছে।

ঊষা বাঈ তক্ষুনি জানে একা সূর্য পাণ্ডে হলে বোনের এমন মানসিক অবস্থা হত না। চেলাকেও আনন্দের ভাগ দিয়েছে। এটাই তার রীতি। নিজে পরিতুষ্ট হলে চর্বিত মাংস খণ্ডের মতো সেটা সঙ্গীর সামনে ফেলে দেয়।

রাগে ঊষা বাঈ চুলের মুঠি ধরে বোনের মাথা মেঝেতে ঠুকে দিয়েছিল। বোন রাগ করেনি। কাঁদেনি। তিন দিন পরে গঙ্গাস্নানে গিয়ে আর ফেরেনি। দশ মাইল দূরে তার লাশ পাওয়া গেছল।

...হ্যাঁ, এতদিনে এই লোককে অবন্তী একবার নেড়েচেড়ে দেখতে রাজি। ...রজার বারডোঁর মতো হিংস্র পশুর সঙ্গে দু দুটো বছর কাটাতে পেরেছে। তার তুলনায় এ আর কত সাংঘাতিক মানুষ হবে? ঊষা বাঈকে বলেছে, দিদিজী, আমি জিতলে তোমার লোকসান হবে না এটুকু বিশ্বাস তুমি রেখো।

পরদিন সকাল ন'টাতেই এসেছে। সেকেলে ধাঁচের দু' মহলা দালান। ছেলেরা বাপের সঙ্গে থাকে না এটুকু জানা আছে। বীরেন্দ্র চৌবে সাদরে তাকে দোতলায় নিয়ে গেল।

মস্ত টেবিলের ও-পাশে গদির চেয়ারে সূর্য পাণ্ডে বসে গড়গড়ার নলে তামাক টানছেন আর একটু বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ছোটর ওপর স্থির চোখ দুটো বেশ লাল। রাতের নেশার পর সকালে যেমন হয়।

দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে অবন্তী এগিয়ে এলো।

ও-ধারে চাউনি মুখের ওপর স্থির একটু। চোখের তারা সহজে নড়ে না অবন্তী আগেও লক্ষ্য করেছে। মাথা নাড়লেন। —বসো, তুমি করে বললে আপত্তি হবে না তো?

—তাই তো বলবেন। মুখোমুখি বসল।

একটা চেয়ার ছেড়ে আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অন্তরঙ্গ মুখে বীরেন্দ্র চৌবে বলল, পদবী শুনছি মালহোত্রা, অথচ কথাবার্তা খাঁটি বাঙালীর—দেশ কোথায় তোমার?

অবন্তী আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে তাকালো, বলল, বস্ হিসেবে এঁকে আমি যেটুকু অধিকার দিয়েছি আপনার বেলায় সেটুকু খাটেনা এ মনে রাখলে আমার পক্ষে কাজ করতে সুবিধে হবে।

বীরেন্দ্র চৌবের ফর্সা মুখ লাল। ক্রোধ সামলে কর্তার দিকে তাকালো। সূর্য পাণ্ডের লালচে মুখ অবন্তীর মুখের ওপর স্থির, একটু নির্বিকারও। বললেন, বীরেন্দ্র আমার সবকিছুর ডান হাত, ছোট ভাইয়ের মতো—আমার পরে এঁকেও তুমি বস ভাবতে পারো—

মৃদু অথচ স্পষ্ট সুরে অবন্তী বলল, তাহলে আমার পক্ষে কাজে জয়েন করার অসুবিধে আছে, একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দু'জনের আণ্ডারে কাজ করে কিনা জানি না, আমি করব না।

চাউনি নড়ল না, নির্লিপ্ত মুখে কৌতুকের আচড় পড়ল একটু। কিন্তু সদয় কৌতুক নয়। বললেন, এ আমার সব থেকে পুরনো আর সব থেকে বিশ্বস্ত লোক, বন্ধুও—এর সঙ্গে কাজের যোগাযোগ তো তোমার থাকতেই হবে।

অবন্তী জবাব দিল, তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই।

—ঠিক আছে। তুমি এম এ পাশ?

—হ্যাঁ।

—মাইনে কত একসপেক্ট করো?

—আপনি বলুন।

—যদি দেড় হাজার থেকে শুরু করি.

দু' হাজারের কম বলবে অবন্তী ভাবেনি। ইচ্ছে করেই একটু সময় নিয়ে জবাব দিল, তাই করবেন।

—তোমার পছন্দ হল না মনে হচ্ছে?

—আপনি শুরু বললেন, তাই আপত্তি করছি না। আর আপনার দিক থেকেও আমার যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে—যোগ্য মনে হলে আপনি বিবেচনা করবেন।

অবন্তী জানে আরও পাঁচশ বাড়াতে বললে তক্ষুনি বাড়াবে। কিন্তু মাইনের লক্ষ্য নিয়ে সে এখানে আসে নি।

—আমাব আড়ত সকাল ন'টায় খোলে, সেখানে তোমার অফিস থাকবে, সকালে সেখানেই বসবে, আমিও তাই বসি—সকাল ন'টায় আসতে তোমার অসুবিধে হবে?

হবে না।

—বেলা এগারোটা থেকে পর্যন্ত একটা আমি দোকানে থাকি, তোমার দোকানে যাবার দরকার নেই। একটা থেকে দুটো, লাঞ্চ এই বাড়িতে তোমার লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকবে

—দুটোর পর থেকে আমি বাড়িতে অফিস করি, তুমিও তাই করবে। সাগরেদের দিকে তাকালেন, পাশের ঘরটা ওর অফিস ঘর করে দিস, ইন্টারকম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, আর নিচের অফিস ঘরের সঙ্গে একটা কানেকশান থাকলেও ভাল হয়। অবন্তীর দিকে চোখ ফেরালেন, লাঞ্চের পর তোমার ওয়ার্কিং আওয়ারস কি হবে?

চোখে চোখ। ঠোঁটে হাসির আভাস। অবন্তী জবাব দিল, বস-এর যতক্ষণ কাজ এফিসিয়েন্ট প্রাইভেট সেক্রেটারিরও ততক্ষণই কাজ থাকার কথা, এ ছাড়া সিডিউল আওয়ার কি হবে আপনি ঠিক করে দিন।

চক্ষু অনড় কিন্তু আগের মতোই কৌতুকের ছায়া। এ-টুকুর সাদা অর্থ, তুমি মেয়ে কত সেয়ানা বুঝতে পারছি। বললেন, নিচের স্টাফদের সিডিউল আওয়ারস সাড়ে ন'টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত—তোমারও তাই থাকল। আজ থেকে জয়েন করছ?

অবন্তী একটু দ্বিধার সুরে বলল, পরশু পয়লা তারিখ থেকে যদি জয়েন করি?

—ঠিক আছে। পরশু এসে তুমি হাতে হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাবে। বোথ সাইডে মিনিমাম এক বছরের কনট্রাক্ট থাকবে। বীরেন্দ্র চৌবের দিকে ফিরে হেসে বললেন, তোর পোজিশন তো বুঝতেই পারছিস, এঁকে সসম্মানে এগিয়ে দিয়ে আয়, আর নিচের ওরা এসে থাকলে পরিচয় করিয়ে দিস—

অবন্তীর মনে হল মালিকটির হাসির কথার মধ্যেও তরল ভাব খুব নেই, বরং একটু ধার-ধার। চৌবে উঠে দাঁড়ালো। —আসুন। ধূর্ত চোখে হাসি ফুটিয়ে মনিব-বন্ধুর দিকে তাকালো। —তুমি যত স্নেহই করো দাদা, আমিও তো কর্মচারী ছাড়া কিছু না—ওঁর সঙ্গে ও-ভাবে কথা বলতে যাওয়া আমারই ভুল হয়েছিল।

সূর্য পাণ্ডের মুখ দেখে মনে হল না এ-ধরনের ছেঁদো কথার কোন দাম আছে তাঁর কাছে। উঠে দাঁড়াতে চাউনিটা অবন্তীর বুকের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত উঠে এলো।

এটা বাইরের মহল। নিচের তলায় বড় বড় দুটো ঘরে নানা বয়সের সাতটি লোক মাত্র কাজ করছে। একজন বয়স্ক ক্যাশিয়ার, একজন স্টেনো টাইপিস্ট, আর অন্যরা বড় মেজ সেজ ন' ছোটবাবু ইত্যাদি। বীরেন্দ্র চৌবে সকলের সঙ্গে এমন ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দিল প্রাইভেট সেক্রেটারি অবন্তী মালহোত্রার, যেন এবার থেকে সে-ই ব্যবসায়ের সর্বময়ী কর্ত্রী। বাড়ির এই অফিসে কেবল বাইরের প্রভিন্স আর বিদেশে মাল চালানের যাবতীয় হিসেব নিকেশ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। বারাণসী আর সমস্ত ইউ পি'র ব্যবসার হিসেবপত্র ব্যবস্থাপনা গোডাউন সংলগ্ন অফিসে।

একটা মাস একটু বেশি অপ্রত্যাশিত ভাবেই কাটল অবন্তীর। মালিকের অসংযত আচরণের এতটুকু আভাসও দেখা গেল না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি কেবলই যেন কঠিন এবং কড়া মালিক। সকাল ন'টার মধ্যেই অবন্তী আড়তের অফিসে আসে। তার দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সূর্য পাণ্ডে আসেন—সেদিনের ড্রাইভার মিশ্রজী আধবুড়ো নয়, বেশ জোয়ান মানুষ। মালিক যে দু ঘন্টা থাকেন, কর্মচারীরা তটস্থ। দোকানে চলে গেলে হাঁপ ফেলে বাঁচে যেন। গত একটা মাসের মধ্যে অবন্তী তাঁকে এই অফিসে হাসতে দেখেনি কখনো। মনে হয় যখন যার ডাক পড়ে, তার বক্তব্য কানে শোনেন, আর অনড় চোখ দুটো দিয়ে বুঝে নেন। হাসতে বাড়ির অফিসেও কম দেখে।

...অবন্তীর চোখ-কান খুব বেশি রকম সজাগ আর সতর্ক। কারণ ব্যবসাটা সত্যি

কত বড় তার কল্পনায় ছিল না। বেনারস আর সমস্ত ইউ পি-তে যেমন বিক্রি, তেমনি এ-দেশের নানা রাজ্যেও। কলকাতা বোম্বাই দিল্লি মাদ্রাজের ব্যবসাও অভাবনীয়। এ ছাড়া বিদেশেও কম মাল চালান যায় না। অবন্তী গোড়ায় কাজের চাপেই বিকেল ছটার আগে ছাড়া পায়নি। চৌবে বলেছে, এত তাড়াতাড়ি বোঝার কি দরকার, বাড়ি চলে যান।

অবন্তী কান দেয়নি। পনেরো দিনের মাথায় খটকা লেগেছে একটু। ক্যাশ কন্ট্রোলের অনেকটাই অবন্তীর হাতে। কে কি জন্য কত টাকা নিচ্ছে, কিভাবে খরচ হবে বা হচ্ছে সেই স্টেটমেন্ট তার হাতে জমা পড়ছে। সে চিরকুট দিলে দু' জায়গারই ক্যাশিয়ার হাজার হাজার টাকা বার করে দেবে। চৌবে স্পষ্টই বলেছে, এন্টারটেনমেন্ট কনভেয়ান্স স্পেকুলেটিভ এক্সপেন্স—এ-সবের দরুন আপনার নানা রকম খরচ থাকতে পারে, আপনার যেমন ইচ্ছে অন-অ্যাকাউন্টে টাকা তুলে নেবেন, তার কোন রিজিড হিসেব মালিক আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবেন না। আপনার স্টেটমেন্টের সঙ্গে সে-সব জুড়ে দেবেন। বাড়ির অফিসে সূর্য পাণ্ডে অনেক সময় ঘরে থাকেন না, একটু অসুস্থ বোধ করলেই অন্দর মহলে গিয়ে শুয়ে পড়েন। কাজ থাকলে বেরিয়ে যান। এক-একদিন তাকে ডেকে বলে যান, ড্রয়ারে টাকা আছে, কত আছে গুণে আমার ভিতরের সেফএ তুলে রেখো, ওগুলো সাদা টাকা নয়। চাবিও তার কাছে ফেলে যান। ড্রয়ার খুলে বা অন্দর মহলের সিন্দুক খুলে অবন্তীর চক্ষু স্থির হয়ে যায়। তাড়া-তাড়া টাকা। সিন্দুক তো বোঝাই। দু'তিনটে বাণ্ডিল সরালেও টের পাওয়ার উপায় নেই।

...কিন্তু অবন্তী স্থির বুঝেছে, এর সবটাই টোপ। সততা পরীক্ষার টোপ।. লোভের টোপ। তার কেমন ধারণা এই মালিকের সমস্ত টাকারই চুলচেরা হিসেব আছে। অবন্তী আরও সতর্ক আরও সজাগ।

দুপুরে তিনজনে একসঙ্গে লাঞ্চ করে। সূর্য পাণ্ডে বীরেন্দ্র চৌবে আর অবন্তী। বাড়িতে চাকর দরোয়ান আর রান্নার লোকও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই রেস্তরাঁ থেকে কেনা লাঞ্চ খেতে হয়। বড় রেস্তরা হলেও রিচ খাবারই। শুধু মদ নয়, অবন্তী বুঝতে পারে মালিকের শ্বাস কষ্টের এটাও বড় কারণ। চড়া প্রেসারেরও। খেতে খেতে বীরেন্দ্র চৌবেই যা দু'দশটা রসিকতার কথা বলে। সূর্য পাণ্ডের তখন স্বাভাবিক মুখ, অর্থাৎ গাম্ভীর্যের তলায় সামান্য হাসির আভাস। দুই একটা কথা বলেন কি বলেন না। তবে, অবন্তীর মনে হয় চোখের ওই অকোমল অচপল চাউনি দিয়েই লোকটা যেন রমণী দেহের স্পর্শ অনুভব করতে পারেন। এক মাসের মধ্যে লাঞ্চের সময় বা দুপুর থেকে বিকেলের অফিসে মানুষটার এর বেশি বে-চাল দেখেনি।...এর একটা কারণও অবশ্য থাকতে পারে। অবন্তীর ভাগ্য কিনা জানে না, কাজে লাগার পর থেকে মানুষটা অসুস্থই মনে হচ্ছে। মুখে একটা আলগা লালের ছাপ, অর্থাৎ ব্লাডপ্রেসার বেশি। হাঁপের বহরও বেশি। হাঁপানির মতো নয়, বুকের বাতাসই যেন কম। বেশি শ্বাস কষ্ট হলে খুক-খুক কাশি।

...একদিন একটু বেশিই হয়েছিল। সামনে বসে অবন্তী চুপচাপ খানিক লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কি বেশি অসুস্থ বোধ করছেন নাকি?

স্টেটমেন্টের পাজা থেকে চোখ দুটো তার মুখের ওপর উঠে এলো। অনড় হল। গাম্ভীর্যের তলায় চোখে পড়ে কি পড়ে না এমন একটু হাসি ছড়ালো। —কেন, তুমি কি ডাক্তার?

—না, দরকার হলে ফোনে আপনার ডাক্তারকে চটপট খবর দিতে পারি।

চোখ আবার স্টেটমেন্টের পাঁজায় নেমে এলো। কিন্তু সুস্থির হয়ে বসতে পারলেন না। মুখের লালচে ভাব বাড়ছে। শ্বাস কষ্টও। একটু বাদে আস্তে আস্তে উঠলেন। তাকালেন।—এসো আমার সঙ্গে।

ঘর ছেড়ে বেরুলেন। বাইরের মহল থেকে অন্দর মহলের দিকে। মস্ত লম্বা বারান্দা। দুটো ঘর ছাড়িয়ে তৃতীয় ঘরে ঢুকলেন। খুব ঠাণ্ডা মুখে অবন্তীও। মস্ত পালঙ্কে শয্যা বিছানো। মাথার দিকের দেয়ালের কাছে কাঠের ফ্রেমে একটা নল আর ফানেল সুদ্ধু অক্সিজেন সিলিণ্ডার বসানো। আর একদিকের কাচের আলমারিতে সারি সারি বিলিতি মদের বোতল। ছোট টেবিলের ওপর একটা ব্লাডপ্রেসার মাপার যন্ত্র। ছোট ছোট শিশিতে ওষুধের বড়ি।

—একটু জল দাও।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে অবন্তী কোণের গেলাসে ঢাকা জলের কুঁজো দেখতে পেল। জল ঢেলে গ্লাস নিয়ে সামনে এলো। শিশি থেকে দুটো বড়ি বার করে নিয়ে তিনি মুখে পুরলেন। হাত থেকে জল নিয়ে গিললেন। দু'চোখ অবন্তীর মুখের ওপর। অবন্তী আধহাতের মধ্যে। গেলাস ফেরত দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বললেন, ফানেলসুদ্ধু ওই অক্সিজেনের নলটা দাও—

অবন্তী তাড়াতাড়ি সেটা এনে তাঁর হাতে দিল। ফানেলটা নিয়ে নাকে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধমকেই উঠলেন, এটা কি খেলনা, অক্সিজেনের চাবি খুলবে কে?

অবন্তী আবার দ্রুত এগোলো।

—চাবিটা আস্তে আস্তে ঘোরাও, যখন বন্ধ করতে বলব বন্ধ করবে।

তাই করল।

জোরে জোরে বারকতক নিঃশ্বাস নিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, ঠিক আছে যাও, একবার বীরেনকে পাঠিয়ে দাও, প্রেসারটা চেক করবে।

অবন্তী জানে প্রেসার দেখা কঠিন কাজ কিছু নয়, যে জানে সেই পারে। কিন্তু সে জানে না। দ্বিধা কাটিয়ে অবন্তী জিগেস করল, ডাক্তারকে খবর দেবার দরকার নেই?

নাকে অক্সিজেনের ফানেল লাগানো। দু'চোখ তার মুখের ওপর। সেই অকোমল হাসির আভাস।—রোগী ডাক্তার পেলে বেশি ভাল হয় না তোমাদের দেখলে? বীরেনকে পাঠিয়ে দাও।

বেরুতে গিয়ে একটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ল অবন্তীর। দেয়ালে ঝুলছে একটা চামড়ার ছোট চাবুক। কিন্তু অদ্ভুত ধরনের চাবুক। গোড়া থেকে শেষ পযন্ত ছোট্ট মার্বেলের মতো কেবল চামড়ার গুটলি।

পরদিন নিয়মিত আবার তিনি অফিসে হাজির। একটু শুকনো ফ্যাকাসে মুখ। আর কোনো ব্যতিক্রম নেই। দুপুরের লাঞ্চে রেস্তরাঁর সেই রিচ খাবার। এর আগে অবন্তী এক ফাঁকে বীরেন্দ্র চৌবেকে জিগেস করেছিল, প্রেসার খুব হাই ছিল?

—খুব।

—কাল রাতে ড্রিংক করেছিলেন?

—খুব।

—আপনি বারণ করলেন না কেন?

ফর্সা মুখে গলগলে হাসি।—কাকে বারণ করব, ওঁর জগতে উনি জগদীশ্বর।

মাসের শেষে নিজস্ব একটা স্টেটমেন্ট দাখিল করল অবন্তী। নিখুঁত হিসেবের মধ্যে একটাই ব্যাপার অসম্পূর্ণ। মাসের মধ্যে তিনবার বীরেন্দ্র চৌবের নামে কয়েক হাজার টাকার ড্রইং লেখা। কেবল সেই টাকার হিসেব নিকেশ নেই। অবন্তী সেই অঙ্কের টাকার নিচে-নিচে লাল দাগ দিয়ে রেখেছে।

তাই দেখে মালিকের নির্লিপ্ত মুখের হাসির আভাস একটু বেশি স্পষ্ট। মাঝারি আকারের দু'চোখ তার মুখের ওপর উঠে এলো। বললেন, তোমার হিসেব কত পাকা সেটা আমি এই ক'মাস ধরে লক্ষ্য করেছি, বীরেনের হিসেব নিয়ে খুব মাথা ঘামানোর দরকার নেই, ও দিকে বেশি চোখ দিলে তার চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে।

অর্থাৎ বীরেন্দ্র চৌবের চুরির ব্যাপারটা অবধারিত খরচের মধ্যেই ধরে নিতে হবে।

পরের মাসের তিন তারিখে মাইনে হয়। অবন্তীও দেড় হাজার টাকা হাতে পেল। অনেক বছর পরে এটাই তার নির্ভেজাল রোজগারের টাকা। দেড় হাজার টাকা নিয়েই সেই রবিবারে যোশী মহারাজের বাড়িতে হাজির। প্রতি রবিবারের মতোই আগে প্রণাম করে তামিল নিতে বসল। শেষ হতে যোশী মহারাজ হেসে বললেন, অন্য দিনের থেকে আজ তোর গলাটা একটু ভালো লাগল বেটি।

অবন্তী আবার প্রণাম করে বলল, আজ যে অন্য দিনের থেকে একটু ভালো দিন বাপুজী। পায়ের কাছে টাকাটা রাখল, আমার প্রথম মাসের মাইনে আপনার পায়ে সংকল্প করেছিলাম। নিতে হবে—

যোশী মহারাজ প্রথমে বিমূঢ় একটু তারপর অত টাকা দেখে আঁতকে উঠলেন। —এ যে অনেক টাকা!

—খুব অনেক না, দেড় হাজার।

—দেড় হাজার মাইনে, কোথায় চাকরি কি চাকরি?

—প্রাইভেট সেক্রেটারির। তারপর আহত গলায় বলল, আমার কোয়ালিফিকেশনে দেড় হাজার কি বেশি হল?

—বেশ বেশ। হাসলেন, তোর ইচ্ছে হয়েছে যখন আমি একশ টাকা নেব, বাকি টাকা তুলে রাখ—

গলায় আকুতি ঢেলে অবন্তী জোর দিয়ে বলল, বাপুজী আজ এই দিনটা আমি আপনার ছেলে, চাকরিতে ঢোকার প্রথম দিন আমার সংকল্প ছিল প্রথম মাসের মাইনে আপনার চরণে এনে দেব—আপনি কখনো আমার সংকল্প নষ্ট করবেন না বাপুজী, এই দেড় হাজার টাকাই আপনাকে নিতে হবে।

বলার মধ্যে এমনিই একটু আবেগ ছিল যে বৃদ্ধ সাধক চেয়ে রইলেন খানিক। —সব দিয়ে দিলে তোর চলবে কি করে?

—আমি কি এই টাকার আশায় বসে আছি নাকি, আমার হাতে এখনো অনেক টাকা—এটা আপনি তুলুন তবে আমার শান্তি।

টাকাটা নিলেন। কপালে ঠেকালেন। বললেন, শেষ বয়সে এ আবার তুই

আমাকে কি মায়ায় বাঁধলি রে বেটি—অ্যা? হঠাৎ উৎসুক। অবন্তীর বাঁ হাত-খানা টেনে নিলেন। ঝুঁকে উৎসুক চোখে হাতের রেখা দেখলেন। ডান হাতটাও টেনে নিয়ে একবার দেখলেন।

—কোথায় চাকরি করছিস, কোনো পছন্দের লোকটোক জুটেছে?

অবন্তী হেসেই মাথা নাড়ল। জোটেনি।

—জুটবে। তোর হাতে আবার বিয়ের চিহ্ন আছে মনে হচ্ছে।...অবশ্য আগের মতো আর দেখতে পারি না, ভুল হয়, কিন্তু আজ তোকে আমি এই আশীর্বাদই করছি।

আট

দিনের চাকা একভাবে ঘুরবে না অবন্তী খুব ভালো করেই জানে। সূর্য পাণ্ডে কিছুটা সংযমের মধ্যে ছিলেন কিনা বা কতটা ছিলেন অবন্তী জানে না। পরের মাস থেকে তাঁকে বেশ একটু চাঙা দেখালো। হাঁপের টান অনেক কম। অবন্তী এখন মুখের দিকে তাকালে মেজাজ বুঝতে পারে। হাসেন না বড়, পুরু ঠোঁটে আর স্থির চোখে সামান্য হাসি দেখা যায়, তাইতেই বোঝা যায় মেজাজপত্র ভালো। দুপুরে লাঞ্চে এসে বিকেল পর্যন্ত তাঁর সামনে তাঁর ঘরেই থাকতে হয়। অবন্তী যখন কাজ করে, চাউনিটা নিঃশব্দে সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করে টের পায়। অবন্তীর ধারণা এবারে উনি হাত বাড়ানোর দিকে এগোবেন।

সেদিন সাড়ে পাঁচটার পর বললেন, বোসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অবন্তী শোনার জন্য প্রস্তুত।

—তুমি এখানে জয়েন করার পর থেকে আমার বিজনেসের লোকদের তোমার সম্পর্কে একটু কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তুমি ঊষা বাঈয়ের সঙ্গে থাকো আর সপ্তাহে ক'দিন টাকা নিয়ে নাচ গান করো এটা আর গোপন থাকছে না, সাহস করে আমাকে কেউ কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারি। তাতে আমার অবশ্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমি নিজেই আর এটা পছন্দ করছি না।

অবন্তী চুপচাপ চেয়ে আছে।

—এটা বন্ধ করলে তোমার কি-রকম লোকসান?...যোশী মহারাজের কাছে তুমি গান শেখো, সেটা বন্ধ করতে বলছি না।

যোশী মহারাজের কাছে গান শেখে অবন্তী বলেনি, কিন্তু দেখা গেল খবর রাখেন।
—টাকা নিয়ে গান বন্ধ করতে বলছেন?

—তোমার সখের জিনিস, ঠিক তা-ও বলছি না...ওখানকার নাচ-গান বন্ধ করলে তোমার কি-রকম লোকসান হবে তাই বলো।

...বেশি পোগ্রাম করি না বলে খুব বেশি লোকসান হবে না...আমার আর দিদিজির মিলিয়ে মাসে হাজার দেড়েক।

স্থির চোখ দুটো মুখ বুক হয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে এসে আবার উঠলো।—ঊষা বাঈকে আমি চিনি...সে তোমাকে এর চার গুণ লোভের রাস্তা দেখাতে চাইছে না?

—এখন পর্যন্ত না...আমার স্বাধীনতায় হাত দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারে নেই এ-রকম বোঝাপড়া তাঁর সঙ্গে হয়েছে।

চেয়ে আছেন। আবার সেই রকম একটু হাসির আভাস। —তোমাদের এই দেড় হাজার টাকার লোকসান যদি এ মাস থেকেই আমি পুষিয়ে দিই, আর অন্যত্র আমার খরচেই যদি তোমার থাকার ব্যবস্থাও করে দিই...তাহলে তোমার ওই শখের দিকটা মানে নাচ-গানের ব্যাপারটা শুধু আমার জন্যেই রিজার্ভ রাখা যায় না?

অবন্তীও চেয়েই আছে। কালো টানা চোখে একটু হাসি চিকিয়ে উঠল।—যায়।...কিন্তু তাতে আপনার বিজনেসের লোকদের মুখ বন্ধ থাকবে?

—থাকবে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ মুখ খোলে না, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির নাচ-গান পাঁচজনের ভোগে আসছে এটা আমার বরদাস্ত করতে অসুবিধে হচ্ছে।

যোশী মহারাজের আশীর্বাদ হঠাৎ কেন মনে পড়ল অবন্তীর জানে না।...আঠারো বছরের বড় এই চরিত্রের পুরুষ পছন্দের মানুষ হতে পারে না। তবু...।

সূর্য পাণ্ডে হৃষ্ট মুখে উঠে দাঁড়ালেন।—ঠিক আছে চলো—

কোথায় যেতে হবে সঠিক বুঝল না। তাঁর সঙ্গে নেমে এলো। নিচের অফিসের লোকজন সকলে তখনো চলে যায়নি। সূর্য পাণ্ডে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার মিশ্র পিছনের দরজা খুলে দিতে আগে ইশারায় অবন্তীকে উঠতে বললেন। তারপর নিজে পাশে বসলেন। —রামচাঁদের ওখানে চলো।

কে রামচাঁদ, তার ওখানে কি বা কেন না বুঝলেও অবন্তী কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মিনিট কুড়ি বাদে গাড়ি ভিড়ের রাস্তার দোকান-পাটের সামনে এক জায়গায় দাঁড়ালো। —এসো।

একতলাটা গয়নার দোকান মনে হল। তাকে নিয়ে সূর্য পাণ্ডে দোতলায় উঠতেই একটি সৌখিন লোক হন্তদন্ত হয়ে অন্তরঙ্গ হাসি মুখে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরল।

—আমার জিনিষ রেডি?

—সিওর সার। তসরিফ রাখিয়ে, ম্যাডাম সীট ডাউন প্লীজ! ব্যস্ত পায়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

অবন্তী দেখছে। নীচের গয়নার দোকানেরই এটা ওপরের স্টোর মনে হল। এখানেও আলমারিতে আর শো-কেসে গয়নার ছড়াছড়ি।

লোকটা, এ-ই রামচাঁদ হবে, ভেলভেটের একটা ছোট্ট চৌকো কেস হাতে ফিরল। নিজেই ওটা খুলে ভিতরের জিনিসটা তুলে দু'জনের সামনে ধরল।...নাকের গয়না। সোনার আঙটায় লাগানো মস্ত একটা হীরে। ঘরের জোরালো আলোয় তার জেল্লা ঠিকরোতে লাগল। অবন্তীর নাকে যে পাথরটা লাগানো আছে সেটার ওপরেই ওটা ধরে ভদ্রলোক সগর্বে তার রইস খদ্দের অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের দিকে তাকালো।

—পরিয়ে দেখান।

অবন্তী যন্ত্রচালিতের মতো নাকের পাথরটা খুলল। লোকটির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হীরের পাথর নাকে লাগালো। আগের পাথরটা এর তুলনায় একেবারে নিষ্প্রভ। পাথরের জেল্লায় অবন্তীর কালো মুখের রূপই বদলে গেল যেন। সূর্য পাণ্ডে উঠে এলেন। নিঃসংকোচে এক হাতে ওর গালটা একদিকে একটু ঘুরিয়ে পাথরটা দেখলেন অথবা কি-রকম মানিয়েছে দেখলেন। মুখে সেই গোছের একটু হাসির

আভাস মাত্র। পছন্দ হয়েছে কিনা অবন্তীকে একবারও জিজ্ঞেস করলেন না।

—বিল।

লোকটা আবার হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। একটু বাদে বড় আকারের ক্যাশমেমো নিয়ে ফিরল।

সূর্য পাণ্ডে একবার দেখে নিয়ে পকেটে পুরলেন। দু'পকেট থেকে দুটো একশ টাকার বাণ্ডিল বার করে তার হাতে দিলেন। লোকটার খুশিতে গদগদ মুখ।

অবন্তীর মুখে কথা নেই।... হীরের দাম বিশ হাজার টাকা এটুকুই শুধু বুঝল।

ফের গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে যে-পথে যেতে বললেন সেখানে উষা বাঈয়ের ডেরা। এখনো এতবড় উপহার সম্পর্কে কোনরকম উচ্ছ্বাস ছেড়ে এই মানুষের মুখে একটি কথাও নেই। কিছু বললে অবন্তী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এমন নয়, আবার এই নির্লিপ্ততাও অস্বস্তির কারণ।...জিনিসটার অর্ডার আগেই দেওয়া ছিল বোঝা যাচ্ছে। কারণ দোকানে গিয়েই মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাঁর জিনিষ রেডি কিনা। পছন্দ করা বা বাছাইয়ের কোনো প্রশ্ন ছিল না। ...ভাবছে অবন্তী, বিশ হাজার টাকায় গায়ের অনেক গয়নাই হতে পারত, কিন্তু নাকে যা ছিল সেটা বদলে এমন একটা হীরে পরানোর দিকেই ঝোঁক হল...এর থেকে কি বুঝবে? বুদ্ধি বা রুচির প্রশংসা করতেই হয়। আয়নায় নিজেকে তো দেখেছে। আর কোনো গয়নাতেই নিজের এই রূপ এত তীক্ষ্ণ আর এমন উজ্জ্বল হত না।

গাড়িতে একটি কথাও হল না।...সঙ্গে নিয়ে এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝছে না। অবন্তীর না থাকুক, এ-সময় অন্য মেয়েদের প্রোগ্রাম থাকতে পারে, উষা বাঈয়ের নিজেরও থাকতে পারে, অতএব নাচ-গানের আকর্ষণে কোনো বিশিষ্টজনের হঠাৎ এসে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়। হয়তো উষা বাঈকে ডেকে প্রাইভেট সেক্রেটারির সম্পর্কে বিকেলের কথা অনুযায়ী নিজের কিছু বলার উদ্দেশ্য। কিন্তু অবন্তীর এটাও পছন্দ হচ্ছে না। সামনে ড্রাইভার তাই কিছু জিজ্ঞেস করাও যাচ্ছে না।...বাড়ির সামনের গলিতে গাড়ি ঢোকে না, সবুর করাই ভালো।

গাড়ি থামতে সূর্য পাণ্ডে ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, এঁর সঙ্গে গিয়ে দুই একটা জিনিষ নিয়ে এসো, তুমি এগোও উনি আসছেন।

ড্রাইভার মিশ্র তক্ষুনি নেমে গলির দিকে এগলো। সূর্য পাণ্ডে অবন্তীর দিকে ঘুরলেন একটু, ওর হাতে তোমার তানপুরাটা দিয়ে দাও...আর তোমার সেই ডান্স ড্রেসটাও নিয়ে এসো, বীনেরকে আজ বাড়িতেই একটু গান-টানের ব্যবস্থা করতে বলেছি, রাতের খাওয়া-দাওয়াও আমার ওখানেই—

এতক্ষণে উদ্দেশ্য জলের মতো সরল...নাকে আজ বহুমূল্য রত্ন উঠেছে। এ প্রস্তাব কি ওটা খুলে দেবার মতো? মোটেই নয়। বরং উল্টো। কোন এক লক্ষ্যের দিকে অবন্তী পা ফেলেছে। যদিও লক্ষ্যটা এখনো প্রায় ঝাপসাই। তবু শুরু তো বটেই। এই রত্ন শেষ ভাবলে অবন্তীর গলায় দড়ি। তবু মিষ্টি অথচ স্পষ্ট করেই বলল, কিন্তু আমার তো একটু বিশ্রাম দরকার, তার থেকেও বেশি দরকার স্নান...আপনি বরং চলে যান, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি নিজেই চলে যাচ্ছি—

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু একটু।—বিশ্রাম আমার ওখানেও হতে পারে, আর চানের ব্যবস্থাও এখান থেকে ভালো ছাড়া খারাপ না—ছোট কিছুতে এক সেট জামা কাপড় নিতে পারো।

অবন্তী নেমে এগোতে গিয়েও থমকালো, বলল, ডান্স মিউজিক হলে আর তানপুরা নিয়ে গিয়ে কি হবে?

—আমার কোনটাতেই অরুচি নেই, মিশ্র চলে গেছে দেরি কোরো না।

অবন্তী চলে এলো। ঊষা বাঈয়ের মুখে শুনেছিল বটে এই লোক উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও সমজদার।...একটা ছবিতে দেখেছিল, লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের হত্যাকারী রোমের সব থেকে অত্যাচারী সম্রাট রাতের নিভৃতে আপন মনে অনবদ্য ভায়োলিন বাজাচ্ছে।...কিছুটা মেলে? অসুস্থতা সত্ত্বেও মদ খাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর মোসায়েব বীরেন্দ্র চৌবে বলেছিল, কাকে বারণ করব, ওঁর জগতে উনি জগদীশ্বর।

অনুষ্ঠান কিছুই হচ্ছে না, দোতলায় মেয়েরাই নাচ গানের মহড়া দিচ্ছে, ঊষা বাঈ বসে আছেন। তাঁকে ইশারায় ডেকে অবন্তী দ্রুত নিজের ঘরে চলে গেল। মুখের দিকে তাকানো মাত্র ঊষা বাঈয়ের কিছু একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল, কিন্তু এক লহমার দেখায় ঠাওর করতে পারলেন না কি।

ঘরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াতেই দু'চোখ উদ্ভাসিত। আরো এগিয়ে এলেন। রত্নের ছটা চোখে লাগার মতো।—বাঃ, দারুণ তো! আজ কিনলে?

—এর নাম কমল হীরে, দাম বিশ হাজার টাকা...আমার কেনার মুরোদ ভারী।

ঊষা বাঈয়ের মুখে কথা সরে না, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন। ছোট ভি আই পি ব্যাগে একপ্রস্থ জামা-কাপড় আর নাচের ড্রেস গোছাতে গোছাতে অবন্তী তার থাকা আর মাইনে প্রসঙ্গে সূর্য পাণ্ডের সঙ্গে যা কথা হয়েছে জানালো। আজ রাতে তাঁর বাড়িতে গান বাজনার কথাও বলল। —ভদ্রলোক গাড়িতে বসে আছেন আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

ঊষা বাঈয়ের মুখে শুকনো টান ধরছে, চাউনি খরখরে। —রাতে ফিরছ না তাহলে?

—কি করে বলব...

—তোমার দিন তাহলে ভালো রকমই ফেবার মুখে?

অবন্তী সোজা তাকালো। —জানি না, তোমাকে আগেও বলেছি দিন ফিরলে তোমার লাভ বই লোকসান নেই।...ফিরলেও তোমার ছোট বোনের মৃত্যু যদি ভুলি তাহলে ধরে নিও তোমার এই ছোট বোনও মরেছে!

ঊষা বাঈ থতমত খেলেন। উদগত আবেগ চাপতে না পেরে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

দোতলার অন্দর মহলে এসে অবন্তী বীরেন্দ্র চৌবে আর জনাতিনেক কাজের লোক ছাড়া আর কাউকে দেখল না। সূর্য পাণ্ডের ঘরে আসরের ব্যবস্থা। এক মুখ হেসে বীরেন্দ্র চৌবে ব্যস্তসমস্ত অন্তরঙ্গ মুখে আজই প্রথম মনিবের সামনেই অবন্তীর একখানা হাত ধরল। —আসুন আপনার ব্যবস্থা মনের মতো হল কিনা দেখে নিন, একটা হাত-মাইকও যোগাড় করে ফিট করেছি, ঘন্টা দুইয়ের জন্য একজন তবলচিও আসছে—

হাত ধরার জন্য অবন্তী আজ স্পষ্টত কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ করল না। কাজের লোকেরা সরে গেছে। সূর্য পাণ্ডে দু'জনকেই লক্ষ্য করছেন। চেলাকে বললেন, ওর দিকে চেয়ে তোর কিছুই চোখে পড়ছে না?

থমকে মুখের দিকে তাকালো। —আরেব্বাস, এ-যে একেবারে অ্যাঞ্জেল ফ্রম হেভেন! সোজা এগিয়ে গিয়ে সূর্য পাণ্ডের পা ছুঁলো। —পায়ের ধুলো দাও দাদা, তোমার চয়েস বটে। হীরেটার অর্ডারটা যখন দিলে তখনো ধারণা করতে পারিনি এ-রকম মানাবে...ম্যাডাম, আয়নায় নিজে তুমি ইয়ে—দূর ছাই আপনি তুমি, আর কতকাল তুমি আমার ওপর অকরুণ হয়ে থাকবে ম্যাডাম, বয়েসের দিকে তাকালেও দাদা মাত্র আমার থেকে তিন বছরের বড়...ক্ষমা ঘেন্না করে আমাকেও 'তুমি' বলার পারমিশনটা দিয়ে দাও—দাদার পাশে থেকে তোমার কাছে এত দূরের লোক হয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না—

অবন্তী তাকে স্থির কটাক্ষে বিদ্ধ করে নিল একটু। হেসে বলল, বেশি কাছের লোক হতে না চাইলে আপত্তি নেই, পারমিশন দেওয়া গেল।

মুখের হাসির আভাসই সূর্য পাণ্ডের মেজাজের ব্যারোমিটার। খুশি বিগলিত মুখে বীরেন্দ্র চৌবে বলে উঠল, আজ আনন্দের চোটে আমিও যদি নাচ শুরু করে দি রাগ করতে পারবে না দাদা—

ড্রাইভার মিশ্র তানপুরা নিয়ে হাজির। বীরেন্দ্র ব্যস্ত মুখে সেটা নিয়ে বাঁয়া তবলার সামনে রাখল। সূর্য পাণ্ডে ভিতরের দরজা দিয়ে পরের ঘরটা দেখিয়ে বললেন, তুমি ও ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে স্নান সেরে নাও, অ্যাটাচড্ বাথ আর সব রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। সাগরেদের দিকে ফিরলেন, ডিনারের আগেও খাবাব ব্যবস্থা কিছু রেখেছিস তো?

—কিছু মানে! এন্তার—

এ-দিকের ঘরে অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। বীরেন চৌবে ব্যস্ত হয়ে ধরতে গেল। অবন্তী মুখ ফেরাতে সূর্য পাণ্ডের চোখে চোখ। ওই দুটো অনড় চোখে রাগের অভিব্যক্তি বোঝা যায়, খুশির আভাসও কখনো-সখনো মেলে—কিন্তু এখন এই চোখে লোভের বন্যা যত স্পষ্ট ততো আর কিছুই নয়।

বীরেন্দ্র চৌবে প্রায় ছুটেই চলে এলো। ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল। মুহূর্তের মধ্যে বিষম কিছু ঘটে গেছে যেন। মালিককে তিন হাত টেনে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কি বলল। না, অবন্তী ভুল দেখছে না। দেখতে দেখতে এমন রাশভারী মালিকের সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। চাউনি উদ্‌ভ্রান্ত। তাড়াতাড়ি অবন্তীর কাছাকাছি এসে বিড়বিড় করে বললেন, একটু মুশকিল হয়ে গেছে, আজ আর গান-টান কিছু হবে না...তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছে...ভালো কথা, কাল আমি খুব ব্যস্ত থাকব, কাল তোমাকে অফিসেই আসতে হবে না, পরশুও আসবে কিনা আমি খবর দেব—

ফিরলেন। অসহিষ্ণু গলায় পেয়ারের সাগরেদের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? লোক ডেকে দশ মিনিটের মধ্যে এ-ঘরের সব কিছু আর আমার ঘরের আলমারি পরিষ্কার করে ফেলতে বল্—গাড়ি নিয়ে অবন্তীকে তুই নিজে

বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়, কি হয়েছে ওকে বলে দিস—

নিজের ঘরের দিকে যেন কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন। এমন জাঁদরেল লোকের হঠাৎ এমন ভীতত্রস্ত দশা কল্পনা করা যায় না।

ছোটাছুটি হাঁক-ডাক করে বীরেন্দ্র চৌবে কাজের লোকদের হুকুম জারি করছে। একজন তানপুরাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুটল, দু'মিনিটের মধ্যে মেঝের গদি ফরাস তাকিয়া সাফ। একটু বাদে চৌবে এসে বলল, চলো ম্যাডাম, আর দেরি করা যাবে না—

বারান্দায় এসে দেখল ঘরের এ-দিকে দরজার সামনে সূর্য পাণ্ডে দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতে মাথা নাড়লেন শুধু, অর্থাৎ যাও—

কিন্তু ওই চোখের দিকে চেয়ে অবন্তীর একটাই উপমা মনে আসছে।...উপোসী বাঘের সামনে থেকে কেউ তার অতি লোভনীয় শিকার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর অসহায় মুখে তাকে শুধু দেখতে হচ্ছে।

নিচে নেমে বীরেন্দ্র চৌবে অনায়াসে তার একটা হাতের ওপর দখল নিল। পরোয়ানা পেয়ে গেছে, আর যেন সংকোচের কারণ নেই। হাত টেনে না নিয়ে অবন্তী জিগ্যেস করল, হঠাৎ কি এমন হল বলুন তো?

—আমাদের কপাল ভাঙল আর কি হবে—আর দিন পেলেন না আসার,...ছেলেদের বাড়ি থেকে ফোন এলো আধ ঘণ্টার মধ্যে দাদার মানে বংশের গুরুদেব আসছেন!

শুনে অবন্তীও ভেবাচাকা খেল একটু।—গুরুদেব!...তাঁকে উনি এত ভয় করেন!

—ভয়! স্বয়ং বিশ্বনাথ এসে সামনে দাঁড়ালেও দাদা এত ঘাবড়ায় না...কিন্তু এই গুরুদেব তাঁর কাছে বিশ্বনাথের বাবা—সামনে এসে দাঁড়ালে কম্প দিয়ে জ্বর আসে।

অবন্তী সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে। চোখের সামনেই কি মানুষকে কি হয়ে যেতে দেখল।...নিজের ঘরের আলমারি পর্যন্ত পরিষ্কার করার হুকুম হল, অর্থাৎ মদের বোতলও চোখের আড়াল করা দরকার। গাড়িতে উঠে জিগ্যেস করল, ওঁর গুরুদেব কে?

—ব্রহ্মমহারাজ...ওঁর বাবার গুরুদেব ছিলেন, এখন ঝাড়-বংশের গুরুদেব!

—উনি কোথায় থাকেন, কোথা থেকে আসছেন?

—সেটা কেবল উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।

—আপনি দেখেছেন তাঁকে?

—দেখেছি, তবে দূর থেকে, দাদার ভয় দেখে কখনো সামনে যেতে সাহস হয়নি। দাদার সব ভক্তি ভয়ে গিয়ে ঠেকেছে, আসলে গুরুদেবকে তিনি যমের মতো ভয় করেন আর তেমনি ঘৃণা করেন।

বাড়ি ফেরার পর সব শুনে ঊষা বাঈও মজা পেলেন। আদরের সুরে বললেন, তুই আজ রাতটার মতো বেঁচে গেলি বলে মন খারাপ হল নাকি?

অবন্তী জবাব দিল, উল্টে কেন যেন আনন্দ হচ্ছে।...ওই মানুষেরও একটা বিষম ভয়ের জায়গা আছে জানা গেল, নিজের চোখেও দেখলাম—ইস্, জানান না দিয়ে যদি আসরের মধ্যে এসে হাজির হতেন...চক্ষু সার্থক হত।

ঊষা বাঈ বলে উঠলেন, তোর বুকের পাটা তো কম নয়, ব্রহ্মমহারাজ ভীষণ শক্তির সাধক আমিও শুনেছি...একবার নাকি নিজের ক্ষমতায় ওই সূর্য পাণ্ডেকে একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—

অবন্তী ফস করে বলে বসল, সেটা এমন কি ভালো কাজ করেছিলেন—খুশি হয়ে উষা বাঈ হেসে ফেললেন।

নয়

আরো প্রায় সাড়ে তিন চার মাস বাদে অবন্তী মালহোত্রা ঠাঁই বদল করেছে। এত দেরি হবার কারণ জানে। বীরেন্দ্র চৌবের মুখে শুনেছে। ওই লোক এখন অনায়াসে তার হাত ধরে, কাঁধে হাত দেয়। একটু বেশি চাপ-টাপ পড়লে অবন্তী যে-ভাবে তাকায় তাতে একটু কুঁকড়ে যায় অবশ্য, কিন্তু হেসে গলগল করে পাঁচকথা বলে সামাল দেয়। সে-ই বলছে, গুরুদেবটি এই তিন সাড়ে-তিন মাস ধরে ঘুরে ফিরে ইউ, পি-তেই ছিলেন, কখন বারাণসীতে এসে হাজির হন এই ভয়ে দাদাকে এতদিন খুবই সতর্ক থাকতে হয়েছে। যদিও উনি বারাণসীতে পদার্পণ করলেই খবর পাবেন এমন ব্যবস্থাও সূর্য পাণ্ডে করে রেখেছিলেন। কিন্তু তা বলে অবন্তীকে একেবারে নিজের বাড়িতে এনে তুলতে সাহস করেননি। গত তিন থেকে চার মাসের মধ্যে ছ' রাত তাঁর বাড়িতে নাচ গানের আসর বসেছে। অবন্তীর ধারণা গুরুদেবের ভয়ে তখন এই মানুষ হয়তো স্টেশনেও লোক মোতায়েন রেখেছিল। যত রাত বাড়ছে ততো তাঁকে নিরুদ্বেগ মনে হয়েছে।

...না, এই পুরুষকে ভোগের জোরালো দোসর মনে হয়নি অবন্তীর। রজার বারডোর মতো কলাকৌশল বর্জিত বেপরোয়া পশু নয়। কিন্তু তার থেকেও নিষ্ঠুর একটা প্রবণতার আভাস অবন্তী এটুকু সময়ের মধ্যেই পেয়েছে। ভদ্রতার কৃত্রিম মুখোসের আড়াল থেকে প্রবৃত্তির সংগোপন নখদন্তের আঘাতে শয্যাসঙ্গিনীকে শারীরিক ক্লেশ দিয়ে তাঁর আনন্দ। নিজের বয়সের বা অন্য দুর্বলতার পরিপূরক যেন এটুকু। অথচ আচরণে বা মুখভাবে মনে হবে না ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিছু। সেটা বাড়ছে কারণ অবন্তীর দিক থেকে পারতপক্ষে প্রতিবাদ নেই কিছু। বাড়াবাড়ি হলে চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দেয় এই আচরণ পছন্দ করছে না। তখন অবুঝের ভান করে। রজার বারডোঁর তুলনায় এই লোকের ক্রূরতা যোল আনা সোফিসটিকেটেড।

এ-বাড়িতে এসে পাকাপাকিভাবে থাকার ডাক পড়তে অবন্তী ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু নিজের জীবনটাকে নিয়ে পাশার একটা বড় দান ফেলেছে এবারে। এখন পিছু হটতে রাজি নয়।...ভাগ্য বা জ্যোতিষীর গণনায় কোনদিন কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। এখনো আছে একবারও বলবে না। তবু হঠাৎ-হঠাৎ যোশী মহারাজের কথা মনে পড়ে। খুশি মুখে বলেছিলেন তোর হাতে আবার বিয়ের চিহ্ন আছে...তোকে আমি সেই আশীর্বাদ করছি।

আঠারো বছরের বড় এই প্রৌঢ়কে স্বামী কল্পনা করতে বিতৃষ্ণায় ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু অবন্তীর জীবনে আর কি স্বামীর প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন আছে কেবল উত্তীর্ণ হওয়ার। নিজের চোখে দশজনের চোখে নিজেকে উত্তীর্ণ করার। এজন্য পুরুষ-পশুর কংকালের পাহাড় অতিক্রম করতে হলেও অবন্তী আর পিছু-পা হবে না। হিংস্র নখ-দন্ত মেলে ভাগ্য তার থেকে অনেক নিয়েছে, কিছুই দেবে না? তার অপরাধ কি ছিল? সরল বিশ্বাস ছাড়া আর কি অপরাধ তার ছিল?

ডাক পড়তে মুখ বুজেই চলে এসেছে। আগের দিনের বিশাল বাড়ির মহলে সে ঠাঁই পেয়েছে। একেবারে কোণের বড়সড় ঘরটা তার। সূর্য পাণ্ডে এই ঘর নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি। হীরে কেনার বেলায় যেমন, অন্য সব ব্যাপারেও তাই—নিজের পছন্দটাই সব। অন্য কারো মতামতের ধার ধারেন না।

আসার আগে গলগল করে ভিতরের কথা বীরেন্দ্র চৌবেই বার করে দিয়েছে। ভয়ংকর গুরুদেবটি দীর্ঘকালের জন্য প্রস্থান করেছেন। এটা মহাপ্রস্থানও হতে পারে। প্রথমে বিদেশে কিছুকাল কাটাবেন, তারপর ফিরে এসে হিমালয়ের কোথাও অজ্ঞাত-বাসে থাকবেন। নিজেব মুখেই নাকি বলে গেছেন পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে দেখা হবে না। সূর্য পাণ্ডের ছেলেরা নাকি হাপুস নয়নে কেঁদেছে। তাদের আশংকা গুরুদেব চিরবিদায় নিলেন। গুরুদেব অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, আবার দেখা হবে।

কিন্তু সেই অনিশ্চিত দূরের ভবিষ্যত নিয়ে সূর্য পাণ্ডে মাথা ঘামানোর মানুষ নন।

...এ বাড়িতে বাস করতে এসে ওই গুরুদেবের একখানা বড় ছবি অবন্তী দেখেছে। ...সূর্য পাণ্ডেব স্ত্রীর পূজোর ঘর ছিল একটা। সেই ঘর আজও আছে। কোনো বিগ্রহ নেই। গুরুর আদেশেই সেই বিগ্রহ নাকি কোন দেবালয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকর-বাকরেরা অন্যসব ঘরের মতই ওই ঘরও পরিচ্ছন্ন রাখে, এছাড়া ও-ঘরে আর কেউ ঢোকে না।

সেখানে দেয়ালে ব্রহ্ম মহারাজের একখানা বড় ফোটো টাঙানো। অবন্তী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এখনো অনেক সময় এসে দাঁড়ায়। নির্ণিমেষে দেখে। চোখের গভীরে যেন স্নেহের সমুদ্র, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাবার হাতছানি। অথচ সমস্ত মুখ ভারী দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কত সময় অবন্তীর দু হাত যুক্ত হতে চেয়েছে, ছবির উদ্দেশে দেয়ালে মাথা ঠেকাতে ইচ্ছে করেছে। কিন্তু অবন্তী হাত যুক্ত হতে দেয়নি, দেয়ালে মাথা ঠেকায় নি। কে ইষ্ট? তার ইষ্ট বলে কেউ কোথাও আছে? অবন্তীর ইহকাল বলে কিছু আছে? পরকাল বলে কিছু আছে? আছে কেবল বুকের তলার কিছু জমাট বাঁধা আগুন—সবই ছাই করে দেবার নির্মম বাসনা।

কিন্তু দিন যায় বছর যায় একটা দুটো করে, একটা হতাশা অবন্তীকে পেয়ে বসছে। বাইরে তাব প্রকাশ নেই, অব্যক্ত যন্ত্রণা আছে।...যে মানুষের কাছে আছে, সে উদার হয়ে যত না হোক, অসুস্থতার দরুন অনেক কিছুই তার হাতে ছেড়েছে। অবন্তীর মাইনে এখন কাগজে কলমে মাসে আড়াই হাজার, আর ভোগের সহচরী হিসেবে মাসে আরো তিন হাজার। এই সাড়ে পাঁচ হাজারের মধ্যে মাসে এক হাজার করে সে উষা বাঈকে দিচ্ছে। বাকি টাকা তার নামে ব্যাঙ্কে জমছে। কিন্তু এর বাইরে খরচের সব টাকাই বলতে গেলে অবন্তীর হাত দিয়েই হয়। ঘরের সিন্দুক খোলার দরকার হলে তার ডাক পড়ে এমন নয়, যে কোন কারণে টাকার দরকার হলে অবন্তী সোজা এসে কিছু না জিগ্যেস করেই এই লোকের বালিশের তলা থেকে বা ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খোলে, টাকা বার করে নেয়। এদিক থেকে সূর্য পাণ্ডের জহুরীর চোখ। বুঝেছেন এর হাতে দশটা টাকাও গড়বড় হবার নয়। বাঁধানো হিসেবের খাতা আছে গোটা তিনেক। একটা বাড়ি খরচের, একটা অফিসের খরচের, আর একটা আড়তের অফিসের খরচের। মাসের পর মাসের হিসেব উল্টে দেখেছেন সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তীর দ্বিতীয় জোরের দিক হল বিচক্ষণ ভাবে ব্যবসা বুঝে নেওয়া। মালিক অসুস্থ হয়ে পড়লেও কেউ কিছু টের পায় না। সব নিখুঁতভাবে চলে। টাকা নিয়ে বেশি গড়বড় করলে অবন্তী মালিকের সামনে বীরেন্দ্র চৌবেকে পর্যন্ত গম্ভীর মুখে সতর্ক করে, এভাবে চললে যার দায় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি হাত ধুয়ে বসে থাকব—তখন যা খুশি করুন।

বীরেন চৌবের দু' চোখ জ্বলে উঠতে চায়। তিন-তিনটে বছর কেটে গেল, তার আশায় ছাই পড়েছে, লোভে ছাই পড়েছে! এতকালের মধ্যে এ-রকম নিরাশ তাকে কখনো হতে হয়নি। কিন্তু মুখে হাসি ছড়িয়ে ভিতরের ক্রূর মনটাকে আড়াল করতে হয়।

...নিজের অগোচরে বা গোচরেও কিছুটা কর্তৃত্ব এই রমণীর হাতে মালিককে ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেটা মনে হলে বা কোনো পরিস্থিতিতে সেটা প্রকট হয়ে উঠলে সূর্য পাণ্ডেও হিংস্র ক্রূর হয়ে উঠতে চান। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো আবার হাল ছাড়তেও হয়। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে অবন্তী নিজে তাঁর রান্নার আর খাওয়া-দাওয়ার তদারক করে। নিজের দেহ দিয়ে সূর্য পাণ্ডেকে এর সুফল অনুভব করতেই হয়। শরীর বেশি অসুস্থ হলে অবন্তীর কড়াকড়িও বাড়ে। লোভী মানুষটা তখন ক্ষেপে যায়। যাচ্ছেতাই করে চাকর-বাকরের সামনেই বকাবকি করেন, বলেন, বিয়ে করা বউ ভাবতে শুরু করেছ নিজেকে —কেমন? কখনো খাওয়া ফেলে রাগ করে উঠে চলে যান। ঠাকুর চাকর ভয়ে কাঁপে। একদিন টেবিলের থালা গেলাস উল্টে ফেলে দিতে অবন্তী বলেছিল, শরীরের যা অবস্থা আজ কিছু খেতে দেবারই ইচ্ছে ছিল না, ভালোই হল, না খাওয়ার থেকে খেয়ে বেশি বিপদ হয়।

সূর্য পাণ্ডে চোখ দিয়ে যাকে ভস্ম করবেন সে তখন আর কাছে নেই।

মানুষটা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন মদ খাওয়ার সময় বাধা পড়লে। বাধা পড়েই। বেশি মদ পেটে পড়লেই লোকটার হাঁপানি বাড়ে, শ্বাস কষ্ট বাড়ে। তখন অক্সিজেনের দরকার হয়। অবন্তী জোর করেই বাধা দেয়, মাত্রার হিসেবের কাছাকাছি এলেই আলমারিতে চাবি দিয়ে সেটা নিয়ে চলে যায়। দিশেহারা রাগে সূর্য পাণ্ডে তাকে তেড়ে মারতে এসেছেন। তাঁর পেয়ারের সাগরেদের সামনেই! এই লোক সর্বদাই তাঁর নেশার দোসর। অবন্তী তখনো অবিচলিত। বলে, আমাকে বিদেয় করে দিয়ে যা খুশি করুন, কিচ্ছু বলতে আসব না।

হাত শেষ পর্যন্ত গায়ে নেমে আসে না। কিন্তু অকথ্য গালাগাল করেন, ভোর হলেই তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন বলে শাসান। কিন্তু পরদিন আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। যেন ভুলেই গেছেন।

আর একটা জোরের দিক অবন্তীর ক্রমশই করায়ত্ত। কিন্তু মনে হলে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে। বাসনাপর্বে কিছু তোয়াজের আগে ওই প্রৌঢ় দেহে কামনার আগুন ছোটে না। গোড়ায় প্রায়ই বলতেন, বীরেন যা মাসাজ আর তোয়াজ জানে তেমন আর কেউ জানে না—ওর থেকে শিখে নাও না। অবন্তী সহধর্মিণী নয়, ভোগের সঙ্গিনী, তাই এমন কথা অনায়াসে বলতে পারেন। কারো সাহায্য ছাড়াই অবন্তী এই তোয়াজের উপযুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু অনেক সময়েই ইচ্ছে করে, এই লোকের টুঁটি দাঁতে করে ছিঁড়ে নিয়ে এখান থেকে চলে যায়।

হ্যাঁ সে কেবল লীলাসঙ্গিনী, ব্যভিচারী ভোগের সহচরী। নাচের সময় অঙ্গে কোন বসন না থাকলেই ওই দুই পশু খুশি হয়। গানে আপত্তি নেই, বীরেন চৌবের সামনে নাচতে না চাইলে এই লোকই ফেটে পড়ে। অবন্তীরও কি অবনতি হয়েছে? এই মালিকের সামনেও আর নাচতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় একটা নেকড়ের লোভাতুর চাউনি তার সর্বাঙ্গ চাটছে। বিদেশে বা এখানেও আগে তো গায়ে মাখতো না। এখন এমন হয় কেন?

মুখের ওপর জবাব দিলে তেতে-ওঠা মালিক যখন মাঝে মাঝে হুকুম এমন কি অনুনয়ও করেন, বলেন, বীরেন বেচারার ওপর তুমি এত বিরূপ কেন, তার ওপর একটু সদয় হও না...বরাবর ও দাদার প্রসাদ পেয়ে অভ্যস্ত, আমার আপত্তি না থাকলে তোমার এত কি আপত্তি!

অবন্তী কখনো কোনো জবাব না দিয়েই মনের ভাব বুঝিয়ে দেয়। কখনো মৃদু কঠিন গলায় বলে, এ কথা বলার আগে আপনি আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছেন কিনা সেটা ভাববেন।

মুখের ওপর জবাব দিলে তেতে ওঠা স্বভাব।—কেন, দোষের মধ্যে ওর আমার মত টাকা নেই, এছাড়া আমার সঙ্গে ওর তফাৎ কোথায়? তোমার কাছে আমি যা, বীরেনও তাই—এ জন্যে বাড়তি টাকা চাও পাবে।

অবন্তীর কেন যেন এই মুখ থেঁতলে দিতে ইচ্ছে করে। কঠিন গলায় বলে, আমার বিবেচনার ওপর আপনি জুলুম করবেন না, কেবল আপনার প্রয়োজন ফুরোলে বলে দেবেন।

যত রাগই করুক এই লোকের প্রয়োজন ফুরোবে না এ-ও ভালোই জানে। আর কিছু না পারুক, এঁকে তার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল করে তুলতে পেরেছে।

এই কথা প্রসঙ্গেই সূর্য পাণ্ডে একদিন ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন। বলে উঠেছিলেন, আমার হুকুম শুনে চলতে তুমি বাধ্য, চলে যাবে বলে কাকে ভয় দেখাও, ইচ্ছে করলেই এখান থেকে তুমি জ্যান্ত বেরুতে পারবে ভাবো?

চোখে চোখ রেখে অবন্তী সেদিন বলেছিল, জ্যান্ত বেরুতে না পারলেই বা কি, ঊষা বাঈয়ের বোনকে আপনি ধরে রাখতে পেরেছিলেন?

সূর্য পাণ্ডের মুখে কথা সরেনি। পাথুরে দু' চোখ গনগনে কয়লার মত জ্বলে উঠেছিল।

আগে হলে গায়ে মাখত না, কিন্তু এখন আর এক অশান্তি অবন্তীর মনে থিতিয়ে উঠেছে।...দুই ছেলের সঙ্গে বাপের অর্থাৎ সূর্য পাণ্ডের অশান্তি বাড়ছে। ছেলেদের ব্যবসা আলাদা, কিন্তু বাপ যেখানে এত বছর ধরে একটা মেয়েছেলেকে এনে ঘরে তুলেছে, আর তার হাতে নিজের এত বড় ব্যবসার কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছে, সেখানে তারা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? দু'দিকেরই বৃদ্ধ উকিলটির আনাগোনা বাড়ছে। বাপের মতলব বোঝার চেষ্টা। সূর্য পাণ্ডে অবশ্য তাঁকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ব্যবসা আর বিষয় নিয়ে ছেলেদের বা অন্য কারো মাথা ঘামানোর দরকার নেই—তিনি যা খুশি তা-ই করবেন। এ খবর চুপি-চুপি বীরেন্দ্র চৌবে অবন্তীকে দিয়েছে। ছেলেরা যে তারপরেও দস্তুর মতো

মাথা ঘামাচ্ছে তাও বলেছে। ম্যাডামের মন পাওয়ার লোভে ভিতরে ভিতরে সে পাগল হয়ে আছে। তাই তোষণের চেষ্টা। এমন আভাসও দিয়েছে, ম্যাডাম যদি তার ওপর একটু সদয় হয় তাহলে সে দাদাকে দিয়ে একটা উইল করানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

অবন্তী সর্ব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইদানিং ভিতর থেকে সেটা আর সম্ভব হয় না। এখন ঠিক যে কি চায় সে, তা-ও জানে না। ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে এখন যে টাকা জমেছে, একটা জীবন স্বচ্ছন্দে ভালোভাবে কেটে যেতে পারে। এক এক সময় ইচ্ছে করে, আর ভবিষ্যত ভেবে কাজ নেই, সব ছেড়েছুড়ে কোনো একদিকে চলে গেলেই হয়। কিন্তু তক্ষুনি ভিতর থেকে কেউ যেন ফুঁসে ওঠে। জীবন নিয়ে এই যুদ্ধ তার ভবিতব্য। বিশ্বাস আর সরলতার মাশুল গুণে দিয়ে এই বিধ্বস্ত জীবন নিয়েই সে সরে দাঁড়াবে?

...একমাত্র শান্তির জায়গা যোশী মহারাজের কাছে। তখন সব যন্ত্রণা সব ক্ষতর ওপর যেন অদ্ভুত একটা শান্তির প্রলেপ পড়ে। গানের তালিম যখন নেয় সব ভুলে যায়।

অবন্তীর বয়েস এখন ছত্রিরিশ। কিন্তু দেহের সুঠাম সৌষ্ঠব যেন একভাবেই স্থির হয়ে আছে। ...সূর্য পাণ্ডের বয়েস পঞ্চান্নয় গড়ালো। মদে আর অত্যাচারে শরীর আরো ভাঙছে। হাঁপ আর শ্বাসকষ্ট লেগেই আছে। তাঁর ভোগের ক্ষমতা যতো কমছে, ঘরের রমণীর প্রতি ততো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছেন, অত্যাচারের লোভ ততো বাড়ছে। গঞ্জনা দেন, তার ফ্রান্সের সাত বছরের জীবন নিয়ে অকথ্য সব কথা বলেন আর হাসেন, রেগে গেলে গায়ে হাত পর্যন্ত তোলেন। অবন্তী ভেবে পায় না কেন সে এতটা সহ্য করছে, এখনো মন কেন বলে, সহ্য করা দরকার।

এ বাড়িতেই এ সময়ে অভাবিত ব্যাপার ঘটে গেল একটা। রাত তখন দশটা হবে, অবন্তী তখন নিজের কোণের ঘরে। ওদিকে মালিকের ঘরে সন্ধ্যা থেকে মদ চলছিল, ঘন্টাখানেক আগে অবন্তী মদের আলমারির তালা বন্ধ করে অকথ্য গালাগাল শুনতে শুনতে চাবি নিয়ে চলে এসেছে। খানিকক্ষণের মধ্যে অক্সিজেনের দরকার হবে তাও জানে।

বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে প্রায় ছুটেই ঘরে ঢুকলেন সূর্য পাণ্ডে। সমস্ত মুখ ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। দিশেহারা চাউনি। বললেন, গুরুদেব এসেছেন, রাতটা এখানে থাকবেন বললেন, ছেলেরা কিছু লাগিয়েছে এমনও হতে পারে, শোনো—উনি কাল চলে না যাওয়া পর্যন্ত এ-ঘর ছেড়ে তুমি বেরুবে না, দোতলার আপিস ঘরে যাবে না, আড়তেও না, খুব খুব খুব সাবধান!

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অবন্তী নিশ্চল স্থাণুর মতো বসে।

সমস্ত রাত চোখে ঘুম নেই প্রায়। নিঃশব্দে একবার এসে গুরুদেবের ফোটোর সামনে দাঁড়িয়েছে। সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ, চাউনি...আর চোখের গভীরে সেই অপার স্নেহের সমুদ্র।

সকাল তখন সাড়ে পাঁচটা। অবন্তী তানপুরা নিয়ে মেঝেতে বসল। প্রথমে মৃদু আওয়াজ তুলল। তারপর স্তব্ধতা খান খান করে ঝংকার উঠল। তার সঙ্গে কণ্ঠের গান সুরে সুরে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল :

ইতনী মিনতি রঘুনন্দনসে
সুখ দ্বন্দ্ব হামারা মিটাও জী।।
আপনে পদপঙ্কজ পিঞ্জর মে
চিত হংস হামার বৈঠাও জী।।
তুলসীদাস কহে কর জোড়ি
ভব সাগর পার উতারো জী।।

গান নয়, একখানা আকুল মিনতি বার বার আছাড়ি বিছাড়ি করে লুটিয়ে পড়তে লাগল। প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট ধবে চলল সুরের সেই অব্যক্ত হাহাকার, বুক ভাঙা আকুতি। দরজার সামনে কারা নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়েছে, কিন্তু তার দু'চোখ বোজা, দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। সুরের পথে তার সত্তা কাঁদছে, অন্তরাত্মা কাঁদছে।

গান থামল। অবন্তী চোখ মেলে তাকালো।

সামনে সেই মূর্তি। ফোটোতে যাঁকে অনেক দেখেছে। ফোটোর থেকেও দৃপ্ত অথচ করুণাঘন মনে হল। তানপুরা রেখে অবন্তী মেঝের ওপর আস্তে আস্তে উপুড় হল, কপাল মেঝেতে, যুক্ত দুই হাত প্রণাম হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে স্থির হল।

স্তোত্রের মতো সুর আর স্বর আবার বাতাস ভরাট করে তুলল :

নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ
নমো নারায়ণ নমো নমঃ।
নমঃ শিবায় নমঃ শিবায়
নমঃ শিবায় নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগুরবে
নমঃ শ্রীগুরবে নমো নমঃ।।

আবার খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর জলদ কণ্ঠস্বর কানে এলো। —ওঠো।

অবন্তী আস্তে আস্তে উঠল। জানুর ওপর সোজা হয়ে বসল। দু'হাত জোড় এখনো। দুই গালে জলের দাগ।

—কে মা তুমি?

অবন্তীর জলে ভেজা দু' চোখ ব্রহ্মমহারাজের মুখের ওপর, খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট করে জবাব দিল, হতভাগিনী...।

তিনি দেখছেন। অপলক চেয়ে আছেন। —তুমি এখানে কেন?

—ঈশ্বর জানেন।...পনেরো বছর ধরে সরল বিশ্বাসের মাশুল গুনে চলেছি।

আবার কয়েক পলকের দৃষ্টিপাত। —এখানে কতদিন আছ?

—বেনারসে ছ' বছর।

একটু আগে তুলসীদাসের যে ভজনখানা গাইলে তার অচলিত সুর রাগ বিস্তার সবই আমার এক বিশেষ পরিচিত জনের—এ জিনিষ তুমি কোথায় পেলে?

—আমার সঙ্গীত গুরুর কাছ থেকে।

—কে তিনি?

—দয়াল যোশী মহারাজ।

ঈষৎ বিস্ময়। —যোশী মহারাজ নিজে তোমাকে শিখিয়েছেন?

—এখনো শেখাচ্ছেন।

স্থির গম্ভীর অপলক। চেয়েই আছেন। দেখছেন। গেরুয়ার রং গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিশে আছে। আস্তে আস্তে ঘুরলেন। সূর্য পাণ্ডের মুখোমুখি। মুখের ওপর এক ঝলক ভর্ৎসনার ঝাপটা পড়ল। অবন্তী দেখছে, মানুষটা বেতস পাতার মতো কাঁপছে।

—এসো আমার সঙ্গে, শিষ্যকে হুকুম করে ঘাড় ফিরিয়ে অবন্তীকে বললেন, আমি খানিকক্ষণের মধ্যে আসছি।

বড় বড় পা ফেলে চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। সেই ফাঁকে সূর্য পাণ্ডে একবার ঘরের দিকে তাকালেন। এই বিশ্বাসঘাতকতা আর ধৃষ্টতার শাস্তি তাঁর জানা নেই। গুরুর পিছনে ছুটলেন।

ব্রহ্মগুরু সোজা নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভারের পাশে সূর্য পাণ্ডে। গাড়ি যোশী মহারাজের ডেরার গেটের সামনে দাঁড়ালো। তিনি নেমে এগিয়ে চললেন। পিছনে সূর্য পাণ্ডে। উনি ভিতরে ঢুকে গেলেন। সূর্য পাণ্ডে বাইরের ঘরে নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে।

আধ ঘণ্টা বাদে ব্রহ্মগুরু বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। গাড়ির মালিক আবার ড্রাইভারের পাশে।

অবন্তী তখনো নিজের ঘরের মেঝেতেই বসে। তানপুরাটা পর্যন্ত তেমনি পাশে পড়ে আছে। ব্রহ্মগুরু বলে গেলেন খানিকক্ষণের মধ্যে আসছেন। কেন বললেন ধারণার অতীত।...এই মুখ যেন চোখে লেগে আছে আর গায়ে কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আবার সচকিত। ওই মূর্তি আবার দরজার সামনে।

ভিতরে ঢুকলেন। অবন্তীর সামনে মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন। অবন্তী ব্যস্ত হয়ে উঠতে যেতেই হাত তুলে বাধা দিলেন। দরজার তিন হাত তফাতে পাংশু বিরস মুখে সূর্য পাণ্ডে দাঁড়িয়ে। এদিকেই চেয়ে আছেন।

—বেনারসে আসার আগে তুমি সাত বছর ফ্রান্সে ছিলে?

অবন্তী একবার মুখ তুলে তাকালো, তারপর দৃষ্টি নত করল।

এবারে ব্রহ্মগুরু আরো অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, তুমি নাকি তোমার বাপুজি মানে যোশী মহারাজকে মাঝে মাঝে কি একখানা অপূর্ব বাংলা গান শোনাও, সেই গানের অর্থও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছ—তোমার গলায় ও-গান শুনলেই আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে বললেন, আমাকে একটু শোনাও তো গানখানা—

অবন্তীর ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল একটু। অর্থাৎ তিনি যোশী মহারাজের কাছে গেছলেন, সেখান থেকেই ঘুরে এলেন। অবন্তী কিসের খোঁজে দরজার দিকে তাকালো একবার তাও যেন পলকে বুঝলেন। —হারমোনিয়াম দরকার নেই, শুধু গলাতেই গাও।

অবন্তী গলায় শাড়ির আঁচল জড়িয়ে আস্তে আস্তে জোড়াসনে বসল। হাত দুটি কোলের কাছে যুক্ত হল। দু' চোখ বুজে গেল।

ঘরের বাতাস আবার সমর্পণের সুরে ভরাট হতে থাকল।

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক
মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু বিশ্ব বিপদহন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।
আছ অনল অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপী-লতায় জলদেরি গায়
শশী তারকায় তপনে,
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।'

অবন্তী তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। ব্রহ্ম মহারাজ ভাবে নিশ্চল স্থির।

খানিক বাদে কাঁধে হাত রাখলেন। —ওঠো।

দরজার দিকে ঘুরে আদেশের সুরে বললেন, এখানে এসো। সূর্য পাণ্ডে বিবর্ণ মুখে কলের পুতুলের মতো ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। অল্প অল্প কাঁপছেন।

আবার তাঁর মুখের ওপর সেই ভর্ৎসনার ঝাপটা। —ঘরে শক্তিকে এনেও তোমার বাঁদরামো গেল না--কেমন? তোমার সামনে দুর্দিন. আর খুব বেশি সময় পাবে না —এখনো সাবধান। যাও, আমি আসছি—

পালিয়ে বাঁচলেন।

ব্রহ্মগুরু ওই প্রশান্ত গভীর দু' চোখ অবন্তীর মুখের ওপর স্থির আবার। —মা আমার আদেশ, পুরনো যা-কিছু মন থেকে ধুয়ে মুছে ফ্যালো। মোহ-কালিমা তোমার ঘুচেই গেছে এটুকু মনে প্রাণে বিশ্বাস করো।...আজ থেকে তোমার আর এক জীবন শুরু হবে, আমি না বলা পর্যন্ত আজ ফল আর দুধ ছাড়া কিছু খাবে না। স্নান করে শুচি-শুদ্ধ হয়ে থেকো।

সজল দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর তুলে মৃদু গলায় অবন্তী জিগ্যেস করল, আমাকে দীক্ষা দেবেন?

—দেব। তার আগে একটু অন্য অনুষ্ঠান আছে।

অনুষ্ঠান কি সেটা রাতে বোঝা গেল। মাঝের সেই বড় ঘরের মেঝেতে চারটে আসন পাতা। মঙ্গলানুষ্ঠানের স্বল্প সরঞ্জাম।

একটি আসনে অবন্তী বসেছে। তার মুখোমুখি আসনে সূর্য পাণ্ডে। ব্রহ্মগুরু মন্ত্র পড়লেন। অবন্তীর বাপুজী দয়াল যোশী মহারাজ কন্যা সম্প্রদান করলেন। বৃদ্ধের দাড়ি ভরা মুখখানা আনন্দে গলে গলে পড়ছে। ব্রহ্মগুরুর আদেশে মালা-বদল হল, শুভদৃষ্টি হল। তিনি নিজে হাতে অবন্তীর কপালে সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল। সাক্ষী কেবল পুরনো ড্রাইভার মিশ্র, সেও গুরুজীর ভক্ত। সে-ই শাঁখ বাজালো।

এর পর ব্রহ্মগুরু একটু হোম করলেন। সূর্য পাণ্ডের দীক্ষা অনেক বছর আগেই হয়ে গেছে। অবন্তীকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার দুটি শব্দের মন্ত্র কানে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবন্তীর সর্বাঙ্গে শুধু নয়, সমস্ত সত্তায় বিদ্যুৎ শিহরণ। অবন্তী কাঁপছে। অবন্তী বসে থাকতে পারছে না। অবন্তীর ভীষণ ঘুমও পাচ্ছে।

ব্রহ্মগুরু মহারাজ সেই রাতেই বারাণসীধাম ত্যাগ করলেন। অবন্তীকে বলে গেলেন, খুব শিগগীর না হোক, আবার দেখা হবে।

দশ

অবন্তীর নতুন জীবনের এমন চেহারা কি স্বয়ং ব্রহ্মগুরুও কল্পনা করতে পেরেছিলেন? জীবনের সমস্ত পুরনো মার আবার চার গুণ হয়ে ফিরে আসবে এটাই কি তার নতুন জীবনের ভবিতব্য? এ কখনো হতে পারে? যাঁর মুখভাব মনে এলে শান্তি, যার কথায় অমৃতের স্বাদ, যাঁর দেওয়া জপমন্ত্রে আলোর হদিশ—তাঁর যদি এত দয়া, অবন্তীর বাকি জীবনটুকু তিনি এই মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে গেলেন কেন? এ কি পরিহাস? ...পরীক্ষা?

সূর্য পাণ্ডের বিকৃতি ক্রোধ ঘৃণা আর বিদ্বেষ অবন্তীর মাথায় বজ্র হয়ে নেমে এসেছে। অপমানে অত্যাচারে উৎপীড়নে তার অষ্টপ্রহর বিষিয়েও তিনি ক্ষান্ত হতে রাজি নন। বদ্ধ ধারণা, দেহসর্বস্ব বহুভোগ্য এই কুহকিনী স্ত্রীর অধিকার পাবার জন্যই এভাবে এতগুলো বছর এখানে কাটিয়েছে। তাঁর বিশাল বিত্ত হাতে পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। ধারণা, অনেক মাথা খাটিয়ে ছলে বলে কৌশলে তাঁকে বোকা বানিয়ে তাঁর পুরুষকার নস্যাৎ করে সে এই দিনের নাগাল পেয়েছে। মোহিনী মায়ায় মানুষ ভোলে, দেবতা ভোলে না? দেবদূত ভোলে না? যাকে যে রকম ভোলানোর অস্ত্র। তাঁর নিষেধ অমান্য করার স্পর্ধা জীবনে কমই দেখেছেন সূর্য পাণ্ডে। নিষেধ সত্ত্বেও সকালের বিশেষ মুহূর্তটি বেছে নিয়ে এই নারী গানের জাল বিছিয়ে গুরুদেবকে নিজের ঘরের দোরে টেনে এনেছে, চোখের জলে তাঁর বুকের তলায় ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এখন লক্ষ্যে পৌঁছেই গেল ভাবছে। কিন্তু সদর্পে কেউ সাপের লেজে পা দিয়ে দাঁড়ালে তার ভাগ্যে কি জোটে? কেবল বিষাক্ত দংশন ছাড়া আর তার কি প্রাপ্য হতে পারে?

ক্ষিপ্ত আক্রোশে ছোবল বসিয়েই চলেছেন সূর্য পাণ্ডে।

অবন্তীর কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর দেখে পরদিন থেকেই সকলে সচকিত, বিভ্রান্ত। বাড়ির অফিসের লোকেরা, আড়তের অফিসের লোকেরাও।...মালিকের বাড়িতে মালিকের ঘরে এত বছর কাটালো, এখনো আছে, তার কপালে সিঁথিতে সিঁদুর—এ

তাহলে মালিক ছাড়া আর কার সীমন্তিনী হতে পারে?

খবরটা দুই ছেলের কানে যেতে সময় লাগে নি। ব্যাপার বোঝার জন্য দু'তরফের সেই বৃদ্ধ উকিল অচিরে বাড়িতে এসে হাজির। কি কারণে অবন্তীও তখন মালিকের ঘরেই। উকিলবাবু ছদ্ম বিস্ময়ে চেয়ে আছেন দেখে সূর্য পাণ্ডে গলায় বিষ ঢেলে বলেছেন, অবাক হয়ে দেখছেন কি, নিজের বুদ্ধির জোরে আমার স্ত্রী হবার অধিকার উনি অর্জন করেছেন—স্ত্রী না হলে এতবড় বিষয়-ব্যবসা হাতের মুঠোয় পাবে কি করে?...ছেলেরা ঠিকই মতলব বুঝেছিল, ওদের চিন্তা করতে বারণ করবেন...বিষয় খুব ভালো করেই খাওয়াচ্ছি আমি, ব্যবস্থা যা করার করছি।

উকিলটি চলে যাবার পরেই অবন্তী আবার ঘরে এসেছে।—আপনার বিষয়-ব্যবসা সব আপনি এই মুহূর্তে ছেলেদের লেখা-পড়া করে দিন, কিন্তু লোকের সামনে এভাবে অপমান করবেন না।

—কি? পুরুষের পাথুরে চোখ ধক-ধক করে উঠেছে। —তোমার অপমান বোধও আছে বলছ? দেশের-বিদেশের শ'য়ে শ'য়ে লোকের লোভের অপমান গায়ে মেখে এখানে এসে অপমান জ্ঞানও লাভ হয়েছে?

শুধু বাড়ির অফিস ঘরে নয়, সূর্য পাণ্ডে আড়তের অফিসেও আর তাকে মুখ না দেখাতে হুকুম করেছেন। নিজে খুলতে না পারলে সিন্দুকের চাবি বীরেন্দ্র চৌবেকে দিয়ে খোলান, তবু অবন্তীকে ছুঁতে দেন না। মদ খাওয়া দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন, নিষেধ করা ছেড়ে অবন্তীর নিষেধের চোখে তাকানোর অপরাধে দু'দিন হাতের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছেন।...বিয়ের পর থেকে এই লোক আর তাকে স্পর্শ করেননি। কিন্তু সামনে দেখলেই ওই নিশ্চল দু'চোখ থেকে ব্যভিচারী লোভ ঠিকরে পড়ে। বর্তমানের এই সম্পর্কটা তাঁর এই লোভেও যেন বাদ সেধে বসেছে। তারও ফল দুর্জয় ক্রোধ।

কিন্তু রাতে মদের গেলাস হাতে নিলে তার ডাক পড়েই। প্রাণের সাগরেদ বীরেন্দ্র চৌবের লুব্ধ দৃষ্টি আর অবন্তীর বিরক্তিও যেন বেশ উপভোগ্য। ওই লোকটাকে দেখলে অবন্তীর সত্যি এখন গা ঘিনঘিন করে। বিয়ের পর বীরেন্দ্রর চাউনি আরো ক্রূর কুটিল। সময় সময় মনে হয়, মালিকের একটু প্রশ্রয়ের ইশারা পেলেই সে থাবা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

সে-রাতের আসরে মালিকের হুকুম হল, আজ আমরা তোমার প্যারিসের সব থেকে লোক-মাতানো নাচ আর গান চাই—সে-রকম চোখ-তাতানো ড্রেস কি আছে পরে এসো —নূড হলেও আপত্তি নেই।

বিয়ের এই চার মাসের মধ্যে নাচ-গানের হুকুম আর হয়নি। অবন্তী ঠাণ্ডা অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, এ-রকম নাচ গান আর এখানে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠল বুঝি, সাঁই-সাঁই শ্বাস।—কেন হবে না? এখন তুমি সতী-সাধ্বী স্ত্রী হয়েছ বলে? হাজার বার হবে—যখন বলব তখন হবে!

অবন্তী ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, গুরুদেব যদি বলেন তোমার হুকুম হলে বাইরের লোকের সামনে নাচ-গান হতে পারে তাহলে কোন-রকম নাচ-গানেই আর আমার আপত্তি হবে না।

...না, হাতের মদের গেলাস ছুঁড়ে মারেন নি—কিন্তু গেলাসের সমস্ত তরল পদার্থের

ঝাপটা সজোরে অবন্তীর চোখে মুখে এসে পড়েছে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলে গেল মনে হয়েছে। অবন্তী তবু সোজা তাকিয়েছে তাঁর দিকে। মেরে বসেছে বটে, রাগে কাঁপছেও, কিন্তু ঐ এক নাম শুনে সমস্ত মুখ পাংশুও।

ছ'মাস যেতে অনিয়ম অনাচার অত্যাচারের অমোঘ মাশুল দেবারই দিন এসে গেল বুঝি। সেদিন মদের গেলাস হাতে বার কয়েক বমির উদ্বেগের পরেই শয্যায় ঢলে পড়লেন।

দু'দুজন বড় ডাক্তার একই কথা জানালেন। সেরিব্রাল অ্যাটাক। বড় গোছেরই। হাসপাতালে নেওয়া যাবে না, নড়া-চড়া করানোর প্রশ্নই নেই।

চিকিৎসার ত্রুটি নেই। দুই ছেলে নকুল আর সহদেব এসে ঘন্টার পর ঘন্টা থাকছে। তাদের স্ত্রীরাও এসে এসে দেখে যাচ্ছে। দিনরাতের নার্স এসেছে। পদস্থ কর্মচারীরা দু'বেলা এসে এসে খবর নিচ্ছে।

চারদিন বাদে জ্ঞান হয়েছে। সেই জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠতেও খুব সময় লাগেনি। কিন্তু যে থাবা পড়েছে তাতে বাঁ দিকের সর্ব অঙ্গ অসাড়। মুখের বাঁদিক বাঁ-হাত বাঁ-পা।

সাড়ম্বর চিকিৎসা চলতেই থাকল। মুখের বিকৃতিই শুধু কমতে লাগল, কিন্তু বাঁ-হাত বাঁ-পা অচল। এরই মধ্যে ছেলেরা একজনের প্রতি বাপের মনোভাব লক্ষ্য করেছে। ছ' বছর রক্ষিতার মতো থেকে যে এখন কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরে বসে আছে, তাকে। তার দিকে চোখ পড়লেই বাপের ক্রূর দৃষ্টি আর বিড়বিড় গালাগালি। বড় ছেলে নকুল বাবার সামনেই অবন্তীকে একদিন বলে বসল, আমরা যতক্ষণ থাকব আপনি ততক্ষণ এ-ঘরে বা আমাদের সামনে আসবেন না!

বাপের মনের খবর শোনা ছিল, এখানে এসে স্বচক্ষেই ছেলেরা দেখেছে। এ-রকম বলে দেবার পরেও বাপের পরিতুষ্ট মুখই দেখেছে।

দোরগোড়া থেকে আর একজন এ অপমান দেখেছে। শুনেছে। পুরনো ড্রাইভার মিশ্র। মালিকের অসুখে সে-ও বাড়ির লোকের মতোই উতলা।

ছেলেদের এক সময় নিচে পেয়ে সে বিষণ্ন মুখে বলেছে, গুরুজী মহারাজ নিজে বসে মন্ত্র পড়ে মালিকের সঙ্গে যাঁর বিয়ে দিয়েছেন তাঁকে দাদাবাবুদের এভাবে অপমান করা ঠিক হল না।

দুই ভাই-ই একসঙ্গে তড়িৎস্পৃষ্ট যেন। —কে বসে মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিয়েছেন? আমাদের গুরুদেব...ব্রহ্মগুরু?

—জি দাদাবাবুরা, আউর আপনা লেড়কির মতন ওস্তাদ দয়াল মহারাজ সম্প্রদান করিয়েছেন।

দু'ভাই আবারও হাঁ। এ কি অসম্ভব কথা শুনছে তারা!

কিন্তু এরপর অবন্তীর দেখা আর তারা পায়নি। তারা এলে অবন্তী নিজের ঘরে সেঁধিয়ে থাকে।

ছ' মাস পরেও সূর্য পাণ্ডে নিজে হাঁটতে পারেন না। লাঠি সত্ত্বেও বাঁদিকে লোকের কাঁধে ভর দিয়ে একটু-আধটু হাঁটতে চলতে পারেন। বিকেল চারটে থেকে বেশ রাত পর্যন্ত লোকেরও দরকার হয় না। সারাক্ষণই বীরেন্দ্র চৌবে ছায়ার মতো সঙ্গে আছে।

এ অবস্থায়ও মানুষটার বিকৃতি বেড়েই চলেছে। অবন্তীর ওপর দুর্বার আক্রোশই তাঁর সব থেকে বড় বিকৃতি। তাকে সামনে দেখলে ক্ষেপে যান—অশ্রাব্য গালাগালি করেন, আবার না দেখতে পেলেও সেটা স্পর্ধা ভাবেন, চেলাকে হুকুম করেন ঘাড় ধরে নিয়ে আসতে! অবন্তীর হাতের রান্না দূরে থাক, ছোঁয়াও খান না। আবার খাওয়ার অনিয়ম শুরু হয়েছে। মদের মাত্রাও আবার বাড়ছে। ব্লাড প্রেসার তো চড়েই আছে, অক্সিজেন সিলিণ্ডার চালাতে হয় না এমন রাত যায় না। অন্য ঘর থেকেও শ্বাসের সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যায়। বীরেন্দ্র চৌবের সামনে বসে সন্ধ্যা থেকে রাতের শুশ্রূষা অবন্তীকেই করতে হয়। এতে আপত্তি হবে কেন, এ তো শাস্তিরই সামিল—আরো শাস্তি বীরেন্দ্র ক্ষুধাতুর লোভাতুব দৃষ্টি-লেহনের সামনে বসে থাকাটা। সূর্য পাণ্ডে বিকৃত আনন্দে লক্ষ্য করে যান।

সেদিন অফিস ঘরে এসে অবন্তী ফোনের রিসিভার তুলে নিল, নম্বর ডায়াল করল। সাড়া পেয়ে জানান দিল নকুল বা সহদেব পাণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

নকুল পাণ্ডেই ফোন ধরল।

অবন্তী বলল, মুখ দেখতে আপত্তি আছে জানি, কিন্তু খুব দরকারে দুই একটা কথা জানাতে পারব কি?

—বলুন। নকুল পাণ্ডের বিব্রত অথচ সংযত জবাব।

—আবার খাওয়া-দাওয়ার বেশি-রকম অনিয়ম শুরু হয়েছে, ড্রিংকএর মাত্রাও বাডছে—সব থেকে বেশি ক্ষতি কবছেন তাঁর বন্ধু বীরেন্দ্রবাবু, রোজই সকালে ডাক্তার এসে বকাবকি করেন, কিন্তু সন্ধ্যার পরে একই ব্যাপার চলছে। শ্বাস কষ্টও আগের থেকে অনেক বেড়েছে।...গুরুদেব বলে গেছলেন এ বছরটা খুব দুঃসময়, তাই জানানো দরকার মনে করলাম।

সেই বিকেলে দুই ছেলে হাজির। অবন্তী জানত না। ঘরের সামনে আসতেই ক্রুদ্ধ চিৎকার কানে এলো, ফোনে তোদের কাছে উনি নালিশ করেছেন? এত আস্পর্ধা! তোরা এসেছিস যখন ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়ে যা—আমি হুকুম করছি!

নকুল পাণ্ডের মিনমিনে গলা। —এর মধ্যে গুরুদেব আছেন শুনলাম...।

—থাকলেই বা! ক্রোধে ক্ষিপ্ত। —গুরুদেব মানুষ নন? তিনি একটা ভুল করলে সেই ভুল আমাদের মাথায় করে বসে থাকতে হবে?

অবন্তী নিজের ঘরে চলে এলো। না, কেউ তাকে বার করে দেবার জন্য এগিয়ে এলো না।

রাত ন'টা নাগাদ চাকর মারফত ঘরে ডাক পড়ল তার। আসতে শয্যার নিজের বাঁদিকে অর্থাৎ যে-দিকটা এখনো অচল, সূর্য পাণ্ডে সে-দিকটায় বসতে বললেন তাকে। তাঁর ডান দিকটা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল।

অবন্তী বসল। তিন হাতের মধ্যে বীরেন্দ্র চৌবে বসে। তার চোখে-মুখে হিংস্র খুশির ঝিলিক।

অবন্তী সোজা তার দিকে তাকালো।

—শোনো, মোলায়েম সুরে সূর্য পাণ্ডে শুরু করলেন, শোনো মহাভারত নিশ্চয় পড়েছ, আর ক্ষেত্রজ সন্তানের কথাও ঝুড়ি-ঝুড়ি পড়েছ...সেটা অনাচার নয়, শাস্ত্রেও

বাধে না, অক্ষম স্বামীর হুকুমই শাস্ত্র...আমার আর একটি সন্তান চাই, বীরেন আমার অনুরোধে রাজি হয়েছে, তোমার খুব একটা লজ্জা বা সঙ্কোচের কারণ নেই, আমি তো সামনেই থাকব! ও কি—উঠছ যে? বোসো বলছি! বজ্র হুংকার।

অবন্তী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

—উঃ! অস্ফুট একটা আর্তনাদ গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো। পিঠটা জ্বলে ঝলসে যাচ্ছে।

চামড়ার যে গুটলি বসানো চাবুকটা দেয়ালে ঝোলানো থাকে সেটা সূর্য পাণ্ডের ডান হাতে—সেটাই প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে একবার অবন্তীর পিঠের ওপর নেমে এসে আবার উঠছে।

অবন্তী নিজের অগোচরে কয়েক পা সরে এলো। সূর্য পাণ্ডে বীরেন্দ্রর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠলেন, ধর্ ওকে, আজ আমি ওকে আধমরা করে দেখব আমার হুকুম মানে কিনা!

অবন্তী ছুটে বেরিয়ে গেল। নিজের ঘরে এসে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ধড়মড় করে উঠতে হল আবার। দরজার কাছে কে দু'জন দাঁড়িয়ে।

একটা চাকরের সঙ্গে বীরেন্দ্র। কাঁপা গলায় জানালো, দাদার শ্বাস কষ্ট ভয়ঙ্কর বেড়েছে, বুকেও যন্ত্রণা হচ্ছে, উথাল-পাথাল করছেন, একটুও ভালো মনে হচ্ছে না।

এসে অবস্থা দেখে অবন্তীর চক্ষু স্থির। পাগলের মতোই করছেন। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। সঙ্গে অবিরাম কাশি। গলার কাশি নয়, অন্য রকমের চেনা কাশি। বীরেন্দ্র জানালো সে এর মধ্যে চারটে শ্বাস কষ্টের আর দুটো ঘুমের ওষুধ দিয়েছে।

অবন্তী ছুটে টেলিফোনের কাছে যেতে বীরেন্দ্র জানালো, ডাক্তার একটা জরুরী কলে গেছেন, এখনো ফেরেন নি—এলেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—বাড়িতে ছেলেদের ফোন করুন। অবন্তী বলল।

তার গলা পেয়ে এত কষ্টের মধ্যেও সূর্য পাণ্ডে চোখ তাকিয়ে দেখলেন। পাথুরে চোখ দুটো ধকধক করছে। চাকর আর ড্রাইভার মিশ্রর সামনেই গালাগালি করে উঠতে গিয়ে কাশতে লাগলেন। ফলে আরো ঘাম, আরো শ্বাস কষ্ট।

রিসিভার রেখে হতাশ মুখে বীরেন্দ্র বলল, দুই ভাই-ই ব্যবসার কাজে কোথায় গেছে, কাল সকালের আগে ফিরবে না।

অবন্তী ফিরে দেখে মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে যোঝা সত্ত্বেও ওই মানুষ আহত জানোয়ারের মতো তার দিকে চেয়ে।

ফানেল খুলে অবন্তী অক্সিজেনের সরু নলটাই মাপমতো নাকে ঢুকিয়ে দিল। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে নিতে লাগল। তার নিজের পিঠের চামড়া দু'ফাঁক, এখনো জ্বলে যাচ্ছে। এই লোকের বাধা দেবার শক্তি নেই, কেবল চোখের চাবুক এখনো তার সর্বাঙ্গে নেমে আসছে।

ডাক্তার রাত সাড়ে এগারোটার পরে এলেন। অবন্তী জানে এই রোগীর ওপর অভিজ্ঞ ডাক্তারটি খুবই বিরূপ। অবাধ্য রোগী সর্বদাই তাঁকে মুখের ওপর বলে দ্যান, আপনার চিকিৎসা আপনি করুন, আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।

এসে পর পর তিনটে ইনজেকশন দিলেন তিনি। মিনিট পনেরোর মধ্যে শ্বাসের টান কিছু কমল। বুকের ব্যথাও বোধহয়। ঘুমিয়ে পড়লেন।

ডাক্তার অবন্তীকে বললেন, ইনজেকশনের এফেক্ট কতক্ষণ থাকবে বলা যায় না, কারণ এ ধরনের কাশিটাই মারাত্মক। রাতটা কেটে গেলে সকালের আগে আর কিছু করার নেই। এক কথায়, এ-রকম অবস্থায় আশ্বাস দেবার মতো কিছু নেই।

রাত দুটো।

কাশির চোটেই ঘুম ভেঙে গেল। কাশি বাড়তেই থাকল। শ্বাসকষ্টে আবার কপালে বুকে ঘাম দেখা দিল। অবন্তী সামনের চেয়ারে বসে। ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অবন্তী ঘাম মুছে কূল পাচ্ছে না। খুক-খুক কাশিরও বিরাম নেই। বুকে যন্ত্রণা। কিন্তু সব থেকে অসহ্য শ্বাসকষ্ট। রাতের নির্জনে এই শ্বাসের শব্দ বড় ভয়ঙ্কর।

উথাল পাথাল ভাব বাড়তেই থাকল। ফুল-স্পিডে পাখা ঘুরছে, নাকে অক্সিজেন, তবু ইশারায় বাতাস চাইছেন। কার কাছে চাইছেন খেয়াল নেই। অবন্তী ছুটে গিয়ে একটা হাত-পাখা এনে শয্যার পাশে বসে প্রাণপণে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু ফল কিছু হচ্ছে মনে হয় না। মুহুর্মুহু তৃষ্ণা। পাখা রেখে অবন্তী জল দিচ্ছে আবার পাখা নিয়ে বসছে।

শ্বাসকষ্টে এক-একবার উঠে বসতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাঁদিক অচল, পারা সম্ভব নয়। অবন্তী আর একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে দিল।

ছটফটানির মধ্যেও এবারে খেয়াল করলেন কে শুশ্রূষা করছে। হাপরের মতো শব্দ করে শ্বাস নিচ্ছেন ফেলছেন। কাশির কামাই নেই। তার মধ্যেই হিংস্র বিকৃত দুই পাথুরে চোখ অবন্তীর মুখের ওপর। কাশির ফাঁকে ফাঁকে বলে উঠলেন, তুমি ভেবেছ কি...তোমাকে টিট করতে না পারলে আমার নামে কুকুর পুষো...শুধু বীরেন নয়, পাঁচ সাতটা নেকড়ে-মানুষ এনে তোমাকে আমি খাওয়াবো...আর আয়েস করে আমি তাই দেখব...তবে আমি সূর্য পাণ্ডে!

অবন্তীর কি যে হল হঠাৎ। তারও দু'চোখ পাথরের মতো হয়ে উঠছে। লোকটার মুখের দিকে অপলক চেয়ে আছে। হাপরের মতো বুকটা উঠতে দেখছে নামতে দেখছে, কপাল মুখ ঘামতে দেখছে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে দেখছে। খুক-খুক কাশির জন্য সিকিভাগ নিঃশ্বাসও নিতে পারছে না। তারই মধ্যে দুই ঘোলাটে চোখ এই অমোঘ ভবিতব্য ঘটানোর ক্রূর শপথ।

অবন্তীর হাতের উল্টোদিকের আচমকা ঝাপটায় লিউকো-প্লাস্ট লাগানো নাকের অক্সিজেনের সরু নলটা ছিটকে বিছানার একদিকে পড়ে গেল। মানুষটার দু'চোখ দিশেহারা হয়ে ওঠার আগেই অবন্তী শয্যা ছেড়ে উঠল। নিজেই দেখছে তারই দুটো আঙুল অক্সিজেন সিলিণ্ডারের চাবিটা বন্ধ করে দিল। পুরোদমে ঘোরা পাখার সুইচটাও টিপে বন্ধ করে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল।

বাইরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিল অবন্তী। আবার যখন ভিতরে ঢুকল রাত প্রায় চারটে।

এই বাড়িতে বা আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে সরবে শোক করার কেউ নেই। দুই ছেলে এসেছে, তাদের বউ ছেলে মেয়েরা এসেছে। দুই তরফের সমস্ত কর্মচারীরা

এসেছে। সকলেই একটা বিষণ্ণ মৃত্যু দেখছে। বিষণ্ণ বলতে মৃতের মুখে প্রায় ক্ষেত্রেই যে সৌম্যভাব ফিরে আসে সেটা নেই। ডাক্তারটি ভোরে নিজে থেকেই দেখতে এসেছিলেন।...ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেছেন। দুই ছেলেই উপস্থিত তখন। তারা ভোর-রাতের গাড়িতে ফিরে খবর পেয়েই চলে এসেছে। ডাক্তার তাদের বলে গেছেন, রাতের অবস্থা দেখেই মনে হয়েছিল সকাল পর্যন্ত হয়তো টিকবেন না।

মৌন আড়ম্বরে দেহ মণিকর্ণিকার শ্মশানে ছাই হয়েছে।

অবন্তীকে ক'দিনের মধ্যে কেউ একটিবারও নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখেনি।

ব্রহ্মগুরু এসেছেন আরো প্রায় দু'মাস বাদে। ছেলেরা তাঁর অপেক্ষাতেই ছিল। তাদের সঙ্গে নিয়ে এ-বাড়িতে এলেন। এই দু' মাসের মধ্যেও অন্দরমহলের কোনো লোক অবন্তীর মুখ দেখেনি।

অবন্তী সেদিনও নিজের ঘরের মেঝেতে বসে।

ছেলেরা দরজার বাইরে। ব্রহ্মগুরু ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। তিনি চেয়ে আছেন। অবন্তীও অপলক চেয়ে আছে। তাঁর চোখের গভীরে এখনো সেই অপার স্নেহের সমুদ্র।

অবন্তীর সমস্ত অস্তিত্ব কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। দু'হাতে পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে কপাল রাখল। সেই একদিন অবন্তীর চোখের জলে তাঁর পায়ের সামনের মেঝেটা ভিজেছিল, এইদিন পা দু'খানা ভিজল।

—ওঠো।

অবন্তী উঠল।

—চতুর্দশ খণ্ড সমাপ্ত—

গ্রন্থ-পরিচিতি

আশুতোষ রচনাবলীর চতুর্দশ খণ্ডে রয়েছে চারখানি গ্রন্থ। 'সোনার হরিণ নেই' (দ্বিতীয় ভাগ), 'খনির নতুন মণি', 'অন্য নাম জীবন' ও 'এক রমণীর যুদ্ধ'।

'সোনার হরিণ নেই' উপন্যাসটি দু'টি পর্বে তৎকালীন জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকা 'অমৃত'-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এবং পুস্তকাকারে এই সুদীর্ঘ উপন্যাস মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে দু'টি খণ্ডে ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত সুখপাঠ্য এই উপন্যাসটি লেখকের নিজস্ব পছন্দের তালিকায় ছিল। অনেকের মতে, এর নায়ক-চরিত্রটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ফিলসফির আত্মীকরণ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে।

'খনির নতুন মণি' বহু পুরনো রচনা। তৎকালীন কোনও এক বিশিষ্ট শারদ-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বই হিসেবে এটি প্রকাশনা করেন দে'জ পাবলিশিং ; শ্রাবণ, ১৩৬৬

'অন্য নাম জীবন' প্রথম প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৬৬ সনে, করুণা প্রকাশনী থেকে। ভয়ার্ত বন্যার পটভূমিতে রচিত এই কাহিনীতে রয়েছে এক বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

'এক রমণীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয় কোনও একটি শারদ পত্রিকায় (খুব সম্ভবত প্রসাদ-এ)। পুস্তক হিসেবে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ, ১৯৩৭-র ফেব্রুয়ারি, বইমেলা। প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং।

'সোনার হরিণ নেই'-এর সমাপ্তি, রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান 'খনির নতুন মণি', প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে 'অন্য নাম জীবন', এবং নারী-সংগ্রামের অভিনব আলেখ্য 'এক রমণীর যুদ্ধ'—আশুতোষ রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ডের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত হবে আশা করি।